~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য

রচনাসংগ্রহ

গৌরী আইয়ুব

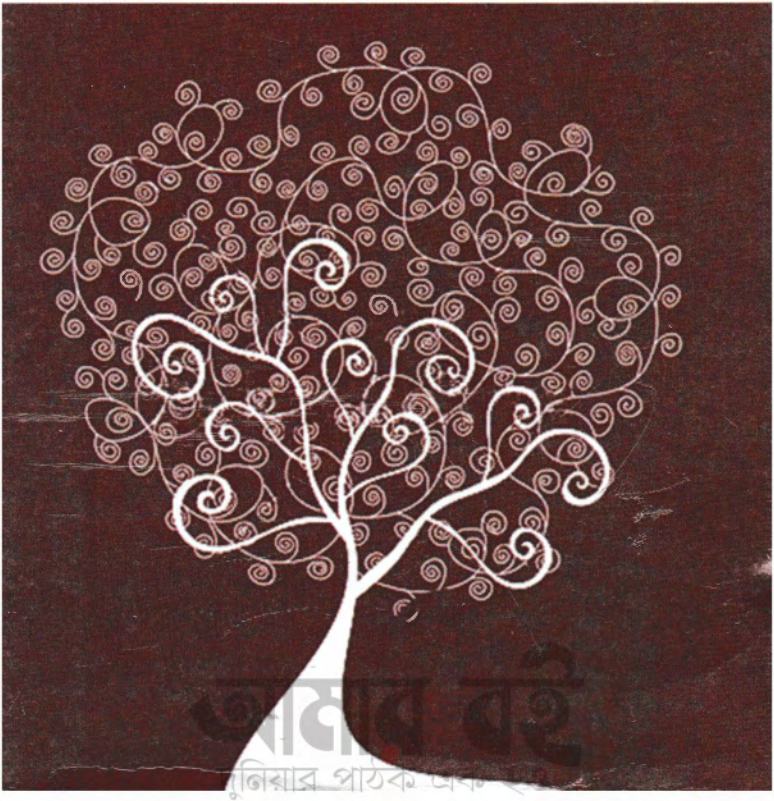

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য..." গৌরী আইয়ুবের আত্মজীবনীমূলক রচনা ও প্রবন্ধের একমাত্র সংকলন। পাটনায় বড় হওয়া, শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা, সেখানে অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আলাপ ও প্রেম, পরবর্তী জীবনে নানান বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব, এসবের কথা তিনি লিখেছেন সহজে ও অকপটে। এই সংকলনের অন্য আকর্ষণ তাঁর তিনদশকব্যাপী রচিত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলি—রবীন্দ্রভাবনা, উচ্চশিক্ষা, রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, স্ত্রী স্বাধীনতা, ঈশ্বরচিন্তা এবং অন্যান্য বিষয়ে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতে এমার্জেন্সির সময়কার রচনাগুলি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৌরী আইয়ুবের জন্ম পাটনায় ১৯৩১ সালে। বিশ্বভারতী থেকে বি. এ (১৯৫২) ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ (১৯৫৫) পাশ করেন। দীর্ঘদিন শ্রী শিক্ষায়তন কলেজে অধ্যাপক ও এডুকেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন। বেশ কিছু মর্মস্পর্শী ছোট গল্প ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করে লেখিকা হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। আজীবন নানাপ্রকার সমাজসেবায় যুক্ত ছিলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ত্রাণে ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাঁর। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'মৈত্রী সম্মাননা' পুরস্কার প্রদান করেন। মৃত্যু ১৯৯৮ সালে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য

রচনাসংগ্রহ

গৌরী আইয়ুব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য

রচনাসংগ্রহ

গৌরী আইয়ুব

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

AAMADER DUJANER KATHA EBONG ANANYANYA RACHANASANGRAHA
A Collection of writings by GOURI AYYUB
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241 2330, 2219 7920 Fax (033) 2219 2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ .650.00

ISBN 978-81-295-2168-2

প্রথম প্রকাশ ২৫ বৈশাখ ১৪২১

৬৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ সংস্থাপনা দিলীপ দে

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে। বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

মুখবন্ধ ৯
ভূমিকা ❑ আরতি সেন
অনুলেখকের কথা ❑ কামাল হোসেন ৩৭

আমাদের দুজনের কথা

জবাবদিহি ৪১
শান্তিনিকেতনের দিনগুলি ৪২
উষাগ্রাম মেথডিস্ট মিশন ৮১
অবশেষে কলকাতায় ৮৪
৫ পার্ল রোড ১০০
সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু ১০৬
সেদিন দুজনে... ১১৬
আমার ছেলেবেলা ১১৮
শিমলার স্মৃতি ১২৫
দিনলিপি (১৯৭৫-৭৭) ১২৮

বন্ধুদের স্মরণে

শ্রীমতি সুশীলা আশার ১৩৫
রবীন্দ্র-সনাথ সোমেন্দ্রনাথ বসু ১৩৯
নিভৃতচারিণী নীলিমা সেন ১৪৩
সৈয়দ সাদত আবুল মাসুদ ১৫১
শিবনারায়ণ রায় বন্ধুবরেষু ১৬০
মৈত্রেয়ী দেবী ও 'ন হন্যতে' ১৭০
Ellen Roy An Account of a Brief Friendship ১৭৪

রবীন্দ্রভাবনা

ঠাকুর পরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি ১৯১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে ১৯৬
রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃঙ্খলা ২১৩
খণ্ডিত প্রতিমা ২৩০
রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ ২৪০
বিশ্বভারতী—একটি ব্যর্থ প্রয়াস ২৪৬

রা জ নৈ তি ক

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ ২৫৭
জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ২৬৬
কোন বাংলা? কে বাঙালী? ২৭৪
প্রগতি কি ও কেন? ২৮৮
তবে কি গণতন্ত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা অসম্ভব? ২৯২
আমার কাছে আর কোনও বিকল্প নেই ২৯৬
ভারতীয় ঐতিহ্য ও জবাহরলাল ২৯৯
ইন্দিরা গান্ধী—আমার বিস্ময় ৩০৪
ব্যর্থ লোকনায়ক ৩১১
জনতার বিশ মাস ৩১৬
বিশ দফার বিশ মাস ৩২০
বিশ দফার বিশ মাস পুনশ্চ ৩৩৫
সমালোচনার অধিকার ৩৩৮

দু ই স ম্প্র দা য়

দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগাযোগ ৩৪৫
কাবিলনামহ থেকে বসুধারা ৩৪৯
রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ৩৬৬
যেদিকে আমাদের চোখ পড়েনি ৩৭৮
হায় আমার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ! ৩৮৫
ভারতীয় মুসলমান সমাজে আজকের মেয়েরা ৩৯০
হিন্দু-মুসলমান সাংকর বিবাহের সমস্যা ৩৯৭

বা ং লা দে শ

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বাংলা ৪০৭
মুক্তিফৌজী ৪১১
প্রভাতেই অন্ধকার ৪১৮
অনুবাদ "বাংলাদেশ" (কাইফি আজমী) ৪২১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শি ক্ষা

'জাতীয় বিদ্যালয়'	৪২৫
শিক্ষা নাকি শিক্ষার মূলোচ্ছেদ	৪৩০
ইংরাজির নির্বাসন নয়	৪৩৩
সৎভাবে পড়ালে এই পাঠ্যসূচিতেও কাজ হত	৪৩৭
ভাষা বিতর্কের শেষ কোথায়?	৪৩৯
Ideas and Experiments in Education	৪৪৪
Education and Social Change	৪৪৮

সা মা জি ক স ম স্যা ও স্ত্রী স্বা ধী ন তা

মেয়েরা আজ কতটা অবলা?	৪৫৫
জন্মশাসন ও স্ত্রী স্বাধীনতা	৪৫৮
অধিকার রক্ষা না অধিকার হরণ?	৪৬২
গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা	৪৬৭
সরলা দেবী	৪৮৩
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন	৪৯০
শান্তা দেবী চিরকালের আধুনিকা	৪৯৪
প্রীতি ও তার অপ্রীতিকর জীবন	৫০৫
এরা কি ঘর পাবে না কখনও?	৫০৯
বরণীয়া-বরণ	৫১৩
অপ্রয়োজনীয়	৫১৮

স মা লো চ না

বাংলা সমালোচনা	৫২৫
কী বই পড়েছেন?	৫২৭
দুই কুড়ির সমৃদ্ধ ভূয়োদর্শন	৫২৯
রবীন্দ্রগবেষণার এক অভিনব ধারা—১	৫৫০
রবীন্দ্রগবেষণার এক অভিনব ধারা—২	৫৬১
রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে	৫৭০
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মত	৫৮১
A Modern Approach to Islam	৫৮৫
Tear-jerkers for the Low Brow	৫৯৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানাবিধ

ঈশ্বর, মৃত্যু, মানুষ—ইত্যাদি ভাবনা—১ ৫৯৯
ঈশ্বর, মৃত্যু, মানুষ—ইত্যাদি ভাবনা—১ ৬০৯
দৃষ্টিকোণ আমি ভয় করিনে ৬১৭
নবজাতক সম্পাদিকা সমীপেষু ৬২৩

জীবন রেখা ৬২৯
রচনা-তালিকা ৬৩২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

আমাদের মায়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পর আমরা ওঁর সমস্ত প্রবন্ধ এবং আত্মজীবনীমূলক রচনা একত্রিত করে একটি সংকলন প্রকাশ করার চেষ্টা শুরু করি। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেন আমাদের অগ্রজতুল্য শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। সংকলনটির পরিকল্পনা ও মূল কাঠামো রচনার প্রথমদিকের সমস্ত কাজ স্বপনদা করেছেন। ২০১২ সালে উনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমরা দু'জন সাধ্যমতো চেষ্টা করে কাজটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করেছি। সংকলনটি গুছিয়ে নিতে যা ভাবা গিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশী সময় লেগেছে। পাঠকের হাতে বইটি তুলে দিতে পারার আনন্দে আজ আর দেরী হওয়ার সেই সব কারণ দর্শাতে মন চাইছে না।

মা অসুস্থ থাকাকালীন ডঃ কামাল হোসেন মায়ের আত্মজীবনীমূলক লেখাটির অধিকাংশ ওঁর কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কামালদার কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ও আমাদের 'পিসি' ডঃ আরতি সেন বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। ২০০৬ সালে আমরা পিসিকে হারিয়েছি।

ছোট-বড় নানা পত্র-পত্রিকায় মা লিখতেন। বাড়িতে যে লেখাগুলো পেয়েছি তা ছাড়াও আমাদের বন্ধু ও শুভার্থীরা তাঁদের সংগ্রহের থেকে মায়ের রচনা আমাদের দিয়েছেন। এ ব্যাপারে 'দেশ' পত্রিকার সাহায্যের কথা সবার আগে উল্লেখ করতে হয়। এছাড়া অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, শ্রীনিরঞ্জন হালদার ও পুরোগামী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশুভঙ্কর রায় উৎসাহের সঙ্গে আমাদের এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছেন। সংকলনটির প্রস্তুতিপর্বে আমাদের বান্ধবীদ্বয় সাহানা নাগচৌধুরী ও সোহিনী ঘোষের কাছ থেকে সময়োচিত নানা পরামর্শ পেয়েছি। এঁদের এবং স্থানাভাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না সেই বন্ধুদের জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

আমাদের ধারণা যে মায়ের সব লেখা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। এখনো আমরা ওঁর লেখার সন্ধান করে চলেছি। আমাদের আশা যে এই বই-এর পরবর্তী সংস্করণে আরো কিছু লেখা যুক্ত করতে পারবো। অন্যদিকে, কাছাকাছি বিষয়ে একাধিক রচনা যেখানে পেয়েছি, আমাদের বিবেচনায় যেটিকে ভাল বলে মনে হয়েছে আমরা সেটিকেই শুধু নির্বাচন করেছি। মায়ের লেখা আবার করে পড়তে গিয়ে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে অনেক রচনাই বিষয়-নির্বাচন ও মতামতের দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে এখনো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ

এই বইটির ওপর কাজ করতে গিয়ে আমাদের কয়েকজন বন্ধুলাভ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষ দত্তের নাম আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। ওঁর উৎসাহ ও সঠিক পথপ্রদর্শন ছাড়া আমাদের দু'জনের পক্ষে এই প্রায় অচেনা জগতে এতোখানি এগোনো সম্ভব হত না।

দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশুশেখর দে ও শ্রীশুভঙ্কর দে-র আন্তরিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল।

নমস্কারান্তে,

চম্পাকলি আইয়ুব ও পূষণ আইয়ুব

মুম্বাই, ২৫।১১।২০১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আরতি সেন

গৌরীর লেখা সংখ্যায় অনেক বেশি নয়। প্রবন্ধ, গল্প, অনুবাদ, আত্মজীবনীমূলক রচনা, স্মৃতিচারণ—সব মিলিয়ে হয়তো পঁচাত্তরের বেশি হবে না। অবশ্য একথা ঠিক যে সংখ্যায় যাই হোক না কেন, গৌরীর লেখিকা—পরিচয় বাঙালি পাঠকের কাছে অজ্ঞাত নয়, অবহেলিত তো নয়ই। যখনই তার কোনও লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তখনই তো বেশ বড়সংখ্যক বিশিষ্ট এক পাঠকগোষ্ঠীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, সমাদর অর্জন করেছে। কিন্তু তবু এও হয়তো বলা যায় যে ছোটবড়, ঘনিষ্ঠ বা স্বল্প পরিচিত, সব বয়সের নরনারীর মনে গৌরীর জন্য যে শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালবাসার আসনটি পাতা হয়ে গেছে স্থায়ীভাবে, তা তার লেখিকা পরিচয়ের জন্য ততটা নয়, যতটা তার স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের জন্য সামগ্রিকভাবে। সেইসঙ্গে তার তেজস্বী বিবেক, তার নিরলস সমাজকর্ম, তার নির্ভেজাল কর্তব্যবোধ ও দায়বদ্ধতা। অন্যদিকে তার নিপুণ গৃহিণীপনা আর উদার আতিথ্যের আকর্ষণও কম ছিল না আত্মপর নির্বিশেষে সকলের কাছে। আনন্দ দান করবার এবং নিজেও আনন্দিত হবার একটা স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল—যা দীর্ঘদিন অটুট ছিল তার মধ্যে, যতদিন না কঠিন রোগ তাকে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলেছিল। এই সব বহুগুণসমন্বিত গৌরীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ফলে ; ক্রমে মুখে মুখে ছড়িয়ে তা জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। সেই অনন্য সাধারণ ব্যক্তি পরিচয়ের আড়ালে গৌরীর লেখিকাসত্তা কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছে। অথচ যত্ন করে যাঁরা গৌরীর লেখা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে গৌরী লেখার মধ্যে যে মননশীলতা, বিশ্লেষণক্ষমতা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি, ভাষার সাবলীলতা, প্রসাদগুণ এবং সবার উপরে যে একটি স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা বর্তমান, তাতে বাংলা সাহিত্যের প্রোথিতযশা লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করার যোগ্যতা তার ছিল। হয়তো সামাজিক দায়বদ্ধতা আর সাংসারিক পরিস্থিতির দাবি তার কাছে এতটাই অগ্রাধিকার পেয়েছিল যে তার লেখক-সত্তাকে পিছু হটতে হয়েছে খানিকটা। অথচ লিখতে সে ভালোবাসত, যখন সময় এবং সুযোগ পেত তখনই লিখত। যখন কলম কাগজ নিয়ে পুরোদস্তুর লেখা হত না, তখনও কোনও না কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়ের চিন্তা তার মনকে ব্যাপৃত রাখত—লেখার প্রস্তুতি চলত মনে মনে। লিখতে গৌরী কতখানি ভালোবাসত তার পরিচয় পাওয়া যাবে তার ঘরে যত্রতত্র—অজস্র অসমাপ্ত লেখা বা লেখার প্রস্তুতির নিদর্শন রয়েছে তার ডায়েরীর পাতায়, তার হিসেবের খাতার অব্যবহৃত পৃষ্ঠায়, তার বন্ধুদের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিগুলির মধ্যে, সেইসব অসমাপ্ত অথবা টুকরো লেখার প্রত্যেকটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ কিম্বা গল্প হয়ে উঠতে পারতো তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু হয়তো সময় মেলেনি তার। যেগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে, সেগুলিকেও কোনও বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় পাঠাবার কথা মনে হয়নি তার, কারণ অতি প্রবল ছিল তার আত্মাভিমান বোধ। অনুরুদ্ধ হয়ে তবেই সে লেখা ছাপাতে পাঠিয়েছে। অবশ্য মুখ্যত প্রতিবাদধর্মী যে সব লেখা, দেশের কোনও তাৎক্ষণিক সমস্যা বা সঙ্কটের সঙ্গে যুক্ত, সে লেখাগুলি যে সংবাদপত্রে বা অন্য কোনও বহুল-প্রচারিত পত্রিকাতেই নিজে থেকে পাঠিয়েছে। তাই গৌরীর লেখা বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তার লেখার একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার চাহিদা অনেকদিনের দুই বাংলার সমঝদার পাঠকদের কাছে এটা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত।

এই গ্রন্থের কোনও দীর্ঘ ভূমিকা লেখার প্রয়োজন ছিল না, কারণ লেখাগুলি স্বপ্রকাশ। তবু আমি এটা লিখতে ইচ্ছুক হয়েছি দুটি কারণে, দুটিই ব্যক্তিগত কারণ। এর আগে শ্রীমতী মীরাতুন নাহার "কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু" নামে গৌরীকে নিয়ে যে স্মারক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন, তাতে আমাকেও লিখবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন ; নিজের অসুস্থতার জন্য তখন লিখে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, তাই মনের মধ্যে একটা দুঃখ জমা ছিল। তাই লেখবার আর একটা সুযোগ পেয়ে সেটা গ্রহণ করলাম। দ্বিতীয়ত, গৌরীর যে সব লেখা অনেকদিন আগে পড়েছিলাম, তার অনেকখানি ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ কিছু লেখা একেবারে পড়াই হয়নি। এই ভূমিকাটি লিখতে গিয়ে সবগুলি লেখা একসঙ্গে পড়ার সুযোগ পেলাম। প্রবন্ধ, গল্প, অনুবাদ, স্মৃতিচারণ, আত্মজীবনী সব মিলিয়ে গৌরীর লেখক-সত্তার একটি "অখণ্ড প্রতিমা" প্রত্যক্ষ করা হল, এটা আমার লাভ। এই "অখণ্ড প্রতিমার" নানা অবয়ব একটু খুঁটিয়ে দেখে দুচার কথা বলবার চেষ্টা করছি। গৌরীর লেখার একজন অনুরাগী পাঠক হিসেবে।

প্রথমে গৌরীর প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে কিছু কথা বলছি। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই মননশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠতা, বিষয় বিন্যাস যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি লক্ষণীয় ভাষার স্বচ্ছ সাবলীল গতি, আলোচনার ভঙ্গি আন্তরিক, সরস এবং প্রয়োজনে ঈষৎ ব্যঙ্গাশ্রিত, বক্তব্যের উপস্থাপনে মার্জিত এবং নিরহঙ্কার আত্মপ্রত্যয়। লেখকের সঙ্গে পাঠকের একটা মানসিক সংযোগ হয়ে যায় সহজেই। পাঠক লেখকের সঙ্গে একমত হন বা না হন, পড়তে পড়তে কিন্তু মনে মনে একটা কথোপকথন শুরু হয়ে যায়। গৌরীর মননশীলতা ও নান্দনিক চেতনা যথেষ্ট উচ্চমানের হলেও ও তার লেখার মধ্যে তা প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকলেও তাত্ত্বিকতা বা নান্দনিকতা তত প্রাধান্য পায় না। জীবনমুখী, কর্মমুখী এক বিবেকিতাই তার প্রবন্ধ লেখার প্রধান প্রেরণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কথায় আসি। যে মূল বিষয়গুলি গৌরীর লেখায় বারবার আসে তা হল রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য। যে সব সমস্যা এ কালের, এ দেশের মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত পর্যুদস্ত করছে সেইসব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তার সমাধান খোঁজাই হল তার প্রবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে নানা তত্ত্বের কথা আসে, কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও সমস্যাগুলিকে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সমাধানের কার্যক্রম খোঁজাতেই তার প্রধান উৎসাহ।

গৌরীর লেখা প্রবন্ধের মধ্যে সবচেয়ে মননশীল, যুক্তিনিষ্ঠ ও মানবিক আবেদনপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ সংসাহসিক রচনাগুলির বিষয় হল হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ঐক্য/অনৈক্য এবং জাতীয় সংহতি। আমাদের দেশের নানা সমস্যার মধ্যে সম্ভবত এটাই সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা, যার কোনও কূলকিনারা দেখতে না পেয়ে হতাশ নিরুদ্যম হয়ে যেতে হয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষকেই। গৌরীর ক্ষেত্রে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তাগিদটার একটা বাড়তি উৎস ছিল, কারণ সমস্যাটা তার ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল এতটাই যে এটা তার মনোজগতের অনেকখানি অংশ দখল করে থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক। সে নিজে ভালোবেসে এমন একজন মানুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়েছিল যিনি জন্মসূত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং যিনি বৌদ্ধিক আভিজাত্যে, হৃদয়বত্তায়, পাণ্ডিত্যে, সূক্ষ্ম রুচি ও রসবোধে, সৌজন্যে ও শিষ্টাচারে ছিলেন একজন অনন্য সাধারণ মানুষ এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিবাহ ছিল তার পিতৃকুলের, বিশেষ করে তার পিতার অননুমোদনে ; এবং স্বল্পসংখ্যক কিছু আত্মীয় বন্ধুকে বাদ দিলে সাধারণভাবে হিন্দুসমাজের অননুমোদনে। মুসলমান সম্প্রদায়েরও যে পূর্ণ অনুমোদন ছিল তা নয়, কারণ গৌরী বিয়ের জন্য ধর্মান্তরিত হয়নি, অবশ্য আইয়ুবের নিকট-আত্মীয়েরা গৌরীকে পরিবারের বধূ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন পরম সমাদরে কারণ তাঁরা ছিলেন খুব উদারপন্থী ও অসাম্প্রদায়িক। গৌরী কিন্তু একেবারেই সমাজবিমুখ ব্যক্তিগত জীবনযাপন করার মনোবৃত্তিসম্পন্ন মেয়ে ছিল না। তার সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল অতিমাত্রায় সজাগ। তার আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ—যাতে শুধুমাত্র দুটি ব্যক্তিমানুষের মিলনে থেমে না থাকে, বরং এক বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য ও মিলনের প্রতীক হয়ে ওঠে, এটা ছিল তার আকাঙ্ক্ষা, তার স্বপ্ন ; বলা যায় তার জীবনের ব্রত। বিয়ের পরবর্তী বহুবছর ধরে তার পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এটা গৌরীর পক্ষে খুব বেদনাদায়ক, বিশেষ করে তার পিতার সঙ্গে সম্পর্কের অবসান খুব মর্মান্তিক হয়েছিল তা ঘনিষ্ঠ দু-চারজন অনুভব করতে পারলেও তার নিজের আচরণে বা কথাবার্তায় সেই বেদনা প্রকাশ করার দুর্বলতা তার কখনও প্রকাশ পায়নি। অন্যদিকে আইয়ুবের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠছিল, যদিও আইয়ুব নিজে কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দিতেন না। আসলে গৌরী শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে মুসলমান সমাজটাকে কাছে থেকে দেখবার চেষ্টা করছিল, চিনতে চাইছিল। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজের গভীরে প্রবেশ করছিল। মুসলিম মানসকে বোঝবার চেষ্টা করছিল, শুধু আইয়ুবের আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ শিক্ষিত অভিজাত মুসলমানদের সঙ্গে নয় পার্কসার্কাস অঞ্চলের বস্তিবাসী অথবা পথবাসী এবং গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র মুসলমানদেরও, বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের জীবনযাত্রা, ভাবনাচিন্তা, ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ—এসব সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে অবহিত হচ্ছিল। পরে মৈত্রেয়ীদেবীর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার কাজ করতে গিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার আরও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে আসা বহু মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। ক্রমে সে পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ববাংলা—দুই দেশেরই মুসলমানদের কাছে শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং একদিকে তার নিজের ভেতরকার তাগিদ, এবং অন্যদিকে বাইরে থেকেও নানা যোগাযোগের ফলে মুসলমান সমাজের সে যতখানি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিল, তাঁদের সমস্যা, তাঁদের বেদনা, তাঁদের সন্দেহ ইঁত্যাদির মনস্তত্ত্ব বুঝতে পেরেছিল, তাতে এদেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূলটা কোথায় তা বোঝার চেষ্টা করা তার পক্ষে অনেকটা সম্ভব হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে করতে সম্প্রীতি স্থাপনের বাস্তব উপায়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করা সম্ভব হয়েছিল। গৌরীর এইসব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হয়েছে তার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বা বিরোধ-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে।

"হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রবন্ধটিতে এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে গৌরী বর্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করেছে। গৌরী দেখিয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) সাম্প্রদায়িক বিরোধ বারবার চাগিয়ে উঠলেও ভাষা-আন্দোলনের তীব্রতা সাম্প্রদায়িক বিরোধের তীব্রতাকে কিছুটা প্রশমিত করতে পেরেছিল। সে তুলনায় ভারতের অবস্থাটা খুব জটিল এখানে সংখ্যায় মুসলমানরা অনেক বেশি ও এখানে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এমনকি নেতাদের ধারণাও খুব অস্পষ্ট। সেই অবস্থায় ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং বারবার ধরে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নৃশংসভাবে ফেটে পড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গৌরী সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে ীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটি আলোচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মুসলমান ও খ্রিস্টানরা হল অন্য ধর্ম সম্পর্কে অসহিষ্ণু, আর হিন্দুদের হল অন্য ধর্মের সঙ্গে অসহযোগ। ধর্মমতে মুসলমানদের বাধা প্রবল আর আচারে হিন্দুর বাধা প্রবল। তাই ধর্মের দিক থেকে দেখলে এই দুই সম্প্রদায়ের মেলবার আশা কম। কিন্তু মেলবার পথ হল মনের পরিবর্তন। যুগের পরিবর্তন। তাঁর বিশ্বাস যে ধর্মে না মিললেও হিন্দু মুসলমান জনবন্ধনে মিলবে, মহাজাতি গঠনের দিকেই আমাদের মহৎ স্বার্থ অনবরত কাজ করছে।

এইখানেই গৌরীর সংশয়, গৌরীর প্রশ্ন, হতাশাও। মহৎ স্বার্থের কথা মনে রেখে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের কার্যকলাপে তেমন তো প্রমাণিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, নানা ধর্ম ভারতবর্ষের মাটিতে একটা সামঞ্জস্যের পথ খুঁজে পাবে। কবীর নানক প্রভৃতি ভক্তি আন্দোলনের নেতারা এমন কিছু সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন বটে, তবু রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাসের সপক্ষে গৌরী যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পায়নি হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে জনগণের জীবনে হিংসার তাণ্ডব ডেকে আনছে। তাই গভীরভাবে হতাশাগ্রস্ত মন নিয়ে গৌরী তবুও মানুষের শুভবুদ্ধি ও শুভ ইচ্ছার উপর আস্থা রাখার কথা বলেছে এই প্রবন্ধে।

"ঠাকুর পরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি" (নবজাতক, ১৩৭৩) প্রবন্ধে গৌরী দেখিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের চিন্তা এবং সমন্বয়ধর্মিতা, এর পিছনে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের অবদান রয়েছে অনেকটা। গৌরীর ভাষায় "ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা যেমন তাদের ব্রাহ্মণত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, তেমনি "পীর আলি" আখ্যা মুক্তি দিয়েছিল জীর্ণ সঙ্কীর্ণ লোকাচার থেকে।" গৌরী দেখিয়েছে এ পরিবারের পোষাকে আশাকে, আচারব্যবহারে, শিল্পবোধে, মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরভক্তির যে প্রকৃতি, গৌরীর মতে তাতে উপনিষদের চেয়েও সুফীবাদের প্রভাবই বেশি গভীর। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলিত প্রভাব ঠাকুরবাড়িতে যে পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল, সেখানে বড় হয়ে ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি প্রতিভাধর সন্তান তাঁদের চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে দেশকে এক মহাজাতীয়তায় পৌঁছে দেবার পথ নির্দেশ করেছিলেন— এমনই ধারণা প্রকাশ করেছে গৌরী এ প্রবন্ধে।

গৌরীর মতে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক মেলামেশাটা খুব জরুরী এই যোগাযোগের অভাবেই ভুল বোঝাবুঝি পরস্পরকে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, ঘৃণা ইত্যাদি বিরোধের কারণগুলি জমতে থাকে, "দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগাযোগ" নামে প্রবন্ধে গৌরী খুব দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করছে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের পরে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আপনা-আপনিই চলে যাবে এমন ধারণার সঙ্গে সে আদৌ একমত নয়। গৌরীর বক্তব্য এই যে ধর্মবোধের কথা বাদ দিলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার আচরণের পার্থক্য, আহার-বিহারের পার্থক্য এবং তজ্জনিত ঘৃণা, অবিশ্বাস এইসব এতটাই প্রবল যে তা একটা স্থায়ী অসামঞ্জস্যের কারণ হয়ে আছে। এগুলি দূর করবার জন্য প্রাকটিক্যাল উপায় ভাবা দরকার।

গৌরী নিজে ধর্মবিশ্বাসী ছিল না। খুব সুস্পষ্টভাবেই সে নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করেছে। হিন্দুধর্ম বা মুসলমানধর্ম কোনোটাতেই তার বিশেষ কোনও আকর্ষণ ছিল এমন নয়। কিন্তু স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও সহানুভূতির দ্বারা সে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের মনস্তত্ত্বটা বোঝবার চেষ্টা করত, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ব। সেইজন্য রুশদী তাঁর Satanic verses বইটিতে মুসলমান সমাজের স্পর্শকাতর স্থানে যে আঘাত দিয়েছেন তাতে গৌরী বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। এই নয় যে মুসলমানদের মধ্যে যে গোঁড়ামি বা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা দেখা যায় তা সে সমর্থন করে। এও নয় যে লেখকের স্বাধীনতায় সে বিশ্বাসী নয়। যুক্তি দিয়ে ধর্মবিশ্বাসকে যাচাই করে নেওয়াটা সে সঙ্গত বলে মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে। কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ যখন যুক্তির জায়গা জুড়ে বসে তখনই তার মনে জাগে তীব্র প্রতিবাদ। "রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি" প্রবন্ধটিতে সেই প্রতিবাদের তীব্র স্বরই আমরা শুনতে পাই। তাছাড়া এ প্রবন্ধটিতে গৌরী আরও দেখিয়েছে যে কীভাবে রুশদীর বই এবং খোমেইনির ফতোয়া আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলেছে। ইসলামের মাহাত্ম্য গৌরীর কাছে স্বীকৃত ও শ্রদ্ধার্হ ; সেই সঙ্গে একদেশদর্শী গোঁড়ামি আর আপোষহীন নিষ্ঠুরতাপূর্ণ মৌলবাদের ভয়াবহতা সম্বন্ধে যে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সেই শ্রদ্ধা এবং উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে এই প্রবন্ধের কয়েকটি বাক্যের মধ্যে" সলমন রুশদীর যেদিন ঘাতকের হাতে মৃত্যু হবে সেইদিনটা মুসলমানের গর্ব করার দিন নয়, লজ্জা পাবার দিন হবে...কোনও মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়, শক্তি থাকে উদার মানবিকতায়। হজরৎ মহম্মদের জ্যোতি এবং ইস্লামের মাহাত্ম্য আপন শক্তিতেই চিরস্থায়ী হবে। এমন দুর্দিন কি সত্যিই এসেছে যে ঈশ্বরপ্রেরিত কীর্তিকে রক্ষা করার জন্য ভাড়াটে ঘাতকের প্রয়োজন হবে?"

"কাবিলনামাহ্ থেকে বসুধারা" প্রবন্ধটিতেও (চতুরঙ্গ, ১৯৮৪) সমস্যাটা ভারী চিত্তাকর্ষক ও সরসভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে গৌরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আল্ মাহ্মুদের (বাংলাদেশের কবি) এক বন্ধুত্বপূর্ণ বিতর্ক থেকে এই প্রবন্ধের জন্ম। শিক্ষিত একজন হিন্দু "কাবিল্নামাহ্" নামে মুসলমান সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির অর্থ জানেন না, এই যেমন একজন মুসলমানের ক্ষোভ, তেমনি "বসুধারা" নামে হিন্দুসমাজের এক অতি পরিচিত মাঙ্গলিক শব্দের সঙ্গেও একজন শিক্ষিত মুসলমান পরিচিত নন, এটাও ঘটনা। পরস্পরের প্রতিবেশী দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি এবং সদাব্যবহৃত ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে যে অপরিচয়ের দূরত্ব, তা থেকেই জন্মায় ক্ষোভ, অভিমান, ঈর্ষা, ঘৃণা, অবজ্ঞা যা শেষপর্যন্ত একটা তীব্র অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষে পৌঁছে দেবার প্রবণতায় পৌঁছে দেয়, এটাই গৌরীর মূল বক্তব্য।

মুস্তাফা নূরউল ইসলামের "সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত" নামে গ্রন্থ থেকে ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি উদ্ধৃতি দিয়ে গৌরী অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম মানসের ক্রমপরিণতির ধারাটি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। সে দেখিয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমানের মনকে বিষয়গুলি অধিকার করেছিল, তা হল (১) একটি বিশ্বজনীন ধর্মের গৌরব, (২) সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বেদনা (৩) মাতৃভাষার প্রতি সহজাত মমতা এবং (৪) আঞ্চলিক সংস্কৃতির মাধ্যাকর্ষণ। গৌরীর ভাষায় এই চতুষ্কোণ টানাপোড়েনে সেদিনের বাঙালি মুসলমানকে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল। তারমধ্যে রাজনীতি এসে প্রবেশ করে এই সংস্কৃতিক সমস্যার সাধারণ সমাধানকেও জটিল করে তুলেছিল।

হিন্দু আর মুসলমানের চর্চিত বাংলাভাষা যে দুই ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পর, তার কারণ হিসেবে বাংলাদেশের অধ্যাপক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আনিসুজ্জমান দেখিয়েছে যে জাতীয়তাবাদ আর হিন্দুজাগরণ—এ দুটো সমার্থক হয়ে ওঠাটাই ছিল এর কারণ। গৌরীর মতে এটা 'আংশিক কারণ' হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ কারণ নয়। গৌরীর মতে সংখ্যাগুরু হিন্দুসম্প্রদায়ের অধিকাংশের তরফ থেকে যে দূরত্ববোধ, অবজ্ঞা, অনাদর ও বঞ্চনা সংখ্যালঘু মুসলিমদের ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে এবং যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ হিন্দু আদৌ আত্মানুসন্ধানী নন বা হতেও চান না, গৌরী তা খুব ভালোভাবেই অনুভব করে ও খুব স্পষ্টভাবেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেইসঙ্গে কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা যে গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে কতটা প্রবল, সাধারণভাবে গোটা মুসলমান সমাজকে তা কতটা প্রভাবিত করে রাখে আর সামাজিক অগ্রগতির ক্ষতি করে, সেটাও খুব রূঢ়ভাবে তুলে ধরতে তার কোন ইতস্ততভাব নেই। শাহ্‌বানুর মামলা প্রসঙ্গে লেখা "অধিকার রক্ষা না অধিকার হরণ" নামে প্রবন্ধে এবং "তবে কি গণতন্ত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা অসম্ভব" নামে প্রবন্ধে গৌরী রক্ষণশীল মুসলমানদের ওই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াকে চরম ধিক্কার জানিয়েছে। অসহায় মুসলমান মহিলাদের তালাক পাওয়ার পরে স্বামীর কাছে খোরপোষ পাওয়ার যে ন্যায়সংগত মানবিক অধিকার সেটাও যখন সারা ভারত জুড়ে একটা সাম্প্রদায়িক বিতর্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা ভয়াবহ অবশ্যই। এ প্রসঙ্গে গৌরী খোলাখুলি মন্তব্য করেছে, "আমার ধর্ম বা আমার সমাজের সবই ভালো, অপরের কাছ থেকে শিখবার আমাদের কিছুই নেই এমন একটা অহঙ্কার এবং গোঁড়ামি মুসলমান সমাজের অনেকের মনেই বদ্ধমূল, ফলে তাঁদের কাছে সমালোচনা বা সংস্কারের প্রয়াস মাত্রই সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধের যোগ্য।" শাস্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থেকে কীভাবে সহানুভূতির সঙ্গে গোটা সমাজকে বার করে নিয়ে আসা যায় সেটাই সমস্যা। অবশ্য গৌরীর তবুও আশা যে মুসলমান সমাজের মধ্যে থেকেই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠবে। "প্রগতি কি ও কেন" প্রবন্ধে আবারও শাহবানুর মামলা প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া যে পরিমাণে তীব্র হয়ে উঠেছিল তার উল্লেখ করে গৌরী অভিমত প্রকাশ করেছে যে "ধর্মের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে মুসলমানদের যত গর্ববোধই থাকুক না কেন, কোরাণ শরিফের মূল শিক্ষা হতে তাঁরা যে কতদূর সরে এসেছেন সে বিষয়ে হুঁসই নেই তাঁদের।"

কিন্তু এমন নয় যে গৌরী শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতা ও অযৌক্তিকতার সমালোচনা করছে। সাধারণভাবে হিন্দু সমাজ ও বিশেষভাবে হিন্দু মৌলবাদীদের সমালোচনাতেও তার কলম সমান তীব্র, শাণিত। রুশদী সম্বন্ধে প্রবন্ধটির এক জায়গায় বলা হচ্ছে, শাহবাণুর লাঞ্ছনায় শরীয়ত পন্থীদের বহু ধিক্কার দিয়েছিলাম। রূপ কানোয়ার মূক করে দিয়ে গেছে আমাকে। সতীপ্রথা সমর্থক শঙ্করাচার্যদের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন কজন বুদ্ধিজীবী?" খুব স্পষ্ট করেই গৌরী বলেছে যে গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা, স্পর্শকাতরতা ইত্যাদির ব্যাপ্তি সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কম নয়। নিজেদের সমাজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আত্মানুসন্ধানের অভাব দুই সম্প্রদায়েরই লক্ষণ।

হিন্দুমুসলমান প্রসঙ্গে গৌরী সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য। জন্মসূত্রে সে নিজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যে লালিত এবং বিবাহসূত্রে মুসলমান সমাজের সঙ্গেও তার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছিল। তাই দুই সমাজেরই যে কল্যাণকামী, দুই সমাজেরই উর্দ্ধে তার অবস্থিতি এবং ভালোবাসার জোরে দুই সমাজেরই গঠনমূলক সমালোচনার যথার্থ অধিকারী। তবু যেহেতু সবদেশেই সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কথা তুলে ধরবার মানুষ কম, তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তার সহানুভূতি একটু বেশি থাকবে এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক—উন্নততর সভ্যতার, উদার মানবিকতার এটা একটা প্রধান লক্ষণ। তারই পরিচয় পাই গৌরীর লেখায়।

এবারে গৌরীর রাজনৈতিক লেখাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। প্রথমেই বলা উচিত যে নানা রাজনৈতিক তত্ত্ব ও মতবাদ সম্বন্ধে গৌরীর যথেষ্ট স্বচ্ছ ধারণা থাকলেও রাজনীতির তত্ত্বগত আলোচনায় তার ততটা উৎসাহ ছিল না। তার সামনে ছিল বহুবিধ সমস্যায় কণ্টকিত আমাদের এই স্বদেশ এবং তার বৈশ্বিক পটভূমি। বিশেষ কোন দলীয় মতবাদ তার ছিল না, যদিও অল্পবয়সে কিছুকালের জন্য সে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। পরে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই তার আর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না বা তার লেখার মধ্যেও তাই কোনও পক্ষপাতমূলক ভাবনা কম। গৌরীর লেখায় আমরা যা দেখতে পাই তা হল একজন যুক্তিবাদী, দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী, সৎ নাগরিকের নিরপেক্ষ ও নির্ভীকভাবে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ, মতপ্রকাশ ও সম্ভাব্য পথনির্দেশ। গৌরী ছিল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, একনায়কতন্ত্রের এবং হিংসাশ্রয়ী রাজনীতির বিরোধী। সংসদীয় গণতন্ত্রকে সে ভারতবর্ষের মত একটা বিরাট, বৈচিত্র্যময় বহু ভাষাভাষী, বহুধর্মের, বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতির দেশের পক্ষে একটা মন্দের ভালো রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে মনে করত। তবে সে জানত যে এই ব্যবস্থারও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং আরও ভালো কিছুর সন্ধান আমাদের করে যেতেই হবে। "প্রভাতেই অন্ধকার" নামে প্রবন্ধটিতে গৌরী ভারতীয় গণতন্ত্রের সফলতা ও বিফলতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন, কিছু তর্ক তুলেছে এবং এই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রবণতা নিয়ে খানিকটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। ভারত ও চীন—এই দুটি প্রকাণ্ড দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে গৌরী একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত স্বচ্ছ চিন্তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে বলছে, "দুঃখ এই যে আমরা ভুলে যাই, (১) কোথাও কোথাও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব না করেই সমৃদ্ধি শৃঙ্খলা এসেছে (২) কোথাও বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেই সমৃদ্ধি শৃঙ্খলা লাভ হয়েছে (৩) কোথাও আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেও সমৃদ্ধি শৃঙ্খলা আসেনি। সুতরাং সমৃদ্ধি শৃঙ্খলার সত্যিকারের অপরিহার্য শর্তটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে, এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতাই করা উচিত—এটাই গৌরীর অভিমত।

বিচ্ছিন্নতাবাদ যেভাবে আমাদের দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দিকে দিকে নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটা জাতীয় সংহতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক সঙ্কেত। আসামের আন্দোলনের পর থেকে এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতে শুরু করেছে। যে আঞ্চলিক সত্তা এবং আঞ্চলিক স্বার্থের উপরেও একটা ভারতীয় সত্তা আমাদের আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কি না। ভারতের বহু অঞ্চলের নাগরিক যে মনে করছেন যে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে তাঁদের আঞ্চলিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত, এর গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। চীন বা খ্রিস্টান মিশনারী বা সি. আই. এর প্ররোচনা বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না বা সমস্যার সমাধানও করা যাবে না। গৌরী বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক নয়। দেশের কোনও কোনও অঞ্চলের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে হিংসাত্মক আচরণ করলে তার প্রতিবিধান রাষ্ট্রকে খুব কঠোর হাতেই করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান এবং নিরশন করাটাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির কাছে শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সাম্য এনে দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা না চালালে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হতে বাধ্য।

"জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ" নামে প্রবন্ধটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান লেখা। আমাদের দেশে একদিকে জাতীয়তাবাদ ক্রমশ জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে ওঠার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে এবং অন্যদিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নামে পঞ্চায়েত নামে নতুন যন্ত্রটা কেন্দ্রীয়তাকে গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত করতে চলেছে। এমন একটা সময়ে জাতীয়তাবাদকে বিপজ্জনক বলে মনে করাটা অযৌক্তিক নয়। এমনই একটা পরিপ্রেক্ষিতে একসময়ে প্রয়াত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন "জনমনে কসমোপলিট্যান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ এবং প্রসার ক্রমাগত না ঘটাতে পারলে সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবই নয়"। গৌরকিশোরের প্রবন্ধটি গৌরীকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করলেও তার মনে এমন একটা প্রশ্ন জেগেছিল যে শিক্ষায় এবং সমাজচেতনায় অনগ্রসর আমাদের এই দেশে জঙ্গী জাতীয়তাবাদ ঠেকানোর জন্য বিশ্বমানবিকতার চর্চা কতটা সম্ভব?—এমন একটা দেশ যেখানে দেশ কাকে বলে, কী তার ভৌগোলিক চতুঃসীমা, নিজের গ্রাম বা শহর ছড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত তা বিস্তৃত, কারাই বা স্বদেশী কারাই বা বিদেশী এ সম্বন্ধে সামান্যতম বোধ অধিকাংশ মানুষের নেই? গৌরীর মতে উগ্র জাতীয়তাবাদ ঠেকানোর জন্য একটা নম্র জাতীয়তাবোধ অথবা স্বদেশপ্রেম বরং জাগানোর চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বপ্রেম একটা বিমূর্ত ধারণা ; স্বদেশপ্রেমকে ক্রমসম্প্রসারিত করেই সে ধারণায় পৌঁছনো যায়। এ ধরনের জাতীয়তাবোধ থেকেই অনৈক্যের বৈচিত্র্য বজায় রেখেও সংহতি ও ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস তৈরী হয়।

"বিধান সভা নির্বাচন ও আমি—আমার কাছে আর কোনও বিকল্প নেই" নামে প্রবন্ধটি থেকে বোঝা যায় গৌরীর রাজনৈতিক বিচার কত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। কেউ তার সঙ্গে ভিন্নমত হতে পারেন, কিন্তু তার নিজের অবস্থানটা সে নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করেছে। প্রবন্ধ লেখার সময়টা ১৯৭৭ সাল, দিল্লিতে জনতারাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের মুখোমুখি। একজন ভোটার হিসেবে গৌরীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল সংবিধানের ৪২তম ধারা সংশোধন, যার সাহায্যে বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস ও প্রধানমন্ত্রীকে আইনের উর্দ্ধে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। গৌরীর ধারণা ছিল যে রাজ্যগুলিতেও যদি জনতাদল ক্ষমতায় আসেন তবেই ৪২তম ধারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নাকচ করতে তাঁরা সক্ষম হবেন। তাই জনতাদলকে ভোট দেওয়া ছাড়া তার কাছে অন্য বিকল্প ছিল না। জনতা পার্টি নয়, তার আনুগত্য ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার কাছে। "জনতার বিশমাস" নামে প্রবন্ধটি থেকেই সেটা বোঝা যাবে।

রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা ছেড়ে এবারে গৌরীর নারীবিষয়ক ভাবনার আলোচনায় আসছি। গৌরীর নারীবিষয়ক ভাবনাকে তথাকথিত "নারীবাদের" আওতায় ফেলা যাবে না হয়তো। অন্তত নারীবাদের গতি পরিণতির সবটাই সমর্থনযোগ্য নয় তার কাছে। কিন্তু এযুগের একজন শিক্ষিত, সমাজসচেতন উদারনৈতিক ব্যক্তি এবং নারী হিসেবেও সমাজে মেয়েদের অবস্থান ও সমস্যা বিষয়ে তার চিন্তা সদাজাগ্রত। এবং এ প্রসঙ্গে নারীবাদী আন্দোলনকে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য আন্দোলন বলে মনে করে। গৌরীর চিন্তায় পুরুষবিদ্বেষী আবেগ নেই, আছে খোলা চোখে পরিস্থিতির বিচার। আবহমান কাল থেকে প্রচলিত এবং স্বীকৃত নানা শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধান যে নানাভাবে মেয়েদের খর্ব ও বঞ্চিত করে রেখেছে তাতে যেমন তার সন্দেহ নেই, তেমনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে একথাও শতমুখে স্বীকার করবে যে আমাদের দেশে আধুনিক যুগে নারী শিক্ষা ও নারীমুক্তির উদ্গাতা যুগস্রষ্টা কয়েকজন উদারচেতা মহানুভব পুরুষই। বিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মপ্রকাশমূলক নানা কর্ম আত্মনিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে তার একটি বিশ্লেষণী মূল্যায়ন রয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে। গৌরী দেখিয়েছে যে প্রথম যুগে যদিও নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত চিত্তের উন্মেষ এবং সমাজসেবা, পরে কিন্তু ক্রমেই ব্যাপকভাবে মেয়েরা অর্থকরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে এবং এর ফলে সংসারে মেয়েদের নতুন মর্যাদা এসেছে। মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনে এবং অন্যবিধ অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে এদেশের কয়েকজন উদারমনস্ক মহানুভব পুরুষের প্রয়াস ও অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে গৌরী বলছে যে সম্ভবত এই কারণেই এদেশে নারীমুক্তি আন্দোলন কখনওই পাশ্চাত্যদেশের মতো তীব্র আকার ধারণ করেনি, বরং অনেক অধিকার মেয়েরা বিনা আয়াসেই পেয়ে গেছে। এদেশের সংবিধান এবং আইন এ ব্যাপারে সামনের দিকেই হাঁটছে। তবে এসব অধিকার সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। অবশ্য তা সত্ত্বেও গৌরী জানে যে আইন এবং সংবিধান দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না যদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই আইনের শর্তগুলি প্রতিপালনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত না হয়। তাই প্রগতিশীল আইন চালু হলেও আজও এদেশের অধিকাংশ মেয়ে বিড়ম্বিত ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে রয়েছে। তবু একথাও সত্য যে "সনাতন ঐতিহ্যে ও আধুনিক শিক্ষায় গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা শক্ত মাটি এবং সমসাময়িক যুগের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও নিজেদের স্থৈর্য এবং মহিমা একেবারে হারাননি।" অবশ্য "মেয়েরা আজ কতটা অবলা" নামে অন্য একটি প্রবন্ধে গৌরীর বিশ্লেষণী চোখে এটাও ধরা পড়েছে যে বাইরের দিক থেকে যেসব মেয়েরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরও কিন্তু মনের জড়তা, নির্ভরতা, এসব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে গিয়েছে অনেকখানি—অর্থাৎ আধুনিক মেয়ের মনের মধ্যে একটা আত্মখণ্ডন আছে। কখনও কখনও মেয়েরা একটা অবলা কম্প্লেক্সে ভোগে আর মনগড়া দুঃখবোধে নিজেদের বঞ্চিত বা শাসিত মনে করে। "সেবা" নামে মেয়েদের যে একটা কল্যাণকর অস্ত্রবিদ্যা জানা ছিল। অপব্যবহারে শীঘ্রই তাতে মরচে পড়ে যাবে এমন একটা আশঙ্কা দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ হয়েছে।

"অলোকা" নামে ছোট্ট রচনাটি এক গ্রাম্য মেয়ের সংগ্রামের সত্য কাহিনী। অলোকা এবং তার সহকর্মীরা পিপ্‌ল্‌স্‌ ইন্‌স্‌টিট্যুট ফর রুর‍্যাল এ্যাকশন নামে এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কী প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়ে বঞ্চিত নির্যাতিত মেয়েদের জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তারই উল্লেখ আছে এই লেখায়। অলোকা আমাদের অনেকেরই চেনা, তার সংগ্রাম গোটা বাংলার নারী সমাজের সংগ্রাম। সেইভাবেই গৌরী এই সত্যকাহিনীটিকে উপস্থাপিত করেছে।

তেমনি "প্রীতি ও তার অপ্রীতিকর জীবন" ও একটি সত্য ঘটনামূলক লেখা। সেও আরেকরকম সংগ্রামের কাহিনী। "জোহরা বিবির বড় মেয়ে" আর এক রচনা যা গল্পের স্টাইলে লেখা আর এক সত্য ঘটনা, মেয়েদের জীবনের এক অতি পরিচিত সমস্যা আর তার করুণ পরিণতি। অবাঞ্ছিত এবং বহুসন্তানে জর্জরিত এক মাতৃত্ব এবং এক নীরব নিরুপায় আত্মসমর্পণ। "তপারানীর জন্মান্তর" ও এক সত্য ঘটনা—একটি অনাথ শিশুকন্যা কেমন করে বিদেশী পিতামাতার কাছে আশ্রয় পেলো, ঘর পেলো, শিক্ষা পেলো আর তার অতীত ইতিহাস ভুলে গিয়ে একটা নতুন জন্মে পৌঁছে গেল তারই বিবরণ। আবার তারই পাশাপাশি "এরা কি ঘর পাবে না কখনও" তে গৌরী আর একটি মেয়ের করুণ কাহিনী লিখেছে—স্বামী-পরিত্যক্তা নিরাশ্রয় হতদরিদ্র সেই মেয়েটি তার সদ্যোজাত সন্তানকে নিরুপায় হয়ে তুলে দিয়েছিল গৌরীর হাতে—গৌরী কোনও পালক পিতামাতা খুঁজে তার হাতে শিশুটিকে তুলে দিতে পারবে কোনওদিন সেই আশায়। সেই নিরুপায় মেয়েটি কুন্তীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে গৌরীকে। আমাদের দেশে কত নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানের জন্য হাহাকার করে, কিন্তু মায়ের কোলে শিশু পৌঁছয় না। জাত, ধর্ম, গোত্র, গাত্রবর্ণ, বংশপরিচয় এইসব বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এইসব প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্যভিত্তিক কাহিনীগুলি উপস্থাপিত করে গৌরী গ্রামাঞ্চলের বা শহরে বস্তী অঞ্চলের দরিদ্র অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মেয়েদের সমস্যাগুলির নানা মাত্রা তুলে ধরেছে। বোঝা যায় ভালোভাবেই যে এগুলির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। সে খুব কাছে থেকে দেখেছে যে একদিকে যেমন তাদের অনেকেই নিজেদের শোচনীয় অবস্থাকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে মেনে নিয়েছে, অন্যদিকে এও দেখা যাচ্ছে যে এমন কি পশ্চাৎপদ গ্রামাঞ্চলেও অন্য এক মনোভাব একটু একটু করে মাথা চাড়া দিচ্ছে মেয়েদের মনে—ভাগ্যের সঙ্গে, পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করবার মনোভাব, রুখে দাঁড়াবার সংকল্প ও শক্তি। এটাই গৌরীর কাছে আশার পা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"শিক্ষা" বিষয়ে গৌরীর বেশ কয়েকটি লেখা রয়েছে। গৌরী ছিল শিক্ষাতত্ত্বের ছাত্রী ও অধ্যাপিকা—শিক্ষার তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা তো তার নিজস্ব ক্ষেত্র। কিন্তু এক্ষেত্রে তার লেখাগুলি মোটেই তত্ত্বপ্রধান নয় ; বর্তমান কালের নানা প্রকার শিক্ষা সমস্যা ও সরকারি শিক্ষানীতিগুলিই প্রাধান্য লাভ করেছে তার লেখায়। অবশ্য "রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃঙ্খলা" আর একটু বেশি মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা। অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একসময় এক দুঃখজনক পত্রবিনিময় হয়েছিল—শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ওই পত্রালাপের কথা সবারই জানা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় আনন্দের প্রাধান্য ; গভীর অধ্যয়নের জন্য যে কঠোর সাধনা এবং শৃঙ্খলাবোধ প্রয়োজন, তার চর্চার কোনও আয়োজন বা গুরুত্ব নেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায়। এটাই ছিল যদুনাথ সরকারের বক্তব্য। যদুনাথ সরকারের পত্র রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। কারণ যদুনাথ কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াই শুধু জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। আসলে শুধু যদুনাথ নয়, শান্তিনিকেতন সম্পর্কে তৎকালীন অনেক শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির ওটাই অভিমত ছিল, এখনও আছে। প্রসঙ্গটা খুব মৌলিক এবং বিতর্কিত। রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলাবোধকে কিছুমাত্র কম গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর নিজের জীবনসাধনায় যে কতটা নিয়মশৃঙ্খলা ছিল তাও সকলেই জানে। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি জানতেন যে সত্যিকারের শৃঙ্খলা নিজের তাগিদে ভিতর থেকে আসে, সেই ভেতরের তাগিদটাই জাগিয়ে তুলতে হয়। নানাদেশের আধুনিক শিক্ষাচিন্তকদের সঙ্গে কথা বলে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বচক্ষে দেখে তিনি এই ধারণারই সমর্থন পেয়েছিলেন। যদুনাথ রবীন্দ্রনাথের এই বিতর্কে গৌরী রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে শান্তিনিকেতনে শৃঙ্খলাবোধ, শিক্ষার পদ্ধতির যাথার্থ্যকে যেভাবে দৃঢ় যুক্তির ওপর এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে তা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য।

Education and social change নামে ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটিতে সমাজ বদলের উপর শিক্ষার এবং শিক্ষার উপর সমাজবদলের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে গৌরী এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার পাঠক্রম, পদ্ধতি এবং ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কে—এসবের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছে। পশ্চিম বাংলায় উচ্চশিক্ষার চাহিদা খুব বেশীরকম বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অনেকেই উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার ফলে সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌পদ একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে—এটা গৌরী লক্ষ করেছে। নিম্নমানের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রদের অবাধ প্রবেশ ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাছাড়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে দেশে যে দ্রুত পরিবর্তন অহরহ ঘটে চলেছে, তারও প্রতিফলন ঘটছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইসব পরিবর্তনের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং এর ফলে জাত বাস্তব সমস্যাগুলির মোকাবিলা করবার কোনও শিক্ষা বা বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বা সরকারি শিক্ষানীতিতে নেই—এটাই গৌরীর বক্তব্য এ প্রবন্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"জাতীয় বিদ্যালয়" নামে প্রবন্ধে গৌরী লক্ষ করছে যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গান্ধীজির সেবাগ্রাম বা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষা নিয়ে যে সব আশ্চর্যরকমের অভিনব শিক্ষাচিন্তা এবং শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা দেশে আলোড়ন তুলেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থানুকুল্য আসা সত্ত্বেও তেমন কোনও আয়োজন তো গড়ে উঠলই না, বরং ওই শিক্ষাধারাগুলিও ক্রমে প্রাণহীন হয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। গৌরীর বক্তব্য এই যে শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু সরকারী নীতির উপর নির্ভর করলেই চলবে না, এতে জনসাধারণেরও সক্রিয় অংশ থাকা দরকার, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার চালাবার অধিকার থাকা চাই গণতান্ত্রিক দেশে।

"ইংরেজির নির্বাসন নয়", "শিক্ষা নাকি শিক্ষার মূলোচ্ছেদ", "সৎভাবে পড়ালে এই পাঠ্যসূচিতেও কাজ হত" ইত্যাদি নানা লেখায় প্রধানত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে গৌরীর নিজস্ব মতামতও পরিস্ফুট হয়েছে। মোট কথা, দেশের শিক্ষানীতি নিয়ে যখনই কোনও বিতর্ক হয়েছে, বিশেষ করে শিক্ষায় ভাষানীতি নিয়ে, তখনই গৌরীর লেখনী সচল হয়েছে, আর নিজের সুস্পষ্ট মতামত সে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছে।

কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট এবং সুচিন্তিত গ্রন্থ-সমালোচনা আমরা গৌরীর কাছে পেয়েছি। কোনও পেশাদারী সমালোচনা নয়। একজন মনোযোগী এবং সমঝদার পাঠকের চিন্তাশীল এবং সৎ সমালোচনা। এরমধ্যে "রবীন্দ্র গবেষণার একটি অভিনব ধারা" এবং রবীন্দ্র গবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনায় জবাবে নামে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত সমালোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নানা কারণে। কেতকী কুশারী ডাইসনের "রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" এবং "In your Blossoming Flower Garden" নামে বই দুটির সমালোচনায় উপরোক্ত প্রবন্ধ দুটি লেখা। কেতকী কবি, সুপণ্ডিত এবং সু-গবেষিকা। গবেষণার কাজে তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রম ও সততার কথা সুবিদিত। সেটা গৌরীর কাছেও স্বীকৃত। ইংরেজি বইটির খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও গৌরী করেছে। বাংলা বইটি অর্থাৎ—রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে নামে বইটিতে গবেষণার যে ধারার পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে কেতকী, সেটা সম্বন্ধে খুব উচ্ছ্বসিত না হলেও মোটামাটি স্বাগত জানিয়েছে গৌরী। তার অপছন্দ এবং আপত্তি অন্যখানে। রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পো এলমহার্স্টের ত্রয়ী সম্পর্কের যে প্রকৃতি, কোনওমতেই ওই গ্রন্থের উপন্যাস-অংশটির, অর্থাৎ অশনি অনামিকার সম্পর্কের কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপন্যাসটি গবেষণাকর্মের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে যে সাহিত্যকর্মটি তৈরি হয়েছে, তাতে সাহিত্য বা গবেষণা কোনটিরই উৎকর্ষ বাড়েনি, এই হল গৌরীর অভিমত। গৌরীর দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সাহিত্য গবেষকদের কাছে বিতর্কিত বলে মনে হবে, তা হল লেখকের সাহিত্যবিচারের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর জীবনীরচনার উদ্দেশ্যে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করা কতখানি সংগত এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি এবং যে সেন্টিমেন্ট গৌরী প্রকাশ করেছে এই লেখায়, তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, ব্যক্তিগতভাবে আমি গৌরীর অবস্থানটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ করব। কিন্তু কেউ কেউ যুক্তিসংগতভাবে যখন বলবেন যে গবেষণা কর্ম হল, সত্যানুসন্ধান ; যেখানে প্রয়োজন হলে হৃদয়বৃত্তিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, নাহলে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের বিঘ্ন ঘটে, সে তর্কটার মীমাংসা হওয়া কঠিন। আইয়ুব জীবিত থাকতে এ প্রসঙ্গটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। "আমাদের" অর্থাৎ আইয়ুব, গৌরী, স্বপন মজুমদার এবং আমার মধ্যে। আইয়ুবও মনে করতেন যে সাহিত্যবিচার করবার সময় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনা অপ্রয়োজনীয়, কখনও কখনও অসমীচীনও। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাঠকের একটা কৌতূহল থাকে বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই অসাহিত্যিক কৌতূহল। সাহিত্যবিচার বা সাহিত্য আস্বাদনের কোনও তারতম্য হয় না ওতে, সাহিত্য বুঝবারও কোনও সহায়তা হয় না। এ তর্কটাতে আমি নিজে একটু বিভ্রান্ত বোধ করি। ব্যক্তিগত রুচি ও অনুভবের দিক থেকে দেখলে আমিও চাইব না যে আমার প্রিয় লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকে বেআব্রু করে লোকের সামনে তুলে ধরা হোক। আবার বিচারবুদ্ধি এবং যুক্তি দিয়ে আমার মনে হবে যে কোনও তথ্য যদি সমালোচকের বা গবেষকের হাতে পৌঁছয় এবং নিজের কাজের জন্য ওই তথ্যকে প্রয়োজনীয় বলে তাঁর মনে হয়, তবে তা থেকে তাঁকে বিরত করা সম্ভব না সঙ্গত? তথ্যটি যথার্থ কিনা, তার ওপর ভিত্তি করে যে সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে তাও যথার্থ কিনা—তা নিশ্চয় অত্যন্ত সাবধানতা আর সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে গালিবের যে অনুবাদ আইয়ুব করেছেন, তার উপসংহারে গৌরী নিজে গালিবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছে। তার মনে হয়েছে এবং হয়তো সংগতভাবেই মনে হয়েছে যে গালিবের কবিতার মেজাজটি ঠিকমত ধরবার এবং আস্বাদন করবার জন্য পাঠকের পক্ষে গালিবের জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এই জীবনীর শুরুতেই গৌরী মন্তব্য করেছে, "দোষে গুণে, প্রতিভায়-অপদার্থতায়, অহঙ্কারে দীনতায়, সাহসে কাপুরুষতায় এই মানুষটিকে আজ সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা সহজ নয়"। কিন্তু গালিবের যে গুণ ও দোষগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরিণতিতে যে জীবন তাঁকে কাটতে হয়েছিল এবং যে কবি-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল, সেইটি জানলে তাঁর কাব্যের স্বরূপ বুঝতে হয়তো কিছুটা সুবিধা হবে পাঠকের। এ প্রসঙ্গটি নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে পারে, তবে আপাতত তার অবকাশ নেই।

দেশের কয়েকজন স্মরণীয় পুরুষের চারিত্র্য ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লিখেছে গৌরী। এঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, জবাহরলাল নেহরু, জয়প্রকাশ নারায়ণ। রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ অবশ্য প্রায় তার সব লেখাতেই কোনও না কোনওভাবে এসে যায়। কিন্তু পৃথকভাবে লেখা দুটি প্রবন্ধ হল "খণ্ডিত প্রতিমা" এবং রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের (Tagore Research Institute)-এর পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-তে দেওয়া লিখিত ভাষণ। "খণ্ডিত প্রতিমা"তে গৌরী বলতে চেয়েছে যে যদিও বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব বলে মনে গর্ববোধ করে, তবু এর মধ্যে গর্ব আছে কিন্তু বোধ নেই। "রবীন্দ্রনাথকে আদ্যোপান্ত জানা, বোঝা, আত্মস্থ করা এক দুরূহ কাজ। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভা, বিচিত্র ব্যক্তিত্ব, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী আগ্রহ এবং অনুরাগ, এসব থেকে খণ্ড অংশ বেছে নিয়ে তাকে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বলে মনে করে মানুষ, তারই পূজা করে"। তাই "খণ্ডিত প্রতিমা"। গৌরীর বিশেষ খেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঠকের সবচেয়ে বেশি অপরিচয় তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে। তাঁর গ্রামচিন্তা, স্বদেশচিন্তা, রাজনীতি চিন্তা এসবই এত বাস্তবভিত্তিক, এত স্বকীয় এত প্রাসঙ্গিক, অথচ তার সঙ্গেই বেশি অপরিচয়! Tagore Research Institute-এ প্রদত্ত ভাষণটিতেও প্রায় অনুরূপ চিন্তা গৌরীর। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের "শীতল—উদাসীনতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গৌরী মন্তব্য করছে যে "আমাদের চিত্তভূমিতে কর্ষণ হচ্ছে না এবং যতটুকু বা হচ্ছে তাতে ঠিক জাতের ধান বোনা হচ্ছে না।" রবীন্দ্রনাথের বাণী বহন করার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিনি। এমনকি শান্তিনিকেতনেও তাঁর চিন্তাভাবনা ঠিকমত গৃহীত হয়নি।

জবাহরলাল সম্বন্ধে লেখাটির নাম "ভারতীয় ঐতিহ্য ও জবাহরলাল"। জবাহরলাল অল্পবয়স থেকেই পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন এবং শিক্ষা পেয়েছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক উচ্চশিক্ষিত জবাহরলাল দরিদ্র ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসে নতুন করে ভারতীয় ঐতিহ্যের অধিকার লাভ করতে প্রয়াসী হলেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা, মার্কসবাদ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা, ভারতীয় ধর্মচেতনা ও আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির টানাপোড়েনে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও একাকিত্ববোধ তৈরি হয়েছিল, তারই বিশ্লেষণ আছে এ প্রবন্ধটিতে। জয়প্রকাশ সম্পর্কে লেখাটির নাম "ব্যর্থ লোকনায়ক," গৌরীর দৃষ্টিতে, "গান্ধীর সঙ্গে তুলনায় জয়প্রকাশের ব্যর্থতা প্রায় জীবনব্যাপী" এবং "মানুষ হিসেবে তিনি যতই মহৎ হয়েছেন, জননেতা হিসেবে ততই কম আকর্ষক হয়েছেন," সীমিত রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে জয়প্রকাশ যে ক্রমেই নিজেকে বৃহত্তর সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এটা তাঁর উত্তরণ, কিন্তু তাঁর একারই উত্তরণ। তাই লোকনায়ক হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা।

ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মানুষের স্মৃতিচারণ করেছে গৌরী নানা লেখায়। এঁদের মধ্যে একজন তার আত্মীয় বাকি সকলেই বন্ধু। সব লেখাগুলির মধ্যেই গৌরীর প্রশংসামনস্কতা, বিশ্লেষণ প্রবণতা ও সহৃদয়তার পরিচয় মেলে।

"মহিমময়ী পরমাত্মীয়া" নামে লেখাটিতে আছে তার নিজের জ্যেঠিমার কথা। মধ্যশিক্ষিত, নিতান্তই গৃহবধূ এই মহিলা প্রখর বুদ্ধি, আগ্রহ আর ভূয়োদর্শিতার জোরে শুধু সংসার প্রতিপালন আর সংসার প্রশাসনের ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর সুপণ্ডিত স্বামীর যোগ্য সখী ও সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। এঁদের দাম্পত্য গৌরীর কাছে দাম্পত্যের আদর্শ ছিল, তার কম বয়স থেকেই,

আরও একজনের পাতিব্রত্য গৌরীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল—তিনি এম. এন রায়ের পত্নী এলেন রায়। এলেন বিদেশিনী, বিদুষী ও আধুনিকা প্রখর বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর পাতিব্রত্য ভারতীয় নারীদের অতিক্রম করে গিয়েছিল, কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি স্বামীর সহযোগী ছিলেন। বিদেশিনী হয়েও, ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে ওঠার কোনওরকম চেষ্টা না করেও, এদেশকেই আপন দেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য অন্য অর্থে গোটা পৃথিবীই ছিল তাঁর স্বদেশ। দেরাদুনে গৌরী এবং আইয়ুব পুত্র পূষণ্‌কে নিয়ে যখন এলেনের আতিথ্যে ছিলেন কিছুদিন, তখন খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেনকে দেখবার এবং চেনবার সুযোগ হয়েছিল গৌরীর, স্বল্পস্থায়ী কিন্তু গভীর এক বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল দুজনের। তারই বিবরণ আছে "An Account of a Brief Frindship" নামে এলেনের স্মৃতিচারণটিতে এ লেখাটি ইংরেজি ভাষায়।

গৌরী যখন দেরাদুনে, তখন এম. এন. রায় জীবিত নেই, কিন্তু গৌরী লক্ষ করেছিল যে তাঁর স্মৃতি এত আদরে ছড়িয়ে আছে বাড়ির সর্বত্র মনে হত না যে তিনি নেই। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এলেন যেমন সংসারের কাজকর্ম করতেন, বাগানে বন্ধুদের আপ্যায়ন করতেন ও আনন্দ দান করতেন, তেমনি দক্ষতার সঙ্গে তিনি অফিস চালাতেন, লেখাপড়ার কাজ করতেন, স্বামীর অসম্পূর্ণ কাজগুলি চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। আবার সকলের অগোচরে বিরলে বসে যে দিনলিপি রচনা করতেন, (যা কেবলমাত্র গৌরীকেই দেখতে দিয়েছিলেন), তা ছিল প্রয়াত স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনার হাহাকারে ভরা। নতুন বিবাহিত গৌরীর কাছে এলেনের প্রেমও ছিল এক আদর্শ দাম্পত্য প্রেম।

আরও যাঁদের সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছে গৌরী, তাঁদের মধ্যে এক শিবনারায়ণ রায় ছাড়া বাকি সকলেই প্রয়াত। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট, স্বনামধন্য। সুনির্বাচিত ঘটনা ও বর্ণনার দ্বারা গৌরী এঁদের প্রত্যেকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে! ঋজুদেহ এবং ঋজুচরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং ঈষৎ অহঙ্কারী স্পষ্টবক্তা, শিল্পসাহিত্য রসিক, মানবতাবাদী বন্ধু এবং পরিবার বৎসল শিবনারায়ণ রায় ; সুলেখক, পণ্ডিত, সুরসিক, আড্ডাবাজ এবং ঈষৎ খামখেয়ালী সৈয়দ মুজতবা আলি ; সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত, সংগ্রামী এবং বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত মৈত্রেয়ী দেবী, যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা এবং নিজেও সুলেখিকা ; রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিত ও রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের প্রাণপুরুষ সোমেন্দ্রনাথ বসু ; রবীন্দ্রসংগীতের একান্ত সাধনায় যাঁর আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মবোধের প্রকাশ সেই সুকণ্ঠী তন্ময় গায়িকা, যশস্বিতা সম্পর্কে নিঃস্পৃহ এবং নিভৃতচারিণী নিলীমা সেন, আইয়ুব যাঁকে "রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান" নামে প্রবন্ধটি শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসর্গ করেছিলেন জাস্টিস মাসুদ যিনি ছিলেন উচ্চপদের অধিকারী হয়েও নিরহঙ্কার, প্রসন্নব্যক্তিত্ব, বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণত স্মৃতিচারণ এবং চরিত্রচিত্রণের সময়ে লেখকরা নিজের কথা বলবার, নিজের গুণপনা বর্ণনা করবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না। গৌরী এটা পেরেছিল। নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখে অন্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার ছবি তুলে ধরবার অভ্যাস, প্রবণতা এবং শিক্ষা তার ছিল।

স্মৃতিচারণ বিষয়ক লেখাগুলির মধ্যে কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট হল গৌরীর নিজের জীবনের স্মৃতি নিয়ে লেখা। বিশেষ করে "আমাদের দুজনের কথা।" কখনও কখনও আমার মনে হয়—এটাই বোধহয় গৌরীর সব লেখার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখা। এত সাবলীল এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সজীব পড়লে মনে হয় সে যেন তার যে কাঁচা বয়সের, তরুণ মনের অভিজ্ঞতাগুলিকে সেই বয়সেরই উৎসাহ, সজীবতা, বিস্ময়, শিহরণ নিয়ে লিখছে। যেন সে ফিরে গেছে সেই দিনগুলিতে। অথচ এ লেখাগুলি তার নিজের হাতে লেখা নয় ; সে তখন এত পঙ্গু যে নিজের হাতে লেখার শক্তি চলে গেছে। সে মুখে মুখে বলে গেছে আর কামাল হোসেন (গৌরীর একান্ত অনুরাগী অল্পবয়সী তরুণ মন চিকিৎসক, গৌরীর প্রতিবেশি) শ্রুতিলিখন করে গেছে। কিন্তু বলার সময়ও তার ভাষা তার বাক্‌ভঙ্গি এত সুন্দর, তার নিজের লেখার মতই ঝরঝরে হয়ে উঠেছে। অবশ্য এতে কামাল হোসেনের কৃতিত্ব অনেকখানি, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গৌরীকে গল্প বলতে, গল্প করতে যারা শুনেছে, তারা সবাই বুঝবে যে এ লেখার ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, সব গৌরীরই নিজস্ব ওই গল্পগুলো আমিও গৌরীর মুখে কতবার শুনেছি, তাই নিজের স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছ।

"ছেলেবেলার গল্প" একটি অসমাপ্ত রচনা। এর মধ্যে গৌরীর বাবা, মা, ভাইবোনদের কথা আছে, পাটনার প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে ছোটখাট মন্তব্য আছে ; স্কুলে ভর্তি হওয়া, স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের কথা, টিচারদের কথা—এইসব গল্প দিয়ে এই অসমাপ্ত ছেলেবেলার কথাটি ভারী সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। গান্ধিবাদী পিতা, পড়াশুনায় আশ্চর্যরকম ভালো, জীবন যাপনে সবরকমের বাহুল্য বর্জিত, খদ্দর পরেন এবং চরকা কাটেন এবং বিনা খরচে বিনা আড়ম্বরে বিবাহ করেছেন কন্যাকে নিজের বাড়িতে তুলে এনে যাতে কন্যার অসহায়া বিধবা মাকে বিবাহ সংক্রান্ত কোনওরকম অসুবিধা ভোগ করতে না হয়—এসব নিয়ে গৌরীর মনে যেমন পিতা সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা আর গর্ববোধ ছিল, তেমনি তিনি যে বালিকা বধূর সাজসজ্জা, আচার আচরণ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত জবরদস্তি করতেন সেটা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। এই ভালো না লাগাটা যে খুব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে দিয়েছে তার স্মৃতিচারণের মধ্যে। তবে গৌরীর পিতা যে পাটনার অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিদের মত উন্নাসিক ছিলেন না, বিহারীদের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশতেন এবং ছেলেমেয়েদেরও মিশতে উৎসাহ দিতেন, হিন্দি শিখতেও উৎসাহ দিতেন, এর ফলে একটা উদার পারিবারিক আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, যাতে গৌরী এবং অন্যান্য ভাইবোনদের মধ্যেও অবাঙালিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার একটা সমজ ক্ষমতা তৈরি হয়েছিল, হিন্দিও শিখতে পেরেছিল ভালোভাবে। এরই ফলে সে সঙ্কীর্ণ বাঙালিয়ানার ঊর্দ্ধে উঠতে পেরেছিল পরবর্তীকালে।

"আমাদের দুজনের কথা" প্রধানত—আইয়ুব আর গৌরীর প্রেমের কাহিনী। শান্তিনিকেতনের পটভূমিতে এর সূত্রপাত, পরিণতি কলকাতায়। এই কাহিনী এত প্রাণবন্ত, এত অকপট যে মনে হয় কথাগুলি যেন "হৃদয়ের উৎসমুখ" হতে শতধারায় বার হয়ে আসছে। সে দিনগুলির আনন্দ, রোমাঞ্চ, ভয়, উদ্বেগ, দুঃখ, হতাশা সবই এত সজীব যে এক কাহিনী পাঠককেও যেন টেনে নিয়ে যায়। সেই কালে, সেই স্থলে। লেখার আরম্ভটাই কী আশ্চর্য সুন্দর!

"শতাব্দীর মধ্যাহ্নে, ১৯৫০ সালের ঠিক মাঝামাঝি আমার একটা জন্মান্তর ঘটে"...সেদিন শান্তিনিকেতন আমার জীবনে কী মহাসমারোহে প্রবেশ করেছিল তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবটুকু বলার সাধ্য আমার নেই। সেদিনই যেন আমার সবখানি সত্তা জুড়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল।" এ এক আশ্চর্য অনুভব—শান্তিনিকেতনেই এটা হওয়া সম্ভব, শান্তিনিকেতনের পথঘাট, খোলামাঠ, খোয়াই কোপাই, শালবীথি বকুলবীথি, শান্তিনিকেতনের খোলা আকাশের নীচে পড়াশুনা, শিক্ষক ছাত্রের মধুর সম্পর্ক ; সব কিছু মিলেই এই মহোৎসব। এক মুক্তির আনন্দ। আর এরই যেন চূড়ান্ত বিন্দু হিসেবে আবির্ভাব হল প্রেমের, রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় "এসেছ প্রেম এসেছ আজ কী মহাসমারোহে"। গৌরীর পিতৃদেব তাকে কমিউনিস্ট রাজনীতির আওতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে পাঠালেন পাটনা থেকে শান্তিনিকেতনে, জানতেন না যে মেয়েকে তপ্ত কটাহ থেকে আগুনে ঝাঁপ দিতে পাঠাচ্ছেন। শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে গৌরীর জন্য প্রেমের ফাঁদ পাতা হচ্ছিল, অচিরেই সে ধরা পড়ল সেই ফাঁদে। তারই অন্তরঙ্গ বর্ণনা পাই "আমাদের দুজনের কথা"তে। প্রখ্যাত মনীষী আবু সয়ীদ আইয়ুব দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। গৌরী তাঁর ছাত্রী। নতুন অধ্যাপক, আগে থেকে জানা ছিল না বলে সঙ্গে করে বসবার আসনটি আনেন নি। এদিক ওদিক তাকাতেই গৌরী তার নিজের আসনটি তাঁকে নিয়ে নিজে বান্ধবী মাধবীর আসনের একপাশে স্থান নিল। এই আসন দান কি একটা প্রতীক? সেই মুহূর্তেই কি আইয়ুবের জন্য চিরদিনের প্রেমের আসন বিছিয়ে দিল গৌরী?

কেমন করে গৌরী এবং আইয়ুব পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। পরস্পরের মন জানাজানি হল, আইয়ুব অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলেন, তারপর কত উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ, সামাজিক বাধা আর অশান্তি—এসবের মধ্যে ধৈর্য ধরে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত কূলে এসে পৌঁছল গৌরী, তারই বর্ণনা এ কাহিনীতে। আইয়ুবের তরফ থেকে আকর্ষণ অনেকখানি থাকলেও সঙ্কোচ এবং সতর্কতা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তাঁর বয়স, তাঁর অসুস্থতা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর আশাহীনতা। একদিন পড়বার সময় কথায় কথায় বলেছিলেন, "ওই যে শিরীষ গাছটা, আমারই মতো ওটাতে ঘুণ ধরেছে"। বলেছিলেন যে তাঁকে আসল বয়সের তুলনায় দশ বছর কম দেখালেও ভিতরে ভিতরে আরও দশ বছর বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। গৌরীকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিটায় তাঁর নিজের কোনও কথা ছিল না, ছিল শুধু রবীন্দ্রনাথের একটি গান "বাণী মোর নাহি"। এই চিঠি পড়ে গৌরী প্রথমে একটু হতাশ হয়েছিল, কিন্তু "দিনে দিনে মৌচাকের মতো সেই চিঠিখানা আমার মনের মধ্যে যেন মধু সঞ্চয় করে এনেছিল।"

অধ্যাপক প্রবাসজীবন চৌধুরীর সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিল অন্যান্য ছাত্রছাত্রী সহ গৌরী। তখন হেমন্তকাল। প্রবাসজীবন হেমন্তকালের ওপর জীবনানন্দের একটি কবিতা মৃদুস্বরে আবৃত্তি করছিলেন, তখন "আমার মনে অতি সঙ্গোপনে একটি বিষাদ বিন্দু বিন্দু করে জমে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই ধরনের আনন্দযাত্রায় আইয়ুবকে কোনওদিন সঙ্গী পাওয়া যাবে না, সেইখানে চিরহেমন্ত।...কিন্তু অন্যদিকে আমি এও অনুভব করছিলাম যে এই হেমন্ত মোটেই ধানকাটা মাঠের মত রিক্ত ছিল না, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কণা কণা সোনার ফসলে আমার হৃদয়কে দিনে দিনে পূর্ণ করে তুলছিলেন।”

১৯৫০ এর ডিসেম্বরে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে যোগদানের অছিলায় কলকাতায় এসে গৌরীর প্রথম আইয়ুবের বাড়িতে পদার্পণ। সেই অভিজ্ঞতার কথা গৌরী এত অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছে যে তার অভিজ্ঞতাটিকে যেন পাঠক নিজের মন দিয়ে অনুভব করতে পারে—“কয়েকঘণ্টা কিছু গভীর অন্তরঙ্গ কথা এবং কিছু স্পর্শের ভিতর দিয়ে কোন স্বর্গরাজ্যে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও ভাবতে বসলে মনের মধ্যে শিহরণ জাগে।”

যাই হোক, “আমাদের দুজনের কথা” কিন্তু শুধুমাত্র দুজনের কথা নয় ; দুজনকে কেন্দ্রে রেখে মস্ত বড় চালচিত্রে আঁকা হয়েছে অনেক দৃশ্যপট, অনেক মানুষ, অনেক বিচিত্র চরিত্র আর ঘটনা। শান্তিনিকেতনের আর কলকাতার। শান্তিনিকেতনের তখনকার প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষজন, জীবনযাত্রা, লেখাপড়ার ধরণ, উৎসব অনুষ্ঠান। সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক চরিত্র, এ সবের একটা বাস্তব বর্ণনা, মাঝে মাঝে সরস কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য—সব মিলে বইটিকে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য আবার সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা দিয়েছে। শান্তিনিকেতনকে যে গৌরী কতখানি ভালোবেসেছিল, তার একটু পরিচয় পাই তার একটা মন্তব্যে—কোন এক পিকনিক থেকে ফিরে আসার পর লিখেছে— “সেইদিন শান্তিনিকেতনে যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা ঘটেছিল তাতে বুঝতে পেরেছিলাম পৃথিবীর আর কোথাও এইরকম স্কুলকলেজ বোধহয় পাওয়া যাবে না।”

শান্তিনিকেতনে অবাঙালি এবং অভারতীয় বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে গৌরীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাদের অনেকের সঙ্গেই তার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সে লিখেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার মিলাডার কথা। লিখেছে বার্মিজ বন্ধু অংসো, যে শাশুড়ির অত্যাচার সইতে না পেরে পালিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেছিল কলাভবনে, পরে রাশিয়ায় চলে গিয়েছিল। লিখেছে তার অসমবয়সী বন্ধু এবং উপদেষ্টা কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী বিদেশিনী এটা ঘোষের কথা, যিনি তাঁকে অনেক বিদেশী রান্নাবান্না,আদব কায়দা আর নাচগান শিখিয়েছিলেন। মাদামোয়াজেল বুর্দার কথা লিখেছে, যাঁর কাছে গৌরী ফরাসী শিখতে যেত। ওই সময়ে নিমাই চট্টোপাধ্যায় আর গৌরী দত্ত—এই দুই তরুণ-তরুণীর যৌথ দায়িত্বে এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল—পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্বপাকিস্তানের খ্যাতনামা সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীরা যোগ দিয়েছিলেন ওই মেলায়। গৌরীর জীবনের সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা তো বটেই, গৌরীর কর্মকুশলতা আর ব্যবস্থাপনার দক্ষতাও অনুমান করে নেওয়া যায় এ বর্ণনা থেকে। শান্তিনিকেতন থেকে বি-এড-পরীক্ষা দিয়ে গৌরী কিছুদিনের জন্য আসানসোল উষাগ্রাম স্কুলে চাকরি করতে গিয়েছিল—সেখান থেকে প্রতি শনিবার কলকাতায় গিয়ে আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করে আবার রবিবারে ফিরে আসত। তারপর কলকাতায় এডুকেশনে এম. এ পড়তে আসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অভিজ্ঞতা, গৌরীর নিজের এবং আইয়ুবেরও বন্ধুবান্ধবের কথা, এম. এ পাশ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাউথ পয়েন্ট স্কুলে চাকরি—এরপর বিবাহের প্রস্তুতি ও বিবাহ—এখানেই শেষ হয়েছে লেখাটি। নানা ঘটনা, নানা চরিত্র, নানা অভিজ্ঞতা। যদিও বিবাহের দিনের বর্ণনা এবং দুজনের একান্ত মিলনের মুহূর্তটি—এখানেই বেশ নাটকীয়ভাবে লেখাটি শেষ হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে বিবাহ-পরবর্তী কালেরও নানা ঘটনার উল্লেখ আছে—সংসারযাত্রার কথা, পুষনের জন্ম, আইয়ুবের কোয়েস্টে যোগদানও একটি উল্লেখযোগ্য সেমিনার পরিচালনা (যাতে যোগ দিতে আর্থার কোয়েসলার এসেছিলেন কলকাতায়)—এইসব নানা কথায় রীতিমতো ঘটনাবহুল চিত্তাকর্ষক কাহিনী। যেখানে এই কাহিনী শেষ হয়েছে, তারপরেও আইয়ুবের এবং গৌরীর জীবনে আরও কতরকম অভিজ্ঞতা এসেছে, কত কি ঘটে গেছে, সেসব যদি গৌরীর কলমে ধরা থাকত তবে তো কতই না সমাদর লাভ করত পাঠক কুলের কাছে, কত মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারত, ভবিষ্যতে কোনও সুদক্ষ জীবনীকার হয়ত গৌরীর জীবনী রচনা করবেন কিন্তু গৌরীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলির রসোত্তীর্ণ বর্ণনা তার মধ্যে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা কম। "এই যে অহনা" নামে বইটি উপন্যাসের ধাঁচে লেখা—কিন্তু আসলে এটা গৌরীরই জীবনকথা। নাতনী শ্রেয়াকে উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছে

"তুমি পড়লে বুঝতে পারবে—
কতটা গল্প এর, কতটুকু গল্পনা
কতটা সত্যি আর কতটুক কল্পনা।"

শ্রেয়ারই অন্য নাম অহনা। সে তার ঠাকুরমা অর্থাৎ গৌরীকে "আম্মা" বলেই ডাকে। "এই যে অহনা" গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি ঘটনা, এমনকি প্রত্যেকটি কথোপকথন হুবহু সত্যের অনুলিপি। তবু কল্পনা তো আছেই। যেখানে মনের কথা, মনের আনন্দ, মনের দুঃখের বর্ণনা, সেখানেই সত্য আর কল্পনা মিলেমিশে একাকার। শান্তিনিকেতনবাসী আম্মা পুত্রের কর্মস্থল মুম্বইতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। সেখানে ছোট্ট অহনার সঙ্গে যে দিনযাপন, দিনে দিনে নানা খেলার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে, ইংরেজি বাংলা নানা গল্পের বই পড়ে শুনিয়ে, রূপকথা, রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলির মনোহর বর্ণনা দিয়ে নাতনীর মনোহরণ করে তার সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে তোলা, তারই সরস স্নিগ্ধ বিবরণ "এই যে অহনা"। অহনার নানারকম আবদার, রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তার সমালোচনা, আম্মার সঙ্গে বসে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, অহনার কল্পনাপ্রবণ মনের খেলা,—এইসব কিছু এত সুন্দর করে বলা হয়েছে যে এ বই শিশুদের কাছে আর বড়দের কাছে সমান উপভোগ্য। "ছেলেবেলার গল্প" বা "আমাদের দুজনের কথা"তে গৌরী যদি অতীতমুখী হয়ে থাকে, "এই যে অহনা"তে তার মন বর্তমানমুখী, ভবিষ্যৎমুখী। নাতনীর সমান বয়সে চলে এসে সে নাতনীর সঙ্গে নতুনকরে বাঁচতে চাইছে, পারছে। কিছুদিন আগে কলকাতার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপিকা গল্প করতে করতে বলছিলেন যে তিনি "Changing role of a grand mother" এই বিষয়ে একটি গবেষণা করেন, তবে "এই যে অহনা" সে গবেষণার জন্য একটি উৎকৃষ্ট নমুনা হবে। গৌরী তো শুধু ঠাকুরমা নয়, সে তাছাড়া ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা, শিশুমনস্তত্ত্ববিদ। শিশুমনের অন্ধিসন্ধি তার জানা, কল্পনার খেলা খেলতে যে যেমন পটু, তেমনি শিশুশিক্ষার দায়িত্ব বিষয়েও সচেতন। আবার সাবেকি ঠাকুরমার ভূমিকায় নাতনীর সঙ্গে খেলা করা, খেলার ডালি সাজানো, গল্প বলা, এসবেও তার সমান উৎসাহ। তার হাঁটতে কষ্ট, তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নাতনীর সঙ্গে গাছতলা দিয়ে হাঁটা, হিমঝুরি ফুল কুড়োনো, বিনি সুতোর মালা গাঁথা, এসবে তার যে কী অপার আনন্দ, তা লেখার ছত্রে ছত্রে টের পাওয়া যায়। আবার নাতনীর সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে সাবেকি ঠাকুরমাদের মত কাঁথা সেলাইও করে যায়। রূপকথার গল্প, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, হ্যান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসনের গল্প বলে যেমন নাতনী অহনার কল্পনাকে উসকে দিচ্ছে, তেমনি আবার তার জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্নগুলির যুক্তিনিষ্ঠ উত্তর দিয়ে, তাকেও প্রশ্ন করে, তার মধ্যে সমালোচনার শক্তি আর সাহস তৈরি করছে, তার মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলছে। জন্মদিনে ইস্কুলের বন্ধুদের জন্য যখন উপহারের ডালি সাজিয়ে দিচ্ছে, তখন বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার কথা বড় বড় করে লেখা থাকছে সে ডালির ওপর, এইভাবে মহানন্দে দিন কাটাতে কাটাতে একদিন বিদায়ের ক্ষণ এল, ছুটি ফুরিয়ে গেল এবার যাবার পালা। ছলছল চোখে যার সঙ্গে বিদায়, আম্মা জানে যে সেই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হবে না। সে বড় হয়ে উঠবে, অন্যরকম ভাববে, অন্য কথা বলবে। এই বিদায় তাই এক হিসেবে চিরবিদায়। তারই বিষণ্ণতা দিয়ে বই শেষ হয়েছে। সমস্ত গল্পটি যেন কাঁথা সেলাই-এর এক একটি ফোঁড় সাজিয়ে সাজিয়ে দিনলিপির নক্‌সি কাঁথা বানানো। "কাঁথা" একটা প্রতীকী মূল্য লাভ করেছে গল্পটিতে।

এবারে গৌরীর করা অনুবাদ সম্বন্ধে কিছু বলি। অনুবাদে গৌরীর হাত প্রথম থেকেই বেশ ভালো তার প্রথম প্রকাশিত রচনাটি একটি ইংরেজি গল্পের অনুবাদ ছিল, আইয়ুবের খুব পছন্দ হয়েছিল অনুবাদটি। অনুবাদের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সে বেশ ভালোভাবে ভাবনাচিন্তা করেছিল এবং নিজের করা অনুবাদে ওই নীতিগুলি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে। ইংরেজি ভাষা ছাড়া হিন্দি ভাষাতেও গৌরীর বেশ ভালো দখল ছিল। উর্দু ততটা ভালো জানত না ; কিন্তু যেহেতু উর্দুর হিন্দির সঙ্গে বেশ মিল আছে এবং যেহেতু আইয়ুবের আর শ্বশুরবাড়ির অন্য সকলেরও মাতৃভাষা উর্দু, বাড়িতে উর্দুতেই কথাবার্তা বলতেন, এবং যেহেতু উর্দু সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতায় আইয়ুবের খুব ভালো দখল এবং খুব গভীর অনুরাগ ছিল, তাই উর্দু কবিতা পড়তে, উপভোগ ও বিচার করতে, গৌরীরও বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। উর্দুভাষা সে বেশ খানিকটা শিখেওছিল, তবে নিজে লেখেনি কখনও।

"নবজাতক" পত্রিকায় গৌরীকৃত কাইফি আজমির কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছিল। সম্ভবত ওই তার প্রথম উর্দু কবিতার অনুবাদ। আইয়ুব যখন "গালিবের গজল থেকে" নামে গালিবের অনুবাদ গ্রন্থটি রচনা করেন, ওই কাজ গৌরী আইয়ুবকে নানাভাবে খুব সাহায্য করেছিল। তাছাড়া ওই গ্রন্থে গৌরী গালিবের একটি ক্ষুদ্র জীবনী রচনা করেছিল। তার মনে হয়েছিল যে গালিবের সমকাল এবং সংস্কৃতির চরিত্র, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী, তাঁর ছন্নছাড়া জীবনযাত্রা—এসব সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বাঙালি পাঠকের পক্ষে গালিবের কবিতার মেজাজ ও তাৎপর্য ধরতে পারা যথেষ্ট কঠিন। তাই ওই জীবনী রচনায় সে উৎসাহিত হয়েছিল। প্রতিকূল কাল, বিরোধী স্ব-সমাজ, আর্থিক অনটন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বর অবিশ্বাসী, নিঃসঙ্গ, সিনিক অথচ অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং হৃদয়াবেগসম্পন্ন প্রতিভাধর গালিব, শরাবের মধ্যে আর তওয়ায়েফ—প্রেমের মধ্যে আত্মনিমজ্জন করে দুনিয়াকে অগ্রাহ্য করেন, অসাধারণ ভালো কবিতা লেখেন—গালিবের এই বিষণ্ণ অহংকারী ছন্নছাড়া চরিত্রটি ঠিক ঠিক ফুটে উঠেছে গৌরীর রচনায়। এই জীবনী বাঙালি পাঠকের কাছে গালিবের কবিতার রসাস্বাদনে সহায়ক হবে তাতে সন্দেহ নেই।

মীরের কবিতার অনুবাদ করবার জন্য নির্বাচিত কবিতা সবগুলির অনুবাদ আইয়ুব করে যেতে পারেননি, গৌরীই সেগুলি সমাপ্ত করে অনুবাদ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেছিল, এই কাজে যে উর্দুসাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত এক মহিলার সাহায্য নিয়েছিল। অনুবাদ করতে গিয়ে সে আইয়ুবেরই পথ ও মতের অনুসরণ করেছিল—কবিতার ভাব ও ব্যঞ্জনা যথাযথভাবে তুলে ধরার উপরই জোর দিয়েছিল, আক্ষরিক অনুবাদের উপর জোর না দিয়ে। তাছাড়া মিল এবং ছন্দ দুটোই ত্যাগ করেছিল। অনুবাদের শেষে মীরেরও একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করেছে গৌরী। মীর গালিবের পূর্ববর্তী শতাব্দীর। দিল্লিতে বহুবছর বাস করার পর রাজনীতির উত্থান পতনের অস্থিরতা, গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রিয় শহর পরিত্যাগ করে লক্ষ্ণৌ-এর অধিবাসী হন ও জীবনের শেষ কয়েক বছর লক্ষ্ণৌতেই কাটান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রথম যৌবনে এক তীব্র অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে মস্তিষ্কের সুস্থতা হারান কিছুদিনের জন্য। প্রেম ও দুঃখ তাঁর কবিতার মূল সুর। তাঁর পিতা দরবেশ ছিলেন বলে অল্পবয়স থেকে তাঁর অনুভূতিতে একটা আধ্যাত্মিকতার সুর ছিল। এদিকে আবার দিল্লি, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে ওই সময়ে তওয়ায়েফ অর্থাৎ নৃত্যগীত কলাপটিয়সী সুন্দরী শিক্ষিত নাগরিকা বারাঙ্গনাদের আবির্ভাব হয়েছিল। আইয়ুবের মতে এই তওয়ায়েফ প্রেমের সোপান বেয়ে মীরের উত্তরণ ঘটেছিল ঈশ্বরপ্রেমের স্তরে। তাছাড়া মীরের আত্মমর্যাদাবোধ ও অহঙ্কার ছিল অতি তীব্র। যদিও অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় জীবিকা নির্বাহ করা তখনকার কবিদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ছিল, তবু মীর কিন্তু কখনও চরম অভাবের মধ্যে পড়েও পৃষ্ঠপোষকদের মুরুব্বিআনা বরদাস্ত করেননি। এত তীব্র ছিল তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ। মীরের কবিতার অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

গৌরীর সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদের কাজ বোধহয় জাপানী কবি মাৎসুও বাশোউ-এর রচনার অনুবাদ—"ওকুনো হোসেমিচি"—যার আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ হল "দূর প্রদেশের সঙ্কীর্ণ পথ"। গৌরী একে বলেছে রম্যরচনা। "দূর প্রদেশের সঙ্কীর্ণ পথ" বইটি এক ভ্রমণকাহিনী—আবার ঠিক সাধারণ ভ্রমণ কাহিনীও নয় এটা। এ এক কাব্যিক ভ্রমণ। জাপানের বিভিন্ন স্থানের যেসব দৃশ্য আগেকার কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতা লেখায়, মাৎসুও বাশোউ-এর ভ্রমণ সেইসব স্থানেই। কবি হিসেবে এই সব স্থানই তাঁর কাছে তীর্থস্থান। দুর্গমপথ, আক্ষরিক এবং প্রতীকী—দুই অর্থেই সঙ্কীর্ণ, সে পথে একা বা দু-একজন যাওয়া যায়, দলবেঁধে নয়। সেইসব স্থানে ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা, আর মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট সব হাইকু।

কৌউকো নিওয়া নামে গৌরীর জাপানী ছাত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে করা এই অনুবাদ। জাপানী সাহিত্য জাপানী সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরীর আগ্রহ অনেকদিনের। হয়তো রবীন্দ্রনাথের "জাপান যাত্রীর ডায়েরী" পড়েই এই আগ্রহের শুরু। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক খুব গাঢ় এবং অনেক প্রাচীন। জাপানী শিল্পীদের, জাপানী ছাত্রদের অনেকদিন ধরেই শান্তিনিকেতনে আনাগোনা, পড়াশুনা, ভাববিনিময়। শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করবার সময় নিশ্চয় গৌরীর জাপান সম্বন্ধে আগ্রহ লালিত হয়ে থাকবে। কিন্তু জাপানী ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, তাই জাপানী সাহিত্যের সঙ্গে তার সোজাসুজি পরিচয় হয়নি, হয়েছে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু অনেক বছর পরে কয়েকজন জাপানী ছাত্রছাত্রীর মাধ্যমে জাপানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে এবং কিছুটা জাপানী ভাষার সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটল। এই ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় এসে গৌরীর কাছে বাংলা শিখতে আসত। গৌরীর সরস পড়ানো আর আন্তরিক স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এদের প্রত্যেককে এত আকৃষ্ট করেছিল যে পড়াশুনা শেষ হবার পরও গৌরীর সঙ্গে এদের স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এরা যেমন গৌরীর কাছে বাংলা শিখত, গৌরীও এদের কাছে জাপানী ভাষা কিছুটা শিখত, তার চেয়ে বেশি করে জাপানী সংস্কৃতি সম্বন্ধে শিখত। জাপানীদের চরিত্রের মধ্যে যে নান্দনিকতা ও শৃঙ্খলাবোধের, নম্রতা ও দৃঢ়তার সমন্বয়, এবং যে আশ্চর্য রকমের পরিমিতিবোধ, তা গৌরীকে খুব আকৃষ্ট করত। কত সংক্ষেপে অথচ কত অব্যর্থভাবে কবিতার ভাব প্রকাশ করা যায়, জাপানী হাইকু তারই প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ দুটি হাইকুর অনুবাদ করেছিলেন, সে দুটি ছিল বাশোউ-এরই লেখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোথাও কবির নাম উল্লেখ করেননি। সেই তিনশত বছরের পুরোনো কবি, যাঁর কবিতায় আজও জাপানী পাঠকের হৃদয় আলোড়িত, এতদিনে বাঙালি পাঠকের কাছে পরিচিত হলেন নিজ নামে গৌরী ও ক্যোউকো নিওয়ার যৌথ অনুবাদের মাধ্যমে। অবশ্য এটাও তাঁর নিজনাম নয়, লেখনী নাম। একাধিকবার লেখনী নাম পরিবর্তন করে শেষ পর্যন্ত 'মাৎসুও বাশোউ' নামেই থেকে গেছেন।

দুটি পৃথক ভূমিকায় দুই লেখক প্রাসঙ্গিক নানা কথা লিখেছেন। বাশোউ-এর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখেছে গৌরী, তাঁর কাব্যিক তীর্থযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মরমী বর্ণনা দিয়েছে। হাইকু ও রেনকু সম্বন্ধে এবং বাশোউ সম্পর্কেও আরও বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ক্যোউকো নিওয়া।

ভূমিকায় গৌরী অনুবাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে বেশ সুচিন্তিত আলোচনা করেছে এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত হাইকু অনুবাদের একটু সমালোচনা করেছে। নিজেদের অনুবাদের পদ্ধতিটাও বিশ্লেষণ করেছে। জাপানী শব্দের উচ্চারণ বিষয়েও পাঠকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছু নির্দেশ দেওয়া আছে।

এবারে গৌরীর লেখা ছোটগল্প সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রেখে এ আলোচনা শেষ করব। অবশ্য বেশ কুশলী সমালোচনা ইতিপূর্বে একাধিক ব্যক্তি করেছেন গৌরীর ছোটগল্প নিয়ে ; তবুও দুচার কথা বলি। "তুচ্ছ কিছু সুখ দুঃখ" নামে গৌরীর একটি ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, তাছাড়া আরও খুচরো কিছু গল্প, নানা পত্রপত্রিকায়। সংকলন গ্রন্থটির কথাই বলি প্রথমে। গল্পলেখিকা হিসেবে গৌরীর পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শক্তি, দুটোই বেশ প্রবল। প্রকৃতির বর্ণনাতে যেমন, মানুষের আচরণও চরিত্র বর্ণনাতেও তেমনি, সে বেশ সাবলীল। সাধারণ মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের রোজকার জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প—গণ্ডীবদ্ধ জীবন, যেখানে বৈচিত্র্যের অবকাশ কম, সেই নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার চেনা সড়কে হঠাৎ এসে পড়ে অচেনা সুখ, অচেনা দুঃখ, যাদের সত্যিকারের প্রকৃতিটা চিনে নিতেও সাহস পায়না বাঁধাপথে চলা মানুষেরা, বিশেষ করে মেয়েরা। ওই সুখ দুঃখগুলিকে "তুচ্ছ" বলা হয়েছে আলঙ্কারিক অর্থে যা বলতে চেয়েছে গৌরী তা হল এই যে গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ওই সুখদুঃখগুলি অভিজ্ঞতাই স্মৃতির মধ্যে অমূল্য, অক্ষয় সম্পদ হয়ে টিকে থাকে। ভাসুরপো—কাকীমা, ভাসুর-ভ্রাতৃবধূ, বেয়াই-বেয়ান ইত্যাদি সাংসারিক স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের প্রান্ত-ছোঁয়া এক অপরিচিত সম্পর্কের আভাস এনে দিয়ে সেখানেই থামিয়ে দেয় গৌরী। গৌরীর পরিশীলিত রুচি এবং সংযতভাষা সত্ত্বেও খুব স্পষ্টভাবেই ধ্বনিত হতে থাকে সমাজবহির্ভূত ওই সম্পর্কের, ওই অনুভবের গভীরতর ব্যঞ্জনা। বিশেষ করে নারীমনের বঞ্চনাবোধ এবং বেদনা কয়েকটি গল্পে খুবই পরিস্ফুট। দায়, অঘটন, অসমান্তর, বেজোড় প্রভৃতি গল্পগুলি এই জাতের। "অতুলনীয়া" গল্পটি একটু অন্যরকমের। রূপে গুণে, শিল্পচর্চায়, মেধায় অসাধারণ এক মেয়ের আবেগ চালিত অকপট বহুচারিতার প্রকৃতিটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা আছে এই গল্পটিতে। এছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প "আমি চিনি গো চিনি"। এক প্রতিভাবান স্বামী এবং তাঁর অসামান্যা বিদেশিনী স্ত্রীর গল্প। স্বামীর বয়স স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি এবং সর্বদাই তিনি শরীর সম্পর্কহীন প্রেমের কাব্যিক বর্ণনা দিয়ে স্ত্রীকে মুগ্ধ করে রাখতেন এবং স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি একান্ত প্রেমে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন হাসিমুখে, স্বামীকে এরকমও বোঝবার অবকাশ দিয়েছিলেন যে তিনি নিজেই ফ্রিজিড। স্বামীর মৃত্যুর পরেও আজীবন স্বামীর প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে রেখেছিলেন এই বিদেশিনী, ওঁর মনে কি কখনও এমন সন্দেহ জাগেনি যে বৃদ্ধ স্বামী আসলে ছিলেন শারীর-মিলনে অক্ষম? এই প্রশ্নটি রেখেই গল্প শেষ হয়েছে, বিদেশিনীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে।

গৌরী একদিকে যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের চরিত্রগুলিকে, বিশেষত নারীচরিত্রগুলিকে নিয়ে গল্প লিখেছে, তেমনি আবার বস্তিবাসী মুসলমানদের, বিশেষ করে মেয়েদের জীবনযাত্রা নিয়ে তার কয়েকটি গল্প আছে। পার্কসার্কাস অঞ্চলের বস্তিবাসী দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের জীবন সম্পর্কে গৌরীর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়েরা বেশীরভাগই বাড়িতে বাড়িতে ঝি এর কাজ বা ওই ধরনের কাজ করে ; তাদের স্বামীরা হয়তো কারখানায় কিম্বা দর্জির কাজ করে। অনেকেই গ্রাম থেকে চলে এসেছে, আবার-আত্মীয় স্বজনেরা গ্রামে থাকায় গ্রামে যাওয়া আসাও আছে। গৌরীর কাছে এসে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে, নিজেদের সমস্যার কথা বলে, টাকা ধার নিয়ে যায়, ওষুধ নিয়ে যায়, ছেলেপুলেকে পড়াবার জন্যও পাঠিয়ে দেয় গৌরীর কাছে। এরাই তার গল্পের পাত্রপাত্রী। এদের কথা লিখবার আগে গৌরী মন দিয়ে এদের কথোপকথন শুনে এদের মুখের ভাষা খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেছে, ফলে গল্পগুলি খুব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। গরীব মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রা, সামাজিক সম্পর্ক, বিবাহপ্রথা এসব যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি বর্ণিত হয়েছে তাদের আচরণ, স্বভাবচরিত্র, কলহবিবাদ স্নেহ, সহানুভূতি এমন কি অবৈধ যৌনতাও। অসুস্থ ছেলের মুখের খাবার ছেলেকে না দিয়ে প্রণয়ীকে তুষ্ট করবার জন্য নিয়ে গেছে মা—যৌনতার এইরকম এক হৃদয়হীন চেহারাও খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে একটি গল্পে। "ত্রিযামা" এবং "চিরন্তনী"—এই দুটি গল্পই বস্তিবাসী দরিদ্র মুসলমানদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের ছবি খুব বাস্তবানুগভাবে তুলে ধরেছে। তাদের ঘর সংসারের বর্ণনা, তাদের একটু একটু উর্দু মেশানো আবার কিছুটা গ্রাম্যতা মেশানো মুখের ভাষা গল্পদুটিকে খুব জীবন্ত করে তুলেছে।

গৌরীর অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'জোহরা বিবির বড় মেয়ে', "তপারানীর জন্মান্তর" ইত্যাদি যথেষ্ট আকর্যক গল্প, তবে এগুলি সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তাছাড়া ওই গল্পগুলির মধ্যে খানিকটা প্রচারধর্মিতা আছে—ঠিক বিশুদ্ধ গল্প হয়তো বলা যাবেনা ওদের। "প্রীতির অপ্রীতিকর জীবন"ও তাই। সমাজ সেবিকা গৌরী সমাজের কতকগুলি সমস্যা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পাঠকদের।

একেবারে অন্যরকম স্বাদের দুটি গল্প হল "আত্মভুক" আর কবন্ধ। "আত্মভুক" গল্পটির উপজীব্য হল শৈশবকালের অবচেতন ডাইনির ভয়—অন্ধবিশ্বাস যে ভয়ের ভিত্তি। "কবন্ধ" গল্পটি একটি স্বপ্নকে অবলম্বন করে—এরই মূলে আছে অবচেতন ভয়—শৈশবের নয়, কৈশোরের ভয়—ভয়টা সম্ভবত যৌন আক্রমণের, দুটি গল্পে যে দুই ধরনের ভয়ের গল্প আছে তা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করে গৌরী একটা গা ছমছম পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। দুটি গল্পেরই শেষে একটা মনোবৈজ্ঞানিক আত্মসমীক্ষণ আছে—"আত্মভুক্" গল্পে অস্পষ্টভাবে, কবন্ধ গল্পে খুব স্পষ্টভাবে।

গৌরীর লেখা সম্পর্কে আলোচনার এখানেই সমাপ্তি। নানাস্বাদের লেখার মধ্যে দিয়ে তার লেখক-সত্তার যে সমগ্র রূপটি ফুটে উঠেছে। তারই একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করলাম আমার এই লেখায়। বাকিটা রইলো সমঝ্‌দার পাঠকদের জন্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুলেখকের কথা

১৯৮২ সালের ২১ ডিসেম্বর আবু সয়ীদ আইয়ুব চলে যাওয়ার পর গৌরীদি বেশ একা হয়ে গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল আইয়ুবের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখবেন। কিন্তু হাজার রকম সামাজিক দায়িত্ব ও জীবিকার তাগিদে নিজস্ব সময় খুব কমই পেতেন। অবসর নেওয়ার পর যখন সময় পেলেন তখন অসুস্থতা বেড়ে গেল।

সন্তান জন্মের পর থেকেই তিনি রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বাবারও এই রোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে এই রোগে গৌরীদি খুব কষ্ট পেয়েছেন। মাঝে মাঝে লাঠিরও ব্যবহার করতেন। ১৯৯৭ সালের শুরু থেকে সেই কষ্ট বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিক ভাবে।

অসুস্থতা এতই বেড়ে গেল, নিজে হাতে লেখার কাজ.করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন আর কোনও উপায় না থাকায় অনুলেখক হিসেবে তাঁর ডিক্টেশনে লেখা শুরু করলাম 'আমাদের দু'জনের কথা'।

আমার জীবনের এক মহামূল্যবান সম্পদ এই স্মৃতিকথাটি রচনা করার অভিজ্ঞতা। একটি ঘটনার পেছনে আরও কত ঘটনা, একই ব্যক্তিচরিত্রের আরও কত বিচিত্র রূপ, একটি স্মৃতি ছুঁয়ে কত নানা রঙের স্মৃতির পথে তিনি যেভাবে আমাকে হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন, সারা জীবনেও তা ভুলবার নয়। হয়তো কোনওদিন আমার এই অনুলেখক-পর্বের অভিজ্ঞতা দিয়েই রচনা করতে পারি এক বিস্ময়কর অনুভূতিমালার পুনর্নির্মাণের রূপকথাময় ইতিবৃত্ত।

তিনি মুখে বলে যেতেন, লংহ্যান্ডে আমি লিখে যেতাম। বার বার পড়ে শোনাতে বলতেন। সব সময় পরিমার্জনা চলত। চিরকাল নিজের লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে এবং বার বার পরিমার্জনায় ও পুনর্লিখনে নিরন্তর পরিশ্রমী। এভাবে মুখে বলে নির্দেশ দিয়ে মনের মতো কাজটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর কতখানি মানসিক পরিশ্রম হত, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি সাধারণত রাত্রে চেম্বার শেষ করে তাঁর কাছে যেতাম। তিনি অপেক্ষায় শুয়ে থাকতেন, কখন আমি যাব, কাজ শুরু হবে। সকলকে বলতেন, 'কামাল যতক্ষণ থাকে, আমি রোগের যন্ত্রণা সব তখন ভুলে যাই। কী ভাবে যে এই দু-তিন ঘণ্টা সময় কেটে যায় বুঝতেই পারি না।' আসলে তাঁর যাপিত জীবনের মাধুর্য এতটাই বেশি ছিল যে সেই জীবনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্মৃতিচারণেও তিনি অনাবিল আনন্দে ডুবে যেতেন। ফলে সেসময় নিজের রোগযন্ত্রণার কথা তাঁর মনেই থাকত না।

মূল শ্রুতিলিখিত পাণ্ডুলিপি তাঁর মনের মত করে পরিমার্জনার কাজ এতদিনে শেষ করতে পারলাম। আমাকে যাঁরা নিয়মিত এই মূল্যবান দায়িত্ব পালনে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র শ্রীপূষন্ আইয়ুব এবং ভাসুর ডাঃ এ.এম. ও. গানির নাতনি শ্রীমতী রীনা মমতাজের নাম অবশ্যই করতে হয়।

১৯৯৮ সালের ১৩ জুলাই ভোর ৪-৫৫ মিনিটে তিনি চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে শেষ দুটি ঘণ্টা তাঁর বিছানার পাশে বসে ছিলাম আমি আর ছোট বোন মনীষাদি। মৃত্যু কত শান্ত, সুন্দর ও ধীরগতিতে মানুষের অস্তিত্বকে মহাশূন্যতার অন্ধকারে বিলীন করে দেয়, এ দুর্লভ ঘটনার সাক্ষী থাকাও এক বিরল অভিজ্ঞতা।

৬.১২.২০০০ কামাল হোসেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দুজনের কথা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জবাবদিহি

১৯৮২-র ২১ ডিসেম্বর আইয়ুব চলে গিয়েছেন। পনের বছর হতে চলেছে। এই পনের বছরে বহুবার তাঁর কথা লিখবার তাগিদ ভিতর থেকেই অনুভব করেছি। বন্ধুরাও উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে আমার নিজের কথা লিখতেও বলছিলেন। নিজের কথাটা স্থগিত রেখে ওঁর কথাই লিখবার চেষ্টা, এই পনের বছরে অন্তত দশ বার করেছি। কিন্তু একবারও মনের মতো হয়নি। জীবনী লিখবার মতো যথেষ্ট মালমশলা এবং ঐতিহাসিক চেতনা আমার নেই। তাছাড়া আমার স্মৃতিশক্তিও খুব নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রথম দিকে মনে হত ওঁর কথা লিখতে বসে শোকের উচ্ছ্বাস প্রায় বুঝি বা অশোভন হয়ে উঠছে। একজন স্ত্রী সদ্য প্রয়াত স্বামী সম্বন্ধে কতখানি নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে? অথচ শোকের আবেগে নিজেকে হাস্যাস্পদ করতে ইচ্ছা ছিল না।

আর একটা ভয় আগাগোড়া আমার মনকে বিব্রত করে রেখেছে। তাঁর কথা বলতে গিয়ে নিজেকেই জাহির করে চলেছি কি? দু'জন যে আমরা একেবারেই সমস্তরের মানুষ নই, একথা আমার চেয়ে আর কে বেশি করে জানে?

ওঁর কথা লিখতে বসে হার মেনে শেষ কালে নিজের কথাই লিখতে শুরু করলাম, প্রধানত কামালের উৎসাহে। কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমার জীবনের বত্রিশটি বছর বাদ দিলে নিজের কথা কীই বা থাকে বলার? এমনকি প্রথম দিককার কথাগুলি লিখতে বসেই মনে হল, সে যেন পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তুতি। এই পরবর্তী অধ্যায়টিই আমার সার্থক জীবন-যাপন। তাই শুধু নিজের কথা বলতে গিয়ে দেখলাম, সে বড় অকিঞ্চিৎকর।

অবশেষে ঠিক করলাম দু'জনের কথাই লিখব। যাঁরা অনুকম্পাসম্পন্ন বন্ধু তাঁদের উৎসাহে মাঝে মাঝে হয়ত নিজের সীমানা অতিক্রম করে ফেলব, তবু তার জন্য পাঠকের কাছ থেকেও কিছুটা প্রশ্রয় প্রত্যাশা করছি। অনুলেখক কামাল হোসেনের ধৈর্য ও উৎসাহ ছাড়া এই লেখাটি সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। তাকে আমি সব সময় আশীর্বাদ জানাই।

গৌরী আইয়ুব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তিনিকেতনের দিনগুলি

শতাব্দীর মধ্যাহ্নে, ১৯৫০-এর ঠিক মাঝামাঝি আমার একটা জন্মান্তর ঘটে। তখন আমার বয়স উনিশ। তার আগে পর্যন্ত কেটেছে জন্মস্থান পাটনায়। সেখান থেকে উৎখাত হয়ে আর কোথাও ছিটকে পড়ব তা কখনও ভাবিনি। শেষ ছ'টা মাস উদ্বেগে অশান্তিতে অনিশ্চয়তায় দীর্ণ ছিলাম। তারপর একদিন বিকেলে আমার ছোটভাই বিজুকে সঙ্গী করে বোলপুরের ট্রেন ধরলাম।

পরদিন ভোরে বোলপুর পৌঁছে ডাক বাংলোর মাঠের প্রান্তে একটি গৃহে আতিথ্য লাভ করলাম। তখনই মনে হল এ এক নতুন পৃথিবী। দোতলা মাঠকোঠাটি ভারি অভিনব লাগল। তখনও ডাকবাংলোর মাঠের এক প্রান্তে অল্প একটু শাল বন ছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সেই বাড়ির কন্যা আমার পূর্বপরিচিতা বান্ধবী আর পাঠভবনের প্রাক্তনী, গীতা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে তার সাইকেলে চলল। দেখে চমৎকৃত হলাম। একটা রিকশায় আমি আর বিজু পিছন পিছন শান্তিনিকেতন পৌঁছলাম। দিনের শেষ বেলায় শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমার সমস্ত মন প্রাণকে অভিভূত করেছিল।

শ্রীপল্লীতে লাল বাঁধের ধারে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের গৃহ ছিল আমার প্রথম গন্তব্য। হাতে ছিল আমার পিতার একটি চিঠি। তাঁর সঙ্গে আমাদের একটু আত্মীয়তাও ছিল। পরে তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অধ্যাপক হয়েছিলেন। যেমন সুন্দর লেগেছিল শান্তিনিকেতন, তেমনই সুন্দর ছিল এই ছান্দসিক অধ্যাপকের সংসারটি। সেদিন দেখা তাঁর সুন্দরী হাস্যমুখী গৃহিণীটির সেই ছবি আজও অমলিন হয়ে আছে পরবর্তী বহু করুণ স্মৃতিকে ছাপিয়ে।

ঠিক হল পরদিন সকালেই আমি শিক্ষাভবনে এসে ভর্তি হব। অধ্যাপকের অন্যতমা ছাত্রী আরতি সেনকে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার দায়িত্ব তিনি দিয়ে দিলেন। তখন গীতার সঙ্গে বোলপুরে তাদের বাড়িতে ফিরে এলাম।

সেদিন রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। পরদিন সকালে যখন শান্তিনিকেতনে রাঙা মাটির পথে পাদুকাহীন পা রাখলাম, তখন এক এক জায়গায় রক্ত চন্দনের মতো নরম কাদা ছিল। আগের দিন লক্ষ্য করেছিলাম প্রায় সবাই শুধু পায়ে হাঁটা-চলা করছে। শালবীথি ধরে পথের পূর্ব প্রান্তে দ্বারিক বাড়িতে পৌঁছলাম। সেখানে তখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাভবনের আপিস ছিল। সেই প্রাচীন সুন্দর বাড়িটিকে শান্তিনিকেতনের মানচিত্র থেকে লুপ্ত করা হয়ে গিয়েছে। তখন আপিস সামলাচ্ছিলেন একটিমাত্র ব্যক্তি। ভুজঙ্গদা চট করে ভর্তি হবার ফর্ম বার করে দিলেন তাতে নাম-ধাম সব লিখে Religion এর জায়গায় একটা কাটাকুটি দিয়ে রাখলাম। ভুজঙ্গদা এতক্ষণ হাসি মুখেই কথা বলছিলেন। এবার একটু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এ আবার কী হল?' আমি সামান্য জাঁক করেই বললাম, 'আমি তো চিরকাল এইরকম লিখে এসেছি। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্মেও Religion কিছু লিখিনি তো।' উনি আর কথা বাড়ালেন না। মৃদুস্বরে শুধু স্বগত মন্তব্য করলেন, 'এখনকার ছেলেমেয়েদের যত্ত সব...।' সেখানেই শ্রীভবনেও ভর্তি হবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আবার শালবীথি ধরে আরতিদির পায়ে পায়ে এসে শ্রীভবনে পৌঁছলাম। দোতলায় ছ'জনের একটি ঘরে আমার জন্য একটি শয্যা নির্দিষ্ট হল। ওই ঘরের সামনে চওড়া ঢাকা বারান্দাটির অনেকখানি বোগন ভিলিয়ার লতায় আড়াল করা ছিল। ওই বারান্দায় মাত্র ছ'মাস হস্টেল বাসের কত সুখের স্মৃতি কত মধুর বেদনার কথা সখীদের সঙ্গে কত বিশ্রম্ভালাপ মনে পড়ছে। অতি সহজেই শান্তিনিকেতনে প্রবেশাধিকার পেলাম। সেদিন শান্তিনিকেতন আমার জীবনে কী মহা সমারোহে প্রবেশ করেছিল, তার সবটুকু বলার সাধ্য আমার নেই। সেদিনই যেন আমার সবখানি সত্তা জুড়ে এক মহোৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।

*** ***

তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর হে সুন্দর॥

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে আমাদের ক্লাস শুরু হল। জেনারেল কিচেনে প্রাতরাশ শেষ করে দ্রুত পায়ে লাইব্রেরির সামনে এসে দাঁড়াতাম আমরা। বৈতালিক শুরু হত। প্রত্যেকটি ভবন পালা করে গানের দায়িত্ব নিত।

পিতানো হ'সি, পিতানোবোধি...সমস্বরে উচ্চারণ করার পরে গান গেয়ে বৈতালিক শেষ হত। যে যার ক্লাসের দিকে চলে যেতাম। তখনো বেশিরভাগ ক্লাস, তা স্কুলের হোক বা কলেজের, গাছতলাতেই হত। আম্রকুঞ্জ এবং গৌর প্রাঙ্গণের অধিকাংশ গাছতলা ছিল পাঠভবনের দখলে। গুটিকয়েক শিক্ষা ভবনের ভাগেও পড়ত। অবশ্য শিক্ষাভবনের বিজ্ঞান ক্লাসের জন্য তখনই প্রশস্ত কক্ষ তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল।

আমরা, ফিলসফি অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরির পাশেই একটা বকুল গাছের তলা পেয়ে গেলাম। সাইকোলজি, মেটাফিজিক্স ক্লাসগুলি হত পূর্বাহ্নে। অপরাহ্নে অধ্যাপক ডঃ ভেঙ্কটরামন ভারতীয় দর্শনের ক্লাস নিতেন। প্রবাসজীবনদা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পড়াতেন, সেও অপরাহ্ণেই। এথিক্‌স ক্লাস শুরু হতে ক'দিন দেরী হয়েছিল মনে আছে। তবে দিন কয়েকের মধ্যেই জানা গেল আবু সয়ীদ আইয়ুব নামে একজন নতুন অধ্যাপক আমাদের এথিক্‌স ক্লাস নেবেন পূর্বাহ্ণেই।

প্রথম যেদিন এথিক্‌স ক্লাস হয়, সেদিন বৈতালিক ভাঙবার পরে অধ্যাপকদের মধ্য থেকে একজন নতুন ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সতীর্থ পূরবী দত্ত। আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্তর কন্যা। সেদিন বৃষ্টি পড়ে চারদিকটা ভেজা ভেজা ছিল। তাই গাছতলায় না বসে পূরবী তার অসাধারণ ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে চলল দ্বারিক ভবনের দিকে। তাকে অনুসরণ করে ধুতি পাঞ্জাবি ও কালো জবাহের জ্যাকেট পরিহিত যে মানুষটি ছাতায় ভর করে মৃদু গতিতে সাবধানে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিলাম, এই কি আবু সয়ীদ আইয়ুব! আমি তখনও পর্যন্ত কোনো মুসলমানকে ধুতি পরতে দেখিনি। আমি ধরেই নিয়েছিলাম শেরওয়ানী পাজামা ফেজ পরিহিত একটি অধ্যাপককে দেখতে পাব এবং মুখে যাঁর সুগন্ধি পান। সেদিন দ্বারিকের দোতলার অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন অন্য কয়েকজন অধ্যাপক। আমরাও একতলার এক পাশে একটু জায়গা পেলাম। সবাই যে যার আসন পেতে বসতে গিয়ে দেখা গেল অধ্যাপকের হাতে কোনো আসন নেই। তিনি বিব্রত মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তাঁকে আমার আসনটি দিয়ে আমি মাধবীর আসনের এক অংশে স্থান পেলাম। উনি আসনটি পেতে সসঙ্কোচে বসলেন এক পাশে দুটি পা মুড়ে। ওই ভঙ্গিতে পুরুষরা সাধারণত বসেন না। অবশ্য গান্ধীজীর একটি বিখ্যাত ছবিতে দেখা যেত যে তিনি ওই ভঙ্গীতে পা মুড়ে সভামঞ্চে উপবিষ্ট। আমাদের অধ্যাপকের বসার এ ভঙ্গীটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল মনে হয়।

আমাদের আলাপ পরিচয়ের পালা শুরু হল। কে কোথা থেকে এসেছি, কেন ফিলসফি পড়ার কথা ভেবেছি...এইসব আর কি। বিশেষ করে কৌতূহল সৃষ্টি করল আমাদের রাজস্থানী বন্ধু সোমনাথ সটক। সে বলতে চাইছিল, জাতে ওরা বাজাজ, বাবার কাপড়ের ব্যবসা চালাতে তার একেবারেই ভাল লাগে না। তাই তার মনে হয়েছে শান্তিনিকেতনে এসে দর্শন পাঠ করলে তার মন হয়ত তৃপ্তি পাবে। কিন্তু এই কথা কটি বলতে সে ঘেমে নেয়ে উঠল। কারণ সে ছিল ভীষণ তোতলা। মোটা চশমার পিছন থেকে বড় বড় চোখে অধ্যাপক আমাদের সব ক'জনার মুখ দুয়েকবার দেখে নিলেন। কারুর মুখে আর বিদ্রুপ হাস্যের লেশমাত্র রইল না। অধ্যাপক ধৈর্য ধরে তার উত্তরটি বার করে আনতে সাহায্য করতে থাকলেন।

পাঠ্য বিষয়ে নিজের বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বললেন, তোমরা হয়ত ভারতীয় দর্শন চিন্তার সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হয়েছ, তাই ভারতীয় দর্শন ভাবনা দিয়েই শুরু করা যাক। এই প্রসঙ্গে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রসঙ্গ তুললেন। সংস্কৃত শব্দ তিনটি বিশেষ করে নিদিধ্যাসন শব্দটি যেন একটু সযত্ন প্রয়াসে শুদ্ধ উচ্চারণ করলেন। গুরুর মুখ থেকে পাওয়া জ্ঞান কী করে এইভাবে তিনটি পর্যায়ের সাহায্যে শিষ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্তীকরণ করতেন সেকথাই ব্যাখ্যা করে বললেন, শ্রুতি স্মৃতি আবৃত্তি ও মননের সযত্ন চর্চায় জ্ঞানের পরম্পরা সুরক্ষিত হত।

এরপর নীতি শাস্ত্রের পাঠ শুরু হল সাধারণ আলাপচারীর ভঙ্গিতে। কোন কাজটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক তার বিচার আমরা কী করে করি? আমাদের মনে কী উদ্দেশ্য আছে তাই দিয়ে? নাকি ওই কাজের কী ফল দাঁড়াল তাই দিয়ে? পড়াশুনোয় ব্যস্ত কোনো বাবুমশাইয়ের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে যে ভিক্ষুক তাঁকে ভিক্ষার জন্য ঘ্যানঘ্যান ক'রে বিরক্ত করছিল, তাকে যদি উনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর রুপোর দোয়াতদানটি ছুঁড়ে মারেন এবং বাবু যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন তাহলে ভিক্ষুকটি নিশ্চয়ই রুপোর দোয়াত দানিটি কুড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত উপকৃত হবে। তাহলে কি বাবুমশাইয়ের কাজটি নৈতিক হল?

এই নিয়ে দশবারোজন মিলে বেশ কথাবার্তা আলোচনা জমে উঠেছিল। ঘণ্টা পড়ার পরেও বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলল। সেদিনকার পাঠ শেষ হলে অধ্যাপক আবার বিব্রতভাবে বললেন আমি তো রেজিস্টার নিয়ে আসিনি। তোমাদের নামগুলো একটু লিখে দেবে। তখন আমি খাতার শেষ পৃষ্ঠা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে সব ক'জনের নাম লিখে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি একপলক দেখে ভাঁজ করে সেটি তাঁর জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিলেন। অনেকদিন পরে সেই পকেট থেকে সেই কাগজখানি বার করে হাসতে হাসতে আমাকে দেখিয়ে ছিলেন।

সবাই উঠে পড়লে আমি আমার আসনটি ফেরত পেলাম। সেটি শ্রীনিকেতনের তাঁতে বোনা আসন ছিল না। গীতার পরামর্শে আমার মা তাঁর হাতে বোনা একটি কার্পেটের আসন আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আসনটি ফেরত দিতে দিতে অধ্যাপক বলেছিলেন, 'এটি নিশ্চয়ই কিনতে পাওয়া যায় না।' অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে জেনে নিয়ে শ্রীনিকেতনে বোনা একটি আসন কেনার জন্য শিল্পসদন দোকানটির দিকে চলে গেলেন।

আবু সয়ীদ আইয়ুব নামটি আমি আগে কখনও শুনিনি। এমনকি যেসব মুসলমানী নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, ঠিক সেগুলির মতনও নয় এই নামটি। কিন্তু দেখা গেল পুণ্যশ্লোক, অনীশ, নারায়ণ চক্রবর্তীরা শুধু যে নামটির সঙ্গে পরিচিত তাই নয় তাঁর লেখার সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে আবার 'পরিচয়' পত্রিকার নাম শুনলাম। তখন মনে পড়ল পাটনার ক্লাসফ্রেন্ড চয়নিকা বলেছিল, "পরিচয় পত্রিকা রাখা হয় না এমন শিক্ষিত বাড়ি আছে নাকি?" আমাদের বাড়িতে রাখা হত না, মাত্র দেশ আর প্রবাসী পর্যন্ত দৌড়। তাই চুপ হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আবু সয়ীদ আইয়ুবদের 'পরিচয়' আর চয়নিকা পীযূষদাদের 'পরিচয়' যে একই নয় সে কথা জানতে আরো কয়েক মাস লেগেছিল।

শোনা গেল আবু সয়ীদ আইয়ুব মশাই নাকি বাংলা ভাষাতেই কঠিন দুর্বোধ্য সব প্রবন্ধ লেখেন। যদিও তাঁর মাতৃভাষা ছিল উর্দু।

তখন থেকে যথারীতি ক্লাস চলতে থাকল। অনেকগুলি ক্লাসই খুব ভালো লাগত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইংরেজির দু'জন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সুনীলচন্দ্র সরকার খুব ভিন্ন ধরনের মানুষ ছিলেন, তাঁদের বাচনভঙ্গি এবং ভাবনাচিন্তার জগৎ ছিল অত্যন্ত স্বতন্ত্র রকমের। কিন্তু দু'জনের পাঠনই আমি খুব উপভোগ করতাম। বাংলা পড়তাম ছান্দসিক অধ্যাপকের কাছে। সংস্কৃত পড়বার জন্য যেতাম নগেনদা ও সুখময় পণ্ডিত মশায়ের কাছে। 'শকুন্তলা' নাটক পড়াতেন অধ্যাপক কুঞ্জবিহারী দাস। বিশালকায় পুরুষ কুঞ্জদার অঙ্গভঙ্গিতে ওই নাটকের ব্যাখ্যায় এক বিচিত্র হাস্যরসের সৃষ্টি হত।

এমন করেই চলছিল। এথিক্সের অধ্যাপক মশাইকে সপ্তাহে বার দুয়েক পাওয়া যেত। এবং তিনি অবশ্যই শ্রীনিকেতনের তাঁতে বোনা একটি নতুন আসন হাতে নিয়ে আসতেন। কিন্তু ঘণ্টা পড়লে আসনটি কোনো রকমে তুলে ভাঁজ না করেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে (তখন অস্থায়ীভাবে টাটা ভবনের দিকে) লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতেন। ভদ্রলোকের এই আচরণের ব্যাখ্যা কিছুকাল পরে জানা গেল। তিনি ক্লাসে আসার আগে কিছু খেয়ে আসার সময় পেতেন না। ক্লাস করতে করতে এত খিদে পেত যে তখন আর সৌজন্য প্রকাশের ধৈর্য থাকত না।

এর অল্পদিন পরেই এল ২২শে শ্রাবণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ উৎসব এবং সপ্তাহ ব্যাপী সান্ধ্য সভা। বৃক্ষরোপণের মূল উৎসবটা হয়েছিল মেলার মাঠে। তখনকার মেলার মাঠ ছিল উত্তরায়ণের সামনের একফালি জমি যার পুব দিকটা গোয়ালপাড়ার পথ দিয়ে ঘেরা। সেদিন আমরা শ্রীভবনে হলুদ রঙে ছুপিয়ে দেওয়া সবুজ পাড় শাড়ি পরে দলে দলে মেলার মাঠে অপরাহ্নে পৌঁছে গিয়েছিলাম। একটা উঁচু মঞ্চের উপরে পঞ্চভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম যথাযোগ্য সাজসজ্জা করে তাদের আশীর্বাদ বর্ষণ করতে শুরু করেছিল একটি বৃক্ষশিশুকে। সেটিকে মহাসমারোহে রোপণ করা হচ্ছিল। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে মেলার মাঠের মধ্যে বসে সে সব দেখছিলাম।

হঠাৎ ডানদিকে ছ'সাতজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করে দুটি পা দেখতে পেলাম। নতুন ধরনের বকলস আঁটা কাবলী জুতো পরা। সামনের দিকটা পাটির মতো করে বোনা ছিল। জুতো পরা পায়ের ওপরে ধুতির কোঁচা এসে পড়েছিল। পরমুহূর্তেই লক্ষ্য করেছিলাম আমাদের দর্শনের অধ্যাপকই পাশে ছাতা রেখে বসে বসে দেখছেন। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মৃদু হেসেছিলেন।

এরপর সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য অনুষ্ঠান ছিল সিংহসদনে। সিংহসদনের মেঝের উপরই সতরঞ্চি বিছিয়ে সামনে নিচু ডেস্ক নিয়ে সভাপতি বসতেন। তাঁর আশে পাশে অনুষ্ঠানে গান বা পাঠে যোগ দেবার জন্য ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা বসতেন। এবং তাঁদের ঘিরে মুখোমুখি বসতেন শ্রোতারা। আর সিংহসদনের মঞ্চের উপরেও সতরঞ্চির উপর বহু বিশিষ্ট অতিথি বসতেন। একদিন আমাকে হিন্দি ভবনের অধ্যক্ষ বাজপেয়ীজী রবীন্দ্রনাথের একটি লেখার হিন্দি অনুবাদের কিছু অংশ পাঠ করতে দিয়েছিলেন। ওই পাঠ্য অংশটুকু বাজপেয়ীজীর বই থেকে লিখে নেওয়ার পরে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমহারে অক্ষর তো বড়ে সুন্দর হ্যায়।' শুনে আমি গর্বে বেশ স্ফীত হয়েছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেদিন আমাদের পূরবী আর বাদলদা যে গানটি গেয়েছিল তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে—

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর, হে গম্ভীর
*** ***
দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা
*** ***

গান, পাঠ, বক্তৃতা ইত্যাদি যথারীতি চলছিল। হঠাৎ যেন চুম্বকের আকর্ষণে সিংহসদনের মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই দিনেই বোধ হয় বিচিত্র একটা অনুভূতি মনে শিহরণ জাগিয়েছিল। সেইদিনের অনুষ্ঠানের পরে আমার এক বান্ধবী এসে জানিয়েছিল যে, আমাদের বিবিদি (ইন্দিরা দেবী) নাকি ওদের বলেছেন, 'ওই যে হিন্দি পড়ছিল, ওই সাদা থান পরা নতুন মেয়েটা কে? এ কী পোশাক? কেউ তো তাকে সভায় বেনারসী পরে আসতে বলেনি, তাই বলে একেবারে থান পরে আসবে!' ওই সময় মাঝে মাঝে পাড়হীন মলমলের থান পরে মাথায় সাদা মালতী ফুল গুঁজে আমার মনে হত যেন বিশেষ রকমের সাজসজ্জা করা হল।

এরপর প্রায়ই আমি আর মাধবী গোয়ালপাড়ার পথ ধরে বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় টাটা ভবনের সামনে আমাদের অধ্যাপককে একাকী বসে থাকতে দেখতাম। তখনও টাটাভবনের সামনে বিশেষ কিছু গাছপালা ছিল না। ভবনে প্রবেশপথে দু'পাশে কিছু আমলকী, বকুল, কদম জাতীয় গাছ লাগানো হয়েছিল। চারদিকটা সিমেন্টের বেদী দিয়ে ঘিরে। তারই একটি বেদীর উপর তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন। অন্ধকার নেমে এলে যখন ফিরে আসতাম, তখন আর তাঁকে দেখতে পেতাম না। কিছুদিন পরে উনি বলেছিলেন, যে আমাদের ফেরাটা উনি টের পেতেন একজন বান্ধবীর উচ্চ কলহাস্যে। অন্যজনের মুখের স্মিত হাসিটি কিন্তু দেখতে পাওয়া যেত না। বলেছিলেন, তোমাদের একজনের হাসি শুনবার মতো, আর একজনেরটা দেখবার মতো।

সন্ধ্যায় ওই উপবিষ্ট অধ্যাপককে দেখে কখনও বা একটু হাস্য বিনিময় করে ওই পথে সান্ধ্য ভ্রমণে যাওয়ার উৎসাহ আমাদের খুব বেড়ে গিয়েছিল। তারপর সাহস এতটা বেড়ে গেল যে আমরা ভকত ভাইয়ের দোকান থেকে কয়েকটা ললিপপ এবং টফি কিনে ব্রাউন পেপারের মোড়কটি দ্রুত পায়ে এসে অধ্যাপকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোয়াল পাড়ার পথে তেমনই দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়েছিলাম। মাধবী শুধু বলে গিয়েছিল, 'একা একা বসে থাকেন, তাই সময় কাটানোর জন্য।'

পরে আইয়ুব মন্তব্য করেছিলেন, 'তখনও বুঝতে পারছিলাম না আসলে কার আগ্রহ বেশি এবং কে কাকে সাহস যোগাচ্ছে?'

যে প্রাচীন তপোবনের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছিলেন, তাতে বর্ষাকালটা ছিল অনধ্যায়। কিন্তু আমাদের শিক্ষাভবন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুটিন মাফিক চলত। সব বিভাগেই গরমের ছুটির পর জুলাইমাসে অর্থাৎ আষাঢ়ের মাঝামাঝি পুরোদমে ক্লাশ শুরু হয়ে যেত। কিন্তু বর্ষা তো তাই বলে রেহাই দেবে না। একদিন বৈতালিকের সময় থেকেই বেশ রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন অধ্যাপক ও শিক্ষকরা ছাতা মাথায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ছুটি দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিংহসদনের ঘণ্টা সেটি ঘোষণা করে দিতেই ছেলেমেয়েরা আনন্দে নেচে উঠল। পাঠভবনের বড় ছেলেমেয়েরাই ধুয়ো তুলল যে আজকে বেড়াতে যেতেই হবে। শিক্ষাভবনেরও অনেকেই তাতে সোৎসাহে যোগ দিল। কিন্তু কোনো একজন মাষ্টারমশাইকে সঙ্গী হতে রাজি করতে না পারলে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে না। তখন পাঠভবনের নবাগত একজন মাষ্টারমশাইকে ছেলেমেয়েরা ধরে পড়ল। লাজুক বিব্রত হাসি হেসে উনি তাঁর ধুতির কোঁচাটি সামলাতে সামলাতে বললেন, 'ওরে বাবা, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না।'

কিন্তু পারব না বললে কী আর ওই দামাল ছেলেমেয়েরা শোনে? বেচারিকে যেতেই হল।

তারপর আমাদের মাতন দেখে কে! যে কটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় পাচ্ছিল তাদের হাতে আমাদের বই আসন সব গছিয়ে দিয়ে আমরা শালবীথি ধরে পূর্বপল্লীর দিকে দৌড় লাগালাম। পূর্বপল্লী তখন চোরকাঁটায় ছাওয়া রুক্ষ মাঠ। এখানে সেখানে বুনো কুলের ঝোপ। আর বেঁটেখাটো বাচ্চা খেজুর গাছ যাতে সোনালী ফুলের গুচ্ছ ঝলমল করত। ওই রকম একটা গাছকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমাদের দামোদর রেড্ডি ভাঙাচোরা ভাষায় বলল, 'Look. look at the পাকামি of the tree'। ও যে ততদিনে 'পাকামি' শব্দটা শিখেছে, তাতেই তো আমরা অবাক।

পূর্বপল্লীতে তখন দূরে দূরে চার পাঁচটি মাত্র বাড়ি ছিল। আমরা পায়ে চলা পথকেও অগ্রাহ্য করে চোরকাঁটার উপর দিয়ে পূর্ব মুখে ছুটতে শুরু করেছিলাম। রেল লাইনের ধারে পৌঁছে একটুখানি ইতস্তত করেছিলাম, কারণ ওখানটা ঢালু জমি বেয়ে নেমে অনেকটা নিচে রেললাইন পার হয়ে আবার অমনি করে ঢাল বেয়ে উঠতে হত পারুলডাঙ্গার মাঠে পৌঁছবার জন্য। ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে সাধারণত কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু সেদিন বৃষ্টিতে মাটি পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। তাও ধরাধরি ঠেলাঠেলি করতে করতে আমরা পারুলডাঙ্গায় গিয়ে পৌঁছে গেলাম। কী ভাগ্য, তখন বোলপুর কী আমেদপুরের দিক থেকে কোনো ট্রেন এসে পড়েনি। অবশ্য ট্রেন এলে ওই খাদের মধ্যে অনেক দূর থেকে একটা বুম্ বুম্ শব্দ শোনা যেত। আমাদের পায়ের তলায় পারুলডাঙ্গা, তালতোড় সব দ্রুত সরে যাচ্ছিল। আমার তো সেদিনই সেগুলি প্রথম দেখা। মাঠ, ঘাট, খেত, খেতের আল ধরে শুধু পায়ে ছুটতে ছুটতে এক সময় আমরা কোপাই নদীর ধারে পৌঁছে গেলাম। সেদিন শীর্ণ কোপাইয়ে ঢল নেমেছিল। গেরুয়া জল কলকল করতে করতে ছুটে যাচ্ছিল। ছাত্রছাত্রীদের কাছে উৎসাহ পেয়ে নবাগত মাষ্টারমশাইও কোঁচাটোচা সুদ্ধ জলে নেমে পড়েছিলেন। আমরাও সেই ঘোলা জল হাসতে হাসতে পার হয়ে এলাম। জল আমাদের কোমর পর্যন্ত ছিল বটে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কী তার ধার। ভয়ে ভয়ে আমরা একে অপরের হাত জড়িয়ে ধরছিলাম। ওপারে পৌঁছে সবাই খোলা মাঠের উপর ক্লান্ত হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। আরও অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমাদের সবারই বসন তখন অর্ধেকটা গেরুয়ারঙে ছোপানো। বীরভূমের বৈরাগ্যের ছোঁয়া কখনও অবশ্য আমাদের মনে লাগেনি। হৈ হৈ করে গান গেয়ে নানারকম খেলা খেলে আর বুনো কুল খেয়ে কারোরই আর সময়ের জ্ঞান ছিল না।

হঠাৎ একজন তার ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন যদি না ফেরো তাহলে কিচেনে লাস্ট ব্যাচেও খাওয়া ছুটবে না।'

তখন সবাই আবার হুড়মুড় করে ফিরতি পথে ছুট লাগালাম। 'আমাদের শান্তিনিকেতন সব হতে আপন' গাইতে গাইতে কিচেনে পৌঁছে দেখি, এতগুলো ছেলেমেয়ে বিনা নোটিশে অনুপস্থিত দেখে কিচেন ম্যানেজার রবিদা খুব চিন্তায় পড়েছিলেন। কোনো খবর না দিয়ে কোথায় এরা উধাও হল?

কর্দমাক্ত ঘর্মাক্ত মূর্তিগুলিকে ফিরে আসতে দেখে তিনি সস্নেহে তাড়া দিয়ে বললেন, 'যাও যাও সব বসে পড় গে। আমি তো এখনই রান্নাঘর বন্ধ করে দিতে বলছিলাম।'

সেই দিনে শান্তিনিকেতনের যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তাতে বুঝতে পেরেছিলাম পৃথিবীর আর কোথাও এই রকম স্কুল কলেজ বোধহয় পাওয়া যাবে না।

শান্তিনিকেতনের জীবনে যে আমাকে প্রায় হাত ধরে প্রবেশ করিয়েছিল সে ওই মাধবী। এক বুধবারে সে বলল, 'চলো, আমার কাকার বাড়িতে নিয়ে যাই।'

মন্দিরের উপাসনা শেষ হলে আমরা সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি নিয়ে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে শ্রীনিকেতন গিয়েছিলাম। সেখানে লোকশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মাধবীর বড় প্রিয় 'কাকাবাবু'। তিনি কলাভবনের প্রাক্তনী ছিলেন, কবি এবং শিশুসাহিত্যিক হিসেবে কিছু খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন কাকাবাবু ও কাকিমা এমন করে অভ্যর্থনা জানালেন, যেন তাঁরা সকাল থেকেই জানতেন যে আমরা যাব। অবশ্য তখনও কাকিমার রান্না চড়ানো হয় নি। আমরা হাত পা ধুয়ে কাকাবাবুর 'মিউজিয়াম' ঢুকলাম। শ্রীনিকেতনের দুই কক্ষের অপরিসর কোয়ার্টারে একটি কক্ষ জুড়ে ছিল কাকাবাবুর শিল্পসংগ্রহ। সগর্বে তিনি দেখিয়েছিলেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (সম্ভবত তাঁর দাদামশাই) কাশ্মীরি কাজ করা ভারি সুন্দর একটা জোব্বা। হ্যাঙ্গাঁরটি আবার দেওয়ালে সযত্নে রেখে দিয়েই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন উল্টোদিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি ফ্রেমে বাঁধানো ছোট ছবির দিকে। পুরির সমুদ্রতট, তটের প্রান্তে ফেনা জমে আছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায় যে ওই ফেনার বিন্যাস লুকিয়ে রেখেছে একটি নাম, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যত দূর মনে পড়ছে তাঁরই হাতের লেখায় আরও বড় করে বাঁধানো ছিল উমর খৈয়ামের একটি রুবাই। ফার্সির ধাঁচে বাংলা অক্ষরে লেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই ঘরে সব কটি দেওয়াল জুড়ে কত যে ছোট বড় শিল্পকর্ম সাজিয়ে রাখা হয়েছিল তার আর তালিকা দিতে পারছি না। তবে মনে পড়ছে ঘরের মাঝখানে যে মাদুরটি পাতা ছিল তাতে এমন নকশা করা ছিল, যে প্রাণে ধরে তার উপরে উঠে বসা সহজ ছিল না। ঘরের দ্বারপ্রান্তে ছিল মস্ত বড় ভারি একটা ঝকঝকে পিতলের কলসি, তাতে একগুচ্ছ কাশফুল।

পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং সেটাই ছিল বর্তমান কালের প্রয়োজনে নিযুক্ত। মস্ত বড় তক্তপোষের উপরে কাকাবাবু কাকিমা ও তাদের শিশুকন্যা রুচিরার সঙ্গে শুয়ে শুয়ে অনেক গল্প শুনেছিলাম কাকাবাবুর মুখে। স্বল্পভাষিণী, সুন্দরী ও বিদূষী কাকিমা মাঝে মধ্যে দুয়েকটি বাক্য সংযোজন করছিলেন। তিনি ছিলেন দর্শনের এম. এ.। তাই মুহূর্তে আমাকে আপন করে নিলেন যেহেতু আমার পিতার বই তাঁর পড়া ছিল। ওঁদের রান্নাঘরের কুঁড়েটি ছিল উঠোনের আর এক প্রান্তে। আমরা সেদিন রান্নাঘরে বসেও অনেক গল্প করেছিলাম।

খোড়ো ঘরের মাটির মেঝেতে কাঠের উনুন পাতা ছিল, তাতে কাকিমা ডাল ভাত এবং আলু ভাতে রেঁধেছিলেন। তাছাড়া একটা তরকারিও ছিল। উনুনের পাশে একটু কাৎ করে রাখা ছিল একটি ছোট্ট ঘিয়ের শিশি। আলু-ভাতের উপর কয়েক ফোঁটা ঘিও দিয়েছিলেন কাকিমা। তাঁর সেই প্রসন্ন মুখে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনের স্বাদ আমি আজও ভুলিনি।

এই কাকাবাবু কাকিমার সংসার তখন চলছিল কাকাবাবুর দেড়শো কি দুশো টাকা মাহিনায়। তিনি তখন লোকশিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। এবং অবসর সময়ে শিল্প ও সাহিত্যচর্চা করতেন। কাকাবাবু পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু সে সম্পত্তি মামলা-মোকদ্দমার অশান্তি পার হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছিল বোধহয় আরও বিশ বছর পর। এই সময়টা কী নিদারুণ অর্থকষ্ট এবং রোগভোগ করে কাটিয়েছিলেন এই দম্পতি। কাকাবাবু তাও সুখের মুখ কিছুটা দেখে গেছিলেন, কিন্তু কাকিমা কতটুকু দেখেছিলেন আমি জানি না। আজ তাঁর পুত্র-পৌত্র সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে দেখে ভালো লাগে। আর ওই ছোট্ট মিষ্টি রুচিরাকে শান্তিনিকেতন ছাড়ার পর আর দেখিনি।

সেদিন মাধবী যেই আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিল, অমনি কাকাবাবু বলে উঠেছিলেন, 'তাই নাকি, তোমার নাম বুঝি গৌরী?' মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী?'

অনেক দিন পর সেকথা মনে করে নিজেই হেসেছি।

আরো বার কয়েক তাঁদের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। তখন শ্রীনিকেতনটা ঘুরে ঘুরে সবখানি দেখিয়েছিলেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিল শ্রীনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা। তখন শান্তিনিকেতনের যেমন আর্থিক অনটন ছিল, শ্রীনিকেতনের অনটন তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল। অথচ সেদিন শ্রীনিকেতনে কত কিছু উৎপাদন হত। শ্রীনিকেতন ডেয়ারি তখন শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে শুধু [illegible] শান্তিনিকেতনের বহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘরে ঘরেও খাঁটি দুধের যোগান দিত। এখন যা স্বপ্নের মতো মনে হয়। আর শ্রীনিকেতনের হাতের কাজের খ্যাতি তো তখন ভারতজোড়া। তাঁতে, বাটিকে, সূচিশিল্পে, চর্মশিল্পে আর মৃৎশিল্পের যা উৎপাদন হত তা ঠাসা থাকত শিল্পসদনের দোকানে। শান্তিনিকেতনে যাঁরা বেড়াতে যেতেন, তাঁরা দুহাত ভরে চারুশিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করে ফিরতেন।

তখন গুরু পল্লীতেও যেমন দেখেছি, শ্রীনিকেতনেও তেমনই বড় সাদাসিধে সরল জীবনযাত্রা দেখেছি।

বিশ্বভারতী মাঝে মাঝে অনুদান পেলে কিছু কিছু কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছিল অধ্যাপক ও কর্মীদের জন্য। তবে সেই সব কোয়ার্টারেও বিলাসিতা দেখিনি, দেখেছিলাম শিল্পরুচি।

একদিন সকালে অধ্যাপক আইয়ুবের জন্য আমরা একটি নির্দিষ্ট গাছতলায় অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দেখি তিনি আসছেন এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসছেন একজন পাজামা পাঞ্জাবী পরা অপরিচিত ভদ্রলোক। তিনিও সেদিন আমাদের ক্লাসের একপাশে বসলেন। তবে তাঁকে ছাত্রজাতীয় মনে হল না। পরে শুনলাম, তিনি আমাদের অধ্যাপকের বন্ধু, অম্লান দত্ত। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল অধ্যাপক আইয়ুবের পাঠনভঙ্গি উপভোগ করার।

মাঝে মাঝে অন্য ভবনের ছেলেমেয়েরাও তাঁর ক্লাসে এসে বসত। কখনও কলাভবন থেকে শুভচারী দাশগুপ্ত ক্লাস করতে আসত—দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর পুত্র। একদিন এল অনীশ। অনীশ ঘটক আমাদের চেয়ে এক বছরের সিনিয়র ছিল। নানারকম দুষ্টুমি করতে ওস্তাদ। সেদিনকার পাঠ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তখন একটু সময় বাকি ছিল। তখন অনীশ ভালোমানুষের মতো মুখ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আইয়ুবদা, আপনাকে আমরা 'ভাইজান' বললে কি আপনি বেশি খুশি হবেন? গৌরী বলছিল..."

তিনি অপাঙ্গে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিশ্চয় খুশি হব। শুধু 'আইয়ুব সাহেব' না বললেই হল।"

এর কয়েকদিন আগেই ওই অনীশের পরামর্শেই শিক্ষাভবনের ছাত্র ইউনিয়নের এক ভালোমানুষ সেক্রেটারি টাটাভবনে তাঁর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি ওস্তাদ আবু সয়ীদ আইয়ুব? কাল সন্ধ্যায় আমাদের একটি অনুষ্ঠান আছে, যদি আপনাকে আমরা সেখানে পাই, আপনার কণ্ঠে কিছু সংগীত শুনতে পারি, তাহলে সবাই খুব খুশি হব।'

অনীশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল কী হয়। যখন মিনিট খানিকের মধ্যে দেখতে পেল এক লাফে ওই সেক্রেটারি টাটা বিল্ডিং-এর বারান্দা থেকে নেমে তার দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে ছুটে আসছে, তখন অনীশ মুহূর্তে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল।

অধ্যাপক আইয়ুব প্রথম দিনের আলোচনাটি বাংলা ভাষায় করলেও, তারপর থেকে ক্লাস নিতেন ইংরেজিতে। মাঝে মাঝে বেশ চমক দিতেন। যেদিন Appearance

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

and Reality পড়াতে শুরু করলেন, হঠাৎ ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে একটা ফল বার করে দেখালেন। বেশ সরস উজ্জ্বল রঙের কমলালেবু। এবং সেটা সবার সামনে তুলে ধরে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কী?'

সবাই হেসে ফেলে বলল, 'An orange.

তাহলে এই orange-এর গন্ধ কীরকম হবে? স্পর্শ করলে কেমন লাগবে ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব শুনে নিয়ে একজনের হাতে সেটি দিয়ে বললেন, 'দেখ দিকিনি তোমাদের অনুমান ঠিক কিনা?'

সে হাতে নিয়ে দেখল ওটা কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা। এইবার বেশ ফলাও করে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল Appearance and Reality-র মধ্যে তফাৎ কোথায়? এবং তা থেকে অনিবার্যত শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম এই বিশ্বকে যেমনটা দেখায় বিশ্ব কি ঠিক তাই না অন্য কোনও কিছু?

সাধারণত পাশ কোর্সে বড় ক্লাসগুলি হত সকালের দিকে। আর অনার্সের ক্লাস মধ্যাহ্ন বিরতির পরে। বৃষ্টি হোক কিংবা ঝাঁ ঝাঁ রোদ হোক, এই শেষ বেলার ক্লাসে আসতে তাঁর খুব কষ্ট হত। তখন শুনেছিলাম, ভদ্রলোক যথেষ্ট সুস্থ নন।

ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় খানিকটা ঘনিষ্ঠ হল। একদিন বললেন যে তাঁকে একটা কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। এবার টাটা বিল্ডিং ছেড়ে সেখানে গিয়ে গুছিয়ে বসতে হবে। কলকাতা থেকে তাঁর বউদিকে আসতে বলেছিলেন গুছিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তিনি আসতে পারছেন না। তাই আমরা কয়েকজন গিয়ে কি তাঁকে সাহায্য করব? আগামী বুধবার যদি মন্দিরের পরে তাঁর কাছে গিয়ে জেনে নিই সেদিন বাড়ি বদল করা হবে কিনা, তাহলে তিনি নিশ্চিত জানাতে পারবেন। এবং দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে বাড়ি বদল করা যাবে।

তিনি কথাটা বলে চলে যাবার পরে সপ্রতিভ শিবানী মন্তব্য করল, 'বউদি কেন বাড়ি গোছাতে আসবেন? বাড়ির গৃহিণীরই তো আসার কথা

পরবর্তী বুধবারে মন্দিরের উপাসনার পরে আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলেমেয়ে বলল, 'আজকে তো একবার খবর নিতে হয় আইয়ুবদা বাড়ি পাল্টাবেন কিনা।'

ওরা আমাকেই ঠেলে দিল, 'যাও না, গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে এস।'

আমি তো মনে মনে পা বাড়িয়েই ছিলাম। টাটা বিল্ডিং-এ গিয়ে দেখি, সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে একটু বিপর্যস্তভাবে উনি এটা সেটা নিয়ে টানাটানি করছেন। ঘর্মাক্ত কপালের উপরে দীর্ঘ কেশ কিছুটা এলোমেলো হয়ে নেমে এসেছে। তাঁকে সেদিনই বাসা বদল করতে হবে। উনি বললেন, 'ছেলেরা কেউ কি আসতে পারবে না?'

আমি জানালাম যে অবশ্যই পারবে। আমরা চার-পাঁচজন শেষ বেলায় আসব।

সেদিন আমার হাতে কয়েকটি মালতী ফুল ছিল। শান্তিনিকেতনে আসার আগে এই ফুল আমি কোনোদিন দেখিনি। এই সাদা সুগন্ধি ফুলটিকেই যে মালতী বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা জানতাম না। মাধবী মালতী নিয়ে এখনও অনেকের মনে ভ্রান্তি রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে মধুমালতীও।

অধ্যাপক ফুলগুলি হাতে নিয়ে জানতে চাইলেন, 'কী, এর নাম কী?'

আমি নাম বলে এবং ফুলগুলি দিয়ে চলে এলাম।

সেদিন বেলা তিনটে নাগাদ মাধবী শিবানী পুণ্যশ্লোক আর অনীশ ঘটকের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম তাঁকে নিজামের আনুকূল্যে সদ্য নির্মিত বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করে আসার জন্য। কী সুন্দর ঝকঝকে একটি কোয়ার্টার, তার তিন দিকে খোয়াই থেকে সদ্য তুলে আনা মোরাম বেছানো। আর সামনে বারান্দার ধার ঘেঁযে একটি তরুণ শিরীষ গাছ।

বিশ্বভারতী কিছু নতুন আসবাবপত্র দিয়ে রেখেছিল, কয়েকটি খাট এবং চেয়ার টেবিল। কদিন পরেই দেখা গেল শ্রীনিকেতন থেকে কেনা নীল আর হলুদ পর্দা, টেবিল ক্লথ, বেড কভার আর খান কয়েক মোড়ায় বাড়িখানি একেবারে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠল।

চতুর্দিকে খোলামেলা সেই বাড়িখানিকে পঁয়ত্রিশ বছর পরে আর চিনতে পারছিলাম না। এমন ঘিঞ্জি বাজার গড়ে উঠেছে চারদিকে। কোথায় সেদিনকার সেই নিজামের অর্থানুকূল্যে প্রস্তুত সুন্দর গৃহখানি।

বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অপরাহ্নের ক্লাসগুলো নিজের বাড়িতেই নিতেন। দুর্বল স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাঁর বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ ড. প্রবোধ বাগচী সহজেই এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। আরো অনেকেই অবশ্য কখনও কখনও বাড়িতে ক্লাস নিতেন।

তবে ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে তিনি কিন্তু বেশ কড়া ছিলেন। আড়াইটায় ক্লাস শুরু হলে আড়াইটার দু'মিনিট আগে পৌঁছে গেলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু দু মিনিট পরে পৌঁছলে অধ্যাপকের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠত। প্রথমটায় এই ব্যাপারটা তেমন গা করিনি। একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে একটা ঘুম দিয়ে উঠে স্নান সেরে চুল এলিয়ে মাধবী আর আমি পৌঁছতে পাঁচ-ছ মিনিট দেরি করেছিলাম। অধ্যাপক চেয়ারে সহপাঠীরা মোড়ায় বসে দরজার দিকে তাকিয়েছিল। আমরা একটু অপ্রস্তুতভাবে ঘরে ঢুকতেই অধ্যাপক গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই সময়টায় তোমরা ক্লাস করতে আস, আমার সঙ্গে গল্প করতে আস না। এবার থেকে সেটা ভুলে যেও না।'

আমরা তখন চোখে এমনই অন্ধকার দেখতে লাগলাম যে দুটি মোড়া খুঁজে নিয়ে বসতেও একটু সময় নিলাম। তারপর পড়ানো শুরু হল। আমরা মাথা নিচু করে নোট লিখছিলাম। মাধবীর চোখ থেকে নীরবে জলের ফোঁটা পড়ছিল, সে সাবধানে চোখ মুছছিল। অধ্যাপকের তা চোখ এড়ায় নি। আমি বাঁ হাতে একটা রুমাল দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে রেখেছিলাম। একবারও কোন প্রশ্ন করিনি বা প্রশ্নের উত্তর দিই নি।

এক ঘণ্টার ক্লাস চল্লিশ মিনিটেই শেষ করে দিয়ে তিনি হাল ছেড়ে সবাইকেই সাধারণভাবে বলেছিলেন, 'আজ তো আমার পড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল। অথচ খুব যত্ন করে এই লেকচারটা তৈরি করেছিলাম।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবাই খাতাপত্র গুটিয়ে নিয়ে আমাদের দিকে তাকাল, কারুর চোখে কৌতুক, কারুর বা সামান্য একটু অভিযোগের ভাব। আমরা কতক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকবো? তাই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আজ তাহলে যাই?'

অধ্যাপক বললেন, 'না—আর একটু বস।'

তারপর সবাইকেই বললেন, 'তোমরা যদি ক্লাসের নিয়ম কানুন না মানো, তাহলে বাড়িতে ডেকে এনে ক্লাস করা খুব অশোভন দেখায়। এ ব্যাপারে তোমাদের সহযোগিতা না পেলে আমি কী করে বিকেলের ক্লাসগুলি বাড়িতে করি?'

পুণ্যশ্লোকের স্মিত হাস্য এবার সশব্দ হল। সে বলল, 'এর পর থেকে আর এমনটা হবে বলে মনে হয় না।'

আমরা সবাই দল বেঁধে চলে এলাম। শুধু আমাদের দুজনের নয় অধ্যাপকের মনের ভার কাটতেও আরও কয়েকদিন লেগেছিল বলে মনে পড়ছে।

শান্তিনিকেতনে ততদিনে বেশ পাকাপোক্ত হয়েছি, নিজের ক্লাসের বাইরেও বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে আড্ডা দিচ্ছি। একজন ঠাট্টার সুরে বলল, 'তোমার পিছনে আমরা অনেকেই লাইন দেব ভাবছিলাম কিন্তু শোনা গেল তোমার উপর আইয়ুব সাহেবের নজর পড়েছে তাই সময় থাকতে সাবধান হয়ে গেলাম।' তার সেই বাঁকা হাসি এখনও মনে বিঁধে আছে।

সেদিন যারা বসে আমার লেগ পুল করছিল, তাদের মধ্যে আর একজন বলেছিল, 'তুমি নাকি জেল-ফেরতা মেয়ে!'

সে আমার আরও বছর খানেক আগেকার ইতিহাস। সুকান্তর সেই 'দুরন্ত আঠেরো' তখন আমার। ছাত্র আন্দোলনের মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। খানিকদূর যাওয়ার পর দেখি কয়েকটি পুলিশ হাতে বেটন নিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে আমাদের পথ আগলাচ্ছে। বাঁ হাত দিয়ে পাশে চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। আমরা দেখি, সবজিবাগ থানার ভিতরে ঢুকে পড়েছি। আমরা পাঁচ-ছটি মেয়ে ভাবছি, এটা কী হল? ততক্ষণে পেছন দিক থেকে আমাদের এস. এফ. আই—এর ছেলেরা সব সরে পড়েছে। পরে পীযূষদাদের মুখে শুনেছিলাম, ওটা ছিল স্ট্রাটেজিক রিট্রিট—আমাদের ট্রেনিং এর অংশ। তাই সবাইকে ওখানে ঢুকিয়ে দেবার কোনও মানে হত না।

আমাদের বেশ সসম্ভ্রমে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন ও-সি। আমরা তাঁর টেবিলের উল্টোদিকে কয়েকটি চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। ও.সি আলোচনা শুরু করেছিলেন, 'তো কাহিয়ে, দেবীজি, ইহা আপ ক্যায়সে আ পৌঁছে? হাঁ

আমাদের নাম ধাম বাড়ির ঠিকানা কলেজের খবর সব জেনে নেওয়ার পরেই পাটনা কলেজের প্রিন্সিপালকে টেলিফোন করে আমাদের খবরটা দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, অন্য ক'জনের অভিভাবকদের সঙ্গে তখনই যোগাযোগ না করতে পারলেও দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষকে নিজের আপিসে ডেকে নিতে দেরি হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সিপাল ফিলসফির হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'ডঃ দত্ত, আপনার মেয়ে কোথায়?' পিতা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কেন ওর তো একটু সর্দি-জ্বর হয়েছে, তাই বাড়িতেই রয়ে গেছে। আজ আমি তাকে কলেজে নিয়ে আসিনি।'

এছাড়া কী কথাবার্তা হয়েছিল, তা আমার পিতা ছাড়া আর কেউ জানতেন না, আমিও জানতে পারিনি। আমাদের যথার্থ হিতৈষী কয়েকটি বন্ধু ব্যাকুল হয়ে আমার পিতার কাছে ছুটে গিয়ে নাকি কিংকর্তব্য স্থির করার জন্য দুঃসংবাদটি জানিয়েছিল এবং প্রচণ্ড ধমক খেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল।

দুদিন পরে আমার ভাইকে নিয়ে মা বহুকষ্টে বাঁকিপুর সেন্ট্রাল জেলে পৌঁছেছিলেন জামিন নেবার জন্য। তিনজনে রিকসায় উঠে বসলে মা খদ্দরের আঁচলটা মাথায় ঠিক করে গুছিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। সারা পথ কোনও কথা বলেন নি। বাবা তার আগে কী ঘোষণা করেছেন সে কথা আমার ভাইয়েরও বলার নয়। এ-কথাও সে তখন স্বীকার করেনি যে বাবার নির্দেশে সে আমার সব চিঠিপত্র, বন্ধুদের সঙ্গে তোলা কয়েকটি গ্রুপ ফটো সব পুড়িয়ে ফেলেছে। একটা অ্যালবাম বিজুর আমার দুজনেরই প্রিয় সে অতিকষ্টে সরিয়ে ফেলেছিল। পরে আমি করুণ কণ্ঠে তাকে তিরস্কার করেছিলাম, 'চিঠিগুলো কেন সব পুড়িয়ে ফেললি?'

আমার অকালে পরিণত অনুজ গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'রেখাদির চিঠিগুলো সব বাবার হাতে পড়লে ভালো হত?'

পিতা এবং আমার মধ্যিখানে তখন কঠিন নৈঃশব্দ্যের প্রাচীর। মা খানিকটা তিরস্কার করার পরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। তাঁর কাছ থেকে এবং ভাইবোনেদের কাছ থেকেও জানা গেল বাবার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে লাভ নেই। মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আমার নাম কলেজ থেকে কাটিয়ে দেওয়া হল? আমি এখন কী করব?' মা বলেছিলেন, 'বাড়িতে বসে পড়াশুনো করো।'

কয়েকদিন পর উত্যক্ত হয়ে মার কাছে ঘোষণা করেছিলাম, "আমি তাহলে বাড়ি ছেড়ে পার্টি অফিসে গিয়ে থাকব। সেখান থেকে পড়াশুনো কাজকর্ম সবই ইচ্ছেমতো করবো।"

এটাকে বোধহয় মা 'ফাঁকা ভয় দেখানো' বলে মনে করতে পারেন নি। এবং মনে হয় সেটি স্বামীর গোচরে দুরু দুরু বক্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এইসঙ্গে আমি একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলাম পিতাকে আমার বক্তব্য আনুপূর্বিক জানাবার জন্য। পরে দেখেছিলাম, আমার বক্তব্য ২০টি পয়েন্টে লেখা হয়েছিল। চিঠিখানা বাবার টেবিলে কাগজ চাপা দিয়ে রেখে দেওয়ার পরে মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। পরে সেকথা অগ্রজরা জেনে হাসাহাসি করত, জিন্নার মতো গৌরীর কুড়ি পয়েন্ট।

তাও দেখি বাবা মুখ খোলেন না। ক'দিন থেকেই তাঁর শরীরটা বেশ খারাপ মনে হচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিলেন। দু-তিন দিনের মধ্যেই বেশ জ্বর নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফিরে শয্যা নিয়েছিলেন। মা আমাকে চাপা গলায় ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, "এই রকম একটা শক্ত মানুষ, আমি তাঁকে কখনও এইভাবে কাঁদতে দেখিনি।"

শুনে একটু দমে গিয়েছিলাম এবং একটু বিরক্তিও বোধ করেছিলাম যে যুদ্ধের এটা বৈধ রীতি নয়—সেন্টিমেন্টাল ব্ল্যাকমেইলিং। ক'দিন পরে একরাত্রে ভাইবোনেরা শুয়ে পড়লে পরে পিতার ঘরে আমার ডাক পড়েছিল। আমি জড়োসড়ো হয়ে পিতার তক্তপোষের পাশে একটা টুলে বসেছিলাম। ঘরে একটা টিমটিমে লণ্ঠন ছিল। বাবা আমার একটা হাত ধরে কাঁদতে শুরু করলেন। আমার মন তো গলল না, বরং যেন একটু কঠিন হয়ে থাকলাম। তবু হয়ত অচিরেই একটু নরম হতাম, বাবা কান্না থামিয়ে সর্দিতে ভারি গলায় আমার সঙ্গীসাথীদের সম্বন্ধে ক্রোধ বর্ষণ করতে শুরু করলেন।

আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম, 'আমি দোষ করেছি, আমাকে বকো, ওদের নিয়ে টানাটানি করছ কেন?'

বাবা একটু বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার তো এখনও বুদ্ধি পাকে নি, তাই ওদের তুমি তোমার গুরু নির্বাচন করেছ। গান্ধী নয়—লেনিন এখন তোমাদের পথ প্রদর্শক—এখন তোমারও মনে হচ্ছে end justifies the means.

আমি আর কোনও উত্তর দিইনি। উঠে চলে এসেছিলাম। তবে দু'একদিনের মধ্যেই ওঁর শরীর একটু ভালো হওয়ার পরেই আমাকে জানিয়েছিলেন, 'পাটনায় আর পড়াশুনো চলবে না। কারণ এখানে পড়াশুনোর নামে শুধু রাজনীতিই চলতে থাকবে।' আমি যদি সত্যিই পড়াশুনো করতে চাই, আমার সামনে দুটি বিকল্প রয়েছে—হয় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে, নয় শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে।

আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মনস্থির করে ফেললাম যে apolitical হলেও শান্তিনিকেতনেই বরং নিঃশ্বাস ফেলা যাবে। অতএব বিশ্বভারতীতে যাওয়া ঠিক হয়েছিল। সেটা ছিল জানুয়ারী মাস ১৯৫০।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য তখনও ছ'মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই ছ'টি মাসও মোটেই নিস্তরঙ্গ থাকেনি। বিশেষত আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা যখন জানতে পেরেছিল যে আমি শান্তিনিকেতনে 'পালাবার' ব্যবস্থা করছি, তখন তারা ক্রুদ্ধ এবং হতাশ হয়েছিল। আমাকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফেরাবারও যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অধ্যাপক দত্তের দুর্গে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

কণিকার হাতে একদিন একটা চিঠি এসে পৌঁছেছিল। আমি তখন সরস্বতী পুজোর খিঁচুড়ি রাঁধছিলাম। চিঠিটা পড়েই আমি হাঁড়ির তলায় উনুনে গুঁজে দিয়েছিলাম। সেটা মায়ের এবং আরও কয়েকজনের চোখে পড়ে গিয়েছিল। অচিরেই বাবা এসে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তিরস্কার করতে শুরু করেন। অবশেষে ক্রুদ্ধভাবে ঘোষণা করেছিলেন, 'তুমি এখুনী ওঠো, পাটনা ছাড়তে হবে'। কোথায় রইল খিচুড়ি রাঁধা, কোথায় রইল সরস্বতী পুজো, একটা বাক্স গুছিয়ে নিয়ে বিজুর সঙ্গে রিকসায় উঠলাম।

ঘণ্টা দুয়েকেরে মধ্যে হাওড়া গামী ট্রেনে। পরদিন সকালের দিকে হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে ঘুষুড়িতে আমার জ্যাঠতুতো দাদার চাকুরীর স্থলে পৌঁছতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ওঁরা অবশ্য জানতেন না যে আমরা যাচ্ছি। আমার সেই ভ্রাতা এখন বিখ্যাত মানুষ। তখন তিনি সম্ভবত তাঁর প্রথম চাকরী শুরু করেছিলেন হাওড়ায় একটি কটন মিলে। সেটি ছিল গঙ্গার তীরে একটি প্রশস্ত বাগানের মাঝখানে। পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত মনোরম। তাঁদের কোয়ার্টারগুলিও ছিল সাহেবী আমলের, প্রশস্ত ও আরামদায়ক।

আমার ভ্রাতা তখন ছুটি নিয়ে তাঁর সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন। মনে হয় কোনো একটা ট্রেনিং এর জন্য। জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমার সংসারে সেই আনন্দময় গৃহে কয়েকটা দিন ভালোই কেটেছিল। কিন্তু অচিরে একটি লম্বা মতন লেফাফা এল জ্যাঠামশাইয়ের নামে। বাবা তাঁকে লিখেছিলেন যেন সঙ্গে পাঠানো টাইপ করা আবেদনপত্রে আমার স্বাক্ষর করে ফেরত পাঠাই।

আমি তো চিঠিটা পড়ে দেখে বেঁকে বসেছিলাম। সরকারের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা কী করে সম্ভব? আমার আপত্তি শুনে আমার সেই সদাস্নিগ্ধ জ্যাঠামশাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, "তোমার মান সম্মান আছে, তোমার বাবার মান-সম্মানের তোমার কোনও দায় নেই।"

এরপর পাটনায় ফিরে আসতে দেরি হয়নি। কিন্তু ফিরে এসেও বাড়িতে অভিভাবকদের নজরবন্দী হয়ে রইলাম। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বান্ধবীদেরও আসতে দেওয়া হল না। কারণ আমার উপর নাকি পুলিশের নজর ছিল এবং যারা আসবে তারা বিপন্ন হবে।

জুন মাসের শেষের দিকে একদিন সাহেবগঞ্জ লুপ রেলওয়েতে বোলপুরের টিকিট কাটা হল। স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিয়ে ট্রেনটাকে ছাড়বার আগে জানালার কাছ মুখ এনে করুণ কণ্ঠে আমার পিতা আমাকে বলেছিলেন, 'এখানে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ, হাস্যাস্পদ করেছ। ওখানে গিয়ে লক্ষ্মী হয়ে থেকো।'

কিন্তু লক্ষ্মী হওয়া যার কপালে নেই সেকি আর সনির্বন্ধ অনুরোধেও লক্ষ্মী হতে পারে? তবে সেদিন আমিও কল্পনা করতে পারিনি, আমার জন্যই মা-বাবার ভাগ্যে আরো কত বিড়ম্বনা সঞ্চিত ছিল।

অধ্যাপক আইয়ুবের বাড়িতে আমরা মাঝে মাঝেই বিকেলের দিকে বেড়াতে যেতাম। ততদিনে গোয়ালপাড়ার পথ ধরে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ কমে গিয়েছে, কারণ টাটা বিল্ডিং-এ তখন তো আর কেউ থাকেন না। আমরা মোরামের উপরে কয়েকটা মোড়া নিয়ে বসতাম। আর উনি বসতেন একটা বেতের চেয়ারে। একদিন বললেন, 'ওই শিরীষ গাছটা আমারই মতো, ওটাতে ঘুণ ধরেছে।' পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে তাঁকে আসল বয়সের তুলনায় দশ বছর কম দেখালেও নানা রোগে জীর্ণ হয়ে ভিতরে ভিতরে আরো দশ বছরের বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

ছোট ছোট কত অজস্র স্মৃতি সেই বাড়িটিকে ঘিরে আজো বার বার ফিরে ফিরে আসে। ওই বাড়িটা ছিল একটি চৌকো প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে। আর ওই দিকেই তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাশে থাকতেন কুঞ্জবিহারী দাস। প্রাঙ্গণটির আর তিন দিক ঘিরে আরো দুটি দুটি করে বাড়ি ছিল অধ্যাপকদের। উত্তরদিকে তাঁর মুখোমুখি থাকতেন হীরেনদা। রাতের খাওয়া শেষ করে হীরেনদা নাকি তাঁর বারান্দায় এসে মৃদু স্বরে ডাক দিতেন 'আইয়ুব সাহেব, জেগে আছেন?'

আইয়ুব সানন্দে বেরিয়ে এসে ওই বারান্দায় বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করার কথা আমাকে বার বার বলেছেন। শান্তিনিকেতনে এই একটি বন্ধু লাভ করেছিলেন। যাঁর সঙ্গে অনেকখানি মনের মিল হয়েছিল।

অন্য একটি করুণ স্মৃতি মনে পড়ছে। পুজোর ছুটির আগেই একদিন Hedonism সম্বন্ধে লিখতে দেবেন বললেন। আমরা প্রস্তুত হয়ে দুরু-দুরু বক্ষে একটি করে খাতা নিয়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলাম। কী লিখেছিলাম আজ মনে পড়ছে না, তবে খাতা থেকে ছিঁড়ে রাখা সেই প্রবন্ধের পৃষ্ঠাকটি খুঁজে পেলে আর একবার পড়ে দেখতাম। যা মনে আছে তা হল এই যে মাধবী আর আমি একজন দশে আড়াই আর একজন তিন পেয়েছিলাম। সেদিন বিকেলটায় শ্রীভবনের বারান্দায় বসে মাধবী তো চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। আমারও প্রায় সেই অবস্থা, কিন্তু চোখের জল তখন অত সহজে আসত না।

এর পর তো পুজোর ছুটি আসন্ন হল, বাড়ি ফিরে যাবার সম্ভাবনাটা ভালোই লাগছিল। কিন্তু একটা বিচ্ছেদ বেদনা মনকে ব্যাকুল করে রেখেছিল। তাঁর ঠিকানাটা নিয়ে এসেছিলাম। পাটনার দল রওনা হওয়ার আগেই জামসেদপুরের বিরাট দলের সঙ্গে মাধবী নাচতে নাচতে চলে গেল। ওর বাড়ির জন্য টান আরও অনেক বেশি ছিল। অধ্যাপকও কলকাতা থেকে আনা তাঁর ভৃত্যটিকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

পাটনায় ফিরে গিয়ে এবার বাড়িটাকে আর আমার আগের মতো অসহনীয় লাগল না, অন্যেরাও নিশ্চয়ই আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। তবে শান্তিনিকেতনের দিনগুলিতে ফিরে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত। ক'দিনের মধ্যেই পাঁচনম্বর পার্ল রোডের ঠিকানায় প্রথম চিঠিখানা সাহস করে লিখে ফেলেছিলাম। কিন্তু কী লিখেছিলাম, কী ছিল তার সম্ভাষণ, কিছুই আজ আর মনে নেই।

ক'দিন পরে উত্তর এল। খামের উপর স্বল্প পরিচিত হাতের লেখাটি দেখে মন নেচে উঠেছিল। কিন্তু খাম খুলে প্রথমটায় একটু যেন হতাশ হয়েছিলাম সেই চিঠিখানা পড়ে। কিন্তু দিনে দিনে মৌচাকের মতো সেই চিঠিখানা আমার মনের মধ্যে যেন মধু সঞ্চয় করে চলেছিল।

নীল লাইনটানা কাগজের উপরে অধ্যাপকের হাতে লেখা একটি কেবল গান ছিল সেই চিঠিতে—

"বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া তগণ্য তারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি।
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি।"

এই চিঠির আমি আর কোনও জবাব দিয়েছিলাম বলে মনে পড়ে না। তিনিও যে আর কিছু লেখেন নি, সেকথা স্পষ্টই মনে আছে।

শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নিজের কথা কিছুই কেন লেখেন নি?' উনি বলেছিলেন, 'ওটাই তো সবচেয়ে বেশি করে আমার নিজের কথা। তাছাড়া অন্য কিছু লেখার ঝুঁকি নিতে সাহস পাই নি। তোমার অভিভাবকরা চিঠিপত্র সেনসর করে কিনা তাতো জানতাম না। নিজের ভাষায় নিরুত্তাপ কিছু লিখলে তুমি ক্ষুণ্ণ হতে, অথচ আমার স্বাক্ষরিত চিঠিতে সহৃদয় উক্তি থাকলে অভিভাবকদের সেটা কেমন লাগবে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু যে চিঠি লিখেছিলাম এর চেয়ে ভালো চিঠি লেখার সাধ্য আমার নেই।'

ছুটির কটা দিন দেখতে দেখতেই কেটে গিয়েছিল। নানা জায়গা থেকে বন্ধুদেরও অনেক চিঠি পেয়েছিলাম। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামে একটা ক্যাম্প করতে গিয়ে লেখা পুণ্যশ্লোকের চিঠিখানি এখনও মনে পড়লে ভালো লাগে। সেই সব উজ্জ্বল দিন সেই পুণ্য সেই গীতু আজ কত দূরের মানুষ।

শান্তিনিকেতন যে কত রকম করে আমাকে দু-হাত ভরে দিয়েছিল, সে কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করার অখণ্ড অবসর পেয়েছিলাম পাটনায় বসে। মনে পড়ছিল দিদিভাই রেখা বসুকে। আমাদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, কিন্তু মনে হত যেন কত বেশি প্রবীণা। কলাভবনের এই ছাত্রীটির সঙ্গে পরিচয় মাধবীর দিদিভাই বলে। মাধবী অকাতরে তার বন্ধুত্বের অংশ দিয়েছিল। আমাদের যত কথা যত অকপট স্বীকারোক্তি সব ছিল দিদিভাইয়ের কাছে। ও নিজের মতো পরামর্শ দিত, সাবধান করত। একদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল, 'দ্যাখ, সোনালীর মতো যেন করিসনে। মাসোজীর জীবনটা ছারকার করে দিয়ে গেছে ওই মেয়ে।'

শ্রীভবনে আমাদের ছ'জনের ঘরে এক প্রান্তে ছিল দিদিভাইয়ের ঘরটি। অন্যপ্রান্তে ওইরকম আর একটি ছোট ঘরে থাকত মিলাডা কলাবোভা। চেকোস্লোভাকিয়া থেকে 'স্বেচ্ছা-নির্বাসিত'। একই সঙ্গে পড়ত বটে, কিন্তু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় খানিকটা প্রবীণা ছিল বইকি। সে কিন্তু ইংরেজিটা খুব ভালো রপ্ত করেছিল। এবং মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে যা সব সরস মন্তব্য করত তাতে মাঝে মাঝে ঘাবড়ে যেতাম। মানুষটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সিনিক্যাল হলেও তার রসবোধের অভাব ছিল না। এবং কোনো কারণে সে আমাকে পছন্দ করেছিল। ওর ঘরে সহজে সে কাউকে প্রবেশ করতে দিত না। পাঁচ মিনিটের জন্যও কোথাও যেতে হলে দোরে কুলুপ আঁটত। একদিন তার সেই রহস্যের খনি আমার চোখের সামনে খানিকক্ষণের জন্য মেলে ধরেছিল। আমাকে ভেতরে নিয়ে সাবধানে দরজা বন্ধ করে পর্দা সরিয়ে দেখিয়েছিল তার চার দেওয়ালে কত কী ফ্রেসকো এঁকেছে। ব্যাপারটা এমনিতে কর্তৃপক্ষের ক্রোধের কারণ হত। তার উপরে ফ্রেসকোর বিষয় দেখলে তাদের যা ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হত, সে বিষয়ে মিলাডা যথেষ্ট অবহিত ছিল। শুধু আদিরসাত্মক বর্ণনা নয়, কর্তৃপক্ষের মেজাজ বিগড়ে দেওয়ার মতো কিছু সমসাময়িক ঘটনাও এঁকে রেখেছিল সে।

এই 'ডেঞ্জারাস' মেয়েটিও খুব বন্ধু হয়ে উঠেছিল। আমাদের পারস্পরিক সম্ভাষণ ছিল ছাগলের ডাক। কেন তা আর মনে করতে পারছি না। ওর ছিল ইকনমিক স-এ অনার্স। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অধ্যাপকটি ওর এবং নারায়ণের ক্লাস নিতে যেতেন তিনি কোনওদিন গিয়ে পৌঁছতে না পারলে সে মহা ফূর্তিতে আমাদের দর্শন ক্লাসের পাশ দিয়ে শালবীথির পথে খানিকক্ষণ পায়চারি করত। এবং মিহিসুরে ম্যা-ম্যা ডেকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি সন্ধ্যা প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়িতে কাটত। তিনি ছিলেন গাছপাগল। শান্তিনিকেতনের সেই ঊষর ভূমিকে কত না কষ্টে বাগান করবার চেষ্টা করতেন। কুয়ো থেকে জল তুলে কত কষ্টে যে তাঁর বৃক্ষশিশুগুলিকে বড় করতেন তা নিজের চোখে দেখেছি বলেই জানি। তাঁর বাগানের একপাশে ছিল একটি কাঁটা ঝোপ তাতে ছোট ছোট নীল ফুল ফুটেছিল। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলাম ওই কাঁটাগাছের নাম ডুরানটা। ক্রমে তাঁর বাগানটাকে ডুরান্টা দিয়ে ঘিরে দেবার বাসনা ছিল তাঁর। কিন্তু তা বোধহয় আর সম্ভব হয়নি। ওই গাছ পাটনায় কত দেখেছি, কিন্তু নাম জানতাম না। বহু গাছের নাম-ধাম স্বভাব চরিত্র ফুল-ফল সম্বন্ধে বলবার সময় তিনি রীতিমতো বইটই এনে আমাকে জ্ঞান দিতেন। তাঁর একটা বড় সড়ো প্রিয় বই ছিল 'Trees of Calcutta'। এখনও যখন কলকাতার পথ চলতে সেই সব গাছ দেখি, তখন তাঁকে মনে পড়ে। তাঁকে স্মরণ করবার জন্য আমার অন্য কোনও বনের সন্ধানে যেতে হয় না।

তাঁর কাছে জেনেছিলাম, বকুল ফুল একবার ফোটে বর্ষায়, একবার শীতে। আর যে ছাতিম ফুল বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে প্রায় প্রতীকী ভূমিকায় আছে, সেই ছাতিমপাতা নাকি প্রাচীন গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ভাবে ব্যবহার করা হত।

আমার সেই অধ্যাপক, অসমবয়সী বন্ধু আমার জীবনে যে চারিত্র্যমাধুর্য, বিশ্বচেতনা, আর রসবোধ দান করেছিলেন, তা স্মরণ করলে আজও অভিভূত হই। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু প্রশ্ন করে মনটাকে ভরিয়ে দিতেন। একদিন তাঁর বাড়িতে পা দিতেই প্রশ্ন করলেন, 'গৌরী, সুখ আর আনন্দের তফাৎতা কী?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা আনন্দের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। সেবার গরমের ছুটিতে দেবীপদদা—অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য শান্তিনিকেতনে এলেন প্রবোধ সেন মশাইয়ের বাড়িতে। তিনি বহু বছর আগে প্রবোধকাকুর ছাত্র ছিলেন। সে সময় থেকে এই অধ্যাপক তাঁর পিতৃতুল্য এবং তাঁর সংসারটি দেবীদারও যেন নিজের বাড়ি বলে মনে হত।

এই সময় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন প্রস্তাব করলেন, রেবাদি ও আমাকে এলিয়ট পড়াবেন, যাতে আধুনিক ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে আমাদের ভুল ভেঙে যায়।

আমরা প্রথমে পড়লাম 'The love song of Alfred Prufork'—প্রথমটায় এর ভাষা, এর উপমা সবই যেন কেমন দুর্বোধ্য অদ্ভুত ঠেকত। কোনোদিন তো শুনিনি যে সন্ধ্যাটাকে মনে হচ্ছে কোনো 'etherised patient on the operation table' আর কবিতার প্রবীণ নায়ক যেন জীবনটাকে coffee spoon দিয়ে মেপে চলেছেন।

একে একে আরও দু-তিনটি কবিতা পড়া হয়ে গেল। এই আনন্দ সংবাদ যখন আবু সয়ীদ আইয়ুবকে জানিয়েছিলাম, তখন তিনি কিন্তু একটু আহত হয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। লিখেছিলেন, 'আমিও কিন্তু এলিয়ট ভালোই পড়াতে পারতাম তোমাকে।'

ওদিকে দেবীপদদা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার সময় জেনে গিয়েছিলেন যে অধ্যাপক আইয়ুব আমাদের দর্শন পড়াচ্ছেন এবং আমাদের প্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। দেবীপদদা তখন যাকে বলা হত প্রগতিপন্থী বা মার্কসপন্থী তাই ছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব তখন তাঁদের চোখে প্রগতি বিরোধী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন। তাই অধ্যাপক আইয়ুব সম্বন্ধে তাঁর মন বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। দেবীপদদা কলকাতা ফিরে যাওয়ার পরে খুব সুন্দর হাতের লেখায় একটি চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন।

আমি তার উত্তর দিতে গিয়ে কী এক প্রসঙ্গে, আজ আর মনে নেই, আইয়ুবের ব্যবহৃত একটি শব্দবন্ধ 'মহৎ বেহায়াপনা' ব্যবহার করেছিলাম। সেটা পড়ে দেবীপদদা বেশ রুষ্ট হয়ে লিখেছিলেন, 'আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রভাব তোমার উপর কতখানি পড়েছে, তা বুঝতে পারলাম ঐ শব্দ ব্যবহারে।'

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল যখন মিলাডার টাইফয়েড হল। সেতো নিজের ঘর ছেড়ে 'সিক রুমে' এসে পড়েছিল, তখন তাকে দেখাশুনা করার মতো বিশেষ কেউ ছিল না হস্টেলে। তাই ছোটদের বিভাগের সুধাদিকে সাহায্য করবার জন্য আমি দায়িত্ব নিয়েছিলাম মিলাডাকে স্পঞ্জ করা, পথ্য তৈরি করে খাওয়ানো, তাকে কিছুটা সঙ্গ দেওয়ার জন্য। ফলে সে সময় ওকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ ঘটেছিল। এদেশ ছেড়ে ওর চলে যাওয়ার পরও কোনওদিন আমাদের সেই বন্ধুত্বের বাঁধন আলগা হয়ে যায় নি। আমি উত্তর দিতে পারি বা না পারি, সে আমাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি লিখেই চলেছে।

নির্জন আশ্রমের জীবন আরও পূর্ণ হয়ে উঠল যখন 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেলাম। বউঠান (প্রতিমা ঠাকুর) কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' করাবেন বলে ঠিক করলেন। আমি ছিলাম মালতীর ভূমিকায়। অভিনয়ের দিনে লক্ষ্মীবেশী লাল টুকটুকে বেনারসী পরা গীতু হাতে ঝাঁপি নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ক্ষীরো দাসীকে বর দিলেন, যেন সে রানী হয়। লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হলেন। সিংহাসনে বসে ক্ষীরো 'রানী' মালতীকে হুকুম করল, 'শেখাও কায়দা'।

মালতী সেদিন সগর্বে তার পাঞ্জাবী বান্ধবীর উৎসাহে তার বেনারসী কুর্তা আর গারারা পরেছিল। পোশাকটা এখন বেশি কেউ পরে না। বেশ ফোলা ফোলা পাজামা, আর হাঁটুর কাছে আরেক থাক কুঁচি দেওয়া ঝুল। ওটাকে পাজামা বলে মনে হত না, মনে হত যেন ঘাঘরা। তখনকার দিনে ওই পোশাক পরে বেগম লিয়াকাত আলী বিলেতেও যেতেন। অচিরেই তাঁর স্বামী নিহত হওয়ার পরে সেই সদা-হাস্যময়ী সুন্দরীর কী হয়েছিল জানি না। আর কোনওদিন তাঁর ছবি খবরের কাগজে দেখতে পাই নি।

আমার সেদিনের সেই সজ্জা বিশেষ কেউ দেখল না বলে দুঃখ হচ্ছিল। বিশেষ মানুষটি তখন গরমের ছুটি উপভোগ করছেন কলকাতায়। সখেদে ভেবেছিলাম, বেশ হয়েছে। কিন্তু কার যে 'বেশ হয়েছিল' সে হিসেব-নিকেস করা কোনোদিন সম্ভব হয়নি।

পরদিন কিন্তু অবাক করে দিল প্রথম বর্ষ কলাভবনের অং সো। সে যে দর্শককুলের পেছনে বসে বসে স্কেচ করেছিল কে জানত। আমি দেখে তাকে বললাম, 'আমাকে দাও না।'

সে বলল, 'এখন না, আগে ওটাকে ফিনিশ করতে দাও।'

সে অল্প কথার মানুষ ছিল। তাছাড়া আমি কোনওদিন কোনও কিছু আদায় করার জন্য কারুর উপর চাপ দিইনি। ক-দিন পর সত্যিই যখন ছবিটাকে ঘষে মেজে এনে দেখাল, আমি লোভীর মতো বলতে চাইছিলাম, 'আমাকে দেবে?'

কিন্তু সে কথা না বাড়িয়ে বলল, 'এটা আমার।'

ও খুব ভালোই বুঝতে পারছিল, আমি কাকে ছবিটা দেখাবার জন্য পাগল হচ্ছিলাম।

প্রায়ই ওর সঙ্গে মাটির বাড়ির ব্ল্যাক হাউসের সামনে জামগাছের তলায় পা-ছড়িয়ে বসে অল্প কথায় অনেক গল্প হত। আমার মনে হয় বর্মীরা এমনিতে কম কথা বলেন, হাত চালান বেশি। অংসো বেচারা কোন্ ভাষাতেই বা গাল-গল্প করবে! সে বাংলা শেখেনি। অল্প কিছু ইংরেজি সম্বল। কাজেই ভাষার অভাব নানারকম নাটকীয় স্বরক্ষেপণ দিয়ে খানিকটা পুষিয়ে দিত। বেচারা খানিকটা সংসার-বৈরাগ্য নিয়েই চলে এসেছিল। কারণ সে ছিল বিবাহিত। ওদের দেশের প্রথানুযায়ী সে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। প্রথম প্রথম শাশুড়ি খুবই জামাই আদর করতেন, 'বা অং সো' 'বা অং সো' (বাবা/বাছা) করতেন। কিন্তু অল্পদিনেই শাশুড়ির সুর ভারি ও কর্কশ হয়ে গেল, তখন তিনি হাঁক দিতেন, 'অং সো—'। জামাতার অভিনয়ে আমার কাছে ছবিটা স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটা সরকারি স্কলারশিপ লাভ হওয়ায় বিশ্বভারতীতে কলা চর্চা করতে সুযোগ পেয়েছিল। সে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে হালকা তল্পি তল্পা বগলদাবা করে দমদমে এসে নেমেছিল।

শান্তিনিকেতনেও খুব বেশি বন্ধু তার হয়নি। আমি অল্প একটু বন্ধুত্ব করাতেই সে বর্তে গিয়েছিল। আমার বিকেলের সঙ্গিনী রেবা সেনকেও তার খুব পছন্দ হয়েছিল। এক আধ দিন আড়ালে বলেছিল, 'রেবাদিকে আমার বেশ ভালো লাগে, মনে হয় যেন আমাদের দেশের মেয়ে।'

বছর দুয়েক পরে সে মস্কো চলে গেল। পথে করাচীতে খানিকক্ষণ থেমেছিল। সেই অভিজ্ঞতা এয়ার লেটারে দু-পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছোট ছোট স্কেচ এঁকে জানিয়েছিল। সেই চিঠি আজও খুঁজলে আমার ছিন্নপত্রের ঝাঁপিতে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখনই খুঁজে এই কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার সামর্থ নেই এই রোগজীর্ণ দেহে। তাই দু-একটি অক্ষম শব্দে সেই আশ্চর্য চিঠির বর্ণনা করি। প্রথম পৃষ্ঠার স্কেচে একটা বেঞ্চে তার তল্পিতল্পা কোলের উপর নিয়ে বাঁ হাতের উপর মুখ রেখে সে ভাবছে কেমন এই দেশটা। তার সামনে একটা সুন্দর বোরখা এসে দাঁড়াল। সে সোল্লাসে বোরখার তলায় যে মুখখানি দেখবে তা কল্পনা করছিল। পরের পৃষ্ঠার স্কেচে বোরখার নেকাব উঠে গেল। বেরিয়ে এল একটা দাঁত বার করা বুড়ির মুখ ভ্যাঙচানি! অং সো বগলের তলায় তল্পিতল্পা নিয়ে ঝুঁকে অবাক হয়ে ভাবছে, এ কী হেরিলাম!

আমার কাছে তার খুব বেশি স্মৃতি নেই। একটা অটোগ্রাফ খাতায় দু-পৃষ্ঠা জুড়ে বর্মী ভাষায় কী সব লেখা ছিল। যখন জিগ্যেস করেছিলাম, 'কী লিখেছ?' সে বলেছিল, 'অত তোমার জানবার দরকার নেই। যদি সত্যিই জানতে চাও, একদিন না একদিন কেউ তোমাকে পড়ে বুঝিয়ে দেবে।' এখনও পর্যন্ত কাউকে পাইনি যাকে বলতে পারি, 'দে পড়ে দে আমার তোরা...'

আমার চোখে আজও যা ভাসে, সেটা স্মৃতি নয়, কল্পনা। আমি মনে মনে দেখি যেন অং সো সেই তল্পিতল্পা বগলদাবা করে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ক্লান্ত পায়ে মস্কোর প্লেনের উদ্দেশে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সেই অলৌকিক আকাশযান তাকে কোথায় নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল, আমার জানা নেই।

সেদিনকার শান্তিনিকেতনে আর একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন এটা ঘোষ। 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন নাকি কান্তিচন্দ্র ঘোষ। রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম-এর সম্ভবত প্রথম বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর সেই ছোট্ট বইটির কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরত। সে বইয়ে কোনও ছবি ছিল না, যেমন কিনা ছিল পরবর্তী নরেন্দ্র দেব, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি অনেক অনুবাদকের বইয়ে। কিন্তু কান্তিচন্দ্রের ভাষার যাদুতে আমাদের মনে কত যে ছবি আঁকা হয়ে যেত।

এই কান্তিচন্দ্র ঘোষকে বিবাহ করে হাঙ্গেরির কন্যা এটাদি শান্তিনিকেতনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তার কয়েক বছর আগেই তাঁর স্বামী কান্তিচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের শোবার ঘরে দুটি বড় বড় ছবিতে এটাদি আর কান্তিচন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হতাম। ছবিদুটির বাঁধাইও ছিল দেখবার মতো। চওড়া পালিশ করা আবলুশ কাঠের ডিম্বাকৃতি ফ্রেমে।

তখনও সেই সুসজ্জিত ঘরের প্রায় প্রতিটি জিনিসে যেন কান্তিচন্দ্রের সজীব উপস্থিতি ছিল। এটাদি এমন করেই তাঁর স্বামীর কথা বলতে পারতেন। খাবার ঘরের একটি দেওয়াল জোড়া সরু শেলফের উপরে রকমারি গেলাসের প্রদর্শনী ছিল। আমার কাছে সেটা অভিনব ঠেকত। ক্রমে জানতে পেরেছিলাম; প্রমথ চৌধুরী-গোষ্ঠীর এই মানুষটিও পৃথিবীর যাবতীয় বিশেষ করে ফরাসী আসব wine বিষয়ে অত্যন্ত সুরসিক, সুপণ্ডিত ছিলেন।

এটাদি তাঁর বৈধব্যের নিঃসঙ্গ জীবনকে ভরে রেখেছিলেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের দিয়ে। আর বৌঠান, বিবিদি এঁদের কাছে তিনি ছিলেন ঘরের মানুষ। নানা-রকম আনন্দ অনুষ্ঠান কত সহজেই তিনি সাজিয়ে তুলতে পারতেন। আমাদের মতো চোদ্দ পনেরটি মেয়েকে নিয়ে একবার তিনি হাঙ্গেরিয়ান ফোক ডান্সের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

উত্তরায়ণের বড় হল ঘরে যখন তিনি আমাদের তালিম দিতেন, আমরা যে কী আনন্দ পেতাম, বলার নয়। বেশির ভাগ সময় উনি নিজেই পিয়ানো নিয়ে বসতেন। কিন্তু কয়েকবার বিবিদিও পিয়ানোয় বসেছিলেন, মনে পড়ে। তখন-এটাদি আমাদের Waltz-এর ধীর সুন্দর পদক্ষেপও শিখিয়েছিলেন। তাঁর সেই তালিম দেওয়া আমরা যত উপভোগ করতাম, তিনি তার চেয়ে কম করতেন না। গোলগাল মানুষটি ঘেমে নেয়ে উঠতেন, কিন্তু আমাদের ভুল শুধরে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।

তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে বিকেলের চায়ে বা রাত্রের আহারে কিংবা কোনও কোনও বিশেষ সন্ধ্যায় ধ্যানের আসরে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তাঁর মোরাম-ঢালা পেছনের বারান্দায় বসলে তখন দিগন্তব্যাপী খোয়াই দেখা যেত। ওঁর সুন্দর বাড়িখানি ছিল উত্তরায়ণেরও উত্তরে, তবে গোয়াল পাড়ার পথের অন্য ধারে। কিন্তু আজ সেই উজ্জ্বল ঝলমলে বাড়িখানি ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে নিজের হতশ্রী মুখখানি লুকিয়ে ফেলেছে। আর খোয়াই লুপ্ত হতে হতে কোথায় চলে গেছে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

তাঁর সহজাত পরোপকারী স্বভাবের জন্য তিনি আইয়ুবের নিজাম ভবনটিকেও গুছিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। মাঝে মাঝে ফরাসিনী মাদমোয়াজেল বুর্দাকে নিয়ে আলাপচারী করতে যেতেন আইয়ুবের কাছে। মাদমোয়াজেল বৌদ্ধ দর্শনের, মৈত্রেয়াণ শাখা বিষয়ে গবেষণায় রত ছিলেন। এটাদি মনে করেছিলেন, যেহেতু বিষয়টা দর্শন, তাই আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁকে খুব সাহায্য করতে পারবেন এবং দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্ব সহজেই সম্ভব হবে। কিন্তু মাদমোয়াজেল ছিলেন ইংরেজি বাক্যহীনা। কয়েকবার একটুখানি আলাপচারীর চেষ্টা করে আইয়ুব অসহায় ভঙ্গিতে এটাদিকে বলেছিলেন, 'এভাবে কী করে কথাবার্তা চালানো যাবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এটাদি আইয়ুবের কথাটা বুর্দাকে ফরাসিতে অনুবাদ করে দিতেই মাদমোয়াজেল গভীর কালো চোখে আইয়ুবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ কি কেবল কথা দিয়েই পরস্পরকে বোঝে?' তাঁর ওই ফরাসি বাক্যটি আইয়ুব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারেন নি। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে যথাযোগ্য উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট ফরাসি তাঁর জানা ছিল না। অন্য কারণগুলি নাই বা ব্যাখ্যা করলাম।

একদিন এটাদি বাড়িতে কয়েকজন বিদেশী ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সন্ধ্যায় চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেটা কোনও একটা দেশের নববর্ষের দিন ছিল। কিন্তু কোন্ দেশের তা আজ মনে পড়ছে না। তুর্কি গুভাঁ, ফরাসিনী বুর্দা, কয়েকটি আমেরিকান ছেলেমেয়ে, জনাকয়েক সিংহলী এবং ভারতীয় আমরা পাঁচ-ছ'জন ছিলাম। তবে এই হৈ-চৈ-এর মধ্যে আইয়ুবকে সেদিন ডাকেন নি। বিদেশীরা বেশ নাচ গান শুরু করে দিয়েছিল। আমরা ভারতীয়রা তখনও এ-বিষয়ে জানতাম না বলেই বোধহয় পরে এটাদি আমাদের নৃত্য শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেদিন আমরা দর্শকের ভূমিকাতেই ছিলাম। কিচেনে খাওয়ার ঘণ্টা পড়লে আমরা ক-জন চলে এসেছিলাম। কিন্তু অন্যদের তখনও আনন্দোৎসবের জের কাটেনি।

দুয়েকবার তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশে আইয়ুবকে এবং আমার মতো দু-চারজন ছাত্রছাত্রীকে তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন। তখন নানা বিষয়ে সুন্দর কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। মাঝে মাঝে আইয়ুব উৎসাহ দেওয়াতে এটাদি নানা দেশের লোকসংগীত গেয়ে শোনাতেন। ইউরোপে নানা দেশে লোকনৃত্য সম্বন্ধেও তখন তাঁরই মুখে নানা কথা শুনতাম। কিন্তু সঙ্গী না থাকায় তিনি তার নমুনা বিশেষ পেশ করতে পারেন নি, তবে নিজে অল্প স্বল্প নেচে দেখাতেন।

পরে যখন আইয়ুব শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে এসেছিলেন, এবং আমিও শ্রীভবন ছেড়ে মা এবং বোনেদের নিয়ে একটি বাড়িতে থাকতে শুরু করেছিলাম, তখন আইয়ুবের চিঠি এটাদির ঠিকানাতেও মাঝে মাঝে গিয়ে পৌঁছত—বিশেষ করে তেমন censorable কিছু থাকলে। এটাদি নিজেই সাগ্রহে তার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। উনি যখন কলকাতায় আসতেন, সময় পেলে আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করে আমাকে গিয়ে খবর দিতেন। একদিন সেইসব কথা বলতে বলতে এটাদি বলেছিলেন, 'গৌরী, তুমি তো নিরামিষ খাওয়া পরিবারের মেয়ে, মুসলিম রান্নার কিছুই জানো না। তোমাকে কিন্তু সেসব ভালো করে শিখে নিতে হবে। আমিও হয়তো অল্পস্বল্প শিখিয়ে দিতে পারব।'

কথাটা যখন অধ্যাপককে চিঠিতে জানালাম, তিনি মজা করে লিখলেন, 'এটাদিকে বলো যে—The road to my heart is not through my stomach.

যাই হোক, এটাদির সঙ্গে এক অসমবয়সী সখ্যতা হয়েছিল, যা আমার বিষণ্ণ দিনগুলিকে অনেকখানি শান্ত করে রাখত। মাঝে মাঝে আমার মায়ের অনুমতি নিয়ে রাত্রে তাঁর কাছে থাকতে বলতেন। তিনি নিজেও কত নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন বুঝতে পারতাম। আমরা জ্যোৎস্না রাত্রে বাগানে খাট নিয়ে বিছানা পেতে ঘুমোতাম। হাসিখুশি মানুষটির অন্তরে অশ্রুর যে ফল্গুধারা ছিল, তার পরিচয় পেতে বিলম্ব হয়নি। দুঃখিনী মানুষটি পরবর্তীকালে খানিকটা যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবং শেষ পর্যন্ত খুব অসুস্থ শরীরে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন নিষ্কপর্দক অবস্থায়।

আমাদের বিয়ের পরে যখন দেখা করতে এলেন, নিজের তাঁতে বোনা দুটি মণিপুরী ব্যাগ উপহার দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর পরেও সেগুলি কী করে আমার কাছে অমর হয়ে রইল!

তিনি যখন আমাদের সঙ্গে বসে নানারকম আনন্দের কথাও বলতেন, তখনও মাঝে মাঝে তাঁর জীবনের বঞ্চনার সত্যটা যেন ঝিলিক দিয়ে যেত। কাউকে তিনি সরাসরি দোষারোপ করতেন না। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জেনেছিলাম যে তাঁর প্রবীণ স্বামী তাঁর ইচ্ছাপত্রে জানিয়ে রেখেছিলেন, এটাদি যদি দেশত্যাগ না করেন এবং পুনর্বিবাহ না করেন, তবেই ওই গৃহটির উত্তরাধিকারিণী হতে পারবেন। নয়ত এক ধর্মীয় সেবা প্রতিষ্ঠান লাভ করবে। ফলে শেষবার দেশে ফিরে যাওয়ার পাথেয় নাকি তাঁর মা এবং ভগ্নীরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে অনেক বন্ধুবান্ধবী পেয়েছিলাম। তাদের অনেকের সঙ্গে আইয়ুবেরও পরিচয় হয়েছিল। একদিন বলেছিলেন, 'তোমার অনেক ছেলে বন্ধু থাকবে এতে আমি অবাক হইনি। কিন্তু তোমার যে এত সব চমৎকার বান্ধবী আছে, তাতে আমার তোমার সম্বন্ধেই আগ্রহ আরও বেড়ে যাচ্ছে।'

আমার পরম সৌভাগ্য যে আজও বৃদ্ধ বয়সে জীর্ণ স্বাস্থ্যে আমি বন্ধু এবং বান্ধবীদের অকৃপণ ভালোবাসা পেয়ে চলেছি। নইলে বেঁচে থাকাই কঠিন হত। সাধারণত বলা হয়, বেশি বয়সে আর গভীর বন্ধুত্ব হয় না। সেটাও ভ্রান্ত বলেই মনে হচ্ছে।

মাসখানেক পবে পুজোর ছুটি সেরে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে প্রকৃতিকে অন্য রকম দেখাল। সেই আমলকি ডাল সাজল কাঙাল ঘুঁচিয়ে দিল সে পল্লবজাল...

একদিকে পড়াশুনা অন্যদিকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—দিনগুলিকে একেবারে ভরিয়ে রেখেছিল। ততদিনে অধ্যাপকদের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছে। তাই তাঁদের কাছে আব্দার করাও সহজ হয়েছে। একদিন প্রবাসজীবনদার শেষ বেলার ক্লাস হয়ে যাবার পর তাঁকে আমরা অনুরোধ করলাম, পরদিন বুধবারেই মন্দিরের পরে আমাদের সঙ্গে সারাদিনের জন্য বেড়াতে যেতে হবে। উনি তো এক কথায় রাজি। তখনও আমি জানতাম না গানে গল্পে আবৃত্তিতে কেমন মাতিয়ে রাখতে পারেন তিনি।

রবিদাকে বলে মাখন লাগানো রুটি, কলা এবং প্রত্যেকের জন্য দুটি করে সেদ্ধ ডিম পেয়ে আমরা তো মহা খুশি। প্রত্যেকের কাঁধে একটি করে ঝুলি। তাতে যাবতীয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহনযোগ্য জিনিস। আমরা দশ বারো জন সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেটাও রেললাইন পার হয়ে, তবে মোটামুটি রেললাইন ধরেই উত্তর-পুবের দিকে। সারাদিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মাঝে একটি গরুর গাড়ি দেখতে পেলে হিচ হাইক করা কঠিন ছিল না। তবে 'হিচ হাইক' কথাটাই তখনও জানতাম না। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় টোকা ছিল।

সেদিন প্রবাসজীবনদার হাতে ছিল এক কপি 'Leaves of Grass'। তিনি হাঁটতে হাঁটতে পড়ে শোনাচ্ছিলেন হুইটম্যানের সেই সব আশ্চর্য কবিতার লাইন–

I believe a leaf of grass is no less than the
journey-work of the stars.
And the pisrmire is equally perfect. and a grain of sand.
and the egg of the wren...

তবে তার আগেই যথাবিহিত 'আমাদের যাত্রা হল শুরু' গাওয়া হয়ে গিয়েছে। তারপর কখনও গান, কখনও পড়া, কখনও মজার মজার গল্প।

হঠাৎ অনীশ দরাজ গলায় গাইতে শুরু করেছিল, 'নয় এ মধুর খেলা, তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা...'

বেলা দুপুরে যখন রোদ চড়ে উঠল, একটা পুকুর ধারে গাছতলায় বসে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা হল পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে। আমরা কিন্তু কেউ তখন কাঁধে জলের বোতল নিয়ে পথ চলতাম না। তবে কি ওই পুকুরের জলই খেয়েছিলাম? কারোর তো তাতে কোনও বিতৃষ্ণা বোধ হয়নি।

ঘণ্টা দুয়েক পরেই আবার এক সময় আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে যখন আমেদপুর স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন হেমন্তর নিষ্প্রভ সূর্য ঢলে পড়েছে।

স্টেশনের বাইরে মাঠের মাঝখানে বসে প্রবাসদা বললেন, এই সেই জীবনানন্দের ধান কাটা মাঠ। মৃদু স্বরে আবৃত্তি করছিলেন–

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গেছে ক্ষেতে–রোদ গেছে পড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধরে ;
তখন গিয়েছে থেমে অই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়
হেমন্ত বিয়াড়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির বিছানার পর;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর!
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চলে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল!...

সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রবাসদা যখন বলছিলেন, 'এই হল আমাদের হেমন্তের দিন', সেই সময়ে আমার মনে অতি সঙ্গোপনে অন্য একটি বিষাদ বিন্দু বিন্দু করে জমে উঠছিল। বুঝতে পারছিলাম, এই ধরনের আনন্দ যাত্রায় আইয়ুবকে কোনওদিন সঙ্গী পাওয়া যাবে না। সেইখানে চির হেমন্ত। যতই কেন তিনি মনে মনে এবং স্বভাবেও এই আনন্দময় পৃথিবীর একনিষ্ঠ প্রেমিক হন, তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর অন্তরে যে বৈরাগ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঞ্চার করেছে, তাতে তাঁর মনে হত যেন এই আনন্দ-যজ্ঞে তাঁর কোনও অধিকার নেই। শুধু লোভীর মতো সেই সব গল্প শুনতেন। কিন্তু অন্যদিকে আমি এও অনুভব করছিলাম, যে এই হেমন্ত মোটেই ধানকাটা মাঠের মতো রিক্ত ছিল না, বরং কণা কণা সোনার ফসলে আমার হৃদয়কে তিনি দিনে দিনে পূর্ণ করে তুলছিলেন।

খানিকক্ষণ পরে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে যখন ট্রেন এসে পৌঁছল, আমরা হুড়মুড় করে একটি কামরায় উঠে পড়লাম। ট্রেন তখন বোলপুরের দিকে যাচ্ছিল। দিনটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল, সেই একটি কথাই সবার মুখে মুখে মনে মনে ফিরছিল। বোলপুরে পৌঁছতে দেরি হল না।

সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥
...আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন...

গাইতে গাইতে ডাকবাংলোর মাঠ পেরিয়ে ভুবনডাঙ্গার পাশ দিয়ে বাঁধগোড়ার দিঘি বাঁয়ে রেখে, ক্রমে আমরা নিচু বাংলায় এসে পৌঁছলাম।

হঠাৎ একটা আম গাছের সরু ডাল একটু লাফ দিয়ে নামিয়ে প্রবাসদা দেখালেন আকাশে বড় চাঁদ। তারপর গান শুরু করলেন—

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে।
আলোছায়ার সুরে অনেককালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় বলে।...

অনীশ এবং মাধবীও গলা মিলিয়েছিল। ওই গান অমন করে আর তো শুনলাম না।

১৯৫০-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশন হচ্ছিল। তাতেই যোগ দেবার অছিলায় কলকাতায় এসেছিলাম।

অধ্যাপক ক-দিন আগেই এসেছিলেন। আমি যে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম, সেখান থেকে সিনেট হাউসে সভাস্থলে যাওয়া-আসার পথটি চেনা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপকের বাড়িতে আসার পথটি তখনও অজানা ছিল। একদিন তিনি বন্ধু মানসী দাশগুপ্তকে অনুরোধ করেছিলেন যেন সিনেট হাউস থেকে আমাকে তাঁর পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের বাড়িতে তিনি পৌঁছে দেন।

দুপুর বেলা মানসী আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে আসেন। সেদিন সযত্নে রক্ষিত (well maintanced) সেই বাড়িটি বড় সুন্দর লেগেছিল। লাল সিঁড়ির প্রথম ভাগটিতে পা দিতেই একটা গন্ধ পেয়েছিলাম। এবং দোতলায় ওঁর ঘরে এসে পৌঁছে টের পাওয়া গেল যে সুগন্ধটি এই ঘর থেকেই একতলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানসী দরজা পর্যন্ত এসে বলে গিয়েছিলেন, এই যে, আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি তো?'

সেদিন তিনি আর বসেননি।

আমার মনটা খচ খচ করছিল। কিন্তু তাকে থাকতে বলার সাহস ছিল না। কারণ বুঝতে পারছিলাম, তিনি সেদিন কোনও তৃতীয় ব্যক্তি চান না।

একটু পরে উনি এসে সোফায় আমার পাশে বসলেন। হঠাৎ সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ হল যে ভিতরটা কাঁপতে লাগল। এর আগে কত দিনই তো কত গল্প কত হাস্য পরিহাস হয়েছে, কিন্তু এতটা কাছে বসিনি, যাতে গায়ের গন্ধটুকুও পাওয়া যায়। আজ সেকথা বিশ্বাস্য করে তোলা কঠিন হবে বলে মনে হয়, কারণ জীবনে, সাহিত্যে এবং অন্য মিডিয়াতেও এত দ্রুত দুটি মানব-মানবী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে যে আমাদের অতি বিলম্বিত লয়ে ঘনিষ্ঠতার কথা যদি বলি তাহলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। বিশেষ করে তিনি ছিলেন একজন যথেষ্ট পরিণত বয়স্ক মানুষ। হয়ত বা সেই কারণেই একটি অপরিণত এবং স্পষ্টত অনভিজ্ঞ মেয়েকে তিনি ঘাবড়ে দিতে সাহস পান নি।

কয়েক ঘণ্টা কিছু গভীর অন্তরঙ্গ কথা এবং কিছু স্পর্শের ভিতর দিয়ে কোন স্বর্গরাজ্যে তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও ভাবতে বসলে মনের মধ্যে শিহরণ জাগে। কিন্তু হঠাৎ দেখি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উনি উঠে পড়লেন এবং সাড়ে চারটের মধ্যে উনি আমার স্থানীয় অভিভাবকদের গৃহে আমাকে পৌঁছে দেবেন বলে তৈরি হয়ে নিলেন। সেই বাড়িতে আমি ট্যাক্সি থেকে নামার আগে উনি নেমে দরজাটি ধরে দাঁড়ালেন। সেই এক মুহূর্তেই আমার জ্যাঠতুতো দিদি তাঁকে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন।

আমি নামলে তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। ওই ট্যাক্সি নিয়েই ফিরে গেলেন। আমি বাড়ির গেট খুলে কয়েক ধাপ পার হয়ে ঘরে ঢুকছি, দিদি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এসে বললেন, 'কে রে ওই সুন্দর মানুষটি?'

আমি একটু বিচলিত ভাবে বলেছিলাম, 'আমার অধ্যাপক'।

আমার মুখের বিচলিত ভাবটা দিদির চোখ এড়ায় নি।

পরদিন আমাদের শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার কথা, সেটা পৌষমেলার আগের দিন। অভিভাবকরা এক আত্মীয় যুবকের সঙ্গে আমাদের বোলপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে দুটি থার্ড ক্লাসের টিকিট হাতে নিয়ে পৌষ মেলা যাত্রীর ভিড় ঠেলে একটা কম্পার্টমেন্টের দিকে এগুচ্ছি, হঠাৎ দ্রুত পায়ে পিছন থেকে এসে আমাদের অধ্যাপক আমাকে বললেন, 'তোমার টিকিট আমার সঙ্গে কাটা হয়েছে। এদিকে এস।'

সেই যুবকটি হতচকিত হয়ে আমার পিছন পিছন এল দেখবার জন্য যে কে কোথায় ছোঁ মেরে নিয়ে আমাকে তুলল। আমি একটু বিব্রতভাবে অধ্যাপকের পিছন পিছন একটা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে আমার চলনদারকে বললাম, 'কিছু মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোর না। শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা হবে। তুমি তো ফাল্গুনীদির বাড়িতেই রইলে।' সে বেশ অপ্রসন্ন মুখে হাত নেড়ে বিদায় নিল। পরে যতবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার এই আচরণের জন্য খোঁটা দিতে ছাড়েনি।

এদিকে সেকেন্ড ক্লাসেও সেদিন বেশ ঠাসাঠাসি ভিড় ছিল। বিশ্বভারতী কর্মসমিতির কয়েকজন কেষ্টবিষ্টুও ওই কম্পার্টমেন্টে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ঘনিষ্ঠভাবে বসতে বাধ্য হওয়ায় কয়েকঘণ্টা যাবৎ আমরা পরস্পরের হাত ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাও তাঁর কালো শালের অন্তরালে।

উল্টোদিক থেকে একজন প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ভ্রূ কুঞ্চিত করে সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। অধ্যাপক একটু বিচলিত বোধ করছিলেন এই ভেবে যে পরদিনই আম্রকুঞ্জের সভায় ওই ব্যক্তিটি তাঁর পরিচয় আবিষ্কার করে ফেলবেন।

তবু সেদিন আমরা যেন একটু 'দুঃসাহসী' হয়ে উঠেছিলাম।

পৌষ মেলার উৎসবে, বিশেষ করে ৭ই পৌষ মন্দিরের উপাসনায় আর আম্রকুঞ্জে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমরা পরস্পরকে দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কথাবার্তা কিছুই হয়নি।

এরপর প্রত্যেকটি ভবন থেকে এক্‌সকার্সনের দল নানা জায়গায় চলে গেল। শিক্ষাভবনের ছাত্রছাত্রীদের দলে আমি ছিলাম না। শিক্ষাভবন অথবা বিনয় ভবনের অধ্যাপকদের মধ্যে আবু সয়ীদ আইয়ুবও ছিলেন না।

পৌষ মেলার পরেই শান্তিনিকেতন যখন খানিকটা ফাঁকা, তখন বাবা এলেন আমার খোঁজখবর নিতে। আমার জনৈক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপককে নাকি তিনি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, আমি কেমন আছি, কেমন পড়াশুনো করছি। তার উত্তরে তিনি নাকি জানিয়েছিলেন যে আমি পড়াশুনোয় অবহেলা না করলেও কোনও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করছি এবং তা নিয়ে লোকেরা বলাবলি করছে।

বলা বাহুল্য পিতা খানিকটা উদ্বেগ নিয়েই শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছলেন এবং প্রথমেই প্রবোধচন্দ্র সেন মশাইয়ের কাছে এ-বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। তিনি তো আমাকে খুবই পছন্দ করতেন, আর অধ্যাপক আইয়ুবের সঙ্গেও তাঁর ভালো পরিচয় হয়েছিল। তিনি বাবাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, এ-নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছুই নেই। এই অধ্যাপকের সঙ্গে মেলামেশা করলেও কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

এরপর একদিন দেখতে পেলাম যে পিতা আমার অধ্যাপকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন লাইব্রেরির সামনে। Philosophy East and west সম্পাদনার সময় তাঁদের মধ্যে আগেই চিঠিপত্রে আলাপ হয়েছিল। তখন তাঁরা কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন ভেবে বুক দুরু দুরু করছিল। কিন্তু পরে অধ্যাপক নিশ্চিন্ত করে বলেছিলেন, যে কোনও অপ্রিয় আলোচনা হয় নি। এবং আমার প্রসঙ্গ ওঠেই নি।

ক-দিনের মধ্যেই প্রবোধ সেন মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করলেন যে তাঁকে যেহেতু বছর খানিকের জন্য আমেরিকা যেতে হচ্ছে 'ভিজিটিং প্রফেসরশিপ' নিয়ে তাই পাটনার বাড়ি বন্ধ করে দিয়ে গৃহিণী ও ছোট চারটি মেয়েকে শান্তিনিকেতনেই নিয়ে আসবেন।

অতএব আমাকে পরামর্শ দিলেন তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি খুঁজে বার করতে, ক্যাম্পাসের মধ্যে হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। মেয়েদের সুরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর তাহলে আর কোনও ভাবনা থাকে না।

আমার অধ্যাপক সম্বন্ধে আমাকে তিনি কোনও কিছু না বলেই দিন কয়েকের মধ্যেই পাটনা ফিরে গেলেন।

এর মধ্যে দিন সাতেক পরে এক্‌সকার্সন থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের আনন্দের ঝুলি ভরে নিয়ে ফিরে এল। প্রায় শূন্য আশ্রমে আমারও যে খুব নিরানন্দ কেটেছিল এমন নয়। বার কয়েক তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, গল্পও হয়েছিল।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, আবার আমরা যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। সাম্প্রতিক যে ঘনিষ্ঠতাটুকু ঘটেছিল সেটাকে এরপর বহুদিন ধরে কল্পনায় ও ভাবনায় লালন করে চললাম, যেন বহু মূল্যবান এবং সযত্নে লুকিয়ে রাখার মতো কোনও সম্পদ।

বন্ধুদের কয়েক জনের সাহায্যে এবার বাড়ি খোঁজা শুরু হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে অত্যন্ত সুন্দর একটি বাড়ি ক-দিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। ধীরানন্দ রায়ের সৌজন্যে। শালবীথির পূর্বপ্রান্তে ছিল দ্বারিক ভবন। আর পশ্চিম প্রান্তে ছিল শ্রী পল্লীর ওই বাড়িটি। সঙ্গীত ভবনের একেবারে পাশেই। শালবীথি গড়িয়ে গড়িয়ে আমাদের সামনের বারান্দার সিঁড়িতে এসে থামত। সেই খোলা বারান্দায় বসে শান্তিনিকেতনের অন্তরটি যেন দেখতে পাওয়া যেত।

জানুয়ারি মাসেই বাকসো-প্যাঁটরা ও চারটি কন্যা নিয়ে মা এসে পৌঁছলেন। ততদিনে আমি তো শান্তিনিকেতনের পাকাপোক্ত অধিবাসী হয়ে গেছি। তাই পাঠভবনে বোনেদের ভর্তি করানো এবং শান্তিনিকেতনে সংসার পেতে বসতে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তাছাড়া আমাদের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ ছিল যৎসামান্য।

আমি তো শ্রীভবন ছেড়ে বাড়ি চলে এলাম। তাই পুরোনো বন্ধুত্বও রইল এবং নতুন পরিচিতের বৃত্ত প্রসারিত হল। শ্রীভবনের মেয়েরা সব সময় আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতে লাগল। বিশেষ করে গ্রীষ্মের জলাভাবের সময় আমাদের কুয়োর জলে স্নানার্থীও অনেকেই চলে আসত।

মাকে বাবা সে সময় কিছু বলেছিলেন কিনা জানি না। মাও আমার প্রিয় অধ্যাপক সম্বন্ধে অন্য কোনও সূত্রে কিছু তখনই জেনেছিলেন বলে মনে হয় না। বরং বাড়িতে আসার ফলে আমার স্বাধীনতা আরও বেড়ে গেল। রাত্রে খাওয়ার পরে এটাদির সঙ্গে বা মাদমোয়াজল বুর্দার সঙ্গে বেড়াতে গেলে মা কোনওদিন আপত্তি করেন নি। কত রাত্রে লাল বাঁধের ধারে কাঁকরের উপরে শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্নারাতে মাদমোয়াজেলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে গল্প করেছি।

মাদমোয়াজেল বুর্দার সঙ্গে আমার অধ্যাপকের যদিও আলাপ পরিচয় তেমন জমেনি, আমার সঙ্গে কিন্তু তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে আমরা কয়েকজন ফরাসী ভাষার পাঠ নিতে যেতাম। রেবাদি এবং মধুশ্রী রায় আমার সহপাঠিনী ছিল। মধুশ্রী তখন ইস্কুলের মেয়ে। তার ব্যবহার এবং তার গান মাদমোয়াজেল খুব পছন্দ করতেন। তার নামের অর্থ জেনে নিয়ে তাঁর ফরাসী নামকরণ করেছিলেন Beaute de printeau (বসন্তের সৌন্দর্য)। এই পাঠ নিতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল। তাঁর ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আমাদের কিছু দুর্বোধ্য লাগত না। আমি নিজেও কিছু আহামরি ইংরেজি বলতাম না। হিন্দী ভবনে ক্লাস নেবার পরে তাঁকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা টাটা বিল্ডিং-এর কাছাকাছি স্কলারস ব্লকে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। কিন্তু এর পরেও অনেক দিনই রাত্রে খাওয়ার পরে একটা টর্চ হাতে আমাদের বাড়ি এসে পৌঁছতেন। এ বাড়িতে যেহেতু কোনও পুরুষ অভিভাবক ছিলেন না, তাই বোধহয় ওই অসময়ে আসার ব্যাপারে অনেকটা সহজ বোধ করতেন।

ততক্ষণে আশ্রমের ইলেকট্রিক লাইটও প্রায় নিভিয়ে দেওয়া হত। তখন আমাদের প্রিয় গন্তব্য ছিল লাল বাঁধের ধারে খোয়াই—রেবাদিদের বাড়ির পেছন দিকে। সেই খোয়াইয়ে শুয়ে শুয়ে আমরা কত যে গল্প করতাম ভাবলে অবাক লাগে। অথচ দু-পক্ষেরই ভাষার অপ্রতুলতা ছিল, কিংবা আমার ভাষাও উনি কতটুকু বুঝতেন জানি না। তবে তাঁর একটি উচ্ছ্বসিত উক্তি মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। স্বল্প জ্যোৎস্নালোকিত রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠছেন 'ci bleau ci clare !' (so blue so clear)।

কিছুকালের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরে যান। মনে হয় তাঁর গবেষণার কাজ বিশেষ অগ্রসর হচ্ছিল না। দেশে ফিরে গিয়েও বার কয়েক চিঠি লিখেছিলেন—অবশ্যই অতি সুন্দর ফরাসীতে। আমি ভাঙাচোরা ইংরেজির সঙ্গে দু-চারটে ফরাসী মিশিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু এই বন্ধুত্বকে রক্ষা করা যায় নি! কিন্তু অনেকগুলি রজনী গভীর হওয়া পর্যন্ত আমরা খোয়াই-এ শুয়ে শুয়ে কী দারুণ উপভোগ করেছিলাম। আমার কী ভাগ্য ওই সময়ে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে আমার মা কোনও বাধা দেন নি।

সে সময় অনেকদিন সন্ধ্যাটা গড়িয়ে রাত হত যখন ছান্দসিক কন্যা রেবাদি আর আমি গল্প করতে করতে পরস্পরকে বাড়ি পৌঁছতে থাকতাম। একবার সে আমাকে পৌঁছতে এসে আমাদের বারান্দায় দু-চারটে কথা বলার পর আবার আমি যেতাম তাকে পৌঁছাতে। এই চলত আর কী!

অধ্যাপকের কাছে সন্ধ্যার পরে যাওয়ার সাহস আমার যদি বা ছিল, তাঁর দিক দিয়ে প্রশ্রয় দেবার সাহস একেবারেই ছিল না। মাত্র একদিন তিনি বাড়ি নেই দেখে তাঁর একটা জানালার ভিতর দিকে কিছু ফুল রেখে চলে এসেছিলাম। তাতে আমার নির্বুদ্ধিতাকে অত্যন্ত নিন্দা করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি কখন এসেছি, কখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফিরে যাচ্ছি, তিনি বাড়িতে ছিলেন কি ছিলেন না, সেটা হয়ত কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু কেউ কেউ দেখেছে, আমি তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছি। অন্য কেউ হয়ত দেখেছে, আমি তাঁর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছি। আমি কতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম, সে বিষয়েও যাঁর যা ইচ্ছে অনুমান করে নেবেন। এই রকম নির্বোধের মতো অপবাদ কুড়োনোর কোনও প্রয়োজন আছে কী?

আমাদের নিজেদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এবং আমেরিকার জন্য যাত্রা করার আগে বাবা ক-দিনের জন্য আবার শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। ক-দিনেই আমাদের জীবনযাত্রার ধরনধারণ দেখে তিনি তো অবাক। এমনকি তাঁর গৃহবন্দিনী গৃহিণীও যে নতুন করে কী এক মুক্তির আশ্বাস পেয়েছেন। খানিকটা অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এখানে কী একটা ঘূর্ণি হাওয়া আছে, এদের সবারই সেই ঘূর্ণি হাওয়ায় পেয়েছে। কেবল দেখি বাড়ি আসে আর যায়।'

কথাটা নেহাত ভুল ছিল না। আমরা পাঁচ বোনেই একেবারে সকাল বেলায় ক্লাস করতে চলে যেতাম। তারপর দুপুরে বাড়ি ফিরে হুড়মুড় করে সংসারের কাজ কিছু সেরে এবং খেয়ে দেয়ে আবার শালবীথির পথে উধাও হতাম। ক্লাস সেরে ফিরতে বিকেল চারটে হয়ে যেত। তারপর প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই থাকত কোনও না কোনও ভবনের এবং পাঠভবনের হয় আদ্য, নয় মধ্য, নয় অন্ত বিভাগের সভা বা নাচ গান অভিনয়। মা রাতের রান্না বিকেলেই সেরে ফেলে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতেন। সেগুলি বেশির ভাগই তখন লাইব্রেরির বারান্দায় হত।

বাবা কয়েকদিনেই যা দেখে গেলেন, তাতে ওঁর মনে হল, এদের শান্তিনিকেতনে আসা ব্যর্থ হয় নি।

*

জানুয়ারির মাঝামাঝি আবার যথারীতি পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল। মার্চের শেষের দিকে হঠাৎ একদিন ইংরেজি ক্লাস হয়ে গেলে হীরেনদা আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'গৌরী, আইয়ুব সাহেব তোমাকে একবার ডেকেছেন। তাঁর শরীরটা ভালো নেই।'

আমি বিচলিতভাবে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কী হয়েছে ওঁর?

উনি একই ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলেন, 'ওই যা তাঁর হয় আর কী, খুব ভাবনা করার মতো কিছু নয়।'

উনি চলে গেলে আমি আর পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করলাম না। তখন হয়ত বেলা সাড়ে এগারোটা আমি কাউকে কিছু না বলেই ওঁর বাড়িতে চলে গেলাম। আমি ঠিক মনে করতে পারছিলাম না যে ওঁর কী হয় যার জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই। তাই আমার খুবই দুর্ভাবনা হচ্ছিল।

আইয়ুব দরজা খুলে দিলে চোখে পড়ল যে তাঁর বেশবাস ও চুল খানিকটা অবিন্যস্ত। উনি ওঁর শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমিও পিছন পিছন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উনি খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একটা হাতে মশারি বাঁধবার দণ্ডটি ধরে বললেন, 'কাল রাত থেকে আমার রক্তবমি হচ্ছে।'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কী।

উনি বিছানায় বসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বললেন। আমি দুই হাতে আমার বই-খাতা-আসন জাপটে ধরে শুনতে লাগলাম। মাথা ঝিম ঝিম করছিল। মুখ হয়ত ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

উনি তখন বললেন, 'তুমি অত ঘাবড়ে যেও না। টিউবারকিউলোসিসের আর কোনও সিমটম এখনও নেই। তবে কয়েকদিন বিশ্রাম করে কলকাতা গিয়ে একটা থরো চেক আপ করা দরকার। তোমাকে আসল কারণটাই বললাম, যেন তোমার মনটা প্রস্তুত থাকে। আর সবাইকে সব কথা বলবার দরকার নেই। শুধু ভেবে দেখ, তোমার কোনও বন্ধু, আমাকে সঙ্গে করে কলকাতা নিয়ে যেতে পারবে কিনা।'

আমি তাঁর বাড়ি থেকে এসে কিছুক্ষণ ছাতিমতলায় চুপচাপ বসে রইলাম। আবার ঘণ্টা পড়লে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। তবে বাড়ি যাওয়ার পথে কিচেনে একটু খোঁজ করে গেলাম, দামু আছে কিনা।

অল্প একটু অপেক্ষা করার পরেই সদাপ্রসন্ন দীর্ঘাঙ্গ পুরুষটিকে দেখতে পেয়ে বললাম, 'দামু, তুমি খাওয়া-দাওয়ার পর একটু আমাদের বাড়ি এস।'

সেদিন দামোদর রেড্ডিকেই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু মনে হয়েছিল।

তখন জলকষ্টের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি হত পয়লা বৈশাখের রবীন্দ্র জন্মোৎসব সেরে নিয়ে। অধ্যাপক ছুটি হবার কিছু আগেই দামোদর রেড্ডিকে সঙ্গে করে কলকাতা চলে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত বা ছুটির আগেই আর একবার ফিরে আসবেন। কিন্তু দামু তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসে বলেছিল, তার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ অসুখ সংক্রান্ত সমস্ত অনুসন্ধান এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। মনটা একটু দমে গিয়েছিল। যাই হোক, দামু খুব উৎসাহের সঙ্গে অধ্যাপকের বাড়িতে একদিন কাটাবার গল্প শোনাল।

এরপর গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতেই আশ্রম একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এবার শূন্যতাটা আরও যেন বুকে চেপে বসল। কিন্তু ক-দিন পরেই দেখা গেল আশ্রমের এই নিরিবিলি অবসরের অন্য এক গভীর আনন্দ রয়েছে। তখন স্থায়ী আশ্রমিকদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হত।

আমার তখনও আশা ছিল যে গরমের ছুটি শেষ হতেই উনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবেন। কিন্তু দেখা গেল ডাক্তারদের বিধান হল অন্যরকম। তাঁকে আরও মাসখানিক বিশ্রাম করে ফিরবার অনুমতি তাঁরা দিয়েছিলেন এই শর্তে যে খুব বেশি পরিশ্রম করবেন না। ওঁর অনুপস্থিতির সময় তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আলো জ্বলত, যখন তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে কলকাতার বন্ধুরা কেউ বেড়াতে যেতেন। একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো এক বন্ধু একশো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বালিয়ে রেখেই ফিরে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে প্রতিবেশীরা বুঝতে পারলেন যে বাড়িতে মানুষ নেই, কিন্তু দিবারাত্রি আলো জ্বলছে। তখন মেইনটেন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এসে মেন সুইচ বন্ধ করে আলো নেভালো।

উনি কলকাতায় চলে যাবার আগেও মাঝেমাঝেই কলকাতা থেকে বন্ধু বান্ধবীরা বেড়াতে যেতেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার, মাধবীর এবং আমাদের আরও কোন কোন বন্ধুর আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সবান্ধব অরুণ ও মানসী দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা প্রতিমা দাশগুপ্ত (পরে Pratima Bowes)। শান্তিনিকেতনে তাঁদের নিয়ে ঘুরে দেখাবার কাজটা আমরাই মাঝে মাঝে করতাম।

যদিও শান্তিনিকেতনে একটানা বাস করার সুযোগ আইয়ুব খুব বেশিদিন পান নি, তবু ওই অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকজনের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক হয়েছিল। হীরেনদা এবং প্রবোধদার কথা তো আগেই বলেছি। মাঝে মাঝে নন্দলাল বসুর (মাষ্টারমশাই) সঙ্গে বসে চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মাষ্টারমশাই সাগ্রহে তাঁর নানা পর্যায়ের ছবি দেখিয়েছিলেন। সে বিষয়ে আইয়ুবের মতামতও জানতে চেয়েছিলেন।

আরও একজনের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ হত, তিনি ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁর বাড়িতে যত না যেতেন, বিদ্যাভবনে তাঁর যে বিশেষ কক্ষ ছিল সেখানে বসে মধ্যযুগের সাহিত্য বিশেষ করে মীরার ভজন নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল। মীরার কোনও কোনও ভজন আইয়ুবের সমস্ত জীবনকেই একটি বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছিল। যখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁর পড়াশুনা করার ক্ষমতা ছিল না, শুভলক্ষ্মীর রেকর্ড তিনি দিনের পর দিন বাজিয়ে শুনতেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ভজন ছিল, সুনি ম্যায় হরি আওন কি আওয়াজ...।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী তখন বিনয় ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। এবং সেই সুবাদে আইয়ুবের সাক্ষাৎ-সম্পর্ক ছিল তাঁরই সঙ্গে। এই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মানুষটি আইয়ুবকে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। এঁর সঙ্গে অবশ্য 'পরিচয়'-এর যুগ থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল।

মাঝে মাঝেই অনিল চন্দ ও রানী চন্দর সঙ্গেও সুন্দর কিছু সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন। রানীদির সরস গল্প এবং গুরুদেবের স্মৃতিচার তাঁদের কোনার্ক বাড়ির বারান্দায় বসে শুনে আসতেন। বাংলা এবং উড়িষ্যার নানা মন্দিরের প্রাচীরে খোদাই করা মূর্তির প্রতিকৃতি কী করে তাঁরা সংগ্রহ করতেন মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে গিয়ে, সেই সব গল্প শুনে এসে আমাদেরও শুনিয়ে ছিলেন।

গরমের ছুটি কেটে গেল, তবু তিনি ফিরলেন না দেখে মনটা একটু বিমর্ষ হয়েছিল। কিন্তু এক মাস পরে তাঁর বউদি এবং বউদির সঙ্গে ফুটফুটে একটি নাতনী সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন। তখন তাঁদের দেখভাল করার দায়িত্ব পেয়ে আমি তো বর্তে গেলাম। বিশেষ করে ছোট্ট শিশু রীনার। অবশ্য বউদির দেখভাল করার খুব প্রয়োজন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হত না। তিনি অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েই পরিচয় করে নিয়েছিলেন। তিনি অসংকোচে 'আমি আইয়ুবের বউদি' বলে চমৎকার ভাব করে নিতে পারতেন। একদিন আমাদের বাড়িতেও তাঁকে নিয়ে এলাম।

ছোট্ট রীনার সঙ্গে তখন থেকেই আমার হিন্দুস্থানী (হিন্দি ও উর্দুর মিশ্রণ) ভাষায় কথাবার্তা হত, কারণ বউদি সেটাতেই উৎসাহ দিচ্ছিলেন এবং আইয়ুবও এই কারণে সমর্থন করছিলেন যে বালিকাটি কলকাত্তাই উর্দু ভাষাতে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্থ ছিল এবং আমি হিন্দি জানতাম। তাই মাঝামাঝি রফা করা গিয়েছিল হিন্দুস্থানীতে। ছেচল্লিশ বছর ধরে এই ভাষাতেই আমরা কথা বলে আসছি, যদিও অনেকেই তাতে কৌতুক বোধ করে। রীনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোন গভীরে পৌঁছে গেছে, তা শুধু আমাদের মনই জানে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিকমতন গুছিয়ে বসতে না বসতেই আইয়ুব আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এবং আবার দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত করে তাঁকে ফিরে যেতে হল।

কিছুদিন পর্যন্ত খুব দিশেহারা লাগছিল। কিন্তু চিঠির আদান-প্রদান আমাকে কিছুটা নতুন সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করল। আমরা মোটামুটি ধরেই নিলাম যে এভাবে চাকরি করা তাঁর আর চলবে না। কারণ নানা রকম কঠিন চিকিৎসার নির্দেশ আসতে লাগল। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। একবার শোনা গেল Lobectomy করতে হবে। আর একবার ডাক্তাররা বিধান দিলেন Thoracoplasty করতে হবে। তিনি নিজেও যতখানি উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ বোধ করতেন, আমি তো তাঁর চেয়ে কম করতাম না, কিন্তু কী করে তাঁকে কলকাতায় দেখতে আসব?

নিজের চশমা ভেঙে চশমা সারাবার অজুহাত সৃষ্টি করে (বোলপুরে তখনও তার ব্যবস্থা বিশেষ ছিল না) কলকাতা আসবার সুযোগ পেলাম। মার কাছ থেকে তার অনুমতি পাবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে খবর দিলাম যে দু-তিন দিনের জন্য কলকাতা যাব, এবং পার্ক স্ট্রীটে আমার মামাবাড়িতে থাকব। উনি পত্রপাঠ জানালেন, কীভাবে সেখান থেকে এইট-বি বাস ধরে যাদবপুর টার্মিনাসে পৌঁছে খানিকটা পায়ে হেঁটে কে. এস. রায় হসপিটাল পৌঁছতে পারব।

সত্যিই গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম। ভিজিটিং আওয়ার শুরু হতে না হতেই তিনি দোতলায় তাঁর ঘরের জানালায় বসেছিলেন গেটের দিকে তাকিয়ে।

জীবনে সেও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যে দু-তিন দিন থাকা সম্ভব হয়েছিল, প্রত্যেক দিনই ভিজিটিং আওয়ারটুকু তাঁর সঙ্গে কাটাতে পেরেছিলাম। শেষ দিনে চলে আসার সময়ে সত্যিই দিশেহারা বোধ করছিলাম যে আর কি কখনো আমাদের আবার দেখা হবে? উনি নিজে তো ধরেই নিয়েছিলেন যে ওই রকম আসুরিক চিকিৎসা হলে তিনি আর বাঁচবেন না।

এরপর নানা দিক থেকে তাঁর লাংস-এর এক্স-রে করেও নিশ্চিতভাবে ঠাহর করা গেল না যে ক্ষতটির অবস্থান ঠিক কোথায়। সম্ভবত কোনও পাঁজরার হাড়ের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল, তাই এক্স-রে'তে ধরা যাচ্ছিল না। আর নানা রকম জটিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসার কথায় রোগী যে দ্রুত আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এবং প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, তা লক্ষ্য করে প্রধান চিকিৎসক ডা. পি. কে. সেন অবশেষে স্থির করলেন যে অপারেশন না করাই ভালো, অন্য যা কিছু চিকিৎসা তাই চলতে থাকুক বাড়িতে বিশ্রামে রেখে। অতএব তিনি বাড়ি ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তখনও নিশ্চিত করে ভাবিনি তিনি আর কোনওদিনই শান্তিনিকেতনে ফিরবেন না। ক্রমে সে সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। নানা অছিলায় দু-এক দিনের জন্য কলকাতায় এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ছাড়া দেখা-সাক্ষাতের আর কোনও পথ রইল না। উনি অবশ্য চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

ওঁর অনুপস্থিতির সময় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা হল সাহিত্যমেলা। সেটা ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা। তত দিনে অন্নদাশংকর রায় চাকরি থেকে আগেভাগেই অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করছিলেন মন দিয়ে লেখালেখি করার জন্য।

সে সময় শান্তিনিকেতনে অন্নদাশংকর রায় এবং লীলা রায়ের সংসারটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্যশ্লোক তো আগেই এসে বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়েছিল। এবার ছোট তিনটি সন্তানও সেখানকার ছাত্রছাত্রী হল। ওঁদের সংসারটি আর পাঁচটি সংসারের মতো ছিল না। সন্তানদের তাঁরা অপরিমিত স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছিলেন। তাই ওরা কে কখন কোথায় কী করছে, তার খবরও সব সময় তাঁরা পেতেন না। কিন্তু ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে ব্যাকুল মা তাদের সন্ধানে বেরোতেন। কতদিন দেখা যেত কনিষ্ঠা কন্যা তৃপ্তিকে কোলে করে মা বাড়ি ফিরছেন। কোথাও ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সে কিন্তু তখন মোটেই কোলের শিশুটি ছিল না। লীলা রায় তাঁর বিচিত্র সংসারটি পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখাপড়াও যেমন করতেন, তেমনি স্বামীকেও নানাভাবে সাহায্য করতেন। স্বামী যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে আছেন, এবং তাঁকে নানাভাবে সুযোগ দেওয়া দরকার, এ বিষয়ে মাসীমার মত সদা যত্নশীল আরও একজনকেই দেখেছিলাম, তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী এলেন রায়। অবশ্য তাঁকে যখন দেখেছি তখন তাঁর স্বামী গত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ যে ভাবে তিনি দু-হাতে করে চলেছিলেন তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, স্বামী যখন বর্তমান ছিলেন তখন তাঁকে এবং তাঁর কাজকর্মকে কীভাবে লালন করতেন তিনি। আইয়ুব এবং আরও বহু ব্যক্তির কাছে সেইসব কথা শুনেছিলাম। ইদানীং প্রায়ই ভারতীয়রা মহিলাদের পাতিব্রত্য নিয়ে উচ্ছ্বাস শুনতে পাই। কিন্তু এই দুই বিদেশিনী মহিলার যে নিঃস্বার্থ স্বামীপরায়ণতা দেখেছিলাম, তেমনটা আমি আমার দেশের কোনও সতী-সাধ্বীকে দেখিনি।

সে সময় নিমাই চট্টোপাধ্যায় নামে একজন অনেকের সুপরিচিত কৃতী কিন্তু পরীক্ষা বিমুখ ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে জুটেছিল কাজের সন্ধানে। সে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি-র সম্পাদক ক্ষিতীশ রায়ের সহকারী নিযুক্ত হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি 'তিন সঙ্গী'তে থাকত। অল্প দিনেই সে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এবং আমার সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। আর অন্নদাশংকর রায়-দম্পতির সঙ্গে তার অনেক আগে থেকেই ঘনিষ্ঠতা ছিল পুণ্যশ্লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে। তবে সে যখন শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এল, ততদিনে পুণ্যশ্লোক বিশ্বভারতী থেকে বি.এ.-তে ভালো রেজাল্ট করে সরাসরি পি. এইচ. ডি. করবার জন্য জার্মানীর Göttingen বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিল। তাই পুত্রপ্রতিম নিমাই অন্নদাশংকর এবং লীলা মাসীমার ঘরের ছেলের মতো ছিল।

অন্নদাশংকর রায় এবং নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পিত 'সাহিত্যমেলা' যে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিতেই করা হচ্ছিল, সেকথা কাউকেই ঘুণাক্ষরেও জানানো হয়নি, পাছে পাকিস্তানী সরকারের প্রতিকূলতায় সেখান থেকে কোনও সাহিত্যিককেই 'সাহিত্যমেলায়' যোগ দেবার জন্য পেতে অসুবিধা হয়।

'সাহিত্যমেলা'কে সুপরিচালনার জন্য শান্তিনিকেতনে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছিল। কমিটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন অন্নদাশংকর রায়। দু-জন সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিল নিমাই চট্টোপাধ্যায় আর গৌরী দত্ত।

পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির মানচিত্রটি ছিল নিমাইয়ের নখদর্পণে। আর আমি ছিলাম সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। পাটনায় বড় হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগ প্রায় ঘটেই নি। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসেই ক্রমে সেই জগৎটাকে আবিষ্কার করলাম। আর সাহিত্যমেলা-র জন্য কাজ করতে এসেই তা সত্যিকারের জানা হল।

মেলাটা যে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের মেলামেশার সুযোগ করার জন্যই বিশেষ করে আহ্বান করা হচ্ছে, সেইটে যোগদানকারীদের এবং শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। গতানুগতিক সেমিনার কি কনফারেন্স না হলেও যোগদান-কারীদের অনুরোধ করা হয়েছিল যেন তাঁরা সাহিত্যের এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে কোথায় কী সৃষ্টি হয়েছে তার একটা পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। কবিতা, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য,·লোকসাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বাংলা থেকে কাকে কাকে আহ্বান করা হবে, তার তালিকা যখন নিমাইয়ের সাহায্যে অন্নদাশংকর করছিলেন, আমি বাংলা সাহিত্যের জগৎটাকে জানবার সুযোগ পাচ্ছিলাম। এমনকি কারা প্রগতিশীল সাহিত্যিক আর কারা নয়, তাও তখন আমার জানা ছিল না।

প্রতিদিনই অন্নদাশংকর রায় ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বসে সভার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকল্পনা করছিলাম। বিশেষ করে কীভাবে টাকা তোলা হবে, তার পরিকল্পনা। কারণ বিশ্বভারতী অন্য বিষয়ে আনুকূল্য দিলেও তার কাছ থেকে অর্থসাহায্য পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তার নিজেরই আর্থিক অনটন 'প্রবাদতুল্য ছিল' অবশ্য অল্প দিন পরেই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমরা ছাত্রছাত্রীরা কয়েকজন ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এবং বেশ ভালো সাড়া পেয়েছিলাম। তাই আমরা অন্তত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত প্রতিনিধিদের পাথেয়টুকু দিতে পেরেছিলাম।

তখন অবশ্য সময় আর হাতে খুব বেশি ছিল না। সেজন্য অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঠাও সম্ভব হয়নি। যাই হোক, আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেই বেশ সমারোহের সঙ্গে মেলা অনুষ্ঠিত হল। আমন্ত্রিত অতিথি-সাহিত্যিকদের আতিথ্যও দেওয়া সম্ভব হল। কারণ অনেকে তাঁদের বাড়িতেই সাগ্রহে এই অতিথিদের রাখতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তাছাড়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষও আতিথ্য দিলেন বিশিষ্ট কয়েকজন অতিথিকে।

জনাকয়েক পূর্ব বাংলার সাহিত্যিককে পেয়েই সবার আগ্রহ অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আসতে পেরেছিলেন কেবলমাত্র অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, হারানিধি-খ্যাত মহম্মদ মনসুরউদ্দিন, শামসুর রাহমান এবং কায়সুল হক। শামসুর রাহমান তখন অবশ্য তরুণ এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কবি বলেই পরিচিত হয়েছিলেন। ওঁদের বিশেষভাবে দেখাশুনো করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ বাংলার কাজী আবদুল ওদুদ।

চার দিন পর মেলা যখন ভাঙলো, তখন আমাদের মনের অবস্থা বিজয়া দশমীর বিসর্জন শেষের মতো।

এত বড় আনন্দানুষ্ঠান হয়ে গেল, কিন্তু আইয়ুবের তাতে কোনও ভূমিকাই ছিল না, এটা আমার মনের মধ্যে অহরহ বিঁধছিল। তিনি রোগশয্যায় শুয়েও কয়েকটি চিঠিতে বেদনা প্রকাশ করেছিলেন যে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলার মতো ঘটনাটি ঘটে গেল, কিন্তু তিনি তার কিছু আভাসটুকুও পেলেন না। সত্যি কথা বলতে কী, সে সময়ে আমার মনের একটা কোণে মেঘ জমে থাকত বিশেষ করে এই কারণেই যে, যে-মানুষটি শান্তিনিকেতনকে এবং আমাকেও এতখানি দিতে পারতেন, তার কিছুই দিতে পারলেন না তাঁর নির্মম ভাগ্যের প্রতিকূলতায়।

আমি বি. এ. পাশ করার পরেও বিশ্বভারতীতে আরও এক বছর ছিলাম বিনয় ভবনে বি.টি. পড়বার জন্য। কারণ ততদিনে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমার হার্দিক ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা আমার পিতা ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। যদিও বিশ্বভারতীতে দর্শনে এম-এ- পড়ার কোনও সুযোগ ছিল না, এবং পড়তে হলে কলকাতাতেই আসতে হত, তবু আমাকে কলকাতায় পাঠাতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

তিনি উৎসাহ দিলেন যেন আমি ওখানেই শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হই। আমিও তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য স্কুলে চাকরি করতে পারব আশা করে বিনয় ভবনে ভর্তি হতে রাজি হয়ে গেলাম।

তবে এক বছরের ট্রেনিং শেষ হলে দেখা গেল আমার পিতার পরিকল্পনাটি অন্য রকম ছিল। তিনি আমাকে এর পর লন্ডনে পাঠাতে চাইলেন 'টিচার্স ডিপ্লোমা' নেবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য। এবং তার মস্ত বড় আর্থিক দায়িত্বও বহন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

অবশ্য রাজনীতি থেকে যত সহজে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে পেরেছিলেন, প্রেম থেকে সরিয়ে তেমন করে বিলেত পাঠাতে পারলেন না। ফলে তাঁর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল।

বি.টি. পরীক্ষার ফল বার হওয়ার পরে আর যে কটা দিন বাড়িতে ছিলাম, তখন আমেরিকা থেকে ফিরে বাবাও সেখানে ছিলেন। প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যা আমার সঙ্গে বসে তিনি কথা বলতেন, যখন বাড়ির অন্যেরা নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমের দিকে চলে যেত।

চাপা গলায় তর্জন করে বলতেন, আমার যে এতটা অধঃপতন হবে, তিনি তা কল্পনাও করতে পারেন নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে কিছুকাল আগে তাঁর কাছে গবেষণারত ছাত্রীর প্রেম নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সে-বিষয়ে তির্যক উল্লেখ করে বলেছিলেন, অধ্যাপকরা অসংযত হলে কী নিদারুণ লজ্জার ব্যাপার ঘটে! অধ্যাপক—গুরু, পিতৃতুল্য কন্যাসমা ছাত্রীর সঙ্গে এরকম আচরণ ক্ষমা করা যায় না।

যাই হোক তিনি আবার জানিয়ে দিলেন যে কলকাতায় গিয়ে এম. এ. পড়তে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সম্মতিও নেই এবং সাহায্যও থাকবে না।

ওই সময়ে শান্তিনিকেতনেও একটা ঝড় উঠেছিল। সে বিষয়ে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'তোমরাই তো দেখি এই ঘটনার নিন্দা করো, তাহলে তুমি কী করে এমন অশালীন আচরণ করতে পারলে?'

তখন ভাগ্যক্রমে আসানসোলের কাছে ঊষাগ্রামে একটা মেথডিস্ট মিশন স্কুলে চাকরির প্রস্তাব এল। আমি তো এক বাক্যে রাজি। পিতাও শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, আমি তাহলে আরও দূরে চলে যেতে বাধ্য হব—কলকাতা থেকে নিরানব্বই মাইলের পরিবর্তে একশো পঞ্চান্ন মাইল দূরে মিশনারি কড়াকড়ির মধ্যে।

আমিও বেশ শান্ত এবং সহযোগী পরিবেশে আমাদের সংসার ছেড়ে রওনা দিলাম। শান্তিনিকেতনে আসার সময় পাটনাতে মা যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়েছিলেন, এবারও তেমনই দিলেন। গরমের দিনের উপযুক্ত অল্পস্বল্প জিনিসপত্র নিয়ে নিলাম। সবাই ভাবছিল, এছাড়া আর যা প্রয়োজন হবে তখন শান্তিনিকেতন এসে নিয়ে যাব।

এ ভাবেই শান্তিনিকেতনের কয়েক বছরের শিক্ষাজীবনের সীমা ফুরিয়ে গেল। সেখান থেকে ঊষাগ্রাম যাওয়ার সময় স্বপ্নেও ভাবিনি আমি কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতা এসে আইয়ুবের সঙ্গে ঘর-সংসার শুরু করতে পারব।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৮ (১৪০৫) সং ২, পৃঃ ১২২-৮
সং ৩, পৃঃ ২১২-৬ সং ৪, পৃঃ ২৭৪-৮১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উষাগ্রাম মেথডিস্ট মিশন

উষাগ্রাম মেথডিস্ট মিশন গার্লস স্কুলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা পাদরীরা শান্তিনিকেতনের কাছ থেকে অনেকখানি প্রেরণা লাভ করেছিলেন। বেশ বড় সড় কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কটেজ ছিল, যাতে দশ বারো জন করে মেয়ে থাকত, একই সঙ্গে ছোট বড় মিলিয়ে। তারা নিজেরাই নিজেদের সব কাজকর্ম করত, রান্না ঘরদোর পরিষ্কার করা, সবই করত।

ওই আবাসিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীরাও কম্পাউন্ডের ভিতরেই থাকতেন। আমরা আট দশ জন অবিবাহিত শিক্ষিকা ছিলাম। একটা টানা বারান্দা সামনে রেখে পর পর আমাদের ঘরগুলি ছিল। বেশ সুন্দর টালিতে ছাওয়া। জানালা দরজায় নেট লাগানো, যাতে মশা-মাছির উৎপাত না থাকে। এ ধরনের ভাবনাটা অবশ্য বিদেশী, তবে সুখকর। শান্তিনিকেতনের ঘরবাড়িতে এ জাতীয় ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যেত না। আমাদের সব ক'জনের রান্নাখাওয়ার ব্যবস্থা একই সঙ্গে ছিল।

রাঁধুনী ছিল যে বোবা প্রৌঢ়াটি, তার মতন গল্প করতে উৎসুক মানুষ আমি কম দেখেছি। আমাদের অবসর আছে দেখলেই আমাদের ঘরে এসে ঢুকে পড়ত এবং হাত পা চোখ মুখ ঘুরিয়ে কত যে গল্প করে যেত, একটানা আঁ-আঁ শব্দ করতে করতে। আমাদের সম্বন্ধে তার কৌতূহলেরও অন্ত ছিল না। অকপটেই নানা রকম প্রশ্ন করে যেত। আমরাও যথাসাধ্য হাত-পা নেড়েই উত্তর দিতে চেষ্টা করতাম, কারণ কানে তো সে শুনতে পেত না।

স্কুল বাড়িটিও বেশ প্রশস্ত ছিল। একটি ছোটখাটো লাইব্রেরিও ছিল। আমাকে লাইব্রেরিয়ানের দায়িত্ব দেওয়া হল। এবং নতুন বই কিনবার অনুমতিও দেওয়া হল।

ছাত্রীগুলি ভারী লক্ষ্মী ছিল। শান্তিনিকেতনের তুলনায় খুবই সাদাসিধে এবং শিক্ষিকাদের ভালোবাসার জন্য, সেবা করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। ছাত্রীরা অবশ্য অধিকাংশই আশেপাশের কোলিয়ারী অঞ্চল থেকে আসত, এবং অনেকেই তারা বেশ সচ্ছল ঘরের মেয়ে ছিল। তাদের মধ্যে হিন্দু মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। তবে আবাসিকরা প্রায় সকলেই ছিল খ্রীস্টান।

এদিকে বাবা তো এখন মনে করেছিলেন, ওই আবাসিক বিদ্যালয়ের বাধানিষেধ কাটিয়ে কলকাতা পৌঁছনো সহজ হবে না। কিন্তু শিক্ষিকাদের উপরে মিশন কর্তৃপক্ষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোটেই তেমন কোনও বাধা-নিষেধ চাপাতেন না। আমাদের কাজকর্ম হয়ে গেলে সন্ধ্যার দিকে আমরা ঊষাগ্রাম থেকে আসানসোল শহরে কেনাকেটা করতে যেতাম। সিনেমা দেখতে যেতাম। কিছু বন্ধু পরিবারের সঙ্গে দেখাশুনোও করতে যেতাম।

তবে শনিবার বিকেলগুলিতে আমি কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হতাম। একজন বৃদ্ধ মাস্টার মশাই আমাকে হাওড়াগামী দ্রুত ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতেন। রাত প্রায় ন'টা-সাড়ে ন'টায়। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি বলে কেউ কোনও প্রশ্নই তোলেন নি কোনওদিন। রবিবার ভোরে হাওড়া পৌঁছতাম। তারপর ট্রামে পার্ক সার্কাসে এসে যখন পৌঁছতাম, তখন অনেক দিনই অধ্যাপকের ঘরের দরজা খোলেনি। তবে প্রতীক্ষায় থাকায় ঘুম ভেঙে যেত অনেক আগেই। সারাটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যা হতে হতেই বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে আমাকে হাওড়ায় পাঠিয়ে দিতেন।

যে ট্রেনে ফিরতাম, তা প্রায় রাত সাড়ে তিনটায় আসানসোলে পৌঁছত। বার বার করে অধ্যাপক বলে দিতেন, ভোর না হলে যেন স্টেশন থেকে না বার হই।

কিন্তু ভয় জিনিসটা তখনও খুব একটা সংযত করত না আমাকে। আমি পৌঁছেই একটা রিক্‌সা নিয়ে ঊষাগ্রামে চলে যেতাম। রাত্তির বেলায় ওই নির্জন পথে একটি কালভার্ট সম্বন্ধে অনেকেই আমাকে নানারকম ভয়ের গল্প বলত। ওখানে নাকি প্রায়ই ডাকাতি-রাহাজানি হত।

অবশ্য রিক্‌সাওলাদের উপর ভরসা করে কখনও কোনও অসুবিধায় পড়িনি। ওদিকে স্কুলের সদর গেটে তো তখন তালা। কিন্তু তার পাশেই ছিল একটি ছোট কটেজ তাতে স্কুলের ক্লার্ক মহিলাটি সপরিবারে থাকতেন। তাঁদের দিকটায় স্কুল কম্পাউন্ডের কাঁটাতারের বেড়া খানিকটা ঢিলে হয়ে নিচু হয়ে গিয়েছিল। কারণ তাঁরাও পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য ওই অবৈধ পথে আনাগোনা করতেন।

আমি সেই বেড়া ডিঙিয়ে তাঁদের দরজায় টোকা দিলে বাড়ির গিন্নি আলো জ্বালিয়ে তাঁদের ঘরের ভিতর দিয়ে স্কুল কম্পাউন্ডে পৌঁছে যাবার পথ করে দিতেন। কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেন নি।

আমি ভোর সাড়ে চারটায় পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে আটটা পর্যন্ত ঘুমোতাম। তারপর আবার সোমবারের রুটিনের জন্য প্রস্তুত হতে আমার কোনও কষ্টই হত না। যে মাস তিনেক সেখানে চাকরি করেছিলাম, এভাবে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' করতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'র অর্থ হল এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা।

কী বিষয়ে এম. এ. পড়ব তা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আইয়ুব বললেন, 'এম.এ.-তে তোমার দর্শন না পড়াই বোধহয় ভালো হবে। কারণ ও-বিষয়ে তোমার যদি কোনও হীনমন্যতা থাকে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুব সহজ হবে না। তার চেয়ে তুমি এমন একটা বিষয় নাও, যে বিষয়ে তুমি আমাকে নতুন কিছু বলতে পারো, শেখাতে পারো। আমি চিরকাল তোমার শিক্ষক হয়ে থাকতে চাই না।'

তাই ঠিক হল, এডুকেশনে এম.এ. পড়ব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বছর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দু-তিন মাত্র বিষয়টা পড়ানো শুরু হয়েছে। আমারও সেটা ভালোই লাগল।

আমি আসানসোল ফিরে গিয়ে বাবাকে চিঠি লিখলাম যে এবার আমি কলকাতা গিয়ে এম.এ. পড়তে চাই। বাবা তাঁর পূর্বতন সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। আমার যাতে ক্ষতি হবে বলে মনে করেন তিনি, সেই ব্যাপারে কোনওরকম সাহায্য তিনি করবেন না।

এদিকে আইয়ুব তো এখন প্রায় নিষ্কপর্দক। নানাজনের কাছে ঋণে জর্জরিত। হাতে কাজকর্ম নেই। শরীরও অসুস্থ। নিজেই প্রায় অগ্রজের আশ্রিত হয়ে আছেন। তখন তাঁর বন্ধু অম্লান দত্তের পরামর্শে ঠিক হ'ল যে তিনিই আমার খরচটা এখন বহন করবেন এবং পরে আমি সেই ঋণ শোধ করব। যেহেতু আইয়ুব মনে করছিলেন, তিনি আর অল্প দিনই জীবিত থাকবেন, তাই সে ঋণের দায়িত্ব তাঁর নিজের নেবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

তখন আমার ইউনিভার্সিটির মাইনে, হস্টেলের খরচ এবং হাতখরচ মিলিয়ে মাসে আশি টাকার মতো লাগত। সেটা অম্লান দিতে শুরু করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, হস্টেলের ব্যবস্থা করা, সব কিছু তিনিই করলেন। আমি সাড়ে তিন মাসের মধ্যে উষাগ্রামের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় হেস্টিংস হাউসের হস্টেলে এসে উঠলাম।

যদিও আমাদের আশা কম ছিল, তবু আইয়ুব আস্তে আস্তে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই রকেফেলার ফাউন্ডেশনের একটা ফেলোশিপ পেয়ে গেলেন ঘরে বসে গবেষণা করার জন্য। ওঁর পক্ষে এর চেয়ে সুব্যবস্থা আর কী হতে পারে? বলা বাহুল্য, অম্লানের ঋণ তিনি শোধ করে দিতে পারলেন। এবং আমার আর্থিক দায়িত্বও নিতে সক্ষম হলেন।

এইভাবে পিতাকে অগ্রাহ্য করে কলকাতায় পড়তে আসায় পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

উষাগ্রাম থেকে চলে আসা মোটেই সহজ হয়নি। ছাত্রীরা সব চোখের জলে ভাসিয়ে দিল। আবাসিক ছাত্রীরা তাদের কটেজে নেমন্তন্ন করল। বাইরের ছাত্রীরা অনেকেই তাদের কোলিয়ারীর কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল।

বেশ ভারী মন নিয়ে আসানসোল ছাড়লাম। কয়েকজন, বিশেষ করে মিনতি মুখোপাধ্যায় কথা আদায় করল যে পুজোর ছুটি হলেই আমি আবার আসানসোল আসব ওদের কাছে।

কথা রেখেছিলাম। ওদের বাড়িতে গিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আদরযত্ন পেয়েছিলাম। এই সব লিখতে লিখতে আজ, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৭, হঠাৎ একটা টেলিফোন এল। সেই আমার মিনুরানী এতকাল পরে ফোন করে খবর নিল। এখন সেও আমার মতই আর্থ্রাইটিসে প্রায় শয্যাশয়ী। ভাবতে অবাক লাগে, সেই হাসিখুশী চঞ্চল মেয়েটির সঙ্গে ঘাঘর বুড়ি নদীটির ধারে পাথরের উপর দিয়ে আমরা কত লাফালাফি করেছি।

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশেষে কলকাতায়

কলকাতায় যেদিন ট্রাংক-বিছানা নিয়ে ভোরবেলায় পৌঁছলাম, তখন তো আর কেউ স্টেশনে নিতে আসেনি। তবে সঙ্গে আইয়ুবের দেওয়া বিস্তৃত নির্দেশ ছিল, কী ভাবে ট্যাক্সি নিয়ে চেতলা পৌঁছব। এবারেও সাবধান করে দিয়েছিলেন, সকাল না হওয়া পর্যন্ত যেন ট্যাক্সি না ধরি।

আমি সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে একটি মোটাসোটা প্রৌঢ় শিখ ড্রাইভারের ট্যাক্সি ধরে সোজা চেতলার হেস্টিংস হাউসের গেটে পৌঁছে গেলাম। তখন হয়তো সকাল ছ'টা বেজেছে।

সেখানে তো সব ব্যবস্থা করাই ছিল। সুপারিন্টেন্ডন্টের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে এম.এ.-র ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটিতে চলে গেলাম। সেখানে সেই বাড়িতেও অধিকাংশই ছিল হেস্টিংস হাউস বি.টি.কলেজের ছাত্রীরা। তাদেরই এক পাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনে এম.এ.পড়া ছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন, তারপরে ঊষাগ্রাম, তারপরে হেস্টিংস হাউস। হেস্টিংস হাউসে এত খোলামেলা বিরাট চত্বর ছিল যে আমার মনে হল না কলকাতার দম আটকানো পরিবেশে এসে পড়েছি। তখনও হেস্টিংস সাহেবের তৈরি করা বাড়িটা অবিকৃত ছিল, আজকের মতো আরও পাঁচটা দালান তুলে তার চত্বরটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়নি। হেস্টিংস হাউসের সেই বিরাট প্রাসাদের চারদিকে বাগান আর এক দিকে একটা বুজে যাওয়া খাল আমাদের অবসর বিনোদনের পক্ষে খুব উপযুক্ত জায়গা ছিল। কেয়া ঝোপে ঢাকা ওই খালটা নাকি লম্বা একটা লেকের মতো ছিল। সেখানে সাহেবরা বিবিরা নৌকো বিহার করতেন।

সামনের দিকে ছিল জাজেস কোর্ট রোড আর পেছন দিকে ছিল চেতলা রোড। চেতলার দিকে মস্ত লম্বা খাতা নিয়ে দারোয়ান বসে থাকত, আমাদের আসা-যাওয়ার খতিয়ান লিখিয়ে নেবার জন্য। বিশেষ করে রাত্রে আটটার মধ্যে ফিরেছি কিনা তা লিখে রাখা হত ওই খাতায়।

অতএব আমি অনেক দিনই ওই পথে ফিরতাম না, কারণ ফিরতে ফিরতে আটটার বেশি হয়ে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় যেমন সামনের গেট দিয়ে যেতাম। আর রাত আটটা [illegible] অনেক দিনই সেই পথেই ফিরতাম। তবে লোহার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গেট বন্ধ হয়ে যেত। এবং ওই দিকটা অন্ধকার থাকত। গেটের কাছাকাছি একটা ছোট বাড়িতে কলেজ অফিসের কর্মচারীটি থাকতেন। তিনিও তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেন। অতএব কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে লোহার গেটের দুই গরাদের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না। ভিতরে ঢুকেই ছুটতে ছুটতে কোনোরকমে গিয়ে প্রার্থনা শেষের হাজিরায় থাকা সম্ভব হত।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় চলে যেতাম পার্ক সার্কাসে। আইয়ুবের কাছে। ফিরবার সময় একটু দেরি হয়ে যেত। হাজরায় এসে তেত্রিশ নম্বর বাস পেতে মাঝে মাঝে সত্যিই দেরি হত এবং দুর্ভাবনা ঘটত। অনেক সময় ছুটির দিনেও দুপুর নাগাদ চলে আসতাম পার্ক সার্কাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য খাতায় কিছু লিখতে হত না। কিন্তু অন্যত্র যাবার জন্য লিখতে হত।

আমরা কী লিখছি তাতে দারোয়ানের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। আমার ধারণা ছিল সুপারিন্টেন্ডেন্টও সেসব পড়ে দেখতেন না। কয়েকটা ছুটির দিনে দুষ্টুমি করে লিখে রেখেছিলাম যে Gestalt Psychology-প্র্যাকটিকাল স্টাডি করার জন্য চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জি দেখতে যাচ্ছি। আমি কি আর জানি যে এর জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডিঙিয়ে একেবারে খোদ হেস্টিংস হাউসের প্রিন্সিপাল বিখ্যাত নলিনী দাশের কাছে ডাক পড়বে। তিনি এক কালে অল্প দিন আইয়ুবের কাছে ফিলসফিও পড়েছিলেন এম.এ.-তে—যখন ড. রাধাকৃষ্ণাণের ছ'মাস অক্সফোর্ড বাসের সময় তাঁর ক্লাস ভাগ করে নিতেন সুরেন গোস্বামী এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব।

নলিনীদি যথাসম্ভব গম্ভীর মুখে খাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এসব কী লিখেছ?'

আমি তো লজ্জায় ভয়ে কাঁপছিলাম। মাথা নীচু করে বলেছিলাম, 'অন্যায় করেছি, ক্ষমা করবেন।'

ওখানে তো ব্যাপারটা চুকে গিয়েছিল। কিন্তু হাসতে হাসতে আইয়ুবকে যখন কথাটা বলেছিলাম, তিনি কপট ক্রোধ প্রকাশ করে বলেছিলেন, '৫ নম্বর পার্ল রোডে তুমি শিম্পাঞ্জি স্টাডি করতে আস? ভদ্রমহিলা যদি তোমার আসল গন্তব্যটা জানতে পারেন, তাহলে কেমন হবে?'

সত্যি বলতে কী, মাঝে মাঝে তখন ছুটির দিনে ভোরবেলায় উঠে ওঁর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় আর অদূরে একটি হর্টিকালচারাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছি। তার জন্য হস্টেলে কোনও জবাবদিহি করতে হয়নি। তবে বান্ধবীদের কাছে প্রথম কিছুদিন ব্যাপারটা গোপন রাখতে হয়েছিল। তবে অচিরেই আমার সহপাঠিনী কয়েকজন এবং বি.টি.-র দুটি ছাত্রী খুব অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তারা আমার গতিবিধি সবই জানত।

তবে আমি অধ্যাপকের কাছে শুধু নয়, আমার বহু আত্মীয়-স্বজনের কাছেও যেতাম। কিন্তু এই হস্টেলে-বাস খুব বেশিদিন কপালে ছিল না। কারণ আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে সুপারিন্টেন্ডের প্রায়ই খিটিমিটি হচ্ছিল। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম যে হস্টেলে ছেড়ে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার সহপাঠিনী বান্ধবী সুনন্দা আর আমি একটা বিচিত্র আস্তানা পেয়ে গেলাম রাজা বসন্ত রায় রোডে।

তখন আমাদের ক্লাসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পড়তেন, যিনি প্রায় ক্লাস করতে পারতেন না। ক্লাস করলেও বসে বসে ঢুলতেন। কিন্তু আমরা একটা ঘরের সন্ধান করছি শুনে তিনি সজাগ হয়ে এসে জানিয়েছিলেন, যে তাঁর বাড়িতে একটা ঘর তিনি সাবলেট করতে চান। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরী করা বাড়িটা দেখে একটু হতাশ হলেও পাঞ্জাবী সতীর্থর পরিবারটি আমাদের এক মুহূর্তে আপন করে নিল।

ভদ্রলোকের অদ্ভুত একটা হিসেবিআনা ছিল। তিনি প্রচুর রোজগার করছিলেন। ভোরবেলায় প্রথম ট্রাম চালু হতেই তিনি টিউশনি করতে বার হতেন। বিড়লা, জালান, মোপানী ইত্যাদি পরিবারের বোকা-সোকা ছেলেদের অঙ্ক শেখাবার দায়িত্ব নিতেন তিনি এবং প্রচুর রোজগার করতেন। তাছাড়া একটা স্কুলেও পড়াতেন। তাই এম.এ.ক্লাস করা তাঁর বেশির ভাগ দিনই হত না। তবে তিনি বলতেন, আমাদের নোট-টোট পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারলেন না। সময়ই ছিল না পড়াশুনা করার। তবে তাতে তিনি বিশেষ কিছু দুঃখিত হন নি। হাসতে হাসতে আমাদের বলেছিলেন, 'আব পয়সা আ রহা হ্যায়, ঝপেট লেনে দিজিয়ে। আগে চলকে দেখেঙ্গে, কব ইমতিহান দে সাকে।'

কলকাতায় আসার পর থেকেই সত্যিকারের একটা জানাশোনা বোঝাপড়া হতে শুরু হল আইয়ুবের সঙ্গে। আগেকার পরিচয়টা ছিল তুলনায় পোশাকী, তখন আলাপচারিতাই ছিল মুখ্য। তারপর চিঠিপত্রে সুখদুঃখের কথা বিনিময় করার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরকে জানার খানিকটা অবকাশ ঘটেছিল।

প্রথম থেকেই তাঁর আলাপচারিতায় আমরা মুগ্ধ ছিলাম। অজস্র কথা বলতেন না। কিন্তু শিল্পিত বাক্‌ধারা ছিল তাঁর অনায়াস আয়ত্ত। তার আগে বাকশিল্প সম্বন্ধে আমি বিশেষ সচেতন হবার সুযোগ পাইনি। আমাদের নিজেদের সংসারে কম কথা বলাটাই ছিল রীতি। প্রগলভতা ছিল অমার্জনীয়। যারা এসে প্রচুর কথা বলতেন, বিশেষ করে একজন প্রতিবেশিনী, তাঁদের সম্বন্ধে আমার বাবার বেশি উঁচু ধারণা ছিল না। ওই ভারতচন্দ্রের মতো মনোভাব আর কী, 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর'।

আমাদের প্রতিবেশিনীর কথাও আমাদের কিন্তু মুগ্ধ করত। তিনি এসে আমাদের মায়ের সঙ্গে গল্প করতে বসলেই আমরা পড়াশুনা কাজকর্ম ছেড়ে উঁকিঝুঁকি মারতাম। বাবা বাড়ি না থাকলে বেশ তাঁকে ঘিরে বসেও পড়তাম তাঁর গল্প শুনতে।

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে দেখলাম, কথা বলাটাই একটা শিল্প। এবং সেই শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিলেন বেশ কয়েকজন মানুষ। তার মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশায়ের pun তো ছিল বিখ্যাত। আরও অনেকেই খুব সুন্দর কথা বলতেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন ইত্যাদি অনেকেই নিজের নিজের ভঙ্গিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরাও অনেকে বেশ কথা নিয়ে খেলা করত এবং সুন্দর কথা বলার সযত্ন চর্চা করত। কারোর বেলায় ব্যাপারটা কৃত্রিম শোনালেও অনেকেই নাকি এ বিষয়ে বেশ পারঙ্গম হয়ে উঠেছিল।

আইয়ুবও তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে কথার রাজা ছিলেন। সেই কথায় ভুবন জয় করতে পারতেন। আমার মতো সামান্য একজন মেয়ে তো কিছুই নয়।

তাঁর নিজের অবশ্য ধারণা ছিল যে কথ্য বাংলা তাঁর আসে না, যেহেতু ছেলেবেলা থেকে ওই ভাষা তিনি শোনেনও নি, বলেনও নি। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয়, তখন তাঁর কোনও জড়তা ছিল না বাংলায় আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারে। যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো কয়েকজনের সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত ইংরেজিই বেশি বলতেন। তিনি বাঙালি মহিলাদের তর্ক শুনতে ভালোবাসতেন এবং বলতেন যে মুখের ভাষা যদি শিখতে হয়, তাহলে যে কোনও ভাষাভাষী মহিলাদের কাছেই শেখা উচিত।

কলকাতায় আসার পরে দেখা গেল দার্শনিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ঘরোয়া বিতর্কেও তিনি অদ্বিতীয়। তবে লিখিতভাবে পাবলিক বিতর্কের বেশ কিছু পরিচয় তো আগেই পেয়েছিলাম তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে। আমি যখন তাঁর কাছে ইউনিভার্সিটি থেকে যেতাম, তখন অনেক দিনই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মাঝে মাঝেই বিষ্ণু দে মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে চলে আসতেন ওঁর সঙ্গে গল্প করার জন্য। এই সব মানুষদের সঙ্গে আইয়ুবের আলাপচারি নীরবে শোনাই ছিল আমার আনন্দ। আর যেদিন একা থাকতাম, সেদিন আমার খানিকটা শিক্ষার ভার নিতেন বলা যায়। তবে তাতেও আনন্দের ভাগ কিছু কম ছিল না।

অনেক দিনই নানারকম কবিতা পড়ে শোনাতেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই থাকতেন। কয়েকটি কবিতা যেন এখনও কানে শুনতে পাই, এবং মনে হয়, যেন কবির বকলমে আইয়ুবই মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন আমাকে।

...বোলো তারে, বোলো এতদিনে তারে দেখা হল...কিংবা রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-সঙ্গিনীকে নিয়ে সেই অপূর্ব কবিতা—

> একদিন বলেছিল, "জানি হাত দেখা।"
> হাতে তুলে নিয়ে হাত নতশিরে গনেছিল রেখা—
> বলেছিল, "তোমার স্বভাব
> প্রেমের লক্ষণে দীন।" দিই নাই কোনোই জবাব।
> পরশের সত্য পুরস্কার
> খণ্ডিয়া দিয়েছে দোষ মিথ্যা সে নিন্দার।

* * *

অথবা—পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা।

* * *

সেই কবিতাটি এখনও বার বার মনে পড়ছে—

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষা শেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুলমোরের থোলো।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।

* * *

বিশেষ করে 'মন শুধু বলে এ অসম্ভব, এ অসম্ভব' এই কবিতাটি এত বার পড়ে শুনিয়েছেন যে মনে হত, যেন এ নিতান্ত কাব্যচর্চা নয়।

আর পড়ে শোনাতেন সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বিশেষ করে অমিয় চক্রবর্তী—

তুমি যেন বল আর আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহরে যাই কল্পজাল বুনি...

আর তাঁর সেই প্রিয় কবিতা 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন' এবং আরও অনেক। তাছাড়া ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রেম অপ্রেমের কয়েকটি কবিতা। কখনও বা বুদ্ধদেব বসুর কোনও কোনও কবিতা। সত্যি কথা বলতে কী, আধুনিক কবিতার সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে সংরক্ত অনুভবের সঙ্গে পরিচয় হবে সে কি আমি কোনওদিন ভেবেছিলাম।

মনে পড়ে বছর চার-পাঁচ আগে যখন পাটনায় আই. এ. পড়ছিলাম, তখন আমাদের লাইব্রেরিতে কোনও এক ছিদ্রান্বেষী তুখোড় সমালোচকের (সজনীকান্ত দাস জাতীয় কেউ হবেন আর কী!) একটি বই হাতে পড়েছিল, যাতে সমর সেন থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত সব কবিদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে রেখেছিলেন। এঁদের প্রত্যেকেরই কবিতা থেকে তাঁদের কিছু মুদ্রাদোষ উদ্ধৃত করে রেখেছিলেন।

অর্থাৎ আধুনিক কবিতা পড়ার আগেই তাঁদের ভুরি ভুরি নিন্দা এবং তাঁদের কবিতা নিয়ে বিদ্রূপ আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। এতদিনে বুঝলাম সেই সমালোচক কী অর্বাচীন ও রুচিহীন ছিলেন!

ইংরেজি কবিতার মধ্যে ইয়েটস পড়ে শোনাতেন প্রায়ই—I could shriek if I

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

were not a man. I am dumb out of human dignity...আর এলিয়টের Waste Land আমাকে পড়িয়েছিলেন। তবে কলকাতা আসার আগে আমি যখন ঊষাগ্রামে ছিলাম, তখন Rupert Brook-এর একটি বই আমাকে হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'বইটা পোকায় কাটতে শুরু করেছে, বাতিল করে দিতে হবে। তুমি এটা নিয়ে পড়ে দেখ। এসব রোমান্টিক কবিতা ভালো লাগারই বয়স এখন তোমার।' বইটির মলাট খুলতেই প্রথম মহাযুদ্ধে অকালমৃত এই দেবদূতের মতো সুন্দর কবিটির চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর কবিতাও এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে পোকায় কাটা বইখানি প্রাণে ধরে বহুকাল ফেলে দিতে পারিনি।

নানা কবির যেসব কবিতা আমার ভালো লাগত, সেগুলি নিজের হাতে লিখে রাখার জন্য একটা সুন্দর মোটা খাতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন 'এটা হবে তোমার নিজস্ব সংকলন। যখন কবিতা পড়তে ইচ্ছা করবে, পছন্দসই কবিতাগুলি হাতের কাছেই পাবে।

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র প্রথম সংকলন করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একথা তো সকলেরই জানা। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণ বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন, তাই প্রথম সংস্করণটি বাজারে আর পাওয়া যেত না। আমার জন্য খোঁজ করে একটি কপিও যোগাড় করতে পারেননি। তাই তাঁর কাছে একমাত্র যে কপিটি ছিল, সেটি আমি ঘুরে ফিরে বার বার পড়তাম। বিশেষ করে সম্পাদকদ্বয়ের বক্তব্য।

সাহিত্যের দুটি শিবির সম্বন্ধে তত দিনে আমার কিছু জ্ঞান লাভ হয়েছিল।

পরবর্তীকালে যখন সিগনেটের উৎসাহে 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'র সংকলন করেন, নরেশ গুহ-র সহকারিতায়, তখন আমি একটি বিশেষ পুরস্কার পেয়েছিলাম। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালে, সে বছরই আমার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়। বই-এর দ্বিতীয় পাতায় যেখানে বইটির নাম ছাপা ছিল, তার উপরে লিখে দিয়েছিলেন, 'পঁচিশ বছরের গৌরীর জন্য', তারপর কমা, তারপর তো বই-এর ছাপানো নামটি। এবং তারও নীচে লেখা ছিল তাঁর নিজের নামটি। বইখানি আমার বড় আদরের জিনিস ছিল। জন্মদিনের এমন উপহার আর কোনওদিন পাইনি।

ওই বইটা অনেকেরই ভালো লেগেছিল। যদিও দ্বিতীয় মুদ্রণ কেন যে হল না, তা বোধহয় দিলীপ গুপ্তও ঠিক মতো বলতে পারতেন না। যেহেতু বইটা ছিল প্রেমের কবিতার এবং যেহেতু বিষয়টার সম্বন্ধে কিছু চপল-চিন্তার অবকাশ ছিল কোনও কোনও পাঠকের, তাই মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সম্পাদক মশায় ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের অবতারণা করেছিলেন প্রেম বিষয়ে। সেখানে রসের ছড়াছড়ি ছিল না। অথচ বহু পাঠকের এমনকি আমার এই রচনার অনুলেখক কামালেরও মাত্র পনের-ষোল বছর বয়সে প্রবন্ধটি এত ভালো লেগেছিল যে বইটি কিনতে না পেলেও, লাইব্রেরি থেকে এনে প্রবন্ধটি নিজের খাতায় সযত্নে লিখে রেখেছিল।

কিন্তু প্রবন্ধটি ভালো লাগেনি একজনের। আইয়ুবের কাছ থেকে বইটি উপহার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেয়ে তাঁর বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আপনাকে তো যথার্থ পণ্ডিত বলেই জানতাম, তাহলে প্রেমের কবিতার মুখবন্ধে অমন দুর্বোধ্য ভাষায় পাণ্ডিত্য জাহির করতে গেলেন কেন?'

বলাবাহুল্য, আইয়ুব মর্মাহত হয়েছিলেন। হীরেনদার সাহিত্যরুচি ও আলাপচারির অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন আইয়ুব।

আমার সাহিত্যরুচি গড়ে দেবার জন্য অনেক ইংরেজি বাংলা ছোটগল্পও পড়ে শোনাতেন। আমাকে পড়তে বলতেন আমার উচ্চারণ শুধরে দেবার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজির। কতগুলি উচ্চারণের ভুলে যে ইংরেজি ভাষাটাই অবোধ্য হয়ে যায়, সেইটিই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। যেমন কিনা আমরা অধিকাংশ বাঙালিই Ship আর sheep-এর মধ্যে তফাৎ করি না। কিংবা still আর steel, fill আর feel, mill ও meal, pill ও peal ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি অবশ্য s ও sh-এর মধ্যে ভুল করতাম না। যাকে উর্দুতে বলে সিন ও শীন দুরস্ত হওয়া সেইটে আমার ছিল, কারণ হিন্দি ভাষা জানার দরুণ স ও শ-এর মধ্যে তফাৎ করতে শিখেছিলাম। বাংলায় সে তফাৎ করা হয় না। কিন্তু ইংরেজিতে তো করা হয়। সেই বিখ্যাত জিভ মোচড়ানো বাক্য She sells sea shells on the sea shore—উচ্চারণ করিয়ে দেখেছিলেন যে আমার ই-ঈ-এর ত্রুটি ঘটলেও শ-স-এর গোলযোগ ঘটত না। তবে বাঙালি যে ভাবে W এবং V-কে নিয়ে গোলমাল করে, সেরকম গোলমাল আমারও মাঝে মাঝে হত। আবার F যে ph নয়, আর V যে Bh নয়, সেটাও সযত্নে শুধরে দিতেন। অনেক বাঙালি Fool কে Phool উচ্চারণ করেন কিংবা Vকে Bh—সে বিষয়ে সাবধান করতেন।

আমাকে খবরের কাগজ, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়ে শোনাতে দিতেন। ওঁর উদ্দেশ্যে এই ছিল না যে আমি লরেটো হাউসের ইংরেজি বলতে পারব। অত্যন্ত শ্রুতিকটু উচ্চারণগুলো যেন না করি, সেটুকুই চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝেই বলতেন যে উনি নিজে বি বি সি-র রেডিও শুনে নিজের ইংরেজি উচ্চারণ দুরস্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আমাকেও উৎসাহ দিতেন যেন আমাদের রেডিওতে দিল্লি থেকে পড়া ইংরেজি নিউজ মন দিয়ে শুনি। তাতে উপকার হবে।

এছাড়া নানা বিষয়ে—তা দর্শনই হোক্ বা জ্যোতির্বিদ্যা—সে সব বিষয়ে আমার ভাবনা চিন্তাকে উসকে দেবার চেষ্টা করতেন। স্টেটসম্যানের পেছনের পৃষ্ঠায় প্রতি মাসের প্রথমে সে মাসের আকাশের যে মানচিত্র প্রকাশ হত, সেটি সযত্নে কেটে রাখতেন এবং সেটি নিয়ে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তাঁর প্রিয় বিষয়গুলিতে আমারও যেন কিছুটা অভিরুচি সৃষ্টি হয়, তারই চেষ্টা।

আমি যদিও ফিলসফি পড়ছিলাম না, তবু বারট্রান্ড রাসেলের দুটি বই—Problems of philosophy, Myticism and Logic—প্রায়ই জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বলতেন। রাসেলের ইংরেজি স্টাইলের জন্য তো বটেই, দর্শনকে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব সমস্যা হিসেবে দেখবার অভ্যাস যাতে হয় তাও চেষ্টা করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পাঠ্য শিক্ষাতত্ত্ব বা এডুকেশন এই সব সমস্যা থেকে বিশেষ কিছু দূরে তো ছিল না। তাই সাধারণভাবেই আমি উপকৃত হচ্ছিলাম। তখন উপন্যাস পড়ে শোনাবার মতো যথেষ্ট সময় দু'জনের কারোরই হাতে ছিল না। কিন্তু ছোট বড় বেশ কয়েকটি গল্প আমরা পালা করে একে অপরকে পড়ে শুনিয়েছি। একদিন ডি এইচ লরেন্সের 'সেকেন্ড বেস্ট' গল্পটা দু'জনে মিলে পড়ার পর বলে বসলেন, 'এটা বাংলায় অনুবাদ করে ফেল দেখি।'

সোৎসাহে করে ফেললাম। ওঁর বেশ ভালোও লাগল। তখন আনন্দ সেনগুপ্তর 'সমকালীন' পত্রিকায় ওটা পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওটা পড়ে অনেকের ভালোই লেগেছিল। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমার ক্রিয়াপদে কাল ব্যবহারে কিছুটা স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষ্য করে খুশি হননি। এই গল্পটা অথবা পুণ্যশ্লোকের একটি প্রবন্ধর উপর কিছু টিপ্পনী—কোনটা যে আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা ঠিক মনে করতে পারছি না।

এরপরে একটি ভারি চমৎকার রাশিয়ান গল্প ইংরেজিতে পড়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। ওঁর উৎসাহে সেই গল্পও অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। গল্পটি বেশ দীর্ঘ ছিল। ফিনল্যান্ডের উপকূলে বহুদূরে সমুদ্রে অবস্থিত দুটি লাইট হাউসের দুই নিঃসঙ্গ কর্মীর বন্ধুত্বর কাহিনী। তারা পরস্পরকে কোনওদিন জানেনি, কোনওদিন দেখেও নি। বেতার মারফৎ পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় এবং গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। গল্পটির নাম লেখকের নাম সবই আজ ভুলে গেছি। ছাপতে দেবো দেবো ক'রে কবে যে লেখাটা হারিয়ে গেল কিছুই মনে পড়ছে না। কিন্তু ওই গল্পের নায়কদুটি চিরকালই আমার মনকে অধিকার করে আছে।

এইভাবে তাঁর সাহচর্য আমার জীবনকে এমন ফলবান করে তুলছিল যে তার ভিতর দিয়েই আমরা পরস্পরকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারছিলাম। আইয়ুব প্রায়ই বলতেন, 'দু'জন মানুষের ভালোবাসা যদি কিছু সার্থক ইন্টারেস্টকে ঘিরে পরিণতি লাভ করে, তাহলে সে ভালোবাসা সার্থক হয়, এবং দিনে দিনে পূর্ণতর হয়ে ওঠে। নইলে শুধু ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা যেন শিকড় কেটে দেওয়া গাছের মতো আস্তে আস্তে শুকিয়ে সংসারের ঊষর জমিতে ক্রমে হারিয়ে যায়।'

মাঝে মাঝে গান শোনা—বিশেষ করে ইউরোপীয়ান চেম্বার মিউজিকের রেকর্ড শোনা ও শোনানো ওঁর আর একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। শরীর ভালো না থাকায় আমাকে নিয়ে খুব বেশি বার হতে পারেন নি। কিন্তু কয়েকটি অবিস্মরণীয় বিদেশী ফিল্ম দেখার কথা মনে আছে—'Cyrano de Bergerac' 'La Putain Respectcieuse' 'Life of Hans Christian Anderson' অথবা 'The Ugly Ducking'। গ্রীম ভাইদের নিয়ে একটা ভারী সুন্দর ফিল্ম যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখন আমাদের বিয়েও হয়ে গেছে এবং শিশু সন্তানটির বয়স বছর দুয়েক। বাংলা ফিল্ম আমরা খুব বেশি না দেখলেও 'পথের পাঁচালি' 'অপুর সংসার' 'রাইকমল' একাধিকবার দেখার কথা মনে পড়ে। বিশেষ করে শেষ ফিল্মটিতে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন, এবং সেই কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবার অন্য একটি উপাখ্যান।

হেস্টিংস হাউসের ছাত্রীনিবাস ছেড়ে গণেশ দত্ মিশ্রাজীর বাড়ির একটি ভাঙাচোরা ঘরে এসে ওঠা একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বসন্ত রায় রোডে সম্ভবত সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি ছিল এই শতাব্দীর গোড়ায় তৈরি করা দোতলা দালানটি।

সহপাঠিনী সুনন্দা সরকার আর আমি এসে সেখানে উঠলাম। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের হস্টেলের নিয়ম-নিষেধ আমাদের দম আটকিয়ে যাচ্ছিল। সুনন্দা বিলেত থেকে T.D. পাশ করে এসে আমাদের সঙ্গে এম.এ.তে ভর্তি হয়েছিল। একতলার সামনের দিকের ঘরখানি আমরা পেয়েছিলাম। ভিতর দিকে মিশ্রাজী তাঁর স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে থাকতেন। দুই ঘরের সামনে দিয়ে এক ফালি ঢাকা বারান্দা, রান্নাঘর ইত্যাদি ছিল।

আমরা অবশ্য আমাদের ঘরটাকেই থাকা, খাওয়া, পড়াশুনা করা, রান্না করা সব উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছিলাম। কেবল বাথরুম ও কলতলাটা ওঁদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হত।

চৈত্রের পুকুরের মতো ফুটিফাটা ছিল ওই ঘরের মেঝে। সুনন্দা একটি জুট কার্পেট জোগাড় করে এনে সেটিকে ঢেকে রীতিমতো ভদ্রস্থ করে তুলল। ওঁরা ওঁদের একটি বাড়তি খাট আমাদের দিয়েছিলেন, দু'জনের পক্ষে সেটি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। আইয়ুব আমাকে একটি প্রাগৈতিহাসিক সোফা ও তাঁর নতুন কেনা একটি সৌখিন কেরোসিন স্টোভ উপহার দিয়েছিলেন।

দেওয়ালের তাকগুলোকে পর্দা দিয়ে ঢেকে নিয়ে আমাদের বইপত্র ভাঁড়ার সবই বেশ গুছিয়ে গেল। ওই বাড়ির প্রবীণা মালকিন ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্র। এঁরা তাঁকে 'বাড়ি-মা' বলে ডাকতেন। তিনি একাকী থাকতেন দোতলার দুটি ঘরে। উঠোনটাকে কোণাকুণি ভাগ করে তাঁর যাওয়া আসার পথ ছিল বসন্ত রায় রোডের দিকে। আর আমাদের যাওয়া-আসার পথ ছিল পিছন দিকের একটি গলি দিয়ে।

এই মহিলা তাঁর বাড়ির সামনের ফুটপাথে কয়েকটি গয়লাকে তাঁদের গোধন সমেত থাকতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তারা ভিতরে এসে কল থেকে জল নিয়ে যেত।

উনি ভোর রাত্তিরে অন্ধকার থাকতে উঠে কোনও একটি গরুর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তার বিষ্ঠা মাটিতে পড়ার আগে তিনি ধরে নিতেন। এবং সেই গোময় সর্বাঙ্গে লেপে স্নান করে পবিত্র হতেন।

তাঁকে নাকি কিশোরী বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিবাহের প্রথম ক'দিনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এতদূর অপবিত্র করেছিল যে তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এই বাড়িতেই মা-বাবার কাছে চলে এসেছিলেন। মা-বাবার একমাত্র সন্তান বলে তাঁরাও তাঁকে আর জোর করে ফেরত পাঠাননি। সারাটা জীবন ধরে তিনি সেই অপবিত্র দেহকে পবিত্র করে নেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বেশিরভাগ দিনই নিজের রান্না তিনি করতেন না। বেলা দশটা-এগারোটার সময় সেমিজের উপর একটি কস্তা পাড় শাড়ি উঁচু করে পরে কিছু পয়সা আঁচলে বেঁধে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বার হতেন। মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাঁকে দেখতে পেতাম, তাঁর গলার চওড়া বিছে হার, এবং দুই হাতে বেশ মোটা মোটা কিছু চুড়ি।

তিনিও ওই ভাবেই আমাদেরও গতিবিধি লক্ষ করতেন। তাঁর সারাদিনের কাজ ছিল, একের পর এক ম্যাটিনি, ইভনিং আর নাইট শো দেখে প্রায় মধ্য রাতে বাড়ি ফেরা। অবশ্য ম্যাটিনি শো-তে ঢুকবার আগেই তাঁর পছন্দের দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে জিলিপি, সন্দেশ তেলেভাজা ইত্যাদি খেয়ে নিতেন। এবং দুটো শো-র মাঝে মাঝে আবার মনের মতো খাবার দোকানে গিয়ে ঢুকতেন।

এই বাড়ি-মার মতো আর দুটি চরিত্র আমি দেখিনি। কোনও কোনওদিন অবশ্য বাড়িতেই থাকতেন এবং নিজেই কিছু রান্না করে খেতেন। বারান্দার পার্টিশনের ওদিকে তাঁর দোতলায় যাবার সিঁড়ির উপরে এমন একটা জায়গায় বসতেন যে গ্যালারি থেকে পার্টিশনের উপর দিয়ে এই দিকটা ভালোই দেখা যেত। সেখানে বসে বসে এদিককার এই সংসার-চলচ্চিত্র উপভোগ করতেন এবং আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। আমরা তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি আমাদের বেশ ভালোই দেখতে পেতেন।

মিশ্রাজীর গৃহিণী ভগবতী দেবী ছিলেন একেবারে অন্য জগতের মানুষ। প্রৌঢ় মিশ্রাজী যখন দূর হোসিয়ারপুরের গ্রাম থেকে তাঁকে বিয়ে করে এনেছিলেন তখন তাঁর বয়স এগার কি বার। তাঁর কাছে স্বামী-সহবাসের প্রথম রাত্রের যে অভিজ্ঞতা শুনেছিলাম, সে শুধু মিস মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া'তেই পাওয়া সম্ভব ছিল। অথচ গান্ধীজী এই মূল্যবান দলিলকে বলেছিলেন, Drain Inspectren-এর report। এরকম খোলা নর্দমা যে সারা দেশ জুড়ে কত ছিল (এবং এখনও আছে), তার কোনও হিসেব আছে কি? তাঁর যন্ত্রণাকাতর রাত্রিগুলির কথা আমরা শুনে শুনে তিক্ত বোধ করতাম। কিন্তু তিনি হাসি হাসি মুখে বলতেন, 'যব শাদি কিয়ে হ্যাঁয়, তব বেওহার তো করেংগেই।'

তিনি তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এবং তাদের নিয়ে মোটামুটি প্রসন্ন মনেই সংসার করতেন। কখনও তাঁর সুন্দর মুখে হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। অথচ পাগল তো এঁরই হয়ে যাওয়ার কথা। কারণ প্রতিবার স্বামী-সহবাসের সময় পতিদেবতা তাঁর মুখ এক হাতে চেপে ধরতেন।

তাঁর বিয়ের প্রায় ষোল-সতের বছর পরে আমাদের সঙ্গে যখন আলাপ হল, তখন আমাদের ডাক্তার বান্ধবী অঞ্জলি সেনগুপ্ত তাঁকে লেডি ডাফরিনে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। সেখানকার গাইনিকলজিস্ট বলেছিলেন, 'এত এলোমেলো ভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, এবং ক্ষত এত পুরোনো যে ওগুলোকে সেলাই করে জোড়া দেওয়া আর সম্ভব নয়।'

এই ভাবীর সঙ্গে আমাদের বেশ গভীর সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। তিনি সুনন্দাকে বলতেন 'লাল দিদি', আমাকে বলতেন 'সাদা দিদি', যেহেতু আমি সবসময় সাদা কাপড় পরতাম, এবং সুনন্দা প্রায় লাল পরত। অঞ্জলির দিদি ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই ওই গৃহে তারও ছিল পরম সমাদর।

অনেকদিনই তিনি অযাচিতভাবে আমাদের একবেলার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে ফেলতেন। তাঁর রান্নার সবচেয়ে দরকারি উপাদান ছিল চমৎকার আতপ চাল, খুরজা ঘি এবং আমচুর। তাই দিয়ে যে কী অপূর্ব পোলাও, আলুর দম ইত্যাদি করতেন, তার স্বাদ ভুলবার নয়। তাঁর যে একটি মাত্র পাত্র ছিল রান্নার, তাকে আমরা দ্রৌপদীর পাত্র বলতাম।

আমরা যখন সেই বাড়ি ছেড়ে চলে আসি, তার পরেও বহুদিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

আমি ১৯৫৩-তে পিতার নির্দেশ অমান্য করে কলকাতায় পড়তে আসার পর থেকে বাড়ি যাওয়া আমার পক্ষে একটা কঠিন পরীক্ষা ছিল। অথচ বাইরে থেকে সম্পর্কটা যেন স্বাভাবিক, সেই উদ্দেশে ছুটিছাটার দিন কয়েকের জন্য বাড়ি যেতেই হত।

১৯৫৩-র পুজোর ছুটিটা কিষাণগঞ্জে চলে গিয়েছিলাম সেই কলাভবনের দিদিভাইয়ের বাড়িতে। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। কিযাণগঞ্জ যাব মনে করে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পূর্ণিয়ার টিকিট কিনে বসেছিলাম। তখনও ফরাক্কা ব্যারেজ হয়নি। স্টিমারে নদী পার হয়ে আর একটা ট্রেন ধরে প্রায় মধ্য রাতে কিষাণগঞ্জে পৌঁছেছিলাম।

মাত্র গুটি কতক যাত্রী সেখানে নেমেছিল। তার মধ্যে এরকম একটা কচি চেহারার যাত্রিণী একটা মাঝারি সাইজের সুটকেশ হাতে করে নিয়ে যখন পূর্ণিয়ার টিকিট দেখাল, তখন স্টেশন মাস্টার পর্যন্ত বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বিহারের সেই অজ পাড়াগাঁর মতো স্টেশনে এরকম একটি এসকর্টবিহীন যুবতীকে দেখে তাঁদের রীতিমতো সন্দেহ হল। তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে পূর্ণিয়ার টিকিটটা আমি নিতান্তই ভুল করে কেটেছিলাম।

স্টেশন মাস্টার তো তাঁর আপিস ঘরে আমাকে আদর 'আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালেন। দু-চারজন যাত্রী যারা নেমেছিল তারাও স্টেশনের আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের উপরে যারা ঘোরাঘুরি করছিল তাদের দেখে আমারই বেশ ভয় হতে লাগল।

এদিকে স্টেশন মাস্টারের অতিরিক্ত উৎসাহ আমাকে বিচলিত করছিল। তবে মুখে অবিচলিতই ছিলাম। স্টেশন মাস্টার প্রস্তাব দিলেন, আমি যেন তাঁর আপিস ঘরে বসে বিশ্রাম করি, তিনি বাইরে থেকে আমাকে তালা দিয়ে রাখবেন, এবং সকাল বেলা আমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারব রিক্সা ডেকে।

কিন্তু কী ভাগ্য, আমার দিদিভাই একটি ছেলেকে সঙ্গী করে তখনই এসে পৌঁছল আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। আমি অল্পের উপর দিয়েই রক্ষা পেলাম।

স্টেশন মাস্টারকেও দোষ দেওয়া যায় না। উত্তর বিহারে ওই প্রায় গ্রাম্য স্টেশনে হঠাৎ একটি বাঙালি কন্যার এইভাবে একাকিনী পৌঁছনো তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানারকম সন্দেহ উদ্রেক করতেই পারত।

সেই ছুটিটা কিষাণগঞ্জে পরম আনন্দে দিদিভাই ও তার মা-বাবার সঙ্গে কেটেছিল। ছুটি প্রায় যখন শেষ হয় হয়, তখন সপ্তাহ খানিকের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়ে পাড়া-প্রতিবেশীকে জানান দেওয়া গেল যে পারিবারিক অবস্থা স্বাভাবিকই আছে।

এরপর তো বড় ছুটি আর কিছু ছিল না। কেবল কলকাতায় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শান্তিনিকেতনে না-যাওয়া নিয়ে বিশেষ কোনও কথা বোধহয় হয়নি।

১৯৫৪-র গ্রীষ্মের ছুটিটা ছিল আর এক সমস্যা। সুনন্দার উৎসাহে বহরমপুরে তাদের বাড়িতে চলে গেলাম। তার বাবা-মার কাছে যে আদর-যত্ন পেয়েছিলাম তার আর তুলনা নেই। বাবা কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল নিশিকান্ত সরকার। মা সতী দেবী যেমন বিদুষী সাহিত্যরসিক, তেমনই আবার রন্ধন পটীয়সী। রোজ রোজই একটা ভোজের আয়োজন করে ফেললেন তিনি। মেসোমশাইয়ের একটা ঝোঁক চেপেছিল আমাকে নিত্যি নূতন আম খাওয়াবেন। বহরমপুরে তখন যে কত বিচিত্র স্বাদ ও গন্ধের এবং বিচিত্রতর নামের আম পাওয়া যেত তা বোধহয় এখন আর পাওয়া যায় না। সেই সব বেগমপসন্দ, কোহিতূর, শাহদূল্লা আজও কি পাওয়া যায়? শুনতে পাই নবাবী ঐতিহ্যের কিছুই আর বাকি নেই।

বিকেল হলেই আমরা বেড়াতে যেতাম ভাগীরথীর তীরে ও কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রাচীন বাড়িটায়। তাঁদের সেই আদরযত্নের ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারিনি।

অবশেষে গরমের ছুটি শেষ হবার ক'দিন আগেই বহরমপুর ছাড়লাম তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ বহু কষ্টে ঠেকিয়ে। কারণ কয়েকটা দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে হাজিরা দেওয়া দরকার ছিল।

এরপর ৫৫ সালটা পড়াশুনা নিয়ে সত্যিই ব্যস্ত থাকতে হল। কারণ তখন এম. এ. পরীক্ষা যথাসময়ে নভেম্বর মাসেই হয়ে যেত এবং ডিসেম্বর শেষ না হতেই রেজাল্টও বার হত। এটা কি আজকে বিশ্বাস্য শোনাবে?

আমার সেই ডিসেম্বর চিরদিনের জন্য এক বেদনার ইতিহাস হয়ে রইল। আমার ছোটভাই বিজু, যাকে জ্ঞান হওয়া অবধি আমার ছায়াসঙ্গী বলে মনে হত, সে হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়ল। জানিনা সে অসুখ থেকে সেরে উঠত কিনা, কিন্তু অসুখের সঙ্গে লড়াই করবার মতন মনের জোর তার আর ছিল না। কিছুকাল আগে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে সে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে এক সাধুবাবার পাল্লায় পড়ে বন্ধুদের মত সেও হাত দেখিয়েছিল। তিনি নাকি ভ্রূ কুঁচকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ওই বছরটা তার কাটবে না।

আমাদের বাড়িতে এই সব ঠিকুজি-কুষ্ঠি, হাত দেখা ইত্যাদি বুজরুকি বিষয়ে বিশেষ অবজ্ঞা ছিল। বাবা বলতেন, বাঙালি জাতটার আত্মবিশ্বাস যত কমছে, এই সব বুজরুকি ততই বেড়ে চলেছে।

তাই বিজু এই [illegible] কথা আমাদের কাউকেই কিছু বলেনি। সাধুবাবার দেওয়া মাদুলিটা লুকিয়ে কোমরে বেঁধে রেখেছিল। নার্সিংহোমে মা একদিন তার গায়ে পিঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাত বুলোতে বুলোতে সেটি আবিষ্কার করেন এবং তার কাছ থেকে কাহিনীটা শুনতে পান।

সেই সময়ে দিল্লি থেকে আমদানি নতুন ধরনের ইনফেকটিভ হেপাটাইটিসের চিকিৎসা যথাসাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু বিশে ডিসেম্বর সে চলে গেল। তার ক'দিন আগেই তাকে বাড়িতেই নিয়ে আসা হয়েছিল। কয়েক রাত তার সঙ্গে বসে রাত জেগেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়েছিল। ওর পায়ের দিকে জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া যেত সম্ভবত একটা কদম গাছ। তার পাতা ঝরে যাচ্ছিল। আমার মন কেমন সুপারস্টিশাস হয়ে উঠেছিল এবং মনে হচ্ছিল, ওই পাতাগুলো সব যেদিন ঝরে যাবে সেদিন বোধহয় বিজুও চলে যাবে। সেসময় এরকম একটা গল্প কিছুদিন আগেই পড়েছিলাম, লেখকের নামটা এখন মনে আসছে না। তবে বিজু গল্পটার কথা কিছুই জানত না। আঠেরো কিংবা ঊনিশ তারিখ রাত্তিরে ও আমাকে যখন বলছিল, ওর ছোট্ট বাক্‌সোটির জিনিসপত্র আর যেন কেউ না দেখে। আর কয়েকটি চিঠিপত্র ডায়েরি যেন তার বান্ধবী নীলুকে পৌঁছে দিই। তখন আমি কী এক অদ্ভুত ভাবনা থেকে বলেছিলাম, 'তুই এসব নিয়ে কেন ভাবছিস? মৃত্যুকে ভয় করবার কী আছে?'

ও খুব শক্‌ড হয়ে বলেছিল, 'তুই আমাকে কী বলছিস!'

আসলে আমার মনে তখন তোলপাড় করছিল আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আইয়ুব সুস্থ স্বাভাবিক হবেন না। আমারও কোনও ভরসা করবার কিছু নেই সামনে। তাই ইহলোকে আমাদের কোনও মিলিত জীবনের প্রত্যাশা ছিল না। সেই অবস্থায় মনে হত, মৃত্যু ছাড়া আমারও সামনে কিছু নেই।

অথচ আমি পূর্ণ একটি জীবন পেয়েছিলাম। এবং আজ সাতষট্টি বছরের পরিণত বয়সে মনে হচ্ছে সে মাত্র তেইশ বছর বয়সে এই জল রস গন্ধভরা পৃথিবী থেকে বড় অনিচ্ছায় বিদায় নিয়েছিল।

বিজু সত্যিই চলে গেল। আমাদের আত্মীয় সমাজে সেই ছিল সব চেয়ে বেশি প্রিয়। অতখানি হাসিখুশি প্রাণবন্ত মানুষটা এত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, সেটা আমার কল্পনায় ছিল না। বিশ তারিখ রাত্রে তাকে যখন শ্মশানে নিয়ে চলে যাওয়া হল, তখন আমি আর মা মেঝের উপর বিছানা পেতে পাশাপাশি শুয়েছিলাম। এর আগে বা পরে পরস্পরকে অমন করে জড়িয়ে ধরে কোনওদিন শোবার কথা মনে পড়ে না।

ওই একটি ধাক্কা এক রাত্রের মতন আমাদের নীরবে পরস্পরের বুকের কাছে নিয়ে এসেছিল। সবাই ঠিক করলেন, পরদিনই মা আর আমি শান্তিনিকেতন ফিরে যাব। কারণ ছোট্ট চারটি বোন সেখানে অভিভাবকহীনভাবে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় ছিল। বাবাও তো চলে এসেছিলেন বিজুর জন্য। তাই আমরা পৌঁছবার আগেই খবরটা যাতে ওদের কাছে না পৌঁছয় তার জন্য একুশে সকালেই আমরা দু'জন ট্রেন ধরেছিলাম।

শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসবার 'পরে আমরা একটা ভেজা কাপড়ের পুঁটলি, অল্প

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বল্প মালপত্র নিয়ে একটা বেঞ্চের এক কোণায় বসেছিলাম। আমি নীরব এবং কোনও আবেগের প্রকাশ ছিল না। মা কিন্তু অবিরল চোখের জল ফেলে চলেছিলেন। একজন সহযাত্রী যুবক এসে সস্নেহে জিগ্যেস করেছিল, 'কী হয়েছে আপনার মা?'

আমি বলেছিলাম, 'গত রাত্রে ওঁর একটি পুত্র মারা গিয়েছে।'

কথাটা মুহূর্তের মধ্যে সারা কম্পার্টমেন্টে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছিলেন। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, ১৯৫০-এ ওই একই দিনে অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়ার ঘটনা।

তারপর বহুদিন ধরে আমার সব সময় শুধু একটি কথাই মনে হত, পৃথিবীতে এত মানুষ প্রতিদিন পরিচিত অপরিচিত জন প্রবাহের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে যায়। কিন্তু সেই একটি মুখ আর কোনওদিন দেখতে পাব না। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে তার পরিচয় না হলেও দূর থেকে কয়েকবার শান্তিনিকেতনে তাঁকে দেখেছিল। কিন্তু সাহস করে আলাপ করতে যায়নি।

ইতিপূর্বে আমার সব সমস্যায় সে ছিল আমার সহায়সম্বল। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় সংকটটা যখন দেখা দিল, তখন আর সে পাশে ছিল না। বহুরাত্রে আমার আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর ঘরে শুয়ে শুয়ে ঘুম আসত না। রাস্তার আলো খড়খড়ির পাখিগুলোর উপর পড়ত। দেওয়ালে তার ছায়া দেখে মনে পড়ত অসুখের শেষের দিকে বিজুর পাঁজরার হাড়গুলো যেন ওইরকম কঙ্কালসার দেখাচ্ছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আমার সারা শরীরে মনে শিহরণ জাগত।

ওই ডিসেম্বরের প্রায় শেষাশেষি ফিরে এলাম এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হবে বলে।

সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই ১৬ ম্যান্ডেভিল্ গার্ডেন্সে সাউথ পয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসতীকান্ত গুহ-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম জনৈক বন্ধুর পরামর্শে।

তিনি স্কুল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সব কিছু তদারক করে। আমি তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করে কথা বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি মাথা নিচু করে সেই সব শুনলেন। এক পলক মাত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর একেবারেই সরাসরি তাকিয়ে দেখেন নি। আমার কী রেজাল্ট হয়েছে, কী পড়াতে পারব, সত্যিই স্কুল টিচিং-এ থাকব কিনা অথবা কলেজে চলে যাব ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। আমি উয়াগ্রাম ব্যাপটিস্ট মিশন স্কুলে পড়াবার সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা বলে জানিয়েছিলাম যে যদি পারি, তাহলে স্কুলেই এখন পড়াতে চাই।

উনি কথা বাড়ালেন না। বললেন, আমরা আপাতত [illegible] টাকা দিতে পারব, ইচ্ছে করলে কাল থেকেই যোগ দিতে পারেন।

আমি দু-এক দিনের মধ্যেই যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এলাম। সোজা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পার্ল রোডে এসে আইয়ুবকে সুখবরটি দিলাম। তখন মনে হয়েছিল ১৭৫ টাকা একটা 'Princely Sum'!

ইতিপূর্বেই প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ে বেড়াতে বেড়াতে উনি একটা পেয়িং গেস্ট অ্যাকোমোডেশনের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের উল্টো দিকে। একটি ছোট ভদ্র পরিবার, তবে তাদের আর্থিক অনটন ছিল মনে হয়। তারা তাদের একটি ঘর মাসিক ১০০ টাকায় দিতে রাজি হলেন। সেই সঙ্গে দ্বিপ্রাহরিক এবং নৈশ আহার।

রাতারাতি এমন চাকরি এবং সেই সঙ্গে এমন সুবিধাজনক বাসস্থান সবই ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেল। তাছাড়া পার্ল রোড থেকে তিন মিনিটের দূরত্বে। আর চাই কী।

তখন বেকবাগান থেকে সুইনহো স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে পাঁচ পয়সা ভাড়া ছিল, আশা করি ভুল করছি না। কাজেই একশো পঁচাত্তর টাকায় আমার তেমন কিছু টানাটানি হচ্ছিল না। এমন কি সকাল বেলায় এক পোয়া দুধও রাখতাম। একটি সুদর্শন ফলওয়ালা আমার জানালার কাছে এসে প্রায় সাধাসাধি করে কিছু ফল গছিয়ে দিয়ে যেত।

বিকেলে অবশ্য আমি বাড়ি ফিরতাম না। বেশির ভাগ দিন স্কুল থেকে পার্ল রোডে চলে যেতাম। মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজনের কাছে। এখানে তো বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে কোনও কড়াকড়ি ছিল না। তাই রাত্রি ন'টা দশটায় ফিরেও গৃহস্থদের প্রসন্ন অভ্যর্থনা লাভ করতাম।

এরপর বিবাহ সম্বন্ধে আইয়ুবের দ্বিধা অনেকটা কেটে গেল। আমি ততদিনে এম.এ.বি.টি. পাশ করা পঁচিশ বছরের একটি সাবালিকা। এবং চাকরি করে স্বনির্ভর হয়েছি। সুতরাং নাবালিকাকে ফুসলাবার অভিযোগ নিশ্চয়ই ধোপে টিকবে না, এই ছিল তাঁর ভরসা। অতএব সেবার মার্চ মাসে বসন্তোৎসবে শান্তিনিকেতনে গিয়ে ঘনিষ্ঠ দু-চারজন বন্ধুকে জানিয়ে এলাম যে এবার আমরা বিয়ে করছি।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার ক'দিন পরেই ক্ষুব্ধ ভগিনী এবং মায়ের চিঠি পেলাম। লোকমুখে তাঁদের কানে কথাগুলো পৌঁছেছিল। পরিবারের মান-সম্মান দুঃখ-বেদনা ধুলোয় মিলিয়ে দিয়ে আমার মতো সুবিবেচক মেয়ে কী করে এমন কাজ করতে পারি, তা তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বাবা অবশ্য আরও আগেই আইয়ুবকে একটি কঠোর পত্র লিখেছিলেন। এবং আমাকেও কলকাতা আসার সময় একটি কঠোরতর পত্র লিখে একরকম সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে আমার শৈশবে তিনি একটি বিমা করেছিলেন আমার বিবাহের কথা ভেবেই। ইতিমধ্যে সেটা ম্যাচিওর করেছে। এবং তাঁর কাছে আছে। উনি আমার নামে রাখা সেই টাকাটা পাঠিয়ে দিতে চান।

আমি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই জানিয়েছিলাম যে ওই টাকায় আমার কোনও অধিকার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেই, কারণ আমি তাঁর পছন্দমতো কাউকে তো বিয়ে করছি না। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে কোনও চিঠি আর কোনও দিন পাই নি।

সাউথ পয়েন্টের কাজ ভালোই লাগছিল। তবে মোটেই ঊষাগ্রামের মতন লক্ষ্মী এবং বিনীত ছিল না ছাত্রছাত্রীরা। তখন সাউথ পয়েন্টের মতো সহশিক্ষার প্রচলন আর বিশেষ কোনও স্কুলে ছিল না। নিচু ক্লাসের ছাত্রগুলো এক একটি ছিল হনুমান। তখন টিনের চাল দেওয়া নাকি অ্যালুমিনিয়ামের চাল দেওয়া অস্থায়ী ক্লাসরুমে লোহার চেয়ার টেবিল ছিল। এবং তাদের পায়ায় কোনও রাবার লাগানো ছিল না। প্রথম দিনে ক্লাস থ্রি-র ক্লাস টিচার হয়ে যখন পঁচিশটি ছেলেমেয়ের মুখোমুখি হলাম, তখন তারা আমাকে যথাসম্ভব উত্যক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। সবাইকে চুপচাপ নিজের জায়গায় বসানোই এক কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ দেখি সতীকান্তবাবু একেবারে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে এসেছেন। তারপর আমার পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত high flown ইংরেজিতে এমন ধমক-ধামক দিলেন যে ওরা মুহূর্তে কেঁচো হয়ে গেল। উনি তো ক্লাসে শৃঙ্খলা স্থাপন করে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু আমি লজ্জায় মরে গেলাম। এরপর আর কোনওদিন ওই রকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেনি। এবং অল্পদিনেই ছেলেমেয়েগুলোকে বেশ বশ মানাতে পারলাম।

এছাড়া ক্লাস ফাইভ-সিকস-এও দু-একটা ক্লাস নিতে হত। সেখানে গিয়ে দেখি আর এক সমস্যা। একটি ছোটখাটো কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের ছেলে এক পক্ষে, অর্থাৎ আমেরিকানদের সমর্থক। অন্যপক্ষে প্রায় সবাই সোভিয়েত রাশিয়ার গুণগ্রাহী। ক্রমাগত তারা ওই ছেলেটিকে উত্যক্ত করত। সে কিন্তু মোটেই দমে যাবার পাত্র ছিল না। একদিন শুনি অন্যদের বিদ্রূপ করে বলছে, 'তাও যদি PL-20-র গম না খেতে তাহলে এত বড় বড় কথা বলার অধিকার ছিল। রঙিন কতকগুলো ম্যাগাজিন আর প্রোপাগান্ডা সাহিত্য ছাড়া সোভিয়েত রাশিয়া তোমাদের দিচ্ছে কী?' এই দুই দলকে নিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য কিছু ইতিহাসের কাহিনী তাদের পাঠ্য বই থেকে অবতারণা করতাম।

আমার সঙ্গে সে সময়ে কয়েকজন জ্যোতিষ্ক সাউথ পয়েন্টের শিক্ষকতা করছিলেন—উৎপল দত্ত, বিশ্বনাথন, কমলকুমার মজুমদার, শেখর চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। আমার হীনম্মন্যতাবোধ তাই অকারণ ছিল না।

ক্লাস নাইনে আধ ডজন ছেলেমেয়েকে কুরু পাণ্ডব পড়াতে গিয়ে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সেই দলে ছিল স্বরূপ দত্ত, ইন্দ্রনাথ ইত্যাদিরা। বেশ কয়েক বছর পরে হঠাৎ স্বরূপের সঙ্গে ট্রামে দেখা হলে ও 'আন্টি' বলে ডেকে যেমন করে গল্প শুরু করেছিল, সেকথা আজও মনে পড়ে। ততদিনে কিন্তু সে চলচ্চিত্রের জগতে এসে পড়েছে।

মহিলাদের স্টাফরুমে বেশ কয়েকজন সহকর্মিণীকে ভালো লেগেছিল—উমা সেহানবীশ, পারমিতা নাগ, শক্তি বসু। তাদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত সম্পর্ক রয়েছে।

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

৫, পার্ল রোড

আমাদের বিয়ের পরেও ঘরকন্না পেতে বসতে বেশ কয়েক মাস গেল। আইয়ুবকে তাঁর পরিচিত পরিবেশ, বিশেষ করে ডাক্তার দাদার সযত্ন সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আমার ইচ্ছাও ছিল না এবং তিনিও সাহস পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু তাঁর অধিকারে ছিল মাত্র একটি ঘর এবং স্নানাগার। সেখানে সংসার পেতে বসা তো সহজ ছিল না। ওই সময় আমাকে উদ্ধার করলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। আইয়ুবের যেরকম একটি ঘর ও স্নানাগার ছিল দোতলায়, মুজতবা সাহেবের ছিল একতলায়। দু'জনেই দুটি ফ্ল্যাটের খানিকটা নিয়ে বসবাস করছিলেন। এই সময়ে মুজতবা শান্তিনিকেতনে থাকা মনস্থ করেন, তাই তাঁর ঘরটি তাঁর কাছ থেকে পেয়ে আমরা ধন্য হলাম। আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুজতবার স্মৃতি একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে লিখব। তখন এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত গল্প করা যাবে।

দুই তলার মাঝখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা রইল ইলেকট্রিক বেল, তখনও লোড শেডিং কথাটা চালু হয়নি। নিচের ঘরটা পাওয়ার পরও রাত্রে আমি উপরের ঘরেই চলে যেতাম।

সেই বছর শেষ হতে হতেই আমি সাউথ পয়েন্টের কাজ ছেড়ে দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে একটি বৃত্তি পেলাম গবেষণা করার জন্য। ওদিকে আমাদের সংসারে নতুন একজনের আসার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে।

সাউথ পয়েন্টের কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর আমি আমির আলি অ্যাভিনিউ-এর ঘরটিও ছেড়ে দিলাম। আমাদের পুত্রটি জন্মাবার পরে তাকে নিয়ে সরাসরি নিচের তলায় সংসারটি খানিকটা পাতা হল। আমার সঙ্গে থাকার জন্য একটি সেবিকাকে পাওয়া গেল। কিন্তু আরও এক বছর আমরা ভাবীর (আইয়ুবের দাদা ডাঃ এ. এম. ও. গানির স্ত্রী সালেহা গানি) রান্নাঘরেই আতিথ্য পেয়েছিলাম। বলা যায়, এক হাঁড়ির শরিক ছিলাম।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আমরা ইতিপূর্বে যখনই বিয়ের কথা ভেবছি, তখনই আইয়ুব মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সনাতন অর্থে বিবাহ করার যোগ্য নন। তিনি কোনওভাবেই আমাকে বিশেষ ভাবে বহন করতে সক্ষম হতে পারবেন না। তাই বিবাহের পরেও আমার নিজেকেই বহন করতে হবে এবং তিনিও নিজেকে

আমার বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহন করে যাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। অবশ্য বিবাহের পূর্বেই আমার শিক্ষার খরচ সম্পূর্ণরূপেই বহন করেছিলেন। আমি সাউথ পয়েন্টে চাকরি করার সময়েও আমাকে অল্প-সল্প অর্থ সাহায্য করেছেন।

তাঁর রকেফেলার ফাউন্ডেশনের মেয়াদ ততদিনে ফুরিয়েছে। তবে ফেলোশিপের যে অর্থমূল্য পেয়েছিলেন, তার থেকে কিছুটা সঞ্চয় করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই বৃত্তির সাহায্যে মার্কসবাদ বিষয়ে যে কাজ করেছিলেন, সেটি আর শেষ করে উঠতে পারেন নি। এই কাজটি অপ্রকাশিতই রয়ে গেল যদিও যে ক'জন পণ্ডিত ব্যক্তিকে সেগুলো দেখিয়েছি, তাঁদের মনে হয়েছে যে অসমাপ্ত থাকলেও এগুলি প্রকাশ করা উচিত, কারণ এতে মৌলিক বক্তব্য যথেষ্টই রয়েছে।

সন্তান সম্ভাবনার পরে আমি তো সাউথ পয়েন্টের কাজ ছেড়ে দিলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার বৃত্তি ছিল তখন মাত্র দেড়শ টাকা। তখন ওই পড়াশুনা করতে করতে দুয়েকটি টিউশনি করতে থাকলাম। এদিকে সন্তানের আবির্ভাবের পরে ওঁর নতুন একটা যেন পিতার দায়িত্ববোধ হতে লাগল। তাই তখন মনের মতো একটা কাজের সন্ধান করছিলেন। অনেকটা ওই কারণেই Quest পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিতে আগ্রহী হলেন।

৫৬ সালে আমরা বিয়ে করি। ৫৭ সালে পুষনের জন্ম হয়। ৫৮ সালে আইয়ুব Quest নামে ত্রৈমাসিকের দায়িত্ব নেন। তবে কাজটা ছিল একটু বিশেষ ধরণের, যার সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগাযোগ ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

একদিন অম্লান এসে জানালেন যে Congress for Cultural Freedom-এর ভারতীয় শাখা তাঁদের মুখপত্র Quest পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করবার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব তাঁর পক্ষে তখন নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ভাবছিলেন, আর কেউ নিলে বেশ ভালো হত। কারণ সেই সময়ে পত্রিকাটি যেভাবে চালানো হচ্ছিল, তাতে Congress for Cultural Freedom-এর উদ্দেশ্য ঠিক সাধন করা যাচ্ছিল না।

অম্লান একথা বলে চলে গেলেন। আইয়ুবকে সরাসরি অনুরোধও জানান নি, সম্ভবত আশাও করেননি যে তিনি এই গুরুভার নিতে চাইবেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আইয়ুবের খুব মনে ধরল। সারা রাত্তির এটা নিয়ে ভেবেছিলেন। ঘুম থেকে উঠেই খুব ভোরে আমার ঘরে এলেন। সাধারণত ওই সময়ে তিনি আসতেন এবং স্ত্রীপুত্রের কুশল সংবাদ নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে যেতেন। আমিও সঙ্গী হতাম।

সেদিন নেমে এসে বললেন, 'চলো, আমরা একটু অম্লানের কাছে যাই।' যেতে যেতে ট্যাক্সিতেই আমাকে ব্যাপারটা বললেন। আমরা হ্যারিসন রোডে (এখন মহাত্মা গান্ধী রোড) অম্লানের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইন্ডিয়া হোটেলে গেলাম। আমহার্স্ট স্ট্রীটে পৌঁছে উনি পাশেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপেক্ষা করতে লাগলেন, তিন তলায় ওঠার সাধ্য তাঁর ছিল না। আমি উপরে অম্লানের ঘরে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব তাঁকে বললেন, যে তিনি সম্পাদনা করতে রাজি আছেন, যদি অম্লান সহ-সম্পাদক হন। অম্লানকে তিনি কোনও কাজের দায়িত্ব দেবেন না, কিন্তু Quest সম্পাদনার নৈতিক দায়িত্ব তাঁকেও কিছুটা নিতে হবে। অর্থাৎ যা কিছু প্রকাশ হবে সবই সহ-সম্পাদকের সম্মতিক্রমেই হবে।

এখন থেকে Quest ত্রৈমাসিক পত্রিকা হল। আগে ছিল দ্বিমাসিক। এ বিষয়ে প্রথম সংখ্যাতেই যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি লিখেছিলেন "With this issue Quest assumes a new look and a new editorial personnel. These outward changes are intended to coincide with and to indicate an internal change in the character of the journal. It is being changed from a 'bimonthly of arts and ideas' to a quarterly journal of inquiry, criticism and constructive thought' " স্পষ্ট করেই লিখলেন যে সাহিত্যকে তাঁরা মোটেই বাদ দেবেন না। বরং সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের চর্চাও যথাসম্ভব করা হবে। তবে "The emphasis henceforth willl be on 'ideas' rather than on 'arts'

তাঁদের এই উচ্চাভিলাষকে ঘোষণা করে পত্রিকার motto ধার করে নিলেন তাঁর প্রিয় দার্শনিক Whitehead-এর কাছ থেকে। পত্রিকার প্রচ্ছদে শিরোনামের পাশে লেখা হ'ল 'An Adventure of Ideas.'

তাঁর এই বহু যত্নে রচিত সম্পাদকীয়টি আদ্যোপান্ত এ জায়গায় উদ্ধার করতে পারলেই আমার তৃপ্তি হত। কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা এই কাহিনীর মেজাজের পক্ষে একটু গুরুভার হয়ে যেত। কিন্তু এই একটি মাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তখনকার এবং এখনকার অত্যন্ত গুরুতর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রসঙ্গ যেভাবে আলোচনা করেছেন, তার পাঠকসংখ্যা হয়তো আজকে আর সেদিনকার মতো যথেষ্ট নেই, কিন্তু থাকলে ভালো হত। আজকের বহু সমস্যার পক্ষে সেগুলি অত্যন্তই প্রাসঙ্গিক। আর সেদিন যাঁরা সাম্যবাদ-বিরোধিতার জন্য ভর্ৎসনার খড়্গ তুলে ছুটে এসেছিলেন, তাঁদেরও অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে কিছু সঙ্গত উত্তর দিয়েছিলেন।

Quest-এর সুবাদে আমার জীবনে জগৎজোড়া দিগন্ত খুলে গেল। 'Congress for Cultural Freedom' আরও কয়েকটি পত্রিকার ভার নিয়েছিল। তারমধ্যে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত Encounter তখন খুব নাম করেছিল। জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান প্রভৃতি ভাষাতেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হত।

সারা পৃথিবীর বহু বুদ্ধিজীবী এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে আর্থার কোয়েসলার, স্টিফেন স্পেনডার প্রভৃতি 'God that failed'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আজকের প্রজন্মের কাছে এ বাক্যটি অর্থবহ নয় বলেই মনে হয়। তাই উল্লেখ করা ভালো যে এক সময় যারা অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, কঠিন আঘাতে তাঁদের যখন মোহভঙ্গ হয় তখন তাঁদের অনেকের স্বীকারোক্তি নিয়ে একটি 'বিখ্যাত' (কিংবা 'কুখ্যাত'—কে কোন্ দলে আছেন তার উপর নির্ভর করে) বই 'God that failed' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটা দুই পক্ষের অনুগামীরা পড়তেন এবং উল্লেখ করতেন। এই বইয়ের লেখক-সূচিতে যাঁদের নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল, তাঁদের উল্লেখ করতে গেলেই বলা হত, God that failed লিস্টের লোক।

অতএব এই পত্রিকার দায়িত্ব নেওয়া অবধি আইয়ুবের সঙ্গে সাম্যবাদীদের নতুন করে যুদ্ধ বেধে উঠল। এবং তাঁরা সরবে বলতে লাগলেন যে এতদিনে আইয়ুব খোলাখুলি নিজেকে ক্যাপিটালিস্টদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন। এই অপবাদের উত্তরে আইয়ুব আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি অসাধারণ সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

আজ মনে হয়, Quest পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, সমালোচনা ও সম্পাদকীয়র একটি নির্বাচিত সংকলন প্রকাশিত হলে এই প্রজন্মের পাঠকরা অনেক কিছু চিন্তার খোরাক পেত।

এই পত্রিকার দায়িত্ব পেয়ে আইয়ুব কিন্তু খুব তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কারণ সাম্যবাদের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তো এক বাক্যে তাঁদের কথা সমস্বরে বলে চলেছিলেন। কিন্তু যাঁরা সাম্যবাদের পক্ষে ছিলেন না, তাঁরা তো কোনও একটি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁদের নানারকম ভিন্ন মতামত ও বক্তব্য ছিল। তাঁদের কথাগুলি পরস্পরবিরোধী হলেও একত্রে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা এঁরা অনেকেই অনুভব করছিলেন। এতদিন পরে তার একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

আগেই বলেছি, এই পত্রিকার মলাটের মাথার দিকে এক কোণে আইয়ুবের প্রিয় দার্শনিক A. N. Whitehead-এর একটি উক্তি (সম্ভবত তাঁর একটি বইয়ের নাম) motto হিসেবে ব্যবহার করছিলেন, সেটি হল 'The adventure of ideas'। সত্যি সত্যি তাঁর মনে হয়েছিল যে এই পত্রিকার মারফৎ তাঁর পরিচিত অনেকেই ভাবনাচিন্তার জগতে নতুন নতুন কিছু অভিযান করতে পারবেন। সেই সুযোগ করে দেবার জন্য তাঁদের এই ইংরেজি ত্রৈমাসিকের দায়িত্ব তিনি নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন। পত্রিকাটি আগেও কিছুদিন কবি Nissim Ezekiel-এর সম্পাদনায় বোম্বাই থেকে সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হত। তখন এটা দ্বিমাসিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতারা একে আরও অনেকখানি প্রশস্ত জগতে বিচরণের ক্ষেত্র বলে প্রকাশ করতে চাইছিলেন।

কথা ছিল যে আইয়ুব যতদিন সক্ষম থাকবেন তিনিই আসল কাজের ভার নেবেন এবং অম্লান দত্ত থাকবেন Sleeping Editor। এই পত্রিকাটাও ছিল একটা 'a tale of two cities'—ভারতের পূর্বপ্রান্ত কলকাতা থেকে সম্পাদনা করা হত, আর পশ্চিম প্রান্তে বোম্বাই থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ছাপা ও প্রকাশনার কোনও ভার আইয়ুবকে গ্রহণ করতে হয়নি। যেহেতু পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ছিল এবং তখনও পর্যন্ত এদেশের ডাকবিভাগ অত্যন্ত efficient ছিল, তাই দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রাখতে কোনওরকম অসুবিধা হয়নি। আমার মনে হচ্ছে, কত দিন বিকেলে পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে গিয়ে মোবাইল পোস্টাফিসে দরকারি চিঠিপত্র পোস্ট করে আসতাম এবং পরদিন বিকেলে সেটা বোম্বাইয়ে পোস্ট অফিসে পৌঁছে যেত। এখন সেটা স্বপ্নের মতোই মনে হয়। তখন 'স্পিড পোস্ট' নামক ব্যাপারটির কেউ নাম শোনেনি, সরকারি পোস্টাল ব্যবস্থাই ছিল 'স্পিড পোস্ট'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই পত্রিকাটিকে যথাসম্ভব সর্বভারতীয় একটি মাধ্যম করে তোলার উচ্চাশা ছিল আইয়ুবের। এই ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য তাঁরা সর্বভারতীয় কিছু লেখক সম্মেলন করেছিলেন। Congress for Cultural Freedom মুক্ত হস্তে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। আইয়ুব সম্পাদনার ভার নেবার পরেই প্রথম যে সেমিনারটির আয়োজন করা হয়েছিল তার বিষয় ছিল 'Belief and Literature'। শুধু দেশের ভিতর থেকেই বিখ্যাত সাহিত্যিকরা নয়, বিদেশ থেকেও এসেছিলেন আর্থার কোয়েসলার।

আইয়ুবের ক্ষীণ স্বাস্থ্যেও এ জাতীয় কাজ করা সম্ভব ছিল কারণ সেমিনারের যাবতীয় ঝামেলা সাগ্রহে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন কে কে সিনহা—কলকাতার Congress for Cultural Freedom শাখার সম্পাদক।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, আর্থার কোয়েসলারের সঙ্গে পরিচয়ের কথা। তিনি তখন কলকাতায় এই সেমিনারে যোগ দেওয়া ছাড়াও একটা অভিনব অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করছিলেন যে এমন কোনও যোগী পুরুষ বা অন্যান্য সাধক অথবা অনুসন্ধানীকে পাওয়া যায় কিনা যাঁর Extra Sensory Perception-এর ক্ষমতা রয়েছে এবং সে বিষয়ে তাঁকে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিতে পারেন। তাঁর 'Yogi and the Commissar' বইটির কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল 'The Lotus and The Robot'।

আমাদের Quest-এর সেমিনার শুরু হওয়ার আগে তাঁকে কলকাতায় স্বাগত জানিয়ে সেমিনারের বিষয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব অবহিত করবার জন্য গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর ঘরে সাক্ষাতের আয়োজন হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে আইয়ুবের সঙ্গে আমিও তাঁর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি কোথাও গিয়েছিলেন। মিনিট দশেক পরে ফিরলেন। আমাদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে ভিতরে চলে গেলেন, তাঁর চলনদারটিকে বিদায় জানিয়ে।

একটু পরে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। আদতে পূর্ব ইউরোপের মানুষ হলেও তিনি তখন ইংল্যান্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর লেখার ভাষাও ছিল ইংরেজি। মুখের ভাষাতেও কোনও বিদেশি টান ছিল না। চমৎকার কথা বলছিলেন এবং নানা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও তার মধ্যে তিনি আনছিলেন। আইয়ুবের প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই তিনি জানালেন যে তখনও পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের কোথাও যথার্থ কোনও Yogic Experience-এর সন্ধান পাননি। এতে তিনি হতাশ হলেও আমরা বিস্মিত হইনি, বলাই বাহুল্য। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তিনি কলকাতার একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু খুব যে ভরসা পেয়েছিলেন বলে মনে হল না।

এরপর সেমিনারের বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। সাহিত্যিকের কোনও সুস্পষ্ট দার্শনিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন ছিল কিনা এটাই ছিল বিবেচ্য। এ জাতীয় বিশ্বাস থাকলে সাহিত্যের পক্ষে উপকার হবে না অপকার হবে সেইসব প্রশ্ন উঠেছিল। নাৎসি চিন্তাভাবনার শরিক যে সাহিত্যিক তিনি কি যথার্থ সৎ সাহিত্যিক হতে পারেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিংবা ওই জাতীয় মানবতাবিরোধী চিন্তাভাবনায় যিনি নিমজ্জিত রয়েছেন, তিনি কি এমন সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, যাকে সৎ সাহিত্য বলা যাবে। অথবা সাহিত্যিকের জন্য কোনও পরিচ্ছন্ন সুচিন্তিত বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে কি?

কোয়েসলার বলেছিলেন, 'অবশ্যই আছে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মুজতবা আলী বন্ধুবরেষু

আগেই বলেছি, ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতনে একটি তিন দিন ব্যাপী সাহিত্যমেলার আয়োজন হয়। দুই বাংলার সাহিত্যিকদের নিয়ে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অন্নদাশংকর রায় এবং তাঁর সঙ্গে সুযোগ্য সহায়ক পেয়েছিলেন নিমাই চট্টোপাধ্যায়কে। আমিও অল্প স্বল্প কাজের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। সে আমার এক অভিনব অভিজ্ঞতা। ওই মেলায় একদিন কয়েকজন নবীন কবির সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেদিনই পরিচয় হয়। আধুনিক কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা ওঠে, বিশেষ করে তখন তিনি শান্তিনিকেতনে অনুপস্থিত ছিলেন বলে। কথায় কথায় আমি যখন সুভাষকে বলি যে দু-চারদিনের মধ্যে আমি কলকাতায় যাব, আমার অসুস্থ অধ্যাপক আইয়ুবকে দেখে আসার জন্য তখন সুভাষও তাঁর সঙ্গে আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলে জানালেন। তিনিও শিগ্‌গিরই একদিন দেখা করতে যাবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আরও বলেন যে, আইয়ুবের সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন পার্ল রোডের দোতলায় আইয়ুবকে এবং একতলায় মুজতবা আলিকে দেখে তাঁর খুব বিস্ময়বোধ হয়। এই দুটি বন্ধু পরস্পরের থেকে এত বিপরীত স্বভাবের মানুষ বলে। এত ভিন্ন ধরনের দুটি মানুষ কি করে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেন!

আমি অবশ্য তখনও সৈয়দ মুজতবা আলীকে স্বচক্ষে দেখিনি—তবে আইয়ুবের কাছে নানারকম গল্প শুনেছি। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই ১৯৫০-এ তখনও সেখানে প্রাক্তন ছাত্র সৈয়দদার পরিচিত বহুলোক ছিলেন। তাঁদের মুখেও নানারকম গল্প শুনে মনে হয়েছিল তিনি সেখানকার একজন লেজেন্ড।

মুজতবা সাহেব যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, তখন আইয়ুবও মাঝে মাঝে তাঁর ডাকে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যেতেন। তখনই কলাভবনের বিনায়ক মাসোজী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—এঁদের সঙ্গে আইয়ুবেরও বন্ধুত্ব হয়। ১৯৪৬-এ আইয়ুবের যক্ষ্মা হয়—তখন মাসোজী এবং মুজতবা সাহেব আইয়ুবকে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে মদনাপল্লীর স্যানেটোরিয়ামে গিয়ে কিছুকাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সে সময়কার নানারকম মজার গল্প আইয়ুবের কাছে শুনেছি। আমার সঙ্গে মুজতবা আলীর পরিচয় হয়েছিল আরও কয়েক বছর পরে—১৯৫৩ সালে। আমি শুনেছিলাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে মুজতবা আলী যদিও তখন দিল্লিতেই বেশি থাকেন কিন্তু মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে তাঁর পার্ল রোডের একতলার ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খুব জমিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। ১৯৫৩-তে একদিন বিকেলবেলা পার্ল রোডের বাড়িতে আইয়ুবকে দেখতে গিয়ে মুজতবা আলীর সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। ওঁরা দুই বন্ধু ডক্টর গণির ফ্ল্যাটে খাওয়ার ঘরে গল্প করছিলেন। ওই দুই ব্যাচেলর (মুজতবা সাহেবের বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তখন ঢাকাতেই ছিলেন, কলকাতায় এসে সংসার করেননি) ওই বাড়ির দুটি ঘরের বাসিন্দা হলেও তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ভাবী সালেহা গণির সংসারে। কিন্তু সেদিন কেবল ওঁরা দুজনই চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। আর কেউ ছিলেন না। আইয়ুব তাঁর ছাত্রীর সঙ্গে মুজতবা সাহেবের আলাপ করাতে গিয়ে আমার পিতৃপরিচয় দিলেন। মুজতবা আলীর সঙ্গে আমার বাবার কি করে পরিচয় হয়েছিল সে জানিনা। কিন্তু মনে হয়েছিল বাবাকে মুজতবা সাহেব জানতেন।

আমাকে প্রথম সম্ভাষণে মুজতবা সাহেব বললেন, 'I expected a little more intelligence on your face'—আইয়ুব খুব বিব্রত হয়ে হাসতে লাগলেন। আর আমি তো কোনও দিনই তেমন হাজির-জবাব ছিলাম না। সেদিন প্রায় কিছু বলতে পারিনি। শুধু বোকার মতই একটু হাসতে থাকলাম। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা হতে থাকল। খানিকক্ষণ পরে মুজতবা সাহেবের আরও অনেক বন্ধুবান্ধব এসে পড়ায় তিনি তাঁদের নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমরাও দুজনে আইয়ুবের ঘরে চলে এলাম। তখন আইয়ুব আমাকে জিগ্যেস করলেন, "মুজতবার কথায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে? ও ওইরকম। ভালোমানুষ কাউকে পেলে যা মুখে আসে বলে ঘাবড়ে দিতে ভালোবাসে। কিন্তু এর পরে আলাপ করলে বুঝতে পারবে ও কতখানি সহৃদয় বন্ধু হতে পারে। তখন আর আমার বন্ধুকে এমন শকিং লাগবে না তোমার।"

ওই সময়টা মুজতবা আলী বোধ হয় দিল্লিতে অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-য় কোনও উচ্চপদে ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই কলকাতায় এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন। আমার সঙ্গে নিয়মিত দেখাশুনো হতে লাগল ১৯৫৪/৫৫-র সময় থেকে যখন আমি এম.এ পড়বার জন্য কলকাতায় চলে আসি। তখন দেখা হলে খুব হইহই করে নানারকম গল্প শোনাতেন। বিশেষ করে অল্প দিন পরে যখন কটকের রেডিও স্টেশনের ডিরেক্টর হন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। একবার আইয়ুবকে এবং আমাকেও তাঁর সঙ্গে কটক বেড়াতে যেতে ডাকলেন। আমাদের তখনও বিয়ে হয়নি। অতএব আমাদের দুজনের পক্ষে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হল না। আর আমি তখন এম.এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আইয়ুব একাই তাঁর সঙ্গে কটক চলে গেলেন। সেটা নভেম্বর কি ডিসেম্বর—এক রাত্রির সফর। দুই বন্ধুতে একটি ক্যুপ পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার পর আইয়ুব যথাসময়ে কিঞ্চিৎ নৈশ আহার সেরে নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। মুজতবা সাহেব আইয়ুবের হোল্ড অল খুলে নীচের বার্থে তাঁর বিছানা করে দিলেন। মুজতবা সাহেব নিজে কিন্তু বিশেষ কিছুই খেলেন না এবং ওপরের বার্থে একটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাদরমাত্র বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। সারা রাত কম্বল জড়িয়ে আইয়ুব ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলেন। আর মুজতবা সাহেব দুটি পাখাকে ফুল স্পিডে চালিয়ে ওপরের বার্থে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ফেললেন। তাঁর গায়ে অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু ছিল না। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল রাতের সুনিদ্রার পর মুজতবা সাহেব বেশ ঝরঝরে হয়ে নামলেন। তাঁর ভাষায় 'fit as a fiddle' আর আইয়ুব ধরা গলায় ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে নামলেন, ঠাণ্ডা লেগে চোখে নাকে জল গড়াচ্ছে। প্রথম কটা দিন সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে তিনি আর বেশি ঘোরাঘুরি করতে পারেননি। বরং মুজতবা সাহেবের উৎসাহে তাঁর বাড়িতেই বেশ কিছু স্থানীয় সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের সমাগম হয়। কিন্তু মুজতবা যত বড় করে পার্টি ইত্যাদি দেবার প্ল্যান করেছিলেন, সেগুলি ভেস্তে গেল।

আবু সয়ীদ আইয়ুব যে বালক বয়সেই সিলেটে মুজতবা সাহেবের সতীর্থ ছিলেন সে কথা শুনে থাকলেও আমার মনে ছিল না। সম্প্রতি ভীষ্মদেব চৌধুরী সম্পাদিত সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্রগুচ্ছ গ্রন্থটিতে এই তথ্য পেয়ে খুব ভালো লাগল। ওই সময়ে কিছুদিনের জন্য আইয়ুবের অভিভাবকেরা তাঁকে কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ এখানকার মাদ্রাসা স্কুলে কয়েকটি বয়স্ক ছাত্র সুকুমার দর্শন আইয়ুবকে অত্যন্ত বিরক্ত করছিল। কিশোর আইয়ুব স্কুলে যাবেন না বলে কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তখন তাঁকে এবং তাঁর দাদা আবু আসাদ গণিকে কলকাতা থেকে সরিয়ে বছর দুয়েকের জন্য সিলেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওখানে তাঁদের ভগ্নীপতি আবু-সয়দী আবদুল্লাহ সিলেট আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার সময় মুজতবা সাহেব আইয়ুবের সহপাঠী হয়েছিলেন।

আইয়ুব সিলেট থেকে চলে আসার পর মাঝে কিছুকাল মুজতবা সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ১৯২১ সালে মুজতবা যখন শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করতে এলেন, তখন আবার তাঁদের নতুন করে যোগাযোগ হল। মাঝে মাঝে মুজতবার আমন্ত্রণে আইয়ুব শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। সিলেট যাওয়া আসার পথে মুজতবা কলকাতায় আইয়ুবের ঘরে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেন, কখনও একা কখনও সবান্ধব। মুজতবা সাহেব এলেই তো সেখানে আবার আইয়ুবের তরুণ আত্মীয়দের ভিড় জমে যেত। তাদের অভিভাবকরা অনেকে উদ্বিগ্ন হতেন যে মুজতবা বুঝি ছেলেপুলের মাথা খাচ্ছে।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থার অবসান হলে পরে মুজতবা আলীর ভবঘুরে জীবন বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়ে গেল। প্রথম দফায় তিনি কাবুল চলে গেলেন। তাঁর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপকদের আহ্বানে। মাসে দুশো টাকা মাইনের ইংরেজি পড়ানোর মাস্টারি—তাঁর এবং বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে হল খুব চমৎকার একটা সুযোগ। অল্পদিন পরে সেটি মাসে তিনশো হল। কাবুলের তৎকালীন আমীর আমানুল্লাহ খান তুরস্কের কামাল আতাতুর্ককে অনুসরণ করে ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যাপক বেনোয়া ও বাগদানভ কাবুলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা বিভাগে ইতিপূর্বেই গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে। তাঁদের সুপারিশেই মুজতবা আফগানিস্তানে শিক্ষা বিভাগে চাকরি পান ও ১৯২৭ সালে কাবুল যান। তিনি সেখানে কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শেখাতেন। কিন্তু এই সুখের চাকরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পদিন পরেই প্রতিবিপ্লবের ধাক্কায় আমানুল্লাহর সব উন্নতির পরিকল্পনাই ব্যর্থ হল। বিদেশি শিক্ষকেরাও তড়িঘড়ি সেখান থেকে বিদায় নিলেন। মুজতবা সাহেবের অধ্যাপকরা চলে আসার পর তাঁর আসার ব্যবস্থা করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। অত্যন্ত সংকটের মধ্যে তিনিও কাবুল ত্যাগ করে পেশোয়ারের প্লেন ধরেছিলেন।

দেশে ফেরার পর তাঁর এই বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীরা দিনের পর দিন পরম আগ্রহে শুনেছিলেন। তখনই তাঁর বন্ধুদের মনে হয়েছিল, এ কাহিনীটি উনি যেমন চমৎকার রসিয়ে বলতে পারেন তেমনটি যদি লিখে ফেলতে পারেন তা হলে অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি ভ্রমণকাহিনী হবে।

এরপর ছ-সাত বছর তিনি বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য চলে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক বগদানভের চেষ্টায় তিনি জার্মানিতে পড়াশোনার সুযোগ পেলেন। প্রথমে বার্লিনে এবং পরে বন-এ। সে সময় তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'The Origin of the Khojas and Their Religious Life Today' এরপর তিনি কয়েক বছর ফ্রান্স ও ইটালিতে কাটিয়ে দেশে ফিরবার পথে কায়রোতে যান এবং আল-আজহারে পড়াশোনার সুযোগ পান। কায়রোতে বরোদার বিদ্যোৎসাহী মহারাজা সয়াজি রাও গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

দেশে ফিরে তিনি বরোদার মহারাজার আগ্রহে বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তবে যে কয়েক বছর ছিলেন তার মধ্যে একটিও ছাত্র পাননি। এই সময়কার তাঁর নানারকম অভিজ্ঞতার গল্প করতেন। অল্পদিন পর পর রাজসভা বসত। সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে এই উজ্জ্বল অধ্যাপক রত্নটিরও নিমন্ত্রণ হত। তাঁরা সবাই সভা সাজিয়ে বসতেন। একদিন এরকম একটি সভায় মুজতবা তাঁর নির্ধারিত আসনে বসে এক পার উপর আরেক পা তুলে পা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন সবার দৃষ্টি তাঁর উপরে, আর সভাপরিচালক আমলাটি গম্ভীরকণ্ঠে ধমক দিচ্ছেন 'আলী আদব সে বৈঠো'। এরকম আদব-কায়দা মেনে বছর কয়েক থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন।

এবার তাঁর লেখালেখির কাজ বেশ আনন্দের সঙ্গে শুরু করলেন। কিছুদিন পর বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে উনি 'দেশে-বিদেশে' লেখায় হাত দিলেন। কয়েকবার কয়েকটি সাহিত্য সভাতেও কিছু কিছু অংশ পাঠ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৮-এ লেখাটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। বলতে গেলে রাতারাতি তাঁর লেখক-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আইয়ুব সব সময় বলতেন যে 'দেশে-বিদেশে'ই মুজতবার শ্রেষ্ঠ রচনা।

ততদিনে তো দেশবিভাগ হয়ে গিয়েছে এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয় মহলের তখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেশত্যাগের হিড়িক পড়েছিল। সেই ভাঙাগড়ার মাঝখানে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন যদিও কেউ কেউ যেমন এদিকেই থেকে গেলেন তাঁদের তিন পুরুষের জন্মভূমিতে, কিন্তু মুজতবা সাহেবের আত্মীয়স্বজনের আদিনিবাস সব কিছু পূর্ব বাংলায় সিলেটে অর্থাৎ তখন পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম লিগের রাজনীতিভাবনা এবং দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রথম থেকেই তাঁরা কেউ-ই গ্রহণ করতে পারেন নি। সেজন্য দেশভাগের পরে কয়েক বছর কোন দেশে থাকবেন সে বিষয়ে মুজতবা সাহেব দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এমনকী তিনি বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের পদ নিয়ে সেখানে কিছুকালের জন্য যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে কিছু মতামত অকপটে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে তখনও উর্দু ভাষার বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন দানা বাঁধেনি। কিছু বাঙালি পণ্ডিতও কায়েদে আজমের উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য করার প্রস্তাবে প্রতিবাদ তো জানাননি বরং নানা যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার প্রয়াস করছিলেন এবং আরবি ফারসি ও ব্যাপক উর্দু চর্চাকে সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু মুজতবাই সর্বপ্রথম ওই সমস্যাটিকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। ইতিহাস থেকে আরও কিছু নজির টেনে উর্দুভাষার দাবি কতটা অযৌক্তিক তা প্রমাণ করেছিলেন। ফলে অচিরেই তিনি কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়েন এবং পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন। তাই বলতে গেলে ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে প্রথম বীজটি তিনিই বপন করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সে কথা কেউ স্মরণে রাখেননি। বরং ভিসা পার্সপোর্ট চালু হওয়ার পর উনি যে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেই তাতে ক্ষুব্ধ হন।

এদিকে স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পরে এদেশে মুসলমানের পক্ষে জীবনযাত্রা বেশ কঠিন হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িকতার আবিল পরিবেশে যাঁরা এদিকে রয়ে গেলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

মদনাপল্লী থেকে অনেকটা সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর আইয়ুবের সমস্যা হল একটি চাকরি পাওয়া। পাকিস্তান থেকে ভাল ভাল হিন্দু অধ্যাপকরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের সুব্যবস্থা করতেই শিক্ষাবিভাগ তখন হিমসিম খাচ্ছে। তাই আইয়ুবের একটি কাজ পাওয়ার আশা তখন সুদূরপরাহত। ১৯৪৯ সালে ঢাকার কয়েকজন বন্ধু আইয়ুবের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে একটি চাকরির ব্যবস্থা পাকা করে চিঠি লিখলেন। ততদিনে আইয়ুব ৫ পার্ল রোডের দোতলায় এবং মুজতবা আলী এক তলার স্থায়ী অধিবাসী। একদিন বিকেলে মুজতবা যখন তাঁর বন্ধু কানাইলাল সরকার, কিঙ্কর সেন প্রমুখের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, তখন আইয়ুবও বিষণ্ণ মুখে সেখানে ওঁদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দেন। মুজতবা তখন হাসতে হাসতে বন্ধুদের বললেন যে, লোকে চাকরির খবর পেলে ফুর্তি করে আর আমার এই বন্ধুটি এমন বিষণ্ণ হয়ে আছে যেন বিরাট কোনও শোকের সংবাদ এসেছে।

বন্ধুরা জানবার জন্য উৎসুক হলে মুজতবা তাঁদের বিশদ জানালেন যে ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে আইয়ুব অধ্যাপনার একটি পদ পেয়েছেন এবং থাকার জন্য কোয়ার্টারের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। একথা শুনে বন্ধুরা হই চই করে উঠলেন, 'সে কি আইয়ুব পাকিস্তান চলে যাবেন, এটা হতেই পারে না, আপনাকে কবে যোগ দিতে বলা হয়েছে? আপনি কয়েকটা দিন আমাদের সময় দিন আমরা কালই রথীদার সঙ্গে কথা বলব।' রথীদা তখন শান্তিনিকেতন থেকে এসে জোড়াসাঁকোতে আছেন।

আইয়ুব দুরুদুরু বক্ষে আশার ক্ষীণ একটি সম্ভাবনা নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। দু-তিনদিনের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার চাকরির নিশ্চিত খবর শান্তিনিকেতনের সেই বন্ধুরা নিয়ে এলেন। কিছুকাল আগে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হায়দ্রাবাদের নিজাম বিশ্বভারতীকে উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করার জন্য কিছু দান করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত বিশ্বভারতী এই পদের উপযুক্ত কাউকে পায়নি।

মাস ছয়েকের মধ্যে ১৯৫০-এর এপ্রিল-মে মাসে সেই চাকরিতে আইয়ুব যোগদান করেন। এর অল্পকাল পরে হুমায়ুন কবীরের আহ্বানে মুজতবা সাহেবকেও শিক্ষামন্ত্রকের কোনও এক পদে যোগ দিতে হল। দুই বন্ধু কেউই তাঁদের নতুন দায়িত্ব বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি। আইয়ুব অসুস্থতার কারণে বছর খানিক ছুটি নিলেন। তারপর ইস্তফা দিলেন। ওদিকে মুজতবা সাহেব কালচারাল রিলেশনস্-এর সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করে অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে কয়েক বছর কলকাতা, কটক এবং পাটনায় চাকরি করার পরে তিনিও ইস্তফা দিলেন। যদিও তখন তাঁর একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়েছে। ততদিনে দুই দেশের মধ্যে ভিসা পাসপোর্ট চালু হয়ে গেছে। স্ত্রী-পুত্র পূর্ব পাকিস্তানে থাকা সত্ত্বেও মুজতবা সাহেব ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ব্যক্তিত্ব তাঁকে পাকিস্তানবিরোধী করে রেখেছিল। তবে এর জন্য তাঁর পরবর্তী জীবনে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল।

১৯৫১ তে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্রী ছিলাম, আবু সয়ীদ আইয়ুব সেখানে আমাদের অধ্যাপনা করেছিলেন। তখন হঠাৎ একদিন শান্তিনিকেতনে খবর এল মুজতবা সাহেব বিবাহ করেছেন। তাঁর বন্ধু বান্ধবেরা অনেকেই তখন অবাক হয়েছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁরা আগে কোনওই খবর পাননি। কয়েক মাসের মধ্যেই আইয়ুব অসুস্থ হয়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলেন। ৫, পার্ল রোডে ফিরে এসে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। কিছুকালের জন্য যাদবপুরে কিরণশংকর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালেও গেলেন। সেখানে বড় একটা অপারেশনের কথা হয়েছিল এবং তা নিয়ে আইয়ুব খুবই দুর্ভাবনার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অপারেশনের প্রস্তাব বাতিল হল। সদ্য যেসব স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি ওষুধের খবর পাওয়া গিয়েছিল সেসব দিয়েই চিকিৎসা চলতে লাগল।

আমি কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে হস্টেলে স্থান পাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং হস্টেলে স্থান পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে আইয়ুবের অনুরোধে তাঁর বন্ধু অম্লান দত্ত সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় আসার পর থেকে প্রায় রোজই পার্ল রোডে বিকেলের দিকে একবার করে আসতাম। তখনই আইয়ুবের পরিবারের সঙ্গে এবং মুজতবা কলকাতায় থাকলে তাঁর সঙ্গেও আলাপ হত। একবার কোনও ছুটিতে রাবেয়া আলী তাঁর শিশু পুত্রটিকে নিয়ে এসে মুজতবা সাহেবের ঘরে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছিল। তবে তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ খুব বেশি হয়নি। আসা-যাওয়ার অসুবিধার জন্য এবং মুজতবার একটি মাত্র ঘর থাকায় তাঁর স্ত্রী এখানে এই বাড়িতে এসে বেশি দিন থাকেননি। সম্ভবত দিল্লিতে কটকে এবং পাটনায় এসে মাঝে মাঝে থেকেছেন।

১৯৫৫ সালে আমি এম.এ. পরীক্ষায় পাশ করার পরেই ছাপান্ন সালের জানুয়ারি মাসে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে কাজ পেয়েছিলাম। এইভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেই আইয়ুব বিবাহের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। নয়ত সবাই তাঁকে নাবালিকা হিন্দু কন্যাকে অপহরণের অপবাদ দেবে—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা। আমাদের বিয়ের পরই একটু প্রশস্ত একটি আবাসের প্রয়োজন হল। কারণ একটি মাত্র ঘরে আইয়ুবের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সংসার করা সম্ভব ছিল না। ঠিক সেই সময়েই কলকাতা রেডিও স্টেশনের চাকরি ছেড়ে মুজতবা শান্তিনিকেতনে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর একতলার ঘরটির স্বত্ব তিনি আমাদের দিতে রাজি হন। ঘরটির উপর তাঁর এক অনুগত ভক্তের দাবি ছিল। মুজতবার নির্দেশে তিনি এই দাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বন্ধুবৎসল মুজতবা সাহেব আমাদের মস্তবড় উপকার করেছিলেন। অসুস্থ দেহে তাঁর ডাক্তার ভাইয়ের সান্নিধ্য থেকে আর কোথাও তাঁকে নিয়ে গেলে আইয়ুবের প্রতি অবিচার করা হত। দোতলার একটি এবং একতলায় আর একটি ঘর নিয়ে আমাদের সংসার শুরু হল। ১৯৫৭-য় আমাদের পুত্র সন্তানটির জন্ম হয়েছিল।

এর পরে যখন মুজতবা সাহেব আসতেন, তখন এই বাড়িতে তাঁর ঘরটি না থাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ অনিয়মিত হয়ে গেল। কলকাতায় যেহেতু তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীর সংখ্যা যথেষ্টই ছিল, তাই কলকাতায় তাঁর আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল। তবে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারতেন না।

এরপর ১৯৭০ পর্যন্ত মুজতবা সাহেব প্রথমে শান্তিনিকেতনে ছিলেন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার কাজে। পরে কাজ থেকে ইস্তফা দিয়ে এবং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে অভিমানে বোলপুরে গিয়ে থাকতে শুরু করেন এই সময়টায় ওঁর কথা মনে পড়ল খুব অপরাধী বোধ করতাম। দোতলায় ও একতলায় দুটি বিচ্ছিন্ন ঘরে একটি শিশু এবং অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর হয়েছিল, বিশেষ করে প্রায়ই উনি অসুস্থ থাকতেন বলে। তাই বছর পাঁচেকের মধ্যে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু আমরাও নিরুপায় ছিলাম। এই বাড়িতে আইয়ুবের পার্শ্ববর্তী ভাড়াটেরা চলে যাচ্ছিল বলে তাদের একটি ঘর আমাদের এই শর্তে দিতে রাজি হয়েছিলেন যে একতলার ঘরটি তাঁকেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রত্যার্পণ করতে হবে। অসুস্থ স্বামীর পাশাপাশি ঘরে থাকতে পারব—এই আশায় আমি মুজতবার ঘরটি আমাদের আত্মীয়া গৃহস্বামিনীকে ফেরত দিয়েছিলাম। কথাটা আমি মুজতবা সাহেবকে সসঙ্কোচে জানিয়েছিলাম। মুজতবাও জেনে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। আমি উপরের ঘরটি পাই ১৯৬০ সালে। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপনা ছেড়ে দেওয়ার পর এই বাড়ির সেই প্রাক্তন ঘরটি পেলেই মুজতবা সাহেবের সবচেয়ে সুবিধা হত। কিন্তু তা যে হল না সেজন্য আমি এখনও মনস্তাপ ভোগ করি। সব থেকে বড় সমস্যা হল ১৯৭১-এ যখন পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

সে সময়ে বোলপুরে তাঁর বাড়িতে গোয়েন্দা দফতর থেকে পুলিশ গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ্নাদি করেছিল। কোনও সংবাদপত্রে এ সংবাদটি সে সময়ে বিকৃত ভাবে বেরিয়েছিল দেখে আমাদের অত্যন্ত মন খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কিছু করার ছিল না। যখন শুনলাম আমার একজন শ্রদ্ধার পাত্র প্রবীণ গান্ধীবাদীও এই কারণে মুজতবা আলী সম্পর্কে কিছু সংশয় প্রকাশ করেছেন, তখন আর সহ্য করতে পারিনি। তাঁকে পত্র লিখে আমার ক্ষোভ ও যন্ত্রণা জানিয়েছিলাম। তিনি পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ততদিনে এই বাড়ির বৃদ্ধ মালিক এবং তাঁর স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমাদের উপরের ফ্ল্যাটে থাকতেন কেবল সেই গৃহস্বামীর অকৃতদার কনিষ্ঠ পুত্র কচি। তিনিই মুজতবা সাহেবকে আবার তিনতলার ঘরে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যাপারটা সহজে ঘটেনি। কারণ কচির এই কাজটায় তাঁর ভাইবোনেরা কেউ কেউ অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, মুজতবা সাহেব যে উপরের ঘরে এসে থাকতে শুরু করলেন, এতে আমাদের বিবেক একটু স্বস্তি পেল। কিন্তু দেখা গেল যে মানুষটি ৫৬ সালে এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আর যিনি ৭১ সালে ফিরে এলেন, তাঁরা যেন আর একই মানুষ নন। ইতিমধ্যে দেশ পত্রিকা মারফৎ বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন বহুকাল ধরেই সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। দেশ পত্রিকায় নিয়মিত নানা লেখা বার হচ্ছিল বলে তাঁর অনেকটা আর্থিক সমস্যারও সমাধান হয়েছিল। কোনও রকমে সেই লেখাটুকু লিখতেন, কিন্তু অবশিষ্ট সময়ে আগের মতো পড়াশুনো করার অভ্যাস আর রাখতে পারেননি। যোগ্য-অযোগ্য নানা ব্যক্তির সঙ্গে আড্ডা দিয়েই সময় কেটে যেত এবং পানের অভ্যাসও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। তাঁকে সংযত করার সাধ্য আমাদের কারওর ছিল না। তাঁর মানসিক বিষাদের কারণও যথেষ্ট ছিল, সেকথাও অস্বীকার করা যাবে না। সারা একাত্তর সালটি তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কষ্টের কাল ছিল। তাঁর স্ত্রী, পুত্র যে ঢাকাতেই রয়ে গিয়েছিলেন সেজন্য পূর্ব পাকিস্তানের খান সেনাদের দৌরাত্ম্যের সব খবর পেয়েও মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। এর জন্যও তাঁর এখানে নানাজনের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছিল। স্বামী ভারতীয় এই অপরাধেই তাঁর স্ত্রীর উপরে কত যে নিগ্রহ হতে পারত সেই সব কথা ভেবেই তিনি অন্য ভারতীয় মুসলিম ইন্‌টেলেকচ্যুয়ালদের মত সরাসরি বাংলাদেশে পাকিস্তানী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বর্বরতার নিন্দা করতেও পারছিলেন না। আবার নীরবে সহ্য করাও বড় কঠিন ছিল। এ সময় বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরেই তিনি ঢাকায় যান। সেখানে সকলকে ভাল দেখে তাঁর এতদিনের উদ্বেগের অবসান হল। কিন্তু বেশ কিছুকাল পরিবারের সঙ্গে থাকার পর উনি আবার কলকাতা ফিরে আসেন তাঁর লেখালেখির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তা ছাড়া তাঁর সেই ভবঘুরে জীবনের স্বাধীনতাটুকু তিনি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু লেখালেখি যতটা করবেন ভেবেছিলেন, ততটা করতে পারছিলেন না। নিজেকেও যথেষ্ট সংযত করতে পারছিলেন না। তাঁর ভাবীর পাঠানো খাবার বেশিরভাগ দিনই অস্পৃষ্ট পড়ে থাকত। এর কিছুকাল পরে যখন মিসেস রাবেয়া আলী তাঁর নিজস্ব চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন, তখন আমি এবং আমার বড় জা মিসেস গণি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন কথায় কথায় তাঁকে অনুরোধ জানাই যে, তিনি যেন মুজতবা সাহেবকে আর এখানে একা রেখে না যান। তাঁকে বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজের সঙ্গে ঢাকায় নিয়ে যান। মিসেস আলীকে এইভাবে পরামর্শ দেওয়াটা হয়ত আমাদের পক্ষে উচিত হয়নি। তিনি আমাদের কথা চুপ করে শুনে গিয়েছিলেন, কিছু বলেননি। তিনি বোধ হয় আমাদের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন। তারপর স্বামীকে যে কী বলেছিলেন তা শুধু অনুমানই করতে পারি। এর কয়েকদিন পরে মিসেস আলী ঢাকায় একা ফিরে যান। তখন একদিন সন্ধ্যায় আমি মুজতবার ঘরে গিয়েছিলাম। দু-একটি হাস্য পরিহাসের কথা হবার পরই মুজতবা অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন এবং যেভাবে আমাকে কঠোর তিরস্কার করতে লাগলেন, তাতে আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। তিনি আমাকে এবং আমার জাকে কত ভালোবাসতেন এবং কলকাতায় নিজের ঘর দিয়েও আমাদের একদিন উপকার করতে চেষ্টা করেছিলেন, তার প্রতিদানে আজ আমরা তাঁকে এই ঘর থেকেও দূর করে দেবার চেষ্টা করেছি। আমরা যে এতদূর স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর তা তিনি জানতেন না। তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে পর্যন্ত আমরা ওই উদ্দেশ্যে বিব্রত করেছি। কয়েক মিনিট এইসব কথা বলার পর যখন উনি একটু থামলেন, তখন আমি উঠে নীরবে চলে এলাম।

তারপর আর তাঁর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয়নি। উঠতে নামতে সিঁড়িতে দেখা হলে আমি মাথা নিচু করে সরে দাঁড়াতাম। কিছুদিন পরে ঈদের সময়ে আমার কাছে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে বলেছিলেন, সেদিন রাগের মাথায় যে সব কথা বলেছিলেন তা বলা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না এবং সেহেতু আমি যেন তাঁকে ক্ষমা করি।

আমার এত আত্মঘাতী অহঙ্কার ছিল যে এর জবাবে আমি তাঁকে জানাতে পারিনি যে আমরাও তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তার কয়েকদিন পর তিনি আবার ঢাকা যাচ্ছেন শুনেও আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। আমি ভেবেছিলাম, শিগ্‌গিরই তিনি আবার ফিরে আসবেন। সেইজন্য অনুতাপের জ্বালা আমি আজ পর্যন্ত বয়ে বেড়াচ্ছি। চুয়াত্তরের গোড়ায় যখন খবর এল যে তিনি আর ইহলোক নেই, তখন আমার সমস্ত প্রাণটা হাহাকার করে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই জীবননাট্যের উপর যবনিকা যে এত তাড়াতাড়ি নেমে আসবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তার ফলে, সারাজীবন একটি গভীর অনুতাপ বহন করাই আমার ভবিতব্য। এককালে যিনি এত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি কি করে এভাবে চলে গেলেন তা আজও আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৭ (১৪০৪), সং ৩, পৃঃ ২৪০-৪৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেদিন দু'জনে...

আমার বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন সকলেরই একটা বড় কৌতূহল রয়েছে আমাদের বিয়ের দিনটিকে নিয়ে। আমার এই পর্বের স্মৃতিচারণের শেষ অধ্যায়টি লেখা হোক আমাদের বিয়েকে নিয়ে, এটাই ছিল অনুলেখক কামালের একান্ত ইচ্ছা।

তাই বিয়ের গল্পই হোক। যদি এই অসুস্থ শরীরটা আরও কিছুদিন দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে স্মৃতিকথার দ্বিতীয় পর্বে আমার আর আইয়ুবের কাছাকাছি আসা আরও অসংখ্য প্রিয়জনের গল্প শোনানো যাবে। অস্টিও আর্থ্রাইটিসের তীব্র যন্ত্রণা শরীরটাকে যে ভাবে দিন দিন পঙ্গু করে তুলছে, জানি না কতদিন মুখে বলে শ্রুতিলিখনে কামালকে দিয়ে লেখাতে পারব। রোগব্যাধিজর্জর দেহও কীভাবে মানুষকে অসহায় অবস্থায় পৌঁছে দেয়, আইয়ুবের শেষ জীবনে তা নিজের চোখে দেখেছি। এখন নিজের শরীর দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করছি। কামাল, রিনা, আরতির মতো কাছের মানুষরাও তা প্রতিদিন উপলব্ধি করছে।

অসুখের গল্প এখন থাক। আমাদের বিয়ের গল্প শোনাই। আইয়ুবের আর আমার বিয়ে।

১৯৫৬ সালের জুন মাসে গরমের ছুটিতে আমরা বিয়ে করলাম। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কথা ছিল, রেজিস্ট্রার বাড়ি এসে সকাল সকালই বিয়ের আয়োজন করবেন। আমি বিয়ের উপকরণ হিসেবে দু-চারটে জিনিস সংগ্রহ করে এবং দুটি মালা কিনে নিয়ে ঢাকাঢুকি দিয়ে সবার চোখের আড়ালে ৫ নম্বর পার্ল রোডে একবার সকাল সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম। দেখলাম বরপক্ষের তখনও ঘুম ভাঙে নি। অথবা দরজা খোলেনি।

তখন আমি আবার চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে পার্ল রোড, বেকবাগান, আমির আলি অ্যাভিনিউ, নাসিরুদ্দিন রোড, বালু হক্কাক লেন সব পরিক্রমা করে আবার পা টিপে টিপে দোতলায় উঠে এলাম। এমন বিয়ে-পাগলা কনেকে দেখে কে কী মনে করবে, সেই ভেবে লজ্জায় একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম। এবার কিন্তু দরজাটা ভেজানো দেখে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম।

তারপর ক্রমে ক্রমে আমন্ত্রিতরা দু-একজন এলেন। আমার পক্ষ থেকে আরতি সেন, মীরা দত্ত (পরে বালসুব্রহ্মণ্যম) এবং অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন। আরতি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মীরা ভাইঝি। অমিতাভও নিকট আত্মীয়। অম্লান দত্ত সেই সময়টায় কোনও কাজে কয়েক দিনের জন্য সম্ভবত জাপান গিয়েছিলেন।

আরতি আর মীরা তো অত যত্ন করে সাজিয়ে দিল ভাবী মিসেস গণির ঘরে নিয়ে গিয়ে। এতদিন আমি সাদা শাড়ি পড়তাম। ইচ্ছা করেই আমি এই দিনের জন্য লাল টুকটুকে একটি মুর্শিদাবাদের সিল্ক বেছে নিয়েছিলাম। সেদিন আমি আইয়ুবের কাছ থেকে ওই শাড়ি, আমার জা-এর কাছ থেকে একটি বেগনী রঙের ঝলমলে শাড়ি আর আরতির কাছ থেকে অধিবাসের জন্য একটি হলদে তাঁতের শাড়ি উপহার পেয়েছিলাম। মীরার হাতে তার মা পাঠিয়েছিলেন সুন্দর একটা লাল পাড় সাদা শাড়ি। আর তাঁর ব্যবহৃত একটি সিঁদুর কৌটো, যা আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম।

মীরা তো খুব অপ্রস্তুত। বলতে লাগল, 'আমি যদি জানতাম তুমি রঙিন শাড়ি পরবে, তাহলে কখনই সাদা শাড়ি কিনতাম না।'

আমার জা-এর দেওয়া একটি সোনার হার গলায় পরেছিলাম। আর দু-হাতে কিছু কাঁচের চুড়ি। পরে অবশ্য আমাকে চারখানি সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিয়েছিলেন আমার স্বামী।

বর তো তাঁর সাদা ধুতি পাঞ্জাবীতেই সবার চোখ জুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর আবার গলায় গোড়ে মালা।

আমার ভাসুরের বসার ঘরে বিবাহের আসর সাজানো হয়েছিল। রেজিস্ট্রার এসে পৌঁছলে আমরা সবাই সে ঘরে গিয়ে বসলাম। বরপক্ষ থেকে আমার ভাসুর ড: এ. এম. ও গণি স্বাক্ষর দিলেন। আর কন্যাপক্ষ থেকে মীরা আর অমিতাভ। অল্প সল্প জলযোগ, হাস্য-পরিহাস, তারপর সবাই ফিরে গেলেন।

আমরা দু-জনেও নিজেদের ঘরে চলে এলাম। সেইদিন দু-জনের চোখ ছাপিয়ে এত যে জল উপচে পড়বে তা আমরা ভাবিনি। সে চোখের জলের ভাষা এত জটিল ছিল তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আজও করব না।

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার ছেলেবেলা

আমার জন্ম পাটনায়—১৯৩১-এ। তার অল্প আগে আমার বাবা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আমার পৈতৃক বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলায়। ময়মনসিংহ জেলারই একটি গ্রামে আমার বাবার নিবাস, আরেকটি গ্রামে আমার মায়ের নিবাস। আমার বাবা যখন বিয়ে করেছিলেন তখন ত্রিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স। তার আগে তিনি এম.এ পাশ করেছেন, Ph D করার আগেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পেয়েছেন। বাবা গান্ধীবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে তুলোর গাঁটরি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন, লোকেদের চরখা চালানো শেখাতেন। যখন বাবার সঙ্গে মায়ের বিয়ের প্রস্তাব এলো, আমার একজন মেসোমশাই, বল্লেন যে ছেলেটি তো পড়াশুনোয় খুব ভালো, দেখতেও ফর্সা কটকী বামুন ঠাকুরের মতো চেহারা কিন্তু 'ওই যে তুলার পুঁটলি কাঁধে কইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায়—কে জানে...!' কিন্তু যা হোক্, তার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বাবা স্থির করলেন যে কন্যাকে কোনোরকম যৌতুক দেওয়া হবে না কেন না মা তখন বিধবার কনিষ্ঠা কন্যা। বিধবার বিশেষ কিছুই ছিল না দেওয়ার মত।

কামাল আপনার দাদামশাই তখন জীবিত ছিলেন না?

আমার দাদামশাই তার অনেক আগেই মারা গেছেন। মামাও তখন ঠিকমতো মানুষ হননি। সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব খানিকটা বড় মেয়েদের জামাইরা নিয়েছিলেন। এই জামাইরা অনেকেই খুবই দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। দিদিমার দিক থেকে বরং কষ্ট হয়নি। তবে বিয়ের জন্য বিশেষ খরচ করার তাঁর উপায় ছিল না এবং আমার বাবার দাবী ছিল যে কোনরকম খরচ করবেন না। কনেকে বরের বাড়িতে উঠিয়ে এনে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বরযাত্রী ইত্যাদিদের ভার নেওয়া এবং বিবাহের সমস্ত আয়োজন করা বিধবার পক্ষে একটু কষ্টকরই হতো। যা হোক, বড়মামা আমার মাকে আমাদের পৈতৃক গ্রামে নিয়ে এলেন, আত্মীয়স্বজন দু'চারজন সঙ্গে এলেন। বিয়ের ব্যবস্থা হ'ল। বাবা যখন শুনলেন যে মা-র জন্য একটি বেনারসী শাড়ি ও অল্পস্বল্প গয়নার ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনি বললেন 'এসব তো চলবে না। খদ্দরের শাড়ি পরতে হবে এবং দুটি শাঁখা ছাড়া আর কিছু পরা চলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কামাল এটা কত সালের কথা?

এটা আমার মনে হয় ১৯২৩-এর কথা। যাই হোক্, তখন তো আমার বড়মামা খুবই ছেলেমানুষ। তিনি ঠিক নিজের মায়ের যা কিছু আদেশ সেটা অগ্রাহ্য করতেও ভয় পাচ্ছেন, এদিকে দেখছেন যে তা না করলে, আবার ওই সব পোষাক আষাক যা নিয়ে এসেছিলেন সেগুলির বদলে খদ্দর না পরালে এই ভদ্রলোক বিয়ে করবেন না। তখন তিনি একটু কান্নাকাটি করে রাজি হয়ে গেলেন। যা হোক্, সেই হল মা-র নতুন জীবনের শুরু।

মা যে অল্পদিনের মধ্যে কতখানি বদলে গিয়েছিলেন সেকথা যখন আমি পরে শুনতাম আমার খুব অবাক লাগতো। বিয়ের কিছুদিন পরে আমার মা এক দিদি-জামাই বাবুর কাছে কিছুদিন ছিলেন। সেখান থেকে কোনও একটা বিয়েতে যাবার কথা হয়েছিল—তো দিদি বলতে লাগলেন 'আমার শাড়ি পর, আমার গয়না পর' ইত্যাদি। মা তেরো বছরের মেয়ে কিন্তু খুব জেদ ধরলেন 'না, যেটা উনি পছন্দ করবেন না আমি সেকাজ করবো না।' শেষ পর্যন্ত ওঁর ভগ্নীপতি বললেন 'এই তো কেমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওকে স্বামী যেমন বুঝিয়েছে, তেমন বুঝেছে। ওর স্বামী যেটা পছন্দ করবে না, সেটা সে করছে না—খুব ভালো।' আমিও ভাবি মাঝে মাঝে যে তেরো বছরের মেয়ে অতখানি মনের জোর পেলেন কোথা থেকে! সেটা অবশ্য একটা সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন ও আনুগত্য থেকেই নিশ্চয়ই এসেছিল। কিন্তু বলতেই হবে যে আমার বাবা মায়ের ওপরে বড় বেশি কর্তৃত্বও করতেন। একদিকে আঠাশ/ঊনত্রিশ বছরের একটি যুবক স্বামী আর এদিকে বারো বছরের একটি বালিকা বধূ। বিয়ের পর কিছুকাল আমার মা গৌহাটিতে আমার জ্যাঠামশাই জ্যেঠিমার কাছে ছিলেন। এই জ্যাঠামশাই-জ্যেঠিমা আমার বাবাকে পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। এবং তাঁর পড়াশুনোর একটা পর্যায়ে বাবা গৌহাটিতে পড়েওছিলেন—Cotton college এ—এবং সেখান থেকে BA পাশ করেছিলেন। যা হোক্, এখন মা-র ওপর আদেশ হল তিনি রোজ কতটা যেন সূতো কাটবেন তাহলে বাবার চিঠি পাবেন নইলে পাবেন না।

কামাল ওটা জানাতে হতো?

হ্যাঁ। আমি এই গল্পটা কখনও মায়ের কাছে শুনিনি। আমি শুনেছিলাম বাবার একজন একটু বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ডক্টর রাসবিহারী দাসের কাছ থেকে। তিনি আবার ভীষণ উদার এবং নারীস্বাধীনতা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি বলতেন 'তোমার বাবার ওটা ভীষণ অন্যায় হয়েছিল ঐটুকু মেয়েকে বলা যে তুমি রোজ অতটা করে সূতো কাটবে নইলে তোমাকে আমি চিঠি লিখবো না—এসবের কোনো মানে হয়? আমি তার জন্য ধীরেনকে খুব বকেছি পরে।' যা হোক, এই থেকে খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায় যে এই দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্কটা কীরকম ছিল।

আমার বাবা পাটনায় শিক্ষকতা করতে আসার কিছুদিন পরে আমার জন্ম।

কামাল উনি পাটনার কোথায় ছিলেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন তো ওটার নাম ছিল পাটনা কলেজ। পাটনা কলেজ তখনকার দিনে বেশ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে অনেক ক'জন বিখ্যাত শিক্ষকও ছিলেন। যদুনাথ সরকারের মতো শিক্ষকও ওখানে পড়িয়ে এসেছেন।

কামাল আপনার বাবা ও মায়ের পুরো নাম কী?

আমার বাবার নাম ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, মায়ের নাম নিরুপমা। নিরুপমা চৌধুরী ছিলেন।

কামাল আপনারা ক' ভাইবোন?

আমরা ন'টি ভাইবোন। চারটি ভাই, পাঁচটি বোন। সবচেয়ে বড় ভাইয়ের নাম অধিজিৎ (অজু), তারপর সুধিজিৎ (সুজু) তারপর আমি, গৌরী—আমার একটা ভালো নাম ছিল, মৈত্রেয়ী। তখনকার দিনে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপকরা সবসময়ে নিজেদের কন্যাকে 'মৈত্রেয়ী' নাম দিতেন।

কামাল Official ভাবে কি 'মৈত্রেয়ী'টা চলতো?

না, officially চলেনি কারণ আমি যখন স্কুলে ভর্তি হতে গেলাম তখন, ১৯৪১-এ আমার বয়স দশ। অনেকদিন স্কুলে টুলে পাঠাবার কথা কারোর মনে হয়নি—তারপর যখন মনে হয়েছে তখন তাড়াহুড়ো করে খানিকটা আমাকে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা হ'ল। তার আগে বাংলা যথেষ্ট ভালো শিখে নিয়েছিলাম এবং নানারকম বই যেটা পরে বুঝলাম ওই বয়সে নাকি নিষিদ্ধ—সে সব তখন আমার পড়া হয়ে গিয়েছিল। পরে ক্লাসের বন্ধুদের কাছে শুনলাম 'ছি ছি ছি, তুই এইসব বড়দের বই পড়িস।' যা হোক্, তারপর আমি সেটা গোপন করবার চেষ্টা করতাম বড়দের বই পড়ার লজ্জাতে। কিন্তু ইংরেজি আমার বিশেষ শেখা হয়নি। যখন কথা হল যে আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হবে তখন আমার একজন জ্যাঠামশাই—তিনি পাটনায় ছিলেন—তিনি সেই দায়িত্বটা নিলেন। তিনি পরপর আমাকে দু'টো—বোধহয় New Method Reader Part-I & Part-II—পড়িয়ে দিলেন। ঐটুকু পড়ে আমার বুকে একটু ভরসা হ'ল যে হ্যাঁ পারবো Class VI-এ পরীক্ষা দিতে কিন্তু পরীক্ষা কেউ নেয়নি। কিন্তু যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল যে তোমার নাম কী আমি চটপট বললাম 'গৌরী, গৌরী দত্ত।' কারণ 'মৈত্রেয়ী'টা ইংরিজীতে লেখার সাধ্য ছিল না, আমি তার বানান জানতাম না। তাই যদি আমাকে লিখতে বলে ও আমি লিখতে না পারি সেই লজ্জায় আমি আমার নামটা গোপন করলাম এবং তারপর চিরকালই সেটা গোপন রয়ে গেল।

কামাল বাড়িতেও তারপর চেষ্টা করেনি নামটা পাল্টে দিতে?

না, বাড়িতেও পালটাবার চেষ্টা করা হয়নি।

কামাল তারপর অন্য ভাইবোনদের নামগুলো?

আমার তার পরের ভাই-এর নাম বসুজিৎ (বিজু), তার পরের জনের নাম অশেষ (দীপু), তারপর ইরা। ইরারও একটা ভালো নাম ছিল, 'গায়ত্রী'। ইরার নামটা কেন চাপা পড়ে গেল সে গল্প হয়তো ইরা বলতে পারবে, আমি ঠিক জানিনা। ও যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে তখন আমি পাটনাতেই ছিলাম। আমাদেরই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমি যখন ওকে ভর্তি করতে গেলাম তখন আমি নিজে হয়তো 'গায়ত্রী' বানান লিখতে পারতাম না ইংরেজিতে—তাই হয়তো ওর নাম 'ইরা' হয়ে গিয়েছিল। আমার সেটা মনে নেই। ইরা, তার পরেরটি হচ্ছে মনীষা (ঈশা), তারপর 'শুভা'—শুভার ভালো নাম, ডাক নাম একই এবং তার পরেরটি হচ্ছে সুনন্দা—ডাকনাম 'পদ্মা'। আমরা এই নজন ভাইবোন। এখন, আমার ওপরে দু'টি ভাই ও পরে দুটি ভাই থাকায় অনেকদিন পর্যন্ত ওরাই আমার সহচর অনুচর ছিল। এবং আমার একটু ছেলেদের মতন গেছো স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য আমার এক ঠানদিদির মোটেই ভালো লাগতো না।

কামাল ছেলেবেলার গল্প—সেসময়কার পাটনা?

সেই সময়কার পাটনায় বাঙালি পরিবার খুব বেশি ছিল না। আমাদের আশে পাশে, আমার বাবা যেখানে বাড়ি করেছিলেন আমার জন্মের পর...

কামাল ওটা পাটনার কোন অংশে?

পাটনার পূর্বে অংশে। আমাদের বাড়িটা নদীর থেকে খানিকটা দূরেই ছিল। অন্ততঃ আধমাইল—পৌনে একমাইল দূরে ছিল, তবে আমাদের বাড়ির সামনে বিরাট একটা 'ল' কলেজের চত্বর ছিল। তার ফলে আমাদের বাড়ির আশপাশটা খুব খোলামেলা ছিল। এই বাড়িতে আমরা যখন উঠে এলাম পাড়ায় আরেকটি বাঙালি পরিবার ছিল—এক বাঙালি অধ্যাপক ওই একই কলেজের। আমাদের পাশাপাশি দুটো বাড়ি ছিল। এছাড়া সব বিহারীর বাড়ি ছিল। এই ব্যাপারেও আমার বাবার একটা খোলামেলা স্বভাব ছিল। তিনি আশেপাশে যে বিহারী পরিবার তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং আমাদের খানিকটা হিন্দী শেখানোর চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছিলেন। সাধারণতঃ পাটনার বাঙালিরা সেটা করতো না। তাদের নিজেদের সম্বন্ধে এতেই উচ্চ ধারণা ছিল যে তারা হিন্দী শেখার কোনও প্রয়োজন বোধ করতো না। কিন্তু আমাদের সেটা ছিল না। গেছো স্বভাবের কথা বলছি। আমাদের বাড়িতে গাছটাছ ছিল...

কামাল কী কী ধরনের গাছ ছিল? বাগান মত ছিল?

না, খুব একটা বড় বাড়ি ছিল না তবে অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটা বড় গাছ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা নিমগাছ ছিল। নিমগাছটা সম্বন্ধে আমাদের সবারই খুব আগ্রহ। সেই নিমগাছের একটা নীচের দিকের—বড় ডাল—আমাদের খুবই প্রিয় ছিল! অনেকসময় সেটাকে ঘোড়া বানানোর জন্য ওটার ওপর চড়ে বসতাম। এখন, একদিন দু'তিনজন ওটাতে চড়ে বসায় চড়চড় চড়াৎ করে ভেঙে পড়েছে। হায় সর্বনাশ। ওটা বাবার এত প্রিয় গাছ—উঠোনোর মাঝখানে লাগিয়েছেন ছায়া দেবে বলে। নিমের ছায়া খুব স্বাস্থ্যকর। তখন মা বললেন 'ঠিক আছে, আজ আসুন উনি কলেজ থেকে দেখি কার কী হয়।' তখন আমরা সবাই মিলে ওটাকে চেপে ধরে, মার শাড়ির পাড় এনে, বেঁধে ছেদে ওটাকে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। দেখা গেল ওটা জোড়া লেগে গেল, —মানে গ্রাফটিং হয়ে গেল। অনেকদিন পরেও ওই দাগটা ছিল গাছের ডালে। আমরা ভাবতাম যে এটা আমাদের কীর্তি। তারপর, অতো পোক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গাছ নয়—মনে করো বকফুলের গাছ—সেরকম একটা গাছে আমার চড়বার শখ ছিল। একদিন ওখানে চড়ে ধপাস করে পড়েছি। গাছ থেকে পড়াটা যে কী ব্যাপার হঠাৎ ওপর থেকে ঝপ্ করে নীচে মাটিতে—মাথাটা যেন ঘুরে গেল। এরকম করতাম। আমার একটি ঠানদি কিছুদিন আমাদের বাড়িতে এসে ছিলেন পাটনায়। তিনি আমাকে খুব নিজস্ব ভঙ্গিতে তিরস্কার করতেন 'মাইয়্যালা এই রঙ রঙ না, আরো রঙ আছে। শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবো।' তখন আমি শ্বশুর বাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ বিচলিত ছিলাম না। অবশ্য পরবর্তীকালে আমি ঠিক করেছিলাম কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যাবো না। তখন আমি ও আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া—একটি ভাইঝি—আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা বিয়ে করব না, পুরুষের দাসত্ব স্বীকার করব না। পড়াশুনো করব ও চাকরি বাকরি করে স্বাধীন জীবনযাপন করব। সেসব ভাবলে খুব মজা লাগে।

কামাল ছোটবেলার বন্ধুর কথা মনে আছে?

অনেক বন্ধুর কথাই মনে আছে। কারণ আমার ছোটবেলার বন্ধুরা কেউ কেউ এখনও আমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। আমরা পাটনায় ১৯৪৭-এ যারা একসঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পাশ করেছিলাম, তার পর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলাম—তাদের মধ্যে প্রায় দশবারোজন এখন কলকাতায় বসবাস করি। আমরা কলকাতায় বাস করতে এসেই অল্পদিনের মধ্যেই পরস্পরকে খুঁজে বের করতে পেরেছিলাম। তখন থেকে আমাদের পরিকল্পনা ছিল যে আমরা বছরে একটি দিন প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে যাব। সেটি আমাদের বিয়ের তারিখ। সবাই সবার বিয়ের তারিখটা নোট করে ফেললাম এবং প্রত্যেকেই নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখতাম না। আমরা সেই বিয়ের তারিখে, বিকেলবেলায় বন্ধু ও বন্ধুর স্বামীর জন্য কিছু উপহার ইত্যাদি নিয়ে পৌঁছতাম। এভাবে আমাদের স্বামীরা যতদিন ছিলেন ততদিন এই রেওয়াজটা চলেছিল। কিন্তু তারপর একটি দু'টি করে তারা চলে যেতে লাগলেন। তখন অন্যদের মনে হ'ল এটা আর তেমন ভালো লাগে না। ১৯৮২ সালে আমার বিয়ের তারিখে ১০ই জুন সকলে এসেছিল। তখন আইয়ুব তো Parkinson's disease-এ অনেকটাই জীর্ণ হয়ে গেছেন। তাও তাঁকে হুইল চেয়ারে করে খাবার টেবিলে এনে বসানো হ'ল। আমার বন্ধুরা তাঁকে বেশ সুন্দর জুঁইফুলের মালা পরালো, তাঁকে উপহার দিল, উনি সেটা উপভোগ করলেন—সবার গল্প, হাসি, গান সব কিছু শুনলেন। সেই আমাদের বাড়িতে ওই অনুষ্ঠানের শেষ। কিন্তু আমার বন্ধুদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এখনও রয়েছে, মাঝে মাঝে আমরা একত্র হই। এরা অবশ্য হচ্ছে আমার পাটনার বন্ধুরা। পরবর্তীকালে আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধুরাও আরেক দল আছে। আরও পরে কলকাতায় আসার পর আর এক দল বন্ধু কলকাতার।

কামাল পাটনার স্কুল জীবনের গল্প বলুন।

আমাদের স্কুলটা ছিল বেশ একজন নামকরা মহিলার স্মৃতিতে তৈরী করা। আসলে বোধহয় উনি নিজেই সেটা তৈরি করেছিলেন। পরে সেটাকে আরও অনেক যত্ন করে গড়ে তোলা হয়। এই ভদ্রমহিলার নাম ছিল অঘোরকামিনী দেবী—ইনি বিধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রায়ের মা। অঘোরকামিনী দেবী একসময় তাঁর সন্তানদের নিয়ে ওখানে বসবাস করতেন এবং তখন তিনি একটা সমাজসেবামূলক কাজ এবং খানিকটা নিজের অর্থোপার্জনের জন্য এইটা করেছিলেন। এই যে ভদ্রমহিলা, অঘোরকামিনী দেবী, এর স্বামীর নামটা আমি মনে করতে পারছি না। কিন্তু এই স্বামী এবং স্ত্রী এঁরা একটা আশ্চর্য সিদ্ধান্ত করেছিলেন জীবনের বোধহয় বছর ত্রিশেক পার হতে-হতেই। তাঁদের চার-পাঁচটি সন্তান হবার পর তাঁরা স্থির করেছিলেন যে তাঁরা আর স্বামীস্ত্রীর মত থাকবেন না, ভাই বোনের মত থাকবেন। এই ভদ্রলোক পাটনায় থাকতেন না। থাকলে পাছে তাঁদের সেই ব্রত ভঙ্গ হয়। দু'জনে দু'জায়গায় থাকতেন এবং সমাজসেবা (সন্তানপালনের দায়িত্বটা অবশ্য অঘোরকামিনী দেবীর ওপরই পড়েছিল) করতেন। তাঁদের মধ্যে—স্বামীস্ত্রীর মধ্যে—কিছু চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছিল। সেই চিঠিপত্রগুলো পরবর্তীকালে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি একবার একটুখানি দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু বইটা আমার কাছে নেই। কিন্তু সেটা একটা আশ্চর্য দলিল যে দুটি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এত গভীর প্রেম, তাঁরা পরস্পরকে এত বেশি চাইছেন অথচ একটা ব্রত নিয়েছেন জীবনে সেটা ভঙ্গ করবেন না। তারমধ্যে এই যে চিঠিপত্র লেখা সেগুলো এমন কাতর, এমন বেদনায়...

কামাল কেন ওঁরা এমন ব্রত নিয়েছিলেন?

যদি অনেক সন্তান হয়, তাহলে ওঁরা আর সামাজিক দায়িত্ব কিছু পালন করতে পারবেন না। উনি একজন আশ্চর্য মহিলা ছিলেন সেটা অবশ্য আমি তখন কিছু জানতাম না। আমরা ওঁর একটা ছবি, একটা oil painting, আমাদের স্কুলের হলে দেখতে পেতাম। অঘোরকামিনী দেবী, যে স্কুলটি তৈরি করেন, সেটিই পরে বাঁকিপুর গার্লস হাইস্কুল বলে পরিচিত হয়েছিল। এটি হিন্দী ও বাংলা মিডিয়াম স্কুল কিন্তু ইংরেজির ওপর অনেকটা জোর দেওয়া হত। আর এই স্কুলটা ছিল গঙ্গার তীরে, বেশ খানিকটা জমি নিয়ে। স্কুলটা আমার এমনিতে ভালো লাগত কিন্তু কয়েকজন teacher এতো কড়া ছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁদের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মানুবর্তিতা ছিল যে সেগুলোয় আমার প্রায় আতঙ্ক হত। অংকের teacher—তিনি কী আকারের খাতা class work এবং home work-এর জন্য নিয়ে যেতে হবে, তার ডানদিকে কতখানি margin থাকবে, বাঁদিকে কতখানি margin থাকবে,—ডানদিকে সমস্ত roughwork করতে হবে, এসব নিয়মপালন না করলেই অতন্ত্য কঠোরভাবে শাস্তি দিতেন। এই ভদ্রমহিলাকে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করতো। আজকাল যখন লোকেরা বলে যে 'আহা, ছেলেবেলার দিনগুলো কী সুন্দর ছিল, আরেকবার ফিরে গেলে হয়!' আমি বলি 'হ্যাঁ, আরেকবার ফিরে গেলে হয় কেবল বেলাদি, মুক্তিদির ক্লাসগুলোতে ফিরে যেতে না হ'লেই হয়।' খালি খেলাধূলো, মাঠে বসা গল্প করা ঘণ্টায় পর ঘণ্টা বন্ধুদের সঙ্গে, চীনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খাওয়া, তারপর নানা গান। সে গানগুলো তখন আমি জানতাম সিনেমার গান কিংবা এমন গান যেটা ঠিক আমার বাবা পছন্দ করবেন না তাই আমি সে গান বিশেষ শিখিনি। আমি যখন এখন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবসরবিনোদনের জন্য FM শুনি তখন আমি বুঝতে পারি যে এসব গানগুলো কোনোটা নজরুলের গান, 'আমার প্রিয়া হবে এসো রাণী' তোমার খোঁপায় দেব কী ফুল—'তারার ফুল'। জগন্ময় মিত্রের গাওয়া 'সাতটি বছর আগে', সাতটি বছর পরে, খুব Popular গান ছিল। সেসব গান আমার স্কুলের বন্ধুদের গলায় শুনতে খুব ভালো লাগতো কিন্তু বাড়িতে ওসবের চর্চা মোটেই ছিল না। এবং যদি কোনদিন ওসব শুনতে ইচ্ছে করতো 'অনুরোধের আসরে' তাহলে রাত্রে, radio-টাকে খুব আস্তে করে, ঐসব গান শুনতাম। যা হোক, বাড়িতে গানের একটা চর্চা ছিল বিশেষ করে গীতাঞ্জলির গান আর রজনীকান্তের গান, বাবা নিজে গাইতেন এবং আমাদের গাওয়াবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আমার কীরকম একটা ধারণা ছিল যে এই গানগুলোর সুর বোধহয় এত সহজ নয়, বাবার গলায় কঠিন সুর আসে না বলে বাবা বোধহয় এগুলোকে সহজ করে নিয়েছেন। পরে দেখলাম যে না, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার পরে'—এটার সুর সত্যিই বাবা যা গাইতেন সেটাই। কিংবা রজনীকান্ত সেনের 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইবো তোমার রসাল নন্দনে' সেটার সুর বাবা যা গাইতেন সেটাই ঠিক। তবে তখন আমার বাবার সঙ্গীত প্রতিভা সম্বন্ধে মনে মনে একটু সন্দেহ ছিল।

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিমলার স্মৃতি (১৯৭০)

১৯৭০ সালের মে-জুন মাসে আমরা দ্বিতীয়বার শিমলা গিয়েছিলাম। ইতিহাসের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী সামারহিলের সেই প্রাসাদটিতে এককালে ভাইসরয়দের গ্রীষ্মাবাস ছিল। পরে রাষ্ট্রপতিরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এই বাড়ির ভোগ দখল করতে শুরু করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের পর ডঃ রাধাকৃষ্ণণের নাকি এই শৈলাবাসের বিলাস ভালো লাগে নি। তাই তিনি রাষ্ট্রপতি হবার পরই এই রাষ্ট্রপতি নিবাসটি সর্বজনহিতায় উৎসর্গ করেছিলেন। সর্বজন বললে একটু বাড়িয়ে বলা হয়, বরং বলা উচিৎ বিদ্বৎজন হিতায়। ওখানে স্থাপন করা হয় Institute of Advanced Studies। ভারত স্বাধীন হবার পর বস্তু বিজ্ঞান চর্চার জন্য যত গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যত অর্থব্যয় করা হয়েছে তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যে মানব বিজ্ঞানের জন্য করা হয় নি এ নিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ক্ষুব্ধ ছিলেন বলে শুনেছি। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই ওই ইনস্টিটিউটের স্থাপনা। হিউম্যানিটিজের নানা শাখায় যাঁরা কিছু পড়াশোনা করতে চান তাঁদের অর্থচিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে কয়েক বৎসর নিরিবিলিতে সেখানে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডিরেকটর ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই কাজের পক্ষে ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তিনি বছর দশেক পরিচালনা করে অবসর নেবার পর প্রতিষ্ঠানটি বেশিদিন টেকেনি। শেষটায় শুনেছি আগুন লেগে ওই সুন্দর প্রাসাদটি সেকাল ও একালের সব স্মৃতি নিয়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন কি সেখানে নতুন করে হিমাচল প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ভবন উঠেছে?

আইয়ুবও ওই ইনস্টিটিউটের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন তিন বছরের জন্য। ফেলোদের সেখানেই থাকার নিয়ম ছিল। কিন্তু অত ঠাণ্ডায় অসুস্থ শরীর নিয়ে আইয়ুব সেখানে থাকতে পারবেন না বলে তাঁকে কলকাতায় থেকেই পড়াশোনা করার বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন ডঃ রায়। তবু বছরে কয়েক মাস শিমলায় থেকে সেখানকার সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলে ভালো হয় এ কথা জানিয়েছিলেন। তাই আমার কলেজ ছুটি হলে দু মাসের জন্য আমরা দুবার শিমলা গিয়েছিলাম। আমাদের তিনজনের পক্ষেই তা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট আমাদের জন্য সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মূল প্রাসাদের অনতিদূরে যেন আইয়ুবকে বিশেষ চড়াই উৎরাই ভাঙতে না হয়। পরিবার ভারমুক্ত পণ্ডিত পণ্ডিতানীরা অনেকে মূল প্রাসাদের সংলগ্ন আবাসে থাকতেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটি করে প্রশস্ত study ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের দ্বিতীয়বার শিমলাবাসের সময় ডঃ জুবেরী নামে ইতিহাসের এক গবেষকের পাঠকক্ষে একদিন পড়ন্ত বেলায় বসে কথা বলছিলাম। সদ্য পরিচিত এক বিরাটকায় জর্মান পণ্ডিতও সেখানে বসে ছিলেন। কথায় কথায় এক সময়ে দেওয়াল জোড়া জানালার বাইরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলাম এত সুন্দর জায়গায় বসে পড়াশোনা করেন কি করে? মন বিক্ষিপ্ত হয় না? কাঁচের ভিতর দিয়ে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু যে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যেত সেটিই ধওলাগিরি কিনা আমার মনে নেই। তবে তারই কাছাকাছি যে শতদ্রু নদীর উৎস দেখা যেত মেঘমুক্ত দিনে সেকথা মনে পড়ে। ডঃ জুবেরী মৃদু হেসে বলেছিলেন, "চিত্ত বিক্ষেপ তত হয় না যত হীনমন্যতার বোধ হয়। ওই বিরাট পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ ভুগি। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়।" আমি বলেছিলাম, "আমার অবশ্য সেজন্য শিমলায় আসার দরকার পরে না, কলকাতার দুটি ঘরের মধ্যেই আমি এখন একজনের সঙ্গে বাস করি যে নিজেকে ক্ষুদ্র না মনে করে উপায় নেই।" শুনে জর্মান ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার স্বামী বুঝি খুব দীর্ঘদেহী মানুষ?' উত্তরে ডঃ জুবেরী ও আমি হেসে ফেললাম।

খানিক পরে নিজেদের ঘরে এসে যখন আইয়ুবকে এই ঘটনার কথা বললাম তখন উনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন বটে, তবু বললেন আসলে ওটা মোটেই আমার মনের কথা নয়। আমার স্বভাবে হীনমন্যতা বলে কোনও বস্তুই নাকি নেই। একথাটাও ভুল নয়। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স যাকে বলে তা আমার নেই ঠিকই। কিন্তু আমরা কে কোন মাপের মানুষ তার হিসেব করতে আমার কোনও কালেই ভুল হয় নি। অবশ্য এত বড়ো দাবীটা এত অক্লেশে করা যায় না বোধহয়। আমি আমার মাপেই তাঁকে বুঝেছি। আমার বাবা বলতেন ঘটিকে সমুদ্রেই ডোবাও আর কুয়োতেই ডোবাও সে তার নিজের মাপেই জল তুলবে। কথাটা মিথ্যা নয়। ঐটুকু জলে অনেকেরই তৃষ্ণা মিটবে না জানি। তবু আমার উপায় কি? এটুকুই যে আমার ধারণ ক্ষমতা!

শিমলায় ফিরে যাই। আবু সয়ীদ বলতেন তাঁর আরলিয়েস্ট মেমারী বা শৈশবের প্রথম যে স্মৃতি আবছা মনে আসে তা কালকা স্টেশনের। সিমলা থেকে বোধহয় কলকাতা ফিরছেন সপরিবারে আবুল মকারেম আব্বাদ সাহেব। কালকায় এসে সবাই ট্রেনে চেপে বসেছেন। আম্মা পানওয়ালার কাছ থেকে পান কিনেছেন। তারই এক এক খিলি আদায় করে গালে পুরে দুই ভাই আবু আসাদ ও আবু সয়ীদ পরমানন্দে চিবোচ্ছেন এবং প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পিচিক পিচিক করে যত্রতত্র পিক ফেলে দেখছেন, কেমন লাল দেখায়। আর আবু সয়ীদের মনে হচ্ছিল ঠিক বড়দের মতন করে এক ছট্‌কায় পিকটা ফেলতে পারছেন তো!

অথচ তখন তাঁর বয়স বোধহয় পাঁচ পূর্ণ হয়নি। কারণ আবু সয়ীদ জন্মেছেন ১৯০৬ সালে আর তাঁর পিতা অকালে অবসর নিয়েছিলেন উনিশশো নয় কিংবা দশে। আর সেই তাঁদের শেষ শিমলা যাওয়া। তখন ভাইসরয়ের স্থায়ী নিবাস ছিল রাজধানী কলকাতায়। গ্রীষ্মকালে আপিস আদালত নিয়ে সদলবলে বড়লাট যেতেন সিমলায়। আবুল মকারেম আব্বাদ সাহেবও একজন Confidential clerk ছিলেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাইসরয়ের। ধীর স্থির স্বল্পভাষী, পরিশ্রমী, মানুষটি এই কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত ছিলেন নিঃসন্দেহে। সুন্দর ছিল তাঁর হস্তাক্ষর। সেটা বিজলী ...তি কিংবা টাইপরাইটারের যুগ নয়। অনেক দিন ঘন্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে ভাইসরয়ের চিঠিপত্রের একাধিক পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপি তৈরি করে দিতে হতো। এই করে করে শেষে অসময়ে দৃষ্টি ক্ষীণ হল, রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ল। সরকারি কর্মে অকালে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় ১৫ নম্বর ওয়ালিউল্লাহ লেনের বাড়িতে এসে বসলেন। লর্ড কার্জনের কাছেও তিনি কাজ করেছিলেন শুনেছি এবং স্বভাবগুণে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন শুনেছি। তবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিষয়ে তাঁর কোনও মতামত ছিল কিনা এবং কারুর কাছে তা ব্যক্ত করেছিলেন কিনা জানি না।

ষাট বছর পরে যখন আবার শিমলায় সেই সামার হিলেই গেলেন তখন প্রায়ই আইয়ুব বলতেন, "ঠিক কোথায় যে আমরা ছিলাম কিছুই তো মনে নেই—কিন্তু নিশ্চয়ই ওই বড় বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। কারণ আব্বার নাকি মাঝে মাঝে অনেক রাত করেও ডাক পড়ত ডিকটেশান নেবার জন্য।" ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে ভাসত গোলগাল আপেলের মতন ছবিতে দেখা মানুষটি শেরওয়ানী আর ফেজ টুপী পরে, গলায় মোটা কম্ফর্টার জড়িয়ে খুট্‌খুট্‌ করে চলেছেন ওই বাড়ির দিকে যেখানে এখন সারা ভারতের পণ্ডিতরা মিলে সেমিনার করছেন।

আমরা মাঝে মাঝে বলাবলি করতাম, কে জানে হয়ত এই flat টাতেই থাকতেন তাঁরা। অবশ্য তার সম্ভাবনা কম ছিল। কারণ আমরা দোতলায় যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলাম তার তলাতেই ছিল বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা পোস্ট অফিস। ভাইসরয়ের নিজস্ব ডাকঘর। একটি বিবর্ণ ডাকবাক্স কপালে LETTERS তিলক কেটে দেয়ালের গায়ে তখনও হাঁ করে আছে, কিন্তু পেটে চিঠিপত্র তার পড়ছে না। খুব সম্ভবত এই পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারই থাকতেন ঠিক ওপরের ফ্ল্যাটটায়। তাতে নিশ্চয়ই উঁচু উঁচু টগবগে ওয়েলর ঘোড়া আর শৌখিন সব গাড়ি থামত। ঘোড়ার কিছু সাজসজ্জা গাড়ির কিছু ভগ্নাবশেষ তখনও আস্তাবলে ইতস্তত পড়ে ছিল। আস্তাবলের মাথায়, আমাদের ফ্ল্যাটের পাশেই ছিল সুইমিং পুল—সিমেন্ট বাঁধানো, অগভীর। তখন ভাঙা আসবাবের ভাগাড়—এককালে যেখানে ছিল সাহেব আর বিবিদের জলকেলির আয়োজন। চতুর্দিকে ফুলের বাহার—সুইমিং পুলের বাইরের দেয়াল সবুজ করে ছেয়ে ছিল ঝুমকোলতার চিকন পাতায়। তারই ফাঁকে ফাঁকে সেই বেগুনী ফুল যার আরেক নাম সীতার কর্ণচক্র। এই ফুলের কানপাশা পরেছিলেন সীতা দণ্ডকারণ্যে। আর দেয়াল ঘেঁষে ওই যে হাইড্রেঞ্জার ঝাড় এরাও কি দেখেনি মাত্র ষাট সত্তর বছর আগেকার প্রবাসী প্রবাসিনীদের লীলাখেলা? সাম্রাজ্যবাদীদের সেই রবরবা কিছুই মনে করতে পারতেন না আইয়ুব। শিমলার শৈশবস্মৃতি কেবল সেই কালকায় পান খাওয়া।

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিনলিপি ঃ ১৯৭৫-১৯৭৭

১৭.১২.৭৫

আজ সকাল বেলা অমিয় চক্রবর্তী মশাই আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘণ্টা খানেক কথা বলে গেলেন। নরেশ গুহ নিয়ে এসেছিলেন। নরেশের সঙ্গে তিক্ত পত্র বিনিময়ের পর এই প্রথম দেখা। আমাদের বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে "জয়প্রকাশ" একটি। নরেশ তাচ্ছিল্য ভরে প্রশ্ন করেছিলেন "জয়প্রকাশ লোকটা কে? কি করেছে সে দেশের জন্য?" আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম, যে জয়প্রকাশ আমাদের জাগ্রত বিবেক। অমিয় চক্রবর্তী আজ যে সব কথা বললেন তার মধ্যে কিছুটা আমার কথার সমর্থন ছিল এ বিষয়ে। তাই হয়ত ওঁর কথাগুলি লিখে রাখছি। ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার আশায়। তবে অমিয়বাবু ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে যা কিছু বললেন তা নরেশের মনোমত—এবং আমার পক্ষে অসহনীয়, চুপ করে শুনতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করলেও লাভ নেই কারণ উনি শুনতে পাবেন না। ওঁর কানে শুনতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে বললেন। ওদিকে পথে সিঙ্গাপুরে না কোথায় যেন hearing aid টি হারিয়ে এসেছেন। এখানে মনোমত আর একটা কিনতে পেলেন না। অতএব বাঁ কানের পিছনে হাতের আড়াল দিয়েও অন্যের কথাগুলিকে ধরতে পারছিলেন না ঠিকমত তাই কথোপকথনের চেয়ে শুধু কথনটাই তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছিল।

আইয়ুবকে দু একটি প্রশ্ন করার পরই যখন বুঝতে পারলেন যে আইয়ুবের ক্ষীণকণ্ঠের উত্তর তাঁর কানে পৌঁছবে না তখন তিনি এক তরফাই বলে গেলেন—

জয়প্রকাশকে দেখতে গিয়েছিলাম। বড় কষ্ট হল। মুখখানি তেমনি শুভ্র, স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল। কিন্তু কি কষ্টই পাচ্ছেন, তাছাড়া এমন মানুষ এখন জেলবন্দী হয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে! কি দুঃখের ব্যাপার। ওঁর স্ত্রী তো দুবছর আগেই গত হয়েছেন। মা আর বোনকে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, ছায়ারূপিণী। আর এক ভাইকে দেখলাম, তিনিই সমস্ত ভীড় সামলাচ্ছেন হাত জোড় করে। কত অসংখ্য লোক রোজ যাচ্ছে তাঁকে দেখবার জন্য—ভাই হাত জোড় করে বলছেন ডাক্তারের অনুমতি নেই, তখন তাঁরা শুধু বাইরে থেকে দেখে প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষ তো! কোনো রকম জবরদস্তি করেন না কেউ। আমিও শুধু বাইরে থেকে দেখেই চলে যাব মনে করেছিলাম। কিন্তু তাঁর ভাই এসে বললেন, "আপনি ভিতরে আসুন।" নমস্কার করে বললাম, "বোধহয় চিনতে পারছেন না"—উনি মাথা নেড়ে বললেন, না, চিনতে পারছেন। কী সুন্দর চরিত্রবান মানুষ, সৎচরিত্র মানুষ—অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। আমার তাঁকে দেখে মনে হল যেন হ্যামলেট। উজ্জ্বল চরিত্র, কিন্তু কাঁচা! এর চেয়ে কিন্তু হোরেশিওর চরিত্র অনেক বেশি মহৎ করে এঁকেছেন শেক্সপীয়র। আর একে দেখুন—to be or not to be, দ্বিধাগ্রস্ত অথচ অন্যায় তার অসহ্য। ঐটুকু অন্যায়ের প্রতিকার করতে কী না করল, সব তোলপাড় করে ফেলল, নিজে যাকে ভালোবাসছে সে জলে ডুবে মরছে তবু তার খেয়াল নেই। সে যা হাতের কাছে পায় তাই নিয়ে ঐ অন্যায়ের প্রতিকার করতে ছোটে। জয় প্রকাশও তেমনি। অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। অথচ যাঁদের নিয়ে লড়াই করবেন তারা কেমন সে তো দেখবেন!—

"আপনার কি মনে হল জয়প্রকাশ বেঁচে উঠবেন?" আইয়ুব জিজ্ঞেস করলেন। অমিয়বাবু বললেন "নানা রকম শুনলাম। তবে আমার তো বিশেষ আশা হল না। এ যাত্রা বেঁচে উঠলেও বোধহয় চার পাঁচ মাসের বেশি থাকবেন না।" অমিয়বাবু আইয়ুবকে জিজ্ঞেস করলেন, "দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে কি কোনও অশান্তি বোধ করছেন?"

আইয়ুব বললেন, "অবস্থাটা ভালো লাগছে না। কিন্তু জয়প্রকাশও আর্মিকে বিদ্রোহ করবার আহ্বান জানিয়ে ভুল করেছেন।"

"হাঁ সে তো বটেই। আমি ইন্দিরাগান্ধীর কাছেও গিয়েছিলাম। এ একটা অদ্ভুত নাটক হচ্ছে ইতিহাসের। এ যেন একটা গ্রীক ট্যাজিডি। জানি না শেষ অঙ্কে কী হবে—এক দিকে একটা immovable object, অন্য দিকে একটা irresistible force—ইন্দিরা গান্ধীও হটবেন না, ইনিও প্রতিবাদ করবেনই। শেষ কালে কি হবে? ইনিই কি আগে মারা যাবেন, সব শেষ হয়ে যাবে না ইন্দিরা গান্ধীরই অপঘাত মৃত্যু হবে? কিছুতেই এ দেশের কিছু হবে না, বিরাট দেশ, অসংখ্য মানুষ, প্রতিষ্ঠিত পুরানো ঐতিহ্য—দেশ চলতেই থাকবে। কিন্তু এই নাটকের শেষ অঙ্কে কি আছে? জয়প্রকাশকে বললাম, আপনাদের দুজনের মধ্যে ভিতরের যোগ তো ঠিকই আছে, কিন্তু একী হল, আপনি কি বিপাকে পড়লেন! জয়প্রকাশ কোনও উত্তর দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল।

সেদিন বোলপুর থেকে ফিরছি। শেয়ালদায় কী অবস্থা। অসম্ভব ভীড়—মানুষের পথই আশ্রয়, ড্রেন পাইপে সংসার পেতেছে। পথেই জন্ম হচ্ছে, পথেই মারা যাচ্ছে। কারুর কোনও দায়িত্ব নেই এই মানুষগুলির জন্য। মিউনেসিপ্যালিটির কিছু করবার নেই—আমাদের কিছু করবার নেই। মনে যেন কোনও reaction হয় না। হবেই বা কি করে, হলে যে মরে যাব। বেঁচে থাকতে হয় বলে নির্বিকার হয়ে থাকি। কিন্তু জয়প্রকাশের মত লোকেরা এসব দেখলে ক্ষেপে ওঠে। ওদের মনে হয় এক বছরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেশটা পালটে দেব, চার বছরে এ অবস্থার উন্নতি করব। সে কি সম্ভব? তবু এরা ভাবেন সারা দেশকে না পারি, পাটনা শহরটাকেই পালটে দেব, কিংবা বিহার রাজ্যটাকেই পালটে দেব। কিন্তু সে কি হবার? এই স্বাস্থ্যে এই সংগঠন নিয়ে তিনি কি করতে পারেন? শেষকালে গিয়ে বিপদে পড়লেন।"

আইয়ুব বললেন, "ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কি কথা হল বলুন।" বললেন, "দেখে এলুম একা ঘরে এত কাগজ পত্রের মধ্যে বসে আছেন ভদ্রমহিলা, Prime Minister তিনিই Defence Minister—কত ভাবনা, কতদিক সামলাবেন। অথচ কী চমৎকার ব্যবহার। তাঁর চাকরীর মোহ নেই, ক্ষমতার লোভ নেই। অবিচলিত ভাবে কাজ করে চলেছেন। জনসমস্যার কথা বললুম, সে বিষয়ে সরকার কী করছেন জানতে চাইলুম। বললেন আমরা চেষ্টা তো করছি, কিন্তু যতটা কাজ হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না। আচ্ছা এ বিষয়ে যদি তুমি ভালো করে জানতে চাও তবে করণ সিং-এর কাছে যাও। সে তোমাকে সব বলবে। হয়ত সেও সব বলতে পারবে না—সেক্রেটারীরা অনেক খবর দিতে পারবে। অর্থাৎ মিসেস গান্ধী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর হাতে সব কিছু নেই, নানা পর্যায়ে ক্ষমতা ছড়িয়ে আছে। বললেনও সে কথা যে আমার বলাতেও কিছু হবে না, কারুর বলাতেই কিছু হবে না—এসব সমস্যার সমাধান ক্রমে ক্রমে কিছু একটা আপনি হবে।

কিন্তু কোথায় কী হবে? সেক্রেটারিয়েটের সর্বত্র Corruption—আগাগোড়া দুর্নীতি। জয় প্রকাশের আন্দোলন তো অকারণ নয়। সেই দেখুন ঘুরে ফিরেই জয়প্রকাশে ফিরে আসছি। এই মানুষটিই আজ এত বড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো দাঁড়িয়েছেন। তাই ওঁর কথা সব সময়ই ভাবছি।

১৯.১২.৭৫

আজ এ বি শাহ এসেছিলেন। এখন তিনিই Quest চালাচ্ছেন। বললেন জয়প্রকাশকে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরও মনে হচ্ছে খুব বেশি দিন নেই আর। তাঁর কাছে কিছু কথা শুনলাম আরও। যখন চণ্ডীগড়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী ছিলেন তখন নাকি জয়প্রকাশ অনশন ধর্মঘট করবেন ঠিক করেছিলেন। একথাটা আগেও শুনেছিলাম, এও শুনেছিলাম যে ওখানকার Jailorটি নাকি জয়প্রকাশের আস্থা এবং স্নেহ অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে জানিয়েছিলেন যে অনশন ধর্মঘট করে যদি জয়প্রকাশ কারাগারে মারাও যান তবু কোনও লাভ হবে না—দেশের লোক জানতেও পারবে না। সেজন্যে এই অনশনমৃত্যুর কি নৈতিক কোনো প্রভাব হবে?

এ বি শাহ কিন্তু বললেন যে জয়প্রকাশ কে যে ডাক্তারটি দেখছিলেন তিনি নাকি স্পষ্ট করেই তাঁকে বলেছিলেন যে আপনি যদি আজ অনশন শুরু করেন তবে কাল থেকেই আমরা বুলেটিন দিতে থাকব যে আপনার Kidney fail করছে। এবং শেষ পর্যন্ত সবাই জানবে যে আপনার ওই রোগেই মৃত্যু হয়েছে। একথা শুনেই নাকি জয়প্রকাশ অনশন ধর্মঘট থেকে বিরত হন। তবে শাহ এবং অন্যাদের মনে হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে সে সময় থেকেই বোধহয় জয় প্রকাশের কিডনীর কষ্ট শুরু হয়েছিল। Parole-এ ছাড়া পাবার ৬ সপ্তাহ আগে থেকেই নাকি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন, কাকে নাকি বলেছিলেন "হমসে আনাজ দেখা নাহী জাতা হৈ।" তাতে তার শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ডাক্তাররাই সরকারের উপর চাপ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেছেন।

মুক্তি পাবার পর দিল্লিতে এসেই কি উনি ১৫ মিনিটে একটা প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন?—জিজ্ঞেস করলাম কারণ লণ্ডন থেকে আসা স্বরাজ্য কাগজে এ জাতীয় একটা খবর দেখতে পেয়েছিলাম। শাহ বললেন, উনি ডাকেন নি। দিল্লি এয়ারপোর্টে উনি এসে পৌঁছতেই জনা চারেক বিদেশী রিপোর্টার ওঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু সময় চাইলেন, দেশী কেউ তো যেতেই সাহস করে নি। উনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, যে উনি ওঁর মত কিছুই পালটান নি, উনি এখনও Emergency-র বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাবেন। আন্দোলন যাতে অহিংস থাকে তার চেষ্টা করবেন।

শাহ আরও বললেন যে মিনু মাসানী নাকি পরিষ্কার করেই J.P. কে বলেছিলেন দেখা করতে গিয়ে যে শত্রুপক্ষ কানাকানি করে চলেছে যে জয়প্রকাশ মত বদলেছেন বলেই তাঁকে Parole-এ ছাড়া হয়েছে। এখন যদি J.P. এর প্রতিবাদ না করেন তা হলে হয়ত তিনি চলে যাবেন কিন্তু তাঁর অপবাদ থেকে যাবে। তাই জয়প্রকাশের উচিত তাঁর মতামত স্পষ্ট বলে যাওয়া। তখন মিনু মাসানীর সঙ্গে এ বিষয়ে যা কিছু তাঁর আলোচনা হল সে সব তিনি পরদিন type করে নিয়ে গিয়ে জয়প্রকাশকে দিয়ে বললেন যে কাল তো আমাদের এই সব কথাই আলোচনা হয়েছে, আপনি সমস্তটা পড়ে আপনার স্বাক্ষর করুন। জয়প্রকাশ সমস্তটা পড়বার পর নাকি স্বহস্তে একটি বাক্য যোগ করলেন—"I want my country men to resist tyranny with patience and nonviolence." লিখে তাঁর নাম সই করে দিলেন।

পরদিন নাকি মাসানী tape recorder নিয়ে গিয়ে জয়প্রকাশের সমস্ত বয়ানটি তাঁর মুখেই রেকর্ড করে নিয়েছেন। ভালোই করেছেন।

কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ কাজটি বোধহয় যশলোক হাসপাতালের ওই ঘরে এসে শেষ না হলেই ভালো হতো। চণ্ডীগড়ে নিঃসঙ্গ বন্দী অবস্থায় যদি অনশন ধর্মঘট করতেন তাহলে রাজার মতো চলে যেতেন। এখন he is dying a defeated man.

২৩/১/৭৭

জয়প্রকাশ আজও আছেন, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিরোধী দলগুলি মার্চের নির্বাচনে লড়বার জন্য একত্র করছেন এটা সুখের কথা।

My bounty is as boundless as the sea.
My love as deep the more I give to thee,
The more I have. for both are infinite.

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্ধুদের স্মরণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শ্রীমতী সুশীলা আশার

বিশ্বভারতী যখন মাত্র একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যবসিত হয় নি এবং আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল ছিল তখন তার শিক্ষাকে যাঁরা সার্থকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং সারা জীবন সেই শিক্ষার মর্যাদা বহন করে গিয়েছেন, সুশীলা আশার (মেহেতা) ছিলেন তাঁদেরই অন্যতমা। তাঁর ওই প্রিয় সারস্বত নিকেতনের সঙ্গে আজীবন তিনি সম্পর্ক রক্ষা করেছেন যা বহু প্রাক্তনীই করেন না। সুশীলার মৃত্যুতে তাই ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা অনুভব করেছেন অনেকেই।

সুশীলা উনিশ শো চল্লিশে বিশ্বভারতীতে পড়তে আসেন। তখন রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মে অনুভব করা যেত। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক সব বাধা ঠেলে একটি গুজরাটি কিশোরীর পক্ষে এতদূরে পড়তে আসা বড় সহজ ছিল না। তবু সম্ভব হয়েছিল প্রধানত তাঁর পিতা ভীমজী রামদাস আশারের উৎসাহে। এই গান্ধীবাদী পিতা সাংসারিক জীবনে কৃতী ব্যবসায়ী হয়েও সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় নিজেকে এবং পরিবারকেও আপ্লুত রেখেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথের সংস্থা বলেই বাংলাদেশ থেকে অত দূরে বসেও যে সময়ে তিনি বাংলাভাষার চর্চা করেছিলেন তখনও রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাননি।

কন্যাকে প্রথম থেকেই বোম্বাইয়ের একটি অসাধারণ বিদ্যায়তনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। Pupils'Own School নামে এই পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরিচালনাও করতেন জাহাঙ্গীর ভকিল। ইনি বিশ্বভারতীর এক প্রাক্তন অধ্যাপক ছিলেন। বালিকা বয়সে ইন্দিরা নেহেরুও যে কিছুকাল এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন তা অনেকেই জানেন। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে গড়া এই বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের মধ্যে তখন ছিলেন রবীন্দ্রস্নেহধন্য বিশ্বভারতীর দুই কৃতী ছাত্র, বাচুভাই শুকলা এবং পিনাকিন ত্রিবেদী। এঁদের সবার সান্নিধ্যে এসে এবং নানা উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতন নামে একটি আশ্চর্য নন্দনলোকের ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল সুশীলার মনে। ফলে তাঁর তখন স্বভাবতই মনে হয়েছিল যে শান্তিনিকেতনে যেতে না পারলে তাঁর শিক্ষা কোনও অর্থেই সম্পূর্ণ হবে না।

সুশীলার কল্পনাপ্রবণ শিল্পী স্বভাবকে Pupils' Own School যতটা উদ্দীপিত করেছিল তাতে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরাও বুঝতে পেরেছিলেন যে সেই সময়ে বোম্বাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শহরে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে নৃত্যগীতে সুশীলার সহজাত প্রতিভা যথেষ্ট স্ফুরণ ঘটতে পারত অথচ সেই পড়াশোনাও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু কিশোরী কন্যাকে অত দূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে পাঠাতে মায়ের প্রবল অনিচ্ছা ছিল। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের বিচিত্রমুখী শিক্ষাব্যবস্থার যেমন সুনাম হয়েছিল সেই পরিমাণে সহশিক্ষার এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও দুর্নাম রটনা করবার মতো লোকেরও তো অভাব ছিল না কোনও কালেই। ফলে রক্ষণশীল নয়, বরং শান্তিনিকেতনে পাঠাতে আগ্রহী অভিভাবকরাও যদি কখন কখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করার পর ষোড়শী সুশীলা নিজের জেদে অটল ছিল। অবশেষে পিতার আনুকূল্যে মায়ের সম্মতিও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সুশীলার আবাল্য বান্ধবী কোকিলাও যে একই সঙ্গে যাবার অনুমতি পায় নি সেজন্য দুজনেরই মনে চিরকাল দুঃখ রয়ে গিয়েছিল। প্রিয় বান্ধবীর স্মৃতিচারণ করতে বসে এখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও কোকিলা সেই বঞ্চনার কথা ভোলেনি। যাই হোক এতখানি আগ্রহ নিয়ে গিয়েও প্রথম প্রথম শান্তিনিকেতনের জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ কষ্টই হয়েছিল সুশীলার। ভাষা, আচার আচরণ, খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস সবই এত ভিন্ন ধরনের ছিল! তবু সেই সব বাধা কাটিয়ে কত অসংখ্য অবাঙালী ছেলে মেয়ে যে শান্তিনিকেতনকে এত ভালোবাসতে পেরেছিল তা ভাবলে অবাক লাগে। শিক্ষাভবনে আই এ এবং বি এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অদম্য উৎসাহে সুশীলা নৃত্যগীতের চর্চা করেছিলেন সঙ্গীত ভবনেও। পরে বিনয়ভবনে যোগ দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষার পাঠও গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে বিশ্বভারতীর পাঠ সাঙ্গ হয়।

কিন্তু এর বহু আগে থেকেই বোম্বাই শহরের নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনে ও রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত যোগ দিতেন সুশীলা। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছিল 'চণ্ডালিকা'। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে Pupils Own School বোম্বাইয়ের আশ্রমিক সংঘ এবং আরও একটি অসাধারণ বিদ্যায়তন The New Era School এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিল মিলিতভাবে। এই নৃত্যনাট্যখানিকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছিলেন বাচুভাই শুক্লা। সংগীত ও নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী। সুশীলা ছিলেন প্রকৃতির ভূমিকায়। পরবর্তীকালে অসংখ্যবার 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা', 'তাসের দেশ', 'নটির পূজা', 'ঋতুরঙ্গ' ইত্যাদি নৃত্যনাট্যে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি।

তবে তাঁর শিল্পী জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা ঘটেছিল নেহেরুর "Discovery of India" গ্রন্থটির নাট্যরূপে অংশগ্রহণ করত গিয়ে। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল নব প্রতিষ্ঠিত Indian Renaissance Institute, যার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রবিশংকর, অন্নপূর্ণা দেবী, দেবেন্দ্র শংকর, রাজেন্দ্র শংকর, শান্তি বর্মন ইত্যাদি বহু গুণী ব্যক্তি। এই নৃত্যনাট্যে সুশীলার অভিনয় এতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল যে The Illustrated Weekly of India পত্রিকার ১৯৪৮-এর ১৩ই জুন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সংখ্যার রঙিন প্রচ্ছদটি অধিকার করে ছিলেন সুশীলা। সেই বহু প্রশংসিত অনুষ্ঠানে জবাহের লাল উপস্থিত ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও এডুইনা মাউন্টব্যাটেন-সহ। ইন্দিরা গান্ধীও ছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে কিছু দূরে অবস্থান করছিলেন।

শিল্পী সুশীলার আত্মবিকাশের সমান্তরালে তাঁকে সাংসারিক জীবনের দায় দায়িত্বও বহন করতে হয়েছিল সাধারণের চেয়ে অনেকটা বেশিই। পিতার অকাল মৃত্যুর ফলে সংসারের সবটুকু ভার এসে পড়েছিল তাঁরই কাঁধে যেহেতু পরিবারে আর কোনও পুরুষ ছিল না। বাস্তবের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে নিক্ষিপ্ত হয়েও সুশীলা হার মানেন নি। কারণ তাঁর পিতা প্রথম থেকেই তাঁকে বেশ সবল করে গড়ে তুলেছিলেন। তবু মনে হয়, পারিবারিক ব্যবসায় আর অসুস্থা জননী ও চিররুগ্না ভগ্নীর সবটুকু দায় তাঁর উপরে না বর্তালে হয়ত কলালক্ষ্মীর উপাসনায় আরও একটু মন দিতে পারতেন।

তবে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও ক্রমে তাঁর মনের মতন একটি বিভাগ রচনা করে নিতে পেরেছিলেন সুশীলা যার ভিতর দিয়ে তাঁর শিল্পরুচির অন্য একটি প্রকাশ ঘটতে পেরেছিল। পঞ্চাশের দশকে 'সুন্দরম্' নামে তাঁর বিপণিটি রুচির আভিজাত্যে বোম্বাইয়ের চিত্ত জয় করেছিল অল্পকালের মধ্যেই। সারা ভারতের কোণায় কোণায় নিজে গিয়ে সন্ধান করে তন্তুজ শিল্পের যেসব অসাধারণ নিদর্শন সংগ্রহ করে আনতেন তার তুলনা অন্যত্র সহজে পাওয়া যেত না। তখনও সরকারী আনুকূল্য এই দিকে বর্ষিত হয়নি। আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যার সুদূর গ্রামেও যেমন গিয়েছেন তেমনি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত-অখ্যাত তাঁত শিল্প কেন্দ্রেও গুণী কারুশিল্পীর সন্ধান করেছেন।

সুশীলার নিজস্ব সংগ্রহে যে-সব চিত্তজয়ী মারাঠী পৈঠানী, গুজরাটি বাঁধনী, কাঞ্জিভরম, পোচমপল্লী, টেম্পলশিল্প, হায়দ্রাবাদী শাড়ি, পুরানো দিনের ঢাকাই জামদানী এবং আরও কত কী দেখেছি সেগুলি এবার কোন্ মিউজিয়ামের কারুকলা বিভাগকে অলংকৃত করবে তাই ভাবছি। গ্রামীণ এবং নাগরিক পরিশীলিত রুচির নানা ধরণের সর্বভারতীয় অলংকারের এক ঈর্ষণীয় ভাণ্ডার ছিল তাঁর। সুশীলা একটু বিলম্বে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর কোনও উত্তরাধিকারিণী নেই। অফুরন্ত প্রাণময়ী এই মহিলা উৎসবে অনুষ্ঠানে বন্ধু সম্মিলনে সর্বদাই তাঁর বসনেভূষণে যে সুরুচির পরিচয় দিতেন তাতে নয়ন মুগ্ধ হতো। তবে সুন্দরী সুশীলার সদাপ্রসন্ন ব্যক্তিত্বেই ছিল তাঁর যথার্থ সৌন্দর্য। তাঁর স্বামী বনশী ভাই মেহতা তাঁকে কিশোর বয়স থেকেই নানা ঝড় ঝাপটার ভিতর দিয়ে যেতে দেখেছেন। তিনি বলছিলেন, "সুশীলার মুখের হাসি কোনোদিন ম্লান হতে দেখিনি।"

নৃত্যেই যদিও তাঁর দক্ষতা বেশি ছিল তবু রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি আগ্রহও কম ছিল না। আবার শৈশব থেকেই মার্গ সংগীত অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পিতার উৎসাহে। গুজরাটি অনুবাদে রবীন্দ্র সংগীতের কয়েকটি রেকর্ড তাঁর কণ্ঠে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল সমকালে। জাতীয় সংহতি তখনও রাজনীতি ব্যবসায়ীদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুখের কারণ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু কিছু মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রতিটি বর্ণের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির পর্যায়ে তুলে দিতে পেরেছিল। কিন্তু তখনও মিডিয়ার প্রতাপ আমাদের জীবনে এমন সর্বগ্রাসী রূপ ধরেনি। "ডেকো না আমারে ডেকো না" (মনে সাহস দে দো কোই...) কিংবা "যে আমারে দিয়েছে ডাক..." (মনে জেনে বোলকী সাদ দই...) ইত্যাদি রবীন্দ্র সংগীতের গায়িকা সুশীলা আশারকে আজ বোধহয় খুব বেশি কেউ আর স্মরণে রাখেনি। রবীন্দ্র সংগীতের কোনো ব্যবসায়িক মূল্য যখন ছিল না, যখন তা ছিল নিতান্তই প্রাণের গান, আপন সংস্কৃতির আমরণ চিহ্ন, তখন যাঁরা সহজ আনন্দে এই গান গাইতেন তাঁদের তাই আর কে মনে রাখে? বাংলায় অথবা বাংলার বাইরে?

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-সনাথ সোমেন্দ্রনাথ বসু

'আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না আড়ম্বর করি, কাজ করি না যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না;...' রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষোভ যদি সর্বাংশে সত্য হত, এই উক্তির যদি সত্যিই কোনও ব্যতিক্রম না থাকত, তাহলে নিন্দুকের রটনাকে আমরা তাচ্ছিল্য করতাম কিসের জোরে? মেনে নিতেই হত যে কলকাতা মুমূর্ষু। কিন্তু অর্ধাহারী কলকাতার ধমনীতেও আমরা রক্তের স্পন্দন আজও স্পষ্ট অনুভব করি কারণ সদ্য প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসুর তুল্য মানুষেরা তাঁদের সাধ্যমতন কিছু কর্মের অনুষ্ঠান এখানে আরম্ভ করেছিলেন বেশ কিছুকাল আগেই এবং সম্ভবত এই কাজ অকালে, অসমাপ্ত পরিত্যক্ত হবে না ; তাঁর সহধর্মীরা এই কাজ করেই চলবেন। কলকাতার প্রাণ-ভোমরাটি শেয়ার মার্কেটে নেই, তার গুঞ্জন শোনা যাবে রবীন্দ্রচর্চা ভবন জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে। বহুজনের চিত্তকে উদ্দীপিত করার মতন, উৎসাহকে আকর্ষণ করার মতন সারবস্তু কিছু আছে এই প্রতিষ্ঠানের মূলে। সোমেন্দ্রনাথ বাঙালিকে একটি স্লোগান দিয়ে গেছেন 'রবীন্দ্রচর্চা বাঙালীর জীবনচর্চা'।

সোমেন্দ্রনাথ ছাত্র বয়সে সাম্যবাদী আন্দোলনের যে ধারায় সামিল হয়েছিলেন তার নেতা ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে সাম্যবাদী রাজনীতি যখন স্ট্যালিনিজমের মরুবালিতে পথ হারাল তখন এঁরা রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে এসে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিতে পারলেন এবং প্রধান দিশারী বলে গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথকেই। এঁদের এই সুনির্বাচন যে সম্ভব হয়েছিল সৌমেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে এ কথা স্বীকার করতেই হয়। আপাতত আমি সোমেন্দ্রনাথের কথাই বলব।

সোমেন্দ্র তাঁর গুরু সৌম্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা আর আনুকূল্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র অথবা Tagore Research Institute প্রতিষ্ঠায়, এ কথা সত্য। কিন্তু প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের তিনিই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। কিংবা মিছরির মধ্যবর্তী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেই সুতো যার চতুর্দিকে দানা বেঁধেছে অসংখ্য উৎসুক চিত্রের মাধুর্য। প্রথম থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে বাইরের উপকরণ যত কম ছিল, ততই প্রাচুর্য ছিল বুদ্ধি ও হৃদয়ের। আমি শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হয়ে যাই ১৯৫০-এ, তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসাদ-ধন্য হয় নি বিশ্বভারতী। তাই তখনও বিত্তের চেয়ে চিত্তের প্রতি শ্রদ্ধা একটু বেশিই দেখতে পেয়েছি। কিন্তু গুরুপল্লীর কুটীরগুলিকে আড়াল করে তখনই কয়েকটি প্রাসাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, হাওয়া বইতে শুরু করেছিল রবীন্দ্রনাথের উল্টো দিকে। আশ্রমের যে সরল জীবন আর উন্নত চিন্তার কথা শুনতাম সেই আদর্শে বেশ কিছুটা খাদের মিশেল ঘটছিল দ্রুত।

আরও পনের বছর পরে এই শহরেই রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দেখলাম। এমন একটা সময়ে এই কাজ শুরু হল যখন দেশ-বিদেশ থেকে অর্থানুকূল্য সহজেই পাওয়া যেত। সন্ধানী ব্যক্তির পক্ষে মূলধন সংগ্রহ কঠিন হত না। কিন্তু সোমেন্দ্র এবং তাঁর সহযোগীরা সেই মূলধনের পেছনে ছোটেন নি, না সরকারি না বেসরকারি। এঁদের সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল এঁদের চিত্তের সম্পদ—ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের সময় যে সম্পদের উপর রবীন্দ্রনাথেরও নির্ভর ছিল সবচেয়ে বেশি। এই গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও বেতনভুক কর্মী বা শিক্ষক নেই। সম্পূর্ণত স্বেচ্ছাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন আর একটিও প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে আর কোথাও আছে কি? থাকলেও আমি তার সন্ধান জানি না।

সোমেন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের কথাই কেবল বলছি কারণ কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে একেকটি ব্যক্তি মানুষেরই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটতে থাকে যেমন কিনা সেবাগ্রামে মহাত্মাজীর এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ মুকুরিত হয়েছিল---অন্তত কিছুকাল পর্যন্ত। অবশ্য এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও কীর্তি তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে ছাপিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তুলনায় সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র অনেক বেশি পরস্পরের ওতপ্রোত। তাই সোমেন্দ্রকে স্মরণ করতে বসলে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে স্মরণ না করে পারা যায় না। কোনও কোনও মানুষ নাকি "instiution" হয়ে ওঠেন, কথাটা সোমেন্দ্রের বেলায় প্রায় আক্ষরিক সত্য। সোমেন্দ্রের ক্রম-পরিণতির ফল রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র, তাঁর ব্যক্তিসত্তার যথার্থ সম্প্রসারণ ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানে।

সোমেন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়েও পরিচালনার দিনানুদৈনিক দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে সহকর্মীদের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলেন। ফলে শুধু তাঁর নিজের নয়, আরও বহুজনের আত্মস্ফুরণের সুযোগ ঘটেছে রবীন্দ্রচর্চা ভবনকে কেন্দ্র করে। সৌম্যেন্দ্রনাথের প্রসাদ ও প্রাসাদের ছায়া যেদিন এই প্রতিষ্ঠানের মাথার উপর থেকে সহসা অন্তর্হিত হয়েছিল সেদিন এর ছাত্র-শিক্ষক কেউই দমে যান নি, অপ্রতিহত উদ্যমে তাঁরা তিল তিল সঞ্চয় দিয়ে গড়ে তুললেন নতুন চর্চা ভবন। এই ভবনের প্রতিটি বই প্রতিটি আলমারি অর্জিত হয়েছে সদস্যদের নিরলস চেষ্টায়। আর নিয়মিত পঠন পাঠনই হোক কিংবা বিশেষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনও উৎসবই হোক, এই ভবনের প্রতিটি কর্মে যে শোভন রুচি, শৃঙ্খলা আর সময়নিষ্ঠা দেখেছি তা বাঙালি চরিত্রে সুলভ নয়। সভাপতির গাড়ি বিকল হলেও, শ্রোতারা কোনও দুর্যোগের কারণে যথাসময়ে যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত হতে না পারলেও রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের সাড়ে ছটার অনুষ্ঠান সাড়ে ছটাতেই শুরু হয়েছে। যাঁরাই সভাসমিতিতে নিয়মিত যোগ দেন কিংবা সভাসমিতির ব্যবস্থাপনা করেন তাঁদের অজানা নেই যে এই সামান্য নিয়মটুকু পালন করাও এদেশে কত কঠিন হয়ে ওঠে অধিকাংশ সময়েই। কিন্তু এই শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর মশাইর মেজাজ প্রায় ডিকটেটরের মতন অনমনীয় ছিল।

দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রচর্চার যেখানে যতটুকু আয়োজন হয়েছে গত দুই দশক ধরে, রবীন্দ্রচর্চা ভবন সাগ্রহে তাকে উৎসাহ দিয়েছে। সেই সংবাদ পরিবেশন করেছে ভবনের পত্রিকা মারফত। বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে যে সাহিত্যিককুলের মনে হয়েছিল তাঁদের অগ্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরা শত্রুভাবে হলেও রবীন্দ্রনাথকে ভজনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সাহিত্যিক প্রজন্মের আবির্ভাব, এঁদের এক বিরাট অংশের কাছে রবীন্দ্রনাথ নাকি অপ্রাসঙ্গিক, অনেকেই বুক ফুলিয়ে সে কথা বলেছেন। অন্তত মনে হয়েছে যে যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার একটি জরুরী লক্ষণ হল সর্বপ্রযত্নে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হওয়া-অথবা রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নির্বিকার উদাসীনতা। কেউ কেউ আবার সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের অবমূল্যায়নেও মনোনিবেশ করেছেন। এই প্রতিকূল সময়ে বুক ফুলিয়ে রবীন্দ্রচর্চা করবার জন্য এগিয়ে আসতে হলে বুকের পাটাটা একটু বড় লাগে বৈকি। এদিকে আবার রবীন্দ্রচর্চার যে ধারাটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে—নৃত্য-গীত-নৃত্যনাট্য-কাব্য আবৃত্তি—সেটিকে এখানে বাদ দেওয়া হয় নি বটে কিন্তু চর্চার একেবারে কেন্দ্রেও রাখা হয় নি। এম্‌ফ্যাসিসটা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ও রবীন্দ্র মূল্যবোধের উপরেই বেশি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়েও রবীন্দ্রচিন্তা অনুশীলনের এমন ফলাও আয়োজন হয় নি আজও। সপ্তাহে দুদিন ধরে যে ক্লাস হয়ে চলেছে ১৯৬৫ সাল থেকে তার সযত্ন-সঙ্কলিত পাঠক্রমটায় মনোনিবেশ করলেই দেখা যায় রবীন্দ্রচিন্তার কী বিরাট অংশ আজ আমাদের কাছে অত্যন্তই প্রাসঙ্গিক। এবং একটু সানুরাগ উদ্দীপনের সাহায্যে তরুণ তরুণীদের মধ্যেও এই পাঠক্রমের মাধ্যমে রবীন্দ্রচর্চার প্রতি সশ্রদ্ধ কৌতূহল ফিরিয়ে আনা যায়। ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন বিষয়েই যাঁরা সন্দিগ্ধ তাঁরা কি দেখেন নি সম্প্রতি নকশালবাড়ির রক্তিম মরীচিকার পিছনে 'কত তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে!'

শিল্প সাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান রাজনীতি সর্বক্ষেত্রেই নেতৃপর্যায়ে এখন এদেশে মাঝারি মাপের মানুষের ভিড়। বড় মাপের মানুষ বেশি নেই আশেপাশে, তাই বুদ্ধদেবের সেই 'আত্মদীপো ভব' উপদেশটির আজকেই বড় প্রয়োজন। তবে এই দীপের তৈল সংগ্রহ করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই প্রয়োজনে অধমর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতে আমাদের লজ্জা নেই। অবশ্য তার অর্থ রবীন্দ্রনাথের অক্ষম উপহাসনীয় অনুকরণ নয়। আমরা চাই বা না চাই আগামী বহু বর্ষের মত রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সার্থক জীবনচর্চার জন্য যে ধ্রুবপদটি বেঁধে দিয়েছেন তাকে অতিক্রম করা সহজ হবে না। তবু ওই দিকেই তাঁকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার প্রয়াস নিরন্তর করে যেতে হবে, তাঁকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই।

সঙ্কর্ষিত বুদ্ধি দিয়ে, পরিশীলিত রুচি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের কাছে রবীন্দ্রচর্চা ভবন পথিকৃৎ হয়ে থাকতে পারবে বহুকাল যদি এর সদস্যেরা আত্মদীপ হন। সোমেন্দ্র প্রায়ই অহঙ্কার করে বলতেন, 'রবীন্দ্রচর্চা ভবনকে এমন করে গড়ে দিয়েছি যে আর ভাবনা নেই, সোমেন বসু না থাকলেও ভবন ঠিকই চলতে থাকবে।' গত ১৮ জুলাই সোমেন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রচর্চা ভবনের এক কোণে বসেছিলাম তখন লক্ষ্য করেছি এমন অহঙ্কার দেখিয়ে পরিতৃপ্ত হবার মতন যোগ্যতা সোমেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা অর্জন করেছেন বটে।

দেশ জুড়ে সমস্যার অন্ত নেই। ইদানীং যখনই কোনও একটি সমস্যার কথা বলে সেদিকেও তাঁর মনোযোগ দাবি করেছি তিনি যথাসাধ্য সাড়া দিয়ে পরে বলেছেন, 'আমাদের সবারই তো শক্তি সীমিত, দিনও বেশি আর বাকি নেই। যে কোনও একটা কাজও ভালো করে শেষ করা সাধ্যে কুলোবে বলে মনে হয় না, তাই এখন থেকে আর চারদিকে মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে চাই না।' সোমেন্দ্র তাঁর প্রাণের কাজটি অনন্যমনা হয়ে করতে চেয়েছিলেন, সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা করেও চলে ছিলেন। সম্প্রতি উপরোধে পড়ে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের জন্য বাংলা সাহিত্যের একটি ইংরেজী এনসাইক্লোপিডিয়া সঙ্কলনের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়েছিল। অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য এই কাজটি যথাসময়ে শেষ করার পর এই সেদিন এসে বললেন, 'একটু ক্লান্ত লাগছে এবার। এরপর আর এত বড় দায়িত্ব হাতে নেবনা, কেবলই ইনস্টিটিউটের কাজ করব।' এইবারে তাঁকে লক্ষচ্যুত করে নিয়ে গেল মৃত্যু, এক পক্ষকালের মধ্যেই এবং বড় অসময়ে।

আজকাল ২৩।০৭।৮৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিভৃতচারিণী নীলিমা সেন

আমি শান্তিনিকেতনে বি. এ. পড়তে যাই ১৯৫০-এর জুলাই মাসে। ছাত্রীনিবাস শ্রীভবনে তখন সব ভবনের মেয়েরাই থাকত। শান্তিনিকেতন পল্লীর একেবারে কেন্দ্রে ছিল এই ছাত্রীনিবাস। আশ্রমের সব খবরই মেয়েদের মুখে মুখে ফিরত। তাদের কেউ কেউ তখন ১০/১২ বছর ধরে সেখানে পড়ছে—একেবারে পাঠভবন থেকে। আশ্রমের প্রায় সব পরিবারের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের মুখে তখন আশ্রমসমাজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনার বর্ণনা আমরা নবাগতরা খুব উপভোগ করতাম। ঘটনাটি ছিল নীলিমা সেন ও অমিয় সেনের আসন্ন বিবাহ। তাঁদের প্রেম ও পরিণয়কে নিয়ে প্রায় রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল ছাত্রী মহলে।

অল্পদিন পরেই রূপকথার রাজকন্যা-রাজপুত্তুরের চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সত্যিকারের পরিচয় হতে বহু বছর কেটে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে আবু সয়ীদ আইয়ুবের ভাগ্য আমার চেয়ে খুব যে বেশি প্রসন্ন ছিল তা নয়। উনি অধ্যাপনা এবং গবেষণার কাজে যোগ দেবার জন্যে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন আরও কয়েকমাস আগে, এপ্রিলের গোড়ায়। তারপর গরমের ছুটি পড়ে যাওয়াতে, তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। সত্যিকারের কাজে যোগ দিতে গিয়েছিলেন জুলাই মাসের গোড়ায়। সেই সময়ে বন্ধুবর অম্লান দত্ত একবার কয়েকদিনের জন্য শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়ে যখন আইয়ুবের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি একদিন আইয়ুবকে জানিয়েছিলেন যে সামনে বসে নীলিমা সেনের অনেকগুলি গান তিনি শুনে এসেছেন। এই শুনে আইয়ুব ঈর্ষায় কাতর হয়েছিলেন কারণ শান্তিনিকেতনে আগমনের বহু আগে থেকেই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের 'অকুণ্ঠ এবং আকণ্ঠ' প্রেমিক। তবে অম্লানের মধ্যস্থতায় কেন যে নীলিমা সেনের সঙ্গে পরিচয় করে নেননি, তা জানি না। এর পর একদিন তখনকার গেস্ট হাউসের সামনে শিল্প সদন দোকানে হঠাৎ তাঁর দেখা হয়ে যায় নীলিমা সেন ও অমিয় সেনের সঙ্গে। এই সময় প্রাথমিক পরিচয় ঘটে। তা ছাড়া কয়েকবার কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর অল্পস্বল্প সৌজন্য-বিনিময় হয়। তবে যথার্থ বন্ধুত্ব হবার আগে আরও আঠারো বছর পার হয়ে গিয়েছিল—সে কথা আইয়ুব তাঁর একটি পত্রে নীলিমা সেনকে জানিয়েছিলেন। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে এত দেরি হবার কারণ ছিল এই যে আইয়বের শান্তিনিকেতন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাস অল্পদিনেই শেষ হয়ে যায়। আইয়ুব ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন অসুস্থ দেহে। তারপরে আর কাজে যোগ দিতে পারেন নি।

নীলিমা সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন হয়নি বটে, তবে অমিয় সেনের সঙ্গে হয়েছিল, আমার প্রিয় অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মশায়ের বাড়িতে। তা ছাড়া ১৯৫২-৫৩ সালে যখন শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা হয়, অন্নদাশংকর রায় মশায়ের নেতৃত্বে এবং নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে, তখন আমিও মেলার জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং অমিয় সেনও এই মেলার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে, তাঁকে ওই সময় আরও ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

এর অল্প পরে, নীলিমা সেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা যান কিছুকালের জন্য। সেই সময়ে আমার বাবাও ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে মিনেসোটা য়ুনিভারসিটিতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেখান থেকে বাবা একটা চিঠিতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন নীলিমা সেনের, বলেছিলেন আমেরিকান সমাজেও তাঁর নম্র-মধুর ব্যক্তিত্ব খুব সমাদর পেয়েছিল। সেইসঙ্গে বাবা মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর গান শুনেও। বাবা পরে সবসময় বলতেন যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা নীলিমাকে যত সুন্দর করে গড়ে তুলেছে, তার তুলনা নেই। আমাদের মতো সব মেয়েদেরই উচিত তাঁকে অনুসরণ করা।

শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসার আগে এর চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত যোগাযোগ আমাদের আর হয়নি। এর পর দেখা হয় ষাটের দশকের মাঝামাঝি। কলকাতায় সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে অজিত দত্ত মশায়ের বাড়িতে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করছিল আশ্রমিক সংঘ। সেই সভায় গিয়ে নীলিমা সেন ও অমিয় সেনের সঙ্গে নতুন করে আমাদের পরিচয় হয়। আমরা তখন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের বাড়িতে আসার জন্য। তাঁরা সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন এবং আইয়ুবের বহুদিনের তৃষ্ণা মিটেছিল। নীলিমা সেন, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে' সেদিন গান শুনিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর থেকে এই যোগাযোগ আর ছিন্ন হয়নি। এবং এই যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার আইয়ুব করতে পেরেছিলেন, যখন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আইয়ুবের 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' প্রবন্ধটি পঠিত হয়। প্রবন্ধটি আমিই পড়ে শুনিয়েছিলাম কারণ একটানা অতক্ষণ কিছু পড়ে শোনানো আইয়ুবের পক্ষে কষ্টকর ছিল। তিনি মাঝেমাঝে কিছু গান ও কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। আর নীলিমা সেন আইয়ুবের অনুরোধে অনেকগুলি গান গেয়েছিলেন, প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে। সেদিনের সেই সভায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বলেছিলেন, এই গানগুলি নীলিমার মতো কেউ গাইতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানের চরিত্র বিশ্লেষণ আইয়ুব তাঁর প্রবন্ধে বিশদভাবেই করেছেন, তাই আমার সেই চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি বরং দুঃখের গান বিষয়ে নীলিমা সেনের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সহমর্মিতার উৎস কোথায় তারই একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুসন্ধান করে দেখি।

নীলিমা সেন যে দুঃখের গান এত ভালো গাইতেন, তার মূল কারণ সম্ভবত এই যে রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক বিশ্ববোধের মধ্যে নীলিমা সেন যতটা প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, শান্তিনিকেতনের খুব কম কৃতী ছাত্রছাত্রীই ততটা পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার জগতে নীলিমা সেন নিশ্চয়ই হঠাৎ করে প্রবেশ লাভ করেননি। এই বোধ ধীরে ধীরে তাঁর চৈতন্যে, চেতনায়, কণ্ঠস্বরে সঞ্চারিত হয়েছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল একদিকে তাঁর ক্রমপরিণত ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনে আর অন্য দিকে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট পরিবেশ বা বাতাবরণের প্রভাবে।

নীলিমা সেন বালিকা বয়সেই মা-বাবার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে আসেন। গুরুপল্লীর প্রান্তে তাঁদের সেই বাসগৃহ পরে আমি দেখেছি। তবে প্রথম দিকে হয়তো গুরুপল্লীর অন্য সব মাটির কুটিরের সঙ্গে মানানসই করেই তাঁদের ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল। এবং গুরুপল্লীই ছিল তাঁর আবাল্যের মানবিক পরিবেশ। গুরুপল্লীর জীবনযাত্রা তখন কত সহজ-সরল ও সুন্দর ছিল তার বর্ণনা আমরা অনেকের লেখাতেই পেয়েছি, বিশেষ করে অমিতা সেনের 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' বইখানির কথা মনে পড়ছে। এই জীবনযাত্রার মধ্যেই নীলিমা সেনও মানুষ হয়েছিলেন। তখন শান্তিনিকেতন পল্লীর চতুর্দিকেই খোলা প্রান্তর। অবশ্য দক্ষিণে বোলপুরের দিকে জনবসতি তুলনায় অনেকটা ঘন ছিল। পুব দিকে পূর্বপল্লীর মাঠ ছাড়িয়ে রেল লাইন পার হয়ে তালতোড় পারুলডাঙা পর্যন্ত দৃষ্টি ছিল অবারিত। উত্তরে ছিল যতদূর চোখ যায় লাল কাঁকড়ের খোয়াই। আর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খানিকটা লাল বাঁধ। পশ্চিমেও শ্রীনিকেতন পর্যন্ত বসতি ছিল বিরল। ওই উদার আকাশ, আর উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে যারা মানুষ হচ্ছিল গানে, কবিতায়, ঋতু উৎসবে, এবং নানা নাটক-নাটিকায় সদা সিঞ্চিত হয়ে, তাদের বাইরের জীবনযাত্রা যতই সহজ-সরল এবং প্রায় দীন হোক-না-কেন, অন্তরের সম্পদ তাদের যতখানি সমৃদ্ধ করে রেখেছিল, তার তুলনা আর কোথায় পাওয়া যায় জানি না।

শান্তিনিকেতনের জীবনে প্রথম পদক্ষেপ নীলিমা সেনের কেমনতর হয়েছিল সে কথা কল্পনা করতে গিয়ে আমি নিজের অভিজ্ঞতাই স্মরণ করছি। আমি অবশ্য আরও বছর পনেরো পরে গিয়েছিলাম এবং তাঁর তুলনায় অনেক প্রাপ্ত-বয়সে। শান্তিনিকেতনের প্রথম অনুভব আমার সমস্ত দেহ-মনে যে মুক্তির, যে আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল, তা মনে করলে আজও বড়ো ভালো লাগে। সবার দেখাদেখি জুতো সরিয়ে রেখে যখন শুধু পায়ে সেই লাল ভেজা মাটির ওপর চলাফেরা শুরু করলাম তখন কী আনন্দ হয়েছিল, বলার নয়। তখনও রবীন্দ্রনাথের 'My school' প্রবন্ধটি আমি পড়ি নি। কয়েকবছর পর যখন পড়লাম তখন দৃষ্টিটা আরও খুলে গেল। তিনি লিখেছেন—আমি যে আমার আশ্রমে নগ্ন পায়ে সরল পোশাক-পরিচ্ছদে থাকার উৎসাহ দিই, সেটা এ কারণে নয় যে আমি দারিদ্র্য বা কৃচ্ছ্রতার ব্রত গ্রহণ করেছি। এর কারণ শুধু এই যে জুতো-জামা-পোশাক-আশাকের বাধা না থাকলে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরিত্রীকে, পরিবেশ-প্রকৃতিকে অনেক নিবিড় করে অনুভব করা যায়—তিনি এ কথাও বলেছেন—আমি কখনও মনে করি না যে প্রকৃতিকে জানার উদ্দেশ্য হল তার ওপর প্রভুত্ব লাভ বরং প্রকৃতির সঙ্গে সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রেমের যোগ স্থাপনই আমার আসল উদ্দেশ্য।

নীলিমা সেন যেহেতু আরও অল্প বয়সে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনের এই রোমাঞ্চকর অনুভব নিজের অজ্ঞাতেই আরও গভীর ভাবে গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে তেমন সুযোগ তো আরও বহু আশ্রম-বালকবালিকারাই পেয়েছিল। তাদের সবার চরিত্র কি ওই রকম পরিণতি লাভ করেছিল, যা ঘটেছিল নীলিমা সেনের বেলায়? আমি অবশ্য আরও কয়েকজনকে দেখেছি যারা শান্তিনিকেতনের সার্থক সৃষ্টি এবং নীলিমা সেনের সমসাময়িক, যেমন ক্ষমা গুপ্ত, এখন ক্ষমা ঘোষ। ইনিও ভালো গান করেন, আরও উল্লেখযোগ্য এঁর শিল্পকর্মে সিদ্ধি। কিন্তু নিজেকে তিনি এমন গোপন করে রাখেন যে সচরাচর চোখেই পড়ে না।

নীলিমা সেনের অন্তরপ্রকৃতির মধ্যেই নিশ্চয়ই সেই উপাদান ছিল, যার সাহায্যে শান্তিনিকেতনের সামাজিক, প্রাকৃতিক ও নান্দনিক পরিবেশ ধীরে ধীরে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলেছিল। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন তিনি গায়িকা হিসেবে সুপরিচিত হয়ে গেছেন। আমি তখন তাঁর সদ্য প্রকাশিত রেকর্ডের যে গানটিকে খুব ভালোবাসতাম সেটি হল 'সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে।' তাই করুণ সুরের সঙ্গে নীলিমা সেনের সম্পর্ক কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আমার মনে। আবার মাঝে মাঝে তাঁর সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবের মুখে একটা চপল উক্তিও শুনতে পেতাম যে "বাচ্চু সুযোগ পেলেই কেমন কাঁদোকাঁদো গলায় 'মম দুঃখের সাধন' কিংবা 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গাইতে বসে যায়।" তাই দুঃখের গানের সঙ্গে নীলিমা সেনের একটা অনুষঙ্গ অনেকদিন আগে থেকেই আমার মনে ধরা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটাই তাঁর সংগীতসত্তার একমাত্র দিক নয় বলেই আমি বিশ্বাস করি। বরং তাঁর চারিত্রে বিশ্ববোধের যে বিশিষ্ট উপাদানটি তখনই পরিণত প্রকাশ লাভ করেছিল, তা একটি আর্তি।

রেকর্ডে ধৃত নীলিমা সেনের গাওয়া দুটি গানের কথা মনে পড়ছে—'এসো শরতের অমল মহিমা' ও তার উল্টো পিঠে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে'। প্রথম গানটি ক্ষুদ্র তাই সবটুকুই উদ্ধৃতি দিলাম

এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহতরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে॥

এটি স্পষ্টতই পূজা বা প্রেমের গান নয় কারণ অখণ্ড গীতবিতানে এটি প্রকৃতি পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এই মুখ্যত প্রকৃতির গানেও প্রেম ও পূজার আবেশ রয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই এই বহুবর্ণ গানটির গভীরে নীলিমা সেন যেমন করে প্রবেশ করেছিলেন তেমনটা সহজে আর কেউ পারবে না। গানটি বছর চল্লিশ আগে নীলিমা সেন রেকর্ড করেছিলেন। আমরা পূজায় প্রকাশিত নতুন গান সংগ্রহ করতে গিয়ে এটিকে পেয়েছিলাম। গানটি আর কখনও কারুর কণ্ঠে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। সেবার শরৎ, হেমন্ত, এমন-কি শীতেও এই রেকর্ডটি কত অসংখ্যবার যে বাজিয়ে শুনেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব! নীলিমা সেন আরও বহু ধরনের গান কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়েছেন সে কথা তাঁর গুণগ্রাহীরা সবাই জানেন। কিন্তু এই গানে তাঁর ঈষৎ ধরা গলায় টপ্পার কাজগুলি কী যে সুন্দর করে গেয়েছিলেন আর তাতে আমরা যে কী পরিমাণে অভিভূত হয়েছিলাম তা ভুলবার নয়। 'হৃদয়ে ছিলে জেগে' গানটিও বিশেষ কেউ গান না। উপরোক্ত গানের তুলনায় এই গানের ভাব সহজ, সুরও সহজ। তবে দুটি গানে ভাবের একটা স্পষ্ট মিল আছে এবং এটিও বড়ো সুন্দর গাওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে-সব গানে একটি গভীর অনুভবের কথা তার উপযুক্ত মরমী সুরে ও তানে বিধৃত হয়েছে সেগুলিই বোধহয় নীলিমা সেনের মনঃপ্রকৃতির এবং কণ্ঠের জাদুতে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পেরেছে। তাঁকে দুঃখের গানের গায়িকা হিসেবে চিহ্নিত করে দিলে তাঁর প্রতি একটু অবিচার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কিংবা অন্য কারুর একটু চটুল চপল গানের তাঁর গলায় বোধহয় খুব একটা সার্থক রূপায়ণ হতো না। অন্তত আমার ধারণা তাঁর মেজাজ এবং তাঁর গায়নভঙ্গি সেরকম গানের অনুকূল ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতের সুবিস্তীর্ণ বহুবর্ণময় ক্ষেত্রেও নীলিমা যেন একটু নিভৃতচারিণী। সংগীত সমাবেশের জন্য কিংবা দল বেঁধে গান গাইবার পক্ষে তাঁর মেজাজ ঠিক অনুকূল ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর গান নিভৃত বিজন মন্দিরে গাইবার এবং শুনবার।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে অন্য কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যাক। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত যাঁরা জানেন, তাঁরা সবাই অবহিত আছেন যে, ওই স্থানটিকে দেবেন্দ্রনাথ বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন তাঁর ঈশরসন্ধানী বন্ধুদের নিয়ে বিরলে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করার আশায়। 'শান্তিনিকেতন' বাড়িটি তৈরি হলে পরে মাঝে মাঝে তিনি সেখানে গিয়ে থাকতেন, যেমনভাবে খৃস্টান ধার্মিক মানুষরা 'Retreat'-এ যান। আমার যতদূর জানা আছে কিছুকাল পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের মন্দিরটি গড়ে দেন তাঁদের উপাসনা করার জন্যে। তখন থেকেই এই মন্দিরটি শান্তিনিকেতন-জীবনের এবং বিশ্বভারতী শিক্ষাদর্শের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সাধারণভাবে একজন হিন্দুর মনে 'মন্দির' শব্দটি যে ধারণার সৃষ্টি করে, শান্তিনিকেতনের মন্দির সেরকম কিছু নয়। প্রথম কথা হল সেখানে কোনও বিগ্রহ নেই এবং পূজো-আর্চা-ভোগ-আরাধনা ইত্যাদি কোনও অনুষ্ঠানেরই ব্যবস্থা নেই। শ্বেতপাথরে বাঁধানো সেই বিস্তৃত কক্ষটির একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আছে, যা প্রার্থনা, উপনিষদের মন্ত্রপাঠ, সংগীত, ধূপ আর ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে উপাসনার সময়। শুধু কক্ষের মধ্যে নয়, চতুর্দিক ঘিরে যে কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে, সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বসে থাকলেও গভীরভাবে অনুভব করা যায় একটি বিচিত্র উপস্থিতি।

পাঠভবনের ছাত্রছাত্রী ছাড়া অন্যদের এই উপাসনায় যোগ দেবার কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু প্রতি বুধবারেই দেখতাম মন্দিরে প্রাঙ্গণ উপচে পড়ছে। তাতে বড়ো ছাত্রছাত্রীরা এবং আশ্রম সমাজের বহু সদস্যই উপস্থিত থাকতেন। আমি ততদিনে শুধু সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, ঈশ্বরে পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে এসেছি বছর তিনেক আগে। তাই প্রথম দিনে মন্দিরে যাওয়ার প্রস্তাবে খুব একটা উৎসাহ বোধ করিনি। কিন্তু বান্ধবীদের আগ্রহে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কৌতূহল মেটাতে চলে গিয়েছিলাম। তার পর থেকে বুধবারে যেই মন্দিরে যাবার ঘণ্টা বাজত, সিংহসদন থেকে, আমার মন উতলা হত ছুটে যাবার জন্য। শুধু গান নয়, আলপনা নয়, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষণও আমাকে খুব আকর্ষণ করত। সব-কিছু মিলিয়ে একটা Sense of sublime আমাকে অভিষিক্ত করত। এই ব্যাপারটা যে কী, আমি অনেক বার ভেবে দেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, বোঝাতেও পারব না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাকে খুব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে দেওয়া সহজ নয়, এ কথা সবাই জানেন। তাঁর পৈত্রিক উত্তরাধিকার, ব্রাহ্ম ধর্মের সূত্রে তিনি উপনিষদের দর্শনকে খুব গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন এ কথা সত্য। তাঁর শান্তিনিকেতন মন্দিরের ভাষণগুলি পড়লে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না, কিন্তু তাঁর ধর্মভাবনা শুধু আপ্তবাক্যেই আবদ্ধ থাকে নি। সারাজীবন ধরেই তার বিবর্তন ঘটেছে এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থটিতে তারই একটা রূপরেখা দেবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। তার পরেও সেই ভাবনা আরও পরিণত, আরও রহস্যময় উন্মোচনের পথ করে নিয়েছিল তাঁর একেবারে শেষ দিককার লেখায়।

তাঁর নিজের বেলায় যেমনটা ঘটেছিল, অর্থাৎ তাঁর ধর্মবোধ ও ভাবনা যেমন অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং অত্যন্ত সত্যরূপে উন্মোচিত হচ্ছিল, অপরের বেলাতেও সেইরকমটা হওয়া উচিত বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই শান্তিনিকেতনের হাওয়ায় ছিল সেই উদার আহ্বান, যার যথাযথ ব্যবহার করতে পারলে গতানুগতিক ধর্মবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িক আচার-অনুষ্ঠান এবং ধরাবাঁধা কিছু আপ্তবিশ্বাস আর থাকে না, ক্রমে তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও আত্মগত অনুভবে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আশ্রমিকদের অধিকাংশের বেলাতেই দেখা যেত এক ধরনের অগভীর অনুকরণের অপ্রাপ্তবয়স্ক প্রয়াস। বাইরের আদব-কায়দা, পরিশীলিত আচরণ আয়ত্ত করার এক হাস্যকর চেষ্টা, যথার্থ রাবীন্দ্রিক জীবনবোধের অন্তরে প্রবেশ করার অক্ষমতা। ফলে কিছুকাল পরে শান্তিনিকেতনের ধর্মভাবনা অনেকের কাছে অন্তঃসারশূন্য মনে হত, যে কারণে আমার সময়কার বেশ কয়েকজন অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিকল্প ধর্মচর্চার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করতাম। মাঝে মাঝে এ জাতীয় ধর্মালোচনা-উপাসনা ইত্যাদির ঘরোয়া সভায় সাদর আহ্বানও লাভ করেছি কিন্তু যোগ দেবার খুব একটা আগ্রহ বোধ করিনি। আমি কেবল অবাক হয়ে ভাবতাম রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আবাল্য পালিত হয়েও তেমন কোনও আধ্যাত্মিক তৃপ্তি কেন এঁরা লাভ করতে পারেননি, বিকল্পের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সন্ধান করতে হয়েছে কেন?

নীলিমা সেন সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় হল এই যে, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য আর কারুর দ্বারস্থ হন নি। তাঁর গুরুদেবই অধ্যাত্মবোধের নানা বিচিত্র অনুভবের সন্ধান তাঁকে দিতে পেরেছিলেন, এবং আমার নিজস্ব বিশ্বাস, এই অনুভবের বারো আনাই তিনি রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে যা ছিল unconscious absorbtion পরবর্তী জীবনে ক্রমে তা সচেতন উপলব্ধির মধ্যে এসে গিয়েছিল।

আমি যতদূর জানি, হিন্দু ঘরের বধূ ও কন্যা হওয়া সত্ত্বেও নীলিমা সেন কোনও আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মের চর্চা করেননি। তবে এ ব্যাপারে তাঁর কোনও কালাপাহাড়িও ছিল না। যে ধর্মভাবনা তিনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ থেকে অর্জন করেছিলেন, তা সবই যেন ছিল ফুলের মতো সহজ সুরে তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলা—তাঁর ব্যক্তিসত্তায় তা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। এই ধর্মবোধে ব্রাহ্ম ভাবনাচিন্তা এবং ধর্মবিশ্বাসের অনেকখানি প্রভাব ছিল, এ কথা স্বীকার করতেই হবে কিন্তু এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক হিন্দু, মুসলিম বা খৃস্টান ধর্মবিশ্বাসের কোনও সংঘাত ছিল না। শান্তিনিকেতনে নানা ধরনের পরিবেশ থেকে যে-সব ছাত্রছাত্রী ও কর্মীরা এসেছিলেন, তাঁদের পক্ষে বুধবারের উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোনও আন্তরিক বাধা ছিল বলে আমার মনে হয় না। তবে এই উপাসনা সব মানুষকে সমানভাবে তৃপ্তি দিত, এ কথাও বলা যাবে না এবং সেইজন্যেই বিকল্প ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন যে কেউ কেউ বোধ করতেন এ কথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্র জীবনদর্শন ও ধর্মভাবনাকে যথার্থই অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের কাছে তিন খণ্ড গীতবিতানই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক আকর গ্রন্থ ছিল বলে আমার মনে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের আর কোনও অংশ থেকে এতখানি খোরাক তো পাওয়া যায় না। সংগীতের ক্ষেত্রেই যেহেতু নীলিমা সেনের এত বেশি আনাগোনা ছিল তাই তার ভেতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে এমন উদার ভাবে তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। অবশ্য আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর চিঠিতে প্রায়ই তাঁকে উৎসাহ দিতেন রবীন্দ্রসাহিত্যের আরও কোনও কোনও ক্ষেত্র গভীরভাবে কর্ষণ করার। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি নীলিমা সেনকে লিখেছিলেন যে নীলিমা যদি রবীন্দ্র সাহিত্যের কিছু তন্নিষ্ঠ চর্চা করেন, রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও গভীর হবে, এবং তাঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসংগীত ভাব ও গাম্ভীর্যে আরও সমৃদ্ধ হবে। রবীন্দ্রসাহিত্যের কতখানি বিস্তৃত চর্চা নীলিমা সেন করতে পেরেছিলেন তা আমার জানা নেই তবে প্রথমত ছাত্রী হিসেবে এবং পরবর্তীকালে অধ্যাপনা করার সময় তিনি রবীন্দ্রমানসের যে পরোক্ষ প্রভাব আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তাও কম নয়। এর ফলে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিসত্তা এমন একটা মহিমা লাভ করেছিল যা অন্য খুব বেশি গায়ক-গায়িকার মধ্যে দেখতে পাইনি। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গান এমন একটা স্তরে আছে যা দুঃখশোকের উপরে চলে যায়। প্রেমের গানের উত্তরণ হয় পূজায়। কিন্তু তা তখনই সম্ভব হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন গায়ক বা গায়িকা অত্যন্ত স্পষ্ট করে অনুভব করেন যে কোথায় ব্যক্তিগত শোক বা সুখ এক বিশ্বজাগতিক অনুভবে গিয়ে পৌঁছয়।

আমার মনে হয় নীলিমা সেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে মাঝে মাঝে এই বোধে উত্তীর্ণ হতেন না, তাঁর জীবনচর্যাতে এই বোধকে ধরে রাখতে পারতেন।

জীবন সম্বন্ধে নীলিমা সেন কতখানি তলিয়ে ভাবতেন তা আমার জানা নেই। তবে তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে অল্পস্বল্প যা কথা হয়েছিল তাতে আমার মনে হয়েছিল যে ব্যক্তিগত শোককে আত্মস্থ করে এবং সামাজিক শোকানুষ্ঠান থেকে বিরত থেকে তিনি একটা পরিণত বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর ওপর খুব বেশি করে নির্ভর করতেন রাবীন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তার চর্চায়। এই-সব চর্চায় অমিয় সেন তাঁর থেকে কিছুটা অগ্রসর হলেও তাঁরা পরস্পরের সহযাত্রী ছিলেন। অমিয় সেনের মধ্যে একটা বিরল রসবোধ ছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রী খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি নিশ্চিত জানতেন কোথায় তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে বৌদ্ধিক সাহায্য নিয়ে লাভবান হতে পারেন।

নীলিমা সেনের মৃত্যুর পরে অনেকেই দোকানে দোকানে তাঁর রেকর্ড ও ক্যাসেটের সন্ধান করেছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নি। এটা দুঃখের এবং বিস্ময়ের ব্যাপার। অন্য অনেকের তুলনায় তাঁর রেকর্ড ও ক্যাসেটের সংখ্যা খুবই কম। ৮০ খানা গানও হবে কি না সন্দেহ—এ কথা শুনবার পর থেকে মন হাহাকার করছে। জানি না তাঁর কতজন গুণগ্রাহী তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর আরও কিছু গান ধরে রেখেছেন। রবীন্দ্রভাবনায় ওতপ্রোত এবং শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট গায়নভঙ্গির এমন একজন ঐশ্বর্যময়ী সংগীত সাধিকা অচিরে জনমানস থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবেন এই চিন্তা আমাকে ক্ষুব্ধ করে রেখেছে।

"দূরের নীলিমা" (প্যাপিরাস), সম্পাদক অরুন্ধতী দেব (১৯৯৭), পৃঃ ১২-১৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সাদত আবুল মাসুদ

মাসুদ সাহেব ইহলোক ত্যাগ করায় বাঙালি জীবন থেকে নিরহঙ্কার ভদ্রতা এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অনেকখানি হারিয়ে গেল। সদ্য-প্রয়াত এই বন্ধুটির সঙ্গে যদিও এক প্রজন্মকালের পরিচয় তবু তাঁর নামের ইংরেজি আদ্য অক্ষর দুটির পিছনে সম্পূর্ণ আরবি নামটি যে কী, তা জানা ছিল না। মাত্র বছর দুয়েক আগে একদিন কৌতূহল প্রকাশ করায় তিনি এই শিরোনামটি বলেছিলেন। বলেই অবশ্য আবার যোগ করেছিলেন যে 'সৈয়দ' পদবীটি তিনি ব্যবহার করেন না, কারণ 'সৈয়দ' বলে দাবি করবার মতো গুণ কিছুই নেই তাঁর মধ্যে। শুধু 'সৈয়দ' বংশে জন্মালেই কি 'সৈয়দ' হয়? অতএব তিনি কেবলমাত্র সাদত আবুল মাসুদ নামে পরিচিত হওয়াই পছন্দ করেন। শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

বলা বাহুল্য, এতে তাঁর হীনম্মন্যতা নয়, আত্মবিশ্বাসই প্রকাশ পেয়েছিল। পিতৃ-অর্জিত আভিজাত্য কিংবা বংশগত কৌলীন্য—কোনওটাই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করেন নি। কারণ তাঁর চারিত্র্যে স্বোপার্জিত আভিজাত্য যথেষ্টই ছিল। তারই অধিকারে ভাষাধর্মবিত্তনির্বিশেষে অসংখ্য হৃদয়ে তাঁর জন্য একটি শ্রদ্ধার আসন করে নিতে পেরেছিলেন। অমায়িক, নির্বিরোধ এবং দরাজ মনের মানুষ ছিলেন বলে মাসুদ সাহেবের সান্নিধ্যে একটা আরাম পাওয়া যেত। কখনও দেখেছি কারুর কটু আক্রমণে অত্যন্ত আহত হয়ে সহানুভূতি প্রার্থনা করেছেন, কিন্তু কটু প্রত্যাঘাত করেন নি। চতুর্দিকে আজ ব্যক্তিমানুষ এবং যূথবদ্ধ মানুষ এতই মারমুখী যে এর মধ্যে তাঁর স্বভাবজ ভদ্রতাকে দুর্বলতা বলে মনে হয়েছে অনেকের। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব অর্থেই তাঁর চেয়ে হীন অথচ দুর্বিনীত, এমনকী তাকেও কখনও আঘাত করতে তাঁকে দেখি নি—আদ্যোপান্ত এতই তিনি ছিলেন ভদ্রলোক।

তাঁর সঙ্গে ১৯৬৪ সালে আমার পরিচয় করিয়ে দেন মৈত্রেয়ী দেবী—তখন আমিও নতুন-নতুন যাচ্ছি তাঁর পাম অ্যাভেনিউর পুরানো বাড়িটায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সভায়। সেই সময়ে শ্রীনগরের হজরৎ বাল মাজার থেকে নবীর পবিত্র কেশ খোওয়া যাবার ব্যাপারটি উপলক্ষ করে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে এবং তার পরে পশ্চিম বাংলা ও বিহারে নৃশংস দাঙ্গা হয়। যে-কোনও হত্যাকাণ্ডই বেদনার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শুধু মানুষ মরে না, মনুষ্যত্বও মরে—এই কথাটা তখন বলেছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্নদাশঙ্কর রায়। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনাও ভয়াবহভাবে বিষিয়ে যায়। সেই বিষাক্ত আবহাওয়াকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী।

প্রায় দশ বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নানা ভাবে নানা কাজে মাসুদ সাহেবের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তাঁর গৃহিণীও নিয়মিত আসতেন। বহু সভাসমিতি করা হয়েছিল তখন। দাঙ্গায় উপদ্রুত অঞ্চলে সম্প্রীতি শিবির করা হত—ছোট বড় দাঙ্গা তো লেগেই থাকে দেশ জুড়ে। পারস্পরিক মেলামেশার জন্য ঈদ বিজয়া উৎসবেও সোৎসাহে যোগ দিতেন তখন এই ব্যস্ত আইনজীবী এবং পরবর্তী কালের বিচারপতি মাসুদ। আমাদের এই বাড়ির ছাতেও সেইরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আমার ভাসুর ড. গণি, যিনি কমিউনিস্ট পার্টির একজন শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন। সম্প্রীতি পরিষদের টাকা-কড়ি বিশেষ ছিল না ঠিকই, তবু এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানেরও তিনি ট্রেজারার ছিলেন—যেকালে বিশ্বভারতীর ট্রেজারার হিসাবে তাঁর কাঁধে দায়িত্বের ভার কিছু কম ছিল না। অবশ্য বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ যোগ ছিল চিত্তের। অসংখ্য প্রতিষ্ঠানেরও অসংখ্য পদের ভার তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বহন করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু মনে হত যে বিশ্বভারতীর কাজ তাঁর যত প্রিয় ছিল ততখানি আর কিছু নয়।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে আমি তাঁর সঙ্গে পৌষমেলায় গিয়েছিলাম। সেবার সমাবর্তনে আবু সয়ীদ আইয়ুবকে দেশিকোত্তম উপাধি দান করার প্রস্তাব হয়েছিল। তিনি শয্যাগত ছিলেন বলে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাকেই যেতে হয়েছিল। আমিও আর্থরাইটিসে পঙ্গু বলে ট্রেনে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তাই বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। মাসুদ সাহেবও সকন্যক সেই গাড়িতেই যান। দৌহিত্রও সঙ্গী হয়েছিল। সারা পথ খুব আনন্দে গিয়েছিলাম আমরা।

সমাবর্তন হয়ে যাবার পরেও মাসুদ সাহেবের মোটেই ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। নাতিকে নিয়ে সারা শান্তিনিকেতনে আর মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ছিন্ন-বাধা পলাতক বালকের মতো। শেষকালে ৯ই পৌষে প্রয়াত আশ্রমবন্ধুদের স্মরণে হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর তাঁকে বহুকষ্টে ফিরতে রাজি করা গেল। কিন্তু আনা কি যায়! প্রাক্তনীরা তখন পাঠভবনের রান্না-বাড়ির প্রাঙ্গণে সোৎসাহে নৃত্যগীত অভিনয় শুরু করে দিয়েছেন। তার আকর্ষণ কাটিয়ে আসা মাসুদ সাহেবের পক্ষে বড়োই কঠিন ছিল। তিনি তখন গলা ছেড়ে প্রাণের আনন্দে গানে যোগ দিতে চাইছিলেন। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে অত্যন্ত অনিচ্ছায় ফিরে এসেছিলেন সেদিন। আরও একটা দিন না থাকতে পেরে বেশ মনঃক্ষুণ্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তো একজন অসুস্থ মানুষকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সীমান্তে এবং কলকাতায় আমরা কিছু ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের কাজ করেছিলাম একসঙ্গে। মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে যেমন মাসুদ সাহেবের বাড়িতেও তেমনি বহু বুদ্ধিজীবী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানা জায়গা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার উপর আবার মাসুদ সাহেবের আত্মীয়রাও কেউ-কেউ এসে পড়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কাজেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদ যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল।

তথাকথিত জয়বাংলা থেকে ছিটকে এসে পড়া অনাথ ছিন্নমূল শিশুদের জন্য কল্যাণীতে একটি আশ্রম গড়ে তোলেন মৈত্রেয়ীদি। কেন্দ্রীয় সরকারের উদার সহযোগিতা পেয়েছিলেন তখন। এই আশ্রমেরই নাম দেন খেলাঘর। প্রথমটায় ওই খেলাঘরের সঙ্গে মাসুদ সাহেবেরও যোগ ছিল। বৎসর শেষ হবার আগেই পূর্ব পাকিস্তান নব নাম নব রূপ নিয়ে যখন বাংলাদেশ হয়ে জন্ম নিল, তখন কল্যাণীর খেলাঘর থেকে সেই দেশের শিশুদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ এল। তখন বুঝতে পারলাম ওদের উপর আমাদের কোনও অধিকার নেই, আমরা ভিন্ন দেশের নাগরিক। অথচ ওদের নিয়ে এই কাজটায় আমরা এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে কাজটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছিল না।

তাই নব পর্যায়ে খেলাঘরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মধ্যমগ্রামের কাছে বাদু গ্রামে। শুধু দুস্থ আতুরদের সেবা করার উদ্দেশ্যে নয়। একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যে অসাম্প্রদায়িক কিছু মানুষ গড়ে তুলবার উচ্চাশা নিয়েই এই খেলাঘরের কাজে আমরা কেউ-কেউ মেতে উঠেছিলাম মৈত্রেয়ী দেবী এবং তাঁর স্বামী ড: মনমোহন সেনের সঙ্গে। আমরা ভাবছিলাম এই শিশুগুলি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে পারিবারিক কুসংস্কার ও বিদ্বেষের উত্তরাধিকার থেকেও মুক্ত থাকবে। তাই গোড়া থেকেই একটা সদর্থক ধর্মনিরপেক্ষ আবহাওয়ায় মানুষ করতে পারলে এই ভিন্ন জাতি-ধর্মের গৃহহারা শিশুগুলির মনে নতুন ভারতের যথার্থ ভিত্তিস্থাপন করা সহজ হবে।

কিন্তু মাসুদ সাহেবের মনে হচ্ছিল যে এর ফলে সম্প্রীতি পরিষদের কর্মক্ষেত্র অনেক সঙ্কুচিত হয়ে গেল। তিনি তাই এতে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। খেলাঘরে দুই একবার গিয়ে তাঁর ভালো লেগেছিল ঠিকই, তবু তাঁর মনে হয়েছিল যে এটা একটা এতিমখানা মাত্র। এই কাজেই সবটুকু মন দিয়ে ভারতজোড়া সম্প্রীতি প্রসারের যে বৃহৎ ভূমিকা ছিল সম্প্রীতি পরিষদের সেটিকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। কিন্তু এটা যে একটা বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে, এই অনাথ আশ্রমে মৈত্রেয়ীদি যে শান্তিনিকেতনের আদলে একটি পরিচ্ছন্ন বৌদ্ধিক-নান্দনিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন সেটা তাঁর ঠিকমতন চোখে পড়ে নি। তাই এই কাজেই সম্প্রীতি পরিষদ সর্বশক্তি নিয়োগ করায় মাসুদ সাহেব একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

এর পর থেকে স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সঙ্গে মাসুদ সাহেবের সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে পরিষদের পূর্বতন কর্মকাণ্ডও গুটিয়ে আনা হয়। মৈত্রেয়ীদির অবশ্য মনে হচ্ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ'-এ পরিণত হওয়ায় ভারতীয় মনোভাব পালটাবে এবং সম্প্রীতি প্রচারের প্রয়োজন আর তত থাকবে না। তাঁর আশাবাদের ভিত্তি যে কত দুর্বল ছিল তার প্রমাণ তিনি ভূরি-ভূরি পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়েছেন এবং আরও যে পেতে হল না এর জন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই। কারণ ১৯৯০ সালের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন হত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে মৃত্যুর অল্প কয়েক মাস আগে মৈত্রেয়ীদি তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠানটির পাট আনুষ্ঠানিকভাবেই তুলে দিয়েছিলেন।

খেলাঘরের কাজের সঙ্গে মাসুদ সাহেব যুক্ত না থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগ নানাভাবেই ছিল। বরং বলা যায় মাসুদ সাহেব আরও যত অসংখ্য কাজ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারই দু-চারটির সঙ্গে আমারও যোগ হয়েছিল। আসাম থেকে বাঙালি উৎসাদনই হোক অথবা পশ্চিমবাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সহজপাঠ উৎসাদন, কিংবা শাহবানুর সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন—নানা বিচিত্র ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগ অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত।

বছর পাঁচ-ছয় আগে ছোট আকারে একটি বড় কাজ হাতে নিয়েছিলেন। W.B.C.S. পরীক্ষা দিতে আগ্রহী যেসব ছেলেমেয়ে ভালো স্কুল-কলেজে পড়বার সুযোগ পায় নি বলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে ভয় পায় তাদেরই জন্য বিনা বেতনে একটি কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। মফস্‌সলের মুসলিম ছেলেরাই এতে বেশি আসত...মুসলিম মেয়ে এই কয় বৎসরে একজনও আসে নি। হিন্দু ছেলেমেয়েও এসেছে মাঝে মাঝে। দিবারাত্র তাঁর কাজের তো বিরাম ছিল না ঘরে এবং বাইরে। তারই মধ্যে নিজের চেম্বারে বসেই ক্লাস নিতেন, দু-তিনটি পেপার একা তিনিই পড়াতেন। আমাকেও ক্লাস নিতে বলায় আমি ইংরিজি ক্লাস নিতে শুরু করি। শুধু শর্ত করেছিলাম যে ছাত্রদের আমার ঘরে এসে পড়তে হবে। সপ্তাহে একটি দিন মাত্র। কিন্তু এই কাজে আমি আনন্দ পেয়েছি, তার জন্য মাসুদ সাহেবের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অথচ উনিই আমাকে এমন করে ধন্যবাদ জানাতেন যেন আমি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত উপকার করেছিলাম। এই ক্লাস করার ফলেই সমাজের যে অংশের ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম তা আগে কখনও পাই নি। এই যোগাযোগকে আমি আমার জীবনের এক মূল্যবান অর্জন বলে মনে করি। জানি না মাসুদ সাহেবের আরদ্ধ এই কাজ এর পরেও চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা।

এই শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে মাসুদ সাহেবের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। দেশবিভাগের পরে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত সংস্কৃতিমান মুসলমান যাঁরা সাহস করে দেশত্যাগ করেন নি তাঁদের সংখ্যা গুনবার জন্য এক হাতের সবকটি আঙুলেরও দরকার হত না। অগত্যা সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মাসুদ সাহেব, অধ্যাপক মাহমুদ এবং কাজি আবদুল ওদুদকেই যেতে হত। ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কারণে আইয়ুব বইখাতা ছেড়ে ঘরের বাইরে বিশেষ যেতেন না। তাঁর অগ্রজ ড: আবু আসাদ গণি প্রধানত রাজনীতি এবং সমাজসেবা নিয়েই জড়িয়েছিলেন। আর ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি। পূর্ব পাকিস্তানে চাকুরিরতা তাঁর স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র দুটিকে এদেশে নিয়ে আসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন সম্ভব ছিল না তাঁর লেখনীর উপর নির্ভর করে। অন্য চাকুরি ধরে রাখা তাঁর স্বভাবে ছিল না। আবার পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে তাঁর মন একান্ত নারাজ ছিল। ফলে দুই শত্রু দেশের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত পরিবারকে নিয়ে তিনি নিয়ত অস্বস্তির মধ্যে কাটাতেন।

এঁদের মধ্যে মাসুদ সাহেবেরই দৃঢ় শিকড় ছিল এই রাজ্যের মাটিতে। তারই জোরে নিজের সমাজের মধ্যে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থেকেও মাথা তুলে রাখতে পেরেছিলেন সব সমাজের ঊর্ধ্বে। সৈয়দ মুজতবা আলি আদতে সিলেটের মানুষ ছিলেন, কাজি আবদুল ওদুদ যতদূর জানি ঢাকার এবং অধ্যাপক আবুল ওয়াহাব মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার। আর আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং তাঁর অগ্রজ তো মূলে ছিলেন ওয়েলেসলি স্কোয়ারের উর্দূভাষী সমাজের।

কিন্তু সাদত আবুল মাসুদের দেশ ছিল হাওড়া জেলার বাগনান গ্রামে—তাঁদের অঞ্চলের মানুষের মুখে যেন শুনেছি 'বাইনান' গ্রাম। সেখানকার মাটিতেই এখন তিনি চিরবিশ্রাম পেয়েছেন। কিন্তু সারা জীবনেই শান্তির জন্য বার-বার ছুটে গিয়েছেন তাঁর এই অখ্যাত গ্রামে—অথচ তিনি অত্যন্ত সদর্থেই একজন নাগরিক মানুষ ছিলেন। জেনেভায় হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের কাজেই থাকুন অথবা ফিনান্স কমিশনের দায়িত্ব পালন করুন শ্রীনগরে কিংবা চীন আর রাশিয়ায় ঘুরে বেড়ান, শেষ পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন এই বিলেতফেরতা ব্যারিস্টার মশাই তাঁর বাগনানের বাড়িটিতে ফিরে গিয়ে। সেখানকার আমজামের বাগিচায়, পুকুরঘাটে—যেখানে তাঁর সাত পুরুষের ভিটে। যখনই দু-চার দিন ছুটি পেতেন একাই চলে যেতেন সেখানে। সেই বাড়ি যাতে পোড়ো বাড়ি না হয়ে যায় তাই নিয়মিত তার সংস্কার করাতেন। মাঝে-মাঝে এসে গল্প করতেন, পুকুরে সাঁতার কেটে, গ্রামের মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়িয়ে কেমন শরীর মন ভালো হয়ে যায় তাঁর। যে ঘরে তাঁর পিতা-পিতামহ থেকেছেন সেই ঘরে তাঁদেরই সংগৃহীত বইপত্র নাড়াচাড়া করে অবসর কাটাতেন। গ্রামের পাড়াপড়শির ঘরে-ঘরে ঘুরে তাঁদের দুঃখসুখের খোঁজখবর নিতেন—তাঁদের সুখদুঃখের অংশী হতেন। গ্রামের মসজিদের আজান শুনে উঠে ফজরের নামাজ পড়তেন।

হাঁ, এই তাঁর আর-একটা দিক যা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার যোগ্য। আমি তাঁর মতো ধার্মিক অথচ "ধর্ম-নিরপেক্ষ" লোক এত কাছ থেকে বিশেষ আর কাউকে দেখি নি। তাই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর মানসিক গঠন বুঝবার চেষ্টা করেছি। অধ্যাপক মাহমুদ ধর্মাচরণ সম্বন্ধে উদাসীন, আইয়ুবও তাই ছিলেন। তাঁরা যে-কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস করেন না, সে কথা স্বীকার করার ফলে মাঝে-মাঝে স্বসমাজের নিন্দাভাজন হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু মাসুদ সাহেব নিয়মিত নামাজ-রোজাপালন করতেন। ভোরবেলা উঠে কোরান শরীফ পাঠ করলে তিনি মনের আশ্রয় পান একথা নিজেই বলতেন। এ বিষয়ে তিনিও অকপট ছিলেন। বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একান্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে তাঁর নাস্তিক ভাবরূপ ঘোষণা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনও শুনি নি। এর ফলে বৃহত্তর সমাজে তাঁকে অপাংক্তেয় হতেও তো দেখি নি। আবার শুধু কওম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কায়, অবিশ্বাসী হয়েও, ঈদের জামাতে শামিল হতে হয় নি তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস এবং আচরণ বিষয়ে তিনি অকপট ছিলেন বলেই তিনি দুই সমাজের শ্রদ্ধা ও আস্থার পাত্র ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গেও তাঁর যে আমরণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাও অনেকে জানাতেন না। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে, আবার ঈদের জামাতেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

নানা সময়ে ইসলাম বিষয়ে, বিশেষ করে ইসলামের সর্বজনীন শিক্ষা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে। মুসলমানদের ধর্মবিষয়ে যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও অনুদারতার প্রসঙ্গে অমুসলমানের মনে যে বিরূপতা, তার জন্য প্রায়ই তিনি স্বসমাজকে দায়ী করতেন। কোরান হাদীস যত্ন করে বুদ্ধির সঙ্গে অনুধাবন করলে যে সংকীর্ণতা দূর হবেই— এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল না। আমাকে হাদীসের একটি বাঙলা অনুবাদ দিয়েছিলেন পড়ে দেখবার জন্য।

বাংলাদেশ থেকে ভোরবেলায় "পথ ও পাথেয়" নামে যে অনুষ্ঠানটি বেতারে প্রচারিত হয় সেটি তিনি নিজে নাকি নিয়মিত শুনতেন, আমাকেও শুনতে বলেছিলেন। আমি মাঝে-মাঝে শুনেছি এবং শুনি। তবে কেবলই মনে হতে থাকে যে তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ক'জন নাগরিক এই বেতার আলোচনা থেকে 'পাথেয়' সংগ্রহ করে থাকেন তাঁদের নিত্য দিনের জীবনযাত্রায়। অবশ্য এই প্রশ্ন সব সমাজের সব ধর্মের প্রচারণা বিষয়েই করা যায়।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও কেউ-কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, মাসুদ সাহেব তো মুসলিম পার্সোনাল ল পালটে সব ভারতীয়দের জন্য (এখনই) এক আইন করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহলে তাঁকে সত্যিকার ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় কি? ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে এই দেশের সব হিন্দুসন্তানই যেহেতু সব সম্প্রদায়ের জন্য একই ব্যক্তিগত আইন চান, অতএব তাঁরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিক—তা ছাড়া জন্মসূত্রেই দেশপ্রেমিক তো বটেই। কোন মুসলমান নাগরিক খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ তার বিচার করার কষ্টিপাথর হল, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন। যদি একীকরণের সপক্ষে হন কেউ তাহলেই তিনি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক ভারতীয় নাগরিক, নয় তো নয়।

স্পষ্ট করে বলা বাহুল্য নয় যে, আমি এই মানদণ্ড স্বীকার করি না। বরং উলটো দিকে অনুভব করি যে অসংখ্য হিন্দু সন্তান আছেন যাঁরা এই 'পার্সোনাল ল'-টাকে 'ইশ্যু' করে রেখেছেন অত্যন্ত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে। তা ছাড়া তাঁরা জানেনও না যে এমনকী ইসলামী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও হিন্দুর ব্যক্তিগত আইনে হাত দেওয়া হয় নি এবং যে-কোনও হিন্দু পুরুষ ইচ্ছা করলেই আইনত একশটি অথবা তারও বেশি বিবাহ করতে পারেন (করেন কি), হিন্দুনারী স্বামীগৃহে যতই নির্যাতিতা হন না কেন, বিবাহবিচ্ছেদ এবং খোরপোশ লাভ করা প্রায় অসাধ্য, আর সে দেশের হিন্দু কন্যারা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী নন। তবু সেই দেশের এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দু নাগরিকদের দেশপ্রেমের প্রমাণ দেওয়াবার জন্য একই ব্যক্তিগত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আইনের আওতায় আনবার কথা আজ পর্যন্ত কেউ বলেছেন বলে শুনি নি। ঘাড় ধরে তাদের সমাজসংস্কার বা উন্নতি করবার জন্য কেউ বদ্ধপরিকর হন নি।

মুসলিম পার্সোনাল ল-তে যে কারণে নেহরু হাত দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন মোটামুটি সেই সব কারণেই মাসুদ সাহেবও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মুসলমানরা যেন মনে না করেন যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁদের উপর এই জবরদস্তি করছেন। শিক্ষাদীক্ষা এবং আধুনিক চিন্তার প্রসার হলে সংখ্যালঘু সমাজ থেকেই যখন পরিবর্তনের দাবি উঠবে তখনই পরিবর্তন করা সঙ্গত হবে। পরিবর্তন উপর থেকে চাপিয়ে দিলে শুভ হয় না—তাদের নিরাপত্তাবোধ আহত হয়...ইত্যাদি।

অন্য পক্ষে আমার প্রশ্ন, সংবিধানে যত মহৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার কতটুকু পালন করা বাস্তবে সম্ভব হয়েছে? সংবিধানে সমঅধিকারের প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও এদেশের নারী, এদেশের অন্ত্যজরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন সুবিচার অথবা সমঅধিকার লাভ করছেন না, তেমনি মুসলমানরাও অনেক সময় পাচ্ছেন না—একথা আজ এদেশে বলা কত বিপজ্জনক তা জেনেও বলছি। অন্যদের কথা আপাতত বাদ দিয়ে, নাঃ বাদই বা দেব কেন! কথাটা যখন উঠেছে তখন এই প্রশ্নও করি যে, আজ যখন মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেচে তখন কেন এমন দেখতে পাই যে এই সুপারিশকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার জন্য আমি আমার উচ্চবর্ণের শত-শত বন্ধুদের মধ্যে ৬ জনকেও পাশে পাই না? একি সম্পূর্ণতই শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে 'মেধা' এবং 'মান'-এর সমর্থনে নৈর্ব্যক্তিক মত-দান? মনের কোনও কোণেও কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা লুকানো নেই কারুর? অথবা সেই সনাতন প্রার্থনা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'

আরও শতকরা ২৭% অনুন্নত মানুষকে সমান সুযোগ দেবার প্রস্তাবটুকু করা মাত্র সর্বক্ষেত্রের মান রসাতলে যাবে—এই আশঙ্কায় দেশের ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁরা পরম দুর্ভাবিত তাঁদের একবার তামিলনাড়ুর দিকে তাকিয়ে দেখতে বলি। হাজার-হাজার বৎসর ধরে অন্ত্যজদের প্রতি ব্রাহ্মণের অত্যাচার যেমন নিন্দনীয় ছিল, আজ ওই রাজ্যের সর্বক্ষেত্র থেকে ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ উৎসাদন ঠিক ততখানি না হলেও নিন্দনীয় তো বটেই। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তামিলনাড়ুর মান কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে অন্য সব রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে সেটা তুলনা করে দেখা যাক না? অন্তত চিকিৎসার মান এবং চিকিৎসকের সততা তো সারা ভারত জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে!

গণতান্ত্রিক দেশে যে-কোনও অংশের কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগলে বিতর্কের ঝড় উঠবেই—ওঠায় ক্ষতি নেই, যতক্ষণ না সেটা রক্তক্ষয়ী হিংসায় পরিণত হচ্ছে। সুবিধা যাঁরা ভোগ করছেন তাঁরা বিনাবাক্যে সব সুযোগসুবিধা ভাগ করে নেবেন 'বহিরাগত' অংশের সঙ্গে এটা প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে উচ্চবর্ণের এই অসহিষ্ণু প্রশ্ন আর কতকাল এই নিম্নবর্ণের অপদার্থদের বিশেষ সুযোগ দিতে হবে? মুসলমানদের তোয়াজ করতে হবে? এর জবাব তো স্পষ্ট। যতদিন না দেখা যাচ্ছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে দেশের সব দুর্বল শ্রেণীর মানুষই অবাধ আর ন্যায্য প্রতিযোগিতায় নিজের-নিজের সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট সংখ্যায় এসে সব পদ অধিকার করতে পারছেন। না যদি পারেন তাহলেই বোঝা যাবে যে শিক্ষাব্যবস্থায় বা সমাজব্যবস্থায় কোনও বিষম (বি-সম) বাধা আছে। তখন কেবলমাত্র সংবিধানীকৃত সম-অধিকার আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা তুলে সেই অসম বাধাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

আর যতক্ষণ না অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে অসম ব্যবস্থার আমরা সমাধান করছি ততক্ষণ ব্যক্তিগত আইনের একীকরণের উপর চাপ দেওয়াটা একটা বাড়তি উৎপাত। সংখ্যালঘুরা তাঁদের ব্যক্তিগত আইন আঁকড়ে ধরে থাকলে সারাদেশের এমন কিছু ক্ষতি হয় না, যার জন্য এটাকেই উপলক্ষ করে সাম্প্রদায়িক বিরোধে উশকানি দেওয়া চলে। তার চেয়ে অনেক গুরুতর সমস্যার সমাধানে আমরা আজও হাত দিই নি। "আর ব্যক্তিগত আইনের একীকরণ না হলে দেশের যত না ক্ষতি তার চেয়েও মুসলমানের নিজেদেরই ক্ষতি অনেক বেশি—একথা মনে রাখলে এতখানি অধীর হবেন না যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ।

সাংবিধানিক আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমকে যখন থেকে এদেশে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন থেকেই একটা নূতন পরীক্ষা শুরু হয়েছে এই দেশে। গান্ধীজী নিজেই যখন সর্ব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে গ্রহণ করেছেন, তখন বোঝা যায় আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মেজাজের সঙ্গে এটাই খাপ খায়—এই আদর্শকে গ্রহণ করার চেষ্টাই বোধহয় আমাদের স্বভাবসঙ্গত হবে। পশ্চিমী সেকুলারিজমের ধারণাকে এদেশের মনের জমিতে রোপণ করার চেষ্টা সার্থক হবে না, হয়তো বা প্রয়োজনও নেই। কিন্তু সর্বধর্মের প্রতি সমভাবের চর্চাও যে সহজসাধ্য হবে না তা প্রতিদিনই বুঝতে পারছি পজিটিভ সেকুলারিজমের দৌরাত্ম্য দেখে। যাই হোক, মাসুদ সাহেবকে আমি এই অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বলতে চেয়েছি এবং শ্রদ্ধা করেছি—যদিও ব্যক্তিগত রুচিতে আমি সব ধর্মের প্রতিই সমান উদাসীন।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে সদ্য-প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করতে বসে উপরোক্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কী? প্রথমত প্রাসঙ্গিকতা এই যে, এজাতীয় ভাবনা-চিন্তাই আমরা আদান-প্রদান করেছি বহুদিন যাবৎ। আরও একটি প্রাসঙ্গিকতাও আছে বটে ভারতীয় মুসলমানকে আজ জীবনে মরণে প্রমাণ দিতে হচ্ছে, এই দেশের উপর তার আত্মিক অধিকার কতটুকু। বন্ধুকৃত্য হিসাবে সেই প্রমাণ অল্প একটু পেশ করলাম।

তবে এইসব ছাপিয়ে মনে পড়ছে একটি সন্ধ্যা। শিমলার অ্যাড্‌ভান্সড স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে ১৯৮৬ সালে পাঁচ-দিনব্যাপী সেমিনার চলছিল, বিষয় রবীন্দ্রনাথ। মাসুদ সাহেব তো ছিলেনই—তিনি তখন ওই প্রতিষ্ঠানের ভাইস-চেয়ারম্যান। সারাদিনব্যাপী আলোচনার শেষে সন্ধ্যায় একদিন বিনোদনের আসর বসেছিল। নানা-জনে নানা-রকম গাইছেন, নাচছেন। মাসুদ সাহেব পকেট থেকে ছোট্ট একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডায়েরি বার করে শব্দগুলি দেখে নিয়ে গেয়েছিলেন,

'বিশ্বসাথে যোগে যেথা বিহার'

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।'

তাঁর কণ্ঠে যত গান ছিল তার চেয়ে প্রাণে গান ছিল আরও অনেক বেশি। সেটা সবাইকে স্পর্শ করেছিল।

দর্শনের ছাত্র হলেও বিশ্বের সঙ্গে মাসুদ সাহেবের যোগ তাত্ত্বিক ছিল না, ছিল হার্দিক।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫১ (১৩৯৭), সং ১০, পৃঃ ৮০৭-

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিবনারায়ণ রায় বন্ধুবরেষু

প্রথম যখন সস্ত্রীক শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখনও তাঁর ভীষণ পাণ্ডিত্যখ্যাতি আমার কাছে পৌঁছয় নি। তাই তখন তাঁকে বিশেষ ভয় পাইনি।

স্থান কাল পাত্রের মধ্যে কাল সম্বন্ধেই আমাদের স্মৃতি সবচেয়ে দুর্বল। স্থানটা প্রায়ই হুবহু ছবি হয়ে মনে থেকে যায়। শান্তিনিকেতনে মন্দিরের সামনে বকুল গাছতলায় তখন একটা দোকান ছিল শ্রীনিকেতনের। সেই দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা সেরে বান্ধবী রুক্মিণী ভাটিয়া আর আমি বার হয়ে আসছিলাম। সামনেই দেখতে পেয়েছিলাম তরুণ শাল গাছের মতো সরল দীর্ঘকায় একটি পুরুষ ও তাঁর সুন্দরী সঙ্গিনীকে। সঙ্গিনীকে আমাদের চেয়ে কম বয়সিনী বলেই মনে হয়েছিল। তাঁরাও বোধহয় ওই দোকানেই আসছিলেন।

রুক্মিণী আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। কয়েক মাস আগে ঝাড়গ্রামে একটা ক্যাম্পে যোগ দিতে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যে তার ভালো লেগেছিল সে কথা আগেই তার কাছে শুনেছিলাম। তাই শুধু নাম বলতেই চিনতে পেরেছিলাম। আমার পরিচয় দিতে গিয়ে রুক্মিণী জানিয়েছিল, ফিলসফি অনার্সের ছাত্রী। শিববাবু জানতে চেয়েছিলেন আইয়ুব আমাদের পড়ান কিনা। আমি সদর্থক উত্তর দেওয়ায় উনি মুখখানা একপাশে একটু ঘুরিয়ে বেশ ওপর থেকে কথাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন 'আইয়ুব আমার বন্ধু।' আমার সঙ্গে তাঁর উচ্চতার এতটাই পার্থক্য যে কথাটা যে বেশ ওপর থেকেই পড়বে এটা স্বাভাবিক। তবু সেদিন সামান্য একটু সন্দেহ হয়েছিল যে নিজেকে প্রবীণ অধ্যাপক পদবাচ্য ঘোষণা করে আমাকে নেহাৎ নাবালিকা বলে বরখাস্ত করে দিলেন কিনা। যাই হোক ওঁর এই পরিচয়টা জেনে একটু হেসে চুপ করে ছিলাম। মনে মনে বলেছিলাম, আমারও বন্ধু, তবে এখনই সে কথাটা বলা যাবে না।

আইয়ুব যে সেই সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন না সেটা মনে আছে। তাই মনে হয় ওটা ১৯৫১ সালের গোড়ার দিকের কথা। হয়ত তখন বসন্তোৎসব ছিল। কিছু লোকসমাগম হয়েছিল যেন আশ্রমে। অসুস্থ হয়ে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে আইয়ুব শান্তিনিকেতন থেকে তখন কলকাতা চলে এসেছিলেন। তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম যে তাঁর বন্ধু শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেবারকার আর কোনও স্মৃতি মনে পড়ে না। ওঁরা বোধহয় দু-একদিনের জন্য এসে শান্তিনিকেতন দেখে ফিরে যান। কোনও সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে না। সেবারেই ওঁদের প্রথম শান্তিনিকেতনে যাওয়া কিনা তা কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি পরে।

এর পরের পরিচয় পরোক্ষ ও ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তাঁর কিছু রচনা—সম্ভবত দুটি প্রবন্ধে—শান্তিনিকেতনকে মুখর করে তুলল। আমার স্বল্প পরিচিত ওই ভদ্রলোকটি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিষয়ে নানা শ্রদ্ধাহীন মন্তব্য করেছেন বলে শোনা গেল। তিনি নাকি লিখেছেন, 'দেবেন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র সাহিত্য সৃষ্টিতে গোয়েটের পর্যায়ে উঠবেন কি করে, তিনি কি কখনও বেশ্যাবাড়ি গিয়েছেন?' আবার রবীন্দ্রনাথের ছবির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাকি অভিমত দিয়েছেন যে 'কবি গুরুদেব যতই কেন ঋষির মুখোশ এঁটে থাকুন, তাঁর মনের কিছু অন্ধকার মহলের খবর ধরা পড়ে গিয়েছে তাঁর ছবিতে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মানুষটিকে দেখে তো ভালই লেগেছিল। সঙ্গে স্ত্রী থাকায় তেমন কিছু উগ্র বলেও মনে হয়নি, বরং স্নিগ্ধ—প্রায় শান্তিনিকেতনী রোমান্টিক ধরনেরই মানুষ মনে হয়েছিল। কাঁধে যেন শানব্যাগও ছিল। তাঁর এই রকম আচরণ!

বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম আমি শান্তিনিকেতনে পড়তে যাবার অল্পদিন আগে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় নাকি একটি বক্তৃতা দিতে এসে খুব পরিশীলিত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উদ্দেশে আমি দুটি থান ইঁট ছুঁড়ে মেরেছিলাম...।' বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থের দুই খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে শিবনারায়ণ রায়ের প্রবন্ধ দুটিকে ঢিল বা পাটকেল বলে বর্ণনা করা যায়। তবে ওই দুটি ঢিল শান্তিনিকেতনের নিস্তরঙ্গ ডোবায় পড়ে বেশ বড় বড় ঢেউ তুলেছিল। ছাত্র ও শিক্ষক মহলে খুব উত্তেজনা হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধের বাক্য মুখে মুখে ফিরছিল। বলাই বাহুল্য যে যতই মুখ থেকে মুখান্তরে যাচ্ছিল ততই মূল থেকে তার আকৃতি পালটে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছিল।

আমি স্বচক্ষে শিববাবুর লেখা দেখবার সুযোগ পাই আরও কয়েক বছর পরে। কলকাতায় ১৯৫৩ সালে এম.এ পড়তে আসার পর। ইতিপূর্বে স্বাস্থ্যের কারণে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আইয়ুব যদি শান্তিনিকেতন থেকে চলে না আসতেন তাহলে মনে হয় শিববাবুর বিতর্কিত রচনাগুলি পড়বার সুযোগ আরও আগেই পেতাম। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর ওই লেখাগুলি কেন যে তখন দেখিনি তাই ভাবছি, কারণ প্রায়ই দুপুরবেলা লাইব্রেরির রিডিংরুমে পত্রপত্রিকা দেখতে তো যেতাম। ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে আমাদের অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে কলাম লিখতেন তাও তো প্রায়ই দেখেছি মনে পড়ে। হীরেনদার লেখা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হত মনে আছে। যাই হোক, 'দেশ'-এ যখন 'গোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথ' আর 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় তখন এ লেখাগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ে কারা প্রতিবাদ করে কি লিখেছিলেন তাও আমি দেখিনি। এটা আমার এলেবেলে স্বভাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্যই ঘটেছিল বুঝতে পারি। তবু স্বচক্ষে না দেখেও ধরে নিয়েছিলাম শিবনারায়ণ রায় রবীন্দ্র-প্রতিমা ধ্বংসকারীদের অন্যতম। অতএব মনে হল শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা-করা আমার প্রতিও তিনি বিশেষ সদয় হবেন না। তাই কলকাতায় আসার পরেও তাঁর সঙ্গে ঠিকমতন পরিচিত হতে সাহসী হইনি অনেকদিন।

অবশ্য কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গেই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় করার সাহস কোনওকালে আমার হয়নি। সিংহশিকারে আমার খুব ভয়। তবু কলকাতায় আসার পর আইয়ুবের কল্যাণে নানা গোষ্ঠীর নামকরা কিছু মানুষের সঙ্গে ধীরে ধীরে আলাপ হতে থাকে। আধুনিক কাব্যের প্রৌঢ় দিকপাল সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্রদের মতন মানুষদের কাছ থেকে দেখে খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। যুবক ও তরুণ কবিদের মধ্যেও কয়েকজনকে জানবার সুযোগ পেলাম। শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গেও আইয়ুবের যোগাযোগ ছিল জানতাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি। তাঁর সম্বন্ধে ততদিন এমন ভয় আর কৌতূহল জমা হয়েছিল মনে যে দেখা হলে ঠিকই মনে থাকত। আমার ধারণা উনি বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে বিশেষ আসতেন না যে সময়ে আমি আসতাম। তবে কোনও বক্তৃতামঞ্চে বা বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের সমাপ্তি ভোজে একটু দূর থেকে তাঁকে দেখে থাকতেও পারি।

আইয়ুব মাঝে মধ্যে প্রাসঙ্গিক লেখাও পড়তে দিতেন। শিব রায়ের 'গোয়েটে ও রবীন্দ্রনাথ' পড়ে দেখা গেল যতটা মারাত্মক কথাবার্তা বলেছেন বলে শোনা গিয়েছিল ততটা নয়। "রবীন্দ্রনাথের কল্পনা মানুষের ভাবরূপকে নিয়েই ব্যস্ত তার সমগ্র রূপটিকে স্বীকার করবার প্রৌঢ় দুঃসাহস তিনি ক্বচিৎ দেখিয়েছেন"—এ জাতীয় মতের সঙ্গে বিতর্ক চালানো যায়, সাধ্য থাকলে। কিন্তু এর জন্য মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেওয়া যায় না মোটেই।

আবার "যে মানুষ সারা জীবন ভালোবাসার উপরে এত গান, কবিতা, কাহিনী, নাটক লিখে গেলেন, তাঁর নিজের প্রেমের অভিজ্ঞতার সংবাদ তিনি সযত্নে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন"। রেখেছেন কি সত্যিই? অন্তত একটি নষ্ট প্রেমের রক্তক্ষরণ তো গবেষকরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার অনেক আগেই দেখতে পেয়েছিলেন বহু পাঠক। ...যাই হোক এইরকম সংবাদ প্রতিবাদ করা যেত। এমন কথাও তখন রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে মনে হয়েছে যে নিজের হৃদয়-ক্ষতকে চুলকে রক্তাক্ত করতে উনি হাটের মাঝখানে কুষ্ঠরোগী ভিখারীর মতো যদি নাই করে থাকেন, যদি-বা সেই ক্ষতের উপর প্রসাধিত যত্নে চন্দনের প্রলেপ দিয়েই থাকেন তাহলেও বা এমন কি অপরাধ করেছেন?

"জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করতে পারেননি" বলে, "আদর্শবাদী শুচিতার মোহে অপ্রীতিকর অরুচিকর অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন" বলে "লেখক হিসেবে তাঁর অপূরণীয় লোকসান হয়েছে।" ফলে রবীন্দ্রনাথ "প্রথম শ্রেণীর লেখক হয়ে উঠতে পারেন নি।" শিব রায়ের এই সব অভিযোগ ও মূল্যায়ন তখন অবশ্য

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুবই বেদনা দিয়েছিল। কিন্তু এখনও যে সম্পূর্ণভাবে তাঁর মত গ্রহণ করতে পারি নি তার কি হবে? মনে মনে বিতর্ক আজও থামে নি। তবে কি সাহিত্যবোধের ব্যাপারে কোনওদিনই আর প্রাপ্তবয়স্ক হব না?

গোয়েটের মতো রবিঠাকুরও যে "বুড়ো শেয়াল" অভিধা অর্জন করতে পারেননি তাতে তাঁর সাহিত্যকর্মের এবং আমাদের মতো পাঠকদের কী লোকসানটা হল তাও একটু আধটু ভেবে দেখার চেষ্টা করি। তবে কি ভীরু অসার্থক দ্বিতীয় শ্রেণীর এক লেখকের অপরিণত রুচি-মুগ্ধ পাঠক হয়েই রইলাম? ষাট পেরিয়েও মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিপক্বতা অর্জনে ঘাটতি রয়ে গেল।

কিন্তু নানা প্রতিস্পর্ধী মিডিয়া-আক্রান্ত যুগে বাস করে জীবনের কুৎসিততম রূপ সম্বন্ধেও কি অনবহিত থাকা কারুর পক্ষে আর সম্ভব? কোন্ কালেই বা সম্ভব ছিল, জানি না। যে বড় বাড়ির বড় কেলেঙ্কারীর গল্প দ্বিজেন্দ্রলাল ফলাও করে লিখেছিলেন সেই সংসারে জন্মে, বড় হয়ে, জীবনকে চিনতে শিখে রবিঠাকুরের পক্ষে সম্ভব ছিল কি অপাপবিদ্ধ থাকা? প্রেম কিংবা প্রেমের বিকার ছাড়াও ক্ষুদ্রতা, নীচতা, লোভ, কপটতা কোন্ জিনিসটার সম্বন্ধে তিনি অনবহিত থাকতে পারেন তাই ভাবছি। বেশ্যাবাড়ি শুঁড়িবাড়ি যাননি বলেই মনে হয়। গেলে কি সুরেশ সমাজপতি, সজনীকান্ত দাশ-রা রক্ষা রাখতেন? জালবাজ, ফাটকাবাজ, চোর-জোচ্চরদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছেন বলেও মনে হয় না। নারী-ধর্ষণ, কোনও অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে গলা টিপে হত্যা করা—এরকম সব থ্রিলিং এক্স্‌পিরিয়েন্স তো হয়ই নি। কিন্তু তাঁর চোখ কান কি এতই বন্ধ ছিল, তাঁর কল্পনা কি এতই দীন ছিল যে ওই ভয়াবহ জগৎটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাবেন? কিংবা এতই কি নির্বোধ ছিলেন যে সেটাকে অস্বীকার করবেন? তার পরেও যদি বলে থাকতে পারেন, "ক্ষতি যত ক্ষত যত মিছে হতে মিছে/সেসকলই মরীচিকা মিলাইবে পিছে"—তার অর্থ এই নয় যে ওগুলি অসত্য, ওসবের অস্তিত্বই নেই। বরং ওগুলিকে যদি মরীচিকার মতো তুচ্ছজ্ঞানে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে এক শ্বাসরোধী আবর্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকব, তার উপরে নিজের নির্লিপ্ত দ্রষ্টাস্বরূপকে টেনে তুলতে পারব না। কি জানি, কী যে প্রলাপ বকছি! এসব বুঝিয়ে বলার চেষ্টাও কি আমার ঔদ্ধত্য নয়? অথবা নির্বুদ্ধিতা?

কিন্তু এসব কথা আজ এতকাল পরে তোলা কেন? একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে মুখে কোনওদিন এসব কথা শিববাবুর সামনে তোলার সাহস হয়নি। আরো একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে শিব রায় মানেই মূর্তিমান বিতর্ক। উনি দুম করে কিছু একটা বলবেন, আমরা সবাই হৈ হৈ করে উঠব তবে না বোঝা যাবে যে ওঁর মনটা বেঁচে আছে আর আধমরাদের ঘা দিয়ে দেখছে তাঁরাও বেঁচে আছে কিনা। আর ৪০ বছর আগেকার বিতর্ক তো আজও দেখছি পুরোনো হয়নি। বছর দুয়েক আগে আমার এক কনিষ্ঠা সহকর্মিণী একদিন এসে বলল আগের দিন ওরা কয়েকজন একটা সেমিনারে গিয়েছিল। সেখানে শিবনারায়ণ রায় বলেছিলেন, এবং বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরও কয়েকজন নামজাদা বুদ্ধিজীবীও বলেছিলেন। তাঁদের নাম মনে পড়ছে না এমন নয়, কিন্তু নাই-বা লিখলাম। সে নিজে বামমার্গের প্রতি একটু সহানুভূতি পোষণ করত। কিন্তু সেদিন সোচ্ছ্বাসে সে বলল, 'শিবনারায়ণ রায় সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট! অন্যেরা কী যে হিজিবিজি বললেন।' বিষয় বোধহয় ছিল সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।

যাক আবার অতীতেই ফিরে যাই। আমাদের বিবাহের অল্প কাল পরেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় শিব রায় এসে পড়লেন, কোনও একজন বন্ধুও বোধকরি সঙ্গে ছিলেন বলে মনে পড়ছে। এক গুচ্ছ লাল ও হলুদ গ্ল্যাডিওলি দিলেন আমাকে, অত্যন্ত সলজ্জ ভঙ্গিতে। অমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর ক্ষুরধার ব্যক্তিও যে হার্দিক উত্তাপ প্রকাশে কিশোরের মতো অপ্রতিভ হতে পারেন সেই শিব রায়কে দেখলাম। বলা যায় তাঁর সঙ্গে সেদিনই আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের যথার্থ শুরু। এবং এতটাই সুন্দরভাবে যে ভয়টয় অনেকখানি কেটে গেল। আইয়ুবের স্ত্রী হিসাবে তাঁর যেসব প্রচণ্ড বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কে ভয় পাচ্ছিলাম তাদের মধ্যে তিনিও তো একজন ছিলেন। আর একটা কথাও বলি এখানে। আইয়ুবের অনেক বন্ধুর সঙ্গেই ততদিনে পরিচয় হয়েছে। উষ্ণ সম্বর্ধনা ও সহৃদয় বন্ধুত্বও লাভ করেছি অনেকের কাছ থেকেই। কিন্তু কারুর কাছ থেকেই তখনও ফুল পাই নি। হঠাৎ এমন দুর্লভ ফুল উপহার পেয়ে একেবারেই গলে গিয়েছিলাম। ১৯৫৬ সালে গড়িয়াহাটে কি দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে মোড়ে এমন গ্ল্যাডিওলির সমারোহ দেখতে পাওয়া যেত না। নিউ মার্কেটে ফুলের দোকানে কাঁচের দেয়ালের আড়াল থেকে এই ফুলের বিরল দর্শন লাভ হত। মনে হয় শিব রায় সেখান থেকেই এনেছিলেন ওই ফুল। আর ছিল দেরাদুনে এলেন রায়ের বাগানে। তাঁর গ্ল্যাডিওলি-সংগ্রহের রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর ছিল ভারী অহঙ্কার!

গোয়েটের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অবমূল্যায়ন, কিংবা রবীন্দ্রনাথের ছবির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর নির্জ্ঞান মনের অলিগলিতে অশোভন উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা তখনও যথেষ্টই অপরাধ বটে! কিন্তু অপরাধীর প্রতি মনটা একটু নরম হয়ে গেল। অন্তত তাঁর কোনও বক্তব্য সম্বন্ধেই অসহিষ্ণু প্রত্যাখ্যানের মেজাজ আর রইল না।

তাছাড়া আমার অনভিজ্ঞ, অপরিণত মনের অনেক প্রতিরোধ, অনেক আগল তখন ধীরে ধীরে শিথিল হচ্ছিল আইয়ুবের সান্নিধ্যে। তাঁর চোখ ভালো ছিল না বলে অনেক কিছুই আমাকে পড়ে শোনাতে বলতেন, নিজের লেখালেখির প্রয়োজনেও। আবার আমার শিক্ষার জন্যেও যে পড়তে বলতেন সে কথাও গোপন করতেন না। দিনের পর দিন সাম্যবাদী রাজনীতি নিয়ে ধৈর্য ধরে আলোচনা করতেন। তবে আমার কোনও মত, সে যতই কাঁচা হোক, রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক যাই হোক না কেন, তার উপর সরাসরি আক্রমণ করতেন না। তাঁর যে লেখাগুলি সাম্যবাদী মহলে তীব্র কটু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সেগুলিও পড়তে দিতেন, আমার বক্তব্যও শুনতেন। শিল্পের, সাহিত্যের, সঙ্গীতের মহৎ কিছু ধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার কাঁচা ধারণার ভিত নড়িয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর রণকৌশল। দামামার শব্দ প্রথম থেকেই ভড়কে দিত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাই নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে মনের জমি অন্য ধরনের বীজকে গ্রহণ করার জন্য তৈরি হতে শুরু করেছিল। শিববাবুর 'মৌমাছিতন্ত্র' যখন পড়লাম ততদিনে সাম্যবাদের প্রতি আমার কৈশোরিক মোহের অবসান ঘটেছে। নির্মল বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো মানুষদের প্রভাব এড়ানোর সাধ্য ছিল না আমার। যাই হোক 'মৌমাছিতন্ত্র' খুব লাগসই ভাষা জুগিয়েছিল বিতর্কের। দুই শিবিরের সশস্ত্র যুদ্ধ থেমে যাবার পরেও, শিবিরানুগতদের বাক্ যুদ্ধ যথেষ্টই উত্তপ্ত হয়ে উঠত, শানানো ভাষার কদর ছিল খুব। অবশ্য আমি শিববাবুর লেখা যতটুকু পড়েছি তার মধ্যে অরাজনৈতিক লেখাই বেশি। আর যেসব বিতর্কে সাথে সাথেই তাঁকে জড়িয়ে পড়তে দেখতাম দর্শকের আসন থেকে, সেগুলি একই রাজনৈতিক শিবিরের লোকেদের সঙ্গেও ঘটতো অনেক সময়।

একটা উদাহরণ দিই। বোধহয় পঞ্চাশের দশকের শেষ কিংবা ষাটের দশকের শুরু তখন। বোম্বাইয়ের এক সর্বভারতীয় সাহিত্য সেমিনারে গিয়ে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশার কথা নাকি খুব জোর গলায় ফলাও করে বলে এসেছিলেন শিব রায়। অন্য দুজন প্রধান সাহিত্যিক সেখান থেকে ফিরে আইয়ুবের কাছে দুঃখ করে গেলেন এসে যে শিব রায়ের কথা শুনে সারা দেশের মানুষ ধরে নিল যে এক বাংলা ভাষাতেই বুঝি বলবার মতো লেখালেখি কিছুই হচ্ছে না। এদিকে তামিলে মহাকাব্য লেখা হয়ে যাচ্ছে। হিন্দীতে যুগান্তকারী সব কাব্য রচনা হচ্ছে, মারাঠীতে যা নাটক হচ্ছে তার জুড়ি তো এদেশে নেই। ব্রেখ্ট কি আয়োনেস্কোর সঙ্গেই তুলনা চলে সে সবের। আর উর্দু ছোটগল্প ও উপন্যাস যে কোথায় পৌঁছে গিয়েছে তার সীমাসরহদ্দ বর্ণনা করতে গিয়ে ওই ভাষার মুখর অধ্যাপক সমালোচকরা তো যেন ভাষাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শিব রায় ওইরকম মারাত্মক সমালোচনা এখানে বসে করলে তো ক্ষতি হয় না, বরং সুফলই হয় তার। খানিকটা আত্মসমালোচনা দরকার বৈকি লেখকদের! তাই বলে সর্বভারতীয় একটা ফোরামে ওইরকম কেউ বলে? ভদ্রলোকের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

সে সব দিনের কথা মনে করে এতদিন পর ভারী মজা লাগছে। লিখতে লিখতে একবার মনে হল একবার যদি শিববাবুকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যেত উনি কি বলেছিলেন সেই সেমিনারে! কিন্তু কি করে করব? আমি অচল, ওঁর ফোন নেই। আর সম্পাদক মশাই যে সময় বেঁধে দিয়েছেন তাতে চিঠি চালাচালিরও সময় নেই। অগত্যা ওইরকম সময়ে Quest পত্রিকার রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর একটা প্রবন্ধ Tagore and Modern Bengal পড়ে দেখব ঠিক করলাম। তাতেও তো ওই সময়ের মেজাজ খানিকটা ধরা পড়বে! কিন্তু এটা তো দেখছি বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই শেষ করেছেন, সাধারণভাবে বাঙালিদের খোঁচা দিয়েছেন বটে "However gloomy the future of the Bengali people may appear at the moment, a literature which in recent years has produced a poet like Jibanananda Das and a novelist like Manik Banerji can have but little cause for despair."

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঙালিদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে যখন ঘোষণা করেছেন তখনও অন্যদের রেয়াৎ করেছেন এমন তো নয়। আরও আগে ১৯৫৮ সালে লেখা Decline of the Indian Intellectuals-এ তো দেখছি কোনও দিকেই কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না তিনি। যতদূর মনে পড়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সন্ধানে এসে এডোয়ার্ড শীল্‌স্ তখনও সারা ভারত চষতে শুরু করেন নি। তাঁর আগেই তাঁর চেয়ে বেশি অকরুণ মূল্যায়ন শিব রায় করে রেখেছিলেন। পড়তে পড়তে মনে হল বুদ্ধিজীবীদের প্রতি প্রযুক্ত তাঁর প্রিয় গালাগাল 'insectolatry' কিংবা 'purveyors of cliches and of the sloppy drugs of tribalist beliefs' আজ আরও কত বেশি প্রযোজ্য। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার ওই প্রবন্ধের মূল বক্তব্যকে পালটাবার দরকার নেই। কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে লেখাটাতে সমকালের পুঙ্খানুপুঙ্খ কিছু যোগ করে দিলে অন্তত দুচারজন বিবেকী বুদ্ধিজীবীর আত্মানুসন্ধানে সাহায্য হবে। আর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সরকারি দুধেভাতে বুদ্ধিজীবীদের পোষা যে কতদূর ক্ষতিকর সে বিষয়ে সবাই হয়ত আর একটু সচেতন হবে।

আবার একটু ব্যক্তিগত কথা। ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে আমরা মাস দুই আড়াইয়ের জন্য দেরাদুনে গিয়েছিলাম আইয়ুবের স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। তার আগে আমি এলেন রায়কে মাত্র বার দুয়েক দেখেছি। মানবেন্দ্রনাথকে কোনওদিন দেখি নি। আগে প্রতি বছর শীতকালে এলেন এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় কলকাতায় আসতেন শুনেছি। বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীজনের মধ্যে সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু আমি কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই মানবেন্দ্রনাথের সেই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে, মুসৌরীতে পাহাড়ি পথে চলতে চলতে খাদে পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে জখম হন। ঘটনার কয়েক মাস পরে আইয়ুবের কাছে লেখা এলেনের চিঠিতে যে বর্ণনা পড়েছিলাম আজও তা মনে পড়ে। এরপর আর তিনি কলকাতায় আসতে পারেন নি, দেরাদুনেই শয্যাশয়ী হয়ে গৃহবন্দী ছিলেন। খুব বেশিদিন আর বাঁচেনও নি তারপর।

তাঁর মৃত্যুর পর এলেন একা এসে যখন আনন্দ পালিত রোডে উঠতেন তখন সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম আমরা। শিব রায় যে তাঁদের পুত্রতুল্য ছিলেন এবং নানা ব্যাপারে তাঁর উপরে কতখানি নির্ভর করতেন তা তখন তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝতে অসুবিধা হত না। মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত *Radical Humanist* পত্রিকা তখনও এলেন ও শিব রায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দেরাদুনে র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্টদের বাৎসরিক সম্মেলন যেন একটা উৎসবের মত ছিল যদিও তাতে নানা গুরুতর বিষয়ের আলোচনাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম থেকেই শিব রায়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল এই ক্যাম্প পরিচালনায়। মানবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়।

এলেনের আগ্রহেই আইয়ুব দেরাদুনে যাবার কথা ভেবেছিলেন। এলেন তাঁর বাড়ির অনতিদূরে একটি সুন্দর আস্তানা আমাদের জন্য খুঁজে দিয়েছিলেন পাহাড়ী নদী রিসপানার ধারে। কিন্তু রোজই বিকেলের পর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তেরো নম্বর মোহিনী রোডের বাড়িতেই আমাদের কাটতো। কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। এমন নিটোল সম্পূর্ণ একটি মানুষ আমি বেশি দেখিনি। এমন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে শিব রায়ের চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের কথা বলতে বলতে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠীর কাজকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই শিবের প্রসঙ্গ উঠত। তাঁদের কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হয় কিনা। বাঙালি সাংস্কৃতিক কাজেকর্মে শিব কতখানি জড়িয়ে আছেন, কলকাতায় তাঁর ভবিষ্যৎ কি, ইত্যাদি অনেক কথা। প্রায় নাবালক পুত্রের জন্য মায়ের যেমন দুশ্চিন্তা থাকে তাই ছিল তাঁর। তাঁর একটা দুর্ভাবনার কারণ ছিল শিবের অল্প বয়সে বিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়া, অন্য দুর্ভাবনার বিষয় ছিল কলকাতার 'inbred Bengali adda'! সাংসারিক দায় দায়িত্বে জড়িয়ে গিয়ে আর আড্ডায় মজে শিবের সমস্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনার সর্বনাশ হবে এই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তা। আমার খুব মজা লাগত তাঁকে গজগজ করতে দেখে। কিন্তু বুঝতে পারতাম যে শিবের জন্য যে বিশ্বভূমিকার স্বপ্ন দেখতেন তিনি তার পথে আর দেরী সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

এর এক বছর পরেই এলেনের নিদারুণ মৃত্যু না ঘটলে তিনি দেখে যেতে পারতেন যে ওইসব কোনও বাধাই আর অন্তরায় হয়ে রইল না। যে 'inbred Bengali adda'-র কূপমণ্ডুক জগৎ সম্বন্ধে এলেনের এত দুর্ভাবনা ছিল সেখান থেকে কত অনায়াসে অনেক দূরে চলে গেলেন। প্রথমে অধ্যাপনা করতে গেলেন বোম্বাইয়ে, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। প্রাদেশিকতার বন্ধন কেটে গেল। এটা যে এলেন দেখে যেতে পারেন নি তার জন্য আমার এখনও দুঃখ হয়।

এই অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁদের ভাগ্য অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিনটি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতচর্চা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করে ভারত সরকার। তার একটি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইয়ুবকে এর দায়িত্ব নিতে বলায় তিনি খুব ইতস্তত করছিলেন। একে তো তাঁর পলকা স্বাস্থ্য, তার উপর দর্শন থেকে সরে গিয়ে ভারতচর্চা! অনেকটা আমার আগ্রহেই শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু যাবার ৬ মাসের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আর কিছুতেই তাঁর মন লাগল না, ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু যে দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর থেকে মুক্তি পাবেন কি করে?

মেলবোর্নে ভারতচর্চা বিভাগ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন দার্শনিক বয়েস গিবসন। তিনি বলতে লাগলেন, 'বিভাগ শুরু হতে না হতেই এভাবে একে ফেলে আপনি কি করে চলে যাবেন? বিভাগের কি হবে?' আইয়ুব ভেবেচিন্তে বললেন, 'এই কাজে আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য একজনকে রাজি করাতে পারি কিনা দেখি'। শিবনারায়ণ রায় রাজি হয়েছিলেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বোম্বাইয়ের দায় চুকিয়ে তখনই চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বছর দেড়/দুই পরে গিয়ে তিনি হাল ধরলেন। তবে তার আগেই ডঃ জর্ডেন্‌স্ নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ বেলজিয়ানের হাতে বৈঠাটি গুঁজে দিয়ে আইয়ুব ঘরে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। শিব রায় যে মেলবোর্ন ভারতচর্চা বিভাগ গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে তখন রাজি হয়েছিলেন এতে বিভাগের মঙ্গল হয়েছিল সন্দেহ নেই। আর আমার মনে হয় তিনিও গড়ে তুলবার মত একটা সার্থক কর্মক্ষেত্র পেয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ যে এলেন দেখতে পেলেন না এটা আমাদের সবারই দুর্ভাগ্য।

ভারতচর্চাকে তিনি তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী যে রূপ দিতে পেরেছিলেন বলে শুনেছি তাতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে শুধু নয়, সমসাময়িক ভারতের জীবন্ত আগুনকেই তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের সামনে। অবশ্য যে জ্ঞান তত অর্থকরী নয় তাতে ছাত্রের দেখা কদাচিৎ মেলে। তাই তাঁর বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যাই বেশি ছিল। তাঁর দুয়েকটি কৃতী ছাত্রী পরে কলকাতায় এসেছিলেন ভারত ভ্রমণ করতে এসে। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে যে-স্বচ্ছ দৃষ্টি ও গভীর কৌতূহল লক্ষ্য করেছিলেন আইয়ুব তাতে ভারতচর্চা বিভাগের প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছিল বলে ধারণা হয়েছিল তাঁর। শুধু অস্ট্রেলিয়ায় নয়, নানা আন্তর্জাতিক সভাসমিতির ডাক পেয়ে ভারতচর্চার একটা বৃহৎ প্রেক্ষিত তৈরি করে দিতে পেরেছিলেন শিবনারায়ণ রায় ; প্রাচীন ভারতের গৌরব কীর্তনেই তা সীমিত ছিল না। বলা বাহুল্য তাঁর স্বভাবেই সেটা সম্ভব ছিল না।

শিব রায়ের ভাবনা-চিন্তা ও কাজ বিদেশে আদর পেয়েছিল ঠিকই এবং তাঁর নিজের পক্ষেও বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে প্রায় দুই দশকের যোগাযোগ স্বাস্থ্যকর হয়েছিল নিশ্চয়ই। তবু তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতি যে দেশের মনন চর্চার ক্ষেত্রে একটা ক্ষতি, তাঁর আসল কর্মক্ষেত্র যে স্বদেশেই সে-কথা আমাদের প্রায়ই মনে হত। বিদেশকে যতখানি দেবার ছিল তার চেয়ে দেশকে কিছু কম দেবার ছিল না তাঁর। এ বিষয়ে যে তিনি এবং তাঁর গৃহিণীও সচেতন ছিলেন এটা আমাদের সৌভাগ্য। গীতাকে ধন্যবাদ যে চাকরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই, পারিবারিক অসুবিধা খানিকটা অগ্রাহ্য করেও তাঁরা দেশে ফিরে আসাই ঠিক করেছিলেন। ভারতচর্চার কাজটা গুটিয়ে না ফেললে অন্য যে বড় কাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল তাতে হাত দেওয়া সম্ভব হত না শিব রায়ের পক্ষে।

আইয়ুবের দুর্বল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি চিরকাল যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন। কিন্তু শিব রায় যে কতটা শারীরিক কষ্টকে অগ্রাহ্য করে কাজ করে চলেছেন সেটা বোধহয় সব সময়ে তাঁর নিজেরও মনে থাকে না। গত কয়েক বছর ধরেই ওঁর নিঃশ্বাসের কষ্ট দেখলে উদ্বিগ্ন বোধ করি। কিন্তু এই নিয়েই মানবেন্দ্রনাথের চারটা মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিপুল রচনার সম্পদকে যেভাবে সম্পাদনা করে চলেছেন তার জন্য বহুদিন কৃতজ্ঞ থাকবে বিশ্বের বহু জিজ্ঞাসু মানুষ। এমনভাবে গুরুঋণ যে পরিশোধ করতে পারবেন তিনি তা কি এলেনও কল্পনা করতে পেরেছিলেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের বিশেষ কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই। চিন্তা ভাবনার বড় বড় ঢেউ যেমন ওঠে তেমনি আবার এক সময়ে পড়েও যায়। মানবেন্দ্রনাথের সারা জীবনের যে কর্মের ফসল আরও দীর্ঘস্থায়ী তাকে যে সংরক্ষণ করে গোলায় তুলে রেখে যেতে পারছেন এতে নিশ্চয়ই অনেকখানি তৃপ্তি হচ্ছে তাঁর—নইলে একাজ হাতে নিতেন কেন? কিন্তু তাঁর নিজেরও অনেক কাজ পড়ে আছে এই অতৃপ্তি তাঁকে বেদনা দেয়, এটাও অসঙ্গত নয়।

জীবন যে বড় সংক্ষিপ্ত, স্বাস্থ্যের পুঁজিও তাঁর বেশি নেই। নিজের কাছেও তো মানুষ দায়বদ্ধ। কিছুটা 'স্বার্থপর' না হলে তো সেই দায় আদায় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। নিজের সম্ভাবনাকেও যেন যথাসম্ভব চরিতার্থ করতে পারেন তার জন্যে উদাসীন ভাগ্যের কাছেও আয়ুভিক্ষা করতে ইচ্ছা করে।

"মনস্বী বিপ্লবী শিবনারায়ণ রায়", সম্পাদক স্বরাজ সেনগুপ্ত (২০০১), পৃঃ ১৯-২৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৈত্রেয়ী দেবী ও 'ন হন্যতে'

মৈত্রেয়ী দেবীর পিতা সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মনে আশা ছিল যে তাঁর কন্যা একদিন কবিযশ অর্জন করবেন। মা বাবাই মৈত্রেয়ী দেবীর প্রথম মুগ্ধ পাঠক পাঠিকা। তাঁদের যত্ন ও উৎসাহেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল নিতান্ত বালিকা বয়সে। তাঁর প্রতিটি কবিতা পিতার কণ্ঠস্থ ছিল, সেই সব কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে পিতা ও কন্যার বহু আলোচনা হত। উৎসাহী সমঝদার শ্রোতা পেলে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে তাঁদের শোনাবার জন্য উৎসাহ দিতেন পিতা। ফলে প্রথম থেকেই তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীর মনে যথেষ্ট আস্থা ছিল। মনে হয় বেশ ভারী দার্শনিক কবিতা লেখায় পিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন, নানা রকম তত্ত্বকথা বুঝিয়ে বলতেন, সংস্কৃত কাব্য আলোচনা করতেন। কন্যাকে 'মৈত্রেয়ী' নামের যোগ্য করে তুলতে তাঁর একান্ত চেষ্টা ছিল। এই বিষয়ে মায়েরও উৎসাহ কিছু কম ছিল না। তিনি নাকি বালিশের তলায় খাতা পেন্সিল নিয়ে রাত্রে কন্যার পাশে শুতেন। যদিই মাঝরাতে কন্যার মনে কাব্যের আবেগ জাগে তবে যেন তড়িঘড়ি তাকে অক্ষরের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে পারেন। প্রতিভার এমন সযত্ন পরিচর্যা তখন দুর্লভ ছিল, আজকাল অবশ্য সব মা-বাবাই তাঁদের সন্তানদের জিনিয়াস বলে মনে করেন।

আবার সাহিত্য চর্চাকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়াও সে সময়ের পক্ষে বেশ অভাবনীয় ব্যাপার। মৈত্রেয়ী দেবীর সমসাময়িক বেশির ভাগ লেখক লেখিকাই নিশ্চয় স্মরণ করতে পারবেন যে তাঁদের সাহিত্য চর্চাকে সাবধানে অভিভাবকের দৃষ্টির অগোচরে লালন করতে হতো এবং ধরা পড়ে গেলে প্রায়শই যা লাভ হতো তাকে 'আদর' কোনো অর্থেই বলা চলেনা। কিন্তু এই দার্শনিক ভদ্রলোকের সংসারটাই ছিল একটু আলাদা ধরনের এবং তাঁর গৃহিণীও এবিষয়ে তাঁর অনুগামিনী ছিলেন। এই সংসারে দর্শনচর্চা ও কাব্যসম্ভোগের ফলাও আয়োজন ছিল, অহরহ সেখানে বাংলা ইংরিজি সংস্কৃত সাহিত্যের ফোয়ারা উপচে পড়ত। মস্ত বড় পারিবারিক পাঠাগার ছিল হাতের কাছে, প্রতিদিন দেশ-বিদেশের গুণীজনেরা এই সংসারে আনাগোনা করতেন। অধ্যাপক মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও বাগ্বৈদগ্ধ্য বহু মানুষকে টেনে আনতে তাঁর সান্নিধ্যে। চমৎকার আকর্ষক ব্যক্তিত্ব ছিল নাকি তাঁর। ব্যক্তিগত আলাপচারী কিংবা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নৈর্ব্যক্তিক বক্তৃতা-আলোচনা দুয়েই তিনি ছিলেন সমান পারঙ্গম। মৈত্রেয়ী দেবীর মধ্যেও এই পৈত্রিক গুণ অনেকখানি বর্তেছে। সরস্বতীর প্রসাদ রয়েছে তাঁর রসনায়।

আমাদের দার্শনিকদের অধিকাংশই বিশ্বরহস্য কিংবা আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে এত ব্যাপৃত যে কাব্যরস তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনা। বরং কেউ কেউ কাব্যচর্চাকে যেন একটু তাচ্ছিল্যই করে থাকেন। সেদিক দিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে ব্যতিক্রম বলতেই হবে। কথায় কথায় সংস্কৃত কাব্যের অফুরান উদ্ধৃতির ফোয়ারা উৎসারিত হত তাঁর মুখ থেকে। কাব্য ও কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতই সুরেন্দ্রনাথ যুবক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করে চলেছিলেন। সাক্ষাৎ আলাপ ঘনিষ্ঠ হল পরবর্তীকালে যখন কন্যার মধ্যে কবিত্বের স্ফুরণ দেখতে পেলেন তিনি। বালিকা কন্যাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের দরবারে। আর্জি পেশ করলেন, যেন তাঁর কন্যাকে কাব্যের আঙ্গিক সংক্রান্ত মূল নিয়মগুলি শিখিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ।

কন্যাটিও তখন কাব্যের জগতেই বিচরণ করতেন—কবিতাই ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য, তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কখনও হয়তো সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় প্রিয় কবিদের কবিতা অভিভূতচিত্তে নীরবে পাঠ করে চলেছেন, কখনও রাত্রে ছাতে পায়চারী করতে করতে সরবে মুগ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করেছেন হয়তো সেই সব কবিতা, কখনও আবার নিজেরই রচনায় আবিষ্ট হয়ে আছেন। এই অস্বাভাবিক বালিকাটি কবিতাতে নিঃশ্বাস নিতেন, কবিতা পান করতেন—শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তিনি কাব্যের সূক্ষ্মলোকে বাস করতেন। তাঁর সেই বালিকা বয়সের বহু কবিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শুধু আশীর্বাদ নয়, সযত্ন নির্দেশও লাভ করেছিলেন তিনি কাব্যরচনায়। তবু কবিখ্যাতি তিনি তেমন পাননি। বাঙালি পাঠক আর তাঁকে কবি বলে জানেনা।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে প্রথম যে বইটি তাঁর জন্য স্থায়ী আসনের ব্যবস্থা করে দেয় বাংলা সাহিত্যের আসরে, তার নাম 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'। দার্জিলিং জেলার এই মংপু অঞ্চলে ছিল সিঙ্কোনার চাষ এবং সিঙ্কোনা গবেষণা কেন্দ্র। সেখানে তাঁর স্বামী রসায়নবিদ ডঃ মনমোহন সেন ছিলেন গবেষণা কর্মে নিযুক্ত। স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবী সেই পার্বত্য অঞ্চলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। দর্শন-সাহিত্য-মুখর সেই পিতৃগৃহের অভাব খুব বড় করে বাজত, তা ছাড়া কলকাতার একটি কন্যা ঐরকম দু-চার ঘর মানুষের মাঝখানে যে নির্বাসিত বোধ করবে এতো স্বাভাবিক।

যদিও মংপু ছিল অত্যন্ত দুর্গম এবং মনে মনে চিরনবীন হলেও রবীন্দ্রনাথ তখন সত্তর-উত্তীর্ণ তবু তিনি চারবার মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু গুণীজনের সমাগম হতো সেখানে। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে রাখতেন মৈত্রেয়ী দেবী। সে তো টেপ-রেকর্ডারের যুগ নয়, ধরে রাখতে হতো মনে আর কলমে—আবার সামনে বসেও তো লিখে নেওয়া চলত না। কৃপণের ধনের মতন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে প্রতিদিনের কথাগুলি তিনি সঞ্চয় করে রাখছিলেন, রবীন্দ্রনাথ চলে এলে সেই কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেও অনেকটা সময় কাটানো যাবে এই আশায়। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই তার একটা বড় অংশ তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে। রাজশেখর বসুর মতন উন্নাসিক মানুষ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ পাঠকেরও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি এই বই লিখে। রবীন্দ্রনাথের এমন সরস প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণা আর বিশেষ নেই।

তারপর নানা বিষয়ে আরো আটদশটি বই মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন বটে কিন্তু বাঙালি পাঠকের তেমন নজরে পড়েনি সেগুলো। হঠাৎ পঁচিশ বছর পরে তাঁর উপন্যাস 'ন হন্যতে' পড়ে আর একবার তাঁর পাঠকসমাজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে তিনি একটিও গল্প বা উপন্যাস লেখেননি, তাঁর ধারণা ছিল গল্প তাঁর কলমে আসেনা। এই বইটিও উপন্যাস না আত্মজীবনী তা নিয়ে পাঠকের কৌতূহলের অন্ত নেই; সভা সমিতিতে, ব্যক্তিগত আলাপে, চিঠিপত্রে বারবার এই প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে। উনি তার উত্তর এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন এই জন্য নয় যে এই কাহিনীটিকে একটি রহস্যের যবনিকা দিয়ে আড়াল করে রাখতে চান। বরং উত্তর দিতে যথার্থই গভীর সঙ্কোচ বোধ করেন।

তাঁর বন্ধু হিসেবে আমি শুধু একটি কথা বলতে পারি যে এ বই লেখা তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিছুকাল খুব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন এবং তখন তাঁর হৃদয় ভার কিছুটা যাতে নামাতে পারেন সেজন্যই আমরা দু-এক জন তাঁকে এই কাহিনী লিখতে উৎসাহ দিয়েছিলাম এবং এই কাহিনী লিখতে তাঁর যন্ত্রণাও যেমন হয়েছে, লিখে তৃপ্তিও পেয়েছেন তেমনি। আমি তখন তাঁকে দিনের পর দিন দেখেছি, যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসটির জন্ম হয়েছে তার একমাত্র তুলনা হয় বোধ হয় সন্তান জন্মদানযন্ত্রণার সঙ্গে। যখন তিনি এই কাহিনী লিখছিলেন সে সময় বই আকারে প্রকাশ করে পাঠকের হাতে তুলে দেবার সুদূরতম বাসনাও তাঁর মনে ছিলনা। আমরা মনে করেছিলাম লেখা হয়ে গেলে এটিকে তালাচাবি দিয়ে রেখে দেওয়া হবে ভবিষ্যতের জন্য। একদিন যদি দেশে বা বিদেশে মৈত্রেয়ী দেবীকে নিয়ে কেউ গবেষণা করতে বসেন তখন মৈত্রেয়ী দেবীর জবানবন্দীটাও তাকে পড়ে নিতে হবে সত্যটা সম্পূর্ণ জানবার জন্য। এই রকম একটা আবছা কথা আমাদের মনে ছিল এবং তিনিও লিখে ফেলে catharsis-এর আরাম পেয়েছিলেন। এর বেশি তখন আমরা কেউ কিছু ভাবিনি।

কিন্তু অচিরেই প্রকাশকের খোঁজ করতে হল যখন কলকাতার এক পরিচিত পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো একটি ফরাসী উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত করলেন একজন কলকাতাবাসী বিদেশী লেখক যিনি বাংলায় লেখেন। অস্পষ্ট ইঙ্গিত বহু সঙ্গত-অসঙ্গত অনুমানে উৎসাহ দেয়। লোকেরা সম্ভব-অসম্ভব নানারকম জল্পনা কল্পনা করতে থাকে। সে সবের অবসান ঘটানোর জন্যই শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসটি প্রকাশ করার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন হল। বলা যায় একটি ফরাসী উপন্যাসের প্রত্যুত্তরে লেখা হয়েছিল 'ন হন্যতে' উপন্যাসটি।

বইটি প্রকাশ হতে না হতে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো পাঠক মহলে, একের পর এক সংস্করণ হতে লাগল, ছয় বছরের মধ্যে নয়টি ভারতীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। এই বইয়ের জন্যই সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার পেয়েছেন। সাধারণভাবে পাঠক সমাজের অকুণ্ঠ সমাদর পেলেও এই বই লেখার জন্য তাঁকে কোনো কোনো আত্মীয় বন্ধুর তীব্র প্রতিকূলতাও সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর পরম সহায় ছিলেন তাঁর স্বামী মনমোহন সেন যিনি সম্প্রতি পরলোকে গেছেন। শুধু সাহিত্য নয়, সমাজ সেবাতেও তাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা। যে বয়সে ভারতীয় মহিলারা হয় পূজো আর্চা, নয় পরচর্চা কিংবা পুত্রবধূ-তাড়না ইত্যাদি করে সুখে কাল কাটান সেই বয়সে মৈত্রেয়ী দেবী সমাজে ও সাহিত্যে নিজের জন্য নানা সৃষ্টিক্ষেত্র অধিকার করে চলেছেন। ঠিক এখনই 'যুগান্তর' পত্রিকায় তাঁর শেষতম রচনা 'স্বর্গের কাছাকাছি' প্রকাশ হচ্ছে। এই বইয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া শতাধিক পত্র এবং সেই পত্রের প্রসঙ্গে নানা মন্তব্য। এই বইও তাঁর পাঠকদের আদরের সামগ্রী হবে বলে মনে হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ELLEN ROY : AN ACCOUNT OF A BRIEF FRIENDSHIP

It is strange that I cannot remember exactly the year in which I met Ellen for the first time. My natural sense of history is poor; nor do I maintain a diary. It was the first time that Ayyub[1] was seeing her after Roy's death in January, 1954. He took me along with him, not yet as his wife. I was curious of course, but was also full of awe verging on terror. But I was making a valiant effort to get used to the shape of things to come if and when I marry Abu Sayeed Ayyub. I had already met quite a few of his friends who were known to be formidable intellectuals and belonged to the elite of the creative world. Of course my endeavour during those meetings used to be to look a little less unintelligent than what I am. But here was a friend of his who was not only an intellectual but also a revolutionary of many years' standing, and a memsaheb to boot! So how critically Mrs. Ellen Roy would view this unexpected and rather intriguing adjunct of a chip of a girl, to a good old bachelor friend of theirs. I was not at all sure on that day.

We went to see her, I think, at Ananda Palit Road at Entally. I guess neither the Deys nor the Dattas[2] were in India at that time. However, Mrs. Roy set my initial misgivings at rest with a kind smile and some polite questions, after Ayyub had introduced me to her as his student from Santiniketan. After that of course I was a silent but attentive audience to their conversation, which sometimes became very personal, sometimes global.

Much later when I tried to recollect what happened on that first day and what a poor impression I must have made on her, it occurred to me that since for about two decades she had been in the midst of a politico-intellectual "movement" in this country, she must have had sufficient experience of meeting young men and women with as meagre an intellectual endowment as that of myself. All their followers could not possibly have been Amlan Dattas[2] or Sibnarayan Rays or G. D. Parikhs. Therefore, she must have acquired the art of cultivating and drawing out to their best whatever capacity those who were not so bright had.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

However, on that first occasion of our meeting she did not put me off; rather I returned with a desire to see her again and know her better. But her stay in Calcutta was not long enough to allow us to visit her very many times. Perhaps soon afterwards, she went abroad for some months.

Another thing that impressed me immensely that day was the restrained emotion with which she talked about her husband, his unbearable and prolonged suffering after that awful accident and his last days. Some time earlier in reply to Ayyub's letter of condolence she had written to him how she had felt when she found her husband suddenly vanish into a precipice at Mussoorie while they had gone out for a stroll. She had written: "Suddenly I discovered that all my hopes lay crumbled sixty feet below the street where I was standing" We have lost this precious letter.

It was about four years later, in 1959, that I really came to know, love and adore Ellen when we went for a holiday to Dehradun. The Roys had invited Ayyub many a time before to go to them, but perhaps he needed a nagging wife to goad him to undertake such a 'hazardous' journey! But by then M. N. Roy was no more and the real attraction for him was gone. And yet because Ellen was so lonely there was all the more reason that Ayyub should accept her invitation now. Besides he himself had been unwell for quite some time with various stomach ailments. So we thought a change of climate would do him good. Ellen insisted that we should go to her to stay there for a few months.

Before jumping into the 'adventure' Ayyub had to be very patiently assured on many counts. Almost every other day either a long typed out letter or a hurriedly scribbled note would come from Dehradun bringing my husband some more explanations, assurances and promises about climate, accommodation, food, servant, physician etc., etc. One important point was whether Ellen could rent a place for us not too far from her own place so that we could be under her care, and yet not too near her so that we would not be a constant pain in her neck. Then only we could think of a prolonged holiday. But for the first few days we would have to stay with her till the rented place was made sufficiently habitable for Ayyub! Only when Ellen succeeded in allaying all his major misgivings the railway reservations were made.

With all my eagerness to go to Dehradun I could also feel in me a lurking fear about meeting the lioness at her den. How would a person of such varied and serious interests: whose home must be a busy hive of plans, projects, programmes, etc., be able to accommodate, physi-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

cally and psychologically, a whole family as exacting as the Ayyubs? In particular, I was not sure whether it would be easy for a childless elderly lady of abstract interests to suffer the constant presence of a little boy pattering around her home, which I expected to be a completely adult world. As for the forced company of a non-intellectual being like myself, I thought I would inflict it on her as little as possible and maintain a discreet and polite distance. But at times how pleasantly fate disposes of all our gloomy apprehensions! Even today when I go through her letters I wonder that she showered so much affection on me. It appears to be too good to be true.

It was in early September of 1959 and around ten in the morning that one day we approached the charmed world of 13 Mohini Road. Mohini means the enchantress. Ellen's enchanting personality was yet to be revealed to me gradually, but her cottage and its garden won my heart at the very first sight. We were welcomed by a few wide open morning glories on a creeper that encircled the fat trunk of the sheesham tree at her doorstep, which watched over the bungalow like a tall sentinel. Besides, there was the garden full of flowers. After a heavy shower in the morning the garden was glistening in the limpid sunshine.

In recollection I can once again not only see and hear everyhting vividly but even smell and feel on my skin the impressions of that first day when we went round the bungalow with her immediately after we arrived. The rooms were rather cold, dark and pensive—may be due, partly, to the dark clouds which at times returned to the sky. There were also the large trees which cast their sombre shadow on the entire premise. We could also feel the cold absence of someone who made sense to so many big as well as little things around the place. The books in the library, a particular chair near the fire-place, a walking stick in one corner, the large bed with pillows for two—all these told us that the stage had been set for two, and only one person was now trying to manage the show to the best of her ability. Even this unusually gifted widow, though she had succeeded in building up a life of her own and was trying to carry on the unfinished work of her husband, did not find the full use of her talents without the man who reigned supreme there.

Her back verandah, part of which was turned into a greenhouse, displayed a large assortment of roots, bulbs, seeds and seedlings. It had a refreshingly earthy aroma. Another part of the verandah was a carpenter's workshop turning out furniture according to her designs from every bit of wood that she could lay her hands on. In fact she had

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

several sheesham trees in her garden, one of which had been uprooted by a storm sometime earlier. She showed us some very comfortable chairs which she had got made with that wood. So from the very first hour she did not neatly fit into the personality pattern I was in the habit of associating with a woman whose primary concern was not home-making, or one who never made a home in the conventional sense. However, I soon found out that she did make a home and a much better home at that and on a much bigger scale. Her bungalow constantly hummed with the activity of her gardener, carpenter, cook, etc., she herself now supervising these people, now working on her typewriter, or perhaps talking to the innumerable visitors.

On the very first day the lunch time brought a most interesting experience for our son Pushan. Her kitchen and dining room along with a narrow threshold belonged to another little cottage which was separated from the main bungalow by a strip of garden. In the dining room the table was beautifully laid for four persons. But we also noticed that more than half a dozen aluminium plates were laid out on that narrow threshold. Ellen took a gong and beat it lustily for about half a minute with a mysterious smile on her face. We were amazed since we were supposed to be the only guests and we were already in the dining room. But in no time we found out for whom she was announcing the lunch, when we saw cats of all sizes and colours trooping in from all directions and lining up neatly in front of those plates like a disciplined band of school children. Then their pottage was served by Ellen and her cook. Pushan and his father, cat lovers as they are, watched with much amusement the eating and cleaning operations of a whole feline tribe. I maintained a safe distance. This was Ellen's only interest about which I was not particularly enthusiastic.

The lunch for Ayyub was specially cooked according to directions sent earlier! When he commented with satisfaction that the mince-meat curry was exactly as they used to have as children, Ellen was very pleased indeed. She said it was the highest compliment because nothing ever was exactly as good as mother made it. Pushan, however, found her apple sauce with cream more to his taste and remarked in Bengali: "'Bhalo, tak tak kintu" (good, but slightly sour). The 'but' here does not have the usual sense because he was not at all averse to the 'sourness' of any edible object. Ellen was greatly amused by his remark and often she would offer something to him and ask: "Pushan, will you please taste this and see whether this one too is balo, tak tak kintu?"

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

She would pronounce the Bengali 'bh' and 't' softly like Pushan.

After lunch we sat on the verandah overlooking the front garden. Ellen explained with some pride how she planned her blooms so that never throughout the year her garden would remain completely bare of any flowers even for a week. She promised us that soon in winter we might expect to have a real feast for our eyes. The chrysanthemums would come first and then the narcissus and daffodils. These would be followed by the snowdrops, iris, amaryllis, hyacinth and a host of others which we don't see in Calcutta. We did not disclose to her immediately that we were not brave enough to face the Dehra—dun winter.

I had noticed earlier a wicker tray heaped with tiny 'shiuli' flowers (called 'harsingar' in Hindi) on a table on the verandah. Ellen said that Roy used to be filled with childhood reminiscences when the 'shiulis' were in bloom every year. In the morning the tall man would sit precariously perching himself on his heels and stoop to pick the flowers carefully from the ground underneath the 'shiuli' bush. He had told her that those flowers heralded the greatest festival of Bengal—the Durga Puja. While we three were talking away, Pushan went on collecting pink and yellow pebbles from her garden path. He had already several piles of them in one corner of the verandah and now he was planning to sit down there; to construct something with the building material gathered so painstakingly. Ellen got up in the middle of a sentence and went in. Then she returned with a cut piece of an old carpet and spread it near Pushan. "It is to protect his little buttocks," she said, "the floor is rather damp, he might catch a cold." So this was the childless elderly woman of abstract interests! Ayyub, of course, went on talking about the future of the communist movement in India in the context of the Khruschev revelations in the 20th Congress, unconcerned with what happened to whose buttocks. After about another half an hour Ellen suddenly jumped up in excitement. "Do you hear the river?" she asked.

We were amazed since we did not know what river to hear. "The river is in spate. Come, come, you must see it." Ayyub was too exhausted after two days' journey to undertake any further adventure. So Ellen and I ran down Mohini Road which ended at the bank of 'Rishpana' Yes, Rishpana was in spate. The morning rains had swelled the mountain stream and what a roaring noise it made tumbling over the loose rocks and carrying them along with her. I have lived on the bank of a large river ever since I was born. But the Ganges on the plains has a matronly fullness of form and serenity of spirit. And even during the monsoon

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

one does not hear much noise above a ripple. This Rishpana on the other hand is normally a dry bed of rocks over which several thin lines of water trickle down most of the days. Men and mules walk over her bed and maintain regular contact between the two banks. But after a heavy shower or two Rishpana is a different thing altogether. Then it runs like a fierce mad horse and is capable of carrying away anyone who would dare as much as dip a foot in the stream. I could not imagine that there was such a spot of uncommon natural beauty so near a city. Ellen was very fond of this tempestuous stream and perhaps felt some affinity of character with it.

While returning home from there she showed me on the left hand the first house on the bank of Rishpana. The large mansion stood on an extensive garden and it belonged to the Maharaja of Dumraon. The Maharaja's 'palace' was flanked by a two-storeyed outhouse, the top floor of which used to be the quarter that housed the manager of the estate in good old days. But at that time neither the Maharaja nor the manager was in occupation of his rightful place in those premises. The 'chowkidar' and the 'mali' were all in all. So Ellen had managed through them to rent out the manager's quarter for us to stay for some months.

Our immediate neighbour was the famous D.P., or Dhurjati Prasad Mukherji, who at that time was living a quiet retired life after a not so successful treatment of a malignant tumour in the throat. Dhurjati Prasad, sitting on a wicker chair in his garden, with the Shivalik range as his backdrop at a distance, used to rouse some deep emotions in me. There sat the man who was once a legend for his brilliant conversations, now silently hanging his head on his bosom, so exhausted that he could not even hold his head straight for long. The vivacious man of yesterday now made a picture of despondence in the midst of nature's beauty, once again underlining the absurdity of our existence.

Though Ellen would not let us go immediately to the flat she had rented for us, she had already furnished the place tastefully and comfortably with her own furniture and draperies. We later discovered with what care and affection she had made all the arrangements to make us happy in our temporary dwelling. What particularly elicited unreserved praise from my husband were the chairs she had designed. They had just the correct angle of recline—you neither had to sit up with a straight back as if on an ordeal chair, nor lie down helplessly at an angle of 145° Often sitting in one of Ellen's chairs on the open terrace of our flat Ayyub would go into ecstasies over the grandeur of the Mussoorie

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Hills under the canopy of clouds and then the next moment would remark on the uncommon comfortability of the chair.

Ellen was devoted to her garden. In the mornings she would take me round the backyard orchard and introduce all her favourite trees to me. She would often tell me how those who appreciated the good things of life admired the delicious mangoes of her garden. In her orchard among many other new plants I saw for the first time grape fruits which, we were told, a self-respecting Englishman must have as the first thing in the morning for his breakfast. One day David McCutchion[5], who visited us at Dehradun, demonstrated for our benefit how a grape fruit is eaten after cutting it into two hemispheres and then sprinkling a little sugar on the pulp! Ellen's dwarf orange plant in a large wooden tub was a real curiosity piece. Every year this Lilliputian tree would yield about fifty oranges of a size smaller than a lemon. And she would make her own home-brewed liquor from these oranges.

On the very first evening, after dinner, she offered us this precious liquor with all the accompanying ceremony. But what wastage! She brought out a narrow and oblong wooden box with a sliding lid, placed it on the low centre table and opened the lid with appropriate artistic 'mudras' of the two hands. The inside revealed six little Japanese cups of white porcelain. On each of the cups was painted a fat-bellied wise man of Nippon. She asked us to choose our wise men to drink with. Then she chose her own cup and poured a little of her self-made golden potion into each little cup. It looked beautiful and smelt inviting. But Ayyub appeared to be quite nervous and started saying feebly that the only injunction of the Shariat that he observed was abstention from drinking. And also that his stomach could not digest pork. To that extent he was a 'devout Moslem! Ellen assured him that, correctly speaking, it was not an intoxicant at all. I sipped a little and found it pleasantly sweet. It did not make any difference in me. But my husband started complaining of stomach ache as soon as he had cautiously touched the cup with his lips. He said that his head was reeling. He did not lift the cup for the second time. Ellen was aghast and admonished him: "Don't be silly, Ayyub, this can't do any harm even to a baby." But she had yet to know what a baby she had taken into her hands.

Ellen's mornings were equally distributed between her spacious garden and her portable typewriter. She was quite a fast typist though she used only four fingers. Early in the morning she would spread out all her papers and correspondence around her typewriter on a large

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

table on the verandah overlooking the lawn. On another table would stand a cup and a coffee pot under a tea-cosy. She did not eat a proper breakfast. She would go on typing since early morning and would pour endless cups of coflee for herself. But once in every twenty minutes or so she would jump up to give some instruction to the gardener, or to dig out something with her own hands, or to inspect the preparation of a new plot in some distant and hidden corner of the garden, or perhaps: just to stand quietly for a few minutes to admire the gladioli of many colours which she grew around what she called her "little Taj Mahal"—the bower under which lay buried the ashes from her husband's pyre. Though she laughed at herself about this bit of sentimentality in her, there was no denying the fact that this particular corner of her front garden was sacred to this pronounced materialist and she tended it with special care. Every evening the first light she would put on was a naked bulb hanging from that bower and it would be burning there all through the night watching over her husband's samadhi.

One afternoon there was a heavy hailstorm. Ellen was particularly upset that all her gradioli of an uncommon purple colour would be ruined. We sat on the covered verandah watching helplessly. But she, ignoring all our entreaties to the contrary, would dash out with a large pair of garden scissors in her hand and cut a few stalks of flowers and rush back. After several such sorties she rescued all the flowers, and miraculously enough did not get hurt herself by the hailstorm. Later in the evening she arranged the gladioli in a vase, and when the storm was over, she put the vase under the bower. A very proper tribute to the memory of a stormy man!

Ellen was really proud of her collection of Cactii, specially the Hawaian Cactus which flowered once a year or perhaps once in several years[6] She told me how these Cactus buds would start unfurling their petals in the evening, and by the time they were fully open it would be midnight, and that such occasions were celebrated as great events at 13 Mohini Road. She would ring up all her friends to come with their cameras and watch the flower open. To make a night-long vigil both physically and spiritually satisfying, Ellen would throw a party with the help of her cook, Alimuddin whom she described as "that biblical figure" I saw half a dozen enlarged photographs in her bedroom of this flower at different stages of opening.

Ellen belonged to that, now almost extinct, generation ol European housewives whose pantries choked with home-preserved fruits, jams,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

jellies, juices, squashes, pickles, sauces, chutneys as well as home-baked pies, biscuits, cakes and what not. She would make rows and rows of mango squash or limejuice or mango pickles to be consumed during the annual study camp of the Radical Humanists. Fortunately for their followers, neither Roy nor his better half believed in starving the body for uplifting the spirit! She could work wonders with her primitive-looking kerosene stove and oven. While hurriedly typing out perhaps an article or an editorial for the Radical Humanist, which at that time used to be jointly edited by her and Sibnarayan Ray and published from Calcutta, she would rush into her kitchen to give her hand to rolling hamburgers with minced venison or to beating cottage cheese with chopped mint for the salad. The dinners were sumptuous. From the soup to the dessert she would plan carefully and execute meticulously with her own hands. She would make her own mayonnaise dressing for the salad. I thought it quite a job when she asked me to drip salad oil from a bottle held a little above a bowl in which she went on beating briskly the yolk of an egg with a fork. All her aperitifs were home-made. She showed me how to preserve in vinegar or oil little onions, radishes, cucumbers—practically everything that she grew in the various parts of her kitchen garden. She wanted me to help her while stuffing capsicum or making salad with tomatoes, hard-boiled eggs and beaten cottage cheese. I found the smell of her kitchen very pleasing.

In the afternoons sometimes we used to go to the city for shopping in Ellen's ancient car driven by a really ancient and devoted driver. At one of those shops she found for Pushan a tiny little tumbler of a whitish alloy. We browsed around the shops talking animatedly about pots and pans, baskets and buckets, spoons and sieves which make domestic chores such a pleasure! She insisted on my buying two sets of Chunar bowls. There were about six bowls of graded sizes in each set. The biggest bowl would hold within it the next smaller size and in this way the smallest would be in the centre. It was a good idea since I wanted to bring back to Calcutta in my not so commodious kitchen box all these newly acquired treasures!

The feminine in Ellen showed itself more fully when we went to buy some warm material to protect ourselves against the Dehradun October which turned out to be cooler than what we had expected. Though she would wear rather drab looking slacks in the mornings, she liked to dress elegantly in the evenings. Of course, compared to her friend Mrs. Uttam Singh, she considered herself quite dowdy. But she did take

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

interest in clothes and had drawers full of "jewellery", not of course of gold and pearls as we Indian women have. She had a wonderful collection of costume jewellery made of wood and shell, steel and inexpensive but uncommon stones.

One day Ellen took us to a big cloth merchant in the heart of the city to select some cotswool. Leaving us to search for the material that would suit our purse as well as the weather, Ellen ordered another shop assistant to show her some dress material. Bales of dress material of different colours and textures were piled up before her. Then standing in front of a full-size mirror she would throw on her, one after another, dress material of various designs and colours, not able to make up her mind, like a little girl, as to which colour she liked most and would also suit her most. At long last she chose a steel-blue piece with white polka dots. No doubt it would suit her beautifully. We requested her to allow us to pay for this dress material because that would spare us the trouble of choosing a gift for her ! She was embarrassed but agreed after a while. Later we went to another shop to buy a shawl for Ayyub. This time Ellen helped him to make up his mind quickly, saying, "That mouse colour would suit you best" I too liked the colour she pointed out, but did not think that it should be described as "mouse colour"

Ellen wanted that we should spend the evenings at her home and return to our place after dinner. Thus we had long hours together and Ellen had a rich fund of experience fo keep us thoroughly engrossed. One day she talked about the Indians she had met before coming to India. Once she even had a chance to work as an interpreter for Rabindranath when he visited Germany. On that occasion she also met for the first time Soumyendranath Tagore[7] She imitated how Soumyendranath rather pompously and in a poetic language described his activities in Europe when the poet wanted to know from him what he was doing those days. But I was a little surprised to hear that these two Bengalis, and such close relations as they were, talked to each other in English. Was it for the benefit of the German girl who was interpreting for Rabindranath? Ellen talked about Soumyendranath more as a person than as a politician. Soumyendranath has registered, in writing, his hearty dislike for M. N. Roy, but I don't know whether Roy has shown any awareness of the existence of the other illustrious son of Bengal.

That day and on several other occasions also it seemed to me that neither Ellen and (by inference) nor Roy himself had much enthusiasm for Bengali culture. They definitely did not have a very high opinion of

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Tagore or his Santiniketan. What surprised me really was that though they were so close to some important literary people of Bengal, they seemed to be quite indifferent to Bengali literature. Was it because they were wholly political persons themselves? I still remember with amusement that Ellen did not approve of "Sib wasting himself among inbred Bengali literary adda" It rings very similar to what my own Gandhian father used to say. Ellen had a vision, it seems, of Sib's career as a political thinker only.

One night while we were taking leave after dinner Ellen gave me two or three foolscape size exercise books and asked me to read through them. She whispered to me that those were meant for me only. I was really surprised when I started reading them. Those were closely scribbled pages of effusive expression of her grief. She wailed over her lonely life in such uninhibited language that it was difficult to imagine that those were written during the long and lonely sleepless nights by the same woman who succeeded in keeping herself so pleasantly and thoroughly occupied all day. She had useful work and faithful friends during the daytime. But at night she had nothing more than the company of the sleeping suit of her husband, which she would religiously take out every evening and lay on the bed as if some one would change into them after dinner. In her work-a-day life she could blend rationality and sentimentality wonderfully.

In so far as her published writings were concerned I was familiar with a cool, and at times, caustic rational thinker. But here was I granted an unexpected privilege ol peeping into the very personal and extremely lonely life of a very strong woman. I shuddered and I felt embarrassed at the strength and frankness of her emotions. At that time I was not mature enough to be able to tell her adequately my reactions, either to her satisfaction, or to mine. Today when I think of her own grief I also remember what she wrote to me after Sudhindra Nath's death: "I hope Rajeshwari will bear up without disintegration. She had so bravely built up herself and her life with Sudhin. It will be difficult to make her feel that it does not lose all sense without Sudhin. I know." Yes, both these women tried their best not to disintegrate, yet it was not easy to get over that sense of emptiness. As for myself, I wish I had an access to these manuscripts once again. I would now read through the whole thing with greater love and a mature heart.

On another occasion Ellen talked about Nehru. Roy's ambivalence towards Jawaharlal was well known. He had expressed publicly his

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

bewilderment at the length to which Nehru would go to accommodate Gandhi's eccentricity and obscurantism. Yet he could not help admitting that Nehru had a modern outlook and rational mind so rare in the Indian political scene. He, it seems, could not forgive Nehru's flexibility, and at heart accused him of surrendering principles for immediate political success. Yet his outstanding qualities as a man and a leader could not possibly have gone unnoticed by Roy. Even in his personal relationship this ambivalence was quite obvious. During his last days when he was bedridden, Nehru had been to see him more than once. Ellen admitted that these were trying occasions for her. Roy would be in fits of temper as soon as he was told that Jawaharlal wanted to come to see him. Sometimes he would petulantly declare: "Who wants him here? Why does he want to come to see me? I don't want to see him!" But all his resistance would melt as soon as Jawaharlal entered the bedroom and stretched his hand with a winsome smile, and Ellen would sigh in relief. Nehru surely had belied Roy's expectations as a leader of India's destiny, but he did not fail in expressing his own admiration for Roy's intellect, moral integrity and physical courage. Thanks to Ellen's histrionic talents we could almost see the two men meeting each other in her bedroom.

Inspite of Ellen's warmth and care Dehradun was becoming too cold for us and my husband did not want to stay on any longer. But Ellen would not hear of it. How could we go away, she asked, before the 20th of November which was celebrated in a big way as the day on which Roy was released from the Indian prison. We were uncomfortable because we did not have sufficient warm clothes. Ellen, therefore, piled on us all the blankets, cardigans, socks, coats and scarves that she could spare. She sent Roy's woollens for Ayyub which were several sizes too big for him. Ultimately the tug of war between her and Ayyub became so tense that one morning after breakfast we had to go to get our train reservations. Ellen went with us ostensibly to exert her influence in getting reservations for an early date. But like a naughty schoolgirl she refused to do anything because it was being done against her wishes. She had told us earlier that she could get reservations made for us any time we wanted. But now at the reservation counter she announced that she could not find the man whom she knew and who always eagerly obliged her. This unnerved Ayyub and he could not view with equanimity, as I did, the prospect of freezing in Dehradun for another fortnight or three weeks. I had a hard

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

time pacifying a furious husband on the one hand and an abhimanini friend on the other. She was hurt that we did not listen to her request. But finally peace returned after the reservations had been made, though not for a conveniently near enough date according to my husband.

Though politically D.P. and Ellen belonged to two poles they were good neighbours, and Dhurjati Prasad sometimes came smartly dressed to join the afternoon tea at Ellen's. But he would neither eat nor drink anything because both were painful exercises for him in those days. Still he enjoyed talking and listening to conversations—not of course for a long time at a stretch. One day Dhurjati Prasad took Ayyub to Rathindra Nath Tagore[৮] who had then exiled himself to Rajpura in the outskirts of Dehradun. I did not want to go with them. But I did meet Rathida at Ellen's place one afternoon when he came to tea at her invitation. The person who was held in awe in Santiniketan had since then shrunk in stature to me. The botanist that he was, he went round Ellen's garden appreciating many of her collections. Ellen showed him some rare varieties of hibiscus that day.

The newly built annexe to the left of her cottage housed the Renaissance Institute Library and the guest room which were specially meant for visiting scholars. Ellen invited Ayyub to use this library and I was allowed to help her in dusting and rearranging the books. Often she would send me a note asking me to come after lunch to give a hand in reorganising the library. That gave me a chance to be with Ellen longer and talk about things which may not interest my husband. Naturally our work did not progress very fast, but we were not very sorry for that. One day she gave me a copy of the Duino Elegies to read, a copy of which Buddha-deva Bose[9] sent us later as a gift from the United States. So Rilke always reminds me of both these friends. It was in her library again that I came across a copy of the famous legend of Tristan and Isolde about which I knew nothing till then. Though apparently there is nothing in the legend which resembles Ellen's own life, yet somehow this story as associated with her and 13 Mohini Road makes the tragedy of all loves more complete in my mind. Or, why should I not use the word 'life' instead of 'love' in the above sentence? The "golden sorrow" that life is never ceases to intrigue us, however. As a rationalist Ellen took pride that the number of her house was "thirteen". But I did not like the terrible coincidence of her murderers choosing the 13th of December as the day for committing that heinous crime. All unfavourable coincidences have an insidious way of gnawing at the root of our rational judgments.

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

As our day for departure from Dehradun approached Ellen kept telling us that this first visit of ours was only exploratory, and now that we knew ourselves how beautiful and convenient a place Dehradun was we should come here every year. I am sure this was not something which she only told us but all her friends must have received equally warm treatment from her. But from our side we can say without hesitation that such eagerness to have us with her and such almost irrational refusal to part with us, we have not come across again.

Ellen came to see us off at the station; she saw to it that everything that Ayyub needed was there. She gave us a copy of Roy's Letters from Prison to read on the train. Then we sat in the coupe together for some time and told each other that we were going to meet soon again, either at Calcutta or at Dehradun. The woman who had an endless fund of conversation was very silent on that day. After a while she got up, shook hands with Ayyub, kissed Pushan and hugged me. We kissed each other and then she hurriedly got down, but not because the train had started by then. She did not turn back, nor did she wave her hand at us. She had a dark long coat on her and she walked fast into the darkness of the evening. That was the last time I ever saw her.

If I even wanted to be like another woman it was Ellen, and if that were really possible no one would have been happier than my husband.

1. Abu Sayeed Ayyub, distinguished philosopher and literary critic, author of several books on Tagore. Gauri, his wife, is an educationist and social worker.
2. Sushil and Indira Dey; Sudhin and Rajeswari Datta.
3. Amlan Datta, educationist, economist and author of many books; close associate of the Roys and the radical humanists since 1946.
4. D. P. Mukherji, novelist, essayist, social scientist and musicologist.
5. David McCutchion (1930-1972) taught English at Santiniketan (1957-60) and later comparative literature at Jadavpur University (1960-72); author of several books including monographs on the terracotta temples of Bengal.
6. This was grown from a tiny cutting which had been mailed to her in an envelope by Mrs. Watumall from Hawaii.
7. Rabindranath's nephew. He was in the Soviet Union for some time, and subsequently founded at Calcutta his own political party, the R.C.P.I. musician and author, he published several books including his autobiography in Bengali, Yatri.
8. Rabindranath's son.
9. Buddhadeva Bose (1908-1974), poet, novelist, playwright and critic; author of more than a hundred books in Bengali; translated Hoelderlin, Baudelaire and Rilke into Bengali.

"The World Her Village A Book of Ellen Roy" Ed. Shibnarayan Roy (1979)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রভাবনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠাকুর পরিবার ও মুসলিম সংস্কৃতি

যে ঠাকুর পরিবার একদা সারা বাংলার দৃষ্টান্তস্থল হয়ে উঠেছিল তার ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল দ্বারকানাথের অর্জিত বিত্তে এবং তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল রামমোহন রায়ের আদর্শ। রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথে বলছেন ঃ 'ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছেন মুসলমান, ঐ তো এসেছে খৃষ্টান—সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমান—ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?...' রামমোহনই সেদিন 'বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কারও স্থানসংকীর্ণতা নেই।'

সেদিনের বাংলায় রামমোহনের সত্যিকারের সমসাময়িক প্রায় কেউ-ই ছিল না কারণ তিনি স্বদেশবাসীদের চেয়ে অন্ততপক্ষে একশ বছর এগিয়ে ছিলেন। এই নিঃসঙ্গ ভারত পথিকের গুটিকয় অনুগত সহকর্মীর মধ্যে দ্বারকানাথ অন্যতম কিন্তু সত্যিকারের অনুগামী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবার। রামমোহন রায়ের উদার আদর্শের খোলা হাওয়া সেদিন এই পরিবারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল, চিন্তায় কর্মে প্রবর্তনা দিয়েছিল নিত্য-নবসৃষ্টির, যদিও সমসাময়িক 'ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে।' রামমোহনের কাছে দেশেরও পরিবারের এই ঋণ স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়া ছিলেন। কোনো প্রথা, কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পুর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই রূপে তিনিই স্বদেশের সকল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন ; —আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর আমাদের জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবনগ্রহণ ও জীবনদান করিয়াছেন।'

পরবর্তী কালে যেহেতু দূর পশ্চিমের খৃষ্টান ঐতিহ্যের প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে এই দেশে তাই আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি না যে নিকটতর পশ্চিমের ঐশ্লামিক সংস্কৃতির কাছে আমরা কতটা ঋণী। সচেতনভাবে এই ঋণ গ্রহণে আপত্তি ছিল না রামমোহনের কারণ তিনিও জানতেন 'সভ্যতার অর্থ হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন।' বাহির থেকে রস সঞ্চয় করার ক্ষমতাতেই প্রাণের প্রকাশ। এই অর্থে প্রাণবন্ত ঠাকুর-পরিবার ঐশ্লামিক সংস্কৃতি আয়ত্তীকরণে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন তাই আমার সংক্ষেপে আলোচ্য।

ঠাকুর পরিবারের পীরআলি আখ্যা লাভ সম্বন্ধে কিংবদন্তী এখন সবারই জানা। এই রহস্যজনক এবং আজকের দৃষ্টিতে কৌতুকাবহ ঘটনার ফলে পরিবারটি ব্রাহ্মণ সমাজে ব্রাত্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু এই 'যবন সংস্পর্শদোষ' থেকে যে যুগে প্রায় সারা দেশটাই আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে অসূর্যস্পশ্যা করে রেখেছিল সেই যুগেই যে এই পরিবারটি নতুন চিন্তার খোলা হাওয়ায় পাল তুলে দিতে সাহস করেছিল সে হয়ত অনেকটা এই কারণেও যে নতুন করে আর কে ঠাকুর পরিবারকে একঘরে করে রাখবে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা তাদের ব্রাহ্মণত্বকে যেমন পুনরুজ্জীবিত করেছিল তেমনি পীর আলি আখ্যা মুক্তি দিয়েছিল জীর্ণ-সংকীর্ণ লোকাচার থেকে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তার সমর্থন খুঁজেছিলেন উপনিষদে কিন্তু তার প্রেরণা নিশ্চয়ই এসেছিল খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম থেকে। রামমোহন যে এই দুই ধর্মশাস্ত্র সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং একেশ্বরের ধারণার সপক্ষে যুক্তি আহরণ করেছিলেন সে কথা সর্বজনবিদিত। সাম্প্রদায়িকতা আজ আমাদের কাছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার রূপে আসে। রামমোহন কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ সম্পর্কে সম্ভবত বেশি সচেতন ছিলেন এবং একেশ্বরের ধ্যানেই সর্বধর্মের সমন্বয় সন্ধান করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিক আচরণ অনুষ্ঠানগুলি তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শ্রাদ্ধ, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে শালগ্রামশিলা, হোমাগ্নি, গঙ্গাজল, তুলসীপাতা, বেলপাতা, ইত্যাদি বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষুদ্র আত্মীয়গোষ্ঠী ক্ষুদ্রতর হল। অবশ্য একদিকে পীরআলি সমাজেও যেমন তাঁরা ব্রাত্য হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে তেমনি ধর্মবন্ধুদের নূতন সমাজে তাঁরাই হলেন নেতৃস্থানীয়। কিন্তু এই ধর্মবন্ধুদের সঙ্গেও অল্পকাল পরেই দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধে উপবীত বর্জন, ব্রাহ্মণেতরের বেদি গ্রহণাধিকার, জাতিভেদ দূরীকরণ, স্ত্রী স্বাধীনতা এই সব সমস্যা নিয়ে—তবে আমাদের বর্তমান আলোচ্য প্রসঙ্গের সঙ্গে এসব সমস্যার কোনো যোগ নেই। 'ব্রাহ্মধর্মবোধে' ফিরে যাওয়া যাক। উপনিষদের ধর্মবোধে আছে বিস্ময়, আছে শুদ্ধ জ্ঞান—কিন্তু ভক্তির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ তাতে দেখি না। তাহলে ব্রাহ্মধর্মে যে ঈশ্বর প্রেম ও ভগবৎভক্তির প্রবাহ দেখি দেবেন্দ্রনাথের কাল থেকেই, তার মূল কোথায়? দ্বারকানাথের পরিবার বৈষ্ণব ছিল একথা সত্য এবং বৈষ্ণবধর্মে প্রেম ও ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা ঘটেছে এ কথা কে না জানে। তবু এই অনুমানের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নেই যে ব্রাহ্মধর্মের ঈশ্বর প্রেমে সূফীবাদের স্পর্শ যতখানি লেগেছে বৈষ্ণবধর্মের হয়ত ততখানি নয়। বৈষ্ণবধর্মে প্রেম ও ভক্তির আবিলতা বা তথাকথিত 'রসের ঢলাঢলি' সম্বন্ধে ব্রাহ্মরা ছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত। সূফীদের ঈশ্বরপ্রেম স্বভাবতই ব্রাহ্মদের কাছে বেশি রুচিসম্মত ঠেকেছিল রাধাকৃষ্ণ এবং আনুষঙ্গিক ভাবধারার তুলনায়। ব্যক্তিগতভাবে দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ যে সূফী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন একথা সবাই জানেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে সৌদামিনী দেবীর পিতৃস্মৃতি চারণ—পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে আছেন দেবেন্দ্রনাথ, হাতে ফুলের তোড়া—মাঝে মাঝে তাই শুঁকছেন এবং হাফিজের বয়েৎ আওড়াচ্ছেন আপন মনে। দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ করতে গিয়ে এবং ঈশ্বরের প্রেম গান করার উদ্দেশ্য ফারসী বয়েৎ যত উদ্ধার করেছেন উপনিষদের শ্লোক তত নয়। ব্রাহ্মধর্মে ঈশ্বরপ্রেম গানের মুলসুরটি তাই সূফীবাদের দান বলেই মনে করা উচিত হয়ত।

একথা ঠিকই যে সমসাময়িক শিক্ষিত ও বিত্তবান বহু পরিবারেই মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ছিল তখনও। বিত্তবান সম্প্রদায়ের সামনে তখনও নবাবী জীবনযাত্রা, মোগলাই সমারোহই ছিল অনুকরণীয় আদর্শ। পোষাকে আসাকে গৃহসজ্জায়, আসবাবপত্র ও বাসন-কোসনে এমনকি শিক্ষার ভাষায় মুসলিম প্রভাব স্বভাবতই স্পষ্ট ছিল...ইংরেজ বণিকরা তখন পর্যন্ত গতকালের নবাবী প্রভাবের স্থান অধিকার করতে পারেন নি। এমন কি ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাহায্যে যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন ঐ সময়ে তাঁরা অর্থের অপব্যয়ও করতেন নবাবী ঢঙে বাইনাচ, বুলবুলির নাচ, কিংবা ঘুড়ি ওড়ান ছিল তখনকার ফুরিয়ে আসা রাজন্যবর্গের জীবনযাত্রার ছবি এবং সেই ছবিই অনুকরণ করতেন হঠাৎ-বড়লোক সম্প্রদায়ও। ঠাকুর পরিবারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রিন্স দ্বারকানাথ যদিও বাগানবাড়িতে সাহেবদের জন্য প্রচুর খানাপিনা ও উৎসবের আয়োজন করতেন—তবু পোষাকে পরিচ্ছদে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সাহেবীয়ানার চেয়ে নবাবী-আনা বেশি ছিল। ফরাস, বেলোয়াড়ি ঝাড়লণ্ঠন, আলবোলা, গোলাবপাশ ; এমন কি পুরুষের চোগা চাপকান পাগড়ী আচকান যে শুধু ঠাকুর পরিবারেই ছিল তাই নয়। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিতে তাঁর যে মধ্যবয়সের ছবি আছে তাতেও ঐ পোষাক দেখে হঠাৎ একটু চমক লাগে! ঠাকুর পরিবারের মেয়েরাও পোষাকে অলঙ্কারে যতটা মোগলাই ধরণধারণ গ্রহণ করেছিলেন তা সম্ভবত খুব ব্যাপক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ও বধুবেশে মৃণালিনী দেবীর একটি ছবিতে দেখি পশ্চিমী মুসলমানীর সাজসজ্জা মৃণালিনী দেবীর। আজকের দিনে ঐ বেশবাস, ঐভাবে ওড়না ও অলঙ্কারের ব্যবহার কেউ কল্পনাই করতে পারবে না হিন্দুবাড়িতে নববধূর অঙ্গে, যদিও ঐসব উপাদান অনেকটাই ব্যবহার হয় এখনও। কেশসজ্জাও লক্ষ্য করবার মত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে চোখে পড়ে ঠাকুর বাড়ির বধূ ও কন্যাদের পায়ে জুতো। হিন্দুর অন্তঃ-পুরে এই মুসলমানী অন্দরমহলের প্রভাব নিশ্চয়ই ঠাকুর পরিবারের মত দুচারটি পরিবারেই সীমিত ছিল। কিন্তু এসব তো শুধু বহিরঙ্গ।

ঠাকুর পরিবারের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এখানেই যে এঁদের ব্রাহ্মশুচিবায়ু ধর্মে ও সংস্কৃতিতে যবনস্পর্শদোষ ঘটবার ভয়ে কাতর ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররা কেউই সম্ভবত ফারসী পড়েন নি এবং তাঁদের অধিকাংশই সত্যেন ঠাকুরের উৎসাহে পশ্চিমী শিক্ষা-সাহিত্য ইত্যাদির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন। তবু ঐ বাড়ির শিল্পবোধে, ধর্মবোধে ইসলামী প্রভাব অনস্বীকার্য। এমন কি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায়ও তাঁরা গজল কিংবা ঠুংরির আদর্শ সহজেই গ্রহণ করেছেন। বাড়ির ছেলেরা ওস্তাদের কাছে হিন্দুস্থানী সংগীত চর্চা করেছে সংস্কৃতির প্রয়োজনে, বিলাশ ব্যসনের প্রয়োজনে নয়। যে সঙ্গীত দরবারে মজলিশে সে যুগে বিলাসের আবর্ত সৃষ্টি করত এবং সাধারণের চোখে তাই দূষণীয় হয়ে উঠেছিল সেই সঙ্গীতকেই আবার ব্রহ্মনাম গানের উপযোগী করে নিয়েছিল ঠাকুর বাড়ির প্রতিভা। হাফিজের কাব্যে ও ধর্মবোধেই যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মনের মত প্রকাশভঙ্গী পেতেন তাই নয়, সূফীবাদের শুচিস্নিগ্ধ প্রেমাবিষ্ট ভাবটিই এসেছিল ঠাকুর বাড়ির সংস্কৃতিতে। বল' যেতে পারে হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের ব্যাপক চেষ্টা সচেতন ভাবে হয়েছে বার তিনচার, প্রথমবার মধ্যযুগীর সাধক নানক কবীর ইত্যাদির মধ্যে। দ্বিতীয়বার বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনে। শিখ ধর্মের মধ্যেও সেই একই প্রয়াসের অন্যরূপ দেখি। একেবারে আধুনিক কালে এর কিছুটা ঘটেছে ব্রাহ্মধর্মে। এই শেষোক্ত আন্দোলনে অগ্রনী ছিলেন রামমোহন রায় এবং অনুগামী ঠাকুর পরিবার। তবে এই আন্দোলনের যতটা সুফল ফলতে পারত তা সম্ভব হয়নি গোঁড়া হিন্দুয়ানির বিরোধিতায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ শক্তিমান ব্যক্তিরা একদিকে যেমন পশ্চিমী প্রভাবের ফলে প্রবাহিত রেনেসাঁসের ধারাকে অবরুদ্ধ করেছিলেন অন্যদিকে এই ধর্মসমন্বয়ের প্রয়াসকে বাধা দিয়েছিলেন সবলে। এঁরা সজোরে প্রচার করতে লাগলেন 'নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্মের বিরোধী' এবং সাকার উপাসনাই হিন্দুদের লক্ষণ। এক কল্কি অবতারেরও নাকি অভ্যুদয় হয়েছিল হিন্দু 'ধর্ম সংস্থাপনায়।' তাতে করে সমাজের মুখ দেওয়া হয়েছিল উল্টো দিকে ঘুরিয়ে। ফলে সারাদেশেরই ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু ঠাকুর পরিবারের ততটা হয়নি। কারণ সৌভাগ্যবশত তাঁরা ছিলেন ব্রাত্য।

এই ব্রাত্য পরিবারের ধর্মবোধের বেলায় যেমন শিল্প বোধের বেলাতেও তেমনিই উদার মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব সেখানে সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের সুরে হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীতের মারফৎ যেমন পরোক্ষে মুসলিম প্রভাব এসেছে তেমনি এসেছে লোক সঙ্গীতের মারফৎও। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গানে মন-মেজাজে পোষাকে বাউল সম্প্রদায়ের প্রভাব অতি স্পষ্ট। বাউলরা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয় একথা সত্যি ; আরও ঠিক বলা হয় যদি বলা যায় যে এরা হিন্দুও এবং মুসলমানও। দুই সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে পাওয়া যাবে। ওরা এক জাতের সহজিয়া। তবে এদের সাধনপন্থা, এদের প্রেমমার্গে সুফীবাদের প্রভাব স্পষ্ট। বাংলার নরম মাটিতে ইসলামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এও এক ধরণের পরিণতি বলা যেতে পারে, যা হিন্দু ধর্ম থেকেও রস আহরণ করেছে। এই প্রেমপাগল সাধক সম্প্রদায়ও রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন গোঁড়ামি থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে। শুকনো শাস্ত্রের যুক্তির চেয়ে রসবান হৃদয়ের সহজ প্রকাশকেই রবীন্দ্রনাথ এত বেশি মূল্যবান জ্ঞান করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের বাউল চরিত্রগুলি একটা বিশেষ বক্তব্য ও ভাবাদর্শের মূর্ত রূপ হয়ে উঠেছে। গগন হরকরা কিংবা লালন ফকিরের সাধনাকে সমস্ত হিন্দু সমাজ আপন জ্ঞান করতে যে শিখেছে আজ তার পেছনেও আছে ঐ একটি মানুষের প্রেরণা, অথবা ঠাকুর বংশের দান।

মুসলিম সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ভাব প্রত্যক্ষ করা যায় ঠাকুর পরিবারের চিত্র শিল্পে। যেহেতু দৃশ্য ও শ্রাব্য সব শিল্পেই একদা ঠাকুর পরিবার ছিল অগ্রগামী তাই চিত্র শিল্পেও এক লক্ষণীয় আন্দোলনের জন্ম হয় ঠাকুর পরিবারে। স্বাদেশিকতার ছোঁয়া সব কিছুতেই লেগেছিল, লেগেছিল শিল্পের ক্যানভ্যাসেও। তাই পশ্চিমী টেকনিক বর্জন না করলেও স্বদেশী বিষয়ের অবতারণা দেখি ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন শিল্পীর ছবিতে। আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবনীন্দ্রনাথের সেই সব ছবি যাতে মোগল শিল্পর প্রভাব স্পষ্ট। নইলে এই কলকাতায় বসে তপ্ত বালির ঝড়ে মুমূর্ষু প্রায় তৃষ্ণার্ত উটের এমন সুন্দর ছবি কি করে আঁকা যায়? ছবির রঙ, ছবির বক্তব্য সব কিছুতেই মুসলিম শিল্পরীতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ভাবতে অবাক লাগে যে ঐ প্রেরণা অবনীন্দ্রনাথের জীবনে এত গভীর ছিল যে এমন সব বিদেশী বিষয় নির্বাচনও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক লাগে না আমাদের চোখে কিংবা তাঁর নিজের কাছে। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য নন্দলাল বসু যে-ভারতের সন্ধান করেছেন তা আরও প্রাচীন এবং হয়ত একদিকে আরও অবাস্তব। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির আয়ত্বীকরণ যেহেতু ঠাকুর পরিবারে ততদিনে অনেকখানিই ঘটেছে তাই মোগল শিল্পের মর্মে প্রবেশ করা অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে যতখানি স্বাভাবিক ছিল নন্দলালের পক্ষে ছিল না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে অবনীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদ যেখানে তিনি সচেতনভাবে বাংলা অক্ষরকে আরবীরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ওটা অবশ্য নেহাৎই তুলি নিয়ে খেলা করা, তবে খেলার ভিতর দিয়েও তো ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ হয়। আর এই ব্যক্তিস্বরূপটা যে অবনীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপ তা নয়— বলতে গেলে এটা ঠাকুর পরিবারের ব্যক্তিস্বরূপ।

এককালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন সে কথা হয়ত গতদিনের ঠাকুর পরিবার সম্বন্ধেও অনেকটা খাটে। তাই তাঁর সে উক্তিকে একটু পালটে বলা যায়, ঠাকুর পরিবার বিরাজ করত 'ভারতের সেই আগামী কালে যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।' অন্তত পক্ষে সেদিনকার দেদীপ্যমান ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি প্রতিভাধর ঐ পরিবারকে ও দেশকে এবিষয়ে যে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেছিলেন সে-বিষয়ে দ্বিমত পাওয়া কঠিন হবে।

নবজাতক, ১৩৭৫, পৃঃ ৮৭-৯০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর পাকিস্তানের জন্ম। এবং অবশ্যই স্বাধীন ভারতেরও। এই জন্মের পূর্ববর্তী তিন-চার দশক ধরে একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে দেশ অস্থির ছিল। ফলে অবিভক্ত ভারতবর্ষে এবং আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে অবিভক্ত বাঙলায় রাজনীতি ও সংস্কৃতির সেই অধ্যায়টিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ করে গেছেন যখন হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছিন্নতাবোধ তিক্ততম ও তীব্রতম পর্যায়ে উঠেছিল। তখন বাঙলাদেশে, একদিকে ছিল সংখ্যাগুরু মুসলমান, প্রধানত কৃষিজীবী, আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষায় হিন্দুর তুলনায় অনগ্রসর, সেই পরিমাণে চাকুরি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন—ফলে কিছুটা সংখ্যার জোরেই সেইসব ক্ষেত্রে অধিকতর অধিকারের দাবিদার। অন্যপক্ষে সংখ্যালঘু হলেও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ছিল ইংরাজি শিক্ষায় অগ্রসর একটি নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ, যারা আধুনিক জীবিকার নানা ক্ষেত্রে নিজেদের অর্জিত অগ্রাধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। ফলে সর্বক্ষেত্রেই রেষারেষি উঠেছিল তুঙ্গে। এবং এই তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাকে রাজনীতির উপজীব্য করে তোলার জন্য মুসলমানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল সংখ্যাগুরুত্ব, আর হিন্দুর ছিল আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সুবিধা। সমস্যাটার সর্বভারতীয় চেহারা একটু ভিন্নতর ছিল অবশ্য। তাই নিয়ে সর্বভারতীয় নেতারা যখন রাজনৈতিক মঞ্চে দরকষাকষি করছিলেন তখন তার উত্তেজনার চাপে মাঝে-মাঝেই যে-কোনো অছিলায় জনসাধারণ সরাসরি খুনোখুনিতে নেমে পড়ছিল। বাঙলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক হানাহানি ছোট বড় নানা আকারে নানা অঞ্চলে প্রায়শই ঘটছিল। অবশ্যই তাতে রাজনৈতিক দলগুলির প্ররোচনাও থাকত।

সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ধোঁয়ায় দেশের আবহাওয়া যখন এইরকম কলুষিত এমন সময় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় তারিখে অধ্যাপক কালিদাস নাগের একটি পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ঠিক যখন আমার জানালার ধারে বসে গুঞ্জনধ্বনিতে গান ধরেছি—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে
আমার ভাবনা যত উতল হল
অকারণে—

ঠিক এমন সময় সমুদ্রপার হতে তোমার প্রশ্ন এল, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কী।'

আজকের সভার তারিখ ১লা আষাঢ়, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। আজ ৬৫ বৎসর পরেও আমরা সমস্যাটার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। এখন আরো হতাশ বোধ করার কারণ আছে, যেহেতু এই দুরারোগ্য ব্যাধির দুরূহতম চিকিৎসার প্রয়াসও করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ৪০ বৎসর আগে দেশব্যবচ্ছেদ করে সমস্যাটার একটা চূড়ান্ত সমাধান করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশ্য প্রবহমান ইতিহাসের ধারায় চূড়ান্ত সমাধান বলে কিছু নেই। আবার শোনা যায় কর্কটরোগে আক্রান্ত দেহে অস্ত্রোপচার হলে রোগটা নাকি আরো দ্রুত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত-দেহের বেলাতেও দেখছি এই উৎকট ব্যাধি ক্রমাগত ছড়িয়েই পড়েছে।

দেশবিভাগের কথা যখন উঠলই তখন সমগ্র উপমহাদেশেরই বর্তমান পরিস্থিতিটার উপরেও দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার অন্য নানারকম চেহারা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা এখন আর তেমন বড় সমস্যা নয়, একথা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য দুই হাত থাকলেই তালি বাজে—এ তো চিরকালের কথা। বিভাগপূর্ব পাঞ্জাবের দুই অংশে জনবিনিময় প্রায় সম্পূর্ণ ঘটে গিয়েছিল বলে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা আজ এতই নগণ্য যে তাদের অস্তিত্ব স্মরণেই থাকে না। নতুন করে পাকিস্তানে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হলাম কয়েকদিন আগে, যখন কাগজে পড়লাম মীরাট দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় গত ঈদের দিনে করাচিতে কয়েকটি মন্দির ও হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল।

পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশ-এ দ্বিতীয় জন্ম লাভ করার কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত সেখানেও হিন্দু মুসলান বিরোধের ক্ষত বার বার রক্তক্ষরণ করেছে। কিন্তু উর্দুভাষী পাকিস্তানের সঙ্গে বঙ্গভাষী পাকিস্তানের সম অধিকারের লড়াইটা যত তীব্র হতে থাকল ষাটের দশকে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটাও ততই ধামাচাপা পড়ে গেল। বাংলাদেশের জন্ম হবার পর থেকে এই ১৬ বৎসরে ধামাটা যে একবারও তোলা হয় নি তার কারণ হিসাবে বাংলাদেশীরা দাবি করেন যে তাঁদের দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত মোটামুটি পাকা হয়ে গেছে, এতে ফাটল ধরানো সহজ হবে না আর। এই জাতীয়তাবাদ হিন্দু-মুসলমানের, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দের মিলিত প্রেরণার সৃষ্টি। সত্যিই যদি সম্প্রীতির ভিত বেশ পাকা করে গাঁথা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা সমগ্র উপমহাদেশের পক্ষেই মস্ত বড় আশার কথা, এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু বহুযুগের বদ্ধমূল ভয় তো সহজে কাটতে চায় না। মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশকে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধর্মান্ধতার হাতে প্রাণ দিয়ে সেই আদর্শের চরম মূল্য চুকিয়েছেন একথা আমরা জানি এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। কিন্তু যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁরা যে আজ আর তেমন করে সেই দাবির কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে সাহস পান না এতে আশঙ্কার কারণ অল্প একটু আছে বইকি! বাংলা-দেশে প্রায় নয় কোটি জনসংখ্যার এক-দশমাংশ হিন্দু। এঁদের মধ্যে বর্ণ-হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। অতএব পূর্ববংলায় হিন্দু-সংস্কৃতির একদা উগ্র আত্মাভিমানও আজ লুপ্ত। জনবল অল্প, মনোবলও খুব বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশের হিন্দু-সংখ্যালঘু আজ নির্জীব নির্বিষ। অতএব আপাতত এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যা-জর্জরিত বাংলাদেশেরও কোনো বড় সমস্যা নয়।

প্রতিতুলনায় ভারতরাষ্ট্রে অবস্থাটা, সবাই জানেন, অন্যরকম। এবং অনেক বেশি জটিল। পাঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে যেভাবে নিঃশেষে মুসলমান-অমুসলমান (হিন্দু না বলে অমুসলমান বলছি, কারণ সে সময়ে হিন্দুর সঙ্গে বিরাটসংখ্যক শিখও ছিলেন একপক্ষে) গণ-বিনিময় হয়ে গিয়েছিল সেরকম চূড়ান্ত বিনিময় যদি পাকিস্তানের দুই অংশের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষেরও হয়ে যেত তাহলে এই শতাব্দীর ইতিহাসে আরো একটি অতি নিষ্ঠুর দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান সেরে রাখত ইতিহাসবিধাতা। সেই সমাধান অনেকেই চেয়েছিলেন এবং তাকেই এখনও অনেকে একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান বলেই মনে করেন। আমার এক পাঞ্জাবি ভাবী বলতেন, 'ন রহে বাঁস, ন বাজে বঁসরী'—শ্যামের বাঁশির আপদ যদি বিদায় করতে চাও তাহলে দেশ থেকে সব বাঁশঝাড় উৎখাত করে ফেলো। উৎখাত যে করা হয়নি তাতে করে একদিকে মনুষ্যত্বের উপর কিছুটা আস্থাও যেমন অবশিষ্ট রয়ে গেল অন্য দিকে তেমনি যথাসময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার মতন সমস্যার কিছু শিকড়ও রয়ে গেল আমাদের মাটিতে।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটা স্বাস্থ্যকর কিন্তু অস্পষ্ট ভাবনাকে কিছু ভারতীয় নেতা আমাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন—সংবিধানেও এই আদর্শকে ঠাঁই দিয়েছিলেন। কিন্তু আদর্শটা অস্পষ্টই রয়ে গেছে যেহেতু নেতৃস্থানীয় ভাবুকরাও মনস্থির করতে পারেন নি যে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ঠিক কী বোঝাবে এদেশে। সব ধর্ম থেকে সরকারের সমদূরত্ব না সম-নৈকট্য—equal distance না equal proximity? দেশের চিন্তাশীল মুষ্টিমেয় মানুষের কাছেই যখন আদর্শটা স্পষ্ট রূপ ধরতে পারে নি এবং সরকারি আচরণও দ্বিধাগ্রস্ত তখন সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা যে কিছুমাত্র গৃহীত হয় নি এতে আর অবাক হবার কী আছে? অতএব ধর্মনিরেপেক্ষতার শুভ চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে অনুকূল জল-হাওয়া পেয়ে সেই শিকড় থেকে সাম্প্রদায়িকতার চারা গজিয়ে উঠে ডালপালা মেলতে দেরি করে নি। অতি সম্প্রতি মীরাট ও দিল্লীতে আর একবার কী উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই বিরোধ তা কারুর অজানা নেই।

ভারতবিভাগের পর থেকে কত হাজার বার হিন্দু মুসলমান বিরোধ নৃশংসভাবে ফেটে পড়েছে কখনও ছোট, কখনও বড় আকারে তার পরিসংখ্যান সন্ধান করতেও সাহস হয় না। অর্থাৎ পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে দুই ভিন্ন উপায়ে এই হিন্দুমুসলমান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমস্যার দুই ধরনের সমাধান হয়ে গিয়ে থাকলেও আমাদের দেশের এই সমস্যা, বলতে গেলে ১৯৪৭ সালে যেখানে ছিল আজ ১৯৮৭ সালেও সেখানেই আছে। বরং বলা যায় হিন্দুমুসলমান দুই সম্প্রদায়েই সাম্প্রদায়িক-মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা আবার দ্রুত বাড়ছে এবং তারা আরো অবুঝ এবং মরীয়া হয়ে উঠেছে। এদিকে যাঁরা এই সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করেন তাঁরা আজো দিশেহারা হয়ে পরস্পরকে সেই একই অসহায় প্রশ্ন করে বলেছেন—'ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান কী?'

এই পঁয়ষট্টি বছরে আমরা যে সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছি—সমাধানের দিকে একচুলও অগ্রসর হইনি সেকথা স্পষ্ট করে দেবার জন্যই কালিদাস নাগের প্রশ্ন এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরের উল্লেখ করেছিলাম। পত্রাকারে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরটা খুব দীর্ঘ নয়। অল্পস্বল্প বাদ দিয়ে তাঁর চিঠিখানা প্রায় সবটাই তুলে দেব, পাঠক একটু ধৈর্য ধরবেন

'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র—সে হচ্ছে খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এই জন্যে তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই। খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে একটি সুবিধার কথা এই যে তাঁরা আধুনিক যুগের বাহন ; তাঁদের মন মধ্যযুগের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই। [এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপের বুকে নেমে আসা মধ্যযুগের অন্ধকার, ফ্যাশিসট তাণ্ডব।] ধর্মমত একান্তভাবে তাদের সমস্ত জীবনকে পরিবেষ্টিত করে নেই।...কিন্তু ধর্মের নামে যে জাতির নামকরণ·ধর্মমতেই তাদের মুখ্য পরিচয়। হিন্দুজাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো। অর্থাৎ, তারা ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়—অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের non-violent non coopertion ! হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার মূলক হওয়াতে তার বেড়া আরো কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেলা যায়, হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। [আবার জনান্তিকে বলি, এখন আর তত সংকীর্ণ নেই—শুদ্ধিকরণের বেশ প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে মুসলমানদের পুনর্বার সদ্ধর্মে ফিরিয়ে আনার পাকা ব্যবস্থা হয়েছে নাকি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে।] আচারে ব্যবহারে মুসলমান অপর সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক।......আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের একপ্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানেই তাকে স্থান দেওয়া হোত। [এই কুশ্রী অভিজ্ঞতাটা এতো লজ্জিত করেছিল রবীন্দ্রনাথকে যে অন্তত ৫।৬ বার এর উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা রচনায়]।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'অন্য আচার অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো, সে 'হিন্দু যুগের পূর্ববর্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে সচোটভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙঘ আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল।...মোটকথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংশ্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। ...সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁছেচে, হিন্দু-মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।...আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে প্রতিরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।...হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই—কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরির্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব। —যদি না আসি তবে, নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

আমাদের আলোচ্য সমস্যা ও সমাধানের প্রায় সবটাই এখানে সূত্রাকারে পেয়ে গেলাম বলেই আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে পত্রখানি পাঠককে উপহার দিলাম। নানা দিক থেকে এই সমস্যাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধে উপন্যাসে কাব্যে উত্থাপন করেছেন। এখন তারই কিছুটা বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। উদ্ধৃত পত্রে তিনি বলেছেন বটে যে ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে এই দেশেই এমন পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি জাত পাশাপাশি বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে, ইতিহাসের চক্রান্তে। এদের এক পক্ষ আগ্রাসী এবং আত্মসম্প্রসারণে উদ্যমী মুসলমান, অন্য পক্ষ নিজের সুনিপুণ কৌশলে গড়া আচারের প্রাকারে সুরক্ষিত, কূর্মস্বভাব হিন্দু। কিন্তু পৃথিবীর ইতস্তত একটু চোখ বুলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে যে নিজেদের যারা সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী মনে করে এমন আরো বহু জাতই নানা ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি প্রতিবেশীরূপে বাস করেও আমাদেরই মতন কিছুতে মিলতে পারছে না, পারছে না বলেই নিরন্তর হানাহানি করে চলেছে। এমেরিকার সাদা আর কালো মানুষদের দেখুন, আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রোটেসট্যান্টদের দেখুন, আরো কাছে এশিয়ার দুই প্রতিবেশী মুসলমান দেশ ইরাকে ইরাণে সুন্নী আর শিয়াদের দেখুন—এরকম পারস্পরিক বিরোধের তো শেষ নেই। ইয়োরোপে খ্রীস্টান ও মুসলমানের সংঘাতও হিন্দু-মুসলমানের সংঘাতের মতোই ৮/৯ শ বৎসরের পুরানো। য়িহুদীদের সঙ্গে প্রথমত খ্রীস্টানদের এবং পরে মুসলমানদের বিরোধ আরো প্রবীণ। তাই ইতিহাসবিধাতা ভারতবর্ষের প্রতিই বিশেষ ভাবে অকরুণ হয়েছেন এমন বলা যায় কি?

তাছাড়া ইতিহাসের এই বিধানকে রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের জাতীয় ভাগ্যের অবিমিশ্র অভিশাপ বলে মনে করেছিলেন এমন ভাববারও কারণ নেই। ভারতের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে বসে তিনি নিজেই বলেছেন 'গ্রীস, রোম, ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতিসংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরা মাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।' অতএব দেখা যাচ্ছে জাতিসংঘাত ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের চোখেও ইতিহাসের অভিশাপ নয়, ইতিহাসের বরলাভ—যদি অবশ্য রূঢ়িক থেকে যৌগিক বিকাশ অর্থাৎ সভ্যতার অগ্রগতিই আমাদের কাম্য হয়।

মানবসভ্যতার এই রূঢ়িক থেকে যৌগিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা সমাজের পক্ষে শেষ পর্যন্ত উত্তরণের পর্যায়ে পড়লেও ব্যক্তিমানুষকে এর জন্য কঠিন মূল্য চুকাতে হয়েছে। বহু স্বেদ অশ্রু ও রক্তের অক্ষরেই নিশ্চয়ই লেখা হয়েছিল মানবসভ্যতার এই উত্তরণের ইতিহাস। এদেশে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথার্থ আদিনিবাসীদের সংঘাতেও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমাদের মহাকাব্যে তার কিছু কিছু 'ইতিহাস' আজো আমরা দেখতে পাই। জাতিসংঘাতের অনিবার্য আনুষঙ্গিক যে ঘৃণা এবং জাতিবিদ্বেষ তারও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে মহাকাব্যে। আর্যরা অনার্যদের যে প্রায় বন্য প্রাণীর সমতুল্য মনে করেছিল তার কিছুটা সাক্ষ্য আছে রামায়ণের হনুমান, জাম্বুবান, বালি, সুগ্রীব ইত্যাদি চরিত্রে। রাক্ষসজাতির বর্ণনায় জাতিবিদ্বেষ প্রায় হাস্যকর অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। আবার মজা হল এই যে, ইংরেজ বিজেতারা এই দেশের মানুষকে যখন 'নেটিভ' বলেছিল কিংবা মুসলমান বিজেতারা কাফির আখ্যা দিয়েছিল তখন আমরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলাম। কিন্তু কই আর্য বিজেতারা যে এদেশের মানুষকে 'অনার্য' বা 'অভদ্র-অসভ্য' আখ্যা দিয়েছিল সেটা তো আমরা প্রতিবাদযোগ্য মনে করি না। বরং এখনও সেই শব্দটিকেই আমাদের আদিপুরুষের অভিধা বলে মেনে নিয়েছি। এবং সেইভাবেই ব্যবহার করে চলেছি। অবশ্য দ্রাবিড়রা এই আর্য অহঙ্কারের প্রতিবাদ করে থাকেন। তাকে আবার আমরা উত্তর ভারতের মানুষরা দক্ষিণীদের অযৌক্তিক অতিস্পর্শকাতরতা মনে করি।

হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগের উৎস ও যৌক্তিকতার সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা আমরা আবাল্য শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথও মোটামুটি তার সমর্থন করেছেন : 'এই বিরোধে আর্যরা জয়ী হইলেন কিন্তু অনার্যরা আদিম অস্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকানগণের মতো উৎসাদিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হইল না।...একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল।' তাহলে এটাকে সৌভাগ্য বলেই জ্ঞান করা উচিত শূদ্রদের। কিন্তু হিন্দু সমাজতন্ত্রের নিম্নতম ধাপে গৃহীত হবার এই সৌভাগ্যকে শূদ্ররা পরে যথেষ্ট প্রাপ্তি বলে জ্ঞান করেন নি। এই আশ্রয় ত্যাগ করে তাঁরা কখনও বৌদ্ধধর্মে কখনও ইসলামে বা শিখধর্মে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছেন। এটাকে আমরা মোটেই ভালো চোখে দেখি নি, আজও দেখি না। বাবাসাহেব আম্বেদকর যে হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের বিরোধিতা করে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং নিজেও সেই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার জন্য তাঁকে আমরা ক্ষমা করি নি। অন্যপক্ষে আর্যদের যে 'সামাজিক সুব্যবস্থা' সেদিন মানবিক বলে মনে হয়েছিল, আজ তিন হাজার বৎসর পরে তা কী দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজের কাঁধে। তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ক্রাচ তৈরী করে দিয়েও আজ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না হিন্দু সমাজ। ক্রাচটাই দেহের অঙ্গ হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে মনে হচ্ছে এবং নানা যন্ত্রণাও সৃষ্টি করে চলেছে। অবশ্য এই বর্ণব্যবস্থার দুর্বলতাটাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন : 'যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকরজাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্য লাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই।' তাছাড়াও বলেছেন, 'জগতে হিন্দু-জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।...জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই।'

জাতিসংঘাতের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বহু দেশেই এইরকম জাতিসংঘাত একবার নয়, বার বার ঢেউয়ে ঢেউয়ে এসেছে। ভারত ইতিহাসের এহেন ঢেউ গুনতে বসে 'শক হূনদল পাঠন মোঘল' সকলকেই রবীন্দ্রনাথ আপন বলে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন, এমন-কি 'এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ'-ও বলেছেন। খুব সরবেই বলেছেন যেহেতু তাঁর দেশবাসীরা অনেকেই এই পরবর্তী বহিরাগতদের আপন বলে স্বীকার করতে রাজি নন। একমাত্র আর্যদেরই তাঁরা 'দুবাহু বাড়ায়ে' গ্রহণ করেছেন। এবং আর্য গরিমার প্রতিফলিত গৌরবে নিজেরাও গৌরবান্বিত বোধ করেছেন। অবশ্য আর্যমহিমা কীর্তনে রবীন্দ্রনাথেরও উচ্ছ্বাস কিছু কম ছিল না। তবে আর্যামির ভণ্ডামিকেও রবীন্দ্রনাথ কলমের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন করতে দ্বিধা করেন নি

'মোক্ষমুলর বলেছে আর্য,
তাই শুনে মোরা ছেড়েছি কার্য।'

এখানে সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হয় যে তাঁর 'হিন্দুর ঐক্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অনার্যদের প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক মত প্রকাশ করেছেন তা আমি যতবার পড়ি ততবার ক্ষুব্ধ বোধ করি। তিনি লিখেছেন 'দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা কী শারীর-সংস্থানে কী বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের স্বশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্যসভ্যতার বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম এবং আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে, এই বহুদেবদেবী বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধ লোকাচার-সংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।' অনার্যরা অর্থাৎ দ্রাবিড়রাও সর্ব বিষয়েই আর্যদের চেয়ে নিকৃষ্ট একথা রবীন্দ্রনাথ বললেও আমি মানতে বাধ্য নই। এই মতটি আমাদের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক বলেই যে শুধু আমার কাছে আপত্তিকর ঠেকে তা নয়, এটিকে বাস্তবিক ভ্রান্ত এবং আর্যঅহঙ্কার-প্রসূত বলেই আমার মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে এই আলোচনার অবকাশ নেই।

অনার্য জাতি ও সভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যা ধারণা তাতে আর্যদের ভারতে আগমনকে যে তিনি আশীর্বাদ বলে জ্ঞান করবেন এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যা উল্লেখযোগ্য সে হল এই যে পরবর্তী আগন্তুকদেরও তিনি অবাঞ্ছিত জ্ঞান করেন নি। তাঁর 'ভারততীর্থে'র রচনাকাল ১৩১৭। তার বেশ কিছু কাল আগে থেকেই যে এই ভাবনা তাঁর মনে দানা বেঁধেছে তার প্রমাণ তাঁর অন্য বহু রচনাতেই আছে। ১৩১১ সালে লিখেছিলেন, 'বিধাতা যেন বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।' এই রাসায়নিক কারখানা ঘরে যে-ভারতবর্ষীয় মহাজাতি তৈরি হয়ে চলেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে তার প্রায় প্রত্যেকটি উপাদানকেই তিনি সাগ্রহে সাদরে বরণ করেছেন। তাঁর সমসাময়িকেরা অনেকেই যা করতে পারেন নি, আজও অনেকে পারেন না। অধ্যাপক নাগকে লেখা পত্রে তিনি যেন প্রায় হতাশ প্রশ্ন করেছেন যে 'একপক্ষের যেদিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সেদিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে?' কিন্তু এর উত্তরও তো নিজেই দিয়ে রেখেছিলেন আরো ২৪ বৎসর আগেই।

১৩০৫ সালে লেখা 'কোট বা চাপকান' প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটি জাতি দাঁড়াইয়া যায় তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনো দিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দুমুসলমানে ধর্মে নাও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে—আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেই দিকে অনবরত কাজ করিতেছে।'

করিতেছে কি? এই 'মহৎ স্বার্থ'-টি রবীন্দ্রনাথ যেমন করে বুঝেছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন তাকে যদি আমরা গ্রহণ করতাম এবং যদি যথার্থই সচেতনভাবে আমাদের চেষ্টা সেই 'মহৎ স্বার্থ' রক্ষায় অনবরত কাজ করত তাহলে সেদিন ভারতবিভাগের দাবি আর আজ এত রকমের বিচ্ছিন্নতার দাবি এমন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠত বলে মনে হয় না। কে কোন্ রাজ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে নিরন্তর এই ভয়, আর সংখ্যা-গুরুত্ব বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক মানচিত্রের রেখাগুলি ক্রমাগত নতুন করে আঁকতে হবে—প্রত্যেকেরই এই নির্বোধ আর আত্মক্ষয়ী দাবি আমরা ঠেকাতে পারতাম যদি প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলিকে কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৎ কবি বলেই সমসাময়িক কোলাহলের ঊর্ধ্বে উঠে আত্মানুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি এমন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার থেকে যখন বাঙালি মুসলমান নিরুত্তাপ উদাসীনতায় সরে রইলেন তখনই তাঁর চোখ খুলল। তিনি এই সমস্যাকে তলিয়ে বুঝলেন এবং আর-পাঁচজন হিন্দুর মতোই মুসলমান সমাজকে সুবিধাবাদী এবং আনুগত্যের বিনিময়ে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে বিশেষ প্রশ্রয় প্রার্থী বলে গাল দিলেন না। বরং লিখলেন, 'সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম। সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি।'

বরং আমাদের আত্মীয়তার তাগিদটাই যে সুবিধাবাদী ছিল ভিতর থেকে ভেদবুদ্ধিকে দূর না করে আত্মীয়তার দোহাই পাড়াটা যে ভণ্ডামি—একথা যত অপ্রিয়ই শোনাক, তিনি তো বলতে ছাড়েন নি। বরং প্রায় অভিশাপের ভাষায় বলেছেন, 'এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।' সেই প্রায়শ্চিত্তের সবটুকু যে তাঁকে দেখে যেতে হয় নি এই তাঁর মহাভাগ্য।

মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি যে অসাধারণ কোনো ব্যক্তি ঠিক পথটা যথাসময়ে বাতলে দিলেও সমাজ কেন সে পথে চলতে পারে না? জনতাকে কোনো একটা পথে পরিচালন করার জন্য যে সম্মোহনী ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, হয়ত তা তাঁর যথেষ্ট ছিল না। নয়ত আমাদের দুর্বল স্থানগুলি কোথায়, কোথায় আমাদের উপর চোট আসতে পারে এবং সেই চোট ঠেকাবার উপায় কী—সবই তো তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। তবু আমরা সেই চোট ঠেকাতে পারি নি, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। উনি বলেছিলেন, 'বাহির হইতে হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না।—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনা অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারি নি, যেহেতু ভেদবুদ্ধির পাপকেও নিরস্ত করতে পারি নি।

এই ভেদবুদ্ধির পাপ দূর না করেই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের খুব সঙ্গত এবং খুব স্পষ্ট আপত্তি ছিল। কারণ ওঁর মনে হয়েছিল যে 'এই কাজটা মুলতবি হয়ে পড়ে আছে শত শত বৎসর ধরে।' আগের কাজ আগে সেরে নেওয়াটাই তাঁর বেশি দরকার বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা হাতে-হাতে ফল পেতে চান। দীর্ঘ দিন ধরে সমাজসংস্কারের ধৈর্য তাঁদের থাকে না। তাই তাঁদের যুক্তি ছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়েই এই ভেদবুদ্ধিকেও দূর করা যাবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নামলেই পারস্পরিক অপরিচয়, অবিশ্বাস এবং অন্ধ লোকাচারে বাধাগুলি দূর হয়ে যাবে। এই যুক্তিটাও একেবারে ফেলে দেবার মতন নয়, সে কথা ঠিক। তবে কাছাকাছি এসে হাত মিলিয়ে কাজ করতে নেমে যে আবার আচারের প্রাকারে কঠিন ধাক্কা খাবার আশঙ্কা থাকে, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হতে থাকে, একথাও তো ভেবে দেখা দরকার ছিল। 'লোকহিত' করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে কেমন অহিত হত সে কথাও তিনিই বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছু কাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।' রবীন্দ্রনাথ বেদনার সঙ্গে লক্ষ করলেন যে হিন্দুর কাছে মুসলমান যে অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু যে কাফের—স্বরাজপ্রাপ্তির লোভেও একথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউই ভুলতে পারে নি।

অন্তরে স্বাধীনতার চর্চা করব না, অন্তঃপুরে মেয়েদের স্বাধীনতা দেব না, দেশের এক বিরাট জনসংখ্যাকে পায়ের তলায় চেপে রাখব অথচ সমাজের ওপর তলার ভদ্রলোকের জন্য স্বাধীনতা প্রার্থনা করব, এই আচরণের মধ্যে যে কতখানি অসঙ্গতি আর আত্মবিরোধ রয়েছে তা বার-বার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তা ছাড়াও বলেছেন যে দশটি আঙুলকে পরস্পরে সন্নিবদ্ধ করে অঞ্জলি বাঁধার পর যদি কিছু গ্রহণ করা যায় তবেই তা অঞ্জলিতে থাকে নয়ত আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব গলে পড়ে যায়। স্বাধীনতা যদি কেউ হাতে তুলেও দেয় তবু তা আমাদের বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে যে গলে পড়ে যাবে সেটুকু দেখতে পাবার মতন দূরদর্শিতা তাঁর ছিল।

ভারতবর্ষীয় জাতি বলতে কাকে বুঝব সেই প্রশ্নে আর-একবার ফিরে আসা যাক। আসামে আজ কে ভারতবাসী আর কে ভারতবসী নয়, তার বিচার করতে বসে অহমিয়াভাষী নাগরিকরা যখন বিভাজনবর্ষ নিয়ে দরকষাকষি করেন, কিংবা ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে এসেছিলেন তাঁদের যদি-বা ভারতীয় বলে মেনে নিতে রাজি থাকেন তবু ১৯৭১ সালের পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের বিদেশী বলে বহিষ্কার করবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন আমরা সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ বোধ করি। কিন্তু সমস্ত কাণ্ডটায় ইতিহাসের যে একটা নিষ্ঠুর করুণ পুনরাবৃত্তি আছে সেটা মনে হয় আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই হয়ত স্মরণ করিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে না যে ভারত-ইতিহাসের ধারাতে আগেও অনুরূপ একটি বিভাজন-বর্ষ নির্ধারণ করে রেখেছেন অনেক ভারতবাসী। যে বৎসরে আফগানিস্তানের মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন সেই ১১৮৬ সালটিকেই মোটামুটি এইরকম একটা বিভাজন-বর্ষ জ্ঞান করেন কেউ-কেউ। কেউ বা সেটাকে আরো দেড়শ বৎসর পিছিয়ে দিয়ে গজনীর লুঠেরা সুলতান মাহমুদের প্রথম আক্রমণের সালটিকেই বিভাজনকাল ধার্য করেন। অর্থাৎ তারপর থেকে ঐ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে যাঁরা স্থায়িভাবেও এসেছেন তাঁদের যথার্থ ভারতবাসী এবং তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে উপজাত নবসংস্কৃতিকেও ভারতীয় সংস্কৃতি বলে স্বীকার করায় অনেকের মনেই প্রতিরোধ রয়েছে। আমরা অনেকেই যে-ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব করি, যার পুনরুজ্জীবন কামনা করি, সেই ঐতিহ্য এর পূর্ববর্তী কালের। তাই দেখা যাচ্ছে যে কে ভারতবাসী আর কে ভারতবাসী নয়, এবং কে-ই বা এর বিচার করতে অধিকারী, এই মামলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম স্ব-নিযুক্ত বিচারক কিন্তু আসাম ছাত্রসভাই নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় পুনর্জাগরণের দিনেও এই প্রশ্নের বিচার একবার হয়ে গিয়েছিল। অন্তত কয়েকটি প্রবল কণ্ঠ মুসলমানের বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রশ্ন করেছেন, 'অতীতে সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এই কথা বলিতে দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস।' এবং তারপর একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে 'হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এদেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্মরণ রাখার যোগ্য রবীন্দ্রনাথের সেই অভিমত যে, 'একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরার' মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দুমুসলমান ইংরাজ আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না-থাকিবে।' এই দীর্ঘ বাক্যটি একটি দোধারী তলোয়ার। বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিতাড়নবাদী দুই দলকেই দুদিকে কাটে।

রবীন্দ্রনাথ যদিও ঐ উদ্ধৃত পত্রে বলেছেন, 'হিন্দুমুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে' তবু একথা মোটেই সত্য নয় যে এই দুই ধর্মের দূরত্বকে তিনি অসেতুবন্ধ্য জ্ঞান করতেন। এই দুই সমাজের মানুষ এত শত বৎসর ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হয়ে বাস করার পরেও এদের দূরত্ব কেন ঘুচছে না তা আলোচনা করতে গিয়ে অনেকবার বলেছেন যে আর্যরা যে অর্থে বহিরাগত, ইংরেজরা যে অর্থে বহিরাগত, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান তো সে অর্থে বহিরাগত নয়—তাঁরা এই মাটিরই সন্তান কেবল একটি বহিরাগত ধর্মে দীক্ষিত। এই বহিরাগত ধর্মটি তুলনায় নবীন এবং প্রবল বলে হিন্দুধর্মের উপর এর আঘাতও লেগেছিল প্রচণ্ড জোরে। তখন আর-একবার আত্মরক্ষার তাগিদে হিন্দু সমাজকে নিষেধের এবং বিদ্বেষের প্রাচীর উঁচু করে গাঁথতে হয়েছিল। হিন্দুধর্মের অসাধারণ গ্রহিষ্ণুতা সত্ত্বেও এই সাত-আট শ বছরে ইসলামকে গ্রাস ও পরিপাক যে করতে পারে নি হিন্দুধর্ম তার থেকে একথাও প্রতিষ্ঠিত হয় যে দুই ধর্মের মধ্যে কিছু মৌলিক বৈপরীত্য আছে যার নিশ্চিহ্ন মিশ্রণ সম্ভব নয়। তবু সেই প্রাচীর ডিঙিয়েই এভং সেই বৈপরীত্যকে আত্মস্থ করেই কিছু সমন্বয়ের কাজও হয়ে চলেছিল প্রাণের স্বভাবধর্মে।

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন 'ভারতবর্ষের যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। ...ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত আছে যা সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে...'। এই ভাবনাকেই আরো একটু প্রসারিত করে "আত্মশক্তি ও সমূহ"-এ বলেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে তখন এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল ; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যেসকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য সাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নাই।'

অন্যপক্ষে সমাজের উচ্চতম এবং সচেতন স্তরের জন্য ব্রাহ্মসমাজেরও অনুরূপ একটি ভূমিকা ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। 'ব্রাহ্মসমাজকে তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে নিজেকে উপলব্ধি করবার' জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে 'ব্রাহ্মসমাজের' একটি 'ঐতিহাসিক তাৎপর্য' এই ছিল যে 'মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য' সেই সত্যকে 'ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সঞ্চিত বিপুল যে সাধনা আছে' তারই আত্মীয় বলে প্রতিষ্ঠা করা। ব্রাহ্মসমাজ যে এই ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য প্রবল উদ্যমে অগ্রসর হয়ে আসে নি, সেটা আমাদের সবার পক্ষেই এক পরম দুর্ভাগ্য এবং ওই সমাজের পক্ষে তো বটেই। আবার এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ যতটুকু সুকৃতি পূর্বেই অর্জন করেছিল তাকে মুসলমান সমাজ তো নয়ই, এমন কি হিন্দুসমাজও যে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেয় নি, একথাও স্বীকার করা ভালো। ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজের যে বিরাট ভূমিকা হতে পারত, যা হওয়া উচিত ছিল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, সেটা হয় নি বলেই ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর-এক প্রজন্মকালের মধ্যেই লুপ্ত হবে। যদি না অবশ্য কেউ দাবি করেন যে ইতিপূর্বেই তা হয়ে সেরেছে। এখন যত দিন না হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে ফেলছে ততদিন আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় marginal man বা প্রত্যন্তবাসী মানুষ হয়ে থাকতে হবে গুটি কয়েক ব্রাহ্মকে যাঁরা আজও অবশিষ্ট আছেন।

এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি যা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়, যেহেতু কথাটা রবীন্দ্রনাথের কীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি গত বৎসরে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য। বুধবার সকালে মন্দিরে উপাসনার অনুষ্ঠানেও গিয়েছিলাম—পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে। ছাত্রীবয়সের প্রিয় অতীতকে আর-একবার যতটুকু সম্ভব আস্বাদন করার চেষ্টা আর কী? কিন্তু সেদিন সেখানে যা দেখেছিলাম তাতে একটা কথা আমার মনে এসেছিল। আরো একদিকে রবীন্দ্রনাথের স্বল্প সার্থকতা ও প্রচুর ব্যর্থতার কথা। সেদিন মন্দিরে বিশ্বভারতীর অধিকাংশ ভবনেরই ছাত্রছাত্রীরা এবং অধ্যাপকেরাও অনুপস্থিত ছিলেন। পাঠভবন ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। শুনলাম ঐরকমই নাকি হয় আজকাল। তবে বাংলাদেশের কয়েকটি ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন—নানা ভবনের। সেদিন তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মনে হয়েছিল যেন তাঁরা মন্দিরের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বেশ তৃপ্তি পান। তখন হঠাৎ লক্ষ করি যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই বিগ্রহহীন মন্দিরে যে-ঈশ্বরের উপস্থিতি হিন্দুমনকে যথেষ্ট উজ্জীবিত করে না, সেই উপস্থিতিই ফুল ও ধূপের গন্ধে, আলপনার আভাসে, প্রার্থনা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীতে হয়ত বা আরো পূর্ণতর করে উপলব্ধি করেন মুসলমানেরা। কারণ মুসলমানের নিজস্ব প্রাত্যহিক ধর্মচর্যা বড়ো নিরলঙ্কার। সেদিন আমার মনে এই ভাবনাটাও জেগেছিল যে ধর্মবোধের দিক থেকে বোধহয় বাঙালি মুসলমান রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের আরো গভীরে গ্রহণ করতে পারবেন, বাঙালি হিন্দুর তুলনায়। দেবেন্দ্রনাথের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির যে অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুরই অন্তরের ধন হয়ে উঠতে পারছে না, একটা অভাববোধ থেকে যাচ্ছে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শান্তিনিকেতনের গা ঘেঁষে অরবিন্দনিলয়, সাধুবাবার আশ্রম ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা। সাঁইবাবা, মোহনানন্দরাও দূরে নেই বলেই শুনি। অর্থাৎ হিন্দুমনের পক্ষে রাবীন্দ্রিক ধর্মচর্চা যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক নয় কিন্তু মুসলমানের মনের কাছে হয়ত বা যথেষ্টর চেয়ে একটু বেশিই তৃপ্তিদায়ক। কথাটা কি ভেবে দেখবার মতন নয়?

হিন্দু-মুসলমানের মিলন অপেক্ষা করে আছে মনের পরিবর্তনের জন্য, যুগের পরিবর্তনের জন্য, এ ছাড়া অন্য পন্থা নেই—আগেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদটাকে যখন ক্রমে রাজনৈতিক দাবার শতরঞ্জের উপর বিধিমত সাজিয়ে ফেলা হচ্ছিল তখন উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ সুবুদ্ধির দোহাই পেড়ে ধর্মের দোহাই পেড়ে হৃদয়ের পরিবর্তনের কথাই বলে চলেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল 'রাষ্ট্রিক অধিকার সম্বন্ধে একগুঁয়েভাবে দরকষাকষি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মনকষাকষিকে অত্যন্ত বেশি দূর এগোতে দেওয়া শত্রুপক্ষের আনন্দ বর্ধনের প্রধান উপায়।' তার পরেও বুঝিয়ে বলেছেন, 'আমার বক্তব্য এই যে উপস্থিত কাজ-উদ্ধারের খাতিরে আপাতত নিজের দাবি খাটো করেও একটা মিটমাট করা সম্ভব হয় তো হোক, কিন্তু তবু আসল কথাটাই বাকি রইল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি দেওয়া মিল হতে পারে সে মিলে আমাদের চিরকালের প্রয়োজন মিটবে না। এমন কি পলিটিক্সেও এ তালিটুকু বরাবর অটুট থাকবে এমন আশা নেই, ঐ ফাঁকির জোড়টার কাছে বারে বারে টান পড়বে। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে আগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব। আমাদের মিলতে হবে ঐ গোড়ায়, নইলে কিছুতেই কল্যাণ নেই।'

একটা কথা রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন ; করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখা দরকার, যে 'হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

'আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব।...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই 'বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ'-টিই যে সেই পূর্ববর্ণিত 'মহৎ স্বার্থ' একথা না বলে দিলেও চলে। ধর্মের দেশে ধর্মের ভাষা বলাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। 'বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়োগ', Divine will ইত্যাদি ভাষা সম্ভব জাতীয় সংহতিকে পুষ্ট করার ইচ্ছাকে একটা অলৌকিক শক্তি জোগায়। যাই হোক এই 'নিয়োগের' লক্ষ্যে আছে যুগপরিবর্তন আর উপায় হল মনের পরিবর্তন।

হৃদয়-পরিবর্তনের কাজ নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হয়। আত্মসমালোচনাই আত্মসংস্কারের প্রথম ধাপ। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুসলমানের বিরূপ সমালোচনা যদি বা ক্বচিৎ দেখতে পাই, হিন্দুর সমালোচনা আদ্যন্তমধ্য। এটাকে ধৈর্যের সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে গ্রহণ করার মতন মানসিকতা আজও আছে কিনা সন্দেহ—সেদিনও যে বিশেষ ছিল না সে তো বলাই বাহুল্য। তারপর থেকে এত ঘা খেয়েও আমরা যে খুব শিখেছি তা তো মনে হয় না, বরং অন্য পক্ষকে উচিতমতন শিক্ষা দিতে হবে—এটাই বর্ধিষ্ণু জনমত।

তবু মুসলমানের তুলনায় হিন্দু যে একটু বেশি আত্মসমালোচনা করতে এবং পরের সমালোচনা সহ্য করতে সক্ষম, এটা কখনও কখনও তার স্বঘোষিত শত্রু-ও স্বীকার করেছে। একটা উপাদেয় উদাহরণ পেশ করি। তৎকালীন মুসলিম লীগের একজন প্রথম সারির নেতা, যিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, সেই আবুল মনসূর আহমদ সাহেব গান্ধীহত্যায় এতদূর অস্থির হয়েছিলেন যে হিন্দুদের অত্যন্ত আশালীন ভাষায় গাল দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রফুল্ল সেন মশাই ও আরো বহু হিন্দু নেতা নাকি প্রবন্ধটি পড়ে তাঁকে—মোবারকবাদ—অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ফলে এই ভদ্রলোক তাঁর 'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বৎসর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'হিন্দুস্তানে বসিয়া হিন্দুজাতিকে গাল দিয়া সম্মান ও তারিফ পাইলাম। মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন কথা বলিলে তা পাকিস্তানেই হোক আর হিন্দুস্তানেই হোক, মহাত্মাজির পিছে পিছেই আমাকে দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইত। কাজেই শেষ পর্যন্ত বুঝিলাম হিন্দুজাতি নীচ বটে কিন্তু নীচতা বুঝিবার মত উচ্চতাও তাদের আছে।' বাঁ হাতে দেওয়া প্রশংসাপত্র অবশ্যই, কিন্তু এই মন্তব্যে মুসলমানের নিন্দা, হিন্দুর নিন্দা এবং প্রশংসা সবই যে অকৃত্রিম—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিরোধের ধার ক্ষইয়ে দেবার জন্য আত্মসমালোচনা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। আত্মসমালোচনায় অসাধারণ সৎসাহস ও তীক্ষ্ণ আত্মানুসন্ধান দেখেছি রবীন্দ্রনাথে, তাই তাঁর ছোট একটি বিচ্যুতিরও উল্লেখ করি। 'কথা ও কাহিনী'-র 'হোরিখেলা' কবিতাটি আমাকে অল্প বয়সেই খুব বিচলিত করেছিল। শিশুপাঠ্য রামায়ণ-মহাভারতের কল্যাণে এদেশের শিশুরাও তো জানে যে, শত্রু যদি নিরস্ত্র হয় বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাহলে রণক্ষেত্রেও কোনো যথার্থ বীর তাকে হত্যা করে না। অথচ যে রাজপুতেরা আমাদের বীরত্বের আদর্শ, যে রাজপুত রমণীর অসাধারণ আত্মসম্ভ্রমবোধ তাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের বীরত্বে উদ্‌বুদ্ধ করত সেই রাজপুত রমণী কী করে পাঠান কেসর খাঁকে কপট হোলিখেলায় আহ্বান করে সানুচর তাকে এমন ক্রূরভাবে হত্যা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারল? যে-নীতিবিশুদ্ধ লেখনীর মহৎ সৃষ্টি গুরু গোবিন্দের 'শেষ শিক্ষা' কিংবা আখ্যানকাব্য 'সতী' কিংবা 'গান্ধারীর আবেদন' সেই একই লেখনীর সৃষ্টি এই 'হোরিখেলা' একথা ভাবতে ভালো লাগে না। 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিলো সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা'—শেষ পংক্তির এই দীর্ঘশ্বাসটুকুতে ছলনাময়ী আস্থাভঙ্গ কারিণীদের প্রতি যথেষ্ট ধিক্কার যে নেই, এতে আমাদের বিচারবোধ আহত হয়, স্বীকার না করে উপায় নেই। সম্প্রতি আরো বিমূঢ় বোধ করলাম শুনে যে এই কাব্যটিকেই জাতীয় সংহতির উপজীব্য হিসাবে নৃত্যগীতসহযোগে পেশ করছেন মমতাশঙ্করের দল। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সুবিচার করেন নি সেখানে অপরে কিভাবে অবিচারের কুশাঙ্কুর উপড়ে ফেলবে বুঝতে পারছি না।

যাই হোক, যে কোনো দ্বন্দ্বে আত্মপরনিরপেক্ষ ভাবে সুবিচার করার চেষ্টা থাকলে অন্যপক্ষের উপরেও একটা নৈতিক চাপ পড়ে তার ফলে। তা ছাড়া, প্রথমে নিজেদের সংশোধন করে নেবার পরেই তো বিরুদ্ধ পক্ষের সংশোধন দাবি করতে পারি আমরা। এইরকম একটা মনোভাবের সঙ্গে-সঙ্গে আরো একটা কথাও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল যে, সারা ভারতে হিন্দুই তো সংখ্যা গরিষ্ঠ, শিক্ষায় দীক্ষায় আর্থিক প্রতিষ্ঠায় বেশি অগ্রসর, অতএব বিরোধ মেটাবার কাজে যদি কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় তবে হিন্দুই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একধাপ এগিয়ে যেতে পারেন। তাই চাকুরির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে প্রচণ্ড কোন্দলের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বলতে পেরেছেন, 'মুসলমানেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এত দিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহা মুসলমানের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন প্রসন্ন মনে প্রার্থনা করি।...কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, তখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে লাভ অসম্ভব।'

এই ঐক্যের প্রশ্নে আর-একটা কথাও পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন, যেহেতু বেশ বড় একটা গোষ্ঠী থেকে দাবি উঠেছে যে ভারতীয় ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি হতে পারে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান। ঐ যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু হইবে'—এর অর্থ কী? উনিও কি ঐ-জাতীয় দাবিরই প্রবক্তা? অর্থটা কিন্তু উনি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন পরবর্তী বাক্যে 'তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।' কিন্তু এর আরো একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং সেই ব্যাখ্যা আমরা পাই 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে। ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু বলবেন কিনা এই সংশয়ের নিরসন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'হিন্দু-সমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দু-সমাজের পরিণাম।' তাই রবীন্দ্রনাথের মতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজেরই অঙ্গ। আবার কোনো কোনো প্রসঙ্গে দেখছি 'হিন্দু' এবং 'ভারতবর্ষীয়' তাঁর কাছে সমার্থক—বরং এইভাবে বলা যায় কেবল তথাকথিত হিন্দুই ভারতবর্ষীয় নয়, ভারতবর্ষীয়-মাত্রই হিন্দু। যে অর্থে এককালে মার্কিন দেশে ভারতবর্ষীয় মাত্রই Hindoo বলে পরিচিত ছিল।

নিজের যুক্তির জের টেনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তবে কি মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু-সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খৃষ্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খৃষ্টান। খৃষ্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাঁহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খৃষ্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব একই পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে। বরঞ্চ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল ও সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি—এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানব ধর্মের বিরুদ্ধে।'

আবুল মনসুর সাহেবরা প্রায় এক দশকের মধ্যেই দেশের নব্বুই ভাগ মুসলমানকে তাঁদের সর্বনাশা দ্বিজাতিতত্ত্ব লওয়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ যুক্তি এবং তথ্য বিস্তার করেও তাঁর এই শুভবুদ্ধিপ্রণোদিত একজাতিতত্ত্ব এমন কি ব্রাহ্মদেরও লওয়াতে পারেন নি—অন্যে পরে কা কথা। তাহলে কোন্ আশায় তিনি সেই পত্রে লিখেছিলেন, 'আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব।' য়ুরোপ যেমন করে মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে এসে পড়েছে সত্যসাধনা এবং জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে, তেমন করে এসেই আমরা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারব তাঁর এই ভরসাকে তো য়ুরোপই মিথ্যা—নির্মম মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছে। আধুনিকীকরণেও নৃশংস ঘৃণার সমাধান নেই, একথা অর্ধ শতাব্দী আগেই তো আমরা দেখেছি। বরং ঘৃণাকে সর্বব্যাপী করা সহজতর হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে। আর সেই ঘৃণার তাণ্ডব কী প্রলয়ঙ্কর হতে পারে আধুনিকতম প্রহরণের সহায়তায়, তাও আমরা দেখেছিলাম হিরোসিমা-নাগাসাকিতে।

তাহলে কি বলতে হবে যে সমাজ-পরিবর্তনের কোন্ তত্ত্ব গৃহীত হবে আর কোন্‌টি হবে না তা সেই তত্ত্বের সারবত্তা কিংবা যৌক্তিকতার উপর মোটেই নির্ভর করে না? বরং করে জনমানসের যৌথ প্রবণতার উপরে? কিংবা যে রাজনৈতিক তত্ত্বে কিছু বৈষয়িক প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে তা যতই কেন ভ্রান্তধারণা হোক্ যদি তেমন চিত্তাকর্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষায় তাকে পেশ করা যায় তবে তাই দ্রুত জনমানসকে অভিভূত করতে পারে। সম্ভবত বার্ট্রান্ড রাসেল মানবচরিত্র বিষয়ে যে নৈরাশ্যসূচক মন্তব্য করেছেন সেটাই যথার্থ যে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে 'sense' বা সুবুদ্ধি যূথবদ্ধ মানুষকে যতটা পরিচালিত করেছে 'nonsense' বা নির্বুদ্ধি তার চেয়ে নিয়ন্ত্রিত করেছে অনেক বেশি।

কিন্তু মানুষের সুবুদ্ধির, শুভ-ইচ্ছার উপর আস্থা হারালে, তাকে মঙ্গলের দিকে অনুপ্রাণিত করা যায় এই ভরসা না করতে পারলে, বর্তমানের কারাগার থেকে আমরা উদ্ধার পাব কোন্ পথে? রামজনমভূমি আর বাবরী মসজিদের বিতর্ক যদি লাঠি আর ছোরা ছাড়া নিষ্পত্তি না করা যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ কিংবা গান্ধীর মতো মানুষের জন্ম তো প্রকৃতির এক নিষ্ফল অর্থহীন কর্ম, নিদারুণ অপচয়।

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রচর্চাভবনে পঠিত আচার্য সত্যচরণ পাল বক্তৃতার ঈষৎ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৮ (১৩৯৪), সং ৯, পৃঃ ৭৭৭-৯০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাবীন্দ্রিক শিক্ষায় মুক্তি ও শৃঙ্খলা

'রবীন্দ্র ভাবনা'-র পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে একদা আচার্য যদুনাথ সরকার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুটি পত্র * বিনিময় হয়েছিল যা থেকে রাবীন্দ্রিক শিক্ষার মূলগত নীতি বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্য আহরণ করা যায়।

প্রথম থেকেই উচ্চশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালির মনে কবির প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রতি যে অনেকখানি অবিশ্বাস ছিল সেকথা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। তাই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের একটি প্রবন্ধে (My School) নিজের বিদ্যালয় বিষয়ে লিখতে গিয়ে গোড়াতেই লিখেছিলেন,

"I started a school in Bengal when I was nearing forty. Certainly this was never expected of me, who had spent the greater portion of my life in writing, chiefly verses. Therefore, people naturally thought that as a school it might not be one of the best of its kind, but it was sure to be something outrageously new, being the product of daring inexperience."

১৯০১ সালে এই 'outrageously new' ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তারপর দুই দশক কেটেছিল প্রতিষ্ঠানটিকে ঠিক মতো গড়ে তুলে তার একটা স্বকীয় রূপ দিতে। এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকেই নিজের ধারণা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ করে তোলার উদ্দেশ্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাও রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিল। সবাই জানেন যে প্রাচীন ভারতের আশ্রমিক পরিবেশে বিদ্যাচর্চার স্বনির্ভর ব্যবস্থাটি তাঁর মনকে তখন গভীরভাবে অধিকার করে রেখেছিল। তিনি নিজেও ঐ প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্রগুলির বিষয়ে লিখেছিলেন,

"These places were neither schools nor monasteries in the modern sense

*পত্র দুটি প্রবাসীর পাতা থেকে উদ্ধার করে 'রবীন্দ্রভাবনা' (এপ্রিল-জুন, ১৯৯২) মারফৎ আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য শ্রীসমরেশ্বর বাগচী আমাদের সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দশ বৎসরের পুরানো হলেও এই বিতর্কের মূল্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক নয়। আজও এই প্রশ্নগুলি শিক্ষক অভিভাবক এবং ছাত্রদের অনুধাবন করার যোগ্য। কারণ শিক্ষার যেমন কতগুলি চিরন্তন নীতি আছে তেমনি কতগুলি চিরন্তন সমস্যাও রয়েছে। প্রত্যেক যুগকেই নতুন করে তার সমাধান করতে হয়। তাই বিতর্কটি প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

of the word. ...This ideal of education through sharing a life of high aspiration with one's master took possession of my mind."

পশ্চিমী মডেলে তৈরী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলি তিনি সেভাবে গ্রহণ করতে চাননি। তাঁর আদর্শ বিদ্যালয় শুধু শিক্ষাগত অথবা বিভিন্ন মানের বিদ্যাবিপণী হবে এটা তাঁর পরিকল্পনায় ছিল না। অতএব কেটে ছেঁটে তৈরী 'জ্ঞান' সেখানে নগদ মূল্যে বিক্রয় করার কোনো উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল না। ঐ প্রতিষ্ঠানে একই কালে জ্ঞানসৃষ্টি ও জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন যথার্থ শিক্ষারই স্বার্থে। বিবিধ ক্ষেত্রের উৎসুক, সন্ধানী ও জ্ঞানী-গুণী মানুষ নিজের নিজের ক্ষেত্রে সাধনায় রত থাকবেন এবং তাঁদের নিরন্তর সঙ্গ লাভ করে উদ্বুদ্ধ হবে তরুণ শিক্ষার্থীরা। তাঁদের সেই সাধনার সুফল তারা সরাসরি গ্রহণ করতে পারবে এবং তাঁদের অনুসরণ করবে—এই রকম একটি বৃহত্তর ও সম্মিলিত সাধন ক্ষেত্রের ভাবনাই তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যেমন করে চারাগাছ বেড়ে উঠে ক্রমে একটি পরিণত বৃক্ষের রূপ পায় তেমনি করে তাঁর ঐ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়টিও তার স্বভাবের নিয়মেই বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। অন্তত রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যাপারটা এইভাবেই ঘটেছিল।

তবু তিনি নিজের অনভিজ্ঞতা বিষয়ে অতিমাত্র সচেতন হওয়ায় দেশের সারস্বত সমাজের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁরা তাঁর কল্পনাকে একটি নির্ভরযোগ্য রূপদান করার কাজে সহায় হন। অথচ যদুনাথের মনে হয়েছিল যে এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাধ্যাতীত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ছিল, বেশ ছিল। এরপর আবার বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে যাওয়াটা কবির বাড়াবাড়ি।

তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত (১৯২১) এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে রবীন্দ্রনাথ আচার্য যদুনাথ সরকারকে একটি পত্র লেখেন। যদুনাথ সেই পত্রের উত্তর দেন ৩১শে মে ১৯২২ তারিখে। কেন যে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ রক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না তা বেশ চাঁছা-ছোলা ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন। তাঁর এই উত্তরে বিদ্রূপ আর অবজ্ঞার ঝাঁজও ছিল। তাতে স্বভাবতই ব্যথিত হলেও এই সুপণ্ডিত এবং জ্ঞানান্বেষী বন্ধুর মতামতকে যথাযথ মূল্য দিয়ে তার বিচার করা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন বলে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে আজও কৃতজ্ঞ হয়ে আছি। আহত রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রত্যাঘাত করেন নি। বরং সবিনয়ে অথচ সবলে যুক্তিতথ্য সহযোগে যেভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন তাতে নিরপেক্ষ পাঠকের সহানুভূতি শেষ পর্যন্ত তাঁরই পক্ষ গ্রহণ করেছিল বলে আমার ধারণা।

যদুনাথ-রবীন্দ্রনাথের বিতর্কটি আদ্যোপান্ত অনুধাবন করার উদ্দেশ্যে যদুনাথের প্রধান যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করা যাক প্রথমে ঃ

(ক) পূর্বে যদুনাথ যে শান্তিনিকেতন দেখেছিলেন "তাহা স্কুল মাত্র ছিল। এখানে ছাত্রেরা চরিত্র ও দেহ এবং হৃদয় সুন্দর সুস্থরূপে গঠিত করিয়া, তবে তাহারা মামুলী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলেজে প্রবেশ করিয়া মামুলী বিদ্যা শিখিয়া মস্তিষ্কটা সংসারের উপযোগী করিত। এই যোগের ফলে অতি সুন্দর মনুষ্য গঠিত হইত ; অর্থাৎ আমাদের কলেজে যাহার অভাব বোলপুর তাহা পূরণ করিয়া দিত।" তবে শুধু শিক্ষা বা মস্তিষ্কের চর্চার পক্ষে বোলপুরে যা হচ্ছিল সেটা যে বেশ কাঁচা একথাটা রবীন্দ্রনাথই নাকি কোনো এক সময়ে যদুনাথকে বলেছিলেন।

(খ) 'কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা ভিন্ন ও অতি বৃহৎ। সে একটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাই (১) প্রতি বিভাগে সর্বোচ্চ দক্ষতাযুক্ত শিক্ষক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা বুঝিবার এবং সেই প্রণালীতে কাজ করিয়া উপযোগী শিক্ষা (অর্থাৎ intellectual discipline and exact knowledge) পূর্বেই পাইয়াছে এমন ছাত্রমণ্ডলী, (৩) শিক্ষার পরিপক্ক সচ্চরিত্র একনিষ্ঠ প্রধান নেতা।'

(গ) আমাদের মামুলী কলেজের I. A. এবং B. A. শ্রেণী চারিটি প্রকৃত পক্ষে বিলাতের ভালো সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ করে। এই চারিটি বৎসর খাটিয়া তবে আমাদের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার ও নিজে কাজ করিবার উপযুক্ত হয়। আপনি যেরূপ মনীষী সংগ্রহ করিতেছেন তাহাতে কালে তৃতীয় স্তরটিও (অর্থাৎ রিসার্চ ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ) বেশ কার্যকর হইবে যদি ছাত্র আসে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি (অর্থাৎ মামুলী কলেজের চারিটি শ্রেণী) এখানে একেবারে নাই। যে ছাত্র বোলপুরে আগাগোড়া শিক্ষিত হইয়াছে, সে কিরূপে রিসার্চ-অধ্যাপকের অধ্যাপনা বুঝিতে ও তাঁহার নির্দেশ মত কাজ করিতে পারিবে তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। কারণ প্রকৃত রিসার্চের ভিত্তি—অর্থাৎ উচ্চ General knowledge এবং দুই বা তিন বিষয়ের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাবদ্ধ পাঠ তাহাদের ঘটে নাই; তাহাদের মধ্যভাগটা কাঁচা রহিয়া গিয়াছে।

(ঘ) "তাহার উপর বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge এবং intellectual discipline-কে ঘৃণা করিতে এবং উহার শিক্ষককে, সেবকগণকে হৃদয়হীন শুষ্ক-মস্তিষ্ক 'বিশ্বমানবের' শত্রু, মেকি পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতে শেখে। তাহারা শুধু ভাবের দিকে, synthesis of knowledge-এর অত্যাবশ্যক ভিত্তি যে exact knowledge তাহা শেখে না; বরং শেখাটা অনুচিত কুশিক্ষা বলিয়া মনে করে। এই যেমন আকাশে এরোপ্লেন উড়িতেছে দেখিয়া তাহাদের মনে হয় আহা! কি সুন্দর, এইরূপ উড়াই মানব মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ কাজ ও সুখ! কিন্তু কত প্রেমের, কত শুষ্ক তপস্যার, কত exact knowledge-এর ফলে এরোপ্লেনের সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাবি না।..."

"আমি এখনও মানিতে প্রস্তুত নই যে বর্তমান ভারত জগৎকে দিতে পারে শুধু সেই খৃষ্টপূর্ব যুগের বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য, তস্য ভাষ্য, নব্য ন্যায়ের কচকচি, কেঁথা শেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকসা ; অথবা মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্তা। ভারতবর্ষ যে বিংশ শতাব্দীতেও জগৎকে exact knowledge দিতে পারে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি rechauffe অনুকরণ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া 'জগৎ সভার মাঝে' গ্রহণীয় নূতন জ্ঞান ভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে পারে—এ বিশ্বাসটাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা না করিয়া ছাড়িতে চাহি না।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(চ) "বোলপুরে এরূপ চেষ্টা সম্ভব নহে। সেখানে যে বায়ু সৃষ্ট হইয়াছে তাহা এই scientific method এবং exact knowledge-এর বিরোধী।...বোলপুরের ছাত্রগণ শেখে ভাবের (emotion) বাষ্পের আবরণ দিয়া জগতের দিকে তাকাতে, প্রথম হইতেই বসুধৈব কুটুম্বকম্ বলিয়া তাহারা অণুবীক্ষণ ফেলিয়া দিয়া শুধু দূরবীক্ষণই ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু জ্ঞান রাজ্যে অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণের কোনোটাকেই ছাড়িলে পূর্ণতা লাভ করা যায় না।"

(ছ) "আপনি যখন পদ্যে, ধর্ম ব্যাখ্যানে বা গল্পে বেদান্তের নির্যাস দেন তাহা তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে ; আমি তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লই, কারণ আপনার যুক্তির দ্বারা আমার মস্তিষ্কের নিকট, আপনার ভাবের দ্বারা আমার হৃদয়ের নিকট, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। আর, আমি জানি যে আপনি নিজ জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তবে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বোলপুরের দশ বছরের ছেলে—যোলো বছরের হউক না—'বিশ্বমানব', 'অব্যক্ত মর্মব্যথা' প্রভৃতি কথা আওড়াইতে থাকে, তখন পুঁটিমাছের মুখে তিমি মাছের গলার আওয়াজের মত এগুলি অসঙ্গত শুনায়।"

(জ) "বোলপুরের ছাত্রেরা যে আমাদের পেটেন্ট করা প্রস্তর চক্রে মস্তিষ্ক শানায় না ; exact knowledge, বৈজ্ঞানিক প্রণালী এবং intellectual discipline শেখে না, শেখা অন্যায় মনে করে—তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না।...বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে ইহা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এই রকম ছাত্রেরা রিসার্চ ক্লাসে উঠিয়া, মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা synthesis বাদে,—কোন কার্য করিতে সক্ষম হইবে না।—"

এতখানি উদ্ধৃতি দেবার পরেও মনে হচ্ছে যে তাঁর শাণিত দীর্ঘ পত্রটি আগাগোড়াই আর একবার পাঠকদের পড়া দরকার ছিল। কারণ যদুনাথ বেশ কিছু উপাদেয় উদাহরণের সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে সমর্থনের প্রয়াস করেছিলেন যা বাদ দিতে বাধ্য হবার ফলে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা যে রসলাঘব ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। যুক্তির ধারও হয়ত সামান্য ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তবু তাঁর মূল বক্তব্যের যে কোনো বিকৃতি ঘটাই নি একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। অবশ্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বক্তব্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র বোলপুরের শিক্ষার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছি।

এরপর রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরের সারাংশও সংক্ষেপে দিতে হয়। গভীর খেদের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন

(ক) যদুনাথের অভিযোগ যদি সত্য হয় অর্থাৎ "বোলপুরের ছাত্রগণ exact knowledge ঘৃণা করিতে শেখে এবং এইরূপ কাজের শিক্ষক ও সাধকগণকে হৃদয়হীন, শুষ্ক মস্তিষ্ক, বিশ্বমানবের শত্রু বলিয়া উপহাস করিতে অভ্যস্ত হয় তবে আমার এই বিদ্যালয় কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে, ইহার ফল বিষময়।"

"এতকাল পর্যন্ত এখানে ছাত্রেরা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইত। এখানে বেশীর ভাগ কেবল ছিল সঙ্গীত, চিত্রকলা, বাংলা সাহিত্য এবং অল্প কিছু বিজ্ঞান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে কারণেই হউক দেখা গিয়াছে এখনকার অধিকাংশ ছাত্রই কলিকাতার কলেজে গিয়া বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্তি হইয়াছে।—আপনি কি কোনো প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, ইহারা সেই স্বল্প পরিমাণ শিক্ষার মধ্যে accurate knowledge উপহাস করিতে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মনের মধ্যে এই একটি মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে প্রমাণসঙ্গত প্রণালীতে যে মনস্বীরা জ্ঞানের ভিত্তিপত্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা বিশ্বমানবের শত্রু?"

(খ) "একথা আপনার জানা আছে যে যথোচিত পদ্ধতিতে আমি নিজে শিক্ষালাভ করি নাই। মনে করিতে পারেন এই অশিক্ষাবশতই জ্ঞানান্বেষণের বিহিত প্রণালীকে আমি অশ্রদ্ধা করি,—এবং এই অশ্রদ্ধা আমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এখানকার অপরিণত বুদ্ধি বালকদের মনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এমন কথা যদি স্থির করিয়া থাকেন তবে আমাকে আপনি জানেন না, ইহার বেশী আর কিছু বলিতে পারি না। নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হইলাম, আমার কথা আপনি গ্রহণ করুন বা না করুন, সত্যের দোহাই দিয়া আমি বলিব যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ সঙ্গত অনুসন্ধান প্রণালীর প্রতি আমার একান্ত শ্রদ্ধা আছে। আমাদের দেশের সাবেক পণ্ডিত, এমন কি হাল আমলের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও প্রামাণিক পদ্ধতির চর্চা নাই বলিয়া আমি আক্ষেপ করি।"

(গ) "আমার এখানে ভাবাবেশের অস্পষ্টতায় বৈজ্ঞানিক সত্য দৃষ্টি কলুষিত হইয়া যায় এমন কথা আমার কোনো বন্ধু মহলে প্রচলিত আছে ইহা আমি জানি—কিন্তু তাঁহারা এখানকার কাজ নিকট হইতে দেখেন নাই এবং ব্যক্তিগত বিশেষ সংস্কার বশত তাঁহাদের ধারণা নির্মল নহে।"

(ঘ) "অবশ্য একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈজ্ঞানিকতাকে আমি যেমন মানি ভাবুকতাকেও তেমনি মানি। আমাদের আশ্রমের বায়ুতে সেই ভাবুকতার উপাদান যদি কিছু থাকে তবে সেটা কি চিত্ত বিকাশের পক্ষে হানিকর? সেই সঙ্গে আর কিছুও কি নাই? এখানে যে কৃষি বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহা যদি কাছে আসিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন যে তাহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমনি কার্যোপযোগী, তাহার কার্যক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রণালী বহু ব্যাপক।... এখানে ছুতারের কাজ, কামারের কাজ, চামড়া পাকা করিবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে 'বিশ্বমানবের' বিরুদ্ধতা করা হয় বলিয়া এখানকার কেহই মনে করেন না। কিন্তু আপনারা কি বলেন যে, ভাবুকতার কোনো সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল বিজ্ঞান ও এই সকল কারখানার কাজ শিখাইলেই exact knowledge-এর সাহায্যে ছাত্রদের মন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে?"

(ঙ) "আপনার পত্রের এক জায়গায় আপনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে 'খ্রীষ্টপূর্ব যুগে রচিত বেদান্তের নূতন ভাষ্যের ভাষ্য তস্য ভাষ্য, নব্য ন্যায়ের কচকচি, কেঁথা শেলাইয়ের প্যাটার্ণ এবং আলিপনার নকসার' উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যাহাকে 'বোলপুরের বায়ু' বলেন তাহা কি কেবল এই সকল ফসলেরই উপযোগী? বেদান্তের নূতন ভাষ্য ও নব্য ন্যায়কে বিদ্রূপ করিতে পারি এতটুকু জ্ঞানও আমার নাই। কিন্তু

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেঁথা শেলাইয়ের প্যাটার্ণ, আলিপনার নকসা সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবিৎ ও আর্ট সমালোচকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে—দেখিয়াছি সকল প্রকার জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশের প্রতি তাঁহাদের মানসিক বায়ু পরিশুদ্ধ বলিয়াই এগুলিকে তাঁহারা বহুমূল্য গণ্য করেন। আমার ইচ্ছা যে আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে এবং সেই সঙ্গেই জ্ঞান সাধনায় বিজ্ঞানের যে স্থান আছে তাহাকে সকলে সম্মান করিতে শেখে।"

(চ) "আমার প্রভাব কি আমার ছাত্রদিগকে ভাবাবেশের জড়তায় আচ্ছন্ন করিবে, আর যে-ক্ষেত্রে আমি অর্থাভাব এবং দেশের শ্রদ্ধা ও সহকারিতার অভাবের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিয়া একটা জিনিষকে গড়িয়া তুলিলাম সেই ক্ষেত্রটি ছেলেদের চোখেই পড়িবে না, আর সেই কঠোর সাধনার কোনো প্রভাবই তাহাদের উপর কাজ করিবে না? আমার এই বিদ্যালয়ের এরোপ্লেন কি কেবল ভাবের আকাশে উড়িল, ইহা কি কেবল 'আনন্দেই সৃষ্ট' হইয়াছে, ইহার মধ্যে সংকল্প নাই চিন্তা নাই, পরীক্ষা নাই?"

(ছ) "আমার শিক্ষা, আমার মতি এবং চরিত্র যাহা করিতে পারে তাহার বেশী কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার সামর্থ্যর অসম্পূর্ণতা জানি বলিয়াই আপনাদের মত জ্ঞানের সাধকদিগকে চাহিয়াছিলাম। যদি পাইতাম তবে সম্পূর্ণভাবেই আপনাদের পরিচালনা প্রণালী শিরোধার্য করিয়া লইতাম।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তাঁরই ভাষায় দশবার পড়লেও পাঠক উপকৃত হন মনে করি বলেই তাঁর পত্র থেকেও সমপরিমাণ উদ্ধৃতি দিতে সাহস করেছি এবং তা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যে যতটুকু বাদ দিয়েছি তাও দেওয়া উচিত হয়নি।

যাই হোক দুজনের বক্তব্য অনুধাবন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যদুনাথ প্রাথমিক-মাধ্যমিক-কলেজীয় এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ছাঁচটিকেই অপরিহার্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তাঁর মতে বোলপুরের পাঠভবনে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল সেটা মাত্র প্রাথমিক এবং কিছু দূর হয়ত মাধ্যমিক পর্যায়েরও বলে গণ্য হবার যোগ্য ছিল। এত অল্প প্রস্তুতি সম্বল করে ছাত্রেরা কিভাবে সেই সব মনীষীদের পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুফল গ্রহণ করতে পারবে যাঁরা তখন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এসে বিশ্বভারতীতে যোগ দিচ্ছিলেন? আশঙ্কাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অবশ্য তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এদেশের বেশির ভাগ কলেজেই বিলেতের ভালো সেকেণ্ডারী স্কুলের কাজ হয়। আর প্রকৃত কলেজের কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ এম. এ ক্লাস হতে আরম্ভ হয়। কথাটা আমরা আজও বলে থাকি এবং যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন যে বহু বিষয়েই, বিশেষত মানব বিদ্যায়, এমন কি এম. এ ক্লাসের পড়াশোনার মানও আজ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজের চেয়ে এমন কিছু উন্নততর নয়।

তবে সযত্নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দিয়ে ভিৎটা তৈরী করে দিলে পরে প্রয়োজন মতো পথ নির্দেশ বা গাইডেন্স পেলে যে উৎসুক ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানা বিষয়ে, এমন কি বিজ্ঞানেরও জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সে জাতীয় একক স্বশিক্ষার (individualized education) বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব ও করা উচিত—এই সব আলোচনা য়ুরোপ এমেরিকা থেকে তখনো যে কলকাতা পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি কেন সেটা ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়। আগ্রহী ছাত্রের শিখবার ক্ষমতাকে নিজে কখনও ছোট করে দেখেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীরা একদিকে, অন্যদিকে সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস, তুচ্চি, বোগদানভের মতো পণ্ডিতরাও তরুণ ছাত্রদের জন্য জ্ঞানের উপর মহলের দরজাও খুলে দিতে পারেন। তাছাড়া শুধু মস্তিষ্কের চর্চা তো নয়, সমস্ত ব্যক্তি স্বরূপটিকে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাই পাঠভবনের কাজটা মস্তিষ্ক চর্চার পক্ষে কিছুটা কাঁচা হলেও একটি সম্পূর্ণ মানুষ তৈরীর পক্ষেও কাঁচা হচ্ছিল কি?

বিশ্বভারতীকে আরো একটি ডিগ্রিধারী তৈরী করবার কারখানা হিসেবে তো গড়ে তুলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। প্রকৃতির কোলে একটি অনুকূল মুক্ত পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করছিলেন যেখানে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটতে পারে। "The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence." যদুনাথ চাইছিলেন 'higher education', রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল 'the highest education !' তাঁদের দুজনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞাই যে ভিন্ন হবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আজ সারা বিশ্বেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। আবশ্যিক সর্বজনীন শিক্ষা পেয়ে যারা এক সময়ে নানা কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তারাই আবার আগ্রহ ও অধ্যবসায় থাকলে ইচ্ছামতন পাঠ্য নির্বাচন করে পরিণত বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে পারে। যার যেখানটা কাঁচা রয়ে গিয়েছিল সেটাকে পাকা করে নেবার জন্য দরকার মত কোর্স করে নেওয়া যায়। ধাপে ধাপে অগ্রসর না হলেই 'তজ্জনিত অভাবটি পরে বাহির হইতে পূরণ হইতে পারে না। বয়স ও সুযোগ চলিয়া গেলে...' এসব কথা নিয়ে এখন আর কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। বয়সও যায় না, অসংখ্য সুযোগও সৃষ্টি করেই চলেছে উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। কারণ সারা জীবন ধরেই শেখা যায়, তাই শেখার সুযোগও পাওয়া উচিত।

আর রবীন্দ্রনাথ যে প্রাথমিক মাধ্যমিক ইত্যাদির এই ধার-করা ছাঁচটিই ভাঙবার ব্যর্থ চেষ্টা তখনও করে চলেছিলেন তা অনেকেই বুঝতে পারেন নি, অনেকেই বুঝতে পারলেও সমর্থন করতে পারেন নি। এই কারণে তাঁর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই ক্রমে পরিবেশের চাপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হচ্ছিল। নয়ত শান্তিনিকেতনের সার্টিফিকেটের জোরে তখনও তো কর্মক্ষেত্রে বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রাইভেটে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থাটি মেনে নিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী I. A., I. Sc, ও B. A. ক্লাসও সেখানে শুরু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায়—সেও প্রয়োজনের তাগিদেই। ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত আমরা অনেকেই বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন কলেজে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছি। তবে সেই সঙ্গে কলাভবন ও সঙ্গীতভবনেও কিছু শিখতে উৎসাহ দেওয়া হত। এবং নানা সহ-পাঠক্রমিক কাজেও।

এরই সমান্তরালে বিশ্বভারতীরও ঐ পর্যায়ের নিজস্ব পাঠক্রম আর পরীক্ষাব্যবস্থাও ছিল বটে কিন্তু তার জন্য দু তিন জনের বেশি ছাত্রছাত্রী পাওয়া যেত না। মনে রাখা ভাল যে শিক্ষাভবনে বা পাঠভবনে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাটা ছিল রাবীন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 'গোঁজামিলন'। পরে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পেলে ঐ 'গোঁজামিলনটিই' স্থায়ী রূপ পেল। কারণ দেশের মানুষ এই ছাঁচটিকেই বোঝে এবং এর উপরেই আস্থা রাখে। 'আমাদের মুশকিল এই যে আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই করা রীতিনীতি চাল চলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়ে এই ছাঁচ দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। এই ছাঁচে ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে, একথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।'...'ছাঁচ উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটি মাত্র উপায় আছে—এই ছাঁচের পাশে একটি সজীব জিনিষকে অল্প একটু স্থান দেওয়া।...' এই কথা তিনি ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫) লিখেছিলেন। আর ঐ একটু স্থান দেবার ব্যাপারে উনি অপরের মুখাপেক্ষী না হয়ে ১৩০৮ (১৯০১) থেকেই নিজে চেষ্টা শুরু করে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে বর্তমানের উপযোগী, বরং একটি ভবিষ্যৎমুখী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সজীব ধারণা ও পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ দেবার চেষ্টা করেছিলেন সেটি যেমন গোড়াতেই যদুনাথ ধরতে পারেন নি তেমনি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও মাসুদ কমিটির অধিকাংশ সদস্যও গ্রহণ করতে পারেন নি ; যদিও অবশ্য আদত রাবীন্দ্রিক পরিকল্পনাটি কয়েকজন সদস্য নূতন করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন বলে কিছুটা তর্কবিতর্ক হয়েছিল বলে শুনেছিলাম।

গত শতাব্দীতেই শিক্ষার লক্ষ্য, উপায়, উপকরণ, পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠান—সবই পশ্চিম থেকে গৃহীত হয়ে আমাদের নব্য শিক্ষিতদের অভিভূত করেছিল। তখন থেকে একেই অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করেছিলেন আধুনিকেরা। এই নির্বিচার অনুকরণের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় একক, অতএবে দুর্বল বিদ্রোহ ক্রমশ হার মানছিল। গড্ডলিকা প্রবাহকে তিনি ঠেকাতে পারেন নি। আমি জানি না রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত কিছু কৈশোরিক অপ্রিয় অভিজ্ঞতা আর প্রাপ্ত বয়সের মৌল চিন্তাভাবনার ফল কিনা। অথবা সমসাময়িক পশ্চিমী প্রতিবাদী ভাবনা-চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাছ থেকেও কি কিছুটা উৎসাহ লাভ করেছিলেন তিনি? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সবিনয়ে বলেছেন, 'It was not any new theory of educatoin but memory of my school days'! কিন্তু সেই সময়ে যুরোপের বহুদেশে এবং যে ব্রিটিশ মডেলে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজা হয়েছিল সেই ব্রিটেনেও নতুন শিক্ষাচিন্তা এবং এক্সপেরিমেন্ট যথেষ্টই চলছিল, সরকারী সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি। এমেরিকায় তো কথাই নেই, কারণ ঐতিহ্যের ভারে তার অগ্রগতি ততখানি বাধাগ্রস্থ ছিল না যতখানি য়ুরোপে ছিল। রবীন্দ্রনাথ এসবের কতটুকু সন্ধান পেয়ে ছিলেন জানতে ইচ্ছা করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের কাছ থেকে পাওয়া যে exact knowledge এবং intellectual discipline এর মহিমা কীর্তন করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন যদুনাথ সেই exact knowledge and intellectual discipline তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল ইংরেজি ভাষার জগতেও যা এঁদের কারুর পক্ষেই দুরধিগম্য ছিল না। আমি কেবল একজন সমসাময়িক প্রতিবাদী ভাবুকের কথাই উল্লেখ করব আজ। ইনি স্বনামধন্য ইংরেজ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ এ্যালফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড। Principia Mathematica রচনায় ইনি বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সহযোগী ছিলেন। এঁর অন্য বড় কাজ ঃ Science and the modern world; অতএব ইনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যাথার্থ্য ও পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে অনবহিত ছিলেন এমন নয়। তবু দেখছি এঁর শিক্ষা-চিন্তা যদুনাথের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বেশি অনুকূল। শান্তিনিকেতনে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সেই সময়ে চলছিল তার সন্ধান পেলে তাকে উৎসাহিত করতে ইনি অন্তত এতখানি কুণ্ঠিত হতেন বলে মনে হয় না। ১৯২৪ সালে ইনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে যোগ দেন এবং এমেরিকাতেই অবশিষ্ট জীবন কাটান। এমেরিকার উচ্চ শিক্ষাকে বর্তমান শতাব্দীতে ইনি যতখানি প্রভাবিত করেছেন ততটা সম্ভবত একমাত্র জন ডিউই ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি। তাঁর Aims of Education পুস্তকটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার সুবিস্তৃত প্রভাব ঘটেছিল।

যে বৎসরে যদুনাথ-রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রবিতর্ক ঘটেছিল সেই ১৯২২ সালেই প্রকাশিত হোয়াইটহেডের একটি পুস্তিকায় (Rythm of Education) তিনি যা বলেছিলেন তার আলোচনা বর্তমান বিষয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রম-বর্ধমান পাঠক্রম আর বৌদ্ধিক শৃঙ্খলাই ছিল হোয়াইটহেডের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। শিক্ষার্থীর যে একটি জীবন্ত, বাড়ন্ত মন থাকে আর এই মনের উপর নিশ্চল জ্ঞানের (inert ideas) বোঝা চাপিয়ে তার স্বাভাবিক বিকাশ রোধ করলে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলতা করা হয়, অতএব শিক্ষার্থীর প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে—এই কথা ক'টিই ইংল্যাণ্ড এমেরিকার শিক্ষক সমাজকে তিনি কয়েক দশক ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। 'Inert ideas' বলতে তিনি কি বোঝেন তা বুঝিয়ে বলেছেন, "that is to say, ideas that are merely received into the mind without being utilised or tested or thrown into fresh combination.

এই নিশ্চল জ্ঞানের বোঝা যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাই নয়—ব্যক্তি ও সমাজের প্রগতির পক্ষে কখনও কখনও ক্ষতিকর। দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষার ইতিহাসে মাঝে মধ্যে অল্প কিছু কালের জন্য বৈপ্লবিক ভাবনা চিন্তা সাড়া জাগায়, কিছু ব্যক্তিকে উদ্দীপ্ত করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তার পরেই আবার দীর্ঘ কাল ধরে শিক্ষার নামে ঐ নিশ্চল জ্ঞানের বোঝাই শিক্ষার্থীদের মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। মনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়। কৃত্রিম প্রয়োজনগুলি অগ্রাধিকার পায়। 'Every intellectual revolution which has ever stirred humanity into greatness has been a passionate protest against inert ideas. Then, alas, with pathetic ignorance of human psychology, it has proceeded by some educational scheme to bind humanity afresh with inert ideas of its own fashioning.' তখন আবার রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন বিষয়ের নিত্য নতুন তথ্য ও তত্ত্ব মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করাতে পারলেই শিক্ষকেরা আর অভিভাবকেরা তৃপ্তি লাভ করেন যেন বেশ বিধিমতন সুশিক্ষা দেওয়া হল। কিন্তু সেই বিদ্যার কতখানি শিক্ষার্থীর জীবনে কোন্ কাজে লাগল সে প্রশ্ন কেউ করেন না। চিত্তের কতখানি উন্মেষ ঘটল, বোধবুদ্ধি কতখানি সক্রিয় হল, হৃদয় কতখানি প্রসারিত হল তা নিয়ে বড় কেউ মাথা ঘামান না। কিন্তু হোয়াইটহেড মনে করতেন, 'Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge. কথাটা কিছু নতুন নয়।

কিন্তু এই অত্যন্ত মূল্যবান পুরানো কথাটাই স্মরণে রাখার সময় কোথায় অত্যুৎসাহী শিক্ষক আর উচ্চাভিলাষী অভিভাবকদের? কারণ জ্ঞানের বহর যে নিত্য বেড়ে চলেছে, তাই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যথাসাধ্য গলাধঃকরণ করা আর করানোই তো শিক্ষা। এদিকে জ্ঞানের পুঞ্জ যতই উত্তুঙ্গ হতে থাকুক মানব-শিশুর শৈশব-কৈশোরের কালটি তো পনের বছরই থেকে যাচ্ছে। অতএব শিক্ষালাভের উপযুক্ত নমনীয় সময়টা তো বিশেষ প্রসারিত হচ্ছে না। তবে বিধিবদ্ধ শিক্ষার কালটুকু সামনে পিছনে দুদিকেই অল্পস্বল্প বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে মাত্র। ফলে এটুকু সময়ের মধ্যেই ছাত্রদের ধরে বেঁধে যত উপায়ে যত বেশি গলাধঃকরণ করিয়ে দেওয়া গেল সময়টা ততই সার্থক হল বলে মনে করেন অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ। সেই জ্ঞানকে আত্মস্থ করার, ব্যবহার করার, ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নেবার সুযোগ কি করে দেওয়া সম্ভব? সময়ই বা কোথায়? ফলে এই শিক্ষার উপর প্রায়ই থাকে দেবযানীর সেই অভিশাপ ঃ

......করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।'

তাহলে এই ঊর্ধ্বশ্বাসে গিলে রাখা জ্ঞান শিক্ষার্থী কেন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবে? তার কোন্ প্রয়োজনে লাগছে, তার নিজস্ব কৌতূহল কতখানি মেটাচ্ছে? তার কোন ব্যক্তিগত চাহিদার তৃপ্তি হচ্ছে? সব তো বাইরে থেকে বড়দের চাপিয়ে দেওয়া এবং ছোটদের অসহায় ভাবে মেনে নেওয়া। বলা হয়ে থাকে, আজ যদি বা কোনো প্রয়োজন নাই মেটায় এই সব জ্ঞান তবু ভবিষ্যতে মেটাবে... বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যখন ওরা যাবে তখনই যথাসময়ে দেখতে পাবে ঐ প্রস্তুতির কত দরকার ছিল। কিন্তু যারা যাবে না? তবু মনটাকে শানিয়ে তো রাখা যাক এখন, পরে এই শান দেওয়া হাতিয়ার জটিল জ্ঞানের অরণ্য কেটে, জীবনের দুরূহ সমস্যাগুলি ছেঁটে পথ করে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহায় হবে। আর হোয়াইটহেড ছিলেন এই 'শান দেবার' নীতিরই তীব্র বিরোধী। Exact knowledge আর intellectual discipline ছাত্রদের কোন কাজে লাগবে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে হোয়াইটহেড বলেছেন,

'There is a traditional answer to this question. It runs thus: The mind is an instrument, you must sharpen it, and then use it : the acquisition of the power of solving quadratic equation is part of the process of sharpening the mind ...it embodies a radical error which bids fair to stifle the genius of the modern world. I do not know who was first responsible for this analogy of the mind with a dead instrument.'

মানুষের সবচেয়ে বড় যে সম্পদ তার মন সেই সদাকর্মচঞ্চল মনকে একটা অস্ত্রের মতো জড় পদার্থের সঙ্গে তুলনা প্রথমে যেই করে থাকুন না কেন, সেই ভ্রান্ত উপমা বহু গণ্যমান্য শিক্ষকের সমর্থন পেয়ে বহুকাল যাবৎ সত্যের সম্মান লাভ করে এসেছে। যদুনাথ কোন মৌল ভ্রান্তি পোষণ করেন নি। বহু প্রজন্মের অসংখ্য শিক্ষক এইভাবে শিক্ষার নামে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কখনও বা ক্ষতিকর পাঠক্রমকেও অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে বলপ্রয়োগ করেও প্রবেশ করিয়েছেন এবং তার জন্য আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। এই পাঠক্রমই সেই পেটেন্ট করা প্রস্তর চক্র যাতে বোলপুরের ছাত্রদের মাথা শানানো হয় না বলে তাদের সম্বন্ধে নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন যদুনাথ এবং অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে ওরা "মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা synthesis বাদে কোন কার্য করিতে সক্ষম হইবে না।" সাধারণত অত্যন্ত মৃদুভাষী হোয়াইটহেড কিন্তু এই প্রসঙ্গে কঠোর ভাষায় শিক্ষকদের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন। 'But what ever its weight If authority, whatever the high approval which it can quote, I have no hesitation in denouncing it as one of the most fatal, erroneous and dangerous conceptions ever introduced into the theory of education...

নিজের সমর্থনে তিনি মন নামক বস্তুটির স্বভাব, চরিত্র, আচরণ ও বিকাশের ধরন—সবই ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। "The mind is never passive, it is a perpetual activity, delicate, receptive, responsive to stimulus. You cannot postpone its life until you have sharpened it. আগে তো মস্তিষ্কটাকে শানিয়ে নেওয়া যাক, পরে একে দিয়ে দরকারী কাজ করিয়ে নেওয়া হবে—এমনতর ভ্রান্ত শিক্ষানীতির নিন্দা শুধু হোয়াইটহেড নয় আরো বহু চিন্তাশীল শিক্ষক ও দার্শনিকরাও বহু দিন থেকে করছেন।

তাই বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান শিক্ষাবিদরা মনে করেন যে শিক্ষার্থীর মনের তৃপ্তির জন্য তার বাস্তব চাহিদাগুলিকে মেটানোর কাজটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলে চলে না। আজ যা বহু পরিশ্রমে সে শিখছে তার ষোলো আনা না হোক বারো আনা নগদ উপকার যদি আজই শিক্ষার্থীরা বুঝে নিতে না পারে তাহলে শিক্ষায় না থাকে আনন্দ না থাকে সত্যিকারের উপার্জনের আত্মবিশ্বাস। তখন কোন্ পড়া দিতে পেরে মাস্টারমশাইকে কে কতখানি খুশি করতে পারল, কে কত নম্বর পেল সেটাই হয় গর্বের ব্যাপার। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটাই যায় গুলিয়ে। এই কারণেই শিক্ষকদের স্মরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করিয়ে দেওয়া হোয়াইটহেড অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন যে,

"Whatever interest attaches to your subject matter must be evoked here and now whatever power you are strengthening in the pupil, must be exercised here and now. That is the golden rule of education, and a very difficult rule to follow."

গতানুগতিক পাঠক্রমকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ না করে, পঠন পাঠনের চিরাচরিত রীতি ভেঙে নতুন নতুন পরিস্থিতিকে শিক্ষার কাজে লাগানো যে কত কঠিন তা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের সমস্যাগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে' বহু আলোচনা থেকেই আমরা জেনেছি। এভাবে কাজ করতে গেলে প্রতি মুহূর্তেই অভ্যস্ত পথে ফিরে গিয়ে দায়িত্বটাকে সহজ করে নেবার কত যে প্রলোভন শিক্ষককে জয় করতে হয়, শিক্ষক-অভিভাবক সবাইকেই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি, কল্পনা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিত্য নতুন কত যে প্রমাণ দিতে হয় পদে পদে, এ কথাটা হোয়াইহেডেরও অজানা ছিল না।

"All practical teachers know that education is a patient process of the mastery of details minute by minute, hour by hour, day by day. There is no royal road to learning through the airy path of brilliant generalisations. There is a proverb about the difficulty of seeing the wood because of the tree. That difficulty is exactly the point which I am enforcing. The problem of education is to make the pupil see the wood by means of the trees."

খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলিকে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনমত এবং সাধ্যমত জোড়া দিয়ে দিয়ে যে-জ্ঞানের আর উপলব্ধির জগত তৈরী হয় তাই তার অর্জন, তাই তার যথার্থ শিক্ষার সুফল। একথা যদি আমরা মানতে রাজি থাকি তাহলে আর পাঠক্রম রচনা করবার সময় বহু বিভিন্ন বিষয়ের অগণিত বিচ্ছিন্ন তথ্যের ভাণ্ডার আর পরোক্ষ-লব্ধ সত্যের বিপুল সম্পদ উজাড় করে দেওয়াটাই অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে না। বরং শিক্ষার্থী তার জীবন থেকে যা আহরণ করতে পারে তাই হবে তার সত্যকার পাঠক্রম, বিশেষ করে শিক্ষার জগতে সদ্য-আগত শিশুদের পক্ষে তো বটেই। তাই হোয়াইট হেড অবলীলায় বলতে পেরেছিলেন, 'There is only one subject for education and that is life in all its manifestations.'

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ যা প্রথম থেকেই জীবনমুখী। শিক্ষার্থী আর শিক্ষকের সম্মিলিত জীবনকে শিক্ষার কেন্দ্রে রাখতে চেয়েছিলেন বলেই আশ্রমিক শিক্ষার প্রাচীন আদর্শটি তাঁর এত মনের মত হয়েছিল। 'Thus in the ancient India the school was there where was life itself. There the students were brought up, not in academic atmosphere of scholarship and learning, or in the maimed life of monastic seclusion, but in the atmosphere of living aspiration. They took the cattle to pasture, collected firewood, gathered fruit, cultivated kindness to all creatures, and grew in their spirit with their teachers' spiritual growth.' বুঝতে পারা যায় যে এই জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ কোনো সংকীর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বাদেশিকতার প্রাচীন পন্থী মোহে নয়—বরং ছাত্রের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি আন্তরিক উৎসাহে। এ বিষয়ে তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির উৎসও নিশ্চয়ই তাঁর কৈশোরিক অভিজ্ঞতার তীব্রতা।

যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় তত দিনে বিদেশী সরকারের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 'সেগুলি মোটের উপর একজামিন পাসের কুস্তির আখড়া ছিল।' এরকম বিরূপ সমালোচনা সেদিনও হত, আজও হয়। কিন্তু বিকল্প উন্নততর ব্যবস্থার চেষ্টা তো দেখা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন, 'গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমন করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক না।' এবং শুধু বলা নয় হাতে কলমে করে শেখাতেও কসুর করেন নি। তবু কেন তাঁর এই ছাঁচ ভেঙে ফেলার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রয়াস বলতে গেলে ব্যর্থই হয়েছে, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবু কিছুটা পুনরাবৃত্তি করতে হল এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ যে কালে এই দেশে নতুন করে মুক্ত জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলছিলেন সেই সময়েই য়ুরোপ-এমেরিকার অগ্রসর শিক্ষা ভাবনাতেও তাঁর সমর্থন পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু স্বদেশের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটাকে কবির খেয়ালীপনা মনে করে গুরুত্ব দিতে চাননি।

গতানুগতিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করবার জন্য কি কি অত্যাবশ্যক তার সংক্ষিপ্ত তালিকা তো যদুনাথ তাঁর পত্রে দিয়েই ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন তার জন্য কি কি অপরিহার্য তা আরো ১৫/১৬ বছর আগেই স্পষ্ট করে বলেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে।' এই নিষ্ফলতা থেকেই ছাত্রদের যথাসাধ্য রক্ষা করবার আশায় তাদের সম্ভাষণ করে বলেছিলেন, "আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। দেশের কাব্যে গানে ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রত কথায়, পল্লীর কুটিরে কুটিরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই আহ্বানে যদি তোমরা সাড়া দাও তবেই তোমরা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে পারিবে।"...এই প্রসঙ্গেই আবার স্মরণ করুন শান্তি নিকেতনে "কেঁথা শেলাইয়ের প্যাটার্ণ, আলিপনার নকসা, মুঘল চিত্রের সাত নকলের খাস্ত" নিয়ে যদুনাথের নিষ্করুণ মন্তব্য। কিন্তু ছাত্রদের যেমন ১৯০৫ সালে বলেছিলেন, "বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ", যদুনাথকেও তেমনি ১৯২২ সালে লিখেছিলেন, "আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছা আমাদের আশ্রমের মানসিক বায়ু সেইরূপ পরিশুদ্ধ হউক যাহাতে এই সকল পদার্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া কেহ অবজ্ঞা না করে।" বিদেশে বহু জ্ঞানী গুণীর সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখেছিলেন জ্ঞানের সব ক্ষেত্রের প্রতিই তাঁদের কতখানি আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। বিশ্ব সংসারের কোনো তন্নিষ্ঠ জ্ঞানচর্চাই আপাঙ্‌ক্তেয় নয়। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য বিষয়ে এই দুই ব্যক্তির চিন্তা ভাবনা যে ভিন্ন খাতে বইছিল এতে অবাক হবার কি আছে? বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার কাজে পরস্পরের শরিক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আবার দেখুন, হোয়াইটহেড যেমন বলেছেন যে সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের উপর কঠিনতর দায়িত্ব বর্তায় ছাত্রকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে ক্রমে বৃহত্তর এমন কি বিশ্বজনীন সত্যের পথে নিয়ে যাবার ('to make the pupil see the wood by means of the trees.') তেমনি রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'আইডিয়া যত বড়োই হউক তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে দূরে যাওয়া।' তা যদি করা না হয় তবে আমাদের উৎসুক ইন্দ্রিয়গুলি উপবাসী হয়ে থাকে, নিরুদ্যম বুদ্ধি অকেজো হয়ে পড়ে, কর্মহীন মন অপুষ্টিতে ভোগে।..."We are made to lose our world to find a bagful of information instead. We rob the child of his earth to teach him geography." বিশ্বের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে পুঁথি মুখস্থ করাই তখন শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হয়ে ওঠে। 'পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়ে জানি।"

যদুনাথ অভিযোগ করেছিলেন যে 'বোলপুরের বায়ু' বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুকূল নয়। "জগতের দিকে তাকাতে প্রথম হইতেই বসুধৈব কুটুম্বকং বলিয়া তাহারা (বোলপুরের ছাত্ররা) অণুবীক্ষণই ব্যবহার করিতেছে।" অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের সাহায্যে তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে সযত্নে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে, ধীরে ধীরে তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠা করে সত্যের অনুসন্ধান করার মতো ধৈর্যও তাদের নেই, প্রশিক্ষণও তারা পায় না। অস্পষ্ট কতগুলি ভাবের কথা, জ্ঞানের নানা বিষয়ের ভাসা ভাসা synthesis- এর গাল ভরা বুলি না-বুঝেই আওড়াতে শেখে। অর্থাৎ তাদের শিক্ষার মোট ফল একটা মেকি কাব্যিকতা আর দার্শনিকতা।

কিন্তু এত সহজেই রাবীন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিকে অসার, অগভীর বলে বাতিল করে দেওয়া ঠিক হয়েছিল কি? এই কটু সমালোচনার বহু পূর্বেই শিক্ষার সার্থক পদ্ধতি কি হতে পারে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং তাঁর মনে হয়েছিল ঃ "At first they must gather knowledge through their love of life, and then they will renounce their lives to gain knowledge, and then again they will come back to their fuller lives with ripened wisdom."! মানব মনের স্বাভাবিক বিকাশের ছন্দের সঙ্গে শিক্ষার ছন্দকে এইভাবে মিলিয়ে দেবার প্রয়াসের মধ্যে কি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ দুইই মিলে যায় না? অবশ্য ঐ 'love of life' ব্যাপারটা কোনো কোনো কঠোর পণ্ডিতের কাছে অবোধ্য ও প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে। কিন্তু কবির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট কারণ তিনি কোনদিন ভোলেন নি যে সুদূর শৈশবে প্রথম যখন একটা ক্লাসরুমে তাঁকে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সহসা "I found my world vanishing from around me, giving place to wooden benches and straight walls staring at me with the blank stare of the blind." রূপ রস গন্ধে ভরা তাঁর নিজস্ব রহস্যময় স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে এনে সেসবের বিকল্প হিসেবে কিছু পুঁথি হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি তো জানতেন যে "children are in love with life and it is their first love. All its colour and movement attract their eager attention." এরই পাশাপাশি স্মরণ করছি হোয়াইটহেডের উক্তি : "An infant's first romance is its awakening to the apprehension of objects and to the appreciation of their connexions." সেই প্রথম প্রণয় থেকে, রসময় রহস্যময় বিশ্ব সংসার থেকে সরিয়ে এনে একটি কৃত্রিম শিক্ষার দেয়াল ঘেরা জগতে বন্দী করা মনোবিজ্ঞান-সম্মত কিনা, করবার নৈতিক অধিকার আমাদের আছে কিনা এ প্রশ্নও রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন। 'নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে।' তখন তাদের উৎসুক ইন্দ্রিয়গুলিকে সহজ আনন্দে প্রিয় পরিবেশের সঙ্গে বিবিধ সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করা—এসব কি অবৈজ্ঞানিক? কবি হলেও রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রথম থেকেই অগাধ শ্রদ্ধা ও কৌতূহল ছিল একথা সবাই জানেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি কিভাবে অগ্রসর হবে এ বিষয়ে অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সাক্ষ্যও আর একবার নেওয়া যেতে পারে। বৌদ্ধিক বিকাশকে (intellectual development) ব্যাখ্যা করে বুঝবার চেষ্টায় তিনি হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্স্ অনুসরণ করেছেন। থিসিস, এন্টিথিসিস, ও সিনথেসিসের পর্যায়গুলিকে গ্রহণ করেও তিনি নাম পালটে দিয়ে করেছেন The stage of romance, the stage of precision, এবং the stage of generalisation। বিশ্বের সঙ্গে প্রথম অস্পষ্ট পরিচয়ের যে আনন্দময় অনুভূতি, তাকে ঠিকমতো জানবার বুঝবার জন্য যে আকুলতা, তার সঙ্গে মনের প্রথম সম্পর্ক স্থাপনের যে-রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য তাকেই বলেছেন The stage of romance। এখান থেকেই জানার শুরু, শিক্ষারও আরম্ভ।

এরপরের পর্যায়ে সেই প্রাথমিক পরিচয়কে নিশ্চিত রূপে অধিগত করার পালা। "It is the stage of grammar, the grammar of language, the grammar of science" প্রথম পরিচয়ে যা কিছু আভাসে পাওয়া গিয়েছিল, এবার তাকেই স্পষ্ট করে বুঝবার চেষ্টায় তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখা, খণ্ডগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককে খুঁজে বার করা, তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নূতন তথ্য যোগ করা। অধরাকে এবার শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরবার চেষ্টা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবশেষে আসে সেই পর্যায় যাকে হোয়াইটহেড বলেছেন, "a return to romanticism with advantage of classified ideas and relevant technique" এবং রবীন্দ্রনাথ আগেই যাকে বলেছেন, "come back to their fuller life." এর ফলে জানার প্রক্রিয়া আর মনের পুষ্টি তখন আর পৃথক ব্যাপার থাকে না। আহার্য যেমন করে আত্মস্থ হয়ে দেহকেই গড়ে চলে জ্ঞানও তেমনি আত্মস্থ হয়ে মনে পরিণত হতে থাকে। "আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয়।"

মানুষের মন তার স্বভাব ধর্মে ভিতরের তাগিদেই যেমন করে বিকশিত হতে থাকে সেই ধরনটিকে অনুসরণ করাই মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই কবি-দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ-দার্শনিক দুজনেই মানব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে মনোবৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতিকেই সমর্থন করেছেন। ভাষা কিংবা সাহিত্য চর্চার পক্ষেও যেমন এটি যথাযথ পদ্ধতি, বিজ্ঞান চর্চার জন্যও তেমনি। ইতিহাস, ভুগোল, জ্যামিতি কি প্রাণীতত্ত্ব—যে কোনো বিষয়কেই ঠিক মতো অধিগত করার জন্য এই পর্যায়গুলি অপরিহার্য। মন যদি অসময়ে অপরিমিত পরিমাণে দুষ্পাচ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে অজীর্ণ রোগে অর্থাৎ নিরুৎসুকতায় অথবা অনৌৎসুক্যে না ভোগে তাহলে জীবনব্যাপী আমাদের নিরন্তর জানার প্রয়াসে এই পর্যায়গুলিই বৃত্তাকারে ফিরে ফিরে আসে। জানার জন্যই জানার যে আনন্দ তা অনিঃশেষ হয়ে থাকে যদি না ভ্রান্ত শিক্ষণ পদ্ধতি জিজ্ঞাসু মনেরও অকাল বার্দ্ধক্য ডেকে আনে।

রবীন্দ্রনাথ ও হোয়াইটহেডের শিক্ষা-চিন্তার সামগ্রিক তুলনামূলক বিচার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার স্থান তাঁরা যেখানে নির্দেশ করেছিলেন তা নিয়েও বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমি এই প্রখ্যাত দার্শনিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার সাযুজ্যের প্রতি সাধারণ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি শুধু এই কারণে যে এখনও অনেকের ধারণা যে বিশ্বভারতীর কবি-প্রতিষ্ঠাতার কাণ্ডজ্ঞানের বেশ অভাব ছিল। তাই তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে নৈতিক ও বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে ছাত্রদের যতখানি স্বাধীন সক্রিয় ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তাকে অনেকেই অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে করেন।

তাই আজ যাঁরা সরকারী অর্থানুকূল্যে বিশ্বভারতীকে আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগোত্রীয় করে ফেলায় প্রায় সক্ষম হয়েছেন তাঁরা এই মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে যা হোক তবু এই ক্ষুদে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটা বিশ্বাসযোগ্য রূপ দেওয়া গেল—প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা পেল। কিন্তু সেটা যে ময়ূরও হয়ে উঠল না, কাকও রইল না এই বোধটাও অনেকেরই আছে। কিন্তু অল্প কয়েকজন হলেও কিছু রবীন্দ্রানুসারী ব্যক্তি বোধ হয় এদেশে এখনও আছেন যাঁরা অনুভব করেন যে এই দেশের একজন অসাধারণ শিক্ষাভাবুকের প্রতি আমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি এবং যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিই নি। তাঁর শিক্ষাচিন্তার তন্নিষ্ঠ অনুধাবন এবং ছোট আকারে হলেও এই পরীক্ষামূলক প্রয়াসটি চালিয়ে যাবার একটা দায় বাঙালির ছিল। ভাবের সঙ্গে কর্মের মিল কতখানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘটানো যায় তা নিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের তথা বাঙালিরও একটা অপবাদ হয়ত কিছুদূর ঘুচত।

এই প্রসঙ্গে বার বার রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তাভাবনার পুনর্বিচার হওয়া দরকার যে এর কতখানি আজো অভিনব, বৈপ্লবিক ও ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে সহায়। আর কতখানি অসার কবিকল্পনা অতএব বাস্তবে অনুসরণের অযোগ্য। অন্তত একজন রবীন্দ্রভক্ত মনে করতেন যে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতী থেকে উদ্ধার করে অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কে করবে?

রবীন্দ্র ভাবনা, বর্ষ ১৮ (১৯৯৪), সং ১, পৃঃ ১-২৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খণ্ডিত প্রতিমা

কলকাতার কোনও পথপ্রান্তে একটি গান্ধীমূর্তিকে সম্প্রতি কেউ ধ্বংস করেছে। সংবাদপত্রের ছবিতে দেখা গেল বাঁ পা'টি শুধু হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে এবং এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওই খণ্ডিত পদতলেই প্রণাম জানাচ্ছেন। বেশ মনে রাখার মতো ছবি। একজন সম্পূর্ণ অসচেতন মানুষের এমন নম্র অথচ সবল প্রতিবাদ পশ্চিম বাংলার বর্তমান জঙ্গি ও শ্রদ্ধাহীন আবহাওয়ায় এখনও যে সম্ভব তাও যেন বিশ্বাস হয় না।

সে যাই হোক, নবযুগের কালা পাহাড়দের ধন্যবাদ। এরা হাতে-কলমে না হোক হাতে-শাবলে ওই কাজটা করে চোখ খুলে দিয়েছে। এমনিতে তো মনে থাকে না যে কত অসংখ্য প্রাতঃস্মরণীয় জনের মূর্তিকেই আমরা খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছি এবং যে যার সাধ্যমত এক খণ্ড ঘরে এনে তুলে রেখেছি কপালে ঠেকাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। প্রত্যেকেই নিজের খণ্ডটুকুকেই আরাধ্যের সম্পূর্ণ প্রতিমা জ্ঞান করে থাকি। উপায়ও নেই, যার যত বড় অঞ্জলি সে তো ততটুকুই ধরবে। 'হায়...তোমারে ধরিবে কে'বা!'

নিম্ন গাঙ্গেয় সমতলভূমির অধিবাসীরা যদি ম্যালেরিয়ার নতুন নতুন মারীবীজ, আন্ত্রিক রোগ অথবা এড্‌স এড়িয়ে আরও হাজার বছর টিকে থাকতে পারে এবং এই একই ভাষায় কথা বলে চলে তাহলে হাজার বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবন থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবেন এমন আশঙ্কা নেই। কোনও এক খণ্ড রবীন্দ্রনাথ থাকবেনই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে আজ কোন্ রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের সর্ব ঘটে বিরাজ করছেন তা লক্ষ করে দেখলে খানিকটা অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের কোন্ খণ্ডটি সব চেয়ে টেকসই হবে। তবে 'বিশ্বকবি' রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালির, সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এমন একটা আপ্ত-সংস্কার আপামর বাঙালির নিশ্বাসের হাওয়ায় অক্সিজেনের মতো মিশে আছে এবং তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিনা আয়াসে ছড়িয়ে গিয়েছে। তার আত্মগরিমাকে স্ফীত করেছে। এর জন্য মস্তিষ্কের কোনও সচেতন চর্চার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু ওই রবীন্দ্রনাথ নামের মানুষটিকে যে অমন করে পড়ে পেয়েই আদ্যোপান্ত জানা, বোঝা আর আত্মস্থ করা সম্ভব নয় এইটুকু বোধ হয় গড়পড়তা বাঙালিও বুঝতে পারে।

এক কালে [illegible] কবিরা কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেবল মরমে নয়, সমস্ত সত্তায় সঞ্চারিত হতে পারতেন। তাই অক্ষর-পরিচয়হীন মানুষও বঞ্চিত হতেন না। যেমন করে কবি ভানুভক্ত নেপালি মানসকে কিংবা সন্ত তুলসীদাস হিন্দিভাষী জগৎকে কিংবা কৃত্তিবাস 'মুদিখানা থেকে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত' আবহমান কালের বাঙালিকে অভিসিঞ্চিত করে রাখতেন সে তো আজ আর সম্ভব নয়। 'সেই ট্যাডিশান সমানে' আরও কয়েক প্রজন্ম চলতে থাকলে স্বয়ং এস. ওয়াজেদ আলিই মাথায় হাত দিয়ে বসতেন,—অবশ্য বেঁচে থাকলে। আর বাঙালি তার চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বার হয়ে আশার পথ খুঁজে পেত না।

যে ভাবে শেক্‌সপিয়র দেশ কালকে অতিক্রম করে বিশ্বমানসের যাত্রাপথে একটি অনির্বাণ বাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন, কিংবা গ্যয়টের কাছে জর্মান ভাষাভাষী আর টলস্টয়ের কাছে রাশিয়ানরা আজও যে ভাবে পথ-নির্দেশ প্রত্যাশা করতে পারে সেই ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বাঙালি যদি কিছু আলো, কিছু দিশার সন্ধান চায় তবে হয়ত খুব বেমানান কিছু হয় না। আন্তর্জাতিক মানে ওই তিন জনের পাশে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় করানো যায় কিনা এ প্রশ্ন তুলবার মতো বাঙালির যে অভাব নেই এটা বাঙালির পরিণত-বয়স্কতার লক্ষণ বলেই মনে করব। তবু দেশের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে যা বলা হয়ে থাকে সংস্কৃতিক মান সম্বন্ধেও বোধ হয় সে কথা কিছুটা প্রযোজ্য—প্রত্যেক জাতিই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী তা পায়। কিন্তু প্রত্যেক কবি অথবা সব প্রতিভাধর মানুষই নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পরিবেশ পান এমন কথা তো বলা যায় না। ফলে প্রতিভার অপচয় প্রায়ই ঘটে থাকে এ কথা অস্বীকার করাও যায় না।

রবীন্দ্রনাথ কেন যে গ্যয়টের সমতুল্য কবি হয়ে উঠতে পারেননি তার কারণ নির্দেশ করে যদি কেউ বলেন যে, নির্বিচারে ভালোমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, মঙ্গল-অমঙ্গল সর্ব রকমের অভিজ্ঞতা অর্জনের মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না বলেই তাঁর সাহিত্যকর্ম পেশীহীন পাণ্ডুর রয়ে গেল, আন্তর্জাতিক মাপের সাহিত্যিক তিনি হয়ে উঠতে পারলেন না—তাহলে আপাতত তা নিয়ে বিতর্ক করব না। তবু মনে করিয়ে দেব যে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও এ বিষয়ে একটা বক্তব্য ছিল, যা নেহাত ফেলে দেবার মতো নয়।

১৮৯৪ সালের ১২ই অগস্ট তিনি ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ...জর্মানিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোলট শিলার কান্ট প্রভৃতি বড় বড় চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারিদিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণ-পরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি।...নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে...ভাবের ক্ষুধাই জন্মায়নি, তাদের জড় শরীরের ভিতরে একটা মানস শরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠেনি, সেইজন্য তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যক বোধ নিতান্তই কম।...গ্যয়টের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণ-সঞ্চারক সঙ্গ যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব!...

এই নিরস্তে-পাদপে দেশে তিনি সারা জীবনে প্রায় কখনই যে সমকক্ষ ভাবুকের 'প্রাণ সঞ্চারক' সঙ্গ লাভ করেননি এ-কারণে যদি রবীন্দ্রনাথের মনে ক্ষোভ.জন্মে থাকে তবে তাকে অন্যায় বলা যায় না। পূর্ণ আত্মবিকাশের পক্ষে অন্য মনের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর আনন্দময় সংঘাত তো সত্যিই অপরিহার্য। অথচ তা যথেষ্ট পরিমাণে না পেয়েও যে তিনি একটি নিঃসঙ্গ মহীরুহে পরিণত হতে পেরেছিলেন, এটাই একটা লক্ষ করবার মতো ঘটনা। এক দিকে তিনি ছিলেন সমপ্রতিভাবান সুহৃদের উত্তেজক সঙ্গে-বঞ্চিত, অন্য দিকে আবার তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিস্বরূপের প্রতিটি মাত্রার সার্থক মূল্যায়ন করতে সক্ষম অনুরাগীও বিশেষ পাননি।

তাই তিনিও 'এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন।' বিদ্যাসাগরের নিঃসঙ্গতা তিনি না বুঝলে কে বুঝবে? অবশ্য বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে শান্তিনিকেতনে অথবা জোড়াসাঁকোয় দিবারাত্র অসংখ্য ভক্ত পরিবৃত কবির সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় আত্মনিবার্সিত পণ্ডিতটির কোনও মিল পাওয়া কঠিন। কিন্তু মিল একটা ছিল ঠিকই। ওই সাদৃশ্যের চরিত্র-নির্দেশ করতে হলেও আবার তাঁরই ভাষা ধার করতে হয়। 'বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে... ...বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে তিনি ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়া ছিলেন।...

অন্য পক্ষে জনতার সঙ্গ বিষয়ে একটা অদ্ভুত দ্বিধা-বিভক্ত ভাব ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। জনতার সঙ্গ কামনাও করতেন, আবার বেশিক্ষণ সহ্যও করতে পারতেন না। তাঁর স্বভাবের এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। নিজেই স্বীকার করেছেন যে দূর থেকে অনেক সময় মনে করতেন যে, তিনি খুব লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং 'আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে' বেড়াবেন। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা যেন 'তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে' পালের জাহাজে ছুটে চলার কল্পনার মতো। অপরিণত বয়সে যেমন ভেবেছেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি' । অথচ "লোকসমুদ্রে আন্দোলনে" মুহূর্তকাল থাকলেই নাকি তাঁর অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে উঠত। তখন আবার দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতায় ফিরে আসতেন। দেখা যাচ্ছে, নিজেকে এমনি করে ছড়িয়ে ফেলা, আবার কুড়িয়ে আনার খেলা শুধু তাঁর জীবনদেবতারই স্বভাব ছিল না।

তাঁর এই স্বীকারোক্তির প্রায় দশ বছর পরেই তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আবার অল্প দিনের মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়েও নিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে অবশ্য তাঁর মনে প্রথম থেকেই অনেকটা সংশয় এবং প্রতিরোধ ছিল। গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ যে তাঁর সমাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে তাঁর কবি প্রকৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্ব—এ কথা আংশিক সত্য। আবার বাস্তবের সংস্পর্শে মোহভঙ্গ ব্যাপারটাও যে না ছিল এমন নয়।

কিন্তু এ-জাতীয় আন্দোলন যে প্রায়ই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কখনও ভণ্ডামি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কখনও বা অত্যাচার হয়ে ওঠে এই ঘটনাটাও নিশ্চয়ই তাঁর অতি সংবেদনশীল চিত্তে অবিলম্বেই ধরা পড়ে যেত। তখন সেই আন্দোলনের সংসর্গ তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠত। অবস্থাবিশেষে আর কারুর মনে হোক বা না হোক তাঁর মনে হতে থাকত যে 'আন্দোলন-সভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়া ছিলাম, রঙ ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়া ছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে!' আদর্শের একটা উঁচু তারে বাঁধা থাকা কোনো গণ-আন্দোলনের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই তাঁর পক্ষেও বেশিদিন কোনো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। অথচ যখনই বড় একটা আদর্শের নামে ডাক এসেছে তিনি প্রথমটায় সাড়া না দিয়েও পারেননি।

আরো কিছু উল্লেখযোগ্য পরস্পর-বিরোধী ঝোঁক তাঁর চরিত্রকে এবং সেই পরিমাণে তাঁর জীবনকেও ঐশ্বর্যময় করেছে। কাব্য আর সঙ্গীত আকৈশোর যাঁকে এতখানি অভিভূত করে রেখেছিল এবং এই দুই দিকেই যাঁর সৃজনীপ্রতিভা প্রথম থেকেই এত অসাধারণ স্বীকৃতি পেয়েছিল, সেই একই ব্যক্তি যে শুধু পারিবারিক জমিদারি আর ধর্মসম্প্রদায়ের জোয়াল কাঁধ পেতে নিয়েছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে দেশ ও সমাজের রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব স্বীকার করে এগিয়ে যেতে যে পেরেছিলেন এর তুলনা স্বদেশে বা বিদেশে খুব কি আছে? এইসব অতি-সাংসারিকতার চাপে তাঁর শিল্পীস্বভাব যে অহরহ পীড়িত হত তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। তবু সেই পীড়ার লক্ষণ এত কেন কম দেখতে পাই এটাই আমার বিস্ময়। বরং মনে হয় যেন এইসব বাধা অনায়াসে অতিক্রম করার জেদে ডালপালা ছড়িয়ে চলেছিলেন তিনি। অবশ্য এক্ষেত্রে 'মনে হয়' বলার কোনো অর্থ হয় না, যেহেতু পরিণত বয়সে পৌঁছে নিজেই বলেছেন

'হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছ গুচ্ছ অঞ্জলি মেলে আছে
আমার চারিদিকে চিরকাল ধরে,
আমি-বনস্পতির এরা কিরণ-পিপাসু পল্লব স্তবক,'

সব পরিস্থিতিতেই জীবনরস শোষণ করতে উৎসুক ছিল তাঁর মন। ব্যক্তিগত আঘাত, ব্যর্থতা, অব্যাপারে লিপ্ত হবার যন্ত্রণা—কিছুই যেন ফেলা যায়নি, সবই তাঁর শিল্পীসত্তার পক্ষে বাঞ্ছিত সম্পদ।

তিনি যে স্বভাবসূত্রে নির্জনতার মানুষ হয়েও প্রায়ই ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছেন এই 'অস্বাভাবিক' আচরণের পিছনে একটা তীব্র নৈতিক প্রবর্তনা ছিল যা সারা জীবনই তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন তো পরবর্তী কালের ব্যাপার। আরো আগে থেকেই কখনও চাষীদের ঋণমুক্ত করার জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক খুলে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কখনও বা রেশম শিল্পের উন্নতি করতে গিয়ে 'দুই লক্ষ ক্ষুধিত রেশম কীটকে আহার ও আশ্রয় জোগাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে' উঠেছেন নিজেও এবং পরিবার পরিজনকেও উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন। কখনও আমেরিকান ভুট্টার বীজ এনে চাষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করিয়েছেন, কখনও মাদ্রাজি সরু ধানের। ঠাকুর কোম্পানির ডুবন্ত ব্যবসাকে ভাসিয়ে তুলতে গিয়ে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর আসনেও টান পড়েছিল। আমস্তক ঋণের দায়ে কিছুকাল উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন কবি। শুধু জমিদারিই যেন যথেষ্ট যন্ত্রণা নয়, তার উপর আবার পাট, ভুসিমাল, আখমাড়াই কলের ব্যবসাতেও যখন কবিকেই পরামর্শদাতা হতে হয় তখন যে দুই পক্ষেরই সর্বনাশ আসন্ন এটাও কি না ঠেকে শেখা যায় না!

অথচ এই সবের মধ্যেও নাকি একখানা sketch book নিয়ে মাঝে মাঝেই ছবি আঁকতে বসে যেতেন। "বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যারিস সেলোন-এর জন্য তৈরি করচিনে, এবং কোনও দেশের ন্যাশনাল গ্যালারি যে এগুলি স্বদেশের ট্যাকস বাড়িয়ে সহসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশ মাত্র নেই।"

সবাই জানেন যে বছর ত্রিশেক পরে সেই প্যারিসেই তাঁর ছবির প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়েছিল। Galerie Pigalle-এর প্রদর্শনী প্রায় যেন রাতারাতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিত্রশিল্পী হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। পরিহাসচ্ছলে যা কল্পনা করেছিলেন তা যে এমন সত্য হয়ে যাবে সে কি নিজেও ভাবতে পেরেছিলেন সেদিন? অথবা ভাবতে পেরেছিলেন বলেই কি পরিহাসের ছলটুক করতে হয়েছিল, পাছে অপরের উপহাস কুড়াতে হয়!

প্যারিসের প্রদর্শনী মারফত যাচাই হয়ে যাবার আগে স্বয়ং চিত্রকরও পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতো সংশয়-শঙ্কায় আবার কিঞ্চিৎ অসম্ভবের প্রত্যাশায় যে দোলায়মান ছিলেন এ কথা এখন সবাই জানেন। তাই তাঁর পরম-হিতৈষীরাও তাঁর এই কলম নিয়ে তুলি নিয়ে ছবি আঁকার খেলাকে কতখানি সিরিয়সলি নেবেন তা যদি তখন বুঝে উঠতে না পেরে থাকেন তবে তার জন্য দোষ ধরা যায় না। বরং আজ সেসব কাহিনী উপাদেয় তথ্য বলে মনে হয়। রবীন্দ্র-গবেষিকা ডঃ কেতকী কুশারী ডাইসনের কল্যাণে জানা গেল, যে-ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো সেদিন সর্বশক্তি দিয়ে প্যারিসে একটি সার্থক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তিনি নিজেও ছবিগুলি সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেননি। ওই সময়ে একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে নাকি লিখেছিলেন, 'He makes decorative and curious things. He would like to exhibit in Paris, but, as he says, would not like to 'make a fool of myself.' He called me to consult me. And I did not know what advice to give him. Rathi (Rabindranath's son) shows his father's drawings as if they were those of a son of his......'

প্যারিসে প্রদর্শনীর আগে পর্যন্ত তাঁর ছবি সম্বন্ধে আত্মীয় ও বন্ধু সমাজে এই সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাবটা অবশ্যই বোধগম্য। কিন্তু প্রদর্শনীর পরেও বেশ কিছু কাল—অন্তত তাঁর জীবৎকাল তো বটেই—অর্থাৎ আরো ১১/১২ বছর, তাঁর ছবি সম্বন্ধে যে এদেশের চিত্র বোদ্ধা ও কলা-কুশলীদের মধ্যেও বিশেষ কোনো আগ্রহ বা মত প্রকাশের 'দুঃসাহস' দেখা যায়নি এতে তিনি যে হতাশ বোধ করেননি এমন হতেই পারে না। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে তখন একটি রীতিমতন কলাভবন ছিল তন্নিষ্ঠ শিল্পচর্চার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে সেই সময়ে কলাভবনের কী প্রতিক্রিয়া ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা উৎসুক মানুষের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে।

অবশ্য ভবনের অধিকাংশ প্রতিভাবান শিল্পীরই ঝোঁকটা তখনও ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের দিকে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির আঙ্গিক ও শিল্পভাবনা ওকাকুরার কাছ থেকে গ্রহণ তো করতে পেরেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুরা। এমন কি ওকাকুরা যে দুটি তরুণ শিল্পী তাইকান ও হিশিদাকে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে শিখতেও তো কোনও মানসিক প্রতিরোধ তাঁদের ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে তাঁরা মোটামুটি সসম্ভ্রম নীরব ছিলেন, তার আসল কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তাঁর মনের নাগাল পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গে তাঁর নান্দনিক ভাবনার বিনিময় করতে অগ্রসর হননি। আবারও দেখা যাচ্ছে সেই 'প্রাণ সঞ্চারক সঙ্গ' পাননি চিত্রী রবীন্দ্রনাথও।

রবীন্দ্রনাথ যদি সর্বশক্তি দিয়ে শুধু চিত্রকর হতেন অথবা ভাস্কর, যদি কেবল নট হতেন অথবা নাট্যকার, তবে বাঙালির পক্ষে তাঁকে বোঝা সহজ হত, অন্য সংস্কৃতির মানুষকে বোঝানোও সহজ হত। কিন্তু একটি ব্যক্তি এত রকম কিছু হতে গিয়ে, হতে পেরেই, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। নিজেরাই যখন লোকটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঠিকমতন ঠাহর করতে পারি না তখন অবাঙালিরা যদি শুধু বিস্ময় নয় অবিশ্বাসও বোধ করেন তাহলেও রাগ করবার কিছু নেই। তুলনীয় বিস্ময় আর অবিশ্বাসের ভাবান্তর যে বাঙালির মনে ঘটে না তার কারণ এই যে তারা সবাই তাঁকে অ থেকে হ পর্যন্ত বুঝে ফেলেছেন।

তাঁর আসল কারবার যে-ভাষা নিয়ে সেই ভাষার বাইরেও তাঁকে পৌঁছে দেওয়া যে কত কঠিন তার যথেষ্ট প্রমাণ এত দিনেও কি পাওয়া যায়নি! এমন কি তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরিজিটা ইংরিজি কিনা সে নিয়েও সংশয় ঘোচেনি। ইদানীং যাঁরা এই ক্ষেত্রে কসরত করছেন তাঁদের পারস্পরিক ত্রুটি অনুসন্ধান থেকেও এইটুকু আমরা পাঠকরা বুঝতে পারি যে ব্যাপারটা সোজা নয়। তবু তাঁর গল্প উপন্যাস এমন কি কবিতাও অক্ষম অনুবাদের সাহায্যেও তো কিছুটা পৌঁছেছে, বৃহত্তর ভারতে এবং ভারতের বাইরেও। যা পৌঁছায়নি, পৌঁছাতে পারে না তা তাঁর গান। তবে সেই কথায় পরে আসা যাবে।

অন্য একটা কথা তার আগে এখানেই উল্লেখ করা দরকার। তাঁর কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিও যে তাঁর স্বভাষীর কাছ থেকেই সব সময় যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেছে বা এখনও করে তাও কিন্তু নয়। উদাহরণ হিসাবে 'গোরা'-কেই নেওয়া যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের রোমহর্ষক পণ্ডিত-পণ্ডিতানীরাও মাঝে মাঝে রায় দিয়েছেন 'গোরা' ডাইডাকটিক, 'গোরা' উপন্যাস হিসাবে অপাঠ্য। শুনে যত না অবাক হই তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত বোধ করি। কারণ 'গোরা'-র পাতায় পাতায় আমাকে পুলকিত করার মতো কত না আবেগ-স্পন্দিত মুহূর্ত ধরা আছে

...কেবল গোরার কথা শোনা নহে, সুচরিতা যেন গোরার কথা সম্মুখে দেখিতে ছিল, গোরার চোখের মধ্যে দূর-ভবিষ্যৎ-নিবদ্ধ যে একটি ধ্যানদৃষ্টি ছিল সেই দৃষ্টি এবং

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাক্য সুচরিতার কাছে এক হইয়া দেখা দিল। লজ্জা ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, ভাবের উৎসাহে উদ্দীপ্ত গোরার মুখের দিকে সুচরিতা চোখ তুলিয়া চাহিল।' পড়লে যে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। এও কি একরকম বয়সের দোষ?

যে পরিমাণ সুখদুঃখের কাহিনী, যতখানি হৃদয়াবেগ বাঙালি পাঠ্য উপন্যাসে থাকা প্রয়োজন তা যে 'গোরা' কিংবা 'ঘরে বাইরে'-তে নেই সে কথা হয়ত ঠিক। বাংলা আধুনিক কাব্যে যদিবা মনন-পরিশুদ্ধ আবেগকে স্বাগত জানানো হয়েছিল, গল্প-উপন্যাসে মনন-মন্থন তর্ক-বিতর্ককে তেমন উৎসাহ দেবার মতো পাঠকের অভাব আজও আছে। কবিতার পাঠক আর কথাসাহিত্যের পাঠকে একটা মান-গত পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়, কারণ গল্প-উপন্যাস নাকি প্রধানত বিনোদন-দ্রব্য। ওই সবে মস্তিষ্কের চর্চা বাঙালির ধাতে সয় না। প্রেমে 'পড়লে' তার মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে যায়, গদ্‌গদ আবেগের বুলি ছাড়া বোধ হয় আর কিছু বার হয় না। সাধে কি sceptic কবি বলেছিলেন, 'প্রেমে কি কেবলই 'পতন'? তবু intellection-এর একটা আমেজ অবশ্যই থাকা চাই উন্নাসিকদের জন্য। কিন্তু 'গোরা' তো গড়-পড়তা বাঙালির জন্য নয়। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষেও কি 'গোরা' সত্যিই দুষ্পাচ্য? তাত্ত্বিক আলাপ আলোচনার পরিমাণ কি খুবই বেশি হয়ে গিয়েছে?

'গোরা'-য় আইডিয়াগুলি নাকি গজগজ করছে! কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে রস সঞ্চার করতে পারেনি। কী জানি! আমি তো দেখি মিশ্র আবেগের নীল জমির উপর ভারতীয় সমাজ, সাকার-নিরাকার ধর্ম জাতিবিচার, পেট্রিয়টিজম্ আর মানব-ধর্ম, ব্যক্তিমানুষ বনাম সমাজ, প্রেম শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য আইডিয়া নিয়েই তর্কবিতর্ক আর প্রেম অপ্রেমের জটিল নকশায় রুপোলি জরির পাড় বুনে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর কত না ফুলকারি! এমন আর একখানা জামদানী তো নামল না বাংলার তাঁত থেকে! 'ঝিনী ঝিনী বিনী চাদরিয়া...'।

আজ পঁচাশি বছরের ব্যবধানেও কী আধুনিক! আমাদের এই ঔপমহাদেশিক সমাজ যেহেতু একই আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে, কিছুটা সূক্ষ্ম আর অনেকখানি স্থূল হিঁদুয়ানির আঁধি উঠেছে দেশ জুড়ে তাই আর একবার 'গোরা' পড়ে দেখতে অনুরোধ করি তাঁদের যাঁরা রবীন্দ্রনাথকেই খারিজ করে রাখেননি। '...এত দিন আমি ভারতবর্ষকে পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ দিয়ে সাধনা করেছি—একটা না একটা জায়গায় বেধেছে—সেই সব বাধার সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার মিল করবার জন্য আমি সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেছি।...

...আমি যা দিনরাত হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...' এই আকুতি যার অন্তস্তল থেকে আসেনি সে এই ভাষা লিখতেও পারে না, সে এই ভাষা বুঝতেও পারে না। খণ্ডিত ভারতই তার উপাস্য!

তর্ক থেকে বহু যোজন দূরে ভাষা যেখানে ভাবনার নির্যাসটুকু মাত্র বহন করে,-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনকি কাব্যিক চিন্তার সূত্রও খসিয়ে ফেলতে চায়, সেখানেই দেখা যাচ্ছে বাঙালির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একরকমের সহজিয়া প্রেম। অবশ্য কিছু পূর্বসংস্কার ছাড়তে না পারলে এই প্রেমও ভালোরকম জমতে পারে না। কালোয়াতি গানের কথাকে প্রায় বাদ দিয়ে সুরের ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ হবার অভ্যাস এই দেশের মানুষের। সুর বিস্তারের আতিশয্যে তাঁরা এতই অভ্যস্ত যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাপা বরাদ্দে তাঁদের অনেকেরই ক্ষুধা মিটত না প্রথম দিকে। এখন প্রায় সবাই মেনে নিয়েছে। এদিকে কোনও কোনও জাপানি শ্রোতাকে দেখেছি রবীন্দ্রসঙ্গীতও তাঁদের কাছে দীর্ঘ ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় প্রবেশ করতে যথেষ্ট সক্ষম যাঁরা নন, যাঁরা তাঁর সারাৎসার কাব্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত তাঁদের কাছে ঐইটুকু সুরের মূর্ছনা প্রায়ই খুব ফিকে আর ক্লান্তিকর ঠেকে। ...অথচ ওই সুরটুকুই যে রাবীন্দ্রিক বাণীর পাখায় ভর করে কোনো দিগন্তে পৌঁছে দিতে পারে তা যিনি বাংলা জানেন না তাঁকে বোঝানো প্রায় অসম্ভব। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষায় যাঁরা জন্মেছেন তাঁরাও সবাই যে বোঝেন এমন দাবি কেউ করবে না।

আমার বরং মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যে প্রতিদিন গণমাধ্যমের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সব গানই নির্বিচারে আবালবৃদ্ধের (এই সমাজবদ্ধ পদের তৃতীয় শব্দটি বাদ না দিল আত্মসম্মানে টান পড়ে!) কানে ঢালা হচ্ছে এতে কি গানগুলির ধার ক্ষয়ে যাচ্ছে না? অতি পরিচিত, 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা—'

কিংবা

'সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে।

যাক-না গো সুখ জ্বলে।' ইত্যাদি গানের কী অর্থ করেন অধিকাংশ শ্রোতা তারও হয়ত শিগগিরই পথেঘাটে মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে সমীক্ষা করবেন দূরদর্শনের প্রতিবেদকরা।

অবশ্য বোঝা-না-বোঝায় মেশা একটা ভালোলাগা খুবই সম্ভব।

বলা বাহুল্য, সুপাচ্য এবং স্বাস্থ্যকর গানেরও অভাব নেই তিন খণ্ড গীতবিতানে। অবশ্য যিনি বলে গিয়েছেন,

'নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে। /অন্তহীন কাল-সরোবরে' তাঁর গানের ভাষা নিয়ে দুর্ভাবনা করে লাভ নেই। অন্তহীন কাল-সরোবরেই তা সমর্পণ করা যাক।

কিন্তু ভাবুক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙালির এবং বিশ্বেরও পরিচয় এত অল্প কেন, এটা কি একটা ভাববার মতো প্রশ্ন নয়? Religion of Man তো ইংরিজিতেই লেখা। Crisis in Civilisation জাতীয় দু-চারটি পুস্তিকা বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের অল্প কিছু ইংরিজিতে অনুবাদ হয়েছিল শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে। কিন্তু ওইগুলির সাহায্যে তাঁর মৌলিক চিন্তার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পৌঁছায় অবাঙালির হাতে। তবে সেটা তত ভাবনার কথা নয়। আসল ভাবনার কথা এই যে বাংলা সাহিত্যের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া বাঙালিরাই আর কেউ তাঁর প্রবন্ধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের পাতা উল্টে দেখে না। ওই ছাত্র-ছাত্রীরাও নির্বাচিত পাঠ্যের বাইরে আর বিশেষ কিছু পড়ে বলে মনে হয়না।

অথচ এই প্রবন্ধ জাতীয় গদ্য রচনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপকে সব চেয়ে স্পষ্ট করে, পূর্ণ করে পাওয়া যায়, পাওয়া দরকার। মনে করা যাক সেই গানটি,

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী

অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী...' ইত্যাদি। আমাদের দৃষ্টি চলে যায় 'প্রথম সামরব মুখরিত' সেই তপোবনে, সেই বনভবনে যেখানে 'জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী' সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু তিনিই যখন লেখেন, 'ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষ মূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণ-চীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণীগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।...' তখন মুহূর্তে দেশপ্রেমের 'নেশা' ছুটে যায়। সত্য দৃষ্টিতে যেমন দেশকে দেখতে পাই তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও দেখতে পাই।

এই counter-romantic ছবিটিও যে ওই কবির কলমেই আঁকা তার থেকেই তাঁর দৃষ্টির বিস্তার, রচনার ব্যাপ্তি কিছুটা অনুমান করা যায় না কি? এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আমি আর একটি মাত্র উদ্ধৃতি দেব। '...পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবে কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম যখন আমাদের ছাত্ররা এক সময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবে না বলে পল্লীর উপকার করতে লেগেছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেনি, পল্লীর লোকেরা তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারেনি। কী করে মিলবে! মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয়নি। যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয়নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন তাঁরা জ্ঞানের এমন পঙক্তিভেদ কোথাও করেননি, পরিবেষণের পাতা একই।...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ যে জনদরদি সরকার বছরে বছরে আমাদের একেকটি জেলাকে 'সাক্ষর' করে ফেলছেন শহরের পথে ঘাটে আর গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে পদ্য লিখে, তাঁরা এই বৃদ্ধের কথায় কান দেবেন কি? অবশ্য আমাদের সবারই কান পেতে শুনবার মতো, মন দিয়ে বারবার পড়বার মতো অসংখ্য ভাবনা রবীন্দ্ররচনাবলীর সিন্দুকে তোলা আছে। সেগুলি আজও যে তাজা আছে তার কারণ তিনি কোনও দিনই কেতাবি বুলি কপচাননি, আপ্তবাক্যের ব্যাখ্যা করেননি। তার ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা—সবই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর মননের ফসল। বাস্তব জগৎ আর ভাবলোকের মাঝখানে এর চেয়ে পোক্ত সাঁকো আর কোন্ বাঙালি বেঁধে দিতে পেরেছেন?

শুধু বাঙলা কেন, সারা ভারতে ইতিহাস-ভূগোল টুঁড়ে আর একটি পূর্ণতর মানুষের সন্ধান কেউ দিতে পারবেন? বৌদ্ধিক, নান্দনিক, নৈতিক মাত্রাগুলির এমন সুষম বিন্যাস, এমন সংহত আত্মপ্রকাশ যে দেশে ঘটেছে সে দেশ আজও এত মূঢ় যে অলৌকিকের আবির্ভাব দেখবে বলে মড়া আগলে বসে থাকে!

দেশ, বর্ষ ৬০, সং ২১ (১৪।০৮।১৯৯৩), পৃঃ ২৮-৩২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই এখন গবেষণা আর অনুসন্ধানের একটা খ্যাপা হাওয়া বইছে, যে অনুসন্ধানের মূল উৎস একটা ডিগ্রি বা অন্য কোনো ব্যবহারিক প্রাপ্তির প্রত্যাশা। সেই অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসার উৎস নয় সত্যকার কোনো অনুসন্ধিৎসা কিংবা কোনো কূট প্রশ্ন বা দুরূহ চিন্তার গ্রন্থিমোচন করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ। এই আবহাওয়ায় এমন নিষ্কামভাবে রবীন্দ্রচর্চা করে যাবার, রবীন্দ্রনাথকে অসংখ্য দিক থেকে দেখার আবার রবীন্দ্রনাথের আলোয় আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের সংস্কৃতিকে নানা ভাবে খতিয়ে বিচার করার এই যে নিরলস এবং সাহসী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র শ'দুয়েক মানুষ তাঁদের আমি প্রথমেই ধন্যবাদ দিই এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে। শুধু মানুষ নয়, বহু মহৎ প্রয়াসেরও এই দেশে শৈশবেই মৃত্যু ঘটে, এবং এ ক্ষেত্রেও শিশু মৃত্যুর ভয়াবহ হারের কথা স্মরণ করে বলা যায় যে Tagore Research Institute যখন বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছতে পেরেছে একবার, তখন এই পঞ্চদশী শুধু পূর্ণিমাতে নয়, প্রৌঢ়ত্বেও পৌঁছবে যথাকালে। আমি স্বভাবতই আশাবাদী, তবে বর্তমান বিষয়ে আমার আশার শক্ত মজবুত বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মূলধন, প্রাণরসের মূল উৎস যা এতদিন থেকে দেখে আসছি সে হচ্ছে আপনাদের আন্তরিক আগ্রহ আর নিষ্ঠা। সত্যি কথা বলতে কি এই মূলধনের অভাবেই তো কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা চেয়ে চিন্তে ধার করে এনে ঢালার পরও দেশের বড় বড় প্রকল্পগুলি মার খেয়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়, সে কথাটাই বলতে চেষ্টা করি। কথাটা নতুন নয় এবং এর একটা দিক নিয়ে ক্রমাগতই সবাই আলোচনা করে চলেছেন রবীন্দ্রনাথের গান, নৃত্যনাট্য, এবং কবিতাও কিছু পরিমাণে, বাঙালিকে আজো যতখানি মাতিয়ে রেখেছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মতামত তার সিকি পরিমাণেও স্পর্শ করে না আমাদের চিত্তভূমিকে। গল্পগুচ্ছ যদিও বা কিছু বয়স্ক বাঙালির এখনও উপাদেয় মনে হয়, গোরা, ঘরে বাইরে কিংবা চার অধ্যায় পড়বার মতন আগ্রহ আজ খুব কম বাঙালিরই আছে। এই মানসিক প্রতিরোধ, না প্রতিরোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললে একটা স্বক্রিয় মনোবৃত্তি বোঝায়, বরং বলা উচিত এই নিষ্ক্রিয় বা Passive অনীহা-র মূল কোথায়? যখন এই বইগুলি লেখা হয়েছিল তখন শিক্ষিত মানুষের শতকরা হার তো বাংলাদেশে আজকের চেয়ে অনেক কম ছিল কিন্তু, আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক সমর্থন সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়নি কি দেশে? বাঙালীর প্রধান উপজীব্য আবেগসর্বস্ব সাহিত্য, চিন্তাশীল বিদগ্ধ কথাসাহিত্য তাকে স্পর্শ করে না এ তো সত্য নয় পুরোপুরি। আজ তাহলে এমন শীতল উদাসীনতা কেন? সে কি এই কারণে যে এই রচনাগুলি সমসাময়িক জগৎ থেকে চিন্তায় ভাবনায় পিছিয়ে পড়েছে? পিছিয়ে যে পড়েনি তার একটা তো প্রমাণ দিয়েছেন বহুরূপী দল রক্তকরবী কিংবা চার অধ্যায় অভিনয় করে। আমরা দেখতে দেখতে বলে উঠি না কি যে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আজো কেমন relevant, বর্তমানের পক্ষে প্রযোজ্য? তবু সে গুলি, শিক্ষিত সাধারণে অবহেলিত কেন, ক্লাসিক্স্ মনে করেও পড়বার লোকের এমন অভাব কেন?

অবশ্য সবচেয়ে বেশি অবহেলিত রবীন্দ্ররচনাবলীর দশম খণ্ড থেকে চতুর্দশ খণ্ড (আমি পশ্চিমবাংলা সরকারের শতবার্ষিকী সংস্করণের কথা বলছি) —অর্থাৎ প্রবন্ধ। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা আবশ্যিকভাবে যা পড়েন পড়েন, আর কেউ খুলেও দেখেন না। অথচ আমার মনে হয় ধার্মিক খৃষ্টান যেমন সংশয়ে জর্জরিত এবং বিভ্রান্ত বোধ করলে বাইবেলের যে কোনো একটা পৃষ্ঠা খুলে নিয়ে একটা বাণীর অনুসন্ধান করেন পথনির্দেশ পাবার জন্য, আমরা প্রায় সেভাবেই রবীন্দ্রনাথের এই খণ্ড কটি ব্যবহার করতে পারি। আমি সত্যি করে বলি আজ সকালেই আমি এই রকম একটা পরীক্ষা করেছিলাম, দশমখণ্ড হাতে নিয়ে। ৫৯৫ পৃষ্ঠা খুলে দেখি সেটা পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরীর পরিশিষ্ট। আমি কোন্ বাণী সেখানে পেলাম শুনুন 'পশ্চিম মহাদেশের অন্ধকার পটের উপর আবর্তমান পলিটিক্সের দৃশ্যটাকে একটা সিনেমার বিপুলাকার চলচ্ছবির মতো দেখতে হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে দ্রুতলয়ের প্রতিযোগিতা। জলে স্থলে আকাশে কে একটু মাত্র এগিয়ে যেতে পারে তারই উপর হারজিত নির্ভর করছে। গতি কেবলই বাড়ছে, তার সঙ্গে শান্তির কোনো সমন্বয় নেই।'

...আপনারাই বলুন, এই কথাগুলি কি সমসাময়িক জগৎ থেকে খুব পিছিয়ে পড়েছে?

তাহলে এই অবহেলা, এই উদাসীনতা কেন? অনেক উত্তরই হয়তো দেওয়া যায়। তার মধ্যে একটা উত্তর বোধহয় এই যে আমাদের চিত্তভূমির যথোচিত কর্ষণ হচ্ছে না, আর যতটুকু বা হচ্ছে তাতে ঠিক জাতের বীজও বোনা হচ্ছে না। উদ্ভিদ জগতেও যেমন চিত্তজগতেও বোধহয় তেমনি, ঠিক শষ্য বীজটা ঠিক জায়গায় বুনে তার সদ্ব্যবহার না করে নিলে জল, হাওয়া, পশু পাখী, সেখানে এসে আগাছার বীজ ছড়াবেই, প্রকৃতি ক্রমাগত শূন্যস্থান পূর্ণ করে চলেছে এতো সবাই জানেন। মাও-এর বাণী, স্তালিনের বাণী, হোচিমিনের বাণীকে কিংবা কোনো একটি গুরুদেবের বাণীকে আমি আগাছার বীজ বলব না তবে সবিনয়ে বলব সেই সঙ্গে আমাদের চিত্তক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বাণী বপন করারও একটা দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। অবশ্য আমরা যারা এই চাষবাস করায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উৎসাহী তাদের প্রথম কাজ হলো নিজেদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করা নইলে তিল আর তিসি, শালি ধান আর ইরি ধানের তফাৎ বুঝব না যে।

এইখানেই হয় একটা সমস্যা। সমস্যাটা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে শান্তিনিকেতনেও যে ছিল তার আর এক বার প্রমাণ পেলাম আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের জবানবন্দী থেকে। তাঁকে আশ্রমিক সংঘ ১৩৫৯-এ যখন শ্রদ্ধার্ঘ্য দেয়, তখন তিনি তাঁর ভাষণে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন 'বিরুদ্ধতা শুধু বাইরের নয়, আশ্রমবাসী শিক্ষকদেরও অনেকের ধর্ম আর আদর্শগত যোগ গুরুদেবের সঙ্গে নেই। এমন স্থানে থেকেও তাঁরা ধর্মের প্রেরণা খোঁজেন বাইরে থেকে। গুরুদেব অত্যন্ত উদার বলে এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর কোথাও এমনটি চলত না। এমন কথা সেসব জায়গার কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না।'

আমার সমস্যা এই উদারতা বা সহিষ্ণুতা নিয়েই। গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসী আমার কাছে একটা রাজনৈতিক কাঠামো মাত্র নয়, ওটা আমার কাছে প্রায় একটা ধর্ম, জীবন চর্চার একটা পথনির্দেশিকা বলে মনে হয়। সেদিক থেকে সহিষ্ণুতাকে আমি সমাজজীবনের পক্ষে তেমনি মৌলিক মনে করি অহিংসাকে বুদ্ধ বা গান্ধী যেমন মনে করতেন। ভিন্ন চিন্তা, অন্য আদর্শ, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক জীবনচর্চার মূল ভিত্তি এবং গান্ধীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় বলা যায় যে এ জাতীয় সহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে অনেক বেশি ছিল এবং তার প্রমাণ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সেবাগ্রামের প্রতি তুলনা করলেও যথেষ্ট পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা-প্রচারের ব্যাপারেও গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা কতদূর যাবে সে নিয়ে মতের অমিল আছে। আমরা প্রতিপক্ষের কথা অপছন্দ করলেও তার সেই বিরূপ কথা বলার অধিকার, বলার স্বাধীনতা ভলটেয়ারের মতন প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে বাধ্য, গণতন্ত্রী হিসেবে—একথা আমি মানি। অতটা পারব না নিশ্চয়ই, তবু পারা উচিত বলে মনে করি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যদি আমার এই ঔচিত্যবোধের সুযোগ নিয়ে আমারই অধিকার খর্ব করে, যদি সে এমন কথা প্রচার করে যে সে যা বলছে তাই একমাত্র সত্য এবং অন্য সকলের মত শুধু ভ্রান্ত নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ছলে বলে কৌশলে সেই বিপদজনক ভ্রান্তমতকে দমন করতে হবে তা হলে আমি এহেন প্রতিপক্ষের বাক্-স্বাধীনতা কত দূর পর্যন্ত রক্ষা করতে বা মেনে চলতে বাধ্য? শেষ পর্যন্ত সহ্য করব কি এমনতর স্বাধীনতা? সহ্য করলে গণতন্ত্রের কবর খোঁড়া হবে কিনা, না করলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে কিনা এই নিয়ে বিতর্ক বহুকাল শুনে আসছি। তবে ব্যবহারিক নীতি হিসেবে হয়ত এটাই মেনে চলা ভালো, কিংবা মেনে চলা সম্ভব যে আমার স্বাধীনতা অথবা আপনার বা প্রমোদ দাশগুপ্ত মশাইর স্বাধীনতাও ততদূরই যেতে পারে যতদূর গেলে আর কারুর স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হবে না, অন্য কারুর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করবে না। যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের স্বাধীনতাকে তার চেয়ে বেশি দূর প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সমাজে মাৎস্যন্যায়কেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করে নেওয়া হয়।

শুধু রাজনীতিতে নয়, সমাজে, ব্যক্তির জীবনে, চিন্তা ভাবনার রাজ্যেও বোধ হয় এই নীতিই মেনে চলা উচিত যে আমার স্বাধীনতা তোমার পক্ষে বন্ধন হবে না, তোমার স্বাধীনতা আমার স্বাধীন আত্মপ্রকাশকে খর্ব করবে না। সহিষ্ণুতার চর্চাও ততদূরই চলতে পারে, তার চেয়ে বেশিদূর গেলে তা আত্মঘাতী হয়ে যায়! শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে সহিষ্ণুতার চর্চা করেছিলেন তা কি শান্তিনিকেতনের পক্ষে আত্মঘাতী হয়েছে? বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, মোহনানন্দ, সাঁইবাবা, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, মাওৎসে তুং চারু মজুমদার সবার বাণীই প্রচার হয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনে গত আশী বছর ধরে। এবং ক্ষিতিমোহন সেন যে কথা বলেছেন তাও ঠিক। রবীন্দ্রনাথের কথা-যে কারণেই হোক—তাঁর আশ্রমের অনেকেই এমন কি তাঁর আত্মজও ঠিক মত শোনেন নি, শুনেও বোঝেন নি একথা বললেও অন্যায় হয় না। অনেকেই বাইরে গুরু খুঁজেছেন, পেয়েছেন, এবং কেউ কেউ সেই গুরুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ও ঘটিয়ে ফেলেছেন। সেটা আমার মনে হয় আরো মারাত্মক হয়েছে।

Alex Aronson তাঁর Rabindranath through Western Eyes বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন যে পশ্চিমের অনেকেই যে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি তার কারণ 'many failed either because they admire Rabindranath in the wrong way and for the wrong reasons or because they could never attain that degree of cultural aloofness which would have enabled them to give a meaningful response to so extra ordinary and overwhelming a figure as this poet who had come to them from Bengal.' আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথ তার অধিকাংশ স্বদেশবাসী এমন কি স্বভাষীর কাছেও দুর্বোধ্য অনধিগম্য রয়ে গেলেন প্রায় একই কারণে। যাঁরা তাঁর আশে পাশে গিয়ে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা সবাই ঠিক সঙ্গত কারণে তাঁকে শ্রদ্ধা করেন নি, অথবা তিনি যা দিতে পারতেন তা গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

এই গ্রহণ করার যে অক্ষমতা তার নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ আমার মনে হয় cultural lag বা cultural gap — যদি তাঁর জীবদ্দশাতেও আরো সচেতন প্রয়াস করতেন উৎসাহী ও বুদ্ধিমান রবীন্দ্রানুরাগীরা তবে বোধহয় অনেকেই এই সাংস্কৃতিক-দূরত্বটুকু পার হয়ে আসতে পারতেন। শান্তিনিকেতনে আর যাঁদের আদর্শ ও বাণী উৎসাহী ব্যক্তিরা প্রচার করেছেন তাঁদের বাধা দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। কারণ আদর্শকে আদর্শ দিয়ে চিন্তাকে ভিন্ন চিন্তা দিয়ে প্রতিহত করতে হয়। সেই সব বাণী বা আদর্শের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করেও রাবীন্দ্রিক চিন্তা, ভাবনার, আদর্শের আরো সযত্ন প্রচার, বুদ্ধিদীপ্ত অনুশীলন করা যেত বলেই আমার ধারণা।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র নয় বছর পর শান্তিনিকেতনে ছাত্রী হয়ে গিয়েও আমার প্রায়ই মনে হতো যে রবীন্দ্রনাথ বুঝি কত কত কাল আগে চলে গেছেন। অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানারকম অনুষ্ঠান ছিল, সারা বছর ধরেই একটা রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য বহন করে আনত সেই অনুষ্ঠানগুলি এবং তার ভিতর দিয়ে শান্তিনিকেতনের বহিরঙ্গের একটা ধারা বাহিকতাও রক্ষা করা হচ্ছিল বটে। কিন্তু আমার জন্যে এবং আমার চেয়েও বেশি করে আমার গুজরাতী, মারাঠী, তামীল, কেরলীয়, পাঞ্জাবী, ইন্দোনেশীয়, বর্মী, সিংহলী, ইরানী, তুর্কী, হাঙ্গেরীয়, মার্কিন সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের জন্য দরকার ছিল নিয়মিত রবীন্দ্র চিন্তা, রবীন্দ্র সাহিত্যের চর্চা। সেই বিষয়টাকে আবশ্যিক করার দরকার ছিল না। যদি আমাদের প্রিয় ও সুযোগ্য কিছু অধ্যাপক এই দায়িত্ব নিতেন এবং একান্তই স্বেচ্ছানির্বাচিত (optional) বিষয় হিসেবে তার পঠন পাঠন হতো তাহলে আমাদের অনেকেরই শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর কাটানো সার্থকতর হোতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি এই মুহূর্তে ১৪/১৫ জন শিক্ষককে স্মরণ করছি যাঁরা এই কাজ অনেকটা করতে পারতেন এবং গুরুদক্ষিণা হিসাবে একাজ তাঁদের করা উচিত ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে দেখা সাক্ষাৎ হলে তাঁদের বাড়ি গিয়ে বসে আলাপ আলোচনা করলে আমরা অনেক কিছু পেতাম বটে—ঐ nonformal উপায়ে। কিন্তু কিছু formal শিক্ষারও যে দরকার ছিল সেটা আজ খুব অনুভব করি। রবীন্দ্রনাথ কে ও কি তার সামান্যতম জ্ঞানটুকুও না নিয়ে অনেকে ফিরে যান বছরের পর বছর কাটিয়ে।

এখনও সে কাজ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের নামে যে প্রতিষ্ঠান সেখানকার ছাত্ররা-শিক্ষকরা রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে চিন্তাভাবনার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত হবেন না এ বড় অপচয়। শান্তিনিকেতনে যাবার আগে পর্যন্ত আমার রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় যা ঘটেছিল তা নৈষ্ঠিক পিতার কড়া পাহারা পার হয়ে, কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকখানিই যে চরিত্রগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর এমন একটা ধারণার বশীভূত হয়ে তিনি গীতাঞ্জলি রাজর্ষি চারিত্রপূজা ইত্যাদিই পাঠযোগ্য মনে করতেন। এসব কথা এখন ভাবলে অবাক লাগে, অবশ্য তার একটা কারণ আমি বাংলা দেশের বাইরে মানুষ হয়েছিলাম এবং বাড়িতে তথাকথিত সুকুমার সাহিত্যের চর্চাকে চরিত্রগঠনের অনুকূল মনে করা হতো না। শান্তিনিকেতনে এসে সেই ফাঁক কিছুটা পূরণ হয়েছিল তবু যথেষ্ট হয়নি। যে কাজ এই কেন্দ্রে আপনারা করছেন সেই কাজটিই শান্তিনিকেতনে কেন হতো না, কেন হয় না সে কথা আজকাল প্রায়ই ভাবি।

বৃক্ষরোপণের পরে রবীন্দ্রসপ্তাহে কিছু রবীন্দ্রচর্চা হতো বটে, কিছু পাঠও হতো। কিন্তু অনেকেই জানতেন না কোথা থেকে সেগুলি পাঠ করা হচ্ছে, ঠিক context-টা কি। এর চেয়ে বরং নিয়মিত ক্লাস করে কাব্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ সাহিত্য কিছুটা পড়তে পারলে একটা স্পষ্ট ধারণা হতে পারত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। Tagore Research Institute বহু বাধার ভিতর দিয়েও ১৫ বছর ধরে সে কাজ করে চলেছে, শান্তিনিকেতনে বসে একাজ করার কিছু সুবিধা নিশ্চয়ই আছে আবার ভৌগোলিক দূরত্ব একটা নির্লিপ্তি সৃষ্টি করতে পারে যার ফলে কোনো ব্যক্তিত্বের গৌরবে অভিভূত না হয়ে তার নিরাসক্ত মূল্যায়ন সহজ হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রচর্চার ভালো কোনো আয়োজন নেই একথাও যেমন সত্য, কোনো কোনো সময়ে সামান্য কিছু সমালোচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা উঠলেই গেল গেল রব তোলার মতন লোক এখনও যে একেবারে নেই তা নয়, ত্রিশ বছর আগে আরো বেশি ছিলেন, যখন আমি ছাত্রী হয়ে প্রথম যাই।

রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁর কীর্তি যে অত ভঙ্গুর নয়, তার প্রাণ শক্তির যে শতবর্ষ পরেও আরো শতবর্ষ বহু মুমূর্ষু মনকে সঞ্জীবিত করতে পারবে একথা ভালোভাবে উপলব্ধি করার জন্যই দরকার বুদ্ধিপ্রভব কিছু অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান কর্মেই Tagore Research Institute বেঁচে থাকবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হবে।

(টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠানের ভাষণ।)

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্বভারতী—একটি ব্যর্থ প্রয়াস?

আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ দুটি মানুষই যে শিক্ষা নিয়ে শুধু ভাবনা চিন্তা নয়, রীতিমতন হাতে কলমে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছিলেন এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। রাজনীতি যেমন গান্ধীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি সাহিত্যও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারেনি।

নিজের এবং ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের জীবন নিয়ে গান্ধী যে এক্সপেরিমেন্টে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেই পরীক্ষা নিরীক্ষারই ফল বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারী আনুকূল্য লাভ করেছিল বটে। কিন্তু দেশবাসী এই বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করেনি। গান্ধীর শিক্ষাসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন এবং বাস্তববুদ্ধিজাত। তাঁর কর্মপন্থাও সুপরিকল্পিত; স্বল্পায়াসে স্বল্পব্যয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন সম্ভব ফলে একেবারে অশিক্ষিত মানুষেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে কি কারণে কি ধরনের শিক্ষার আয়োজন করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে আশু-সুফল লাভের সম্ভাবনাও এই ব্যবস্থাটিকে জনপ্রিয় করতে পারে নি। কি নগরে কি গ্রামে সর্বত্রই প্রথমত সন্দেহ এবং পরে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষাকে। দেশের যথার্থ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, শিক্ষাবাবদ ব্যয়ের পরিমাণকে সাধ্যের সীমার মধ্যে রেখে এই যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অত্যন্ত মৌলিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা গান্ধী উদ্ভাবন করেছিলেন একেও তাঁর দেশবাসী গ্রহণ কেন করতে পারল না তার কারণ অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। কেন গান্ধী শিক্ষাবিদ হিসেবে ব্যর্থ হলেন তার একটি তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধান সরকারীভাবেই করা প্রয়োজন ছিল যেহেতু এই বুনিয়াদী পরিকল্পনায় সরকারী বহু অর্থব্যয় করা হয়েছে।

প্রতিতুলনায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সাধারণের পক্ষে কিছুটা যেন দুরধিগম্য। সেই শিক্ষাব্যবস্থায় আশু ফললাভের সম্ভাবনাও কম। অবশ্য কবির হাতে গড়া পাঠশালা ঠিক সাধারণ মানুষের ধারণা অনুযায়ী হবে না এটাই প্রত্যাশিত। কেন প্রৌঢ়বয়সে হঠাৎ এই কাজে হাত দিলেন তার হদিশ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউরিতে কেবল মাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেননি...শুধু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আর চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। ...তিনি আমাকে হেসে বললেন, ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে ক'টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর। ...সেই আমার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হলো। কয়েকজন বাঙ্গালির ছেলেকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলুম।"

সাহিত্যকর্ম এবং ঠাকুর বাড়ির বিষয় কর্মেই তাঁর জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে। কিছুটা সাংসারিক কারণে কিছুটা দেশের প্রতি কর্তব্যের তাড়নাতেও নিজের জীবন নিয়ে এই একটা তন্নিষ্ঠ এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে এসে। 'বিশ্বভারতী' এই পরীক্ষী নিরীক্ষারই সুফল। বলতে গেলে নিজের আর্থিক-পারমার্থিক সর্বস্ব পণ করেই তিনি এই এক্সপেরিমেন্টে মেতেছিলেন। তারপর চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল ধরে এসে পালন ও পরিপুষ্ট করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেশের মানুষের হাতে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো তৃপ্তি ও সার্থকতার বোধ নিয়ে যেতে পেরেছিলেন কি? মৃত্যুর বৎসরকাল পূর্বে, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ স্মরণ করে, যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন তাতে কী আত্মপরাভবের বেদনা! বক্তৃতার সবটুকু উদ্ধার করে দিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু স্থানের কথা চিন্তা করে কিছু কিছু অংশই কেবল উদ্ধার করে দিলাম : 'যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্য কর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্য শুধু তোমরা দায়ী নও, আমরা সকলেই দায়ী।

...আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের সেই দিনগুলির কথা...এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগলভ্‌তা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

...অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করিনি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। ...শান্তিনিকেতনের আকাশ বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ বার্দ্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণশক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি না; মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সবকিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্দ্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মায়া বিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনে রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রুপ করছে তাকে যা মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

...আর একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখ স্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার স্বার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন স্পর্দ্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান করো না—একে স্বীকার করে নাও।..."

তাঁর এই করুণ আবেদন কি আমরা স্বীকার করেছি? প্রত্যাখ্যান করিনি কি একেও?

অথচ সরকারী অবহেলা কিন্তু ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছ বছর পর দেশ স্বাধীন হয়, আরো পাঁচ বছরের মধ্যেই জবাহরলালের উৎসাহে কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর আর্থিক দায়ভার স্বীকার করে নিয়ে একে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী দিয়েছিল। কিন্তু তাতে করে কি রক্ষা করা গেল বিশ্বভারতীর আদর্শকে? ১৯১৯ সালে 'বিশ্বভারতী'র প্রথম বীজবপনের কালে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল "বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তাহলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।"

রবীন্দ্রনাথের ধ্যান দৃষ্টির সামনে ছিল প্রাচীন অরণ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে আদর্শ, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র সম্পদ ছিল মনীষা আর জ্ঞানতপস্যা—অন্য উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এই শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সম্বল করেই রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন "জ্ঞানের অন্নসত্র" খুলবেন বিশ্বভারতীতে, যেমন ছিল নালন্দায়। তাঁর এই বিদ্যানিকেতনের কাজে তখন একের পর এক যে জ্ঞানব্রতীরা এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা স্বেচ্ছায় অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করে এই নতুন অথচ চিরায়ত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই এসেছিলেন। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী এসেছিলেন। এসেছিলেন সিংহলের মহাস্থবির। ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগীয় হিন্দি সাহিত্য ও ধর্মসাধনা বিষয়ে চর্চার ক্ষেত্র রচনা করতে এসেছিলেন। ভীম শাস্ত্রী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। এন্ড্রুজের চতুর্দিকে ইংরেজি সাহিত্য পিপাসুরা সমবেত হয়েছিলেন। নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ আচার্য সিলভা লেভি এই প্রতিষ্ঠানকে প্রায় প্রথম থেকেই 'বিশ্ব-ভারতী' পদবী লাভের যোগ্য করে তুলে ছিলেন। "এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে"—এই তো ছিল রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যার এই যে বীজগুলি চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে বপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ক্ষেত্রপাল রবীন্দ্রনাথ, এই বীজগুলি যে প্রাণবান স্বাস্থ্যবান ছিল সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। এই কৃতী ব্যক্তিরা প্রায় সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাকালে মহীরুহ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সুকৃতির ফল বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীরা এবং দেশবাসীরা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে নি একথা তো সত্য? নয়ত বিদায়ের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের এই গভীর ক্ষোভ কেন? কোন্ স্পর্ধিত অপমান ও সন্দেহে তিনি বিদ্ধ হয়েছিলেন?

তবে কি বীজে নয়, ক্রটি ছিল দেশের মানস ক্ষেত্রে এবং মানসিক আবহাওয়ায়? তা নইলে আমাদের সমসাময়িক কালে দুজন মনীষীর এত আন্তরিক এবং এত সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? দেশের অনাতিথেয় (inhospitable) মনোভূমিতে এই যে অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের দৃষ্টি প্রয়াসের কোনোটিই শিকড় ছড়াতে পারল না তাতে বোঝা যাচ্ছে যে অন্তত এই শতাব্দীতে আর একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা জন্মাবার আশা নেই এ দেশে। মাঝে মাঝে কৃষি কথার আসরে বেতার থেকে শুনতে পাই যে কোনো অঞ্চলের ভূমি কলা চাষ বা আলু চাষের উপযুক্ত কিনা তা স্থির করবার জন্য ভূমির নমুনা (sample) বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার নিকটতম ভূমি গবেষণা কেন্দ্রে (soil research centre)। আমাদের মনোভূমিরও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন যে এই ভূমিতে কোন সার পদার্থের অভাব ছিল যাতে করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শকে আমরা ঠিক মতন গ্রহণ করতে পারলাম না? দেশের আবহাওয়া যে সেই সময়ে অনুকূল ছিল একথা স্বীকার করতেই হবে। জাতীয়তাবাদের জাগরণের ফলে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আকুলতা ছিল দেশের চিত্তে। তাই গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধাগুলিকে অগ্রাহ্য করে নতুন ধরনের বিদ্যালয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে তাঁদের সন্তানদের ব্যবহার করতে দিতে আগ্রহী অভিভাবকের নিতান্ত অভাব ছিল না দেশে। শুধু তো ওয়ার্দ্ধা কিংবা শান্তিনিকেতন নয়, দেশের বহু স্থানেই জাতীয়তাবাদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়েছিল সেদিন।

তবে আমার বিচার্য বিশ্বভারতীর ব্যর্থতা। কেউ যদি দাবী করেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা ষোলো আনাই ব্যর্থ হয়নি তবে আমি সে কথা অবশ্যই অস্বীকার করব না। তবু বলতেই হবে যে ব্যর্থতা আর সার্থকতার পারস্পরিক অনুপাত "তিন চল্লিশ আর সাতান্ন" নয়। অনুপাত চার কুড়ি আর এক কুড়ি। সার্থকতার হিসেব নিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে সারা দেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াকে একটিমাত্র শান্তিনিকেতনই সেদিন কতখানি সুস্থ, উদার ও সুন্দর করে তুলতে পেরেছিল! তাছাড়া শিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ বিশ্বভারতীর কাছ থেকে কিছু শিক্ষানীতি, কিছু আনুষ্ঠানিক রীতিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গ্রহণ করেছে দেশের শিক্ষায়তনগুলি। কিন্তু তা যথেষ্ট নয় সে তো বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী যে আজও আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন প্রাণহীন, শ্রীহীন হয়ে যায়নি একথাও তো মানতেই হবে। কোথায় এই প্রতিষ্ঠানে খানিকটা বৈশিষ্ট্য আজও রয়ে গেছে তা নির্দেশ করা কঠিন নয়। প্রতিষ্ঠাতা নিজে একবার সহযোগী অজিত চক্রবর্তীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন "শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে, তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। এতে করে ওদের জীবনের প্রাচীরের একটা বড়ো জানলা খুলে দেওয়া হচ্ছে সেইখান দিয়ে চন্দনের গন্ধ নিয়ে দক্ষিণের হাওয়া ওদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পাবে। ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয়, কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে; সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়।" রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশাটি এখনও মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়নি। আরও একটি জানলা খুলে রেখেছে কলাভবন। তার ফলে সবাই শিল্পী হয়ে উঠেছে এমন নয়। কিন্তু শিল্পের প্রতি একটা আগ্রহ শিল্প সম্বন্ধে একটা বোধ নিজেদের অজান্তেই সৃষ্টি হতে থাকে ছেলেদের মধ্যে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আয়োজন প্রায় নেই-ই বলা চলে। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা এই যে "আনন্দের শক্তি" অর্জন করে এর ফলে তাদের ব্যক্তিত্বে একটি বাড়তি মাত্রা (dimension) যুক্ত হয়। সঙ্গীতভবন, কলাভবন, শান্তিনিকেতনের সামূহিক জীবন, রুচিশোভন কিছু উৎসব অনুষ্ঠান আজও বিশ্বভারতীকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। কিন্তু শুধু এইটুকুই কি কাম্য ছিল রবীন্দ্রনাথের? আজ যদি তাঁর ব্যর্থতার তালিকা রচনা করতে বসতে হয় তবে সে তালিকা কম দীর্ঘ হবে না।

তাহলে প্রথমে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ কি কি করতে চেয়েছিলেন এবং আজ তা কতদূর সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা।" আজ বিশ্বভারতীর পাঠভবন, শিক্ষাভবন, বিদ্যাভবন, বিনয়ভবন, হিন্দীভবন, চীন ভবন, রবীন্দ্রভবনে উপকরণের অভাব নেই সেদিনের মতো। ভবনে ভবনে যেসব পণ্ডিতেরা সেখানে সমবেত হয়েছেন, আজ আর বৈষয়িক চিন্তায় তাঁদের পীড়িত হবার কারণ নেই যেহেতু কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী তাঁদের বেতন নেহাৎ কম নয়। সরকার তাঁদের আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর করার পর এক প্রজন্মেরও বেশী কাল পার হয়ে গেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অধ্যাপকদের উপর শিক্ষণ-পাঠন পরিমাণের বোঝা নগণ্য। তাহলে কি আশা করা অন্যায় হবে যে বিদ্যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকখানি সময় ও শক্তি নিয়োগ করছেন। কিন্তু করছেন কি? মৌলিক কোনো গবেষণা, প্রাচীন কোনো বিদ্যার পুনরুদ্ধার, কোনো তত্ত্বের প্রয়োগ বা নিরীক্ষা আমরা অন্তত এসবের বিশেষ কোনো সংবাদ পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের আরো একটি উচ্চাভিলাষ ছিল। "সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র-শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়ছি।"

এই প্রস্তাবে অস্পষ্টতা কিছু নেই। তাঁর প্রস্তাবিত এই বিশ্বভারতীর দুটি শাখাকে—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই প্রত্যাশায় যে শাখাদুটি পরস্পরকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করবে, পুষ্ট করবে ও সার্থকতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে এবং সরাসরি প্রতিবেশী পল্লী সমাজের সঙ্গে নাড়ির যোগ, থাকবে শ্রীনিকেতনের। শ্রীনিকেতন যদিও এক সময়ে শান্তিনিকেতনের প্রাত্যহিক কিছু প্রয়োজন মেটাত দুধ ডিমের জোগান দিয়ে তবু তার অবস্থা ছিল দারিদ্র্য প্রভাব প্রতিপত্তিহীনা আত্মীয়ার মতো। শ্রীনিকেতনে উৎপন্ন ভোগ্য বস্তুর ভাগ শান্তিনিকেতন পেলেও, শান্তিনিকেতনের উৎপন্ন বিদ্যার ও সংস্কৃতির ভাগ শ্রীনিকেতন যে যথেষ্ট পেত না—এই অভিমান বহুকাল আগেও শ্রীনিকেতনের ছাত্রশিক্ষক কর্মীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। আজ তো দুদিক থেকেই যোগাযোগ আরো শিথিল হয়েছে। তার উপর শ্রীনিকেতনের সঙ্গে তার পল্লী পরিবেশের যোগ শিথিলতর হয়েছে—এমন এতটা অভিযোগও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শ্রীনিকেতন যেখান থেকে তার প্রাণরস আহরণ করবে এবং যে পল্লীসমাজকে প্রাণিত করবে বলে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন সেই গ্রামের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এমন কি যে সব শহরে ছেলেরা সমাজ সেবা এবং সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা করতে যায় সেখানে তাদেরও নাকি দাবী যেন গ্রামীণ সমাজের চেয়ে নাগরিক সমাজের বিষয়ে তাদের বেশি শিক্ষা দেওয়া হয়।

ছাত্রদেরও বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না। যা শিখলে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের জীবিকার সুবিধা হবে তাই তারা শিখতে চায়। জীবিকার জন্য শিক্ষার চেয়ে জীবনের জন্য শিক্ষা যে অনেক বেশি মূল্যবান এই কথাটাই বা আজ তাদের বুঝিয়ে বলবে কে? রবীন্দ্রনাথের মতন করে কে তাদের বলতে পারেন যে "জীবিকার লক্ষ্য কেবল অভাবকে নিয়ে। প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য—পরিপূর্ণতাকে নিয়ে সকল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনের উপরে সে।

...কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তাহলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই। এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলাম।" শ্রীনিকেতন বলি আর শান্তিনিকেতনই বলি বিশ্বভারতীর সর্ববিভাগেই আজ তরুণ প্রবীন সবার মনেই জীবিকার চিন্তা প্রবল হয়ে জীবনের জন্য যে পরিপূর্ণ শিক্ষার আয়োজন শুরু হয়ে ছিল তাকে অপ্রয়োজনীয় বোধ হচ্ছে। অবশ্য সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কি দ্বীপ করে রাখা যায়? রাখা কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু যা কঠিন অথচ শ্রেয়, তার চর্চা যদি দেশের দু-একটি মানস তীর্থেও সম্ভব না হয় তবে. কোথায় হবে?—

তাঁর আরো একটি অভিলাষের উল্লেখ করি; "কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না এই সঙ্কল্প আমার মনে ছিল।" বার বার এই সঙ্কল্পকে তিনি প্রকাশ করেছেন, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাদিবসেও করেছিলেন; "ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙ্গুল যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলায়ও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলায়ও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে।"

বহুবর্ণ সমৃদ্ধ এই ভারতীয় সংস্কৃতির কতটুকু জানবার আয়োজন আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়েছে? যদি এই সম্মিলনের ক্ষেত্র আমরা প্রস্তুত না করে থাকি এবং তেমন কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও না থাকে তাহলে 'বিশ্বভারতী' নামকরণটাই কি নিরর্থক হয়ে যায় না? বৌদ্ধ জ্ঞানের চর্চা বেশ কিছু কাল বিশ্বভারতীতে হয়েছে, একথা সত্য। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান, সিংহল ইত্যাদি বহু দেশ থেকে পণ্ডিতেরা এসে যোগ দিয়েছেন এই কাজে। তবে যতদূর জানি জ্ঞানচর্চার এই ধারাটিও আজ ক্ষীণতোয়া। অন্যান্য ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ভারতের নানা অঞ্চলে সে বিষয়ে অনুসন্ধান এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করার মতন একটি অনুকূল পরিবেশ ছিল শান্তিনিকেতনে। দর্শনবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বিভাগ গড়ে তোলার চেষ্টা হতো তাহলে সারা ভারতবর্ষেরই জ্ঞানক্ষেত্রের একটা মস্ত বড় অভাব দূর হতে পারত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে এই নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা হয়েছিল কিনা জানি না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এছাড়াও আছে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির চর্চা। এ ব্যাপারেও গর্ব করার মতন তেমন কিছুই গড়ে ওঠেনি। এক হিন্দীভবনই আজও আছে। তবে এই ভবনের পঠন-পাঠন-গবেষণা ক্ষীণতর ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অথচ স্বাধীনভারতে হিন্দির গুরুত্ব কত বেশি বেড়ে গেছে। গবেষণা, অনুবাদ, পঠন-পাঠন পরিভাষা-রচনা দ্বিভাষা-সাহিত্যচর্চার আয়োজন ইত্যাদি কাজে যা ব্যয় হবে তার সীমা যদি আকাশকেও স্পর্শ করে তবু কেন্দ্রীয় সরকার সেই ভার বহন করতে অনিচ্ছুক হবে না। অথচ একথা জেনেও হিন্দি ভবনের শ্রীবৃদ্ধি হলনা কেন? আবার শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগ থেকেই গুজরাত গভীর আগ্রহের সঙ্গে শিক্ষার এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় যোগ দিয়েছে—ভাষার বাধাকে অগ্রাহ্য করে। গান্ধীর ব্যক্তিগত আনুকূল্য বাদ দিলেও যতখানি আনুকূল্য গুজরাতের কাছ থেকে পেয়েছেন ততখানি আর কোনো অঞ্চল থেকে নয়। সে কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করে গেছেন। তাহলে এতদিনেও একটি গুজরাত ভবন হলো না কেন বিশ্বভারতীতে? তামিল ভবন হতে পারত, হতে পারত মহারাষ্ট্র ভবন...এবং আরো কত কী! অন্তত ওড়িষী ভবন এবং অসম ভবন কিংবা পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি ভবন জাতীয় একটি ভবনের একান্তই প্রয়োজন ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক নৈকট্যকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য। জাতীয় সংহতি নামে যত বাক্‌বিস্তার, বক্তৃতা সেমিনার চলছে তার জন্য করদাতাদের যে পরিমাণ অর্থ নষ্ট করা হচ্ছে প্রতিবৎসর তার অল্প একটুখানি ভগ্নাংশ দিয়ে সংহতি চর্চার জন্য একটি স্থায়ী সংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ করা যেত না কি বিশ্বভারতীতে? এতো রবীন্দ্রনাথেরই বিশেষ দায়িত্ব যা বাঙালির উপর বর্তেছে বলে মনে করি। নইলে কোন অধিকারে আমরা দাবি করি যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের?

অবশেষে বিশ্বভারতীর বীজমন্ত্রটি স্মরণ করা যাক; "আমরা এখানে মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে—যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকণীড়ম্। তাঁর রচিত এই নীড়ে তিনি বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে "পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে।... পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র।...আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে"—উনি ১৯২৩ সালেই মনে করেছিলেন সময় এসেছে। কিন্তু সমকালীন দেশবাসীর নিশ্চয়ই তা মনে হয়নি। নয়তো তাঁর বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্ব মানবতার চিন্তা ভাবনা এত বিদ্রূপ আকর্ষণ করেছিল কেন? দেশাত্মবোধের জ্বরাক্রান্ত দেশবাসীর সেদিন মনে হয়েছিল যে স্বদেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যের অবহেলাকে আড়াল করবার জন্যই তিনি বিশ্বপ্রেমের ভড়ং করছেন। কিন্তু তারপরে ৫০/৬০ বছর কেটে গেছে এবং আরো ভয়াবহ একটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের অশনি সংকেতও ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় আন্তর্জাতিক রাজনতির আকাশে। এরই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ তুলে ধরবার দায়িত্বের কথা আর একবার বিশ্বভারতীকে স্মরণ করালে নিশ্চয়ই বেমানান হয় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ যে সমসাময়িক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন নয়। ১৯২৪ সালে বলেছেন ঃ "বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানবের সম্বন্ধে আমাদের দেশের চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। ...সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাবজনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না।"

তাঁর এই সাধনায় সিদ্ধি যৎসামান্য ঘটেছে বটে। অন্তত চীন ভবন তো তারই প্রতীক। চীনের গুরুত্ব অস্বীকার না করেও বলব—প্রতিবেশী বহু দেশ আছে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এক অভিনব বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারত বিশ্বভারতী। দূরবর্তী দেশ থেকে আজও যখন ছাত্রছাত্রী বা পণ্ডিতব্যক্তিরা আসেন তাঁদেরও যথাযথ ব্যবহার করা হয় না বিশ্বভারতীর এই বীজমন্ত্রটিকে রূপ দেবার জন্য। দেবে আর নেবে, মিলিবে মিলাবে কোথায়? প্রায় সবার দৃষ্টির অন্তরালে কয়েকটি বৎসর কাটিয়ে তাঁরা যখন চলে যান তখন শান্তিনিকেতনের মানসভূমিতে কিছু চিহ্ন রেখে যান কি?

এর একটি কারণ কি এই যে আমরা ধরেই নিই যে এই বিদেশীরা সশ্রদ্ধ চিত্তে এখানে কিছুকাল থেকে যা কিছু গ্রহণ করবার করে চলে যাবেন এটাই স্বাভাবিক, ওঁদের কাছ থেকে আমাদের কিছু গ্রহণ করবার নেই? রবীন্দ্রনাথ এই আশঙ্কাই করেছিলেন। বিদেশি পণ্ডিতদের প্রশংসাবাক্য আমাদের অমঙ্গল করতে পারে এ ভয় তাঁর ছিল কারণ তিনি নিজেও দেখে গেছেন যে "তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পন্দিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে।"

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৩।১১।৮৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ

একটা রাজনৈতিক 'চক্রান্ত' অনুযায়ী বিদায়ী শাসকরা যে মানচিত্র ধরে জনসংখ্যার জেলাওয়ারী হিসেব করে ১৯৪৭ সালে দেশটাকে লাল পেন্সিল দিয়ে ফেড়ে ফেলেছিল সে কথা সবাই জানে। কিন্তু এবার যে দেশটা, ভিতর থেকেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে এ বিষয়েও তো দ্বিমত নেই। ভারতরাষ্ট্রের রাজ্যে রাজ্যে জমির ভাগ নিয়ে, জলের বাঁটোয়ারা নিয়ে যে প্রবল মতবিরোধ এবং পরস্পর বিরোধী আন্দোলনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে বিদ্বেষের প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীদের বিরুদ্ধে যতখানি ছিল তার চেয়ে খুব কম নয়। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি পৌনে দুশ' বছরে যত হিংসার প্রকাশ ঘটেছিল তার অনেক গুণ বেশি ঘটেছে গত পঁয়তাল্লিশ বছরে, স্বদেশী বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রতি। এক রাজ্যের বাসিন্দারা অন্য রাজ্যে নিগৃহীত হচ্ছে—যেন সবটুকু ভারতবর্ষ সব ভারতবাসীরই স্বদেশ নয়। উত্তরভারতের 'সাংস্কৃতিক আধিপত্য' দক্ষিণ ভারতের অসহ্য মনে হচ্ছে।

কখনও বা একই রাজ্যের ভিতরে ভাষা নিয়ে, জাতপাত নিয়ে, আঞ্চলিক আনুগত্য নিয়ে, চাকুরীর ভাগ নিয়ে শুধু নয়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের ভাগাভাগি নিয়েও রক্তপাত ঘটছে। এই পশ্চিম বাংলাতেই কেবল গোর্খারা কি ঝাড়খণ্ডীরাই যে নিজেদের শোষিত মনে করেন তাই নয়, উত্তরবঙ্গের বাঙালির মনেও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির বিরুদ্ধে শোষণের অভিযোগ ধোঁয়াতে শুরু করেছে। অর্থাৎ জাতীয় দেহের সর্বপ্রত্যঙ্গে ধ্বসা রোগ দেখা দিয়েছে।

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পরে অন্তর্বিরোধের এই সব উপসর্গ যে দেখা দেবে তার লক্ষণ আগেও চোখে পড়েনি এমন নয়। কোনো কোনো নৈরাশ্যবাদী পূর্বাহ্ণেই আমাদের সাবধান করবার চেষ্টাও করেছিলেন, যে বিদেশী শাসকদের দূর করে দিলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন, 'বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইবে তাহা নহে।' কারণ, 'যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোন দিন নিষ্কৃতি পাইবে না।' তবে স্বভাবতই স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ারে সে সব ভয়-ভাবনা তখন ভেসে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল বিদেশী শাসনের চেয়ে মন্দতো আর কিছু হতে পারে না। অতএব ওটাকে প্রথমে দূর করা যাক। তারপরে ছোট ছোট ভেদ-বিভেদগুলিকে দূর করা যাবে। বাইরে শত্রুরা

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিদায় হবার পরে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল যে গৃহশত্রুরও অভাব নেই। বলতে গেলে এখন আমরা সবাই সবার গৃহশত্রু। ফলে কার কাছ থেকে কতটা ছিনিয়ে নিতে পারি তারই রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ চলছে দেশজুড়ে। প্রায়ই সেটা খুনোখুনির পর্যায়েও নেমে আসছে। এই পরিস্থিতিতে কি ভাবে কাদের কতটুকু পাইয়ে দিতে পারলে কত দিন ঠাণ্ডা রাখা যাবে তার হিসাব-নিকাশ রাজনীতি ব্যবসায়ীরা করতে থাকুন।

সাধারণ নাগরিকদের এখন ভেবে দেখতেই হবে, এই বিদ্বেষ—রোগের চিকিৎসা কী, এর মূলেই বা কী বিষ আছে। কারণ এটা সবারই অস্তিত্বের প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকরা এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা, বিচার-বিবেচনা করতে না শিখলে কী করে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে মত দান করবে? আবার এত বড় দেশে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐকমত্যও আশা করা যায় না।

কিন্তু কতগুলি মূলগত নীতির ব্যাপারে অনেকখানি সহমত হবার প্রয়োজন আছে। ক্রমাগত আমাদের চিন্তাভাবনা-গুলিকে পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। পার্থক্য ও বিরোধগুলিকে যথাসম্ভব আপোষে মিলিয়ে আনার চেষ্টাও দরকার। যেমন কিনা আমরা যারা মনে করি যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষা করার পূর্বশর্ত হল গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা, তারাও হয়ত গণতন্ত্র এবং ধর্মনেরপেক্ষতার চরিত্র বিষয়ে সবাই একমত নই! আবার আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই যারা মেকি ঘোষণা করে, সংখ্যাগুরুর ধর্মনিরপেক্ষতাকে সবার উপর চাপাতে বদ্ধপরিকর, কিংবা এই গণতন্ত্রকেই যারা নানা ভাবে গণতন্ত্রের পরিহাসে পরিণত করে চলেছে তাদেরও সবার সঙ্গেই তো আমাদের তর্কবিতর্ক চালিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটাই মতবিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র সত্য উপায়।

যাইহোক এই আলোচনা শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই তিনটি স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করি

(১) জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হতে বাধ্য?

(২) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কি অনিবার্যত জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই?

(৩) জাতীয়তাবাদের আত্মঘাতী সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য আজই আমাদের দেশে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমানবিকতার ব্যাপক চর্চা কতখানি সম্ভব?

এই প্রশ্নগুলির একটা প্রেক্ষিত আছে। এই পত্রিকার গত মার্চ মাসের সংখ্যায় গৌরকিশোর ঘোষ অত্যন্ত দুঃসাহসী, বলা উচিৎ সৎসাহসী- সুবিশ্লেষিত একটি প্রবন্ধে ('ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বনাম সংঘ পরিবার') পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'জনমনে কসমোপলিট্যান বা বিশ্বমানবিক চেতনার উন্মেষ এবং প্রসার ক্রমাগত না ঘটাতে পারলে সেকুলার গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবই নয়।' হিন্দুবাদীরা আজ জাতীয়তাবাদের নামে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর যে প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে তারই সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদীদের একত্র করার তাড়নায় লেখা এই প্রবন্ধটি আরও অনেকের মতো আমাকেও উদ্দীপ্ত করেছে ঠিকই। তবু জাতীয়তাবাদের প্রতি আমার আবাল্যের আসক্তি অতিক্রম করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারছি না বলেই উপরের প্রশ্ন তিনটি আমার মনে জেগেছে এবং আমাকে নিরন্তর ভাবাচ্ছে। আজ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে যখন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবার সময় এসেছে তখন জাতীয়তাবাদের প্রতি এই দুর্বলতা হয়ত খুবই ক্ষতিকর, তা সত্ত্বেও এই ভাবনাগুলিকে আমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

আমি শেষ প্রশ্নটি প্রথমে আপনাদের সামনে পেশ করছি। কেন, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। রবীন্দ্রনাথ কিংবা মানববেন্দ্রনাথের অনুসারীদের কাছে আন্তর্জাতিকতা কিংবা বিশ্বমানবিকতার ধারণা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো সহজ হয়ে গিয়ে থাকলেও এই শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থই যে ক'জন বোঝেন সেটাও ভেবে দেখা দরকার।

সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে মহিলা প্রার্থিনীদের ভাবনাচিন্তা পর্যবেক্ষণ করার একটি সৎপ্রয়াস দেখেছিলাম খবরের কাগজের প্রতিবেদকদের মধ্যে। হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রার্থিনী জনৈকা মুসলিম মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাবরি মসজিদ যে এঁরা ধ্বংস করলেন এ বিষয়ে তাঁর মত কি? তিনি নাকি জবাব দিয়েছিলেন, 'ও তো অন্য দেশে হয়েছে। ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?' প্রতিবেদক অবশ্য জানাননি যে এর পরে তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন কি না যে অন্য দেশ বলতে উনি কী বোঝেন। অযোধ্যাটা আমাদের বাংলাদেশ নয় এই কি তাঁর বক্তব্য? কিংবা ভারতবর্ষের অন্য কোথায় ভারতীয় জনতা পার্টিরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। অথবা ভারতবর্ষ বলতে কী বোঝায় তাই তিনি জানেন না। তাঁর ধারণাটা সেদিন ঠিক মতো ধরতে না পারলেও একথা আমাদের অজানা নেই যে শতকরা পঁচাত্তর জন ভারতবাসী তাঁর দেশের মানচিত্রটাও ঠিকমতো চেনেন না। অবশ্য ইদানীং দূরদর্শনের আবহাওয়া সংক্রান্ত সংবাদের কল্যাণে দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ কলকাতার অবস্থান বিষয়ে সম্ভবত একটা ধারণা হয়েছে অনেকেরই এবং ঐ চারটি শহরই যে আমাদের দেশ এটাও মনে হয় তাঁরা বুঝতে পারেন। তবু অযোধ্যাটা আমাদের দেশ কিনা, ঢাকা অমৃতসর তক্ষশীলা রাওয়ালপিণ্ডি আমাদের দেশ কিনা এ বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকতেই পারে।

অতদূরেই বা যাবার দরকার কী? উলুবেড়িয়ায় কোনো কোনো নির্বাচনপ্রার্থিনী হয়ত জানেন না যে কুচবিহার অথবা মজঃফরপুর তাঁর দেশ, না পাকিস্তান, না বাংলাদেশ। আর প্রার্থিনীর কথাই বা ধরছি কেন? ক'জন পঞ্চায়েত নির্বাচন-প্রার্থী পুরুষ শুধু নয়, ক'জন পঞ্চায়েত প্রধানই বা নিজের দেশের চৌহদ্দীর খবর রাখেন? অথবা তাঁর জেলার বাইরে পা দেবার সুযোগ কতবার পেয়েছেন? বাস্তব পরিস্থিতিটাই যখন এই রকম তখন এদেশের সব উঠতি নাগরিকদের মনে তার রাজ্য, তার রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রসারী চেতনা, একটা আপনকরা আবেগ জাগানোটাই কি প্রাথমিক দায়িত্ব নয়? ছোট ছোট আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি আমরা কি করে ঠেকাব যদি না বৃহত্তর দেশটার প্রতি একটা ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারি? এই মস্ত বড় দেশটার ভালমন্দ, ভাঙাগড়া, ওঠাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকটি নাগরিকের ভালমন্দের যে একটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে সেটি অনুভব করাতে যদি না পারি তবে প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে বিরোধই বা কী করে ঠেকানো যাবে?

তাই আমার মনে হয় একটা দেশাত্মবোধ, একটা জাতীয় চেতনা ভারত রাষ্ট্রের অখণ্ডিত অস্তিত্বের পূর্বশর্ত। ন্যাশনালিজম- এর এত যে বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, তাঁরও মনে হয়েছিল, 'যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্য পদার্থটি আছে যে প্রাণ পদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে।' এই উপমহাদেশতুল্য দেশের বিরাট জন-সমাজকে মেলাবার জন্য দেশটার ভূগোল ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল, এর বহু বিচিত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে আত্মীয়তা, এই দেশের প্রতি একটু মমতা (অহঙ্কার নয়)—এই সদর্থক ভাবগুলি জাগানোর চেষ্টা করলেও কি অবধারিত ভাবে তা জঙ্গী জাতীয়তাবাদে পরিণত হবেই? 'অহঙ্কার ছাড়া জাতীয়তাবাদ দাঁড়াতে পারে না'—একথা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু জাতীয়তাবোধ? তার জন্য দেশের প্রতি অল্প একটু মমতাই কি যথেষ্ট নয়?

আমাদের অনেকের মনেই তো ভারত নামে দেশটার প্রতি গভীর মমতা আছে, তার নিন্দায় বা তার ক্ষয়ক্ষতিতে প্রাণ কাঁদে—তাই বলে কি দেশকে সমস্ত বিচার বুদ্ধি কিংবা ন্যায়অন্যায় বোধের উপরে তুলে রাখছি? 'যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি' তাহলে আমরা কখনোই 'ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে ...বিরোধের আদর্শকে খাড়া' করব না। এই রাবীন্দ্রিক শিক্ষা কি গ্রহণ করা সম্ভব নয়? My country right or wrong—এটা নির্বোধ অদূরদর্শীর উক্তি। ঠিক যেমন my family – right or wrong কিংবা my community – right or worng এই দুটিও অশ্রদ্ধেয় উক্তি।

শ্রীলঙ্কা কি নেপাল কি বাংলাদেশ অথবা অন্য কোনো দেশের সঙ্গে যদি আমাদের সরকার কিংবা দেশের নাগরিকদেরও একাংশ অন্যায় আচরণ করে তবে কি আমরা তার নিন্দা করব না? চোখ বুজে সমর্থন করব? অবশ্য অনেক সময়েই এজাতীয় দুর্ব্যবহারের সপক্ষে আগে থেকেই এত (কু) যুক্তি আর (মিথ্যা) তথ্যও দেওয়া হতে থাকে যে বহু সৎ ভারতীয় নাগরিকদের কাছেও শ্রীলঙ্কায় আমাদের সৈন্য নামানো কিংবা নেপালের সীমান্ত ঘিরে বাণিজ্যিক অবরোধকেও আর অসঙ্গত মনে হয় না। তবু যদি আমরা সতর্ক থাকি তাহলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে দাবিয়ে রাখার জন্য কিংবা নিজের দেশের আর্থিক-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার যখনই অন্যায় আচরণ করবে আমরা তার নিন্দা করতে পারব মুক্ত কণ্ঠে। আমাদের দেশপ্রেমকে সন্দেহ করলেও, দেশদ্রোহী বলে নিন্দা করলেও মানবধর্মকে তার উর্দ্ধে তুলে রাখতে শেষ পর্যন্ত সাহসী হব কিনা জানি না, কিন্তু সেটাই যে আমাদের কর্তব্য সে বিষয়েতো কোনো সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বজনীন নীতি বোধেরও যদি চর্চা করা হয় তবে নিশ্চয়ই জঙ্গী জাতীয়তাবাদ শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু আগ্রাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবাদে পরিণত হতে পারে এই আশঙ্কায় জাতীয়তার আবেগকেই অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে—এটা কি কোনো কাজের কথা হল? এটা বাস্তবে সম্ভব কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার।

উগ্র জাতীয়তাবাদের এবং সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্রেরও প্রতিষেধক হিসেবে গণতন্ত্রকে এদেশে তৃণমূলে ছড়িয়ে দেবার কথা অনেকেই বলছেন। তার উপায় হিসেবে গ্রামস্বরাজ অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্তির গ্রামভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণের তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথাও ভাবছেন। আশাকরি তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে গ্রামজীবনেও কতখানি অশান্তি আর নৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে। পঞ্চায়েত গ্রামের কতখানি উপকার করছে তা গ্রামীণ মানুষই বলতে পারবেন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাকা পয়সা ক্ষমতা প্রতিপত্তি নিয়ে গ্রাম পর্যায়েও যে দুর্নীতি আর হিংসাবিদ্বেষের বিস্ফোরণ ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। তাই মনে সন্দেহ জাগছে সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক কর্তব্য আর অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার প্রকৃষ্ট উপায় কি এই ভাবে গ্রামে গ্রামে দলবাজি, খুনোখুনি, কর—দাতার অর্থে স্বজনপোষণ আর 'নির্বাচিত' প্রতিনিধির শ্রীবৃদ্ধি? এর বিকল্প কী তা নিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ যেসব ভাবনাচিন্তা করছিলেন তাকে আমরা বিশেষ আমল দিইনি। কিন্তু নিজেরাও তো অন্যকিছু ভেবে বার করতে পারিনি।

এদিকে 'গণতন্ত্র' যে ভাবে শুকনো 'তৃণমূলে' ছড়িয়ে চলেছে তাতে সত্যিকার স্বায়ত্ত শাসন আর ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটছে কি? অথবা গ্রামীণ মানুষকে পীড়নের এই নতুন যন্ত্র গ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে? বিষয়ান্তরে যাবার আগে ১৩১২ বঙ্গাব্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই একটি উদ্ধৃতি উপহার দিই 'এক সময় পঞ্চায়েত আমাদের দেশের জিনিষ ছিল, এখন গবর্মেন্টের আপিসে-গড়া জিনিষ হইতে চলিল।...যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বত:প্রদত্ত নহে, যাহা গবর্মেন্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে—তাহা ঈর্ষ্যার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েতের পদ লাভ করিবার জন্য অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে।'...শতাব্দীর শেষ বর্ষে পা দিয়ে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

মেকি স্বায়ত্ত শাসনে দুর্নীতি একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর দুর্নীতি, অরাজকতা, প্রশাসনের প্রতি সর্বব্যাপী অনাস্থা, আত্মঅবিশ্বাস, সর্বমঙ্গলদাতা এক নেতৃত্বের জন্য আকুলতা এবং অবশেষে সেই প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন নেতা ও তার দলের উপর বিচারহীন আস্থা—এই ভাবে ধাপে ধাপেই স্বৈরতন্ত্র এসে কাঁধে চড়ে বসে...ধর্মসংস্থাপনার্থ! তাই রাজনীতি ব্যবসায়ীরা যখন ধর্মের কথা বলে তখনই আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। কিন্তু এই ইতিহাস যারা জানে তারাও যথাসময়ে বিপদের লক্ষণগুলি চিনে উঠতে পারে না প্রায়ই।

যাই হোক আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে ফিরে যাই। নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠবার জন্য পরিবারের প্রতি আনুগত্যের চর্চা করতে হয়, আবার পারিবারিক স্বার্থকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুটা খর্ব করে পল্লীর প্রতি সৌহার্দের চর্চা করতে হয়। তারপরেও পল্লীর প্রতি আনুগত্যেরও উর্দ্ধে উঠে বৃহত্তর দেশ বা রাজ্যকে ভালবাসতে এবং তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হয়। এসব তো পুরানো কথা। বহু আধুনিক দেশের মানুষই এইভাবে বৃহত্তর গোষ্ঠীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে শিখেছে। যা এখনও ভালো করে শেখা হয়নি সে হল জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিকতার চর্চা করা। উন্নত চিন্তাভাবনায় সক্ষম সব মানুষই জানেন যে এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আমাদের ব্যক্তিসত্তা প্রসারিত ও পরিণত হয়। ব্যক্তিগত ছোট ছোট স্বার্থকে, এমন কি স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি আনুগত্যকেও যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বলি দিতে শেখা দরকার, এটাও কিছু আর নতুন কথা নয়।

অথচ এত সব জেনে শুনেও অত্যন্ত অগ্রসর দেশের মানুষও এখন পর্যন্ত পুরানো অভ্যাস, পুরানো চিন্তাকে কাটিয়ে উঠে বিশ্বের মানুষের প্রতি শুভকামনার প্রমাণ যে প্রতিদিন দিচ্ছে না, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কখনও বা কোনো দূর দেশের সঙ্গে ও স্বার্থের সংঘাতকে জিইয়েই রেখেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। ইরাকে আমেরিকার সাম্প্রতিক আচরণ বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্ভাবনাকে অত্যন্ত নীতিহীনভাবে আঘাত করেছে। জোর যার মুল্লুক তার—বর্বর যুগের এই নীতি আজও আমরা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে নিয়ে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছি। সাম্যবাদীরা জাতীয়বাদকে খর্ব করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেও তো স্বপনেই মিলিয়ে গিয়েছে। কয়েকজন বিশ্বপ্রেমিক ভাবুক যত বড় আদর্শের কথাই বলে থাকুন না কেন, কোনো দেশই এখনও এই ব্যাপারে আমাদের সামনে অনুকরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত রাখতে পারছে না। ভিসা পাসপোর্ট ইমিগ্রেশানের কড়াকড়ি ইত্যাদি কাঁটাতার দিয়ে বিদেশীকে ঠেকাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের এই আত্মকলহে জর্জর রাষ্ট্রে কসমোপলিট্যানিজমের চর্চা কে যে শুরু করবে, কি ভাবে করবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

তবু আপৎকালেও—দুর্ভিক্ষে বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে—দূর দেশের অপরিচিত মানুষদের জন্যও যে অনেকখানি মানবিক সহানুভূতি ও সাহায্যের মনোভাব দেখা যায় এটাও প্রশংসার ব্যাপার বই কি। ইথিওপিয়া কি বসনিয়ার অনাহার—ক্লিষ্ট মানুষের জন্য দূর—দূরান্ত থেকে যখন স্কুলের ছেলেমেয়েরাও আহার সামগ্রী পাঠায় কিংবা ফিলিপাইন দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে সারা বিশ্বের মানুষ উদ্বিগ্ন বোধ করে তখন বিশ্বজনীন সহানুভূতির সামান্য ঐ আভাসটুকুতেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাভরসার ক্ষীণ রেশ জেগে থাকে।

এই ভাবে আশা জাগিয়ে রাখেন কিছু অসাধারণ মানুষও। এ্যালবার্ট শোয়াইৎজার কিংবা মাদার টেরিজার মতো ব্যক্তিরা দেশের উর্ধ্বে উঠতে পেরে অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খ্রিস্টান মিশনারীদের শতদোষের কথা শুনেও বলব যে বিশ্বমানবিকতার পরিচয় এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে যতখানি পাওয়া যায় ততখানি আর কোনো গোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া যায় বলে তো মনে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারছি না। মুমূর্ষুকে, কুষ্ঠ রোগীকে, পরিত্যক্ত উন্মাদিনীকে এরা যে ভাবে পথ থেকে তুলে আশ্রয় দিচ্ছেন, পরিচর্যা করছেন তেমন আর কে করছেন? তবু তাঁদের সম্বন্ধে কৃতঘ্ন বক্রোক্তি প্রায়ই শুনতে পাই।

এদেশে আমরা যারা পরিবারের গণ্ডী থেকে বার হয়ে পল্লীর মঙ্গলটুকুও চিন্তা করতে পারি না, আবর্জনার গাড়ি চলে যাবার পর নিজের সংসার পরিষ্কার করে জঞ্জালের পুঁটুলি অনায়াসে প্রতিবেশীর দুয়ারের সামনে রেখে আসি, আপৎকালীন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে কালোবাজারি করি, শিশুদের খাদ্যে ও প্রাণদায়ী ওষুধে ভেজাল মেশাই—এই আমরাই কী করে এক ধাপে বিশ্বমানবিক চেতনায় উ দ্বুদ্ধ হয়ে উঠব ভেবে পাই না। নেতারা পর্যন্ত পারিবারিক স্বার্থের উপরে উঠতে পারছেন না। এই ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা থেকে একেবারে বিশ্বজনীন পরার্থপরতায় উত্তরণ সম্ভব? প্রথমে কি দেশের প্রতি, জাতির প্রতি একটা দায়িত্ববোধ জাগানো দরকার নয়? তারপর হয়ত রয়ে সয়ে ধাপে ধাপে কসমোপলিট্যানিজমের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

এইবার আমি আমার প্রথম প্রশ্নে আসি। জাতীয়তাবাদ কি ভারতীয় সংহতির পথের কাঁটা? জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ হিন্দুবাদ হয়ে ওঠে তবে তো কাঁটা হবেই। জাতীয়তার অর্থই যদি হয় হিন্দুতা তবে তাতে অহিন্দুর স্থান কোথায়? অবশ্য হিন্দুবাদীরা ঐ 'হিন্দু' শব্দটি নিয়ে বেশ ভেলকি খেলেন। সাধারণত হিন্দু বলতে তাঁরা সেই ধর্মসম্প্রদায়কে বোঝেন যাঁরা বেদপুরাণ গীতার শিক্ষার উপর তাদের জীবনাদর্শকে এবং বর্ণাশ্রমের উপর জীবনচর্যাকে গড়ে তুলেছেন। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে আস্থাও অধিকাংশ হিন্দুর সামান্য লক্ষণ। এই যদি হিন্দুর অভিধা হয় তবে শিখ খ্রিষ্টান মুসলমান তো বটেই এমন কি জৈন ও বৌদ্ধদেরও 'হিন্দু' বলা যায় না। তখন হিন্দুবাদীদের পক্ষে এইসব অহিন্দুকে গেলাও কঠিন হয়ে পড়ে, ফেলাও অসম্ভব ঠেকে। তাই তাঁরা তখন কথার ফেরে ভোলাতে চান। বলেন, হিন্দুর অর্থ ভারতীয়, যেমন হিন্দুস্থান আর হিন্দুস্থানীর অর্থ ভারত এবং ভারতীয় মানবগোষ্ঠী অথবা ভাষা! এই দ্বিতীয় অভিধাই যদি নিতে হয় তবে তো ভারতে জন্মালেই হিন্দু হওয়া যায়! তাহলে আবার এমন একচোখামি কেন করা হয় যে একদল যেন জন্মসূত্রেই হিন্দু ও দেশপ্রেমিক আর অন্য একদলকে চেষ্টাচরিত্র করে স্বভাবচরিত্র পালটে দেশপ্রেম শিখে হিন্দু হতে হবে?

যাইহোক হিন্দুবাদীদের এই কূটনৈতিক উদারতার সুযোগ নিয়ে বলি যে ভারতীয় মাত্রই যদি হিন্দু হয় তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদও ভারতীয় সংহতির অন্তরায় নয়। তবু এই অর্থেও আমি উগ্র জাতীয়তাবাদকে বেশ ভয় করি এই কারণে যে যদি এই অহঙ্কারী জাতীয়তাবাদ স্বার্থোন্মাদ হয়ে ওঠে তাহলে সেটা ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হবেই এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্তরায় হবে। এই জন্যই আমি 'গরব সে বোলো হম হিন্দু হ্যাঁয়' -কে রণহুঙ্কার, অতএব ভয়াবহ জ্ঞান করি।

কিন্তু নম্র একটি জাতীয়তাবোধের খুব প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। কারণ ক্রমশ দূর থেকে দূরতর অনাত্মীয়কে ভালবাসার ক্ষমতা আয়ত্ত করা অত্যাবশক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই বোধের ভিতর দিয়ে, এই প্রেমের ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়েই ক্রমে একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা তার সম্প্রদায়কে, তার দেশকেও অতিক্রম করে বিশ্বমানবতাতে পৌঁছবার পথ করে নিতে পারে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, 'যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়', সেখানে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কোনো স্থান নেই। কিন্তু জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তো ঐ চিরন্তন মূল্যবোধের কোনো বিরোধ নেই বরং ঐ মূল্যবোধেই তার উৎস। তাই ক্রমপ্রসারণের এই চেতনা আপন পরিমাণের বেগেই বিশ্বমানবতায় গিয়ে মিলতে পারবে বলে আমার ধারণা এবং মিলতে পারলেই তার সার্থকতা। এই বোধের মূলে আছে স্বগৃহকে পিছনে ফেলে ক্রমাগত দূরকে, অনাত্মীয়কে আপন করার চেষ্টা। বিশেষত এই দেশে যার আয়তন ও বৈচিত্র্য প্রায় একটি মহাদেশের মতো। নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ধর্মকে আত্মস্থ করেই বিবর্তিত হবে যে জাতীয়তার বোধ তাকে তো অনেকান্তবাদী হতেই হবে।

এর পরে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনে হয় কঠিন হবে না। জাতীয়তাবাদকে যদি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি তাহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অনিবার্য জঙ্গী হিন্দুবাদ হয়ে উঠবেই। জঙ্গী হতে হবেই কারণ গৃহযুদ্ধ ছাড়া, বলপ্রয়োগ ছাড়া অহিন্দুকে হিন্দু করে ফেলা কিংবা ভারতবর্ষ থেকে দূর করে দেওয়া বা নিঃশেষ করে ফেলাও তো সম্ভব হবে না। হিটলার যেমন করে ইহুদী সমস্যার সমাধান করেছিল। তবে বালাসাহেব দেওরস আর বাল ঠাকরের পক্ষে ঐ চূড়ান্ত সমাধানটা তত সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। সম্প্রতি মহরম উপলক্ষ্যে পাড়ার মসজিদ থেকে এক রাত্রে ধর্মীয় আলোচনা সভায় একজনকে উদাত্ত কণ্ঠে গাইতে শোনা গেল

'ছাড়ব না কোরান,
না ছাড়ব হিন্দুস্তান।'

জোর করে ছাড়াতে গেলে সে পথে গুপ্ত ঘাতকরা মারাত্মক মারণাস্ত্র বিছিয়ে রাখবেই। এই ভাবে সারা দেশটা রণক্ষেত্র হয়ে যাবে। এমন বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করার পরেও কি আমরা অন্যপথের সন্ধান করব না?

ভারতীয় রাজনীতিকে হিন্দুবাদী করা আর হিন্দুবাদকে জঙ্গীবাদ করে তোলা যদি বা একজন সংকীর্ণচেতা, দূরদৃষ্টিহীন, আত্মহননে উৎসুক নেতার স্বপ্নবিলাস এবং আমরণ প্রয়াস ছিল, তবু তা ব্যর্থ হবে বলেই আমার ধারণা। কারণ আমার রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টি তার চেয়ে অনেক বেশি বলেই আমি তাঁর উপরে আস্থা রাখি

'বর্তমান কালে হিন্দুয়ানীর পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধূলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলি উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

'কিন্তু এ ধূলা কাটিয়া যাইবে; আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে—সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।'(১৩০৫ বঙ্গাব্দ)

বিবিধের মাঝে মহান মিলনের ভাবনা কি শুধুই আত্মছলনা, কেবলই আলেয়া? সেই মহৎ সম্ভাবনা এখনও অনেকটা অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে বটে। কিন্তু এই দিক্‌ভ্রান্ত দেশকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাবার মত বড় মাপের দিশারী কি সত্যিই দেখা দেবে না? তবে কি সেই চিরন্তন বাণীই আজকেও প্রতিটি ভারতবাসীকে পথ দেখাবে আত্মদীপঃ ভব! যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আত্মদীপ হতেই হয়। আর এহেন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে কি জঙ্গী জাতীয়তাবাদ চোখে ঠুলি পরাতে পারবে?

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪ (১৪০০), সং ২, পৃঃ ১২৪-১২৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

ভাষা নিয়ে এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে গত ৩৩ বছরে বেশ কিছু ছোট-বড় গণহত্যা স্বাধীন ভারতে ঘটে গেছে এবং প্রতিবারই বিপন্ন জাতীয় সংহতিকে রক্ষা করার নানা রকম উপায় নানা জনে বাৎলেছেন। সম্প্রতিকালে আসাম, ত্রিপুরা বা সমস্তটা পূর্বাঞ্চলেই যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল এবং এখনও যা ধোঁয়াচ্ছে তার চেহারাটা একটু আলাদা এবং জাতীয় সংহতি নিয়ে দুশ্চিন্তাটাও আরো গভীর।

ইতিপূর্বে ভারতের আর কোনও অঞ্চলে ভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে, বসবাসকারী মানুষকে 'বহিরাগত' বা বিদেশি আখ্যা দেওয়া হয় নি। এক কাশ্মীর ছাড়া, অন্য কোনো অঞ্চল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা সত্যিই দেখাও দেয় নি, মাদ্রাজে ডি. এম. কে যতই যা বলে থাকুক না কেন। অবশ্য সীমান্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার দাবি ওঠা আরো সহজ এবং বেশি আশঙ্কাজনক। যাই হোক শুধু জাতীয় সংহতি নয়, ৩৩ বছরের মধ্যে আবার ভারতের ভৌগোলিক সত্তা বিষয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

এদিকে ভারতেই কিছু ভারতীয় নাগরিক 'বহিরাগত' বলে ঘোষিত হতে শুরু করায় ভারতীয় জাতীয়তা বোধের মূলেই এবার আঘাত পড়েছে। অবশ্য সভ্য দেশে অবাঞ্ছিত বিদেশিকেও কেউ সরাসরি হত্যা করতে ছুটে যায় না—সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক কিছু আইন আছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমাদের জাতীয় চরিত্র গত পঁয়তাল্লিশ বছরে ক্রমে ক্রমে এতদূর নষ্ট হয়ে গেছে, বর্বরতা এমনই স্বভাবসিদ্ধ হয়েছে যে নির্বিচারে নরহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, পোড়ানো—এগুলি আজকাল বেশ ঘটে যেতে পারে এবং মাসখানেকের বেশি তা নিয়ে কারুর মনে খুব বেশি অস্বস্তি থাকে না। এই তো ত্রিপুরার গণহত্যা এখনই আমরা প্রায় ভুলে গেছি। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হয়েছিল তার অসংখ্য পুনরাভিনয় হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থের যখনই সংঘাত ঘটেছে তখনই শেষ পর্যন্ত এই রকম প্রত্যক্ষ সংগ্রামে গিয়ে তা দাঁড়িয়েছে।

আসামের আন্দোলনের পর থেকে আমরা প্রশ্ন করতে শুরু করেছি, আঞ্চলিক সত্তা এবং আঞ্চলিক স্বার্থ ইত্যাদির উপরেও একটা ভারতীয় সত্তা আমাদের আছে কি না। এবং যদি থাকে তবে সেই সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আঞ্চলিক স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সপক্ষে বিসর্জন দেওয়ার কোনও দায়িত্ব আমরা বোধ করি কি না। অথবা অচিরেই ভারত-ভূখণ্ড পরস্পর বিবদমান কয়েকটি 'স্বাধীন' অঞ্চলে পরিণত হবে কি?

আঠের বছর আগে ১৯৬২ সালে আমাদের একজন বিচক্ষণ ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত লিখেছিলেন ঃ "It appears probable that in some years from now the Republic of India will break down in confusion...The point that seems beyond dispute is that the disintegration of india, if it comes, will come largely as a result of a vicious mental climate that is being steadily built up in the country. Numerous factors, material as well as psychological are contributing to this process." আমি কথাটাকে তখন নৈরাশ্যবাদীর কাল্পনিক বিভীষিকা বলে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই নি। কারণ এর সত্যতা যে এত অল্পদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হবে তা তখন অনুমান করি নি।

কিন্তু এখনও দেখছি ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই এ নিয়ে তেমন বিচলিত নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অশান্তি পশ্চিমবাংলার মানুষকে নানা কারণে একটু বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলছে, প্রধানত ওই অঞ্চলের এক বিরাট সংখ্যক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নাগরিকত্ব হারাতে বসেছেন এবং তাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন বলেই। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে এ নিয়ে তেমন উদ্বেগ নেই এবং তাঁদের মনোভাব কতকটা বোঝা যাবে অর্গানাইজার পত্রিকার সম্পাদক কে আর মালকানির বক্তব্য থেকে। অর্গানাইজার জনসংঘের মুখপত্র। এ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যে নানা কারণে অসন্তুষ্ট বোধ করতে পারে এবং ভারতের ভৌগোলিক সত্তার অন্তর্গত হয়েও ভারতীয়ত্ব বা বিভিন্ন বিষয়ে যে তারা একাত্মবোধ না-ও করতে পারে, একথা শুধু জনসংঘ নয়, ভারতের বহু নাগরিকই অনুমান করতে পারেন না। তাঁদের মনে হয় হিন্দু বললে একটা ধর্মসম্প্রদায় মাত্র নয়, বরং সর্বভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝায় এবং এই সংস্কৃতি এত উদার এবং সর্বমতসহিষ্ণু যে, যে-কোনো ভারতীয় ভাষা, ধর্ম বা জাতিগত গোষ্ঠীকেই এর অন্তর্গত জ্ঞান করা যায়। এ দেশে যে বহু মানবগোষ্ঠী বা race, ধর্মসম্প্রদায় এবং ভাষাগোষ্ঠী, নিজেদের বৃহত্তর সমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করতে পারে এবং সে কারণেই নিজেদের জন্য স্বনিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দাবী করতে পারে এবং রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইতে পারে, একথাটাই মালকানিরা বুঝতে পারেন না। যেমন বুঝতে পারেন নি পাকিস্তানের দাবির সময়েও। তাঁদের মতে ঃ "nobody is doing anybody else a favour by being part of India it is to the mutual advantage of all to be here together." এই কথাটার সত্যমিথ্যা যাচাই করে তেমন লাভ নেই। কিন্তু আসলে যাই হোক, এই দেশের অনেক অঞ্চলের মানুষ যে মনে করে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত থেকে তাদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে এবং তারা শোষিত হচ্ছে, একথা কি অস্বীকার করা যাবে? আসামের তো একটা বড়ো অভিযোগই হলো এই যে তার কাঁচামাল উজাড় করে নিয়ে আসা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে বর্তমান দিল্লি সরকারের আচরণে কোনও পার্থক্য নেই। প্রতিদানে তাদের আর্থিক উন্নতির কোনও চেষ্টা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের, আসামে কোনও শিল্প গড়ে তুলে স্থানীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানুষদের কর্মসংস্থান করার কোনও আয়োজন করা হয়নি স্বাধীন ভারতে, এই সব অভিযোগ অধিকাংশ ভারতীয়ের কানে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে কি?

কাশ্মীরের অভিযোগের তো অন্ত নেই। বাকি ভারতবর্ষের মানুষের গাঁটের কড়ি খরচ করে তাদের জন্য কম দামে চাল সরবরাহ করেও তাদের মন পাওয়া যায় নি এবং কাশ্মীরে যারা অসন্তুষ্ট, তারা যে সবাই পাকিস্তানপন্থী—এও নয়। আরো লক্ষ্য করুন, এদেশের অসংখ্য আদিবাসীগোষ্ঠী, দলিত সমাজ, নানা ভাবে পিছিয়ে-পড়া অংশেও গভীর অসন্তোষ রয়েছে এবং ফলতঃ একটি বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাব ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অথচ এই বিপদের লক্ষণগুলি এখনও অনেকের চোখে পড়ছে না, পড়লেও তার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা সরকারি বা বেসরকারিভাবে কিছুই প্রায় করা হচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝেই এই অসন্তোষ যখন প্রচণ্ড উন্মত্ততার সঙ্গে ফেটে পড়ে তখন সরকার প্রথমত দিশেহারা হয়ে পড়েন, তারপর C. I. A., চীনের চর, মিশনারী ইত্যাদিদের দোষারোপ করে কিছু কাল ক্ষয় করেন এবং শেষকালে জোড়াতালি দিয়ে সমস্যাটাকে সাময়িক ভাবে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হয়, যেমন কিনা আসামের বেলাতেও হচ্ছে এখন।

৭ই আগস্টের পত্রিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশ দেখলাম, বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর অঞ্চলে মিশনারীরা যেন নতুন করে আর কোনও জনকল্যাণ পরিকল্পনা না নেন সে বিষয়ে তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এখন থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বর্তমানে তাঁরা যেসব জনকল্যাণকর্ম করে চলেছেন সেগুলি রাজ্যসরকার অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হলেই সেগুলিও যথাসময়ে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে ঐসব অঞ্চল থেকে সরে আসার জন্য মিশনারীরা যেন প্রস্তুত হন। এই সরকারি-ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, রাজ্য সরকারের ধারণা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে মিশনারীদের উস্কানি রয়েছে।

আর একটি সংবাদ ৮ই আগস্টের। আমাদের প্রধান মন্ত্রী তার আগের দিন রাজ্য সভায় নাকি ঘোষণা করেছেন যে আমাদের পূর্ব সীমান্তে যে সহিংস বিদ্রোহ প্রকাশ পাচ্ছে তার পেছনে এমন কিছু চীনপন্থী লোক রয়েছে যারা চীন থেকে অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে—এমনতর সন্দেহ করার সপক্ষে নাকি যথেষ্ট কারণ আছে।

এই দুটি সংবাদ উল্লেখ করলাম শুধু দেখাবার জন্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করার ব্যাপারে আমাদের সরকারী ভঙ্গিটা কি রকমের। যদি কোথাও কোনও মিশনারী সত্যিই দেশদ্রোহী কাজে সরাসরি লিপ্ত থাকেন বা সে বিষয়ে পরোক্ষে উসকানি দিয়ে থাকেন তবে সেই অপরাধীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন এবং আইন অনুযায়ী বিচার করে দণ্ডই বা দেওয়া হচ্ছে না কেন? কিছুকাল আগে ফাদার স্ট্রোসিও নামে একজন মিশনারিকে হঠাৎ ভারত ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো। তারপর দেশজোড়া প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার সেই আদেশ প্রত্যাহার করে নেন। এখন আমার প্রশ্ন যে ফাদার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্ট্রোসিও সত্যিইকি কোনও দেশদ্রোহী কাজ করেছিলেন, না করেন নি? যদি করে থাকেন তবে তাঁকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত কেন বলবৎ রইল না? আর যদি তিনি নিরপরাধ হন তবে আদৌ তাঁকে এমন অপমান ও লাঞ্ছনা কেন সহ্য করতে হল, কেনই বা দেশের খৃস্টান সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলে দেশের প্রতি এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে বাধ্য করা হল? এটা কি জাতীয় সংহতিকে জোরদার করে?

যদি সত্যিই কেউ অপরাধ করে তবে জনস্বার্থে সেই ব্যক্তির বিচার হোক, দণ্ড হোক। কিন্তু যদি অপরাধ প্রমাণ করা এবং দণ্ড দেওয়ার পরিবর্তে দেশের সরকারও কেবল অস্পষ্ট সন্দেহ ও ভিত্তিহীন গুজব ছড়ান তবে দেশ ও সরকার সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হন, এটা কি খুব স্পষ্ট নয়? তা ছাড়া যেসব সেবার কাজ বহু বৎসর ধরে মিশনারীরা করে আসছেন এবং তার ফলে দেশের বহু মানুষের আস্থা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সহসা সেই কাজ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করলে এই উপকৃত মানুষগুলিকে ক্ষুব্ধ করা হবে না কি? তাছাড়া এই সব কাজের দায়িত্ব কাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, সরকারি চাকুরেদের হাতে—না রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে? আমাদের এই শহরে সরকারি স্কুলও আছে, মিশনারী স্কুলও আছে—আমরা কি গর্ব করে বলতে পারবো যে 'হিন্দু স্কুল', 'হেয়ার স্কুল' বা 'বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল', 'সেন্ট জেভিয়ার্স' কি 'সেন্ট লরেন্সে'র চেয়ে সুপরিচালিত? আর রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে জনসেবার কাজ তুলে দিলে যা হতে পারে তার নমুনা তো আমরা 'কাজের বদলে খাদ্য' দেবার পরিকল্পনাটা খরাগ্রস্ত অঞ্চলে কি রকম চলছিল তার খবর নিলেই জানতে পারব।

তাছাড়া আমরা যদি রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় হিন্দু মিশনারীদের কাজে বাধা না দিই, অথচ খৃস্টান মিশনারীদের কাজে বাধা দিই, তবে তাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং ভেদবুদ্ধি প্রকাশ পায় না কি? যদিও সি পি এম সরকার ভারত সেবাশ্রম সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ, এই প্রতিষ্ঠানটির সেবাকার্য সম্বন্ধে সারা ভারতবর্ষে বহু মানুষ কিন্তু খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন, কারণ সাধুরা খুব সততার সঙ্গে এই কাজ করেন। তবে এঁদের ধর্মীয় মতামত বিষয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মনে যে সন্দেহ বা আশঙ্কা আছে, একথা কি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা জানেন? এমন কি রামকৃষ্ণ মিশনও যে সম্প্রতি আসামে আক্রান্ত হয়েছিল তাতে অনেকে আশ্চর্য হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ভেবে দেখেন না যে খৃস্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজের মনে যেরকম সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে হিন্দু-মিশনারীদের সম্বন্ধেও অপর পক্ষে সেরকম মনোভাব থাকা অন্যায় নয়। তাই পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস যদি আমরা দূর করতে চাই তবে সর্বত্র সব অপরাধের দায় C. I. A. আর খৃস্টান মিশনারীদের উপর যেন নির্বিচারে চাপিয়ে না দিই, সমস্যার আসল মূল কোথায় তারই সন্ধান করি। নয়ত দেশের এক বিরাট জন গোষ্ঠীর আনুগত্য আমরা হারাব।

আবার চীন আমাদের একটি প্রবল প্রতিপক্ষ এবং প্রতিবেশী। চীন সম্বন্ধে, আমাদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আভ্যন্তরীণ অশান্তিতে চীন বা অন্য কোনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে সরকারী কোনও মত প্রকাশ করার সময় অনেকখানি সাবধানতা অবলম্বন করলেই রাজনৈতিক বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়। এদেশের তো একটা সংবিধান আছে, আইন-কানুন আছে এবং সেই অনুযায়ী অপরাধের বিচার ও শাস্তিদানেরও দায়িত্ব রয়েছে সরকারের। অথচ দেখি ভিন্ন দেশের চর এবং অন্তর্ঘাতী কর্মে রত ব্যক্তিদের খুঁজে বার করা, বিচার করা, শাস্তি দেওয়ার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সরকারের যত না আগ্রহ তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসাহ স্থানে-অস্থানে সন্দেহ ও গুজব ছড়ানোর। অন্তত কয়েকটি চীনপন্থী দেশদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে তারা কী ভাবে চীন থেকে ট্রেনিং ও অস্ত্র-শস্ত্র পাচ্ছে তার স্পষ্ট প্রমাণ আমাদের সামনে তুলে ধরে তবেই রাজ্যসভায় ওই জাতীয় ঘোষণা করলে প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষণতা ও তৎপরতার প্রশংসা করতাম।

দেশের কোনও এক অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে হিংসাত্মক কাজ করলে তার শাস্তি কঠোর হাতে দেওয়া হোক, অথচ সে কাজে সরকারি ব্যর্থতার তুলনা নেই। আবার শাস্তি দিলেই শুধু চলে না, তাদের ক্ষোভের কারণও অনুসন্ধান করতে হয়, এবং সঙ্গত কারণগুলির সমাধানও করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে অসংখ্যবার অসংখ্য কমিশন বসেছে। এবং অনেক অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত হবার পর মূল্যবান নির্দেশ ও পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সব নির্দেশ কোনও দিন পালিত হয়নি। অতএব সমস্যাও যেমন কার তেমনি রয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ফেটেও পড়ছে আবার স্বাভাবিক নিয়মে থিতিয়েও যাচ্ছে। হয়ত এই রকমটাই হওয়া আমাদের জাতীয় ভবিতব্য। অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারেও আমরা যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি, নানারকম পদ্ধতি তালগোল পাকিয়ে একটা ভারতীয় পদ্ধতি বার করেছি কাজ করার এবং না করার, তেমনি সামাজিক সমস্যার সমাধানও ঘটবে অতি ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে, হাজার বছর ধরে। এইটা মেনে নিতে পারলে আর কোনও সমস্যাই থাকে না, মেনে নিতে পারি না বলেই আমরা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছি।

বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মসম্প্রদায়ী, বহুজাতি গোষ্ঠীর একটি দেশে আমরা সেরকম সংহতি প্রত্যাশা করতে পারি না, যেমনটা ছোট্ট একটি দেশে করতে পারি, যেখানে ভাষা, ধর্ম, জাতি নিয়ে বিশেষ কোনও বৈষম্য বা বৈচিত্র্য নেই। আমাদের সমস্যাটার তুলনা হয় কেবল সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বা চীনের সঙ্গে। সেখানে জবরদস্তি করে এক রকম একটা সমাধানে পৌঁছোনো গেছে, ঐক্য সাধন করা হয়েছে যেটা এখানে সম্ভব নয়, কারণ ভারতবর্ষ একনায়কতন্ত্রী দেশ নয়, সরকারি ফতোয়া দিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান করে ফেলা এদেশে সম্ভব নয়। এখানে ধীরে সুস্থে পাঁচজনের মত নিয়ে এগোতে হয়। আমাদের বৈচিত্র্য আছে এবং বৈচিত্র্য থাকবে এই নিয়ে আমাদের গর্ব ; "বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' বলে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সাধনাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই মিলন এখনও এতটাই সাধন করা বাকি রয়েছে যে ভাষার জন্য ধর্মের জন্যই শুধু নয়, চাকুরীর জন্য, জমির জন্যও আমরা অপরের মাথা ভাঙতে পিছ পা হই না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখন আমরা যদি সত্যি চাই যে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য সৃষ্টি করব আমরা, অর্থাৎ যদি বৈচিত্র্যকে যথা-সম্ভব রক্ষা করতে চাই, তবে তার কিছু দায়িত্ব আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এতই বিপুল যে সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা, যথাযথ পরিমাণে প্রাধান্য দেওয়া খুব সহজ নয়। ১৪টা ভাষাকে সংবিধানে স্থান দিতেই আরো ১৪টা ভাষার দাবি এগিয়ে আসে এবং নীতিগতভাবে তাদের দাবি অগ্রাহ্য করার কোনও যুক্তিও নেই আমাদের। আঞ্চলিক সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকটি রাজ্যেরই যে একটা বিশেষ সংস্কৃতি আছে কেবল তাই নয়, প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই আবার বেশ কিছু minority culture বা সংখ্যালঘু সংস্কৃতিও রয়েছে। স্বভাবতই এই সব সংখ্যালঘু সংস্কৃতির মানুষেরা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে কেউ কেউ নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়েছেন এবং সে বিষয়ে সরকারি ঔদাসীন্য বা বৃহত্তর জনসমাজের তাচ্ছিল্য অথবা করুণা তাঁদের ক্ষুব্ধ করে। এই ক্ষোভকে রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে অসন্তোষ তীব্রতর করে তোলে। নাগাল্যান্ড-মিজোরাম-মণিপুর-উত্তরাখণ্ড ঝাড়খণ্ড সর্বত্রই এই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে। যতটা অর্থনৈতিক উন্নতির সমতা আনতে পারলে রাজ্যে রাজ্যে বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঈর্ষার ভাব জাগতো না, তাও ঠিকমতন পরিকল্পনা করে করা হয় নি। ফলে শুধু আসামের নয়, আরো বহুরাজ্যেরই মনে হয় শিল্প-উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের সঙ্গত দাবি রক্ষিত হয়নি—এই ব্যাপারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল সুয়োরাণীর আদর পেয়েছে দিল্লীর—এই রকম একটা ধারণা অনেকের মনেই দৃঢ় হয়েছে। এ বিষয়ে সুপরিকল্পিত উন্নয়নের যেমন প্রয়োজন আছে দেশের সর্বশ্রেণীর মঙ্গলের কথা চিন্তা করারও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি, সর্বভারতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তোলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু প্রচার কর্মেরও প্রয়োজন আছে। কেন একটি বিশেষ লাভজনক শিল্প একটি বিশেষ অঞ্চলে গড়ে তোলা যায়, আর কেন অন্য একটি অঞ্চলে যায় না এবং এ বিষয়ে যে একটি রাজ্য অন্য রাজ্যের পরিপূরক হলেই সারা দেশের মঙ্গল, অক্ষম প্রতিযোগিতায় কারুরই উন্নতি হবে না, সেকথাও জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্যে রাজ্যে ঈর্ষা, এক শ্রেণীর কাছ থেকে অন্য শ্রেণী অবিচার লাভ করছে এরকম ক্ষোভ, কখনও কখনও সঙ্গত হলেও বহুক্ষেত্রে দেখা যাবে যথেষ্ট সঙ্গত নয়। তবে এই দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য বড়ো করে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করবার আশু প্রয়োজন রয়েছে এবং একাজে যত দেরী হতে থাকবে অসন্তোষ, ক্ষোভ, বিদ্রোহ ততই প্রবল হতে থাকবে। অর্থাৎ আমার মনে হয়, এবং এটা কিছু নতুন কথা নয়, কারণ অনেকেরই একথা মনে হয়, যে অ-সংহতির সবচেয়ে বড়ো কারণটি অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি না দিলে কোনও সরকারই ভারতবর্ষের সব ক'টি অঞ্চলকে এক করে রাখতে পারবেন না। যে রাজ্য কাঁচামাল জোগান দিচ্ছে আর যে রাজ্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করছে, দুই-ই যদি সমান আর্থিক সাচ্ছল্য উপভোগ না করে তবে হিংসা বিদ্বেষ দেখা দেবেই তো। অর্থাৎ কাঁচামালের উৎপাদক আর শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদককে সমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মূল্য দিতে হবে নয়ত এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শোষণ করছে, এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে বঞ্চিত করছে—এমন অভিযোগ উঠবেই।

তবে অর্থনৈতিক সমতাও যেমন দরকার, সাংস্কৃতিক সমদৃষ্টিরও তেমনি। এক ভাষার বা এক ধর্মের অথবা এক সংস্কৃতির প্রাধান্য অন্যদের পরশ্রীকাতরতার কারণ হবেই। অবশ্য সব সংস্কৃতিই তুল্যমূল্য একথা কেউ বলবে না। কিন্তু কোনও একটি সংস্কৃতি যেন এতখানি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পায়, যাতে অন্যরা অবহেলিত বোধ করে। সর্ব ভারতে আমাদের ভাষা-সমস্যার এখনও কোনও স্বীকৃত সমাধান হয়নি। একদিকে বেসরকারি উৎসাহে ইংরিজির প্রচার ও প্রসার স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের চেয়ে বেশিই হয়েছে বলা যায়, ইংরিজি স্কুলের চাহিদা এত বেশি বেড়ে গেছে যে আগে তা কল্পনাও করা যায় নি। এদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারী আপিসে হিন্দি তার জাল ছড়িয়ে চলেছে, ওদিকে হিন্দী সিনেমাও ভারতবিজয় সেরে ফেলেছে প্রায়। তবু কাজ চালানোর মতন হিন্দী লিখতে পড়তে পারেন এমন লোক অহিন্দী ভাষা অঞ্চলে শতকরা কতজন? ত্রিভাষা সূত্রকে হিন্দীভাষীরাই সর্বপ্রথম অগ্রাহ্য করেছেন কারণ অন্য কোন ভারতীয় ভাষা শেখার তাঁদের গরজ কি? তাঁদের ভাষা অন্যরা শিখতে বাধ্য, নয়ত নানা রকম ব্যবহারিক অসুবিধা হবে—কিন্তু তাঁরা অহিন্দী কোনও ভাষা শিখতে বাধ্য নন। এহেন অবস্থায় একটা অসম প্রতিযোগিতার বোঝা অহিন্দী-ভাষীদের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে, যাকে খুব ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। তদুপরি হিন্দীভাষী অঞ্চলগুলিই দিল্লীর মসনদ ৩৩ বছর ধরে প্রায় monopolise করে রেখেছে, এটাও অবশিষ্ট ভারতবর্ষ লক্ষ্য করছে। প্রধানমন্ত্রী হ'তে হ'লেই উত্তরপ্রদেশে জন্মাতে হবে। এর একমাত্র ক্ষণিক ব্যতিক্রম অদ্যাবধি কেবলমাত্র মোরারজি দেশাই। তবে তিনি হিন্দী-ভাষীর চেয়েও বোধহয় বেশি হিন্দী-প্রেমিক। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে হলে অহিন্দীভাষীকে দুটি ভারতীয় ভাষা জানতেই হবে। তবে হিন্দীভাষীর একটি জানলেই চলবে। এখানে একটা বিবাদের বীজ রয়েই গেছে।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনও সরকারি ধর্ম-আইনও নেই একথা সত্য। কিন্তু ধর্মকে তো সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাই যখনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, সরকারি উদ্যোগেও, সংখ্যাগুরুদের ধর্ম প্রাধান্য পায় স্বাভাবিক কারণেই। তবু হয়ত চেষ্টা করে এই অনুষ্ঠানগুলিকে আরো সর্ব জনগ্রাহ্য করা যায় এবং আচার-অনুষ্ঠানকে সেকুলারাইজ বা ধর্ম-নিরপেক্ষ করা কঠিন নয়, যদি ইচ্ছা এবং কল্পনাশক্তির অভাব না ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় তো অনুভবই করতে পারেন না যে, কোনও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে যতটা জড়িত থাকে সেই পরিমাণে অন্য ধর্মীয় লোকেরা দূরত্ব বোধ করে। মনে হয় যেন এই অনুষ্ঠান থেকে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠী এবং জাতিরও নিজস্ব ভঙ্গিতে আত্মস্ফূরণের প্রয়োজন আছে ঠিকই ; আমাদের ব্যক্তিসত্তা এই প্রত্যক্ষ-গোচর সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রকাশ পায় প্রথমে এবং এরই সঙ্গে একাত্মবোধ করে। কিন্তু সেখানে থেমে থাকলে ব্যক্তিত্বও হয় বড়ো সীমিত, দৃষ্টিও থেকে যায় সংকীর্ণ ; তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটি মানুষ যদি ক্রমাগত আরো বড়ো আরো বড়ো গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে তবেই ক্রমশ তার ব্যক্তি সত্তার পরিধিও বড়ো হতে থাকে। যে ছেলেটি বর্ধমানের এক গ্রামে কায়স্থ কুলে জন্মেছে, সে প্রথমত তার পরিবারের থেকেই তার ব্যক্তিত্বের আদলটি পাবে। কিন্তু ক্রমে তা পরিবার ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম ছাড়িয়ে জেলা, জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য, রাজ্য ছাড়িয়ে দেশ, দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যদি একাত্মবোধ করতে পারে, তবেই বলব তার ব্যক্তিত্বের ক্রমশ বৃহত্তর পরিণতি হচ্ছে। নিজের ছোট্ট প্রাথমিক গণ্ডীর মধ্যে চিরকাল সীমিত থাকায় কোনও মহত্ত্ব নেই, যেমন মনুষ্যত্ব নেই মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে চিরস্থায়ী হয়ে থাকায়, যেমন ডিমের খোলস ভেঙে বৃহত্তর জগতে এসে পৌঁছয় পাখির ছানা, তেমনি করে সংকীর্ণ অস্তিত্বের খোলস ভেঙে ক্রমেই বৃহত্তর জগতে এসে পৌঁছতে পারলে তবেই মানুষ।

ছোট্ট সংস্কৃতির পরিধি থেকে ক্রমে বৃহত্তর সংস্কৃতির অঙ্গনে এসে মুক্তিলাভ করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারলে তবেই আঞ্চলিক সত্তা ক্রমশ ভারতীয় সত্তায় পৌঁছবে এবং কেউ কেউ তাকে ছাড়িয়েও যাবে। আমার মনে হয় সেই উদ্দেশ্যেই এখন ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগুলির সীমান্ত কিছুটা অস্পষ্ট ক'রে এককেটা বড়ো প্রান্ত গড়ে তুললে হয়ত সংহতি সৃষ্টি করতে সুবিধা হবে। সমস্ত ভারতকে ৫/৬টা প্রান্তে ভাগ করে প্রত্যেকটি প্রান্তকে একটা রাজনৈতিক পরিচিতি দিলে কেমন হয়? যেমন কিনা বিহার, বাঙলা, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, হিমাচল, মণিপুর, ত্রিপুরা নিয়ে হতে পারে পূর্ব প্রান্ত। সমস্তটা নিয়ে একটা প্রান্তীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করলে কেমন হয়? আর এই অঞ্চলের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একদিকে থাকবে সবার মাতৃভাষা অন্যদিকে ইংরিজি। মেঘালয় বা উড়িষ্যার মানুষের মনে হবে না যে বাঙালি সংস্কৃতি বা বাংলা ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে উত্তর প্রান্ত, পশ্চিম প্রান্ত, মধ্য প্রান্ত এবং দক্ষিণ প্রান্ত তাদের ভাষাগত সীমান্ত লোপ করে একটা নতুন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সীমান্ত অর্জন করতে পারে।*

জয়শ্রী, বর্ষ (শারদীয় ১৩৮৭), পৃঃ ২৯৭-৩০৪

---

* উইলিয়াম কেরী ইনস্টিটিউট আয়োজিত "জাতীয় সংহতি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোন বাংলা? কে বাঙালী?

আলেকজান্ডারের কল্যাণে পরবর্তী কালের গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা ভূগোলে ইতিহাসে যে 'গঙ্গারিডি'র সন্ধান পাওয়া যায় সেই গঙ্গা-হৃদয় ভূখণ্ডই নাকি আজ গঙ্গার কৃপণ প্রসাদ কণার প্রত্যাশী সমসাময়িক বাংলাদেশ। 'গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ'— ইতিহাসের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মাত্র শেষ দুটি ধাপই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এক, ১৯৪৭-এর আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি আর দুই, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে 'জয়বাংলা' তথা 'বাংলাদেশ'-এর বিস্ফোরণ।

এই দুই ঘটনা সম্বন্ধে পশ্চিমবাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মনোভাব মোটামুটি বিপরীত। হিন্দুরা পাকিস্তানের জন্মকে ক্ষমা করে নি, আর মুসলমানরা ক্ষমা করে নি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের সৃষ্টি। তদুপরি প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে তড়িঘড়ি ধর্ম-নিরপেক্ষ ঘোষণা করে মুজিবুর রহমান শুধু স্বদেশে নয়, এই দেশেরও অধিকাংশ মুসলমানের চোখে নিজেকে ভারতের বশংগত ও অনুগ্রহপ্রার্থী প্রমাণ করেছিলেন। এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। এর পরে অবশ্য ১৯৭৯ সালে এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থায় ও বিশ্বাসে বাংলাদেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এ দেশের মুসলমানের মনস্তুষ্টি করতে পারেননি এবং যথেষ্ট পাপক্ষালনও হয়নি বাংলাদেশীদের। যার জন্য বাংলাদেশ যখন নিষ্ঠুর প্রাকৃতিক দুর্যোগে—সাইক্লোন কি জলপ্লাবনে-বিধ্বস্ত হয় তখন তাকে আল্লাহ্‌র উচিত গজব বলে ঘোষণা করবার মতো লোকের অভাব নেই এই রাজ্যে।

অন্যপক্ষে বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র অগ্রগামী অংশের এবং এদিককার হিন্দুদেরও আশাভঙ্গ হয়েছে এই কারণে যে প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়েও আবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশ। তা ছাড়া ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রত্যাশিত কোনো বিশেষ সুসম্পর্কেরও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রতি আমাদের এই জটিল ও আবেগনিষিক্ত প্রতিন্যাস মনে রেখেও বলতে বাধ্য হই যে ওঁদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা, শিক্ষিত মানুষরাও, উদাসীন। টি.ভি.তে ও দেশের নাটক এই দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু সাধারণভাবে ওঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবার বিশেষ তাগিদ আমাদের নেই। আমাদের বই পাড়ায় বাংলাদেশের বই পাওয়া যায় না বলে যাঁরা অভাব বোধ করেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওখানকার রাজনৈতিক ওঠা-পড়া সম্বন্ধে যদি বা কিছু কৌতূহল এখানে আছে, সাংস্কৃতিক ভাঙাগড়া বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই প্রায়। এমন কি বাংলাদেশটাই আছে কি নেই তাতেও যেন কিছু যায় আসে না আমাদের। কেবল মাত্র বাংলাদেশের তথাকথিত অনুপ্রবেশকারীই এই বাংলার সংবাদপত্র পাঠকদের নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে 'ওরা আছে ওধারে' এবং ওদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চোখ বন্ধ করে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই বছরের গোড়ায় মহাত্মার নাতি রাজমোহন গান্ধী 'মরাল রি আর্থামেন্ট' আন্দোলনের পক্ষে একটি আলোচনার সভার আয়োজন করেছিলেন দিল্লিতে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ও ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা কি করে সম্ভব তারই বিচার বিবেচনা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন বিচক্ষণ প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন শুনেছি। বাংলাদেশ থেকে যে বিরতিহীন অনুপ্রবেশ হচ্ছে বলে সবাই উদ্বিগ্ন তা নিয়েও নকি প্রসঙ্গক্রমে বাদানুবাদ হয়। অনুপ্রবেশ ঘটনাটির উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞ আইনজীবী সেদিন যা বলেছিলেন তা আমাদের পান্নালাল দাশগুপ্ত মশাইও ছয়-সাত বছর আগেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কালে জ্যোতিবাবুরা এবং প্রফুল্ল মহান্তীরা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কাঁটাতারের বেড়া দেবার খরচের হিসাব কষতে শুরু করেছিলেন। ঐ বাংলাদেশী প্রতিনিধি উক্ত সভায় বলেছিলেন যে এটা তো শত শত বছর ধরেই হয়ে চলেছে, এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এর পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত বা প্ররোচনা রয়েছে মনে করা ঠিক নয়। ঐ ভূখণ্ডে যখনই জনস্ফীতি ঘটেছে বা প্রকৃতি প্রতিকূল হয়েছে তখনই ক্ষুধার্ত মানুষ উপচে পড়েছে পূর্বে ও পশ্চিমে।

কথাটা নিতান্ত ভুল নয় এবং শুধুমাত্র নিরন্ন নিরক্ষর মানুষের প্রতিই প্রযোজ্য নয়। আমাদের অনেকেরই পূর্ব-পুরুষেরা উচ্চতম শিক্ষালাভ করার পরেও পূর্ববাংলা ছেড়ে বার হয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণের জন্য। যদিও বাঙালীর তখন ঘর হতে আঙিনা বিদেশ ছিল তবু ঢাকা, বিক্রমপুর, নারায়ণ গঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রামের মায়া ত্যাগ করে তাঁরা কেউ আসামে কেউ উড়িষ্যায় বা বিহারে এবং অনেকে আরও দূর দূর পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তথাকথিত 'প্রবাসী বাঙালী' শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক আইনজীবী এবং নানা পর্যায়ের কলমধারী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। পূর্ব বাংলার জেলায় জেলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত সংসারে গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই যত শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছিলেন তাঁদের কর্মসংস্থানের জন্য সারা ভারতবর্ষেই তখন ফাঁকা ময়দান পাওয়া যেত। সমাজের উপর তলার এই দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নীচু তলাতেও বাস্তুত্যাগ অব্যাহত ছিল। সেটা চলছিল আরো বহু প্রাচীন কাল থেকেই। তবে সম্ভবত খুব বড় আকারে নয়—কারণ জনস্ফীতি ব্যাপারটাই তো মাত্র শ'খানেক বছরের পুরানো। অবশ্য বাস্তুত্যাগের অন্য নানা কারণ তখনও ছিল। এই অনুপ্রবেশের ফলেই তো আসামের অহল্যা ভূমিতে প্রথম লাঙল দিয়েছে পূর্ব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলার চাষী। তাছাড়া আসাম বাংলা বিহার উড়িষ্যা ইত্যাদি প্রাদেশিক সীমান্তগুলি তো তখনও সৃষ্টিই হয়নি। তাই দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাবে না-ই বা কেন মানুষ, যদি অস্তিত্বের প্রয়োজনেই ঘর ছাড়তে হয়? সেই পুরানো অভ্যাসই আজো সম্পূর্ণ যায় নি। যদিও রাজনৈতিক মানচিত্র ইতিমধ্যে দেয়াল তুলে দিয়েছে স্বচ্ছন্দ যাওয়া আসার পথের উপর।

অর্থাৎ আজ যাঁরা এই গণ-সঞ্চরণের পিছনে ভারতীয় জমি দখলের একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছেন, অনুপ্রবেশের সাহায্যে প্রথম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে মুসলিম-প্রধান করে নিয়ে তারপর সেগুলিকেও বাংলাদেশের কুক্ষীগত করার চতুর চক্রান্ত বলে অনুমান করছেন তাঁদের এই জেনোফোরিয়া হয়তো কিছুটা প্রশমিত হতে পারে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে। আরো একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য পেলাম প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে, সাংবাদিকরা গিয়ে খতিয়ে দেখতে পারেন। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে আমাদের সরকারী গড়িমসিতে যাঁরা মোটেই বিচলিত নয়, বরং খুশি, তাঁরা নাকি ছিটমহলের সাধারণ মানুষ। এঁরা শতকরা আশী ভাগেরও বেশী মুসলমান। তবু এঁরা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই নাকি বেশী আগ্রহী। বাংলাদেশ-এর আয়তন বৃদ্ধি করার কোনো ইসলামী অত্যুৎসাহ এঁদের অন্তত নেই। এই তথ্যটা যদি নির্ভরযোগ্যও হয় তবু এ নিয়ে তৃপ্তি বোধ করার মতন মানুষ আর তো বেশি বাকি থাকছে না এই দেশে, যেহেতু 'মেকি সেকুলারিজম'কে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করে খাঁটি সেকুলারিজমের প্রবক্তারা অধিকাংশ মানুষের মনকেই এতখানি বিষিয়ে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই, যে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে এখন কেবল মাত্র মহান বজরঙ্গ বলীর যূথচারীরাই সগর্বে বিরাজ করবেন এবং তাঁরাই স্থির করবেন যে কে এই দেশে বাস করতে অধিকারী এবং কে নয়।

আজ জাত বিচার করে আমরা ঠিক করছি বটে যে কে 'শরণার্থী' অথবা কে 'অনুপ্রবেশকারী' কিন্তু যেহেতু একদল আসছে নিরাপত্তার অভাবে আর অন্যদল আসছে ভাতের অভাবে তাই মনুষ্যত্বের বিচার কাকে সাদরে স্বীকার করা উচিত আর কাকে মাথা মুড়িয়ে কাঁথা পুড়িয়ে অর্ধচন্দ্র দেওয়া উচিত সেটা স্থির করা বড় সহজ নয়। আরো একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করতে অনুরোধ করি। সভ্য দেশের নীতি লঙ্ঘন না করেও অনুপ্রবেশ ঠেকাবার চেষ্টা তো করেই যেতে হবে। সব দেশই করে থাকে। তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ যে ঘটবে তাও ধরেই নেওয়া যেতে পারে। ইংল্যান্ড এত কড়াকড়ি করেও কি ঠেকাতে পারছে? তার তো চারদিকে সমুদ্রের বেড়া দেওয়াই আছে? যাইহোক আমাদের দেশে এই অনুপ্রবেশকারীদের কত ভাগ সীমান্তের কাছাকাছি জমে বসে আর একবার দেশভাগ করার চক্রান্তে শামিল হচ্ছে আর কত ভাগ দিল্লি পাঞ্জাব পর্যন্ত ধেয়ে চলেছে অন্নের সন্ধানে অথবা ছুটেছে আরবের সোনালী মরীচিকার হাতছানিতে সেটাও অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন উৎসুক সমাজবিজ্ঞানীরা। কত বিচিত্র কারণেই তো আদিকাল থেকে মানুষ বাস্তুত্যাগ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলেছে। কোনো দিন এই চলার শেষও হবে না। হতে পারে বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের অনেকের পক্ষেই ভারতবর্ষ পথ মাত্র, শেষ গম্য নয় অর্থাৎ রাহ্ কিন্তু মনজিল নয়।

চীনারা সরকারী চাপে আর জাপানীরা স্বেচ্ছায় যে কঠোর জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা ভারতবর্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের আভ্যন্তরীণ জনস্ফীতির ফলেই যে ভয়াবহ সঙ্কট আসন্ন হয়েছে তার সঙ্গে এই সীমান্তের অনুপ্রবেশ যুক্ত হলে বিপদের মাত্রা আরও কতখানি বেড়ে যায় তার সুনিশ্চিত ধারণা দিতে পারবেন আদমসুমারী বিশেষজ্ঞ অশোক মিত্র মশাই। তবে আমার মোটা ধারণা এই যে এর ফলে আমাদের বিপদ সমুদ্রে এক ঘটি জল বাড়ছে বই নয়। বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হোক বা না হোক এই শতাব্দীর শেষ হতে হতেই জন প্লাবনে আমাদের অর্থনীতি, সমাজস্থিতি, শিক্ষাব্যবস্থা-জাতীয় সব রকমের জনকল্যাণ ব্যবস্থাই যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এই আশঙ্কা সম্ভবত অমূলক নয়।

অবশ্য তা সত্ত্বেও রাজমোহন গান্ধীরা প্রশ্ন করতেই পারেন এবং শুনেছি তাঁরা নাকি সেদিন প্রশ্ন করেও ছিলেন বাংলাদেশীদের যে তাই যদি হয়, অর্থাৎ নিতান্ত রুজিরোজগার ও জীবনধারণের প্রয়োজনেই বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন বেশ কিছু মানুষকে যদি ভারতের শরণাপন্ন হতে হয় স্বাভাবিক ভাবেই, তাহলে দুই দেশের মাঝখানে এই রাজনৈতিক সীমারেখার প্রয়োজন কি? জনৈকা প্রত্যক্ষদর্শিনী আমাকে জানিয়েছিলেন যে বাংলাদেশীরা এই প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু কেন পারেন নি তাই ভাবছি। জবাব নেই তা তো নয়। সম্ভবত ভদ্রতার কারণে বলতে বেধেছিল।

আমার মনে হয় জবাবটা এই রকম সীমান্তটা প্রয়োজন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য। বিভাগপূর্ব বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারায় সদাজাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্তের প্রতিস্পর্ধা-মুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন ছিল অবাধ আত্মবিকাশের জন্য এখনও প্রয়োজন আছে। দেশ ভাগ হবার পর শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত কলকাতা শহরে প্রায় চোখেই পড়ত না। প্রাপ্তবয়স্করা সবাই চাকরি বাকরি বিষয়-আশয়ের ন্যায্য অংশ বুঝে নেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা করেছিলেন। অবশ্যই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। কারণ কলকাতা হারিয়ে ঢাকাতে তাঁদের চোখে বড়ই নিষ্প্রভ লেগেছিল। তবে এক প্রজন্মকাল পার হতে না হতেই তাঁরা নতুন এক তিলোত্তমা ঢাকা গড়ে নিতে পেরেছেন। এঁদের জন্যই সীমান্তের তখনও ছিল, বোধহয় চিরকালই থাকবে। নতুন করে শ্রীহীন কলকাতার অস্বাচ্ছল্যের অংশ নিতে, অথবা চাকরি বাকরি পদপ্রতিষ্ঠার জন্য অসম প্রতিযোগিতায় নামতে যদি ঐ বাংলার স্বচ্ছল আয়েশী উঁচু তলার মানুষরা আগ্রহী না হন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। অন্য পক্ষে পশ্চিমবাংলার সংখ্যাগুরু মানুষই কি আবার এক সংযুক্ত বাংলায় প্রবেশ করতে উৎসুক হবেন যেখানে জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান? তাই সে কথা থাক। বরং যাঁরা এখনই মানস নেত্রে দুই বাংলায় নতুন এক উদারতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দেখতে পাচ্ছেন এবং এই সদ্যোদ্ভিন্ন জাতীয়তা অচিরে যে বৃহৎ বঙ্গের জন্ম দিতে চলেছে তার উপরে দিল্লির কালো থাবা নেমে আসতেও দেখছেন তাঁদের কল্পনা শক্তির প্রশংসা করতে হয়।

উনজনের স্বার্থের দেশভাগ হয়েছিল। সেই উনজন প্রধান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। তবে ধর্মের নামে সর্বস্তরের মানুষকেই ক্ষেপিয়ে, নির্বিত্ত নিম্নবিত্তকে নানা প্রত্যাশার রঙিন ছবি দেখিয়ে সবারই যে সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল দেশ ভাগের সপক্ষে একথা ঠিক। কিন্তু দেশ ভাগ করেও তাঁদের কপাল ফেরে নি এই ৪৫ বছরে। কলকাতার মতোই তাঁরাও ঢাকায় বস্তির অন্ধকারে বাস করেন, গ্রামে গঞ্জে অন্ন খুঁটে খান। সমাজের সেই সব মানুষ যাঁদের জমিজমা নেই, ভিটে মাটি হয়তো আছে ছিঁটে ফোঁটা, যাঁদের ঘরের বৌঝির এত সম্ভ্রম নেই যে ফুলকাটা ইরানী চাদরে ঢেকে রাখতে হয় বরং যাঁদের আব্রু-আড়াল এতই যৎসামান্য যে আড়কাঠিরা অনায়াসে সেখান থেকে বার করে এনে দলে দলে বনগাঁর ট্রেনে তুলে পাচার করতে পারে দিল্লি বোম্বাই ও মধ্যপ্রাচ্যের নীরামাংস ক্রেতাদের কাছে, তাঁদেরই পক্ষে সীমান্তটা একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁদের স্বার্থ দেখবার জন্য কি র‍্যাডক্লিফ সাহেব মানচিত্রকে লাল পেন্সিল দিয়ে ফেড়েছিলেন? তাই তাঁরাও যদি সেই লাল দাগের রক্তচক্ষুকে গ্রাহ্য না করেন তবে কি খুব দোষ দেওয়া যায়?

আবার পূর্বোক্ত প্রশ্নের জের টেনেই যদি এটাকে কেউ রূঢ় কণ্ঠে বলেন যে ওঁরা যখন ওঁদের সীমানা সরহদ্দ বুঝে নিয়ে আলাদা হয়েই গিয়েছেন তখন ওঁদের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার ঝুট ঝামেলা আমরা কেন সহ্য করব, তা হলে তাঁকেও মুখের মতো দেবার জবাব আমার কাছে কিছু নেই। তবু বিষণ্ন মনে না ভেবে পারি না যে সীমানা মুছে ফেললেই যদি সহ্য করা সম্ভব হয় তবে মুছে না ফেললেই বা এত অসহনীয় হবে কেন? আর সত্যিই যদি রাজনৈতিক সীমানা মুছে ফেলা যায় কোনো দিন তাহলে এদিক থেকে যত মধ্যবিত্ত গিয়ে ফেলে আসা সম্পত্তির অধিকার দাবি করবেন তার চেয়ে বহুগুণ নিরন্ন মানুষ তো ওদিক থেকে ভীড় করে আসবেন কলকাতার ফুটপাথে ঘর কন্না পাতবার জন্য, যেমন করে প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষ পেটের দায়ে প্রতিদিন আসছেন। এ বিষয়ে আমাদের সহিষ্ণুতার হ্রাসবৃদ্ধিও কি তাহলে নির্ভর করবে মানচিত্রের সরুমোটা দাগের উপর?

দুই ভিয়েৎনাম, দুই জার্মানি, দুই কোরিয়ার বেলায় যাই হোক না কেন দুই বাংলার ভাগ্যও যে ঐ একই দিকে চলবে এমন আশা করার খুব কারণ আছে বলে আমাদের অনেকেরই হয়তো মনে হয় না। তবে ব্যক্তির ভাগ্যগণনা যদি বা মাঝে মধ্যে ফলে যায়, সমাজের ভাগ্য গণনা করতে গিয়ে তো মার্কস-এঙ্গেলসের মতো জ্যোতিষ সম্রাটরাও হালে পানি পান নি। তাই কে জানে সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতেই একদিন দেখব ভারত নামে (ওঁরা আবার ইন্ডিয়া নামটা বেশি পছন্দ করেন) নতুন এক যুক্তরাষ্ট্রে দুটি বাংলাভাষী অঙ্গরাজ্য সহাবস্থান করছে একটি জামাতে ইসলামী শাসিত ১২ কোটির পূর্ব বাংলা আর অন্যটি ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত সাত কোটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম বাংলা। যেমন বিহার আর উত্তরপ্রদেশ দুটি হিন্দিভাষী রাজ্য পাশাপাশি রয়েছে। তাতে তার কিছু না হোক শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী, চোরা চালান, ছিট মহল আর গঙ্গাজলের বাঁটোয়ারা নিয়ে মন কষাকষির তো শেষ হবে। অবশ্য সম্প্রতি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের মধ্যে যে পরিমাণে জলঘোলা হয়েছে তাতে সে বিষয়েও কোন ভরসা নেই বোঝা যাচ্ছে। বর্ডার সিকিউরিটির প্রহসনটা অন্তত বন্ধ হবে। চোরা চালানের ঢালাও কারবার করে বড় লোক হবার জন্য এক বিরাট সিকিউরিটি ফোর্সকে যত অর্থ ব্যয় করে দুই দেশেই পোষা হচ্ছে সেই টাকাটা পরিবার পরিকল্পনায় ব্যয় করলে ধরাধামে বাঙালী জাতির সংখ্যা হয়তো কিছুটা কমবে কিন্তু তাদের জীবনের গুণগত মানের নিশ্চয়ই অনেকটা উন্নতি হবে। থাক এই দিবা দুঃস্বপ্ন। একটা সিরিয়াস কথা বলতে চাই।

কথাটা এদিক থেকেই শুরু করি। ৪৫ বছর আগে দেশ ভাগ হয়ে যাবার পরেও বাঙালী মুসলমানের একটা বড় অংশ এই রাজ্যেই থেকে যান। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, হুগলী হাওড়া ইত্যাদি সীমান্ত থেকে কিছু দূরবর্তী জেলার গ্রামীণ মুসলমান, বিত্তবান বা বিত্তহীন যাই হোক, খুব বড় সংখ্যায় দেশত্যাগ করেন নি। কারণ এ রাজ্যের দাঙ্গা প্রধানত কলকাতা শহরে ও শহরতলীর শিল্পাঞ্চলেই বেশি হয়েছিল। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বিক্ষুব্ধ উদ্বাস্তুর চাপ শারীরিক বা মানসিক ভাবে ঐ সব অঞ্চলের মুসলমানকে তত উৎপীড়ন করে নি।

আগেই বলেছি এক সময়ে কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মুসলমান প্রায় দেখাই যেত না। দেশ বিভাগের তিন চার বছরের মধ্যেই পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজের মাথার দিকটা মনে হত যেন মুড়িয়ে ছাঁটা হয়ে গিয়েছিল। এই সম্প্রদায়কে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেবার মতো মানুষ গোনাগুনতি এক ডজনও ছিল কিনা সন্দেহ। তারপর তো এই তিন দিশকেই নতুন প্রজন্মের মধ্যবিত্ত উঠে এসেছেন এবং বলা বাহুল্য গুরুতর সংখ্যাগুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়েই। ১৯৫০ থেকে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে যে আসা যাওয়া দেখেছি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। পার্ক সার্কাস গার্লস স্কুলে দেশ ভাগের আগে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ১৯৪৭ থেকে ৫৫ সালের মধ্যে তাদের সংখ্যা কমতে কমতে মাত্র ৮/১০ জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সারা স্কুলে। এখন আবার তারাই প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। একটি নতুন এবং সুখবর হল যে এদের মধ্যে পার্ক সার্কাসের বস্তি অঞ্চলের কন্যারাও বড় সংখ্যায় আসছে। আর মুসলিম মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত ঘরের কন্যারা স্থানীয় কনভেন্টে এবং বিড়লাদের দু তিনটি স্কুলেই বেশি যাচ্ছে। সেগুলির মাধ্যম ইংরিজি। আর সাউথ পয়েন্ট স্কুলও তো অদূরেই রয়েছে।

দেশ ভাগের ফলে সমাজ নামে পরীক্ষাগারে একটা বেশ ইন্টেরেসটিং এক্সপেরিমেন্ট ঘটে গিয়েছে যার ফল অনুধাবনযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তান তথা বংলাদেশের মধ্যবিত্ত মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কষ্ট ভোগ না করেই অবাধ সুযোগ পেয়েছেন আত্মবিকাশের। প্রতি তুলনায় এই বাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানরা তীব্র প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে এবং কোনো রকম সংরক্ষণের সুবিধা না পেয়েই এখন সর্বক্ষেত্রে এসে দাঁড়াচ্ছেন। স্কুল কলেজে খেলা-ধূলায়, শিক্ষা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, সাহিত্যে-সাংবাদিকতায়, বিশেষত আইন ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরেই বাঙালী মুসলমানের উপস্থিতি আবার অনুভব করতে পারছি। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তো নয়ই বরং অনেক সময় কঠিন বেসরকারী প্রতিকূলতার মুখে এঁরা উঠে আসছেন এবং যাঁরা দেশ ভেঙে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে, কখনও বা বিদ্বেষ ও তিরস্কার সহ্য করে।

শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, সুদূর বোম্বাইয়েও আমাদের এত গর্বের ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে যখন মুর্শিদাবাদ কি মালদহের বাংলা স্কুলে পড়া মুসলমান ছেলেকে গবেষণারত দেখি তখন এই সম্প্রদায়ের এবং এই দেশেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নতুন করে একটু আশা জাগে। এই ভাবে সমাজ জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে যাঁরা কৃতকার্য হচ্ছেন তাঁদের দেখে আমার আনন্দ হয় আরো এই কারণে যে দেশ বিভাগের সপক্ষে যেটি সব চেয়ে বড় যুক্তি ছিল তাকেই নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁরা মাথা উঁচু করে নূতন প্রত্যয়ের সঙ্গে আসছেন। পশ্চিম বাংলায় যদি ২০ ভাগ মানুষ ৮০ ভাগ মানুষের চাপে পিষ্ট ও নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবিভক্ত বাংলার ৫৫ ভাগ মানুষের আত্মবিকাশ কি ৪৫ ভাগ মানুষের চাপে রুদ্ধ হয়ে থাকত? কাকে সেদিন স্তর পেয়ে ছিলেন বাঙালী মুসলমান? পদ্মার দুই তীরেই হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ সাধনা অন্তত একশ বছর পিছিয়ে গেল। অবশ্য পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিৎ আরো আগেই ফেটে গিয়েছিল।

পশ্চিম বাংলার মুসলমানের বেলায় এখনও আত্মবিকাশের একটি ক্ষেত্রের দীনতা কিন্তু আমাকে পীড়া দেয়। চারুকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যকে এঁরা সযত্নে আজও পরিহার করে চলেছেন ধর্মীয় অনুশাসনকে অনুসরণ করে। আমার আশা হয়েছিল যে বেতার ও দূরদর্শন মারফৎ বাংলাদেশের সদ্দৃষ্টান্ত এই রাজ্যের বাঙালী মুসলমানকেও উদ্বুদ্ধ করবে। কিন্তু বাইশ বছরেও করেনি। কলকাতার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে যদি বা দুচারজনের নাম শুনতে পাওয়া যায় বেতারে কিংবা দূরদর্শনে, রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুলসঙ্গীতে এমন কি লোকগীতিতেও ক'জনের নাম শোনা যায়? নাটকে বা চলচ্চিত্রেও বিশেষ কেউ আসছেন না, নৃত্যে তো কল্পনাই করা যায় না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে ও বাদ্যে আচার্য আলাউদ্দীন খাঁ এবং তাঁর পরিবার একটি অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম। হয়তো আরও এক কি দুই প্রজন্ম কাল অপেক্ষা করতে হবে এই ব্যাপারে, তবে যদি ঐ নিগড় ভেঙে বার হয়ে আসতে পারেন। আর সংখ্যালঘুর বিপন্ন মানসিকতায় যদি ঐ আত্ম-অবরোধকেই শ্রেয় বলে জানেন, নিগড়কেই মনে করেন আত্মরক্ষার কবচ বা তাবিজ, তবে এই সমাজ আরও কতদিন সৌন্দর্যহীন, আনন্দহীন এক অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকবে কে জানে।

সাহিত্যেই তবু কিছু নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার 'কলম' পত্রিকার গত ঈদ সংখ্যার একটি প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি চয়ন করছি তার লেখক খাজিম আহমেদ। প্রবন্ধের শিরোনাম 'বিভাগ পরবর্তী পশ্চিম বাংলার বাঙালী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের সাহিত্য-চর্চা—১৯৪৭-১৯৭২'। এবার উদ্ধৃতি "বিশ শতকের শুরু থেকেই বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বরূপ সন্ধানে প্রয়াসী হয়ে ওঠে। বস্তুত ১৯২০-৪৭ সালের মধ্যে একটি মর্যাদাশীল জাতিসত্তা হিসেবে উত্থিত হয়। জীবনের হর ক্ষেত্রে সাড়া দেবার মানসিকতা গড়ে ওঠে। এমন সময় দেশ বিভাগের মারফত এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা এল। বাঙালী মুসলমানের আত্মবিকাশের পথটিও এপার বাংলায় রুদ্ধ হয়ে এল। নয়া উত্থিত বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বিরাট অংশ মান-ইজ্জত আর প্রতিষ্ঠার সওয়ালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেন। পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের জীবনে নেমে এল এক অবর্ণনীয় দুর্যোগ।

"দেশ বিভাগের পর বাঙালী মুসলমান সমাজ অকস্মাৎ অভিভাবকহীন হয়ে পড়ল। ...বিভাগোত্তর এই দেশের মুসলমানদের জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি ছিল তাদের কেউ বিশ্বাস করছিল 'পাকিস্তানী দালাল'—এই ছিল সাধারণ পরিচয়।...

পাঠক সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি পশ্চিমবঙ্গের একজন ভুক্তভোগী খাজিম আহমেদের বক্তব্যের সঙ্গে খুব তার পার্থক্য নেই, শুধু একটি বাক্যে ছাড়া। এই বাক্যটি "বাঙালী মুসলমানের আত্মবিকাশের পথটিও এপার বাংলায় রুদ্ধ হয়ে এল।" এল কি সত্যিই? একথা ঠিক যে পশ্চিমবাংলার মুসলমান সমাজে ১৯৪৭-এর পরে অন্তত দশ হাজার বিমূঢ়, উদভ্রান্ত এবং প্রায় অনাথের মতোই বোধ করছিলেন নিজেকে। কিন্তু এপার বাংলায় থেকে যাওয়ার জন্য তাঁদের আত্ম বিকাশের পথটিও রুদ্ধ হয়ে এল একথা কি ঠিক? এত দিন পরে কিছুটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে দেখলে বোধ হয় তৎকালীন দুই বাংলার সাংস্কৃতিক স্থিতিটা আর একটু স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়বে।

বিভাগোত্তর কলকাতায় অন্তত তিনজনকে আমি জানতাম, কাজি আবদুল ওদুদ, সৈয়দ মুজতবা আলী ও আবু সয়ীদ আইয়ুব—যাঁদের মনে হয়নি যে আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। বরং তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ তাঁর ঐ সময় কালের মধ্যেই এই পশ্চিম বাংলায় বসেই করতে পেরেছিলেন। হুমায়ুন কবীর রাজনীতিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকা সত্ত্বেও একটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করে যেতে পেরেছিলেন ঐ অস্থির সময়েও। আর এই পত্রিকার চাহিদা সম্প্রদায়ে নির্বিশেষে দুই বাংলাতেই খুব বেশি ছিল। রেজাউল করিম সাহেবেরও নাম করতে হয় এই প্রসঙ্গে। তিনি মফস্বলে থেকেও তাঁর সাহিত্য কর্ম চালিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো এমন কথা বলাও অশোভন হবে না যে পশ্চিম বাংলার মুসলিম সমাজের প্রথম সারির বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই সেদিন দেশত্যাগ করেন নি এবং পাকিস্তানের দর্শনকেও সমর্থন করেন নি। এই লেখকরা যে সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাবার কথা ভাবেন নি তার প্রধান কারণ এই যে, তাঁদের মনে হয়েছিল যে পাকিস্তানের তৎকালীন আবহাওয়া সুস্থির মনন ও স্বাধীন সৃজনের অনুকূল ছিল না। ঐদিকে চলে গেলে হয় তাঁদের কলম গুটিয়ে বসে থাকতে হত নয়তো ধর্মীয় রাষ্ট্রের জবরদস্তি, উর্দুর জবরদস্তি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হত। তুলনায় পশ্চিমবাংলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবহাওয়াকে বেশি উৎসাহদায়ী এবং লেখকের স্বাধীন সত্তা বিকাশের পক্ষে আতিথেয় বলে বোধ করেছিলেন তাঁরা। দেশভাগের ১৫/২০ বছরের মধ্যেই আরও কয়েকজন নবীন এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরও দেখা পাওয়া গেল মুসলমান সমাজের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ করে না রাখায় বৃহত্তর সমাজের স্বীকৃতি পেতে যাঁদের অসুবিধা হয়নি। এই বাংলার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এঁদের সৃজনশীল আত্মবিকাশের পথরুদ্ধ তো হয়ই নি, বরং এঁদের সাহিত্যকর্মের মান ঐ বাংলার তুলনায় মোটেই হীন নয়, বিশেষ করে তাঁদের তুলনায় যাঁরা এই বাংলা থেকে চলে গিয়ে ওখানে লেখালেখির সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন বলে আশা করা যায়।

আমি যে এইভাবে, একটু রুচিহীন ভাবেই তুলনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তার একমাত্র কারণ হল এই যে দেশভাগের ফলে এই বাংলায় বয়ে যাওয়া মুসলমানের সামাজিক অসহায়তাও আমি যেমন দেখেছি, ঐ বাংলার মুসলমানের আত্মিক সঙ্কটটাও অনুভব করতে পেরেছি। ঐ আত্মিক সঙ্কটের ব্যাপারটা ভারতীয় মুসলমানেরা প্রায় বিশ্বাসই করতে চান না। যাই হোক দুই দিকে সমস্যাটা ছিল দুরকমের। এদিককার মুসলমান, পাছে তাঁদের বিশিষ্ট আত্ম-পরিচয় হারিয়ে বৃহত্তর এবং সর্বগ্রাসী হিন্দুসমাজে লুপ্ত হয়ে যান, সেই ভয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিলেন। আর ওদিককার মুসলমান নেতি নেতি করে তাঁদের যথার্থ আত্ম পরিচয়ের সন্ধান করছিলেন। মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন কারণ হিন্দু বাঙালীর জাতীয়তাবোধের তাঁরা শরিক হতে পারছিলেন না। আবার পাকিস্তান হতে না হতেই মুসলিম জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত ঘটল। যতই কেন প্যান-ইসলামিক আবেগের আতিশয্যে গাওয়া হোক "চিন ও অরব হমারা", দৈনন্দিন জীবনে দেখা গেল বাঙালি মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমান, সিন্ধী মুসলমানের আঞ্চলিক আনুগত্যও কিছু কম নয় এবং মাতৃভাষার সঙ্গে যে একাত্মতা তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া তো সম্ভবই নয়। তখন তাঁরা অনুভব করলেন যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধেরও তাঁরা শরিক হতে পারছেন না। তাঁদের আত্মবোধ ক্রমে প্রসারিত হচ্ছিল। বাঙালীত্ব ও মুসলমানত্বের মধ্যে যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এটা উপলব্ধি করাই তাঁদের নয়া আত্মোপলব্ধি। বাঙালী না মুসলমান এই ভ্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এখনও এই বাংলার সংখ্যালঘু প্রায়ই নিজেকে দ্বিতীয় গোষ্ঠীতেই রাখতে স্বস্তি বোধ করেন। কিন্তু ঐ বাংলায় প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে গিয়েছে। তবে বাঙালীত্বের সংজ্ঞাও যে অনেকখানি উদার হয়েছে গত ৪৫ বছরে সে কথাও মনে রাখা দরকার।

আরও একবার খাজিম আহমেদের প্রবন্ধের উল্লেখ করি। তিনি সাহিত্যচর্চার যে ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর সাড়ে সাত পৃষ্ঠার প্রবন্ধেই একশ সওয়াশ লেখকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের সবার রচনাকর্মকেই হয়তো ঠিক সাহিত্য পদবাচ্য বলে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ জন সাহিত্যিক ও সম্পাদককে নিশ্চয়ই এঁদের মধ্যে পাওয়া যাবে যাঁদের স্বীকার করতে কারুর আপত্তি হবে না। সেটাও কম আশার কথা নয়। তাই বলছিলাম সাহিত্যের জগতে কিছু নতুন মুখ

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো দেখা যাচ্ছে সংখ্যালঘু সমাজ থেকে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে এই বাংলার দেড় কোটি মুসলমানের মধ্যে সঙ্গীত নাটক অথবা চারুকলায় প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার সত্যিই এত অভাব রয়েছে। এই দেশের মাটিতে মানুষ হওয়া একই নরগোষ্ঠীর চরিত্রে কোনো মৌলিক পার্থক্য তো নেই। কল্পনা-প্রবণতা, আবেগ-উচ্ছলতা ও শিল্পিত অভিব্যক্তিতে তাঁরা এতই পরস্পর-সদৃশ যে মানতে ইচ্ছা করে না যে হিন্দুদের ঘরে ঘরে যেখানে মেয়েরা সঙ্গীতে ও নৃত্যের এত চর্চা করছে সেখানে মুসলমানের ঘরে তার চর্চা না হওয়াটাই স্বাভাবিক। জোর করে চোখ রাঙিয়ে যদি কোনো সমাজের শিল্পিত আত্মপ্রকাশকে রুদ্ধ করে রাখা হয় তবে সেই সমাজের মঙ্গল হয় না। এটাকে "জীবনের হর ক্ষেত্রে সাড়া দেবার মানসিকতা...' বলা যায় না।

পিংলার পটুয়ারা যদি গোঁড়া সমাজের নির্যাতন সহ্য করেও নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, জুম্মন ওরফে গুরুপদ চিত্রকর যদি মেদিনীপুরের গ্রামে বসেও হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকার জন্য, তাই নিয়ে গান বাঁধার জন্য, একঘরে হওয়াকে ভয় না করেন, তবে শিক্ষিত মধ্যবত্ত মুসলমানের সেই সৎসাহস নেই কেন? নগর-সমাজে তো ধর্মের শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল। আমার তাই সন্দেহ হয় এক্ষেত্রে আত্মবিকাশ আজও যে এতখানি রুদ্ধ হয়ে আছে তার কারণটা ভিতরের, শিক্ষিত মানুষেরও মানসিক প্রতিরোধ আজও এত প্রবল যে বহু যুগের জড়তা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। এর পরে তো অভিমান সাজে না যে দেশবিভাগের ফলে যে অবর্ণনীয় দুর্যোগ নেমে এসেছে পশ্চিমবাংলার মুসলমানের জীবনে তার ফলেই আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শম্বুক বৃত্তি ত্যাগ করে খোলস ছেড়ে বার হয়ে আসবার সময় কি আজও হয়নি? ইতিমধ্যে দুটি প্রজন্ম যে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেল।

এরপর বৃহত্তর বাঙালিয়ানার প্রশ্ন।

দুই বাংলার বাঙালী সংস্কৃতির ভিন্নমুখী বিকাশের স্বভাব চরিত্র কেমন হচ্ছে, কেমন হবে তা নিয়ে দুই দিকেই ভাবনাচিন্তা লেখালেখি চলছে। ঐ বাংলাতেই অবশ্য বেশি কেননা ওঁদের আত্মানুসন্ধান এখনও একটা বিন্দুতে এসে সুস্থির হয়নি। তবে ব্যক্তি চরিত্র যেমন, জাতীয় চরিত্রও তেমনি কোথাও চিরস্থির হয়ে থাকে না। চরিত্র বস্তুটাই যে গতীয়; স্থিতীয় নয়। তবে ব্যক্তির তুলনায় একটি গোষ্ঠীর চরিত্রে স্থিতি বেশি। যাইহোক ওঁদের সমস্যার চেহারাটা ঠিক আমাদের সমস্যার মতো নয়, ভাষাটা এক হলে কি হবে।

ওঁরা বাঙালী না বাংলাদেশী এই প্রশ্নটা ক্রমেই ওখানে বেশ প্রবল হয়ে উঠছে। এখানে আবার অনেকের কাছে ঐ বিকল্প কল্পনাটাই দুর্বোধ্য ঠিক। কারণ এই বিতর্কের ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতটা ঠিক মতো তাঁদের জানা নেই। আবার এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর একবার বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ইসলামী-করণের প্রশ্ন। যেহেতু ঐ দিকে অনেকেরই এখন মনে হচ্ছে যে দেড় শ বছর ধরে কলকাতা-কেন্দ্রিক বংলা ভাষা ও সাহিত্যের যতখানি সংস্কৃতায়ন ঘটেছে তাতে ঐ বাংলার সাংস্কৃতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চরিত্রটিকে যথাযথভাবে ধারণ ও বহন করতে অক্ষম এই বাংলার ভাষা আর সাহিত্য। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটাও আর একবার যেন তাঁরা খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের অবস্থানটা ঠিক কোথায় তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়টাও বেশ মিশ্র আবেগ জাগিয়ে রেখেছে ওখানে। তবে আমার এই ক্ষীণকায় নিবন্ধে এই প্রশ্নগুলি আলোচনা করবার মতো যথেষ্ট পরিসর নেই। অতএব ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলাম।

আমাদের সমস্যাগুলি অন্যরকম। ওঁরা কোন্ দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছেন সে বিষয়ে আমরা অনেক উদাসীন হলেও 'বাংলাদেশ' 'বাংলা সাহিত্য' ইত্যাদি অভিধাগুলি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যেভাবে একচেটিয়া করে নিচ্ছে তাতে এদিকে যে কিছুটা মর্মবেদনা নেই তা নয়। অবশ্য অনেকের মনে বেদনার চেয়ে বিদ্রূপের ভাবটাই বেশি এবং তা প্রকাশ করতে গিয়ে তো ছোট খাটো আন্তর্জাতিক সঙ্কটও সৃষ্টি করে ফেলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু ভেবে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে ভৌগোলিক পরিচয়টা তাঁরা আত্মসাৎ করে নিলেও ভাষা কিংবা সাহিত্যের উপর কারুরই একচ্ছত্র অধিকার সম্ভব নয়। আমরা বাঙালী কিনা, ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের অধিবাসী হয়ে আমাদের বাঙালীত্বকে কতদূর রক্ষা করা সম্ভব, এসব আমরা নিজেরাই বুঝব, নিজেরাই স্থির করব। এ বিষয়ে কারুর পাঁতি আমরা মানতে রাজি নই। ইতিহাসের পাতা ঘেঁটে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ, গৌড়, রাঢ় ইত্যাদি ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি কোন শতাব্দীর কতদূর পর্যন্ত ছিল এবং সে অনুযায়ী আজকের বাংলাদেশ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ সে সবের কতখানি উত্তরাধিকার দাবী করতে পারে এই বিতর্কে আমার আদৌ কোনো স্পৃহা নেই। কারণ এই বৃথা পাণ্ডিত্য-চারণে কারুর অস্মিতার প্রশ্নে কোনো সমাধান পাওয়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজেকে যা বলে অনুভব করি আমি তাই—যেমন কিনা আমি নিজেকে বাঙালী বলেও জানি আবার ভারতীয় বলেও জানি, দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধই অনুভব করি না। আমার অস্মিতার প্রসারণ ও সংকোচন সম্ভব, প্রসারণটাই সভ্যতার লক্ষণ, সংকোচনটা বর্বরতার। কিন্তু আমার অস্মিতার পরিবর্তন তত সহজ নয়। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে এক ঝাঁকার আমকে অন্য ঝাঁকায় নিয়ে গিয়ে তুললেই তার জাতবদল হয়ে যায় না।

তবে আমাদের বাঙালী চরিত্র আগামী দিনে কি ধরনের চেহারা নেবে, কিংবা যে রকম চেহারা দেখছি সেটা আমাদের মনোমতো কিনা তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্রের প্রবল অভিঘাতে আমাদের বিশিষ্ট বাঙালী সত্তা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থানের দুর্বার স্রোতে ভেসে যাবে, না আমাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য আমরা বজায় রাখতে পারব তা নির্ভর করে সম্পূর্ণতই আমাদের চেষ্টার উপর। প্যারিসে মানুষ করেও ঝর্ণা ভট্টাচার্য তাঁর কন্যা শ্রীময়ী ও ঈশ্বরীকে যতখানি বাঙালী করে তুলতে পেরেছেন—ফরাসী সংস্কৃতিকে তাদের মূল প্রোথিত রেখেও—সেটা কলকাতার অনেক মা বাবাও পারছেন না বা করছেন না। এঁদের পুত্র কন্যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলনে-বলনে পরনে-পড়নে অনেক সময়ই আটা আনা মার্কিনী, চার আনা বোম্বাই এবং বাকি চার আনা লেক কালী মাতার ছাপ-মারা। অথবা নিজের নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের যেটি সবচেয়ে অশ্রদ্ধেয় চিহ্ন সেটিই দেহে-মনে ধারণ করে আছে সগর্বে। আমাদের সংবিধানে অঙ্গীকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার এই বাস্তব পরিণতি যে ভয়াবহ সম্ভাবনার দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে তাতে সাধারণভাবে মুক্ত-বুদ্ধি বাঙালিয়ানার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল মনে হয় না ঠিকই।

কিন্তু সে সব নিয়ে দুর্ভাবনা করার মতো মানুষই বা ক'জন তৈরি হচ্ছে? উচ্চশিক্ষা তো এখন প্রকৌশলিক আর ব্যবহারিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষায় জাল দেওয়া দুধের সরটুকু তুলে নেয় ইঞ্জিনিয়ারিং আর মেডিকেল কলেজ। তারপর বিজ্ঞানের নানা বিভাগ উপচে পড়ার পর যারা স্নান মুখে মানবশাস্ত্র পড়তে আসে তাদের না আছে নিজের প্রতি আস্থা, না তাদের নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা। ফলে যা পঠনপাঠন হয় তার করুণ লজ্জাজনক ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যান করার স্থান নয় এটা। তবে আমাদের পরম তৃপ্তি এই যে আমরা যতো উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ তৈরি করছি তাতে স্বদেশের প্রয়োজন মিটুক না মিটুক বিদেশে রপ্তানি করবার মতো যথেষ্টই উদ্বৃত্ত থেকে যায় এবং ঐ শিক্ষার আসল ধ্যেয় যেহেতু ভালো চাকরি-বাকরি এবং স্বাচ্ছল্য তাই ব্রেন ড্রেন নিয়ে শৌখিন কিছু বিলাপ করা ছাড়া সত্যিকারের ক্ষতি খুব বেশি কেউ বোধ করে বলে মনে হয় না। কিন্তু ভীষণ একটা ক্ষতি তো হয়েই চলেছে। যে সমাজে দর্শন ইতিহাস সাহিত্য ইত্যাদি মানবিক বিদ্যার চর্চা করেন দ্বিতীয় শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষেরা সেই সমাজের চিন্তাভাবনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা-পরিমার্জনা সব কিছুরই মান যে দ্বিতীয় শ্রেণীর হবে এতে অবাক হবার কি আছে?

আরো একটা দুর্ভাবনার ব্যাপারও রয়েছে, সেটা শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে। অল্পদিন আগে ক'জন বামপন্থী যুবক পশ্চিম বাঙালীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে খুবই হতাশার সঙ্গে বলছিলেন যে আমাদের সেরা ছেলে মেয়েরা এখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলাকে প্রথম ভাষা নির্বাচন না করে ইংরেজি অথবা হিন্দিকেই করা পছন্দ করছে যেহেতু পরবর্তী কালে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ঐ ভাষাগুলির বেশি কদর হয় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সব চেয়ে ভালো ছাত্র ছাত্রীরা বাংলা ভাষা শিখছে না এবং মানব বিদ্যারও চর্চা করছে না। হতাশার ব্যাপার তো বটেই।

কিন্তু তবু আমি এ নিয়ে হতাশ বোধ করি না। আমার মধ্যে একটা দুর্মর আশাবাদী রয়েছে বলে নয়। বরং বাস্তব পরিস্থিতিতেই আশা করবার মতো এখনও অনেক কিছু বাকি রয়েছে বলে। সাত কোটি মানুষের পশ্চিম বাংলায় ইংরিজি মাধ্যম লা মার্তিনীয়ের, সেন্ট জেভিয়ার্স, ডন বসকো, সেন্ট পলস, নর্থ পয়েন্ট, সেন্ট্রাল স্কুল ইত্যাদি যাবতীয় উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা পড়বার সুযোগ পায়, যারা দলে দলে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠিটি হাতে পাবার আশায়, তাদের সংখ্যা এত বেশি নয় যে তার পরে আর প্রতিভা বিশেষ অবশিষ্টই থাকে না দেশে। তাই যদি হতো তবে সত্যিই দুর্ভাবনার ব্যাপার হতো। কিন্তু জনসংখ্যা এত বিরাট হওয়ার একটাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুবিধা যে প্রতিভাধর মানুষের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেশি হবে। প্রাকৃতিক বণ্টন-রীতিতেই প্রতিভার বণ্টনও সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষা ও বিত্ত-নিরপেক্ষ ভাবেই ঘটে থাকে। তবে প্রতিভার সন্ধান ও লালন সর্বস্তরে এখনও সম্ভব হচ্ছে না ঠিকই। তাই বলে বিত্তবান যেসব সংসারের ছেলেমেয়েরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তাদের বাইরে আর প্রতিভাই নেই ধরে নিয়ে বিলাপ করবারও কোনো কারণ ঘটে নি। সমাজবাদের কথা মুখে আনবার জন্যেও শিক্ষাকে যতটুকু প্রসারিত করা হয়েছে তার একটু আধটু সুফল দেখেই তো আশা হয়। মাস দু তিন আগে হঠাৎ যখন আমার পরিচিত তন্তুবায়ের পুত্রটি শান্তিপুর থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে বেশ উঁচু স্থান পেয়েছে শুনলাম তখন মনে হল, বাঃ এই তো ভবিষ্যতের ছবি। ওখান থেকেই এখন প্রতিভারও সন্ধান মিলবে যারা মানব বিদ্যাকে তাচ্ছিল্য করতে শেখেনি।

পশ্চিমবাংলার এই শিক্ষাকে মাধ্যম সংক্রান্ত সমস্যাটি বাদ দিলে অন্যান্য সমস্যার একটা বাংলাদেশী চেহারাও রয়েছে আমাদের পাশাপাশি। ওঁদের নগরায়ণ ও শিক্ষার প্রসার যেহেতু আমাদের তুলনায় একটু কম হয়েছে তাই সমস্যাগুলি এখনও মনে হয় তত উৎকট রূপ ধরেনি। বিশেষ করে মানব বিদ্যার প্রতি এমন উদ্ধত অবিশ্বাস আর মাতৃভাষার প্রতি এমন নির্মল তাচ্ছিল্য নিশ্চয়ই সেই পর্যায়ে পৌঁছায় নি যাতে দুর্ভাবনার কারণ হতে পারে। তাই অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় মানব বিদ্যার চর্চা-ক্ষেত্রে যদি ওঁদের নেতৃত্ব আমাদের মেনে নিতে হয় তবে তাতে লজ্জার কিছু নেই। এখন তো আমরা পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। তখন হয়তো আমরা পূর্বাস্য হব। ওঁরা তো পশ্চিমাস্য হয়েই আছেন। ধর্মের বিধানে প্রতিদিন আরবের দিকে মুখ করে প্রার্থনায় বসতে হয়। সাংস্কৃতিক আকর্ষণে কলকাতা ছাড়িয়েও আরো দূরে দূরে সারা উপমহাদেশেই যে প্রসারিত করতে পারছেন তাঁদের দৃষ্টিকে তাতে এই উপমহাদেশের যত না গৌরব, ওঁদের গ্রহিষ্ণুতার মহত্ত্ব তার চেয়েও বেশি।

বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতাকে আমার প্রায়ই হৃদয়হীন মনে হয় কিন্তু অস্বাভাবিক লাগে না। কারণ এটা ইচ্ছাকৃত নয়। বরং এটার মধ্যে একটা স্বাভাবিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতার ভাব আছে। অবশ্য এটাকেই কেউ কূপমণ্ডুকতার নামান্তর বলতে পারেন। নিতান্ত মিথ্যাও হয়তো নয় সেই অভিযোগ। তবু আমার মনে হয় এই উদাসীনতা বোধ হয় অতিসচেতনতার—যা প্রায় স্পর্শকাতরতার পর্যায়ে চলে যায় মাঝে মাঝে—চেয়ে ভালো। দুই বাংলার মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের ভূমিকা রচনা করবার জন্যই পুরানো কিছু বদ্ধমূল ধারণা, কিছু বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস ভুলে যাওয়ার মতো আরো একটু সময় দরকার। দেশ ভাগ করার জন্য দায়ী যে প্রজন্ম সে তো প্রায় চলেই গিয়েছে, তার কিছু আগে বা অল্প পরেও যারা জন্মেছে সেই প্রজন্মও দুই দেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্রমে যত নেপথ্যে চলে যাবে ততই হয়তো মানসিক প্রতিরোধগুলিও ভেঙে পড়বে। তখন কিছুটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সাম্প্রতিক ইতিহাসকে, উভয় পক্ষের একশ' দেড়শ' বছরের সাম্প্রদায়িক আচরণকে যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারা যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখনও তো দেখি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিণতি বিচার করতে গেলে বাঙালী হিন্দু আর মুসলমানের অবস্থান থাকে দুই মেরুতে। কয়েক বছর আগে বোধহয় স্বাধীনতা দিবস সংখ্যার আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান করা হয়েছিল দশ বারো জন লেখককে। প্রশ্নটা মোটামুটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেশ ভাগের জন্য দায়ী কারা? যতদূর মনে পড়ে সমরেশ বসু, গৌর কিশোর ঘোষ এবং অশীন দাশগুপ্ত ছাড়া আর প্রায় সবাই বলে ছিলেন যে যারা পাকিস্তান চেয়েছিল তারাই দায়ী। কিন্তু কেন পাকিস্তান চেয়েছিল তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা চিন্তা কেউ করেছিলেন বলে মনে পড়ে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে লিখেছিলেন, "এ দিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল, আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশ মাতার দুই জানুর উপর বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে। ...বাহির হইতে এই হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে ভেদ-বুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনা অতিক্রম করতে নিশ্চয়ই পারিব।" তাঁর সাবধান-বাণী বৃথা গিয়েছিল, তাঁর পরামর্শ আমরা কানে তুলি না কোনো পক্ষেই, তাই আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম, প্রকাণ্ড খড়্গটি অবশেষে মাথায় এসে পড়েছিল। এখনও তার জন্য আমরা শুধু অপর পক্ষকেই দোষারোপ করে চলেছি, কোনো দিকেই আত্মসমালোচনার চেষ্টাটুকুও নেই। দেশ ভাগকে শেষ মুহূর্তেও ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম ইত্যাদি জনা কয় মানুষ। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের তীব্র প্রতিকূলতায় সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল সে কথা সবাঠই জানেন। তবে ১৯৪৭-এ কেন হিন্দুরাই মরীয়া হয়ে দেশভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন, আর ১৯০৫-এ কেন মুসলমানরা শতকরা নিরানব্বই জনই বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন তার কারণগুলি আজও অন্য পক্ষের সহৃদয় বিবেচনার অপেক্ষার আছে। তা যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে পারস্পরিক দোষারোপ ছাড়া আর তো কিছুই লাভ হবে না। অবশ্য পৃথিবীতে কোনো দুটি প্রতিবেশী দেশ কি আছে যারা পরস্পরের দোষকে ভুলতে পেরেছে? অথবা নিজের দোষকে স্বীকার করেছে?

আমরা প্রতিবেশী এটাই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা। প্রতিবেশীসুলভ বিরোধ-বিদ্বেষ, হিংসা-ঈর্ষাও থাকবেই। কিন্তু আমাদের ভাষা এক, সংস্কৃতিও খুব ভিন্ন নয়। তাই দুই পক্ষেই একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণকেও মাঝে মাঝে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রায় আমাদের হিন্দু কোড বিল পূর্ববর্তী জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। ইচ্ছা করলেই তো ছিন্ন করাও যায় না। চেষ্টা না করলেও একটা অলক্ষ্য সেতুবন্ধন চলতেই থাকে।

'জিজ্ঞাসা', বর্ষ ১৩, সং ১৪, পৃষ্ঠা ৪০২-১০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রগতি কি ও কেন?

এদিকে পত্রিকার নাম প্রগতি। ওদিকে দেশ জুড়ে রক্ষণশীলতা আর প্রগতির সংঘর্ষ চলছে। তাই আজ প্রগতির ধারণা নিয়েই দু-চার কথা বলা যাক।

প্রগতি কাকে বলে তা বোঝানো সহজ নয়। তবে সমসাময়িক চিন্তাভাবনা আচার-আচরণের যদি সে রকম কোনও পরিবর্তন ঘটে যার ফলে ব্যক্তি ও সমাজের কিছুটা মঙ্গল বা উন্নতি হয় তবে সেই পরিবর্তনকে আমরা বোধহয় প্রগতি বা এগিয়ে চলা বলতে পারি। সোজা উদাহরণ দেওয়া যাক একটা। এদেশে আজ বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজেদের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় সন্তানের উপর কিংবা সন্তানের অভাবে কোনও অন্য আত্মীয় স্বজনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। শেষ বয়সে এভাবে গলগ্রহ হয়ে থেকে দু পক্ষেই অনেক অশান্তি হয়। তাই আজ যদি দেশের আর্থিক পরিকল্পনা এমনভাবে করা যায় যে তার ফলে প্রত্যেকটি অভাবী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই কিছু বার্দ্ধক্য ভাতা বা পেনশান পেতে পারেন তাহলে একে আমরা দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি বলতে পারি। বলতে পারি সমাজের একটু উন্নতি হলো। আবার দেখুন, দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪০ বৎসর আগে। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছেলে-মেয়েরই অক্ষর পরিচয়ের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। এবার যদি সর্বশক্তি নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যে ১৯৯০ সাল থেকে প্রত্যেকটি ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুই স্কুলে যেতে পারবে তাহলেও বোধহয় সবাই একমত হয়ে বলবেন দেশের একটু প্রগতি হলো। এই ধরণের এগিয়ে চলা বা প্রগতি নিয়ে আপত্তি বিশেষ হয় না। তাছাড়া এরকম পরিবর্তনকে প্রগতি বলে চিহ্নিত করতেও খুব একটা মতের অমিল দেখা দেয় না। অবশ্য কখনই দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। কারণ মেয়েদের শিক্ষা দিলে সমাজের প্রগতি হবে না সমাজ অধঃপাতে যাবে এ নিয়ে বহু লোকের মনে আজো একটু সংশয় আছে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে তো খুবই ছিল। এখনও কোনও কোনও গ্রামীণ পরিবারে বিশেষ অনিচ্ছা দেখা যায় মেয়েদের ইস্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে। মেয়ে একটু বড়ো হলেই তাকে অবরোধে রাখা, বিশেষত ছেলেদের ইস্কুলে সহশিক্ষা করতে না দেওয়া—এ জাতীয় রক্ষণশীলতা এখনও এদেশে বেশ খানিকটা যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে রক্ষণ-শীলরা দলে তত ভারী নয় আর আজ। বেশির ভাগ মানুষই এখন এটা বুঝতে পেরেছেন যে ঘরের মেয়েদের

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিছুদূর লেখা পড়া করানোটা তার পক্ষে এবং পরিবার পরিজনের পক্ষেও লাভজনক। অর্থাৎ অধিকাংশ ভারতীয়ই আজ শিক্ষার প্রসার বিষয়ে প্রগতিশীল মতামত পোষণ করেন। নিরক্ষরতার কুফল কি তা বুঝতে পারেন। সাক্ষরতার ব্যবহারিক উপযোগিতা কতটা তাও বুঝতে পারেন।

কিন্তু জীবনের অন্য কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রগতির ধারণা এত সহজেই সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। প্রথমত সেরকম পরিবর্তনকে প্রগতি বলে মেনে নিতেই অনেকের মনে তীব্র প্রতিরোধ আছে। মনে করুন, যদি বলি পুরোহিতের কাজ কেবল ব্রাহ্মণরাই করবেন কেন এখনও?—যোগ্য অব্রাহ্মণকেও সেই অধিকার দেওয়া যাক না? অনেক সময়েই তো দেখা যায় মূর্খ কোনও উপবীতধারী এসে অং বং করে অশুদ্ধ মন্ত্র বলে পূজায়-বিবাহে-শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করেন। উচ্চারিত মন্ত্রের অর্থ না বোঝেন পুরোহিত, না তাঁর যজমান। কিন্তু উপবীতটা আছে বলেই তাঁর পৌরোহিত্যের অধিকার আছে একথা আমরা নির্বিচারে মেনে নিয়েছি। যে কোনও জাতের শিক্ষিত মানুষ, তিনি যদি তথাকথিত হরিজন হন তাতেও ক্ষতি নেই—যদি তিনি শুদ্ধ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন, সে মন্ত্রের অর্থ নিজে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর যজমানকে বুঝিয়ে বলতে পারেন তাহলেই তিনি পৌরোহিত্যের অধিকারী হবেন—একথা যদি বলি তাহলে কেমন হয়? আমি জানি তাবড় তাবড় আধুনিকমন্য ব্যক্তিও এটা সহজে মেনে নিতে ইতস্তত করবেন। সমাজের গুটি কয়েক যথার্থ প্রগতিশীল ব্যক্তির কথা বাদ দিয়ে বলছি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে নিজের কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করতে আহ্বান করে কিছু কিছু ব্যক্তি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন দেখেছি—কিন্তু প্রথমে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পৌরোহিত্যের আসনে বসিয়েছিলেন বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। অব্রাহ্মণকে এই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত অধিকার দেবার মতন মানসিকতা আজো দেশের ৯৯ ভাগ মানুষেরই নেই—অব্রাহ্মণেরও নেই। দিলে যে দেশের চারিত্রিক ও সামাজিক উন্নতি হবে, অর্থাৎ প্রগতি হবে, এই কথাও সবাই সহজে মেনে নেবেন না। এতকাল যা হয়নি তা মেনে নিতে অধিকাংশ মানুষেরই সংস্কার বাধা দেবে। অতএব যা বংশপরম্পরায় হয়ে এসেছে সেটাই মঙ্গলজনক এমন কথা প্রমাণ করতে উৎসাহী ‘পণ্ডিতে’র অভাবও হবে না। যদিও হিন্দু সমাজ নিজেকে সংখ্যালঘু অধিকাংশ সমাজের তুলনায় প্রগতিশীল বলে মনে করতেই অভ্যস্ত তবু এই আধুনিকীকরণ ব্যাপারে যথার্থ প্রগতিবাদীর সন্ধান খুব বেশি মিলবে না বলেই আমার আশঙ্কা। বর্ণবিন্যস্ত হিন্দু সমাজের অর্থনৈতিক যুক্তিটা বেশ অনেক কাল আগেই ভেঙে পড়েছে, কিন্তু যুক্তিহীন সংস্কারের ভিতের উপর এখনও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর্ণবিভাগ। যতটুকু বা ভাঙছে, অতি ধীরে ভাঙছে।

ধর্মীয় সংস্কার যে কী প্রবল এবং এই সংস্কারে সুড়সুড়ি দিয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত অধিকাংশ মানুষকেই কতদূর ক্ষেপিয়ে তোলা যায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৮৫-৮৬ সালে শাহবানু বিতর্কে। কোনও তালাকপ্রাপ্ত মহিলা যদি নিজেকে ভরণপোষণ করতে অক্ষম হন তাহলে তাঁকে খোর পোষ দেবার দায়িত্ব প্রাক্তন স্বামীর উপর বর্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিনা এই তো ছিল দেশ জোড়া বিতর্কের বিষয়। যে-কোনও মুসলমান যিনি অর্থ বুঝে তাঁর ধর্মগ্রন্থ পড়েন তিনিই কি জানেন না যে সুরাহ্ বাকরাহ্-র ২-৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন যে, সৎ মুসলমান তালাক দেবার পর স্ত্রীকে যথাসাধ্য খরচপত্র দেবেন। এই যথাসাধ্য 'খরচপত্র' যে কি করে এ দেশের মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে নূন্যতম খরচপত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র ইদ্দৎকালীন তিন মাসের খরচপত্র এসে দাঁড়াল সেটাই আশ্চর্য! যে ইসলাম ধর্মের ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে মুসলমানদের অহঙ্কারের সীমা নেই সেই ধর্মে অসহায়া মহিলাদের প্রতি এই কি সুবিচার হোল? যুক্তি দিয়ে যদি বিচার করি তাহলে কি বুঝতে এক লহমা দেরী হয় যে কোরাণ শরীফের মুল শিক্ষা অনেক বেশি সদয় তালাক প্রাপ্তাদের প্রতি? অথচ ব্যক্তিগত আইনের বিধানটুকুই এখন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে দাঁড়িয়েছে, তালাক পাওয়া মেয়ে ইদ্দৎকালের খরচাটুকুই পেতে অধিকারী—তারপরে তার যা হয় হোক। যদি তার বাপ-ভাইয়ের আশ্রয় না তাকে, যদি তার অন্য কোনও সংগতি না থাকে তাহলে তার কি হবে? তাহলে সে বরং ভিক্ষা করবে, পরের সংসারে দাসীবৃত্তি করবে, এমন কি বেশ্যাবৃত্তি-ও-করবে—তাতে ধর্মের কলঙ্ক নেই, তাতে সমাজের লজ্জা নেই। কিন্তু যেই সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে স্বচ্ছল স্বামী তাঁর অস্বচ্ছল তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকবেন তখনই হায় হায় রব উঠল। সরকারি আক্রমণে মুসলমানের ধর্ম আর রইল না। মোল্লা মৌলবীরা ছুটে এলেন প্রমাণ করতে যে এটা কত বড়ো বেশরীয়তী কাজ হবে!

আমি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের এই নির্লজ্জ ও নির্বোধ আচরণ দেখেছি আর ভেবেছি, আজও প্রয়োজন ছিল সেই তেজস্বিনী বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের মতন একজন মহিলাকে যিনি এই ভণ্ডামী আর নষ্টামীকে ফালা ফালা করে দিতে পারতেন তাঁর শাণিত যুক্তির তরবারি দিয়ে। বেগম রোকেয়া হোসেন কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একশ, দেড়শ বৎসরেরও বেশিকাল পার হয়ে এসে আজও আমাদের সামনে প্রগতির জ্বলন্ত আদর্শ হয়ে আছেন। কিছুকাল আগে 'কলম' পত্রিকার একটি প্রতিনিধি আমাকে ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এতো উচ্ছ্বাস, বেগম রোকেয়া হোসেনকে তো কেউ মনে রাখেন নি?' মনে না রাখায় সত্যিই আমাদের মস্ত বড়ো ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তাঁকে ভুলে থাকার অপরাধ মুসলমান সমাজকেই বেশি দীন, বেশি কৃতঘ্ন করেছে। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে পুনরুদ্ধার করতে যত্নশীল হয়েছেন অনেক কাল। আমি অপেক্ষা করে আছি সেই সুদিনের যেদিন এই বাংলার ঘরে ঘরেও শিক্ষিত মুসলমান বেগম রোকেয়া হোসেনকে পুনরাবিষ্কার করে গর্বিত হবেন, আনন্দিত হবেন। আজ এই প্রগতিশীলা অথচ স্বসংস্কৃতিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতা মহিলার রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করে আমার বক্তব্য শেষ করবো:

"আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ এই বোধহয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মস্তক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।...” “...আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও বিশেষ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে সামাজিক আইন কানুন বিধি বদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিম্বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয় দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!!”

“তবেই দেখিতেছেন, এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নহে। মুনিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোনও স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।...যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থ সমূহ ঈশ্বর-প্রেরিত কিনা, তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোনও দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না! দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন?...যাহা হউক, এখন আমাদের আর ধর্মের নামে নত মস্তকে পরের অযথা প্রভুত্ব সহ্য করা উচিত নহে।...

(নবনূর, ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

এই রচনার কাল ১৩১১। এখন ১৩৯৪। ৮৩ বৎসর পরেও যে ধর্মের নামে শাহবানুদের মস্তক চূর্ণ করা হচ্ছে তার প্রতিবাদ করবে কে? না যদি প্রতিবাদ করা হয় তবে সমাজ তো বদ্ধ জলাশয়ের মতন অস্বাস্থ্যকর অবাসযোগ্য হয়ে যাবে।

প্রগতি, ঈদ সংখ্যা ১৩৯৪, পৃঃ ৮১-৮৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে কি গণতন্ত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা অসম্ভব?

এ কথা সবাই জানেন যে গণতন্ত্রের খোলসটা আমরা গায়ে এঁটেছি কিন্তু গণতান্ত্রিক বোধ ও বিবেক এখনও আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। এর ফলে যে সর্বনাশটা হয়েছে তা সাম্প্রতিক "মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলার অধিকার রক্ষা বিল" এর প্রহসনে যত বেশি করে প্রত্যক্ষ করা গেল ততটা আর কিছুতে নয়। আমাদের লোকসভা, আমাদের সরকার সবই গণতান্ত্রিক রীতিতে গড়া। অতএব আমাদের লোকসভা যে গণতান্ত্রিক অধিকারের উৎসস্বরূপ হবে এমন আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে এই সরকারই আজ এই লোকসভার সাহায্যেই এমন আইন করিয়ে নিচ্ছে যা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অগণতান্ত্রিক। আর আমরা নিরুপায় দর্শক।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটলে পরে কোনও নিরপরাধ স্ত্রী যদি নিজেকে ভরণপোষণ করতে অক্ষম হন তাহলে তাঁর প্রাক্তন স্বামী আইনত তাঁকে খোর পোষ দিতে বাধ্য থাকেন। সব সভ্য দেশেই এই নিয়ম। ইরান ইরাক মিশর তুরস্ক পাকিস্তান বাংলাদেশ ইত্যাদি মুসলিম রাষ্ট্রও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ আইনের এই অত্যন্ত ভদ্র বিধানটাকে বেশরীয়তী আখ্যা দিয়ে লোক ক্ষেপিয়ে একটি ভীরু প্রশাসন ব্যবস্থাকে কতদূর পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে অত্যন্ত বিধিসম্মত গণতান্ত্রিক উপায়ে! কিন্তু অসহায়া মহিলাদের এই যে একটা স্পষ্টতই নীতিবিশুদ্ধ মানবিক অধিকার, যে অধিকারকে সব যুক্তিবাদী মুসলমানই আজ সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে স্বীকার করেন সেটিও এমন ভারত জোড়া সাম্প্রদায়িক বিতর্ক হয়ে দাঁড়াল কেন?

ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা অনুযায়ী শাহবানুকে খোরপোষ দেবার আদেশ যখন সুপ্রীম কোর্ট দেয় তখন প্রথমটা কিন্তু কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। সম্ভবত এই কারণে যে ঘটনাটা তেমন কিছু অভিনব নয়, আর সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে তেমন অন্যায় বলেও ঠেকে নি। এরকম রায় ইতিপূর্বে আর কোনও ভারতীয় আদালতে যে দেওয়া হয়নি এমনও কিন্তু নয়। শাহবানুর অনেক আগেই আরো বহু মুসলমান মহিলা এইভাবে যাবজ্জীবন খোরপোষ আদায় করতে পেরেছেন, পরেও আরো কয়েকজন অন্তত পেরেছেন। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে সারা দেশের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানা আদালতে ঠিক এই সময়ে যে শত শত শাহবানুর মামলা ঝুলছে তার একটাও কোনও মুসলমান মহিলা প্রত্যাহার করেন নি। এ নিয়ে তাহলে এমন করে উত্তাপ সৃষ্টি করা হল কেন?

শাহবানু মামলার রায়ে বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের দুটি বিশেষ মন্তব্য মুসলমান সমাজের বিরাট অংশকে ক্রুদ্ধ ও আতঙ্কিত করেছে। প্রগতিবিরোধী মুসলিম দলগুলি এবং বহু ব্যক্তিও তাঁদের আন্দোলনে ওই দুটি বিষয়কেই হাতিয়ার করতে পেরেছেন। প্রথমতঃ বিচারপতি মশাই দাবি করেছেন যে কোরাণ শরীফের নির্দেশে এবং আমাদের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ ধারার নির্দেশে কোনও বিরোধ নেই ; সেই সঙ্গে আবার সরকারকে উপদেশ দিয়েছেন যেন সংবিধানের ৪৪-তম নির্দেশ অনুযায়ী সকল ভারতবাসীর জন্য একই রকম আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে আর বিলম্ব না করা হয়। এই দুটিতেই গোঁড়া মুসলমানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কোরান শরীফের শিক্ষা মুসলমানকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে একজন অমুসলমান এত বড়ো ধৃষ্টতা বরদাস্ত করা সহজ নয়। গোদের উপর বিষফোড়া হয়েছে সংবিধানের ৪৪-তম ধারার উল্লেখ। এক আইন করে হিন্দুর সঙ্গে একাকার করে দেওয়া হবে মুসলমানের ধর্ম আর সংস্কৃতি-এতো বড়ো সর্বনাশের সম্ভাবনায় মুসলমানদের ভয় দেখানো আরো সহজ হয়েছে। সংখ্যালঘুদের এই আত্মপরিচয় হারাই হারাই ভয় তো সব দেশেই আছে। ফলে এই মামলার অত্যন্ত সঙ্গত রায়কেও তাঁরা সুস্থ চিত্তে স্থির মস্তিষ্কে বিচার করতে পারছেন না।

ভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ১২৫ ধারার সাহায্যে যে শাহবানু মামলা জিতেছেন এটা তাঁদের বিশেষ গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। অতএব ১২৫ ধারাকেই মুসলমানের জীবন থেকে উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তাদের শান্তি নেই। একে তো এতে করে সবার চোখে ধরা পড়ে গেল যে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের প্রতি অচলা ভক্তি মুসলমান সমাজেরও অনেকের মনে নেই। তাছাড়া এই কথাটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে শরীয়তের সব বিধান এখন আর যুগোপযোগী নেই বলেই তাকে অতিক্রম করার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে সমাজে। এতে করে যেন তাঁদের ভীষণ একটা হার হয়ে গেল অমুসলমানের কাছে। কোরাণ হাদিস ও শরীয়তে সর্ব বিষয়ে সব দেশের সব যুগের মুসলমানদের জন্য অভ্রান্ত নির্দেশ আছে, আর কোথাও সৎ পথের সন্ধান করতেই হয় না মুসলমানকে, এরকম একটা অহঙ্কারী দাবি গোঁড়া মুসলমানেরা সরবেই করে থাকেন। এই দাবিতেই আঘাত করেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। তাই এঁরা ক্রোধে আজ ভালোমন্দর বিচার করতে পারছেন না। এই দুর্বিনীতা বিচার প্রার্থিনীর কুদৃষ্টান্ত যাতে সারা সমাজে ছড়িয়ে না পড়ে তাই উদ্ধত বিচারপতি, ধর্মজ্ঞানহীন সরকার, সকলের বিরুদ্ধেই আন্দোলন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে এ দেশের বিরাট একটা জনগোষ্ঠী বিচার বুদ্ধি হারিয়ে যেন প্রায় আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এটা যত বেদনার ততই ভয়ের। সরকার যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুগত্য হারাতে ভয় পায় তা বোঝা গেল। এক মার্কসবাদীদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাদ দিলে অন্য বিরোধী দলগুলিও মুসলমানের প্রতি বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে না সুপ্রীম কোর্টের রায়কে সমর্থন জানাতে সাহস করছে না প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলছে। কিন্তু গোঁড়া মুসলমানদের শান্ত করার আশায় সরকার যে নির্বোধ ও নির্বিবেক আইন প্রণয়ন করতে চলেছে তাতে এই মুসলমান সমাজের যে কতখানি ক্ষতি হবে তা বুঝবার যে চেষ্টা করছেন না অধিকাংশ মুসলমান, এ বড়ো ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মুসলমান সমাজের যে অসম্মান হয়েছিল, এই আইন করে যেন সেই অসম্মান দূর হবে!—ব্যস আর কিছু ভাববার নেই। অথচ এর ফলে যে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপবে, তার বেলায়? যখন বিবেকহীন স্বামীর ঘর থেকেও বিনা অপরাধে বিতাড়িত হবে স্ত্রীরা তখন সেই অন্যায়েরও দায় বর্তাবে বাপ, ভাই, অন্য স্বচ্ছল আত্মীয়, এমনকি ওয়াকফ বোর্ডের উপর? অথচ যে অন্যায়ে নাকি খোদা তালাহ্-র আরস পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, তেমনি নিষ্ঠুর কাজ যে করবে অর্থাৎ তালাক দেবে, তার গায়ে কিন্তু শাস্তির আঁচড়টি লাগবে না। মুসলমান সমাজে কি কেবল স্বামীরাই আছেন? বাপ নেই, ভাই নেই, অন্য সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ নেই যাঁরা এই অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারেন?

নিরন্ধ্র কালো মেঘের প্রান্তেও কিন্তু আমি রূপালি রেখা দেখতে পাচ্ছি। গত ছয় সাত মাস ধরে এই সমস্যার গতিপ্রকৃতি, নেতাদের ভূমিকা, সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া—সবই অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি। আমার ধারণা, শরীয়ত নিয়ে যে অন্ধ উন্মাদনা রাজনৈতিক স্বার্থে পুষ্ট হয়ে চলেছে এবং মুসলমান সমাজকে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে, সেই উন্মাদনা এ রাজ্যের বাঙালি মুসলমানকে তত গভীরভাবে স্পর্শ করেনি। এই আন্দোলনের মূলকেন্দ্র উর্দু ভাষা—উত্তর পশ্চিম ভারত। পশ্চিমবাংলার গ্রাম গঞ্জের মুসলমান এতকাল আসল ব্যাপারটা যে কি তারও খবর ঠিক মতন রাখতেন না। এখন এই বিতর্ক যতই সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, যতই ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক লেখক আইনজীবিরা ব্যাপারটাকে বুঝবার চেষ্টা করছেন ততই দেখছি বহু মুক্তবুদ্ধি মানুষ এগিয়ে আসছেন এই প্রস্তাবিত বিলকে খোলাখুলি নিন্দা করবার জন্য। পেট্রোডলার পুষ্ট ধর্মের ধ্বজাধারীরা প্রথমটা যেমন ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছিলেন এবার বোধহয় আর তেমনটা পারবেন না। গত এক সপ্তাহের মধ্যেই মুর্শিদাবাদের মতন মুসলমান গরিষ্ঠ জেলার রক্ষণশীল আবহাওয়াতেও দুটি কনভেনশানের আয়োজন হচ্ছে বলে সংবাদ পেলাম। একটি ইসলামপুরে, একটি বহরমপুরে। উদ্যোক্তরা প্রথম ক্ষেত্রে ষোলো আনাই মুসলমান। এবং অন্য ক্ষেত্রেও প্রধানত মুসলমান। এত দ্রুত যে এমন স্বাস্থ্যকর প্রতিরোধ গড়ে উঠবে তা আমি আশা করিনি।

তা সত্ত্বেও দিন কয়েকের মধ্যেই মনে হয় রাজীব গান্ধীর কালা-কানুন পাস হয়ে গিয়ে ভারতীয় মুসলমান মেয়েদের ভাগ্যের উপর কিছুকাল পাথর চাপা পড়বে। আমি আশাবাদী হয়ে "কিছুকাল" বলছি কারণ আমার মনে হয় যে এই অধিকার রক্ষা বিলটি যে কত বড়ো ধাপ্পাবাজি এবং আসলে অধিকার রক্ষার নামে অধিকার হরণ সেটা বুঝতে মুসলমান সমাজের দেরী হবে না। তাছাড়া একবার আইনটা পাস হয়ে গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাঁদের জিদ বজায় থাকবে তাঁরাও ঠাণ্ডা মাথায় বসে ভাবতে পারবেন যে তাঁদের নাকের বদলে নরুণ লাভ হোল কিনা। এই হেলায় হারানো অধিকার দুঃখের পথে ফিরে পাবার জন্য মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেই যে প্রবল দাবি আসবে তাতে মৌলবাদীরা ভেসে যাবে, যদি না সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের অবিবেচনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আবার আত্মরক্ষার তাগিদে শামুকের মতন নিজেকে গুটিয়ে নেয়।

ভাবনা-চিন্তা, বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১২, ১৫ । ০৫ । ৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার কাছে আর কোনও বিকল্প নেই

এবার জনতা ও বাম ফ্রন্টের নির্বাচনী সন্ধি যে হয়নি, আমি অন্তত এটাকে সুলক্ষণ বলে মনে করি। লোকসভা নির্বাচনের বেলায় জনতা-বামফ্রন্ট সমঝোতা অবশ্যই নীতিসম্মত ছিল। কারণ দু দলেরই তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রে কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটানো। ঐরকম একটা নঙর্থক ব্যাপারে এতখানি বিপরীতধর্মী দুই দলেরও একমত হওয়া অনুচিত হয়নি, কঠিনও ছিল না। কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের উদ্দেশ্য হল রাজ্যে রাজ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মধারায় বিশ্বাসী সরকার গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য ও লক্ষ্যবেধের উপায় সম্বন্ধে জনতা আর বাম ফ্রন্টের মধ্যে মতের অমিল যেহেতু মৌলিক তাই কেবলমাত্র নির্বাচনে জেতার জন্যই দুই পক্ষের হাতমেলানোটা অনৈতিক হত বলে আমি বিশ্বাস করি এবং অসুবিধা জনকও। কারণ, কংগ্রেসকে যদি আবার হারানো যায়, যা যাবে বলেই মনে হচ্ছে, তবে এবার এ রাজ্যেও তো অনিবার্য প্রশ্ন উঠবে নতুন সরকারের চরিত্রটা কেমন হবে? যদি জনতা-বামফ্রন্ট সন্ধি হত তাহলে মার্কসবাদী-গান্ধীবাদের টানাপোড়েনে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট সৃষ্টি হত আবার, তাতে ভারতবর্ষের এই সবচেয়ে রুগ্ন রাজ্যটির নাভিশ্বাস উঠবার সম্ভাবনা আরো বাড়ত বই কমত না।

তার চেয়ে বরং এইবারে আমাদের সামনে যে স্পষ্ট দুটি বিকল্প আছে সেটাই ভাল। আমরা কেউ মার্কসীয় পন্থায় এ রাজ্যের আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাই, আর কেউ বা গান্ধীবাদী পথে। ধীরে সুস্থে কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার হলেই বহু ভাগ্য মানব। এখন যা পরিস্থিতি হয়েছে তাতে আমরা যে যার পছন্দ মতন প্রতিনিধি বেছে নিতে পারব। একই নামে ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন জিনিস কিনতে বাধ্য হব না।

প্রার্থী নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে বামফ্রন্ট যে পরিমাণ দক্ষতার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা করতে পেরেছেন জনতা দল সে পরিমাণেই বিভেদ বিচ্ছেদ ও অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে কখনও আমাদের বিষণ্ণ কখনও বা ক্রুদ্ধ করেছেন। এমনকি তাঁদের সব ক'টি প্রার্থীর হাতে দলের প্রতীক সম্বলিত সার্টিফিকেটটি পর্যন্ত যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যর্থতা আমাদের একটু হতাশ করেছে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জয়প্রকাশপন্থী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রবক্তারাই যে এই রাজ্যের জনতা প্রার্থীদের দলীয় সার্টিফিকেট দেবার অধিকারটুকুও বিশ্বাস ও ভরসা করে প্রফুল্ল সেন মশাই-এর হাতে ছাড়তে রাজি হননি এই বিসদৃশ ব্যাপারটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সবটুকু অধিকার দিল্লিতে বসে চন্দ্রশেখর নিজের শক্তমুঠোয় ধরে রেখেছিলেন যার ফলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

তা ছাড়া এ রাজ্যের জনতা নেতারাও যেন ভুলে গিয়েছিলেন যে, বিধানসভার প্রার্থী নির্বাচনটা চাকুরির প্রার্থী নির্বাচন নয় যে, সারিবেঁধে এসে প্রার্থীরা দরখাস্ত দিয়ে পদ প্রার্থনা করবেন। আমরা তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পেতাম যদি প্রত্যেক অঞ্চল থেকে তাঁরা একটি করে শ্রদ্ধেয় মানুষ খুঁজে বার করে তাঁকেই অনুরোধ উপরোধ করেও জনতা দলের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে পারতেন। তাতে জনতা দলের সম্মান ক্ষুণ্ণ হত না। এবং তাঁদের প্রার্থীদের সম্মান বৃদ্ধি হত আমাদের চোখে। অতএব এক কথায় বলা যায়, জনতা নেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের বিমুখ করে দিতে।

তবু এই সব আপাতত তুচ্ছ বোধ হচ্ছে আমার চোখে। কারণ, তুলনায় অনেক বেশি জটিল ও মৌলিক সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে যা ভুলে থাকা আমাদের পক্ষে সর্বনাশের হতে পারে। লোকসভা নির্বাচনে জনতা দলের সাফল্য একটি স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করেছে মাত্র। কিন্তু বিদায়ী সরকারের বেশ কিছু কুকীর্তির দায় এখনও আমাদের গলায় ফাঁস পরিয়ে রেখেছে। এবং আমরা তৎপর না হলে অচিরেই ফাঁসটিতে আবার টান পড়তে পারে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন এই ফাঁস। এই সংশোধন-এর সাহায্যে যেভাবে আমাদের সংবিধানকে নষ্টভ্রষ্ট করা হয়েছে তাতে বর্তমানে বিচার বিভাগকে ইচ্ছা করলেই সরকার ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। পার্লিয়ামেন্টকে সর্বময় করার অর্থ জনসাধারণকেই সর্বময় করা, এমন একটি কুযুক্তির সাহায্যে কংগ্রেস সরকার আমাদের ভাঁওতা দিয়ে নিজেই সর্বময় হবার চেষ্টা করেছিল, মনের মতন যা ইচ্ছা আইন করে। ফলত জনগণের মৌলিক অধিকার চুরি করার ব্যাপারে পার্লিয়ামেন্টই হয়েছিল বাধ্য ও সুবিধা জনক হাতিয়ার। নির্বাচনকে ইচ্ছা মত পিছিয়ে দেওয়ায় কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানমন্ত্রীকেও আইনের ঊর্ধ্বে রাখায় জনগণ শক্তিশালী হয়েছিলেন কি? এ সমস্তই ৪২তম সংশোধনের ফলশ্রুতি।

অথচ এখনও অধিকাংশ কংগ্রেসী নেতা এই সব কুকীর্তির জন্য যথেষ্ট লজ্জিত নন, অনুতপ্তও নন। যদি তাঁদের এই সংশোধন বাতিল করার প্রস্তাব জনতা সরকার পার্লিয়ামেন্টে পেশ করেন তখন নাকি তাঁরা ভেবে দেখবেন কি করা যায়—এমনতর স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলের নেতা শ্রীচবন। তাই কংগ্রেসের কাছে আমার আশা নেই যে সে নাকেখৎ দিয়ে নিজের প্রাক্তন অপকর্ম সরাসরি ও পুরোপুরি প্রত্যাহার করবে। এদিকে আমাদের নির্বাচনের ময়দানে অন্য যেসব দল ও গোষ্ঠী আছেন তাদের কারুরই সেই সর্বভারতীয় প্রতিপত্তি নেই যার সাহায্যে তাঁরা (যদি ইচ্ছা করেন তাহলেও) ৪২তম সংশোধন নাকচ করতে পারেন। অতএব এ কাজ সম্ভব শুধু জনতা দলের পক্ষেই। আমি তো আর কোনও বিকল্প দেখিনে। লোকসভা নির্বাচনের আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনতা দল ও পরে জনতা সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, লোকসভা ও রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গরিষ্ঠতা পেলেই তাঁরা এই কালা সংশোধন বাতিল করবেন। বিচার বিভাগকে তার প্রাক্তন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবেন, আমলাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা সংযত করবেন, রাজ্য সরকারের যতটুকু স্বাধীনতা এই সংশোধন হরণ করেছিল তা প্রত্যার্পণ করবেন। এমনকি তাঁরা একথাও বলেছেন যে যতদিন না ওই ৪২তম সংশোধন-এর সংশোধন হচ্ছে ততদিন তার ব্যবহারও করবেন না তাঁরা। এ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবার প্রবণতাই আমরা দেখতে পেয়েছি।

আসন্ন নির্বাচনেও জনতা দল যদি প্রতিটি রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন এবং দুচার বছরের মধ্যে রাজ্য সভাতেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় তবেই ৪২তম সংশোধনী বাতিল করতে তাঁরা সক্ষম, অতএব বাধ্য হবেন। আমার সমস্ত হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে পেতে চাই বলে এবং জনতা সরকারকে এই সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি পালন করার একটা সুযোগ দিতে চাই বলেই আমি জনতা প্রার্থীকে ভোট দেব। লোকসভার নির্বাচনে জনতা দল এক কদম এগিয়েছিল, এবার বিধানসভার নির্বাচনে তাকে আরো এক কদম এগিয়ে দিতে পারলেই আমাদের গলার ফাঁসিটা আলগা হবার আশা আছে। তা যদি না করতে পারি তবে আর কাউকে দোষের ভাগী করতে পারব না।

অতিরিক্ত দলভারী হওয়ার সুযোগে স্বৈরতন্ত্রকে 'বৈধতা' দিয়েছিল ক্ষমতামত্ত কংগ্রেস, যথেষ্ট দলভারী না হতে পারলে সেই বৈধতারই সুযোগ নিতে প্রলুব্ধ হতে পারে অক্ষম 'জনতা'। অতএব সাধু সাবধান।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ০৮।০৬।৭৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় ঐতিহ্য ও জবাহরলাল

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারণা নানা জনের মনে নানা রকম। এই ধরণের বিমূর্ত কল্পনাগুলি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন হতে বাধ্য যেহেতু এই সংস্কৃতির এক-একটা উপাদানকে এক একজন তার ব্যক্তিগত ঝোঁক ও রুচি অনুযায়ী বড়ো করে দেখেন। তবু ভারতীয় সংস্কৃতির যদি কোনও সামগ্রিক রূপ ভবিষ্যত বংশের সামনে আমরা তুলে ধরতে চাই আজ তা হলে নিরপেক্ষভাবে দ্রাবিড়, আর্য, গ্রীক, শক, পাঠান, মোগল ইত্যাদি সব প্রভাব, সব উপাদানকেই স্বীকার করতে হবে কারণ এই সব প্রভাবই আমাদের জীবনযাত্রায়, চিন্তায় ভাবনায় একাকার হয়ে আছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই সমগ্র রূপটি জবাহরলালের ব্যক্তিত্বে যতটা দেখতে পাই তেমনটা আর বিশেষ কারুর ব্যক্তিত্বে পাই না। সবশেষে যে প্রভাব বিদেশ থেকে এসে প্রবলভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাপ্ত হয়েছিল সে হল পশ্চিম ইউরোপের মন ও জীবনধারার প্রভাব। এই শেষোক্ত মনোভঙ্গি ও জীবনধারা বিভিন্ন মাত্রায় এবং বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও নেহরুর ব্যক্তিত্বকে।

ইংলন্ডে বেশ কয়েক বছর পড়াশোনা করা এমন কি পশ্চিমী দ্বৈতনৃত্যচর্চার প্রয়াস করা সত্ত্বেও পশ্চিমী প্রভাব গান্ধীর ব্যক্তিত্বের শুধুমাত্র উপরিতলকেই স্পর্শ করেছিল—ভিতরে খুব দূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তাঁর চিন্তার সরলতা ও স্বচ্ছতা, চরিত্রের দার্ঢ্য, কর্মে নির্দ্বিধ বিশ্বাস—এসবের কিছুই পশ্চিম থেকে পাওয়া নয় তাঁর মনের ভঙ্গী, তাঁর প্রকাশের ভাষা, তাঁর চিন্তার উপাদানে পশ্চিমী প্রভাব যতটুকু ছিল তার সবটুকুকেই তিনি খাঁটি ভারতীয় সজ্জা পরাতে পেরেছিলেন। নেহরুর কিংবা আরো অনেকের পশ্চিমী-প্রভাব-পাওয়া মনের কাছে গান্ধীজীর বক্তব্য যতই 'আন্‌প্রাকটিকাল' কিংবা 'মিস্টিকাল' ঠেকুক না কেন তাঁর চরিত্র যেহেতু মূলত অত্যন্ত ভারতীয় তাই তাঁর বক্তব্য চাষীমজুরকেও তাদেরই মুখের ভাষায় বোঝাতে পেরেছিলেন গান্ধীজী।

তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মন যে পরিমাণে ভারতীয় সেই পরিমানেই বিশ্বজনীন। তাঁর শিল্পী ও দার্শনিক মন আমাদের নিরক্ষর চাষীর বোধগম্য নয়—তাঁর বিশ্বচেতনাকে গ্রহণ করবার মত প্রশস্ত মন তাঁর শিক্ষিত সমসাময়িকদের মধ্যে কেন, এখনও দুর্লভ। পাশ্চাত্য জীবন যাত্রা, চিন্তা, সাহিত্য, শিল্প যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছে তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতির (হিন্দু মুসলমান উভয় সংস্কৃতি) ধারাও এসে সমানভাবে মিলেছে তাঁর ব্যক্তিত্বে। রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ব্যক্তিত্বই সমন্বয়ের এক আশ্চর্য চিত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের একদিকে যদি গান্ধীকে রাখা যায় তবে অন্য দিকে থাকেন নেহরু। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গান্ধী যতখানি ভারতীয় নেহরু প্রায় ততখানিই ইউরোপীয়। আবার ঐস্লামিক সংস্কৃতির প্রভাবও এই ত্রয়ীর মধ্যে নেহরুর ওপরই সবচেয়ে বেশি পড়েছিল কারণ কাশ্মীর কিংবা উত্তর প্রদেশে এই প্রভাব যতটা পৌঁছেছিল বাংলা কিংবা গুজরাতে ততটা পৌঁছয় নি। রবীন্দ্রনাথেও ঐস্লামিক প্রভাব আছে, তুলনায় গান্ধীর মধ্যে নেই বললেও চলে। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে জবাহরের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবনে পশ্চিমী প্রভাব ছিল প্রায় পনের আনা। তারপর যৌবনেই একদা তিনি সচেতনভাবে তাঁর স্বদেশ, তাঁর সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এটা লক্ষ্য করার মত যে জবাহরের ব্যক্তিত্বে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রভাব যতটুকু পড়েছে তার বেশির ভাগই তিনি পরিণতি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করেছেন। আমরা আর পাঁচজন ভারতীয় এই ঐতিহ্যকে যেমন নিজেদের অজ্ঞাতসারে শৈশব থেকেই ভালয় মন্দয় সমান করে পাই এবং পরবর্তী জীবনে ইচ্ছা করলেও তার অনেককিছুই সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারি না জবাহরের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটা ঘটেনি। তিনি যখন ভারতীয় ঐতিহ্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তখন তিনি জানেন যে "The burden of the past, the burden of both good and ill, is overpowering, and sometimes suffocating, more especially for those of us who belong to very ancient civilizations like those of India and China. As Nietzsehe says : Not only the wisdom of centuries—also their madness breaketh out in us. Dangerous is it to be an heir—"

(অতীতের বোঝা—তার ভালমন্দ দুইয়েরই বোঝা—আমাদের অভিভূত করে ফেলে, কখন কখনও প্রায় দম আটকে দেয়—বিশেষত চীন কিংবা ভারতের মত প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী যদি আমরা হই। নীটশে বলেছিলেন যুগযুগান্তের প্রজ্ঞাই শুধু নয় উন্মত্ততাও আমাদের ওপর এসে পড়ে। উত্তরাধিকারী হওয়া তাই বিপজ্জনক।) এদিক দিয়ে আমি মনে করি যে নেহরু সৌভাগ্যবান কারণ জাতীয় ঐতিহ্যকে নির্বিচারে ব্যক্তিত্বের অঙ্গ করে নিতে হয় নি তাঁকে। অবশ্য আজকাল এক শ্রেণীর মনোবিজ্ঞানী বলে থাকেন যে জীবনের প্রথম তিন চার বছরে যে সব প্রভাব এসে পড়ে তাই চরিত্রের চিরস্থায়ী উপাদান এবং সেগুলিই ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রচনা করে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে জবাহরের শৈশবের impressionable বয়স কেটেছে ভারতে, ভারতীয়া মায়ের কোলে এবং এর প্রভাব সারা জীবনে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। তবু মনে রাখা দরকার যে মোতিলাল নেহরুর সংসারে পশ্চিমী রীতিনীতি আর আদব-কায়দা প্রবেশ করেছিল জবাহরের জন্মের আগেই এবং মায়ের পুজো-আর্চা পণ্ডিতজীর সংস্কৃত পড়ান এসবের তেমন কোনও রেখা যে তাঁর সচেতন মনে পড়ে নি সেকথা তিনি নিজেই বলেছিলেন। বরং শৈশবের চেয়েও পরিণত চারিত্র্য গঠনের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কৈশোরকাল (adolescence) সেটি তাঁর কেটেছিল হ্যারো আর কেমব্রিজে।

গত দুই-আড়াই দশকে উগ্র জাতীয়তাবাদের যত রকম চেহারা যত দেশে দেখেছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং অদ্যাবধি ধর্ম আর গোষ্ঠীর নামে যত হানাহানি হয়েছে সেসব স্মরণ করলে প্রায়ই আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটি শিশুর মনে যথাসম্ভব নিজের জাতি, সম্প্রদায় ও দেশের সম্বন্ধে উগ্র অভিমান জাগতে না দেওয়াই ভাল। এমন কি নিজের দেশের ইতিহাস পড়বার আগেই বিশ্বের ইতিহাস পড়ে নিলে হয়ত দৃষ্টির সেই প্রসারতা আসবে যাতে করে আমাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন সার্থক হতে পারে। ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন মানসিক বাতাবরণে বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল বলেই হয়ত জবাহরলাল অসম্ভব স্বাভাবিকতার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন, 'What is my inheritance? To what am I an heir? To all that the humanity has achieved during tens of thousands of years, to all that it has thought and felt and suffered and taken pleasure in, to its cries of triumph and its bitter agony of defeat, to that astonishing adventure of man which began so long ago and yet continues and beckons to us. (কি আমার উত্তরাধিকার ? কিসে আমি উত্তরাধিকারী? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যা কিছু আয়ত্ত করেছে তার সবেতেই আমার উত্তরাধিকার—আজ পর্যন্ত মানুষ যা ভেবেছে, অনুভব করেছে, তার সব বিজয়োল্লাস—সব ব্যর্থতার যন্ত্রণায় আমার অধিকার আমার অধিকার মানুষের সেই আশ্চর্য অভিযানে বহু দিন হল যার শুরু হয়েছে, আজও যা শেষ হয় নি এবং আমাদের নীরবে আহ্বান করেছে)।* এই উক্তিটি আমার কাছে বড়ো রোমাঞ্চকর লাগে এইজন্য যে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এই ভারতীয়টি কত সহজে বলে দিলেন যে তিনি শুধু বুদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য, কালিদাসের উত্তরাধিকারী নন ; তিনি সক্রেটিস কিংবা লাওৎসেরও উত্তরাধিকারী। বিশ্বসংস্কৃতির উত্তরাধিকার দাবি করবার শিক্ষা ও সাহস হয়ত তিনি পেতেন না যদি না নিজের সমাজের (কিংবা সংকীর্ণ ভৌগোলিক অর্থে যেটাকে তাঁর 'নিজের ঐতিহ্য' বলি তার) গণ্ডীর বাইরে বার হয়ে আসতে পারতেন জীবনের প্রভাতকালেই। হয়ত এই একই কারণে জেল থেকে বালিকা কন্যার জন্মদিনের উপহার হিসেবে লিখে পাঠিয়েছেন বিশ্বের ইতিহাস, শুধু ভারতের ইতিহাস নয়। বিদেশি শাসনের জগদ্দল পাথর যদি দেশের বুকের ওপর সেদিন জমে বসে না থাকত তবে এই মানুষটি সত্যিই সর্বতোভাবে বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠতেন।

বিশ্বের সমগ্ররূপ মাঝে মাঝে তাঁর মনের জানলা থেকে সরে গেছে কারণ চোখের সামনে ছিল লাঞ্ছিত দরিদ্র দেশ। বিশ্বভাবনায় উদ্বুদ্ধ, ইংলন্ডে মানুষ হওয়া উত্তর-তিরিশ এই যুবকটি যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মে ছাতার অভাবে মাথায় তোয়ালে বেঁধে ঘুরে ঘুরে এলাহাবাদের আশে পাশে গ্রামীণ ভারতকে আবিষ্কার করলেন তখনই তিনি প্রথম অনুভব করলেন, 'But there is a special heritage for the people of India—not

---

* তুলনীয় ঃ—
"লভিয়াছি জীবলোকে মানব জন্মের অধিকার
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার...
"যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ..."

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

an exclusive one, for none are exclusive and all are common to the race of man—one more especially applicable to us, something that is in our flesh and blood and bones, that has gone to make us what we are and what we are likely to be (কিন্তু ভারতের মানুষ এক ঐতিহ্যের অধিকারী অবশ্য এই ঐতিহ্যে তাদেরই যে শুধু একচেটিয়া অধিকার তা নয় কারণ মানবজাতির কোনও ঐতিহ্যেই কোনও জাতির একচেটিয়া অধিকার থাকতে পারে না—তবু এই ঐতিহ্যের প্রভাব আমাদেরই ওপর বেশি, এ যেন আমাদের রক্তে মাংসে রয়েছে এবং আমরা যা হয়েছি বা হতে পারি সবই এই ঐতিহ্যের কল্যাণে।)

কিন্তু এই বিশেষ ভারতীয় ঐতিহ্যের অধিকারী তিনি কতটা হয়েছিলেন তা বিতর্কের বিষয়। ভারতের ইতিহাস ও ভারতের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে একথা তাঁর সব সময়েই মনে হত যে হাজার হাজার বছর ধরে একটা সংস্কৃতির ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে এই দেশে প্রবাহিত রয়েছে ; পারস্য, মিশর, গ্রীস, আরব কিংবা চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটেছে তবু এই জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতির ধারা অব্যাহত। কারণ কোথায়ও নিশ্চয়ই এর একটা গোপন শক্তির উৎস আছে যা চারিদিকের দারিদ্র্য, হতাশা আর গ্লানির মধ্যে সহজে চোখে পড়ে না। কতবার হরিদ্বার আর এলাহাবাদে কুম্ভমেলার ভিড়ে কিংবা মহাঞ্জোদরোর মাটির টিপির ওপর দাঁড়িয়ে একথা মনে করে তিনি বিস্মিত ও গর্বিত বোধ ক'রেছেন। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের এই পটভূমিকায় যখন বর্তমান ভারতের দিকে তিনি তাকিয়েছেন তখন দুঃসহ বর্তমান আর তেমন বিভীষিকার মত ঠেকে নি। তাঁর মনে হতো যে ভারতের প্রতি তাঁর মনোভাব নাকি বড়ো বেশি আবেগাচ্ছন্ন ও জাতীয়তাবোধে আপ্লুত। এই আবেগই তাঁকে প্রবৃত্ত করেছিল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উৎসসন্ধানে।

এতৎসত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম ও আনুগত্য অনেকটা যেন বাইরে থেকে এসে প্রেমে পড়ার মত। তাই সম্পূর্ণ একাত্মবোধ করতে না পারার ফলে তিনি কখনও কখনও প্রায় নির্বাসিতের মত নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন ভীড়ের মাঝখানেও। বারবার গান্ধীজীর মতামত, গান্ধীজীর মন তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে; তাঁর শিক্ষা, তাঁর মন দিয়ে সহজে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ হয়ত এই যে ভারতীয় মনোভঙ্গী বলতে আমরা যা বুঝি জবাহরলাল ঠিক সেই মনোভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন না। তাঁর জীবন-দর্শন কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রৌঢ় বয়সে একবার বলেছিলেন, "আমার চিন্তা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজকাল আমি আর তেমন নিশ্চিত বোধ করি না তাই আমার জীবন-দর্শন কি তা বলতে ইতস্তত করি।" তবে তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে মিস্টিকাল কোনও ফিলসফির তাঁর ঝোঁক বেশি যুক্তি গ্রাহ্য চিন্তার প্রতি—সে পরিমাণে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের জলধারা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। এই পৃথিবীর প্রতি আসক্তি ও আগ্রহ তাঁকে কর্মে উৎসাহ দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন "Essentially I am interested in this World."—তবে আত্মা, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন:

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"যেহেতু আমার বাতাবরণে এই বিশ্বাসগুলি রয়েছে তাই আমার মন এগুলির প্রতি বিরূপ নয়। যদি সত্যিই আত্মা থাকে তবে সে আত্মা দৈহিক মৃত্যুতে নষ্ট নাও হতে পারে, তবে এ জাতীয় কল্পনা আমার কাছে ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ নয়। আমি এগুলিকে দার্শনিক জিজ্ঞাসার (intellectual speculation) পর্যায়ে ফেলি।"—বেদান্ত সম্বন্ধে মন্তব্যটাও তাঁর মনোভঙ্গীর প্রকাশক। তিনি নাকি বেদান্ত জাতীয় অস্পষ্ট ও অবয়ববিহীন চিন্তাকে ভয় পেতেন। পক্ষান্তরে বহুবার তিনি বলেছেন যে বিজ্ঞানের শিক্ষা কিংবা মার্কস্-এঙ্গেল্সের লেখা তাঁকে খুব প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সব কিছু সম্বন্ধেই মনকে তিনি সন্দেহমুক্ত রেখেছিলেন, কিন্তু যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, যা মূলত ধর্মবিশ্বাসের বস্তু তার প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হয় নি, মনের ধাঁচটাই তাঁর এমন।

অতীতের চেয়ে বর্তমানই তাঁর মনকে বেশি আকৃষ্ট করেছে এবং অতীতের গৌরব স্বীকার করেছেন ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হিসেবে। ভারতের উজ্জ্বল ঐতিহ্য তাঁকে ভরসা দিয়েছে যে তমসাবৃত বর্তমানেই সব নয় এবং ভবিষ্যৎ যদিও অনিশ্চিত এবং সম্ভবত অন্ধকার তবু দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যেতে হয় কারণ "nothing that happens is likely to overcome the spirit of man which has survived so many perils. (যাই ঘটুক না কেন মানুষের আত্মা হার মানবে না কারণ আজ পর্যন্ত অসংখ্য বিপদ সে কাটিয়ে এসেছে)।

ধর্মকে তিনি নাকচ করে দেন নি, অসংখ্য মানুষের আত্মিক শান্তির জন্য এর প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারেন নি; একথাও বলেছেন যে ধর্মের কল্যাণে আমরা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মানুষকে পৃথিবীতে পেয়েছি; আবার একই সঙ্গে ধর্মের সংকীর্ণ আর নিষ্ঠুর দিকটিও তুলে ধরেছেন কারণ দুদিক দেখতে পাওয়াই যুক্তিবাদী মনের ধর্ম। এই জন্যই জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যেও এক দেশদর্শিতা নেই—উচ্ছ্বাসকে সংযত করেছে বুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে একটা সমস্যার কথা মনে পড়ে জাতীয় ঐতিহ্যকে দোষেগুণে একান্তই আমার বলে না পেলে কি মানুষ নিজেকে ছিন্নমূল বোধ করে? সেইজন্যই কি তাঁর মনে হত: "Indeed I often wonder if I represent anyone at all...I have become a queer mixture of the East and West, out of place everywhere, at home nowhere...in my own country I have an exile's feelings. (প্রায়ই আমি ভাবি আমি কি কারুরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারি?...আমি যেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সবখানেই যেন আমি বেমানান, কোথাও যেন ঘর নেই।...স্বদেশেও মাঝে মাঝে নিজেকে যেন নির্বাসিত মনে হয়।)

হয়, হোক। তাতে ক্ষতি কি? এই পৃথিবীতে সবাই কি আমরা নির্বাসিত নই? সেইজন্য জবাহরলালের সঙ্গে আমরা অনেকেই একমত যখন তিনি বলেন, "I can imagine myself feeling at home in the old Indian or Greek pagan and pantheistic atmosphere, but minus the conception of God or Gods that was attached to it. অর্থাৎ শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যই নয় বিশ্বের ঐতিহ্যও তাঁর মনোভূমির ভিত্তি।

নবজাতক শ্রাবণ ১৩৭১, পৃষ্ঠা ৯৩-১০১

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইন্দিরা গান্ধী—আমার বিস্ময়

মাত্র একবার হাত-দুয়েকের ব্যবধানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মুখোমুখি দেখেছিলাম। চোখে ধরা এই একটি ছবির সঙ্গে যখনই ক্যামেরায় ধরা তাঁর অসংখ্য ছবিকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছি একটা পার্থক্য লক্ষ্য না করে পারি নি। ক্যামেরার ছবিতে তাঁর মুখাবয়বে, বিশেষত তাঁর তীক্ষ্ম নাসায় আর অধরোষ্ঠের সুস্পষ্ট রেখায় প্রায় উদ্ধত এক দার্ঢ্য দেখতে পাই। অথচ মুখোমুখি তাঁকে অনেক বেশি মোলায়েম আর মাধুর্যময়ী মনে হয়েছিল। অসামান্য সুন্দরী আর প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই নেত্রীর ভাবমূর্তি কখনো কখনো আমার চোখে তাঁর নীতিবর্জিত রাজনীতির ছোপ লেগে মলিন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ তাঁর মহৎ মৃত্যু সেই সব মালিন্য মার্জনা করে এক অক্ষয় শুভ্র দীপ্তি দিয়েছে তাঁর স্বভাব-সুন্দর আকৃতিকে।

ধর্ম নিরপেক্ষতা তাঁর রাজনৈতিক চরিত্রের এবং ভারতীয় রাজনীতির শ্রদ্ধেয়তম আদর্শ। এর জন্যেই যে তাঁকে প্রাণ দিতে হল এটা একই কালে তাঁর পক্ষে যত বড় সৌভাগ্য আমাদের পক্ষে ততখানিই দুর্ভাগ্য। মহাত্মাজীর মতন তিনিও ধর্মান্ধতার বলি। সাঁইত্রিশ বৎসরে এই দেশের ধর্মমূঢ়তা একচুলও কমে নি। ভরতের অখণ্ডতাকে যে এই পাপ একই রকম, অথচ আরো বেশি বিপন্ন করে রেখেছে তার শেষতম প্রমাণ পাবার পর দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আসে চোখে।

এমন মৃত্যু যে তাঁর অপ্রত্যাশিত ছিল না বরং প্রায় ঈপ্সিতই ছিল সে-কথা তাঁর মুখেই আমরা শুনেছি। সদ্য উড়িষ্যা সফরের সময়েও তিনি জনসভায় বলেছেন যে তাঁর শেষ রক্তবিন্দুও দেশের সেবায় উৎসর্গিত। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে থেকে চিত্র পরিচালক পিতর উস্তিনভ মুভি ক্যামেরা নিয়ে তাঁর অষ্টপ্রহরের সঙ্গী হয়েছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারীর সুযোগ পেয়েছিলেন। এই চিত্র পরিচালকের মনে হয়েছিল যে দেশের প্রয়োজনে ইন্দিরা গান্ধীকে যে সব ঝুঁকি নিতে হচ্ছিল তার পরিণামে যে-কোনো সময়েই যে তাঁকে আততায়ীর আকস্মিক আক্রমণের শিকার হতে পারে সে-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। তবু নিয়তির অশুভ বিধান নিয়ে দুর্ভাবনাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কারণ এ বিষয়ে তাঁর স্বভাবে একটা অভিজাত অনীহা ছিল। উস্তিনভ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "She thought it her duty and right to rule."

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে তিনি চিত্তকে ভাবনাহীন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন উস্তিনভের এই ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। অথচ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁকে দুই দশকেরও অধিককাল ধরে দেখতে অভ্যস্ত তাঁর দেশবাসীরা জানেন যে উপরোক্ত এই আশঙ্কাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরুদ্ধ পক্ষ থাকবেই। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীও সারা দেশে কম নেই। কিন্তু যে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর দলের বিরুদ্ধতা করছে সেগুলি তাঁর নিজের দলের চেয়ে যে বেশি হিংসাশ্রয়ী এ অভিযোগ করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা নেই। অথচ প্রায়ই জনসভায় তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি যে যেন তেন প্রকারেণ তাঁকে ক্ষমতা থেকে অপসৃত করতে বদ্ধ পরিকর কেবল তাই নয়, তাঁর জীবননাশের জন্যও ষড়যন্ত্র করছেন এঁরা।

মানুষের উত্থান-পতন অনুধাবনে আগ্রহী তাঁর বিদগ্ধ পিতা জেলখানায় বসেও পত্রযোগে বালিকা কন্যাকে ইতিহাসের পাঠ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন একথা সকলেই জানেন। সেই সঙ্গে একথাও নিশ্চয়ই সকলে লক্ষ্য করেছেন যে উত্তরোত্তর এঁরা বংশানুক্রমে পিতা-দুহিতা-দৌহিত্র ইতিহাস-পাঠে যত না অভিরুচি অর্জন করেছেন ইতিহাস সৃষ্টি করায় তার চেয়ে বেশি উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। আর ইতিহাস সৃষ্টি করার অর্থাৎ বিরাট জনগোষ্ঠীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের উন্মাদনা যাঁকে পেয়ে বসে তাঁর পক্ষে এর চেয়ে বরণীয় মৃত্যু আর নেই।

জন্মসূত্রেই হোক অথবা চরিত্র গঠনের সুপরিকল্পিত আয়োজনের ফলেই হোক, তাঁর চারিত্র্যের একটি নান্দনিক সৌকুমার্য ছিল। পৃথিবীর আর কোনো দেশের প্রধান মন্ত্রীর বর্ষার প্রথম বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ, বুনো ফুল, আদ্যিকালের বুড়ো গাছপালা ভালো লাগে জানি না। কেই বা পরজন্মে আদিবাসী মেয়ে হয়ে জন্মাতে চেয়েছেন? সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত, অভিনয় নৃত্যকলা সবই তাঁর উষ্ণ সমর্থনের বিষয় ছিল। অসংখ্য শিল্পীর তিনি উৎসাহদাত্রী। তাঁর ব্যক্তি-সত্তার বুনটে নান্দনিক সংবেদনশীলতাই সবচেয়ে উজ্জ্বল-বর্ণ আর টেঁকসই তন্তু। সেই সহজাত সৌন্দর্যবোধ তাঁর ব্যক্তিগত আচরণে অনেকেই অনুভব করেছেন বলে শুনেছি।

এত পরিশীলিত মানুষ ছিলেন বলেই আমি মাঝে মাঝে বড় বিস্ময় বোধ করেছি যখন দেখেছি অতি স্থূলরুচি উচ্চাভিলাষী মানুষেরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন। এঁরা শুধু যে তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছেন তাই নয়, তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারও পেয়েছেন। তাঁর নামাঙ্কিত রাজনৈতিক দলে যাঁরা তাঁকে অহরহ ঘিরে থেকেছেন তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই তাঁর রুচির সাদৃশ্য কি করে সম্ভব হয়েছে সেটাই আমি ভেবে পাই নি। যত তিনি প্রবল হতে থেকেছেন ততই কংগ্রেস দল ভাঙতে ভাঙতে এমন একটি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে যোগ্যতায় ও কর্তৃত্বে দলের মধ্যে কেউই আর তাঁর সমকক্ষ থাকে নি। কেউ কেউ এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন, এই যে অথর্ব বৃদ্ধদের বিদায় করে তরুণদের নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এলেন দলে এত কংগ্রেসে নতুন প্রাণ সঞ্চার হল, এটা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ। তারুণ্যের জয়গান করতে আমারও আপত্তি হত না যদি না দেখতাম এই তরুণেরা নিতান্তই তাঁরই প্রতিফলিত গৌরবে ভাস্বর। আজ তাঁর পরিত্যক্ত মন্ত্রীসভায় তাঁর স্বহস্তে বাছাই করা প্রাণবন্ত তরুণদের মধ্যে একজনকেও পাওয়া গেল না যিনি আপৎকালেও সাময়িকভাবে তাঁর কাজের ভার গ্রহণ করতে সক্ষম। সেই তাঁর অনভিজ্ঞ আত্মজকেই টেনে এনে সামনে দাঁড় করাতে হল প্রতীকী ভূমিকায়। প্রায় চার দশক হতে চলল দেশ স্বাধীন হয়েছে। এতদিনেও যদি দেশে গণতান্ত্রিক মেজাজ আর প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠে থাকে তার জন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষকেই দায়ী করা সঙ্গত নয়, তা আমি জানি। কিন্তু সর্বময় ক্ষমতায় যিনি আসীন তাঁর উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব বর্তায় যোগ্যের সন্ধান করে ক্ষমতাকে ভাগ করে দেবার। সমাজতাত্ত্বিকেরা অন্তত সমস্যাটা বুঝে দেখবার চেষ্টা করুন, কেন স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ঊর্ধ্বার্ধ (Vertical) মেরুদণ্ডের মানুষ ক্রমে লোপ পেয়ে আনুভৌমিক (horizontal) মেরুদণ্ডের মানুষেকে দ্রুত এই প্রকোপ হল। একটা কারণ অবশ্য Auden নিজেই বলে দিয়েছেন—আজ আনুভৌমিক মানুষেরই মূল্য আমাদের কাছে বেশি।

Let us honour if we can
The vertical man
Though we value none
But the horizontal one.

যাইহোক এই দ্রুত অবনয়নের ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র কি বৃহত্তম গড্ডালিকাতন্ত্রে পরিণত হল যেখানে দেশকে নেতৃত্ব দেবার মতো মানুষ একটি পরিবারে ছাড়া আর কোথাও জন্মায় না? এও আর এক বিস্ময়! ১৯৮৪ সালের এই ভারতীয় ছবিটা কোনো জর্জ অরওয়েল এঁকে যান নি।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পরে দেশ জুড়ে এমন আগুন জ্বলে ওঠে নি বটে, তবু আমার তখন মনে হয়েছিল যেন মানবিক মূল্যবোধের সার্বিক বিনাশ ঘটল। কৈশোরের অসংযত আবেগে আমাদের সর্বনাশকে কল্পনায় বাড়িয়ে তুলেছিলাম বলে আজও মনে হয় না। যদিও মহাত্মাজী যে কূট রাজনৈতিক আচরণেও পারঙ্গম ছিলেন একথা সে বয়সেও আমার অজানা ছিল না, শুধু প্রতিপক্ষ নয় তাঁর স্বপক্ষের অনুগামীদের কাছেও তিনি দুর্বোধ্য হয়ে উঠতেন। তা ছাড়াও সাম্যবাদের সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচয় ঘটায় সে সময়ে তাঁর প্রতি আমার মন সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। তবু একটি অচলা আস্থা ছিল যে গান্ধীজী রাজনীতিকে নীতিবিশুদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে ব্যর্থকাম হলেও তিনি বার বার চেষ্টা করেন তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক আচরণকেও চিরন্তন নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে যাচাই করে নিতে। উপেয় মহৎ হলেও নীতিভ্রষ্ট উপায় ক্ষমার্হ হয়নি তাঁর চোখে। আপামর জনসাধারণকে নৈতিকতার যে স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন তা কখনো কখনো বাতুলতা মনে হয়েছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়তো, কিন্তু তাঁর কথায় অবিশ্বাস করিনি যে, "For me God and Truth are convertible terms and if anyone told me that God was a god of untruth or a god of torture, I would decline to worship Him. Therefore, in politics also we have to establish the Kingdom of Heaven."

সত্য আর ঈশ্বর তাঁর কাছে সমার্থক এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর ঘোষিত লক্ষ্য। স্বাধীনতা পাবার পর এত অল্পকালের মধ্যেই যদি তাঁকে সরে যেতে না হত তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনের কিছু কি গুণগত উন্নতি হত না? মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর ধার্মিক জীবনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রায় একক প্রয়াসে অর্জিত এই পুণ্যের পুঁজি, উত্তরসূরীরা ক্রমে যত দেউলিয়া হয়েছেন ততই নিঃশেষে ব্যয় করেছেন দুহাতে, নিজেদের আত্মিক দৈন্য ঢাকবার নিরর্থক চেষ্টায়।

আমাদের আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় রাজনীতি অন্য যে-কোনো দেশের মতোই স্বার্থপ্রণোদিত নয় কিংবা প্রয়োজনমতো ছলনাশ্রয়ী হয় না, আমাদের কর্ণধারদের এই দাবি বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করেছে কিনা সেকথা আপাতত অবান্তর। কিন্তু দেশের বহু মানুষ যে করেছে সেকথা সত্য। আমরা যারা করিনি তাদেরও বহুদিন গান্ধীবাদী আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে মনে মনে এমন একটা প্রত্যাশা রয়েছে যে রাজনীতিকে নৈতিক মানের একটা উঁচু ধাপে রাখা একান্ত অসম্ভব নয় এবং গান্ধীজির এই রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে নিতান্তই গালভরা মুখের কথা নয়, যার প্রয়োজন ঘটে শুধু আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে।

মহাত্মাজীর হাতে গড়া আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী দেশ গড়ার ব্যাপারে গুরুর অনুগামী হননি বটে তবু তাঁর পঞ্চশীল কিংবা জোট নিরপেক্ষতার আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তিতে তো গান্ধীবাদী আদর্শ কিছুটা ছিল। অবশ্য এদিকে সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে যে 'লাইসেন্স-পারমিট রাজ' তৈরি হয়েছে তার জন্যও তাঁকে দায়িত্বমুক্ত করা যায় না ঠিকই। এবং শাসন যন্ত্রটিও জনসাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত একটি পেষণ যন্ত্রে পরিণত হয়ে উঠেছে। তবু তাঁর রাজনৈতিক আচরণ ও কৌশল সম্পূর্ণ বিবেক বর্জিত হয়ে যায় নি। শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বকালে ভারতীয় রাজনীতি যে ভাবে দ্রুত আমরাল, নির্বিবেক স্বার্থ সন্ধানী, অসহিষ্ণু ও স্লোগান সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল তা মহাত্মাজীর পরিমণ্ডলে লালিত, স্বল্পকালের জন্য হলেও রবীন্দ্রনাথের পরিবেশে শিক্ষিত, ল্যাস্কির এই শিষ্যার কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না। সদাজাগ্রত সমালোচক প্রেসকে নেহরু অন্তত গণতন্ত্রের আপদ বলে মনে করেন নি। নেহরুর কন্যা বলেই শুধু নয়, এমন শোভনরুচির বুদ্ধিমান মানুষ বলেও তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক বড় ছিল।

সেইসব বহু প্রত্যাশাপূরণ না হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ্যে তাঁর প্রতি আবেগোচ্ছল আনুগত্যের অভাব হয়নি একথাও সত্য। ইন্দিরা গান্ধীর জীবিতকালেও বহুবার ভেবেছি। এদেশের মানুষের মনে মাতৃপূজার যে সনাতন প্রশস্ত বেদীটি পাতা আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেটি সহজেই তিনি অধিকার করে বসতে পেরেছেন। তিনি ক্রমে আয়ত্ত করেছিলেন অপ্রত্যাশিত রকম তীক্ষ্ম, কূটবুদ্ধি, রণ কৌশলে প্রায়ই তিনি ছিলেন অপরাজিতা আর ছিল তাঁর সিংহীর বিক্রম। ফলে শুধু শিল্পী হুসেনের চোখেই নয়, অধিকাংশ ভারতীয়ের চোখেই তিনি দেবী দুর্গার বাস্তব প্রতিরূপ—যা দেবী শক্তি রূপেন সংস্থিতা। এবং মাতৃরূপেও। ইদানীং বহু গ্রামীণ জনসভায় তিনি বলতে ভালোবাসতেন যে প্রত্যেকটি ভারতীয়ই তাঁর সন্তান। প্রজার সঙ্গে এই পরিচিত সহজবোধ্য সম্পর্ক এ দেশের সর্ব সাধারণের কাছে তাঁকে ঘরের মানুষ করে নিয়েছিল।

ভারতের আত্মাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁর পিতা লিখেছিলেন, "Often, as I wandered from meeting to meeting. I spoke to my audience of this India of ours, of Hindustan and of Bharatmata...I seldom did so in the cities for there the audiences were more sophisticated and wanted stronger fare...sometimes as I reached a gathering a great roar of welcome would greet me: Bharatmata Ki Jai." জবাহরলাল আবার একটু বেশি সূক্ষ্ম বিচারে অভ্যস্ত ছিলেন কিনা—নয়তো গ্রাম আর নগরে এ ব্যাপারে তফাৎ করার খুব কি প্রয়োজন ছিল? কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, ভুজ থেকে অরুণাচল—একটিই তো সুবিস্তৃত গ্রাম। এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে "ভারতমাতার" রক্তমাংসের প্রতিমা হয়ে উঠতে ইন্দিরার তো কোনো অসুবিধা হয়নি। "Indira is India" এই উক্তি তো তথাকথিত কোনো গ্রামের মানুষের নয়।

"ঘরে বাইরে"-তে সন্দীপের সেই পরিকল্পনাটা প্রায়ই স্মরণে আসে। "অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল, তারা বললে, আচ্ছা একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পুজোর রথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।"

এই প্রতিমা বানালেও যে চলে না তা নয়। সম্প্রতি হিন্দি ফিল্ম মারফৎ একটি প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়নি কি? আবার এতদিন যে প্রতিমা চলে আসছে সেটি যদি হয় তবে তো আরো ভালো। 'ভারতমাতা', 'দেবী দুর্গা' সবই মিলে মিশে একাকার হয়ে পূজার বেদীতে স্থান পায় আমাদের সমন্বয়-প্রবণ দেশে।

বঙ্কিম এমনি একটি সমন্বিতা প্রতিমা গড়ায় হাত দিয়েছিলেন যার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন মন্দিরে মন্দিরে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা পায় সবাই—নেহরুও—মন্দির গড়বার কাজটুকু করে দিয়েছিলেন। কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল পূর্বাহ্নেই। দেবী প্রতিমা মানবীর রূপ ধরে সেখানে এসে বসতে বিলম্ব করেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো পুরুষের পক্ষে, সম্ভবত মহাত্মাজীর পক্ষেও এত দ্রুত জনচিত্ত অধিকার করা সম্ভব হয়নি। মার্গারেট থ্যাচার কিংবা জেরাল্ডিন ফেরারোর দেশের তুলনায় যে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার মান অতি নগণ্য, তথাকথিত নারী মুক্তি আন্দোলনের রব যে দেশে ওঠে নি বললেই চলে এবং সর্বক্ষেত্রেই যে দেশে পুরুষ প্রাধান্য অপ্রতিহত, সে দেশেই যে দুই দশক ধরে ইন্দিরা গান্ধী দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে যেতে পারলেন, এই আপাত-বিস্ময়ের ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের আবহমান কালের ঐতিহ্যে।

তথাকথিত নাগরিক সফিস্টিকেশানের অহঙ্কার যাঁদের আছে তাঁদের আনুগত্য পেতেই বা কেন অসুবিধা হবে শ্রীমতী গান্ধীর? তিনি সনাতনকে খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে মেলাতে পেরেছিলেন অধুনাতনের সঙ্গে। সমারভিল কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্রীর আধুনিকতা সম্বন্ধেও কোনো সংশয় থাকবার কারণ আছে কি? উনি শুধু শিল্পের উৎসাহদাত্রী নন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চারও উৎসাহদাত্রী। আবার ভারতীয় মানসের চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষ, আধ্যাত্মিকতা, সদগুরুর সন্ধান সবই মেলাতে পেরেছিলেন তিনি। পিতার চেয়ে এ বিষয়ে অনেক খোলা মন ছিল নাকি তাঁর? জবাহরলালের জীবনী রচয়িতা ডঃ গোপালের অভিমত, শেষ বয়সে তিনি হিন্দু অজ্ঞবাদী (Hindu Agnostic) হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম জীবনের সেই বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতন্ত্র গড়ে তোলার জেদটা কমে গিয়েছিল।

শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যৎকালের দিকেও শ্রীমতী গান্ধীর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল তার প্রমাণ মেলে ১৯৭০ সালে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ থেকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বেপরোয়া বিকাশ যাতে আগামী দিনের মানুষের পক্ষে পৃথিবীটাকে অসহনীয় করে না তোলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে তিনি বলেছিলেন সময় দ্রুত বয়ে চলেছে। বিত্তবান দেশের এক একটি নতুন আবিষ্কার, কারু কৌশলের এক একটি অগ্রগতির ধাপ, বিত্ত সমৃদ্ধ দেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান কয়েক যোজন বাড়িয়ে তুলছে। আমরা সর্বশক্তি দিয়ে দৌড়ে চললেও অন্যদের তুলনায় সে দৌড় হামাগুড়ির সমান। তবু সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, তারা যে ভুল করেছে, সে ভুল পরিহার করা যেত, আমরা যেন সেই একই ভুল না করি।

"এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণকেই প্রগতি বলে ভাবা হচ্ছিল। প্রকৃতি বিজয়ের এই ভ্রান্ত মনস্তত্ত্বের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা মানুষ, চূর্ণবিচূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিষদুষ্ট পারিপার্শ্বিক।" ("অকৃত্রিম আধুনিকতা", যুগান্তর, ২ নভেম্বর, ১৯৮৪)।

তাঁর এই সাবধানবাণী অত্যন্তই সময়োচিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-চর্চার উন্মাদনায় দেশবাসীর একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। খবরের কাগজে পড়ে মনে হয়েছিল যে উপরোক্ত এই সব কারণেই আমেথির গ্রামীণ পরিবেশে চার পাঁচটি ভারী শিল্প-উদ্যোগের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনার সময় বিশেষজ্ঞরা আপত্তি করেছিলেন। সরকার অবশ্য সে আপত্তিকে আমল দেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর কর্মে ও ভাবনায় পরস্পরবিরোধ যথেষ্টই ছিল। মনে হয় ইন্দিরা চরিত্রের মধ্যেই বেশ কিছু স্ববিরোধ ছিল। অল্প বিস্তর সবারই থাকে। তাঁর স্ব-ভাব তাঁকে যে-কর্ম, যে-ভাবনা, আত্মস্ফুরণের যে ক্ষেত্র বেছে নিতে প্রবর্তনা দিত, ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোত তাঁকে বোধহয় তার থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর মতন প্রতিভাময়ীর পক্ষে সেটা ছিল একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি যা হয়ে উঠলেন সেটা বিস্ময়কর উত্তরণ বটে, কিন্তু সম্ভবত ভিতরের একটি আত্ম সমালোচক অতৃপ্ত মানুষ এমন অভাবিত সাফল্যকেও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকত। অবশ্য অল্প বয়স থেকেই যে তিনি ভীড়ের মাঝখানেও নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের ভিতরে ডুবে যেতে পারতেন সে কথা এক সাক্ষাৎকারে তিনি শান্তিনিকেতনের ইতিহাস-রচয়িত্রী উমা দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, "I think what I learnt most in Santiniketan was the ability to live quietly within myself, no matter what was happening outside. This always helped me to survive."। একেবারে শেষের কদিন তাঁকে যা দেখেছেন উস্তিনভ, তাতেও ঐ একই কথার সমর্থন মেলে, "for long moments Mrs. Gandhi would retire into herself. She seemed to become an island of solitude."। তাঁর এই দ্বৈপায়ন সত্তাকে উন্মোচন করতে পারলে হয়তো কিছু বিস্ময়কর আত্মখণ্ডনের উত্তর মিলত।

জওহরলালকে সমসাময়িক অনেকেই ভারতীয় ইতিহাসের হ্যামলেট আখ্যা দিয়েছিলেন। ইনটেলেকচুয়াল বলে তাঁর খ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল বলেই বোধহয় তিনি প্রায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হতেন পথ বেছে নিতে, অর্থনীতি রাজনীতি সমরনীতি—সব ক্ষেত্রেই। ইন্দিরা গান্ধীর এই দুর্বলতা ছিল এটা সর্ববাদী স্বীকৃত। নেহরুর অমরকীর্তি কি? ভিলাই? রাউরকেলা? আসওয়ান বাঁধ? সাহিত্য আকাদমী? Discovery of India? তালিকা দীর্ঘ অবশ্যই করা যায়, তবে আমার পক্ষপাতিত্ব শেষোক্তটির দিকে। ইন্দিরা গান্ধীর অমর কীর্তির তালিকা প্রস্তুত করার সময় এখনই হয়নি। ইতিমধ্যে এইটুকু স্বীকার করি যে অশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন আমাদের সদ্য নিহত প্রধানমন্ত্রী, যে কোনো দেশের যে কোনো কালের একটি সম্রাজ্ঞী এত রূপগুণের অধিকারিণী হলে চিরস্মরণীয়া হয়ে থাকেন।

তবে আমরা কেউ কেউ গণতন্ত্র চেয়েছিলাম।

দেশ, বর্ষ ৫২, সং ৫ (১।১২।১৯৮৪), পৃঃ ৬৭-৬৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ লোকনায়ক

জয়প্রকাশ নারায়ণ বর্তমান ভারতীয় রাজনীতি মঞ্চের সবচেয়ে ব্যর্থ নায়ক। অবশ্য তেমন করে দেখতে গেলে সার্থক আর কে? স্বয়ং গান্ধিই বা সিদ্ধকাম হয়েছিলেন কতটুকু? আসমুদ্র হিমাচল এই ভূখণ্ডের জনগণমন অধিনায়ক অন্তত কয়েক বছরের জন্যও যদি কেউ হয়ে থাকেন তবে তিনি গান্ধি। অথচ স্বাধীনতার প্রথম কয়েক মাসেই তাঁর রামরাজ্যের চিন্তা জ্বলতে দেখে গেছেন তিনি এই ভাঙা দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে। রাজনৈতিক যেরকম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তখন দেশে, যে ধরনের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু করেছিলেন নেতারা, রাজধানী-কেন্দ্রিক যে প্রশাসন ব্যবস্থা রাত না পোহাতেই নতুন জাতীয় সরকারেরও আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছিল এবং সর্বোপরি যে তৎপরতার সঙ্গে দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত জনসেবকরা সাম্রাজ্যবাদীদের পরিত্যক্ত গদিগুলি দখল করতে পেরেছিলেন—সেসবের কোনটাই তো গান্ধিকে আশ্বাস দেবার মতন ছিলনা। এমন কি কংগ্রেস নামক যে প্রতিষ্ঠানটি বলতে গেলে একরকম তাঁরই হাতে গড়া, সেই কংগ্রেসের স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে কী কর্তব্য হবে বা কেমন রূপ হবে সে বিষয়েও তো তাঁর ইচ্ছার ও নির্দেশের মর্যাদা রক্ষা করেননি তাঁর স্নেহপুষ্ট অনুজ নেতারা। অথচ ভারতবর্ষের জনমানসে একদা গান্ধির প্রভাব মহাবীর কিংবা বুদ্ধের প্রভাবের চেয়েও বিস্তৃততর ছিলনা কি? কিন্তু সে প্রভাবের গভীরতা যে আ-ত্বক মাত্র তা তো গান্ধি স্বচক্ষেই দেখে গেছেন মৃত্যুর পূর্বে।

স্বাধীন ভারতের সরকারি নীতি হিসেবে গান্ধিবাদের মৃত্যু গান্ধির মৃত্যুর পূর্বেই ঘটেছিল। তাই বলা অসঙ্গত হবে না যে গান্ধির চেয়ে শক্তিমান ও সার্থকতর জননেতাও এদেশে বিশেষ জন্মাননি, আবার তাঁর নেতৃত্বের ব্যর্থতারও তুলনা নেই। ব্যর্থতার পরিমাপ তো আমরা প্রত্যাশার অনুপাতেই করব! রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি নৈতিক সর্বব্যাপী বিপ্লবের কথা চিন্তা করেছিলেন গান্ধি এবং এতবড়ো অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন বিনা রক্তপাতে। তাঁর সেই প্রত্যাশার এক কড়াও পূর্ণ হয়নি আজো, আমাদের জীবদ্দশায় হবে এমন কোন লক্ষণও নেই। স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনকে এক অভিনব হাতিয়ার দিয়ে তাকে কতক পরিমাণে তাঁর মনের মতন একটা রূপ দিতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু দেশকে তাঁর পরিকল্পিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোন রূপ দিয়ে যেতে পারেননি—কেবল সাড়ে পাঁচ মাস নয়, আরো সাড়ে পাঁচ বছর বেঁচে থাকলেও পারতেন কিনা সন্দেহ। তবে কি বলব সত্যাগ্রহের নঙর্থক শক্তি যতখানি সদর্শক শক্তি ততখানি নেই? বলা হত সত্যাগ্রহ শোষণ-পীড়নকে নাশ করে, শোষক-পীড়ককে নয়। কিন্তু কার্যত দেখছি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়নের সহজ-নিরীক্ষ্য যন্ত্রটিকে বিকল করে দেবার ব্যাপারে সত্যাগ্রহের যদি বা কিছু করণীয় থাকে, সমাজের সর্বস্তরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বহুদূর ছড়িয়ে পড়া শোষণ ও পীড়নের সহস্রমুখী সূক্ষ্ম ও দুর্নিরীক্ষ্য শিকড়গুলিকে নিঃশেষে উপড়ে আনা সত্যাগ্রহেরও কাজ নয়, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের তো নয়ই। আর বিকল্প কোন সমাজবিন্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে যে প্রায় কোন প্রেরণাই জোগাতে পারেনা গান্ধিবাদ সে তো আমরা ত্রিশ বছর ধরেই দেখে চলেছি। অর্থাৎ গান্ধির ঋণাত্মক ভূমিকা যদি বা কিছু ছিল, ধনাত্মক ভূমিকা কি শূন্যের কাছাকাছি নয়? ব্যবহারিক সার্থকতা যদি কোন 'বাদ'-এর ব্যর্থতা-সার্থকতার মাপকাঠি হয়, হবে নাই বা কেন, তাহলে গান্ধিবাদ বিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে ত্রুটি কোথায়?

তুলনায় জয়প্রকাশের ব্যর্থতা প্রায় জীবনব্যাপী। মানুষ হিসেবে তিনি উত্তরোত্তর যত মহত্ত্ব অর্জন করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক বোধ ও দৃষ্টি ক্রমে যত গভীর ও ব্যপ্ত হয়েছে, জননেতা হিসেবে ততই তিনি কম আকর্ষণ হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। ১৯৭৪-৭৫ সালের গণ আন্দোলন, যার পরিণতি সাম্প্রতিক জরুরি অবস্থা—তার উল্লেখ করে কেউ হয়তো আমার এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারেন। বলতে পারেন যে সেদিন সহস্র সহস্র লোক পথে এসেছিল জয়প্রকাশেরই আহ্বানে। কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে তাৎক্ষণিক এবং উত্তেজক এইসব আন্দোলন, সভা, শোভাযাত্রা, আইন অমান্য ইত্যাদি কর্মে যারা যোগ দিয়েছিল তখন, তারা সবাই এখন কেমন বধির হয়ে রয়েছে জয়প্রকাশের আসল কর্মপরিকল্পনায় যোগ দেবার আমন্ত্রণে। ক-টি লোকসমিতি গঠন করা হয়েছে অদ্যাবধি? স্থানীয় বা জাতীয় ক-টি সমস্যা নিয়ে সত্যিকারের গঠনমূলক কাজ শুরু হয়েছিল সেদিন অথবা শুরু হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে আজ? এর কারণ, সীমিত রাজনৈতিক কর্ম থেকে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের মানুষেরও তো উত্তরণ ঘটেনি। দেশের রাজনৈতিক চিন্তা তো সমান বেগে পরিণতি লাভ করেনি। ফলে ১৯৪২ সালে যাঁরা তাঁর সহকর্মী অনুগামী ছিলেন শুধু তাঁদেরই নয়, যাঁরা তাঁর তীব্র সমালোচক ছিলেন তাঁদেরও অনেক পিছনে ফেলে তিনি চলে এসেছেন পরবর্তী ১৫ বছরে। আবার ১৯৬৪-তে যাঁরা তাঁর সহগামী ছিলেন ১৯৭৪-এ তাঁরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন জয়প্রকাশের রাজনীতিক সঙ্গ থেকে। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর শত্রু-মিত্র অনেকেই বেশি দিন তাঁর নাগাল পাননি, তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারেননি। অগত্যা তাঁরা জয়প্রকাশকে নীতিভ্রষ্ট, বহুরূপী, সুবিধাবাদী, অস্থিরচিত্ত ইত্যাদি গালি দিয়ে নিজেদের বিবেককে শান্ত রেখেছেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বোধ ও পরিকল্পনার যেন ক্রমবিকাশ নেই। যেন অনড় অচল হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকাতেই রাজনৈতিক সততার পরাকাষ্ঠা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মার্কস প্রদর্শিত পন্থায় যতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তার সীমা প্রত্যক্ষ করে যদি কেউ সেই পথ পরিত্যাগ করে সর্বোদয়ের পথে আরও মৌলিক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় এবং অবশেষে সে পথেও যথাস্থানে পৌঁছবার বিলম্ব দেখে নতুনতর পথের সন্ধান করতে থাকে তবে যে সে ব্যক্তি বহুলোকের সন্দেহভাজন হবে এবং অনাস্থা অর্জন করবে এতে আর আশ্চর্য কি? কারণ এ জাতীয় মানুষ আমাদের পক্ষে বেশ দুর্বোধ্য বই কি!

জয়প্রকাশের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই জনৈক অনুরাগী অল্পকাল পূর্বে লিখেছেন: His call for struggle against basic maladies of our society has received a tremendous response from the people. In his exhortations they find the expression of their feelings and aspirations. His optimistic assertion for total revolution and building up a new social order radiates hope and enthusiasm to the oppressed.

জয়প্রকাশের কীর্তির এই মূল্যায়ন বড়ো করুণ, তাঁর পক্ষেও, আমাদের পক্ষেও। আমাদের মৌলিক সব সমস্যা সমাধানের কাজে জয়প্রকাশের আহ্বানে নাকি বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে! হায় ঈশ্বর! ভগ্ন পরিত্যক্ত এই মানুষটির প্রতি এ যেন পরিহাসের মতন শোনায়। তাঁর বাণীতে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ শুনবার মতন কান বা মন যদি সত্যিই তৈরি থাকত তাঁর দেশবাসীর, তবে চতুর্দিকে এই নিরুপায় আত্মসমর্পণ কেন?—কোথাও জনতা রাজের উচ্ছৃঙ্খল পায়ে কোথাও বা মার্কসীয় রাজের নির্মম হাতে! সর্বাত্মক বিপ্লবের, নতুন সমাজ ব্যবস্থার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তাতে যদি আমরা সত্যিই আশান্বিত হতাম, উদ্দীপিত হতাম—তবে এই নিঃসঙ্গ অবহেলিত পুরুষ অমূল্য এই শেষ ক'টি দিন পাটনার এক কোণে পড়ে থাকতেন না, দেশের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর স্থান হত। যা হওয়া উচিত ছিল, যেমনটা হলে দেশের মঙ্গল হত, তা হয়েই গেছে অর্থাৎ সে বিষয়ে আর করণীয় বাকি নেই—এমন ভয়ানক আত্মসন্তুষ্টি আমাদের সর্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত করে দেয়। এবং স্বীকার করা ভাল নয় কি যে জয়প্রকাশ ব্যর্থ হয়েছেন—আমরা আজো তাঁর পথে চলবার উপযুক্ত হয়ে উঠিনি!

ইতিপূর্বে উদ্ধৃত জনৈক অনুরাগীর বক্তব্য আরো একটুখানি উদ্ধৃত করি J. P. has been essentially a man of action. But in the realm of ideas he has always been an explorer of truth. In his zeal to fathom new horizons one finds sometimes contradictions in his ideas. But there is unique coherence in his thought and it seeks a positive goal to usher in a new era free from oppression and exploitation.

এই উদ্ধৃতিটির প্রথম বাক্যটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জয়প্রকাশ কি মূলত কর্মী পুরুষ? তাঁর রাজনীতিতে দীক্ষা ও পরিণমন (maturation) কর্মের ভিতর দিয়ে; শিল্প শ্রমিক, রেলওয়ে শ্রমিক, কৃষিজীবী—সব শ্রেণীর শোষিত মানুষের মধ্যেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছেন সারা জীবন ধরে। পথ ভ্রান্ত ছাত্র সমাজ, সংশয় পীড়িত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও সেই কর্মক্ষেত্রের বাইরে থাকেনি। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি, এমন কি কখনও কখনও যে কোনও কোনও আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে এনে বলতে গেলে প্রায় পশ্চাদপসরণই করেছেন, এবং করে অশেষ নিন্দাভাজন হয়েছেন, তাঁর কারণ কী? আমার মনে হয় যে, কোন কর্মোদ্যোগ যদি ক্রমশ বৃহত্তর ক্ষেত্র উদঘাটন না করে, গভীরতর উপলব্ধির পথ প্রশস্ত না করে, তবে সেই সব সীমিত আন্দোলন, কয়েক টাকা মাইনে বা মাগ্‌গী ভাতা বাড়াবার 'বিপ্লব' কিংবা কয়েক বিঘা জমি আদায় করবার 'বিপ্লব' বেশি দিন তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি। বস্তুত এসব আন্দোলনও তাঁর দৃষ্টিকে ছোটো ছোটো সমস্যায় সীমিত করে রাখতে পারেনি—বরং দ্রুত কোন বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হবার উপলক্ষ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সংস্কার, সংগঠন, আন্দোলন—এইগুলি তাঁর কাছে উপেয় হয়ে উঠতে পারে নি—উপায় মাত্রই রয়ে গেছে, যা হওয়াই উচিত। কারণ এ জাতীয় নানা রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে যখন যুক্ত থেকেছেন তখনও চিন্তা থেকে তো অবসর নেন নি তিনি, চিন্তা করে গেছেন, ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতাগুলিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে রেখে গেছেন। বরং কর্মের সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর চিন্তা শক্ত মাটির মধ্যে তার শিকড় চালিয়ে যেতে পেরেছে, বায়বীয় কল্পনার ফানুসে পরিণত হয়নি তাঁর পরিকল্পনাগুলি।

কর্মী মানুষ এবং চিন্তক মানুষের মধ্যে বিরোধ কল্পনা আমাদের এমন মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, অমুক হলেন তাঁদের দলের থিয়োরেটিশিয়ান—অর্থাৎ দলের মস্তিষ্ক, তত্ত্ব নিয়েই যাঁর কারবার। অবশ্য দলের মধ্যে মস্তিষ্কের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই অন্তর্বিরোধ, মাথা ফাটাফাটি, দল ভাঙাভাঙিও বাড়তে থাকে। তাই প্রত্যেক দলনেতারই চেষ্টা থাকে মাথার সংখ্যা কমিয়ে হাত পায়ের সংখ্যা বাড়ানোর—অর্থাৎ ওই পার্টি ওয়ার্কারদের সংখ্যা বাড়ানোর। অবশ্য মাথাই যে সব অবস্থায় নেতৃত্ব করবে এমন না-ও হতে পারে। মাথার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সে কাজ করতে পারে অন্যশ্রেণীর জবরদস্ত মানুষও। তবু মাঝে মাঝেই এই ধরনের একটা শ্রেণীবিভাগ রাজনৈতিক দলে দেখা যায়, একদল কর্মী আরেক দল ভাবুক। থিয়োরী আর প্র্যাকটিসের মধ্যে বিচ্ছেদ যারা তত্ত্বগত ভাবে স্বীকার করেনা তাদের মধ্যেও এই শ্রেণীভাগ লক্ষ করা যায়। তবু বলব মানুষের সমাজে রাণী মৌমাছি ও মজুর মৌমাছির মধ্যে সরল রেখায় জাতিভেদ করে ফেলাটা বিপজ্জনক। মস্তিষ্কহীন পেশিসর্বস্ব মানুষ আর দুর্বলপেশি মস্তিষ্কময় মানুষ—এই রকম অবিমিশ্র দুইজাতের মানুষ নিয়ে আমাদের সমাজ নয়। বরং অধিকাংশ মানুষই আমরা মিশ্র শ্রেণীতে পড়ি। পড়াই ভাল। এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার যদি সত্যিই কোন ভূমিকা থাকে তবে মিশ্র সুষম মানুষ গড়তে চেষ্টা করাই উচিত।

কিন্তু আমি একথা বলব না যে মানুষে মানুষে তফাৎ নেই বা থাকবে না। কিছু কিছু মানুষ তত্ত্বে বেশি পারঙ্গম হবেন চিরকালই এবং অন্য কিছু কর্মে বেশি বলীয়ান হবেন। তবে আমি যে তৃতীয় মিশ্র শ্রেণীর উল্লেখ এই মাত্র করলাম তাদের মধ্যেও অসাধারণ কিছু ব্যক্তিত্ব কচিৎ দেখা যায়। এঁদের চিন্তাও যেমন স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ, কর্মেও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এঁদের তেমনি আগ্রহ ও দক্ষতা। আমাদের আশেপাশে যেসব 'Political beings' দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে পান্নালাল দাশগুপ্ত এই রকম মানুষ। আমার মনে হয় জয়প্রকাশকেও কর্মের স্থলচর বা চিন্তার নভোচর জাতীয় প্রাণী জ্ঞান না করে, উভচর শ্রেণীর মানুষ মনে করা সঙ্গত। উভয় তলেই এই শ্রেণীর মানুষ স্বচ্ছন্দ বিহারী। জয়প্রকাশ একই সঙ্গে man of action এবং man of contemplation বলে আমার বিশ্বাস, তবে তাঁর স্বভাবের পাল্লায় contemplation-এর দিকটাই বোধ হয় একটু ভারী। তাঁর রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতার কারণ সম্ভবত চিন্তার দিকে এই ঝোঁক। কর্মী মানুষকে এক ঠাঁই আঁকড়ে দাঁড়িয়ে কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে হয়, চিন্তককেই মানায় সত্যের পূর্ণতর রূপের সন্ধানে অবিরত চলা। এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় সঙ্গী পাওয়াও যেমন সহজ নয়, সার্থকতার কোন স্পষ্ট চেহারাও ধরা যায়না সহজে।

সমাজবাদী ভাবনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ৯-১৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জনতার বিশ মাস এমার্জেন্সীরাজ, জনতারাজ, কিছু বক্তব্য

ষষ্ঠ লোকসভা থেকে স্বাধিকার প্রমত্তা শ্রীমতী গান্ধির বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের উপর যবনিকা পড়ল। স্পষ্টতই এই নাটকের এখানেই শেষ নয়। জীবনেও যেমন রাজনীতিতেও তেমনি শেষ কথা বলে কিছু নেই। তবু দর্শকের আসনে বসে রুদ্ধশ্বাসে পরবর্তী অঙ্কের প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কি কিছু করণীয় আছে আমাদের? গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের ভূমিকা তো নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় নয়। সরকার ও বিরোধীপক্ষের প্রতিটি কাজের বিচার আমাদের মনে মনে হয়ে থাকে, অন্তত হওয়া দরকার। গণতন্ত্রের আসল সুপ্রীম কোর্ট জনহৃদয়ে। অতএব জনতা সরকারের কার্য্যকলাপকে কাঠগড়ায় তুলে দেখা যাক। গণতান্ত্রিক দায়িত্ব ও অধিকার বিষয়ে সচেতন এবং অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন একজন সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টি থেকে তার বিচার অসঙ্গত হবে না।

জরুরী অবস্থা জারী করার পর শ্রীমতী গান্ধির সরকার ঠিক বিশমাস ক্ষমতায় ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর মোরারজী দেশাইয়ের জনতা সরকারও সদ্য বিশমাস সম্পূর্ণ করল। এই পরবর্তী বিশমাসের বিচারের জন্য পূর্ববর্তী বিশমাসের পটভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। নয়ত ঘটনাগুলি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিত পায় না। এই কালের মধ্যে জনতা সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল আমাদের হৃত অধিকারগুলির অধিকাংশেরই প্রত্যার্পণ। কিন্তু নিতান্ত আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষের পক্ষেও এই অধিকারগুলি জল-হাওয়ার মতনই এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় যে তা থেকে যখন আমরা বঞ্চিত হই তখন প্রতি মুহূর্তে নিজেদের যতই না বিপন্ন বোধ করি, আবার ফিরে পাওয়া মাত্রই ভুলে যেতেও দেরী হয় না। তবু সেজন্য জনতা সরকারকে যথাপরিমান কৃতজ্ঞতা জানিয়েও প্রশ্ন করতে হয় এহ বাহ্য, এরপর কি? এই অধিকারগুলি উপায় মাত্র, উপেয় নয়। এরপর আমরা কোনও লক্ষে চলেছি, নাকি একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি?

আচমকা মুখের ওপর ছুড়ে দেওয়া একটা সাধারণ নির্বাচনের মোকাবেলা করবার জন্য জনতা একটা প্রোগ্রাম নিয়ে মাঠে নেমেছিল, একটা দল নিয়ে নয়। ইতিমধ্যে ওই নামের একটি দল সত্যিই গড়ে উঠতে পারলে দেশের রাজনীতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হত সন্দেহ নেই। তবে গলিত নখদন্ত বৃদ্ধদের গদীর জন্য ঝুটোপাটিও ভারতীয় রাজনীতির একটা দুর্মর পাপ। নিজের নিজের দলভারী করতে কৃতসঙ্কল্প পাঁচটা দল কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হাতে পেয়েও যে এক হতে পারল না এটা যতই দুঃখের ও বিস্ময়ের হোক, তবু আপন নীতিবিশুদ্ধতা বিষয় অবিচল আস্থাবান প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার জন্য এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুঙ্গে তুলে দিয়ে ভালই করেছেন। এই নির্লজ্জ অরুচিকর পেশী প্রদর্শন আর কতদিন এই সর্বংসহ দেশেও সহ্য করা যায়? এই অনিশ্চয়তার একটা অন্তত সাময়িক অবসান ঘটানর জন্যও মোরারজী দেশাইর উদ্ধত অনুদারতা কিছুটা ক্ষমা করা যায়। এরপর আমাদের টলটলায়মান রাজনীতি আশা করি স্পষ্ট একটি পরিণামের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলবে, কারণ বৃদ্ধদের কারুর হাতেই সময় বেশি নেই। তাই চলুক। স্বৈরতন্ত্র অথবা নৈরাজ্য যে দিকেই এবার রাজনৈতিক হাওয়া ছুটুক না কেন, গণতন্ত্রের জন্য আমাদের আরও দীর্ঘ তপস্যার প্রয়োজন আছে এটাই আপাতত বুঝতে পারা যাচ্ছে। ভেঙে পড়া নড়বড়ে গণতন্ত্রকে খানিকটা মেরামত করে জনসাধারণের মধ্যে নতুন দায়িত্ববোধ ও কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করা যে জনতা-গোষ্ঠীর কর্ম নয় তাও প্রমাণিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র আত্মসর্বস্ব অপদার্থ নেতাদের চৈতন্যদোয় হবার জন্য আরও অনেক আঘাত প্রয়োজন। তাছাড়া 'যেমন জাত তার তেমনি সরকার', এ প্রবাদ বাক্যও তো নিতান্ত মিথ্যা নয়। সংবিধানের সোনার থালায় সাজিয়ে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র উপহার দিলেও সেটা অমনি পাওয়া যাবে না। শ্রীমতী গান্ধি ও তাঁর পুত্রের উৎপাত আরো প্রবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হলেই হয়ত গণতন্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিতটা ঠিক করে গড়বার মত আন্তরিক তাগিদ ও নিষ্ঠার সৃষ্টি হত। এখনও আমরা যথেষ্ট দুঃখ পাই নি।

ত্রিশ বছর ধরে বিপথগামী এই দেশকে গান্ধির পথে ফিরিয়ে আনবে, জনতা নামের একটি বহু দলীয় গোষ্ঠী বিশমাস আগে এমন একটা শপথ উচ্চারণ করেছিল রাজঘাটে গান্ধির সমাধিকে সাক্ষী রেখে। গান্ধির অসমাপ্ত কাজ, অন্ত্যোদয়ের ভার তাঁরা কাঁধে তুলে নিলেন—একথা শুনে নাকি সেদিন সমবেত অনেকের চোখেই আনন্দাশ্রু দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু শালগ্রাম ও অগ্নি সাক্ষী করা বিবাহও অবলীলায় আজকাল আদালতে ভেঙে দেওয়া যায় তাই এ শপথকেও অধিকাংশ ভারতবাসীই বোধহয় তেমন গুরুত্ব দেয়নি, যদি আদৌ এ শপথের কথা শুনেও থাকে। সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে, গ্রামমুখী ও কৃষিকেন্দ্রিক করা হবে, অবিলম্বে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের স্বার্থে জমি পুনর্বন্টনের কাজটা যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে করা হবে ইত্যাদি ছেলে ভোলানো প্রতিশ্রুতিতে না ভুলবার মতন প্রাপ্তবয়স্ক নিশ্চয়ই হয়েছে নিরক্ষর ভারতীয় ভোটদাতারাও— ত্রিশ বছর কম পোড় তো খায়নি রাজনৈতিক আঁচে।

তবে এই ভুঁইফোড় গোষ্ঠীকে ক্ষমতা দেবার সময় কি প্রত্যাশা করেছিলাম আমরা? সম্ভবত নৈতিক দিক দিয়ে আর একটু উন্নত মানের সরকার প্রত্যাশা করেছিলাম দুর্নীতি কমবে, বেআইনি সরকারি জবরদস্তি সহ্য করতে হবে না এবং জনস্বার্থ বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরকারি চেতনা আর একটু বাড়বে—এটুকুই আশা করেছিলাম আমরা সাধারণ মানুষরা। নয়ত, সত্যিই যে জনতা সরকার সর্বাত্মক বিপ্লব করতে যাচ্ছে না, একথা জয়প্রকাশজী ছাড়া আর কে না জানত? এবং এইটুকু প্রত্যাশা পূরণ হওয়া অসম্ভব ছিল না। মোরারজী দেশাইয়ের মন্ত্রী পরিষদ একমাত্র নেহেরুর প্রথম মন্ত্রিসভা ছাড়া স্বাধীন ভারতের আর সব কটি মন্ত্রীসভার চেয়ে যে যোগ্যতর লোকদের একত্র করতে পেরেছে এমন একটা কথা বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ তখন বলেছিলেন। তবু এতগুলি সুযোগ্য মানুষও একমত হয়ে কিছু সুস্পষ্ট লক্ষ স্থির করতে পারলেন না। অস্থির রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সুস্থির অর্থ-নীতির সৃষ্টি হবে এমন প্রত্যাশা করাই বোকামি। এমন কি যেসব বিষয়ে আত্মবিরোধজর্জর জনতা গোষ্ঠীতে অনেকটা ঐকমত্য সেই গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন খাতেও নাকি ব্যয়বরাদ্দ শতকরা মাত্র ৬ ভাগ বাড়ানো হয়েছিল ১৯৭৮-৭৯ সালে, অর্থাৎ ৩৭% থেকে হয়েছিল ৪৩%।

"Large promises, smooth excuses" দেবার প্রবণতা কেবল নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসীদের চরিত্র লক্ষণ নয়, ক্রোধান্ধ মেকলে সাহেব যাই বলুন এই চরিত্র লক্ষণটি সর্বভারতীয়ত্বের দাবি করতে পারে।

আরো দুঃখ এই যে ক্রমবর্ধমান বেকারি, শ্রমিক অসন্তোষ, বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি নিয়ে জনতা সরকারের যথেষ্ট মাথা ব্যথা না দেখা গেলেও হিন্দীর প্রসার, গোহত্যা নিবারণ, মদ্যপান নিবারণ—এ জাতীয় ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বেশ সরব। এদিকে তিনি যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি প্রত্যহ পালন করেন বলে সগর্বে ঘোষণা করে এসেছেন বিদেশে তাতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে তার অনাস্থা দেশের চিকিৎসককূলকে প্রসন্ন করেনি। পরমাণু গবেষণা বিষয়ে নতুন সরকারি নীতির সপক্ষে কিছু যে বলা যায় না তা হয়ত নয়, কিন্তু আড়াই হাজার তিন হাজার বছর আগে ভারতে যে অত্যাশ্চর্য বিজ্ঞানচর্চা হয়েছিল তারই পুনরাবিষ্কার করবার সরকারি পরামর্শ দিতে থাকলে শুধু বিজ্ঞানী সমাজের নয় আমাদেরও দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে। অনেকের মনে হতে থাকে এরা প্রগতির শত্রু। তবে হরিজন ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার এদেশে অভিনব কিছু নয়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যতই আকাশ থেকে পড়ুন না কেন এসব দেখে নাগপুর, রাঁচি, জামশেদপুর রাউরকেলা এবং আরো অসংখ্য জায়গায় এ জাতীয় নিষ্ঠুর ঘটনার দীর্ঘতর তালিকা শ্রীমতী গান্ধি এবং তাঁর পিতার আমল থেকেও পেশ করা হয়। সেইসব অপকীর্তির দায়িত্ব যদি সরকারের উপর না বর্তিয়ে থাকে তবে সাম্প্রতিক কুকীর্তিগুলির দায়িত্বও জনতা সরকারে বর্তায় না। গান্ধি নিধনের পরেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকরা যদি নির্মূল না হয়ে থাকেন তবে তার দোষ জনতা দলের নয়। এর জন্য জরুরী অবস্থা জারী করে হাতে বেঁটে লাঠি পরনে খাকী প্যান্ট যাবতীয় লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে তুললে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবককে শহীদ বানিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে আরো উৎসাহিত করা হয়।

যাই হোক একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে নিরক্ষর চাষি-মজুর থেকে শুরু করে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়, অন্ত্যজ সমাজ এমন কি পরমাণু-গবেষক বৈজ্ঞানিক অথবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—কারুরই আস্থা অর্জন করতে পারেননি জনতা সরকার। বরং কিছু অদূরদর্শী ও বিরক্তিকর নীতি এবং অসতর্ক উক্তিতে সর্বস্তরে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছেন—প্রধানত আমাদের প্রধানমন্ত্রী। আরো যিনি করছিলেন তিনি মন্ত্রিসভা থেকে খারিজ হয়ে দেশবাসীকে স্বস্তি দিয়েছেন। এখন প্রতি তুলনায় সেই নেত্রীকেই অত্যন্ত প্রগতিশীলা মনে হচ্ছে অনেকের যিনি কার্যত জ্যোতিষীর পরামর্শ না নিয়ে এক পাও বাড়ান না, যথাস্থানে যথাকৌশলে সবরকম কুসংস্কারের পায়ে পূজা দিয়ে জনগণের চিত্ত জয় করে থাকেন।

অথচ কিছুকাল পূর্বে কেমব্রিজের এক পণ্ডিত বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক নেতাদের শ্রেণী বিভাগ করতে গিয়ে মোরারজী দেশাইকে যুক্তিবাদী নেতাদের শ্রেণীতে ফেলেছিলেন—অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতীয় জনগণকে হয়ত তিনি সঙ্গে রাখতে পারবেন না। সেই পণ্ডিতের মতে কেউ নেতা হন স্বভাবগুণে, সেবাগুণে, বিনা চেষ্টায়, কেউ হন মোহনীয় আকর্ষণ ক্ষমতার (charisma) অধিকারী হয়ে, কেউ বা নানা কৌশলে শক্তি সঞ্চয় করে গদী দখল করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ আবার নেতা হন অবস্থার চাপে, দায়িত্ব কাঁধে পড়লে, যেমন আমাদের দেশে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হয়েছিলেন। যাই হোক ওই মোহক ক্ষমতার অথবা ক্যারিসমার কথা আজকাল অহরহ শোনা যাচ্ছে এদেশেও, শ্রীমতী গান্ধি ছাড়া আর কারুর নাকি ক্যারিসমা নেই। উজ্জ্বল পিতৃ পরিচয় কয়েক বছর বিলেতে পড়াশোনা, ভালো চেহারা এবং সময় বুঝে মুখে কিছু ধরতাই বুলি ও চোখে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করতে পারলে যে এদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে জনচিত্তে মোহজাল বিস্তার করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু এই মনোহারিণী তারকার পিছনে যে অশুভ মেঘটি আছে যা অল্পদিন আগেই ভারতের রাজনীতির আকাশ কালো করে ফেলেছিল, তার কথা ওই বিশ মাসের জনতা-বিশৃঙ্খল ও ভুলিয়ে দিতে পারেনি, জনমন যতই বিস্মৃতিপ্রবণ হোক না কেন। তথাকথিত ক্যারিসমার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রে কি পরিমাণ মূঢ়তা থাকলে একজন ব্যক্তি আমরণ সুনিশ্চিত প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে আত্মনির্বাসিত হয় সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। শ্রীমতী শুধু নিজেকেই নয় সারা দেশের রাজনীতিকেও এমন একটি গহ্বরে নিক্ষেপ করেছেন যার থেকে উদ্ধার পাওয়া সময় সাপেক্ষ।

অতএব আমাদের সামনে মাত্র বিশমাসের মধ্যেই আবার দুটি বিকল্প উপস্থিত হয়েছে, এর কোনওটিই উদ্বাহু হয়ে ছুটে গিয়ে বরণ করার মতন নয় বটে কিন্তু দুটিই তুল্যমূল্য একথা এখনও মানতে আমি রাজি নই। শ্রীমতী গান্ধির রাজত্ব কালের শুরুতে নাকি দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ কোটি, তিনি রাজ্যচ্যুত হবার সময়ে তা বেড়ে ২৯ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল বলে শুনতে পাই। পেটের ভাত দিতে যখন কংগ্রেস ও জনতা দুইই অপারগ, তখন কেবল ঠিক সময় ট্রেন চালাতে পাররেন বলে গোঁসাইদের আবার যেচে মাথায় [illegible] দ্বিধা আছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩।১।৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ দফার বিশ মাস

মোরারজীভাই যদিও তাঁর জরুরী অবস্থাকালীন কারাবাসকে ঈশ্বরের বিধান বলে ঘোষণা করেছেন, আমি কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেই ধন্যবাদ দিই যে এই দেশের মানুষকে কিছু অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছেন তিনি। যখন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে মাত্রই বিশ মাসে এই দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে তখন অবাক তো লাগেই, একটু যেন দুঃখই হয়। চলতি বছরের প্রথম দিনে আমার সুদূরতম কল্পনাতেও আসেনি যে তিন মাস না যেতেই সপুত্রক ইন্দিরাদেবী দলবল গুটিয়ে যবনিকার অন্তরালে চলে যাবেন এবং অবশেষে কংগ্রেসের ভাঙা তরী ধরে অকূল পারাবারে ভাসবেন। (অবশ্য শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?) এখন শুনতে পাচ্ছি কোনো কোনো সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী নাকি আগেই বলেছিলেন ঠিক এমনটাই হবে। অথচ সে সময়ে এই পলকা আশ্বাসটুকু কুটোর মতো হাতের কাছে পেলে কী ভালোই না লাগত! কিন্তু বন্ধুরা যে যার অভ্রান্ত দৈবজ্ঞের সমর্থনে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তখন এসব প্রতিকূল ভবিষ্যৎবাণী করার পক্ষে সেন্সরশিপের বাধা ছিল, মিসার ভয় ছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে শুধু সাংবাদিকদের উপরেই নয়, জ্যোতিষীদের উপরেও সেন্সরশিপ চাপিয়ে শ্রীমতী গান্ধী শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ধোঁকা দিলেন সবচেয়ে বেশি!

কবি অমিয় চক্রবর্তী বৎসরে-দু-বৎসরে একবার ঝড়ের বেগে দেশে এসে ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলি ঝেড়ে মুছে নেন। অবশ্য ওঁর মতন মৃদু স্বভাব শান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঝড়ের অনুষঙ্গ বিন্দুমাত্র নেই, তবে এরোপ্লেন মাত্রই ঝড়ের চেয়ে দ্রুত ছোটে বলেই একথা বলতে হলো। জরুরী অবস্থার সপ্তম মাসে তিনি একবার দেশে এসেছিলেন। অবশ্য কলকাতায় আসার আগে বোম্বাই দিল্লি ইত্যাদি ছুঁয়ে এসেছিলেন। এঁদের কার সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল তা সংক্ষেপে আইয়ুবকে বলে অবশেষে মন্তব্য করেছিলেন, এ যেন একটা গ্রীক নাটক দেখছি, একদিকে একটা দুর্বার শক্তি—irresistible force, অন্যদিকে একটা অনড় বাধা—immovable object; সংঘর্ষ তো হবেই। কিন্তু সংঘর্ষের শেষে যে কী হবে ভেবে পাই না। অবশ্য ভাববারই বা কি আছে? এ এক বিরাট দেশ, অগণিত এই দেশের মানুষ, তাদের একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যও আছে।...দেশ হয়তো এভাবেই চলতে থাকবে তার আপন বেগে।...

শ্রীমতী গান্ধীকে আরও ধন্যবাদ জানাই যে এই নাটকের শেষ অঙ্কটি এতো দ্রুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এলো এবং পরিসমাপ্তি ঘটল উত্তেজনা ও উৎসাহের এমন এক অভাবিত তুঙ্গে এসে, হ্যাঁ, রীতিমতন নাটক। ইদানীং কালে কোনো বাদল সরকার বা উৎপল দত্ত এমন একটি জমজমাট নাটক লিখতেও পারেন নি। করতেও পারেন নি। উক্ত দুই ভদ্রলোকই নিশ্চয় টুপি খুলে শ্রীমতী গান্ধীর শ্রেষ্ঠত্ব আনতমস্তকে মেনে নেবেন। একটা ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন এই মহিলা সারা আর্যাবর্তের উপর দিয়ে। এখন আমরা কালবৈশাখীর পরের দিন ভোরে বসে গত সন্ধ্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করছি। আর লাভ? সেও কম হয়নি। চারদিক বৃষ্টি ধোয়া, উৎসাহে সবুজ এবং স্বস্তিতে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ। আরও একটি খর দ্বিপ্রহরের মুখবন্ধ হিসেবে মন্দ কি?

ক্ষতির জন্য শোক আপাতত আর করব না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ক্ষতি যত সব মিছে হতে মিছে। কিন্তু তবু তা এখন থাক। বরং এবার সেই অভিজ্ঞতাগুলি স্মরণ করি যা বেঁচে থাকার কিছু রস জোগায়, কিছু অর্থ দেয়। তেমন অল্প স্বল্প ইন্‌টেরেসটিং অভিজ্ঞতা আমারও ভাগে কিছু পড়েছিল। অতটুকুও যদি না পেতাম তাহলে গৌর কিংবা জ্যোতির প্রতি আমার ঈর্ষা রাখার আর ঠাঁই থাকত না।

ছাব্বিশে জুন সন্ধ্যায় খবরটা শুনে আমার কিন্তু ঠিকমতন ঠাহর হয়নি ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস। একদিন দুদিন যেতে অনেকটা বোধগম্য হলো। প্রথমটা মনে হয়েছিল যেন মাথায় আচমকা বাড়ি খেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম আমরা সবাই। কিন্তু জরুরী অবস্থার চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেরি হলো না বেশি। কি করে এর প্রতিবাদ করা যাবে সে চিন্তাও আসতে লাগল মাথায়। সভা সমিতি শোভাযাত্রা শ্লোগান সবই তো বারণ। বিবৃতি? কোন পত্রিকা ছাপবে? শ্রীমতী গান্ধীর কাছে সরাসরি যদি গণ্যমান্য জনা দশেক ব্যক্তি আবেদন করেন? কলকাতা শহর থেকে সেদিন কেবল দুজন মহিলা প্রতিবাদ করে পত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি ছিলেন, বীণা ভৌমিক ও মৈত্রেয়ী দেবী।

আমার চেয়ে যাঁরা ঠাণ্ডা মাথার মানুষ এবং সব কিছুর ভালোমন্দ দুই দিক সম্বন্ধে সমদর্শী তাঁরা ট্রেন ঠিক সময়ে চলেছে, সরষের তেলের দাম কমছে, লোকেরা ঠিক সময়ে অফিসে হাজিরা দিচ্ছে ইত্যাদি বড় বড় লাভগুলি জমার ঘরে রেখে নিরপেক্ষ ভাবে বলতে পারছিলেন যে জরুরি অবস্থার ভালো দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। আমি ঠিক করেছিলাম যখন যেখানে যত জনকে পারি অন্তত মুখে বলবই যে মন্দ এত বেশি এবং এত গুরুতর যে ঐটুকু ভালো গিয়ে তাকে চাপা দেওয়া যাবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা আর মৌল নাগরিক অধিকার হারালে স্বাধীন মানুষের খুব কিছু বাকি থাকে না। যাঁরা বলেছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্য কেবল উপরতলার গোণাগুণতি কিছু মানুষের জন্যই, ক্ষুধার্ত মানুষ 'চায়না স্বরাজ, চায় দুটি ভাত, একটুকু নুন, তাঁদের সঙ্গেও আমি একমত হতে পারিনি। মনে হয়েছিল প্রথম দফায় বিনা বিচারে আটক হবেন বটে রাজনীতিক, সাংবাদিক হয় সাহিত্যিকরা। কিন্তু ক্রমে যাদের পেটে ভাত নেই তাদের পিঠেও কিল পড়বে। বিনা বিচারে আটক করবার কারণ তাদের বেলাতেও পাওয়া যাবে না একদম মনে করার কারণ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে সময়ে মুখে মুখে ছাড়া নিজের কথা ছাড়িয়ে দেবার আর কি উপায় ছিল? হঠাৎ আমরা যেন এমন একটা দেশে পৌঁছে গিয়েছিলাম যেখানে খবরের কাগজ নেই, রেডিও নেই, টেলিভিশন নেই, আছে শুধু বশম্বদদের সম্মিলিত স্তব। এমন কি টেলিফোনেও ছিল আড়ি পাতার ভয়, সে ভয় সত্য মিথ্যা যাই হোক না। এর মধ্যে কি ক'রে আমি আমার কথা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেব? বেশির ভাগ মানুষ তো নিজে ভেবে কথা বলে না, যে কথাটা শোনে সে কথাটাই বলে। তাই যে কথার ঢাক চারদিকে বাজছিল সে কথাই সবাই বলছিল। তার উল্টো কথার খেইটাই তো ধরিয়ে দিতে হবে মুখে মুখেই। তাই আমার সঙ্কল্প ছিল, মুখ আমি বন্ধ করব না, ফোনেও না। এইটুকু প্রতিবাদই আমি স্থির করে রেখেছিলাম। তার চেয়ে বড় এবং সার্থকতর কোনো প্রতিবাদ আমার সাধ্য ছিল না।

এমন সময় শুনলাম গৌর প্রতিবাদ করে মাথা মুড়িয়েছেন। আমাদের বন্ধনদশা সবার চোখে স্পষ্ট করে দেবার জন্য শিগগিরই কুকুর-বাঁধা শিকল নিজের গলায় পরে থাকবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন! আমার অত সাহস নেই। কিন্তু তবু একজন যে অন্তত এত বড় কলকাতা শহরে, ভারতবর্ষের সবচেয়ে অহঙ্কারী শহরে, অপমানটা গায়ে মাখল এবং কিছু একটা একক প্রতিবাদ করল তাতেই ভালো লাগল। অনেকে এই নিয়ে হাসাহাসিও করলে, পাগল বললে। তা পাগল তো বটেই। একজন প্রগতিশীল ভদ্রলোক সস্নেহে বললেন, 'গৌরবাবুর মাথায় একটু ছিট আছে, তাই না?' খুব রাগ হলো, একটা হুল ফোটানো উত্তর দিতে ইচ্ছে করল, বললাম, 'গৌরবাবুর কাঁধের উপর একটি মাথা আছে, আমাদের কারুর তা নেই।' মনে হলো যথেষ্ট কড়া হলো না।

এরপর যখন গৌর আর জ্যোতি কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ কলকাতা পত্রিকার রাজনৈতিক সংখ্যা বার করবেন ঠিক করলেন তখন মনে হলো যাক, এবার তাহলে সত্যি একটা কাজের কাজ হবে। হলো। পত্রিকা তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল, কয়েক গুণ বেশি দাম দিতে চেয়েও কতজন পেল না। এরপরও যা প্রত্যাশিত তাই ঘটল। গৌরকে একদিন শেষ রাতে বাড়ি থেকে এসে তুলে নিয়ে গেল। ওঁর মনের বাসনা পূর্ণ হলো। জ্যোতি ফেরার হলো তার নন্দীভৃঙ্গী নিয়ে। ফলে জ্যোতিকে তখন আরও ঘনঘন দেখতে পাওয়া যেতে লাগল গড়িয়াহাটের মোড়ে, লেকে, রেস্তোরাঁয়। ওর চেহারাটি যে হুবহু যেকোনো একটি বাঙালী ছোকরার মতো, সেই চেহারা দেখে পুলিশের ঠাকুরদারও যে সাধ্য নেই ওকে সপ্তদশী কন্যার পিতা বলে সনাক্ত করে—এই সুবিধাগুলি স্মরণে রেখে ও পুলিশের নাকের সামনে নেচে বেড়াতে লাগল। তখন কেউ কেউ বললে জ্যোতির স্মাগলিং, বেআইনি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ইত্যাদির ফলাও করবার আছে এবং পুলিশ তার একটা বড় বখরা পায় বলেই সব জেনেশুনেও জ্যোতিকে ধরছে না। জ্যোতির প্রতি অনুরাগী লোকের সংখ্যাও যত বড় বিরাগী লোকের সংখ্যা তত বড় না হলেও কম নয়। এমন কথাও কেউ কেউ বললে আমায় যে ওর মতন বিপজ্জনক লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমার পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্বুদ্ধিতা আর বিশ্বাসপ্রবণতার চূড়ান্ত। এখন সে কথা মনে করে হাসি পাচ্ছে বটে কিন্তু সে সময়ে অন্তত কিছুক্ষণ আমার দিশেহারা লাগত। তারপর ভাবতাম, হোক সে মন্দ, ও যখন একটা ভালো কাজ সাহস করে করছে ওকে আমি ছাড়ব না। ভালো ভালো লোকেরা তো কেউ কিছু করলো না। কেউ বলল, এখনও সময় হয়নি অপেক্ষা করো; কেউ বলল এ জাতীয় গোপন কাজকর্মের মধ্যে থাকলে চরিত্রের নানা দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকে, ওসবে না যাওয়াই ভাল। পারলে গৌরের মত খোলাখুলি প্রতিবাদ করো, নয়তো চুপ করে থাক। পরামর্শগুলি যুক্তিসঙ্গত হলেও, তখন তা গ্রহণ করবার জন্য আমার মন প্রস্তুত ছিল না। যাই হোক অবিলম্বে অধিকাংশ পরিচিত ও বন্ধুজনের বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল জ্যোতির মুখের উপর। তবে নতুন বন্ধুও পেল ওরা, এই শহরে এবং শহর থেকে দূরে।

প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছিল যে গৌর ধরা দেবেন এবং জ্যোতি দেবে না কারণ দুজনেই চটপট ধরা দিলে তো একটি সংখ্যা বার করেই 'কলকাতা' পত্রিকার প্রতিবাদ শেষ হয়ে যাবে। অথচ কাজটা চালিয়ে যাওয়া দরকার—সেজন্য আত্মগোপন ছাড়া উপায়ও নেই। গৌরের স্বাস্থ্যে ও বয়সে (এবং স্বভাবে) আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয় বলেই জ্যোতিকে ফেরার হতে হয়েছিল কাজ চালিয়ে যাবার জন্য।

জ্যোতিরা ধরা পড়বার মাস দুয়েক আগে একদিন পুলিশ এসে চড়াও হয়েছিল সিপিএম সমর্থক শ্রীঅজয় দাস ও বিনতা রায়ের বাড়িতে যেখানে জ্যোতি তখন বসবাস করছিল। সেদিন পুলিশের হাত এড়াবার জন্য প্রায় দোতলা সমান উঁচু বারান্দা থেকে জ্যোতিকে লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল। ফলে তার দু-পায়ের পাতাই ভেঙে যায়। সেই অবস্থায় দু-এক দিনের বেশি কেউ কলকাতায় তাকে রাখতে সাহস করল না। অগত্যা বহু কষ্টে তাকে ব্যারাকপুর যেতে হয়েছিল পা দুটিকে বিশ্রাম দেবার জন্য। ব্যারাকপুরের গোয়ালিয়র হাউস অনেক কালের পোড়ো বাড়ি, তখন বিক্রীর আশায় নোটিস বুকে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারই আউট হাউসে মোখতার মালীর ঘরে জ্যোতি আশ্রয় পেয়েছিল আজিজুর রহমানের চেষ্টায়। তখন জ্যোতির নাম মকবুল ভাই। মকবুল ভাইকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে গেলে মোখতার, আদর করে নিজের খাটিয়াটি (পরে একদিন ঐ খাটিয়ায় রাত কাটাতে গিয়ে ছারপোকার কামড়ে অস্থির হয়েছিল আজিজ) ছেড়ে দিয়েছে রেঁধে খাইয়েছে। মকবুল ভাইকে খুব ভালবেসেছিল সে।

কলকাতার ইংরেজি সংখ্যা

ইতিমধ্যে ইংরিজি 'কলকাতা' প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। আমাদের মনে হতে লাগল সারা ভারতে যে যেখানে যেভাবে প্রতিবাদ করবার কথা ভাবছে তাদের সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত, তার জন্য একটা উঁচু মানের ইংরেজি কাগজ হলে ভাল হয়। অন্তত 'কলকাতা রাজনৈতিক সংখ্যার রচনাগুলিও ইংরিজিতে প্রচার করতে পারলে অনেকে উৎসাহ পাবে। এই ব্যাপারে শান্তিদা সোৎসাহে এগিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এলেন, তিনিই তখন আসল রসদের জোগানদার। তাঁর ব্রীফ কেস, ধুতির কোঁচা, পাইপ ইত্যাদি সামলাতে সামলাতে প্রায়ই আসতে লাগলেন। বুকের ভিতর অনেক দিনের ধিকিধিকি আঙরা ছিল, অনুকূল বাতাস পেয়ে আবার জ্বলে উঠল। জ্যোতিদের ভূগর্ভে এক্সকারশনের সাপ্তাহিক ভাতাটা আমার কাছে এসে রেখে যেতেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে, প্রফুল্ল সেন মশাইর কাছ থেকে 'কলকাতা' পত্রিকার জন্য অর্থ এবং অন্যান্য সাহায্য সংগ্রহ করে বেড়াতেন 'গভীর গোপনীয়তার' সঙ্গে। আর থেকে থেকেই কখনও আমেদাবাদ কখনও বোম্বাই কখনও মাদ্রাজ পাড়ি দিতেন। মাঝে মাঝে টাকা দিতে এসে খবর দিয়ে যেতেন ছাপার কাজ কতদূর এগিয়েছে, কোথায় কোথায় পত্রিকা রাখা সম্ভব, কিভাবে পত্রিকা বিলি করা হবে ইত্যাদি এবং প্রত্যেক বারই দু'হাত তুলে (বাঁ হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাঝখানে একটি দেশলাই ধরা থাকত) আমাকে আশ্বাস দিতেন, 'আপনার কুনোই ভয় নাই। পুলিশ যদি জিজ্ঞাসা করে সেরেফ বইলা দিবেন আমি শান্তিব্রত সেনরে কুনোদিন দেখিই নাই। নামডা বুধহয় শুনছি, পুরনো র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট কিনা!' পূষণ ওঁর পরামর্শ শুনে মিষ্টি মিষ্টি হাসত। একদিন উনি চলে গেলে পরে বলল, 'অত মিথ্যা কথা বলার চেষ্টাও করো না, তুমি সব গুলিয়ে দেবে। তার চেয়ে যেটা সত্যি সেটাই সংক্ষেপে বলে দিও অন্য কাউকে বিশেষ না জড়িয়ে'। আমার পুত্র অত্যন্ত বিচক্ষণ, প্রয়োজন মতো সদা সর্বদা নির্দেশ ও জ্ঞান দান ক'রে থাকে আমাকে। তবে আলগোছে।

এক দিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ শম্ভু রক্ষিত কাঁধে সেই ফিরিওয়ালার পোঁটলা নিয়ে কান্নি মারতে মারতে এসে ঘরে ঢুকল, 'মৈঁ তো লায়া হ্যায় মজাদার চানাচোর গর্ম'—ভঙ্গিতে। শৈশবের অনুষঙ্গ থাকায় ওর পোঁটলাটি আমার মনকে খুশি করত। ওতেই বোধ হয় ওদের তিনজনের চলমান সংসার ছিল। তার ভিতর থেকেই এক বান্ডিল প্রুফ বার করে একেবারে আমার গা ঘেঁসে এসে ফিসফিস করে বলল, (যদিও সাদা পোষাকে ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না) 'এটা আজই দেখে রাখবেন। সন্ধ্যা সাতটা পনেরোতে জ্যোতিদারা আসবেন। ওঁদের কিছু টাকা চাই। আমি এখন চলি।' বলেই অত্যন্ত সন্দেহজনক ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে ঈষৎ নাড়তে নাড়তে চলে গেল। ওর ভাবভঙ্গি দেখলে আমারই খোঁড়া পায়ে ওর পিছু নিতে লোভ হতো, পুলিশের যে কেন এতদিন লেগেছিল তাকে চিনতে জানি না। আমাদের সেবক সেবিকারা তো সবিশেষ সন্দিগ্ধ ছিল ওর মতলব সম্বন্ধে। আমরা সবাই, আমার ধারণা যে এমনকি আমিও, সামনের দিকে এগোই, কেবল শম্ভু আর কাঁকড়া পাশের দিকে এগোয়।

জ্যোতি আমার ঘরে আসা যাওয়া করছে শুনলে আইয়ুবের করোনারী ইনসাফিশিয়েন্সি আর পার্কিন্‌সন্ ডিজীজ বেড়ে যেত বলে ওকে 'কড়া' নির্দেশ দেওয়া ছিল যেন কেবল সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে ওরা আমার ঘরে আসে। ঐ সময়টাতে আইয়ুবের এই ঘরে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তখন তিনি নিজের ঘরে শুয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন, নয়ত আরতি কি রুচিরা কিংবা অন্য কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করেন। অতএব এই ঘরে ফাঁকা ময়দান। তবু উত্তেজনায় জ্যোতির কণ্ঠ মাঝে মাঝেই তার সপ্তকে উঠলে পূষণ সন্তর্পণে দুই ঘরের মাঝখানের দরজাটা ভেজিয়ে দিত। আর আমি মনে মনে ঈশ্বরের নাম করতাম, জ্যোতি সম্বন্ধে যাদের এ্যালার্জি তারা যেন কেউ এই সময়ে না এসে পড়ে। আমি দেখেছি ঈশ্বর ততবারই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন বা অপূর্ণ রাখেন যতবার করলে পরিসংখ্যানবিদরা তাঁদের সম্ভাবনাতত্ত্ব দিয়ে ঈশ্বরের বিধানকে ভালমতন ব্যাখ্যা করতে পারেন। করুণাময় ঈশ্বর বেঁচে থাকুন।

চিনে ফিরিওলা

ভূগর্ভে প্রবেশ করার পর সেদিনই আমার সঙ্গে জ্যোতির প্রথম দেখা। ও তার পোর্টেবল সংসার ও দলবল নিয়ে যখন সওয়া সাতটায় আমার তীরে এসে ভিড়ল তখন এই কিনারায় বিপজ্জনক কেউ না থাকলেও আমার নিরীহ ইন্দিরাভক্ত অগ্রজ এক কোণে একটি মোড়া নিয়ে বসেছিল। সেও সর্বদা নিজের মতামত ব্যক্ত করতে আমার মতনই ব্যস্ত। জ্যোতির চোখে সেদিন বিদঘুটে ফ্রেমের একটা বুড়োটে চশমা। পুলিশ তাকে জুতোও পরিয়ে ছেড়েছে। পিঠে হ্যাভারস্যাক, পিছনে দীপক আর শম্ভুকে নিয়ে পৌঁছল। সব্যসাচী স্টাইল! পোষাক আসাক ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ভূপর্যটনে বেরিয়েছেন রামনাথ বিশ্বাস। অথবা সিল্কের পোঁটলা পিঠে চিনে চৈনিক ফিরিওয়ালা। জ্যোতি মোট ঘাট নমিয়েই শলা পরামর্শ শুরু করে দিল নীচু গলায়। কোন কোন লেখার অনুবাদ হয়েছে, কোনটার হয়নি, কোনটা দীপক টাইপ করে সেরেছে, কোনটার প্রুফ আমি পেয়েছি, শান্তিদা কাগজের জোগাড় করতে পেরেছেন কিনা ইত্যাদি বলতে বলতে জ্যোতির নেশা চড়তে লাগল। দীপকের পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, 'এই সংখ্যাটা যখন দিল্লিতে পৌঁছবে, তখন দেখে নিও শ্রীমতী গান্ধীর মসনদ টলমল করতে শুরু করবে।' আমার সহোদর এতক্ষণ ধরে এত সব ষড়যন্ত্র সহ্য করেছিল, এখন আর পারল না। একটা বিদ্রুপসূচক 'হুঁ' দিয়ে যেই শুরু করবে আমি কোনোক্রমে তাকে ঠেকালাম। তখন সাড়ে আটটা বাজতে বেশি দেরি নেই, যে কোনো মুহূর্তে ঘণ্টা বাজিয়ে আইয়ুব হুকুম করবেন, খানা লাগাও। তার আগেই এই শ্রীমানদের পার করে দেওয়া দরকার। পাঁচ মিনিট পর পর ওরা বেরিয়ে গেল এক এক করে, কেউ ডান দিকে, কেউ বাঁ দিকে কেউ বা নাক বরাবর। দাদাও অত্যন্ত চটে মটে চলে গেল। বাড়ি পৌঁছে বৌয়ের কাছে অসমাপ্ত বাক্যটি শেষ করল 'গৌরীটার এখনও স্বভাব গেল না, এ দিকে পা নিয়ে নড়তে পারে না তবু কতগুলি অপোগণ্ড জার্নালিস্ট নিয়ে কী সব পলিটিক্স করছে। কলমের খোঁচায় তাঁরা সবাই ইন্দিরা গান্ধীকে দেশ ছাড়া করবেন! হুঃ'—

এরপর একদিন জ্যোতি সকালবেলাতেই এলো, কয়েক পা ঢুকে পিছন থেকে আইয়ুবকে খাবার টেবিলে দেখেই চট করে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বসে রইল, কখন আইয়ুব নিজের ঘরে উঠে যান এই আশায়। খানিক পর পূষণ গিয়ে অল ক্লীয়ার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিলে জ্যোতি বিনা ভূমিকায় কিন্তু সাড়ম্বরে একটি নির্দেশ দিল। 'পরশু সঞ্জয় গান্ধী কলকাতায় আসছে। এতে বাঙালীর অপমান। এর একটা প্রতিবাদ করতেই হবে।' আমি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বললাম, 'কিভাবে প্রতিবাদ করবে ভাবছ?' ও বলল, 'কেন যে উপায় আমাদের হাতে আছে সে উপায়েই! কালো পতাকা নিয়ে "সঞ্জয় ফিরে যাও" না চেঁচিয়েও প্রতিবাদ করা যায়। সবাইকে মুখে মুখে বলে দাও সেদিন আমাদের ঘরে ঘরে অরন্ধন। যতক্ষণ সঞ্জয় কলকাতায় থাকবে আমরা জলস্পর্শ করব না। অপমানিত কলকাতা সেদিন অনশন করবে।' ঠিক আছে। বছরে আমি শুধু একদিন ৩০শে জানুয়ারি উপোষ করি। এ বছরে না হয় দুদিন করব, একদিন মহাত্মাগান্ধীর তিরোভাবের জন্য, একদিন দুরাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের জন্য। মন্দ নয়। কিন্তু অন্য কাকে আর বলব আর উপোষ করতে—কে যে প্রস্তাবটা সিরিয়াসলি নেবে বুঝতে পারলাম না। যাক্ গে, আমি নিজেই করব। খবরের কাগজে দেখে নিলাম শহরে, কখন সঞ্জয়-গ্রহণ লাগবে আর কখন ছাড়বে। ততক্ষণ উপোষ করলাম।

দু'তিন দিন পর মুদির ফিরিস্তি লেখার মতন চিলতে কাগজে জ্যোতির চিঠি এল। নানা দরকারি কথার পর লিখেছে, সেদিন এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ছিলাম, চারদিক শিমুল ফুলে লাল হয়ে গিয়েছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম পৃথিবীতে এত অন্যায় আছে, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। ...অনেক দিন পর পেট ভরে মাংস ভাত খেলাম, চমৎকার রান্না হয়েছিল। খাওয়ার পর খেয়াল হলো আমাদের তো উপবাস করার কথা ছিল। ...এই চিঠি পড়ে কার না গা জ্বলে যায়? জ্যোতির এই চিঠিখানা পুরোনো কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজছিলাম এখানে হুবহু তুলে দেব বলে, হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু অন্য একটা পেয়েছি। সেটা দেখেও একটা দিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল।

একটি চৌকো চিঠি

আরতি আর আমি একদিন এক জায়গায় গিয়েছিলাম। কোথায়, কেন, কীভাবে, সে সব কথা লিখেও কেটে দিলাম—কারণ তাতে করে কারুর-কারুর চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে, সরকার বদল হলেও। তাছাড়া একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যা ভাঙা যায় না। আমাদের সেই গন্তব্যে প্রবেশ করা সহজ হলেও সেখান থেকে প্রস্থান একটু বাধাগ্রস্ত হলো। দুজন পুলিশ অফিসার এসে সবিনয়ে বললেন, 'আপনাদের ব্যাগগুলি একটু দেখব। আমরা তো আর বোমাপেটো নিয়ে ঘুরি না, তাই সৎ নাগরিকের অহঙ্কার প্রকাশ করে বললাম, 'বেশ তো!' ওরা দুজনে আমাদের দুজনের ব্যাগ দুটি উপুড় করে ঢাললেন একটি টেবিলের উপর। বোঝা গেল, বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগবে ওঁদের কারণ আমরা দুই বন্ধুই যাবতীয় চিরকুট, ক্যাশমেমো, প্রশ্নপত্র কাটিং 'ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইল'—রশিদ ইত্যাদি জড়ো করে রাখি ব্যাগে। মহিলাদের যেমন সঞ্চয়ী স্বভাব। ভাবলাম বেশ জব্দ করা যাবে এঁদের। দেখুন না যত ইচ্ছে। হঠাৎ নিজের স্তূপটির দিকে তাকিয়ে একটি ভাঁজ করা চৌকো চিঠি নজরে আসতেই আমার ম্যালেরিয়া জ্বর এসে গেল। শুকনো গলায় বললাম, 'আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না এই পা নিয়ে, একটু বসবার ব্যবস্থা করবেন?' অনুরোধটা অকপট কারণ ততক্ষণে আর্থরাইটিসের ব্যথার উপর আবার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। দুটো সামলে মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করা কঠিন। ভদ্রলোক, নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এখানে বসুন।' আমি বসতে যাচ্ছি, উনি উঠছেন, ঐ সময়ে একটু হাত বাড়িয়ে চৌকো ভাঁজ করা কাগজটি হাতের তলায় চাপা দিলাম। ঐ রকম ছোটা করে ভাঁজ করা থাকায় আমার হাতের অপ্রশস্ত মুঠিতেও নিয়ে নেওয়া সহজ হলো। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে অন্য একটি চিরকুট দেখলেন, তার একদিকে রাজেশ্বরী দত্ত ও রিজেন্ট পার্কের টেলিফোন নম্বর লেখা ছিল, অন্যদিকে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পুত্রের হাতে লেখা সম্ভবত কেমিস্ট্রির ফরমুলা। শ্রীমান বোধহয় ফোনে নম্বরটা শুনে নিয়ে নিজের রাফ খাতার একটি কোণ ছিঁড়ে তাতে লিখে আমায় দিয়েছিল, আমি যথারীতি ব্যাগে রেখেছিলাম। ভদ্রলোক ঐ সাঙ্কেতিক রহস্য ভেদ না করতে পেরে বিরস মুখে রেখে দিলেন। দুটি স্তুপের প্রত্যেকটি চিরকুট দেখা হয়ে গেলে আমরা যে যার ব্যাগ ফেরৎ নিয়ে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসলাম। তখন আমার মুঠোর কাগজটি খুলে আরতিকে পড়ে শোনালাম ঃ

গৌরী,

যে ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম সে উত্তেজনা ও উৎসাহের আতিশয্যে তোমার কাছে টাকা চেয়েছিল; তার ওপর নির্দেশ ছিল মীনাক্ষী নিষ্কপর্দক এবং শান্তিদি অনুপস্থিত থাকলে, তবেই তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে ১০০/২০০/৩০০ যত সম্ভব টাকা আনে, কেননা সে মুহূর্তে আমরা বিশেষ অনটনে ছিলাম। কিন্তু মীনাক্ষী ঠিক এই রকম সংকটের আশঙ্কাতেই ৩০০ সংগ্রহ করে রেখেছিল। তুমি ঐ রকম আকস্মিক বর্গীর মতো আমাদের চৌথের জন্য চড়াও হওয়ার রাগ করনি তো? এ-টাকাটা তোমাকে ফেরৎ পাঠাচ্ছি; আমাদের জন্য কোনো শাড়ির ভাঁজে কি তোমার কোনো প্রিয় বই-এর পাতার ফাঁকে এটা রেখে দাও; খুব সম্ভব আগামী সপ্তাহেই আবার দরকার হবে।

ইংরিজি সংখ্যা কতো দূর?

ভেতরে যে-ফুলের পাপড়ি তা কাল বাসে এক মধ্যবয়স্ক, মোটা সরকারি কর্মচারী আমাকে দিয়েছিলেন।

সহযোদ্ধার অভিবাদন সহ
জ্যোতি

এই চিঠিখানায় শান্তিদাকে 'শান্তিদি' করে যে কী গভীর বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সার্থক হলো, তা কেবল জ্যোতিরই বুদ্ধিগম্য। এই একটি চিঠি এবং এই চিঠি পুলিশের হাতে আমার প্রায়-সমর্পণ করা—এ থেকেই আমাদের যুদ্ধের স্টাইলটা স্পষ্ট! পূষণ পর্যন্ত ছি ছি করল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তিব্রত সেন

এদিকে কিন্তু কদিন পর শান্তিদারও পরোয়ানা এসে গেল। গত বছরের মার্চ মাসটা এ বছর মার্চের মতন শীতল ছিল না। ১৪ দিন লালবাজারে নরকবাস করার পর (চৈত্রমাসে জল খাবার জন্য একটা গেলাশ পর্যন্ত নিতে দেওয়া হয়নি তাঁকে) যেদিন এস বি অফিসে এসে জানলেন তাঁর প্রেসিডেন্সির স্বর্গে অধিকার জন্মেছে সেদিন শান্তিদার কী আনন্দ! শীলার তো ততোদিনে ১৪ নং লর্ড সিনহা রোড নিজের ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। সে আগেই খবর পেয়েছিল যে শান্তিদাকে সেদিন সেখানে আনা হবে এবং সেখান থেকে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। সে ছুটল দেখা হবার আশায়। শান্তিদা ততক্ষণে জালে ঘেরা কালো গাড়িতে উঠছেন, শীলাকে দেখেই সহাস্যে ঘোষণা করলেন,'গৌরীরে জানাইও যে ওর কথা একবারও আমারে জিজ্ঞাসা করে নাই।' শীলা ভয় পেয়ে বলল, 'শান্তিদা আস্তে।' শান্তিদা অমায়িক হেসে হাত নেড়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

গৌর কিন্তু পি জি হাসপাতালে কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টের পুলিশ ঘেরা অংশটিকেও অভয়ারণ্য বানিয়ে ফেলেছিলেন। প্রতিবেশী ছিলেন জ্যোতির্ময় বসু, অত ভারি ওজনের বিপ্লবী আমি এর আগে দেখি নি। তিনিও তখন হৃদরোগী বন্দী। গত বছর যেদিন প্রেসিডেন্সী জেল ভাঙার গুজবে কলকাতা গমগম করছে সেদিন গৌরেরও হার্টখানি পাজরা ভেঙে পালাবার তাল করছিল। প্রথমে হতাহত নকশাল ছেলেদের ব্যবস্থা করে তবে গৌরকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে মধ্যরাতে চালান দেওয়া হলো একবস্ত্রে। জেল থেকে কেউ হাসপাতালে গেলে নাকি হাসপাতালে তাকে কাপড়চোপড় দিতে পারে না, বাড়ি থেকেও আনবার আইন নেই। সেই জেল থেকেই সব কিছু যথানিয়মে যথাসময়ে আসবে। এদিকে জেল থেকে কোনো কিছু বার ক'রে আনার জন্য নানা পর্যায়ের ছাড়পত্র দরকার হয়। তাতে 'একটু' সময় লাগে—এতো জানা কথা। গৌরের ধৈর্য এসব বিষয়ে আবার বড়ই কম। তাই মাত্র দু'তিন দিন এক বস্ত্রে থাকার পরই একজোড়া পাজামা পাঞ্জাবি আদায় করার জন্য গৌর ঘণ্টাখানেক অবসন ধর্মঘট করেছিলেন।

হাসপাতালে

গৌরের এই অভয়ারণ্যে প্রথম আচমকা যেদিন প্রবেশ করি সেদিন কী ভয়টাই পেয়েছিলাম! অথচ আমার নিজের প্ল্যানটা ছিল নিতান্তই নির্দোষ এবং নিরাপদ। ট্যাক্সি নিয়ে হাসপাতালের এমন একটা বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম যেখান থেকে দেখা যাবে দোতলার জালে ঘেরা বারান্দায় ডোরাকোটা পোষাক পরে গৌরকিশোর পায়চারি করছেন, অথবা দু'হাত তুলে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন জালের পিছনে এসে। ঠিক সামনাসামনি দাঁড়ালে হয়তো দৃষ্টি বিনিময়ও হয়ে যাবে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে। সেদিন নির্দিষ্ট জায়গাতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গৌরের ছায়াটিও দেখা গেল না। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুশি করার জন্য হাসপাতালের বাগানের ভিতর দিয়ে মস্ত এক পাক ঘুরে এসে আর একবার দাঁড়ালাম, তখনও কোনো চিহ্ন নেই মানুষটার। শেষকালে যখন হতাশ হয়ে চলে যাচ্ছি হঠাৎ অমল চট্টোপাধ্যায় আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে হাত তুলে থামালেন। বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই গৌরকে দেখতে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ'।

'দেখা হলো?'

'না, ঠিক দেখা বলতে যা বোঝায় সেরকম হবার আশা করিনি—ঐ ওখান থেকে চোখের দেখা একটু দেখে চলে যাব মনে করেছিলাম, তাও হলো না।'

'তাহলে নেমে আসুন, আমি ওঁর কাছে নিয়ে যাব।'

'সে কি করে হবে? আমার কাছে ভিজিটর্স কার্ড নেই। ঢুকব কি করে? আর ওঁর ওখানে তো চারদিকে পুলিশ? আমি এই খোঁড়া পা নিয়ে দোতলতাতেই বা উঠব কি করে? এদিকে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে যদি আবার ট্যাক্সি না পাওয়া যায় তবে বাড়ি ফিরব কি করে?'

ভদ্রলোক এক কথায় সব ভয় দূর করে দিয়ে বললেন, 'আমি তো আছি।' ওঁর আকৃতি ও স্বর দুই-ই ভরসা দেবার মতন।

লিফটে উপরে নিয়ে গিয়ে গৌরদের হাতার মধ্যে একটি ছোট্ট ঘরে আমাকে বসিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি দেখে আসি কি ব্যবস্থা করা যায়।' আমি অথৈ জলে পড়ার মতন করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ যদি এসে বলে আপনি এখানে কেন?'

'বলবেন, ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'কোন ডাক্তারবাবু?' আমার ব্যাকুল প্রশ্ন তাঁকে পিছন থেকে গিয়ে ধরতে পারল না। কিন্তু ওঁর নিশ্চয়ই ধারণা নয় যে পি জি হাসপাতালে মাত্র একজন ডাক্তারবাবুই আছেন। উনি বেরিয়ে যেতেই এক এ্যাটেনডেন্ট যুবকের প্রবেশ ও অধিষ্ঠানের জন্য দুই চোখে আমাকে অভিযুক্ত করে সে প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

চোদ্দ পনেরো বছর ধরে কলেজে পড়িয়েও ভয়ে গলা দিয়ে আওয়াজ বের না হওয়া কি সম্ভব? আমি নিশ্চয়ই জাত ভীতু। বহুকষ্টে অত্যন্ত নির্বিকার মুখ করে বললাম, 'একজন ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি।' সে তো গেল। তখন প্রত্যেকটি মিনিট যাচ্ছে আর ভিতর থেকে কান্না ঠেলে আসছে আমার। কেবল ভাবছি এখন যদি গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে একজন ডাক্তারবাবুই ঢুকে প্রশ্ন করেন তবে তাঁকে কি বলব, একজন ডাক্তারবাবুর জন্য অপেক্ষা করছি?

আমি চিরকাল দেখেছি আরতির সিকিভাগের এক ভাগ উপস্থিত বুদ্ধিও আমার নেই, সাহস তো নেই-ই। ফলে আপৎকালের মুখে কথা পর্যন্ত সরে না। আর ও কী অবলীলাক্রমে ট্রেনে রাহাজান ডাকাতদের পর্যন্ত ট্যাক্‌ল্ করে! কাঁধে ছোরা ঠেকিয়ে ব্যাগ চাইলে বলে 'দেব না', ঘড়ি চাইলে বলে, 'নিন তো দেখি?' এদিকে আমি তো ভয়ে অমলবাবুরও নাম ভুলে গেছি, সত্যি! সে কী ঘর্মাক্ত অবস্থা তখন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে মনে কপাল চাপড়ে বললাম, 'বেশ হয়েছে, যেমন তোমার দুর্বুদ্ধি!'

আস্তিকতার পক্ষে প্রমাণ

ঐ যে গণ্ডাখানেক পুলিশ দরজার বাইরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরই একজন এবার এসে জিজ্ঞেস করে। হায় হায় কী মুর্খের মত দুম্ করে এসে পৌচেছি এই সর্বনেশে জায়গায়। এদিকে যার সঙ্গে এসেছি তাঁর নাম ভুলে গেছি, আর যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাঁর তো নামও উচ্চারণ করা চলবে না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল বিনা বাধায়। তাই না পৃথিবীতে আস্তিকের সংখ্যা এত বেশি! আমি করুণ নয়নে যে পর্দাটার দিকে তাকিয়েছিলাম সেটি হাওয়ায় একটু উড়তেই দেখা গেল গৌর মহাপ্রভু সামনের সরু বারান্দায় পায়চারি করছেন, বেটন বগলে পুলিশও পায়চারি করছে কিছু দূরে। উঠে গিয়ে গৌরকে কিছু বলা বেআইনি হবে কিনা ভাবছি, এমন সময় তিনিই আমায় ওখানে বসে থাকতে দেখে অবাক। তারপর বললেন, 'দাঁড়াও'। একটু পরেই গৌর তাঁর সহায়ক যুবকটির সাহায্যে একটি ইনভ্যালিড চেয়ার নিয়ে এলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, 'ওতে উঠে বোসো।' বসলাম। চেয়ার ঠেলে চওড়া একটা বারান্দায় পাখার তলায় আমাকে এনে দাঁড় করানো হলো। তখন ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় চারদিকে। এর মধ্যে অমলবাবু এসে দেখেন আমি একজন ইনভ্যালিড হার্ট পেশেন্ট হয়ে গেছি। তিনি তো আর হার্ট পেশেন্ট হতে পারেননি তাই তাঁকে দূর থেকেই সরে পড়তে হলো। ততদিনে গৌরের স্বভাবচরিত্র পুলিশের মোটামুটি মালুম হয়ে গেছে, তাই অন্য রুগীদের সঙ্গে কথা বললে ওরা আপত্তি করত না। আধঘণ্টা ধরে গৌর আমার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার পর দেখা গেল আর এক গণ্ডা পুলিশ প্রহরা নিয়ে জ্যোতির্ময় বসু সগৌরবে হাওয়া খেতে যাচ্ছেন আমার মতন আর একটা ঠেলাগাড়ি চড়ে। গৌরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মশাই আপনি বেড়াতে যাবেন না?'

'এই যে, আপনি এগোন, আমিও আসছি।'

প্রথমে লিফটে জ্যোতির্ময় বাবুর ঠেলাগাড়ি নামল। তাঁর প্রহরীরা নামল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর লিফট উঠে এলে আমি আরামে ঠেলাগাড়ি চড়ে আর আমার পাশে পাশে পায়ে হেঁটে গৌর এসে লিফটে ঢুকলেন। তাঁর চারজন সশস্ত্র প্রহরীরাও হেলে দুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সবাই মিলে নিচে নামার পর একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতেই আমি চেয়ার ছেড়ে তাতে উঠে পড়লাম। গৌর হাত নাড়লেন। ওর প্রহরীরা নিশ্চয়ই ভাবল সদ্যমুক্তি পাওয়া এই পেশেন্টটির সঙ্গে গৌরবাবুর একটু বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, তাই যাবার দিনে অতো কথা, হাত নেড়ে বিদায় দেওয়া। গৌর চলে গেলেন বেড়াতে, পেছনে প্রহরীরা চলল, ঠেলাগাড়ি চলল, বাগান থেকে ফিরবার সময় খোকাবাবু ঠেলাগাড়ি চড়ে ফিরবেন। পাশাপাশি দুই চেয়ারে ফিরবেন, জ্যোতির্ময় বসু আর গৌরকিশোর ঘোষ। এতো সামান্য। শ্রীমতী গান্ধীর জেলে জমায়েৎ-উল-ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দোস্তী হয়ে গেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি ভাবতে ভাবতে ফিরলাম গৌরের দেওয়া হিসেবটি। জ্যোর্তির্ময় বসু ও গৌরকিশোর ঘোষকে অহোরাত্র পাহারা দেবার পুলিশি বন্দোবস্ত-এ সরকার মাসে যা খরচ করছে, তার এক চতুর্থাংশও করে না কলকাতার ঐ শ্রেষ্ঠ হাসপাতালের সমস্তটা কার্ডিয়াক ব্লকের নার্সদের মাইনে বাবদ। এই না হলে ওয়েল ফেয়ার স্টেট? তাও সারা রাত পুলিশরা টুলের উপর বসে মশার কামড়ে ছটফট করে। 'ওদের কেন একটু ওডোমস কিনে দেন না?' গৌরের এই প্রশ্নের উত্তরে উপরওয়ালা অফিসারটি বলেছিলেন, তার জন্য কোনো টাকা বরাদ্দ নেই।

প্রবীণতম বন্দী

শান্তিদার কপালে বেশিদিন রাজবাড়ির আতিথ্য জুটল না। কয়েক মাসের মধ্যেই জামিনে খালাস হয়ে গেলেন। হয়েই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সোল্লাসে জানালেন, 'আমারে ধরছে দেইখ্যা আপনি বুঝি মনে করলেন পুলিশ খুব এফিশিয়েন্ট হইছে? কিছু না...কিছু না। আমার কইলকাতায় এ্যাকটিভিটিজ তো কিছু জানতেই পারে নাই। আপনার কথাও একবারও জিজ্ঞাস করে নাই।'

তাহ'লে ধরল কেন?

'ঐ আমেদাবাদ গিয়া যে বক্তৃতা দিসিলাম তার জন্যেই ধরছে...তাও তো বুদ্ধিমানরা আমার নাম ঠিকানাও ঠিক মতন জানত না।...এরা সব অলস আর অপদার্থ। মনে করেন একজনরে কওয়া গেল আমার পিছন পিছন ঘুইরা আমরা সব খবর বার করার জন্য, তাহলে বেডা সারাদিন কিছু না কইরাই বিকালে অফিসে গিয়া ইয়া লম্বা T.A. bill দিয়া কইব, উহা শান্তি সেন সারাদিন আমারে কি হয়রানিডাই না করল।'

আমি তো হাসতে হাসতে মরি, তবে পুলিশকে অতটা অপদার্থ জ্ঞান করার সাহস আমার ছিল না।

এইবার জেল বাস সম্বন্ধে শান্তিদার মনে একটা বিশেষ গর্ব ছিল, 'ইংরেজ আমলে যখন জেলে গেছি তখন আমি ছিলাম দলের মধ্যে ইয়ংগেস্ট—এইবার আমিই হইলাম ওল্ডেস্ট।' এর ফলে তাঁর একটা সুবিধেও হয়েছিল।

'ঐ যে R.S.S.-এর পোলাগুলাইন, ওরা তো সব আপনাগো মতন পাঁচ বার কইরা নমাজ পড়ত, তার কী সব মন্ত্র, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র টাষ্ট্র—আমার আবার মনেও থাকত না। তায় ভাতের থালা সামনে লইয়াই নমাজ পড়া...আমার দ্বারা হইত না। ভুলে আগেই খাইয়া ফেলতাম। শেষে ওরা নিজেরাই কইল, দাদা আপনি বুড়া মানুষ, আপনি আগে খাইয়া লন, আপনের প্রার্থনা করন লাগবো না।'

হাসপাতাল থেকে জেলে ফরবার অল্প দিন পর—পুজোর আগেই গৌর ছাড়া পেলেন, জ্যোতিরা ধরা পড়ল। গৌর আর জ্যোতির একটা গভীর আফশোষ যে এক সঙ্গে তাদের প্রেসিডেন্সি জেল গুলজার করা হলো না। যাই হোক জ্যোতি তার লালবাজারের আসর ম্লান করে যখন প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে উঠলো তখন উত্তরাধিকার সূত্রে পেল গৌরের সেল, গৌরের গুণমুগ্ধ 'ক্রিমিনাল' সম্প্রদায় আর গৌরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নকশাল বন্ধুবর্গ। তাছাড়া তার স্বোপার্জিত সম্পত্তিও উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। মীনাক্ষীও অবশেষে তার দামাল স্বামীকে একটা ভালো বোর্ডিং পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। জ্যোতির ভূগর্ভ বাসটা, স্ত্রীর পক্ষে উপাদেয় ঠেকছিল না নানা কারণে।

সমাজচ্যুতের পুনর্বাসন

এক তো ফেরার স্বামীর স্ত্রী হিসেবে প্রায় অচ্ছুৎ হয়ে গিয়েছিল পুত্রকন্যা নিয়ে। এতদিনে ডি আই আর বন্দীর স্ত্রী হিসেবে শীলার মতো সেও একটা সম্মান পেলো। তাছাড়া তার আর একটা 'সামান্য' অসুবিধে ছিল : জ্যোতির অনুসন্ধানকামী পুলিশ-বাবুদের entertain করা। কে কখন বিনা নোটিশে এসে কী চেয়ে বসবেন অনুমান করা কঠিন। কয়েকজন হয়তো মধ্যরাতে ডজন তিনেক রাইফেল রিভলভার আর গুটি কয় ট্রাক নিয়ে এসে আবদার জানালেন, 'জ্যোতিবাবুর নিজস্ব জিনিসপত্রগুলি নিতে এলাম।' তখন ঐ সাহিত্যরসিক হৃদয়বানদের বোঝানো যে বিয়ের সময় ওরা দুজনে বুদ্ধদেবের স্বাক্ষরিত যে বইগুলি উপহার পেয়েছিল সেগুলি একা জ্যোতির সম্পত্তি নয়—এ এক কঠিন তপস্যা। আরও সুকঠিন তাঁকে ট্যাকল্ করা যিনি এসে বলতেন, 'দেখুন মীনাক্ষী দেবী, আমি আপনার বাবার ছাত্র ছিলাম। আজ আমার কী দুর্ভাগ্য যে আমাকেই আসতে হলো আপনার কাছে। জ্যোতিবাবু শুনেছি কোথা থেকে লাফিয়ে পড়ে নাকি পা ভেঙেছেন। ঐ ভাঙা পা নিয়ে তিনি কত কষ্টই পাচ্ছেন—হয়তো সারা জীবনের মতন পঙ্গু হয়ে যাবেন। আপনি বরং ওঁকে ধরা দিতে বলুন, ওঁকে জানান ওঁর সব রকম চিকিৎসা, সব রকম আরামের ব্যবস্থা আমরা করবোই, আমরা ওঁকে শ্রদ্ধা করি, ওঁর জন্য আমাদের দুঃখ হয়।' একদিন দেখি মীনাক্ষী বিষণ্ণ মুখে বসে অজস্র সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং চা পাটিসাপটা খাওয়াচ্ছে সেই শোকার্ত ভদ্রলোককে। তাও তিনি থেকে থেকেই ডুকরে উঠছেন, 'আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ছে, ওকে ধরতে না পারলে আমাদের চাকরি থাকবে না।...

গত নভেম্বর মাসে জয়প্রকাশ দ্বিতীয়বার কলকাতায় এলেন। এবারে কেবলমাত্র স্টেটসম্যান পত্রিকা অতি সংক্ষেপে জানাল, 'জে পি শহরে এসেছেন।' ইতিপূর্বেই জুলাই মাসেও একবার এসেছিলেন, সে সময়ে শুনেছিলাম, খবরের কাগজগুলির প্রতি নির্দেশ ছিল জয়প্রকাশের মৃত্যুসংবাদ ছাড়া আর কোনো সংবাদ ছাপা চলবে না। তাই সেবার তাঁর আসার খবর চুপিচুপি হ্যান্ডবিল দিয়ে জানাতে হয়েছিল লোককে। আমিও কিছু হ্যান্ডবিল কলেজে আসা যাওয়ার সময় রিকশা থেকে টুপটাপ রাস্তায় ফেলতে ফেলতে গিয়েছিলাম। জুলাই মাসে যখন এসেছিলেন তখন এয়ারপোর্টে ও বাড়িতে পুলিশের কড়াকড়ি অনেক বেশি ছিলো। তবু মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর স্বাক্ষরিত একটি বাণী এনেছিলাম কলকাতার মানুষের জন্য, কিন্তু সেদিন সেটি কোথাও প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তা অতি যত্নে কোথায় যে তুলে রেখেছি আর খুঁজে পাচ্ছি না। তবে এক বাক্য বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করেছি বলে মনে রয়ে গেছে 'Every little act of courage today

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

will be a nail driven into the coffin of dictatorship'। এবারও প্রথমে মৈত্রেয়ীদির সঙ্গে গেলাম পরের দিন আবার সস্ত্রীক গৌর ও আরতিকে নিয়ে গেলাম।

ঠিকানা কলকাতা

যথারীতি ধড়াচুড়ো পরা শান্তিরক্ষকরা এবং শাদা পোষাকে বিশেষ শাখার ব্যক্তিরা যথেষ্ট সংখ্যায় অবস্থান করছিলেন। আমাদের তাঁরা কোনো প্রশ্ন করলেন না, আগেরবার মৈত্রেয়ীদি যা উত্তর দিয়েছিলেন! একজন অতি সপ্রতিভ সাদা পোশাক ভদ্রতা করে লিফটের দরজা খুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?' মৈত্রেয়ীদিও সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিলেন, 'এই কলকাতা থেকেই।' ভদ্রলোক আর প্রশ্ন খুঁজে পাননি। তবে ঘণ্টা খানেক পরে আমরা যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন তাঁরা আমাদের অনুসরণ ক'রে কলকাতায় কোথায় আমাদের নিবাস তা দেখে গিয়েছিলেন। পেট্রলের কি অপব্যয়। নিজেদের যে কী ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছিল। যাই হোক নভেম্বর মাসে পুলিশি ব্যবস্থাদি তুলনায় অনেকটা শিথিল।

আমরা কথাবার্তা শেষ করে যখন নেমে আসছি তখন দেখি বাড়ির হরবোলা ময়নাটাও খাঁচা এবং পরিচারকসহ নিচে নেমে এসে সাদা পোষাকদের সামনে গুম হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলম, তাকেও উৎসাহ দেবার জন্য বললাম, 'ময়না বোলো সীতারাম...বোলো সীতারাম।' সে আমার প্রতি নীরব তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল। শাদা পোষাকরা চুপচাপ দেখিছিলেন ব্যাপারটা। চিরাচরিত ধ্বনি তুলে আমি কোনো সাড়া না পাওয়ায় গৌর পরামর্শ দিলেন, 'একবার বিশ দফা বলাবার চেষ্টা করে দেখ দেখি, মানুষের চেয়ে তাড়াতাড়ি শিখতে পারে কি না।'

জ্যোতিকে সদলবলে ১৫ দিন অন্তর ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে আসা হচ্ছিলো সরকারি খেল দেখবার জন্য। সরকারের কেস সাজানো আর হয়ই না। মীনাক্ষী একদিন বললো, কেস যেদিন ওঠে সেদিন কোর্টে গেলে জ্যোতির সঙ্গে দেখা হতে পারে। আমরা কয়েক জন মিলে যাব ঠিক করলম, মৈত্রেয়ীদির গাড়িটা ধার করে চললাম। গিয়ে যা অবস্থা দেখলাম তাতে দেখা হবার আশা সুদূর পরাহত মনে হলো। সব মিলিয়ে সেখানে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল। তবে শান্তিদা যেখানে ব্যবস্থাপক সেখানে উপায় একটা হবেই। জ্যোতিদের যে ঘরে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তার নিকটতম গেটে গাড়ি লাগানো হয়ে গেলো। শান্তিদা পকেট ভরা এক টাকার নোট নিয়ে একাই একটা advance party হয়ে গেলেন। বাঁ হাতে ডান হাতে নোট ছড়িয়ে পথ সাফ করে ফিরে এসে বললেন, 'এই যে চলেন, ধরেন আমার হাত।' ওরা বাম বাহুটি ডান হাতে আকড়ে ধরে বেশ এগুচ্ছি খোঁড়াতে খোঁড়াতে, গৌর এসে বলেন কি, 'বাঁ হাত দিয়ে আমাকেও ধর, বেশি জোর পাবে।' আমি যতোই বলি না, দুজনের দরকার হবে না, উনি কেবলই বলেন, 'আঃ ধর না। আমি বেশি আপত্তি করার আগেই নীচু কঠিন গলায় বললেন, 'যা বলছি করে না, নইলে আমাকে যে ঢুকতে দেবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অতএব দুই মহাভুজ এই রমণীকে নিয়ে গিয়ে তুললেন যথাস্থানে। তখন জ্যোতির উল্লাস দেখে কে! সেদিন অন্তত তাকে উল্লাসময় দত্ত নাম দেওয়া যেত। মীনাক্ষী ঠিক বলে, জ্যোতিকে কষ্ট দেওয়া সহজ নয়।

আমি খানিকক্ষণ হিমাংশু হালদারের পাশে বসে কথা বলছিলাম, সংগঠনের. কংগ্রেসের ছেলে। জরুরী অবস্থার প্রথম দিকেই সে ধরা পড়েছিলো। অদ্ভুতভাবে তাকেও কলকাতা কন্সপিরেসি 'কেস'-এর সঙ্গে জড়িয়েছে। ওকে এমন নিষ্প্রাণ ফ্যাকাসে দেখলাম, বহুদিন ধরে টাইফয়েডে-ভোগা রুগীদের আগে এরকম চেহারা হতো। 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার রং যে কি তা যদি ঠিক মতো বোঝানো সহজ নাও হয়, হিমাংশুকে দেখলে বলা যায়, 'দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা।' পরে শুনলাম যে সম্প্রতি মাস দুয়েক ধরে অনশন ধর্মঘট করেছিলো জেলের অব্যবস্থা, অনাচারের প্রতিবাদে। শুধু সেই নয় দীর্ঘদিন ধরে আরও অনেকে করেছিল। সে খবর কেউ জানতেও পারেনি। হিমাংশুর সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করছিলাম, মোটা মোটা গরাদওয়ালা তালা-আঁটা একটা বক্সে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে মলিন হতশ্রী একদল শিশু-বৃদ্ধ-যুবা ঠেলাঠেলি করছে এবং আমাদের দেখছে। খানিকক্ষণ পর পর একটা জাবদা খাতা থেকে ছ-সাত জনের নাম হাঁকছিলেন এক শীর্ণ ভদ্রলোক, আর তখন তালা খুলে সেই ছ-সাত জনকে বার করা হচ্ছিলো ঐ খোঁয়াড় থেকে। মোটা একটা দড়িতে পর পর গিঁট দিয়ে প্রত্যেকটি গিঁটে এক এক করে ঐ ছ-সাত জনের বাহুতে বাহু বেঁধে নেওয়া হচ্ছিলো, তারপর দড়ির প্রান্ত দুটি ধরে সশস্ত্র প্রহরী তাদের নিয়ে যাচ্ছিলো। আশ্চর্য আমার দেশ! কত নামে কতরকম মানুষ তারা। হিমাংশু হালদার নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গিতে দু চারটি শব্দে জবাব দিচ্ছিলো। তার যেন জীবন সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াটি কেমন হিমশীতল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই যেদিন সে জেলে গিয়েছিল, এইরকম মানুষ ছিল না।

আটাশ বছর আগে আমার এক কৈশোরিক লীলার ধাক্কা সামলাতে আমার বাবাকে বার কয়েক পাটনা কোর্টে যেতে হয়েছিল। প্রত্যেক বার বাড়ি ফিরে মাকে বলতেন, 'সেখানে কোনো ভদ্রলোক যায়? তোমার মেয়ের গুণে আমাকে সেখানেও যেতে হলো!' আমি ব্যাঙ্কশাল কোর্ট প্রাঙ্গণে বসে ভাবছিলাম, এখানে না এলে মানুষ রতনকে চিনব কি ক'রে?

কলকাতা, আগস্ট ১৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ দফার বিশ মাস ঃ পুনশ্চ

শ্রীমতী মীনাক্ষী দত্ত আমার লেখার প্রুফ দেখার পরেও কিছু ভুল থেকে গিয়েছিল সেটা এমন কিছু নয়। অমনটা হয়েই থাকে। 'ইনসাফিসিয়েন্সি', 'শম্ভু', 'সমাজচ্যুত' জাতীয় শব্দের বানান ভুলে আমি মোটেই কাতর হইনি। এমন কি আমার 'অপ্রশস্ত' মুঠিকে মীনাক্ষী 'অপ্রস্তুত' মুঠি করে দেওয়াতেও তেমন কিছু ইতরবিশেষ ঘটে নি। কেবল বোঝা গেল আমার এম্ফ্যাসিসটা শারীরিক আসামর্থ্যের উপর, আর মীনাক্ষীর এমফ্যাসিসটা মানসিক অসামর্থ্যের উপর। ক্ষতি কি? তা ছাড়া 'অপ্রশস্ত মুঠি' ঐ চৌকো চিঠিখানা আত্মসাৎ করতে গিয়ে 'অপ্রস্তুত' হয়ে পড়েছিল বটে।

আমি আসলে কাতর হয়েছি গৌরকিশোর ঘোষের 'অ-বসন' ধর্মঘটকে মীনাক্ষী 'অবস্থান ধর্মঘটে উন্নীত করায়। আমি মেনে নিচ্ছি এটা সজ্ঞানে সেনসরিং নয়। কিন্তু মীনাক্ষীর পিতা যদি থাকতেন মোটেই অত সহজে মেনে নিতেন না। এই অপরাধের জন্য অনেক তিরস্কার শুনতে হত তাকে। বুদ্ধদেব বসু ধিক্কার দিয়ে বলতেন, তুইও গৌরীর মতন ব্রাহ্মিকা হয়েছিস? 'অ-বসন' শব্দটা সম্বন্ধে তোর মনের অবচেতন এতদূর আপত্তি রয়েছে যে তাকে 'অবস্থান' করে ফেললি? সেকথা কল্পনা করতেও আমার ভালো লাগছে।

অনন্য ধর্মঘট

যাই হোক অ-বসন ধর্মঘটটা একটু ব্যাখ্যা সাপেক্ষ—কারণ ব্যাপারটা এখনও তেমন চালু হয়নি। আমি যতদূর জানি, এক গৌরকিশোর ঘোষ ছাড়া আর কেউ এজাতীয় ধর্মঘট করেন নি, করতে পারবেন বলেও মনে হয় না। প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে গৌরকিশোরকে স্থানান্তরিত করার পর একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি তার মীমাংসা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ স্থির করতে পারছিলেন না যে মিসাবন্দী হৃদরোগীর পরিধেয় সরবরাহ করার দায়িত্ব বা অধিকার কার? জেলের? হাসপাতালের? না পরিবার পরিজনের? এই শেষোক্ত তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব তথা অধিকার সরাসরি নাকচ করে দিলেন প্রথম দুই পক্ষ। ফলে স্বামীর জন্য জামা-পাজামা বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়েও ফেরৎ আনতে হলো শ্রীমতী শীলা ঘোষকে। দেশের এবং গৌরের নিরাপত্তার কথা ভেবেই নিশ্চয়ই তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে দু পক্ষকে বড় বেগ পেতে হয়েছিল। বাড়ির জামা-কাপড় পরা চলবে না তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নেবার পর, গৌর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইলেন তাঁর বাসি কাপড় পালটে নতুন কাপড়টা দেবে কে? তাই নিয়ে, যেমনটা হয় সরকারি মহলে, একটু দেরি হচ্ছিল। গৌর স্বভাবতই অধীর, যা কর কর ভাই 'আস্তে ধীরে' তাঁর কুষ্টিতে লেখে না। ফলে অচিরেই তিনি একদিন মলিন বস্ত্র ত্যাগ করে প্রাতঃস্নান সেরে, হাসপাতালের পরিচারককে উপদেশ দিলেন ভালো করে সর্বাঙ্গে ট্যালকম পাউডার মাখিয়ে দিতে। তারপর এই সুগন্ধ বিভূতি অঙ্গে ধারণ করে দিগ্‌বসন হয়ে কার্ডিয়লজি ডিপার্টমেন্টের দুই নম্বর বেডখানি অলঙ্কৃত করে গৌর শয্যা নিলেন। বেশিক্ষণ থাকতে হয়নি। ঐ দুরূহ সমস্যার সমাধান এর পর চটপট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বলাভ হয়েছিল তাঁর।

তবে এ হেন আচরণের Cardiology Dept. পরেও গৌরকিশোর ঘোষকে Mental Observation Dept-এ ট্রান্সফার করে যে দেওয়া হয়নি সে খবরও আমি বিশ্বস্তসূত্রে ডঃ অঞ্জলি সেনগুপ্তর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

যাই হোক কলম ধরবার সুযোগ যখন আর একবার পেয়েছি তখন ঐ 'বিশ মাস' সম্বন্ধে আরও দুয়েকটা কথা বলে নিই। আমার ঐ লেখা কারুর কারুর ভালো লেগেছে। কেউ বা খুব অপ্রসন্ন হয়েছেন। এ লেখায় কেউ কেউ একটু ব্যথিত হতে পারেন এ আশঙ্কা যে আমার মনে ছিল না তা নয়। তবু কিছু উল্লেখ ও কিছু অনুল্লেখ আমি এড়াতে পারি না। যার জন্য মন সর্বদাই খোঁচা খেয়েছে ভিতর থেকে।

একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। এ অস্বাভাবিক সময়টায় আমরা সবাই ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আবার প্রতিবাদ করার ইচ্ছেও ছিল অনেকের মধ্যেই—সেটাও দেখেছি। শুধু প্রতিবাদটা কিভাবে করা সম্ভব এবং করলে সার্থক হবে কিনা সে বিষয়েই অনেকে মন স্থির করতে পারছিলেন না। এত বিচ্ছিন্ন আর বিভ্রান্ত বোধ করছিল সবাই। যদি উৎসাহী, সমাজ সচেতন এবং শ্রদ্ধেয় কয়েকজন মানুষ যোগসূত্র স্থাপনে উদ্‌যোগী হতেন তখন তাহলে মনে হয় কলকাতা শহরেও বড় রকমের একটা প্রতিবাদ গড়ে তোলা হবে।

পার্ক স্ট্রিটের সভা

এমন কি আমরা কয়েকজন ছোটখাট যে কটি সভার আয়োজন করতে পেরেছিলাম তাতেও উৎসাহী যোগদাতার অভাব ঘটেনি। পার্ক স্ট্রিটে ছোট হল ঠিক করে দিয়েছিলেন সুশীল ভদ্র। সেখানে উমাশঙ্কর যোশী, মবলঙ্কর, শৈবাল গুপ্ত ইত্যাদি অনেকে আমন্ত্রিত হয়ে এসে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় জরুরি অবস্থার নিন্দা করেছিলেন। সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ও লেখকের, বুদ্ধিজীবীর সাংবাদিকের স্বাধীনতা হরণের ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশ্য তাঁর লিখিত ভাষণে তিনি সেদিন বলেছিলেন যে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কোনো বিকল্প খুঁজে পান না। সেদিনের সভায় গৌরকিশোরের লেখা একটি কবিতা সদ্য সদ্য হাসপাতাল থেকে পুলিশের চোখ এড়িয়ে নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন শীলা। কবিতাটি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে উদ্দেশ্য করে লেখা। বিষয় কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাৎ। ঐভাবে হঠাৎ এসে পড়া কবিতাটি সেদিন একটি বিশেষ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। ছোট হলটা ভরে গিয়েছিল উৎসাহী শ্রোতায়। আমাদের আফশোষ হচ্ছিল আরও বড় ঘরে আরও বেশি লোককে কেন ডাকলাম না। এরকম সভা আমরা আরও কেন যে করে উঠতে পারি নি!

তবে একটু ছোট আকারে ঘরোয়া সভা নিজের বাড়িতেই ডাকার সাগ্রহ অনুমতি দিয়েছিলেন সন্দীপ দাস। এই সভা পার্ক স্ট্রিটের সভার চেয়েও অনেক আগে, ১৯৭৫ সালের বড়দিনে হয়েছিল। এখানে আরও খোলাখুলি আলোচনা হয়েছিল, আমাদের পক্ষে কি করা সম্ভব, কি করা উচিত সে বিষয়ে। নানা মতের মানুষ এসেছিলেন। দু-একটি ছোট সভা আমরা মৃণ্ময়ী বসুর বাড়িতেও করেছিলাম। নিশ্চয়ই শুধু আমরা নই, আরও বেশ কিছু লোক নানাভাবে এ জাতীয় সভা-সমিতি করছিলেন তখন—তার খবরও আমরা যে একেবারে পাইনি তাও নয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে তখনও প্রতিবাদ করার মতন সাহস ও উৎসাহ বেশ কিছু মানুষের মধ্যে ছিল। সেই সাহসকে একত্রিত করে বড় রকম একটা বিস্ফোরণ হয়তো ঘটানো যেত, যদি দু চারজন কর্মিষ্ঠ কিন্তু রাজনীতি-নিরপেক্ষ মানুষ থাকতেন আমাদের মধ্যে।

লেখার ব্যাপারেও দেখেছি অনেক ভয় পেলেও, কেউ কেউ সাগ্রহে সাহায্য করতে চেয়েছেন। ইংরিজি 'কলকাতা'র জন্য প্রথমটায় অনুবাদের কাজ করার আগ্রহ, সময় ও নিরিবিলি স্থান ছিল না জ্যোতির। প্রথম যেদিন ওকে নিজের লেখা অনুবাদ করে দেওয়ার কথা বলেছিলাম সেদিন জ্যোতির মনে হয়েছিল, 'ও সব যাদের দরকার তারা করে নেবে, অনুবাদ করে সময় নষ্ট করার মতন সময় আমার নেই।' পরে অবশ্য নানা কথা ভেবে ঐ কাজে তার উৎসাহ হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমিও কয়েকজনকে অনুরোধ করেছিলাম অনুবাদ করে দিতে। একজন সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি, বলেছিলেন 'these are difficult times, one has to be a little selfish now'—আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না...ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হবে...।" আবার বীণা ভৌমিক জ্যোতির 'এখন কী কর্তব্য' এবং উমা দাশগুপ্ত গৌরের "পিতার পত্র" সাগ্রহে, সানন্দে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। অথচ তখন উৎসাহের আতিশয্যে এমন অপরিকল্পিতভাবে সবটা কাজ হচ্ছিল যে ওঁদের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদের করা অনুবাদও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তখন আমার অনুরোধে করা ঐ অনুবাদ দুটি আর ছাপা হয়নি বলে আমার মনে বেশ দুঃখ হয়েছিল। সৎ প্রয়াসের এই অপচয় দুঃখের হলেও মনে রাখা ভাল যে ঐ অনুবাদ করে দেওয়ার ভিতর দিয়েও দুজন বন্ধু তাঁদের প্রতিবাদ জানাবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস যে জরুরী অবস্থা যদি আরও কিছুদিন চলত তবে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় আমরা নিশ্চয়ই একত্র হতে পারতাম, আমাদের ভয় ও সাহস ভাগ করে নেবার জন্য।

কলকাতা, সেপ্টেম্বর [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমালোচনার অধিকার

এই শতাব্দীর গোড়ার দিককার একটি বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই। ১৯০২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এই ঘটনাটির সূত্রপাত। 'বঙ্গ-ভঙ্গ' আন্দোলনের প্রধান নায়ক লর্ড কার্জন তখন ভাইসরয়। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসাবে সেদিন সমাবর্তন ভাষণ দিতে এসেছিলেন। তাঁর ভাষণের একটি উক্তি ছিল

"If I were asked to sum in a single word the most notable characteristic of the East–physical, intellectual and moral–as compared with the West. the word exaggeration or extravagance is the one that I should imploy. It is particularly patent on the surface of the National Press."

[প্রতীচ্যের সঙ্গে তুলনা করে সংক্ষেপে এক কথায় যদি আমাকে বলতে বলা হয় প্রাচ্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কি তাহলে 'অতিরঞ্জন' অথবা 'অপরিমিতি' শব্দটিই আমি ব্যবহার করব। এ দেশের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই এই চরিত্রলক্ষণটি বিশেষভাবে স্পষ্ট।]

সেদিন সমাবর্তন সভায় যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুজন পাশাপাশি বসে ছিলেন। কার্জনের এই ধৃষ্ট উক্তি শুনেই তো নিবেদিতা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি ফিস ফিস করে স্যার গুরুদাসকে বললেন "শুনলেন, ভাইসরয় কি বললেন?" তিনিও শুনেছিলেন এবং অপমানিতও বোধ করেছিলেন বটে কিন্তু বাঙালি ব্রাহ্মণের রক্ত তো আর এত তাড়াতাড়ি ফুটতে সুরু করে না। তবে নিবেদিতাও ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। সভা শেষ হতেই বিচারপতি মশাইকে টানতে টানতে ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীতে (এখন যা ন্যাশনাল লাইব্রেরী বলে পরিচিত) নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে কার্জনের "The problems of the East" বইখানি বার করিয়ে তার ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা খুলে দেখালেন স্যার গুরুদাসকে। ওই দুই পৃষ্ঠায় কার্জন খুব গর্ব করে তাঁর একটি কীর্তি বর্ণনা করেছিলেন। কার্জন যখন কোরিয়ায় যান তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বৎসর। কিন্তু কোরিয়ার বৈদেশিক দপ্তরের সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে যখন তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বাড়িয়ে ৪০ বৎসর বলেন। কারণ তাঁকে নাকি আগেই বলা হয়েছিল যে প্রাচ্য দেশে চল্লিশের কম বয়সী লোকেদের কেউ মানসম্মান দেয় না। কার্জনের নিজের লেখা থেকেই এই অতিরঞ্জন অথবা মিথ্যা ভাষণের সংবাদটি সংগ্রহ করে এনে নিবেদিতা গুরুদাসবাবুকে উত্তেজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেন একটি প্রতিবাদপত্র লিখতে। চিঠিখানি দুজনে মিলেই লিখেছিলেন মনে হয়, তবে পরের দিন যখন অমৃতবাজার পত্রিকায় চিঠিখানি প্রকাশিত হয় তখন তাঁদের কারুরই নাম তাতে ছিল না। চিঠিতে কার্জনের বই থেকেই তাঁর নিজের ভাষাতেই তাঁর কীর্ত্তি উদ্ধৃত হয়েছিল। স্বভাবতঃই সেদিন সরকারি বেসরকারি সব মহলেই ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। ভাইসরয়কে সোজাসুজি মিথ্যাবাদী বলা!

কিন্তু সেদিন অমৃতবাজার পত্রিকাকে এর জন্য কোনো শাস্তি পেতে হয়নি।

[[পত্রিকার জামিন বাজেয়াপ্ত হয়নি, সম্পাদককে সরকারি দফ্তরে ডেকে নিয়ে গিয়ে শাসান হয়নি। এবং স্পষ্টতঃই তখন precensorship বা প্রকাশের প্রায়াহ্নে সমস্ত লেখা যাচাই করিয়ে নেওয়ার দরকার হত না কারণ তা যদি হত তবে তো চিঠিটা প্রকাশই পেত না।

এখন প্রশ্ন, এরকম একটা ব্যাপার আজকের স্বাধীন ভারতে কল্পনা করা যায় কি?]]

ভাইসরয় তো তখন সর্বেসর্বা, তাঁর অঙ্গুলিহেলনে আমাদের উত্থান-পতন। কিন্তু সেই সর্বময় 'ভারত ভাগ্যবিধাতা' না পেরেছিলেন 'অমৃত বাজারের' সম্পাদককে স্পর্শ করতে, না খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন অপরাধী পত্রলেখককে। অবশ্য অনেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে এভাবে হাতে হাতে কার্জনের চরিত্রটি লোকসমক্ষে উদ্ঘাটন করে দেওয়ার ব্যাপারে নিবেদিতা রয়েছেন। যাই হোক কার্জন নিজে মানে মানে ঐ বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ থেকে উল্লিখিত ঘটনার বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। সম পর্যায়ের কিংবা অনেকটা নিম্ন পর্যায়েরও কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে আজকের কোনো কাগজ প্রকাশ করে দিতে পারবে কি ওই জাতীয় কোনো লজ্জাজনক সত্য?

[[ঐ একই নামের একটি পত্রিকা আজও এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে সেই পত্রিকাই বলুন বা লক্ষাধিক প্রচারিত অন্য যে কোনো পত্রিকাই বলুন, কারুরই সাহস হবে না ওই ভাবে বুক ফুলিয়ে সত্য কথা বলার। শুনেছি বহুকালের বিবর্তনের ফলে বাঁদর মানুষ হতে পারে, কিন্তু পঁচাত্তর বছরের বিবর্তনে বাঙালি সম্পাদকজাতীয় জীবরা মেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পর্য্যবসিত হতে পারে বিবর্তনের এই উল্টো চাল আমাদের প্রত্যক্ষ ব্যাপার।]]

আজকের পত্রিকা অফিসে যাঁরা সভা জাঁকিয়ে বসে থাকেন মোটা মোটা মাইনে পাওয়া ভদ্রলোকেরা, তাঁরা নিশ্চয়ই অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিদের উত্তরসুরী নন।

[[তুলনায় বোম্বাইয়ের রাজমোহন গান্ধীর হিম্মৎ দেখে ঈর্ষ্যা হয়। তিনি না হয় গান্ধী-রাজাগোপালাচারীর নাতী বলে রাজরোষের তত ভয় করে না। কিন্তু দিল্লির রমেশ থাপার? সেমিনার পত্রিকার গত জুলাই সংখ্যাটির আলোচ্য বিষয় ছিল, "আমরা কোথায় চলেছি?" [Where do we go from here?] এই সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—"It is not our purpose in this issue to probe

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

the immediate pressures, personal or otherwise, which pushed India into its most critical political crisis. These studies we will leave for less tense times when facts are not censored and comment is free. We are concerned at this moment with the indefinite prolongation of two emergencies, for these emergencies and their implementation can begin to develop overtones which are extremely dangerous, both to ruler and ruled. (ভারতবর্ষকে তার সবচেয়ে সংকটজনক সমস্যার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে অব্যবহিত পূর্ববর্তী যে সব ব্যক্তিগত বা অন্যবিধ চাপ সেগুলির অনুসন্ধান করা আমাদের বর্তমান সংখ্যার উদ্দেশ্য নয়। এ জাতীয় সমীক্ষা আমরা স্থগিত রাখলাম সে সময়ের জন্য যখন আবহাওয়া আর একটু স্বাভাবিক হবে, যখন তথ্যকে কাঁচিকাটা করা হবে না কিংবা মন্তব্য করার স্বাধীনতা থাকবে। উপস্থিত মুহূর্তে আমাদের দুশ্চিন্তা এই যে দু-দু'টি জরুরী অবস্থা অনির্দিষ্টকাল চালিয়ে যাওয়ার এবং এই জরুরী অবস্থা কার্যকরী করার নানারকম আনুষঙ্গিক সমস্যা আছে যা শাসক ও শাসিত দুইয়ের পক্ষেই অত্যন্ত বিপদজনক।) স্পষ্ট কথা বলার এই সৎসাহস যা সবার পক্ষেই স্বাস্থ্যকর,- এই সাহস আজ কলকাতায় প্রায় দুর্লভ। হায় গোখলে!

কিন্তু শুধু একতরফা দোষ দেব কেন? কার্জনের মতো ধৃষ্ট, অহঙ্কারী, একগুঁয়ে ভাইসরয়ের কাছ থেকেও আমরা যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার আশা করতে পেরেছিলাম তা কি আজ আশাতীত নয়? অবশ্য কার্জনের হাত বাঁধা ছিল কতগুলি আইন দিয়ে, তিনি ইচ্ছা করলেই রাজদ্বারে টেনে এনে এই ব্যক্তিগত অপমানের সমুচিত শাস্তি দিতে পারতেন না কোনো সত্যবাদী সম্পাদককে। কিংবা বাঁকা পথে সম্পাদকের ঘরে তল্লাসী করিয়ে আবিষ্কার করে ফেলতে পারতেন না কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা, অথবা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি সম্ভব হতো না অপরাধ প্রমাণ করার আগেই সারাদেশে সেই সম্পাদকের সুনাম নষ্ট করার জন্য আকাশবাণী থেকে প্রচার করে দেওয়া যে কি সন্দেহে তাঁর বাড়িতে খানাতল্লাসী হয়েছে। রাজদ্রোহের জন্য অবশ্য সেকালেও শাস্তি পেয়েছেন পত্রিকাসম্পাদকরা, কিন্তু তবু 'বন্দেমাতরম' জাতীয় পত্রিকা ইংরেজ বর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করতে পেরেছিল। যে সব গণতান্ত্রিক অধিকার ইংলন্ডের প্রজারা ভোগ করতেন, ভারতীয় প্রজারাও তাই দাবি করেছেন সেকালে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পেয়েছেন।]]

সত্যি কথা বলতে কি আজ আমরা ব্যক্তির যে সব মৌলিক অধিকারের কথা বলি সেগুলি এদেশের মানুষ কোনো দিন চিন্তাও করতে পারত না। পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রভাবেই আমরা এ ধরনের অধিকারের কথা চিন্তা করতে শিখেছিলাম। ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের স্ত্রী, আর পুরুষের, ভূম্যধিকারী আর প্রজার সমান অধিকারের কথা কল্পনা করা কি এদেশে কখনও সম্ভব ছিল? আমরা জানতাম, কর্ম ফলে অধিকার ভেদ ঘটে। দুঃখ, লাঞ্ছনা সবই কর্মের ভোগ। যার যে বর্ণে জন্ম সেই অনুযায়ী শাস্ত্র বিহিত কর্ম করে সে সন্তুষ্ট থাকলেই সমাজও রক্ষা পায়—এই ছিল আমাদের আবহমান কালের ধারণা। এ সবের মাঝখানে হঠাৎ পশ্চিমী শিক্ষা পাওয়া কয়েকটি লোক সমাজটাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঢেলে সাজাবেন ঠিক করলেন আধুনিক ধারণা অনুযায়ী। দেশ স্বাধীন হবার পর সংবিধান লিখে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সমান অধিকার সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু এই সব অধিকার তো হাতে তুলে দেবার জিনিষ নয়। এসবের যোগ্য হয়ে তবেই এই অধিকারগুলি অর্জন করতে হয়। অন্যান্য দেশেও তাই হয়েছে। শ্রমিকই হোক কি স্ত্রীলোকই হোক, সংবাদপত্রই হোক কি পার্লামেন্টই হোক—সবাই নিজের নিজের অধিকারের জন্য বহু যুগ ধরে আন্দোলন চালিয়ে গেছে। তবেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার নিরঙ্কুশ অধিকার খর্ব হয়ে ঈশ্বরের সন্তান জনগণের অধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিছুকাল আগে এক ইংরেজ সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন, "Eternal vigilance is the price for liberty, as you know. What is the price for eternal vigilance?" (আপনারা জানেন সদা সতর্ক থেকেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়। কিন্তু সদা জাগ্রত থাকার জন্য কি মূল্য দিতে হয় জানেন কি?) তার মূল্য? তার মূল্য কারাদণ্ড, রাজদ্বারে লাঞ্ছনা, পরিবার পরিজনের অশেষ দুর্গতি। তবু সমাজের এক অংশকে বিবেকের মতো অতন্দ্র থাকতে হয়। সমাজের যেটি চিন্তাশীল অংশ, যে অংশ পরান্ন ভোজী কিংবা উমেদার নয়, ভীত কিংবা চাটুকার নয় তার পবিত্র দায়িত্ব হল নির্ভীক সত্যবাদী সমালোচনা করা—যেমন সমালোচনার আদর্শ নিবেদিতা রেখে গেছেন। শাসক যদি সে অধিকার থেকে শাসিতকে বঞ্চিত করেন তবে তিনি মনে করতে পারেন বটে দুর্যোধনের মতো—

নিন্দারে করিব ধ্বংস কণ্ঠরোধ করি।
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ় বলে চাপি
মোর পাদ পীঠতলে।

কিন্তু তবু বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সাবধানবাণী সব রাষ্ট্রপরিচালকদেরই স্মরণ রাখা মঙ্গল

ওরে বৎস শোন,
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করিরাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়োনা তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে গোপন হৃদয়দুর্গে।

যুগের ডাক, শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৩, পৃঃ ৩৫-৭

দ্রষ্টব্য মূলরচনার তিনটি অংশ, যা [[ ]] দ্বারা চিহ্নিত আছে, সেগুলি এমার্জেন্সির সময় পত্রিকা সম্পাদক সেন্সরের ভয়ে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই সম্প্রদায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগাযোগ

সাম্প্রদায়িক সংহতির উপায় অনুসন্ধানে আমরা নানা পথের কথা গত এক বছরে শুনেছি ও ভেবেছি। রাজনৈতিক সমাধান, ধর্মগত সমাধান, আইনগত সমাধান, শিল্পসাহিত্য ও শিক্ষার মাধ্যমে সংহতি স্থাপনের সচেতন প্রয়াস ইত্যাদি প্রসঙ্গ বার বার আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে সমাধান ও যে উপায়ের কথা আমাদের সবচেয়ে বেশি করে মনে হয়েছে সে হল সামাজিক সমাধান। আমাদের বিশ্বাস পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হবে ততই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হবে। এই যোগাযোগের ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায় তা বিস্তৃত আলোচনা করার আগে দু-একটি আপত্তির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

কেউ কেউ আমাদের বলেছেন যে এই সমস্যার মূলে রয়েছে ধর্ম বিশ্বাসের ও আচারের বিরোধ। আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটন করতে চাই তাহলে এই বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও আচারগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করে তবেই এই সম্প্রদায় দুটিকে মেলাতে পারব। নইলে ওপর ওপর একটা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন হলেও সত্যিকারের মিলন হবে না। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে ধর্ম বিশ্বাস জিনিষটাই আজ দুই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষের মনে শিথিল হয়ে গেছে—তাই ধর্মের সমন্বয় করে সামাজিক সমন্বয়ের প্রয়োজন আজ আর আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক বিরোধগুলির সমন্বয় সত্যিই করা যায় কিনা এবং কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করান সমন্বয়ের ধর্মের আবেদনই (appeal-ই) বা কতখানি হবে বুঝতে পারি না। অন্ততঃ আকবরের দীন-ই ইলাহীর সাধারণ্যে প্রসার বিশেষ আশাব্যঞ্জক তো হয়নি। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ের আচার ও সংস্কারের যে পার্থক্য আছে সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলির গুরুত্ব কিছু কম নয়। এই পার্থক্যের প্রকাশগুলি যেহেতু মূলত সামাজিক এবং এই পার্থক্যগুলিকে দূর করেই হোক বা পরস্পরের আচার ও সংস্কার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার সৃষ্টি করেই হোক, যেভাবেই সমাধান করি না কেন, সেই সমাধান কিন্তু মূলত সামাজিক সমাধান। তা ছাড়াও দুই সম্প্রদায়ের দুই সম্প্রদায়েরই প্রতি যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অবিশ্বাস আছে তারও সমাধান আইন করে, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কিংবা রাজনীতির বুলিতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেবল হবে বলে আমার মনে হয় না। তার জন্য চাই অবিরাম সামাজিক যোগাযোগ এবং হৃদয়ের পরিবর্তন যার ফলেই শুধু দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভব।

আমাদের সামাজিক সমাধানের প্রস্তাব রাজনৈতিক কর্মীদের মনঃপুত নয় এই কারণে যে তাঁরা মনে করেন আমরা গোড়া ঘেঁসে কাজ করছি না কিংবা সমস্যাটিকে তার যথার্থ ও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে না। এঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন ও বলেন যে আমাদের কর্তব্য সোসালিষ্ট রিভলিউশনের পথ প্রশস্ত করা যার ফলে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান আপনি হবে। আর্থিক বৈষম্যের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেললে এই সব সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সেই বিষবৃক্ষের ফুল পাতার মত আপনি শুকিয়ে মরে যাবে। সোসালিষ্ট সমাজবিপ্লব ঘটে গেলেও racial বিদ্বেষের মূল সমাজে থেকে যেতে পারে কি না এবং ঘৃণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা অবিশ্বাস জাতীয় মানবিক দুর্বলতার ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত প্রকাশ নিজে থেকেই বন্ধ হয় কি না সে বিতর্কে না গিয়েই বলব যে সেই সমাজবিপ্লবের সুদিনের প্রত্যাশায় বসে থাকলে এদেশে আরো একশ বছরেও কিছু হবে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে তেমনধারা একটি বিপ্লব আমাদের জীবদ্দশায় হবে বা করবার মত কোনও রাজ নৈতিক দল রয়েছে এ আমার মনে হয় না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া কোনও বড়ো রকম সামাজিক সমস্যার যদি মৌলিক সমাধান সত্যিই না হয় তবে অবশ্য আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই কিংবা হাত চালানোটা নেহাৎ পণ্ডশ্রম। কিন্তু রাজনীতি অর্থনীতি ছাড়াও হৃদয়নীতি বলে যে কিছু আছে এবং মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তার প্রভাব যে অসীম এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর রাতারাতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটার চেয়ে পারস্পরিক সাহচর্য সান্নিধ্য ও বিতর্কের ফলে ক্রমপরিবর্তনের সম্ভাবনাই বেশি এ বিশ্বাস আমাদের আছে বলেই আমরা একাজে নেমেছি। অন্যসব রাজনৈতিকদের কথা বাদই দিলাম, এমন কি যাঁরা স্যোস্যালিস্ট রিভলিউশানের আদর্শ সামনে রেখে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নির্বাচনের মাঠে নেমে রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করার চেষ্টায় আছেন তাঁরাও কি আমাদের দেশের এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে আরো বাড়িয়ে তুলছেন না? Separate electorate না থাক, তাঁরাও ক্ষমতাশীল দলের মতই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে উস্‌কে দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের প্রার্থী নির্বাচন করেন এবং ইলেক্‌টরেটকে বৈপ্লবিক কোনও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা দূরে থাক মূর্খ-অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইলেকটরেটের ভয়ে কোনও প্রগতিশীল মত ও পথ গ্রহণ করতে সাহসী হন না, এ আমরা সম্প্রতি দেখেছি মুসলিম পার্সোনাল ল' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে। ফলে এসব বিষয়ে তাঁদের বৈপ্লবিক নেতৃত্বের দাবি এখন হাস্যকর প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। তাই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে তাঁদের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনুসরণে আমার তেমন আস্থা নেই।

সাম্প্রদায়িক সমস্যাটিকে মূলত সামাজিক সমস্যা বলেই আমার মনে হয় এবং সমাজসংস্কারের পথেই হোক, আইনগত বাধা দূর করেই হোক, রাজনৈতিক ও ধার্মিক অপপ্রচার ঠেকিয়েই হোক—যে ভাবেই হোক হৃদয়ের পরিবর্তনের, সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রশস্ত করাই একমাত্র উপায় বলে মনে হয়। হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি বাস করছে, কাজ করছে, পড়াশোনা করছে তবু কেন তাদের মাঝ থেকে ভয়-বিদ্বেষ অবিশ্বাসের এই প্রাচীরটি ভেঙে পড়ছে না তা নিয়ে আমরা নানাদিক থেকে চিন্তা করবার চেষ্টা করেছি। দুই সম্প্রদায় তো সর্বক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই, কোনও কোনও ক্ষেত্রে যেমন সংগীতে, চলচ্চিত্রে, খেলাধূলার জগতে একধরণের একটা সংহতি হয়ে গেছে; আবার সমাজের উচ্চতম পশ্চিমী ভাবাপন্ন একটা অংশে এবং নিম্নতম শ্রেণীতে বস্তিতে, কারখানায়, মাঠে আবার আর এক ধরণের যোগাযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি থাকার ফলে। কিন্তু যে অংশে প্রায় যোগাযোগের সুযোগই ঘটে না সে হল সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে এবং এই সমাজের চিন্তা ভাবনা, ভয়-বিদ্বেষ বা অবিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমাজকে পরিচালিত করে। ক'জন মধ্যবিত্ত হিন্দু একটি মুসলমানকেও ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এবং ক'জন মধ্যবিত্ত মুসলমানের একটিও হিন্দু 'বন্ধু', কেবলমাত্র পরিচিত নয়—আছে, এটা নিঃসন্দেহে খোঁজ করে দেখার যোগ্য। একদিকে সাক্ষাৎ পরিচয়ের অভাব, অন্যদিকে যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত সংস্কার ও প্রেজুডিস রয়েছে—তার ওপরে রয়েছে নীতিহীন সংবাদপত্র ও সস্তা অপসাহিত্যের উস্কানি—ফলে যাকে পাশে থাকা সত্বেও নিজের চোখে দেখে চিনি না, যার সঙ্গে আলাপ নেই, তার সম্বন্ধেও একটা স্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। কোনও মুসলমানকে ব্যক্তিগতভাবে না চেনা সত্ত্বেও মুসলমানদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কোনও মতামত বা স্পষ্ট ধারণা নেই এমন হিন্দু পাবেন কি? এ প্রশ্ন মুসলমানদের সম্বন্ধেও করছি।

তাই আমরা, অন্তত শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা চাই আরো একটু আলাপ পরিচয়, আরো একটু হার্দিক যোগাযোগ। এতকাল আমরা অনেক সময়ই অন্য সমাজের ব্যক্তিকে চিনি নি, গোষ্ঠী সম্বন্ধে একটা ধারণা নিয়ে কাজ চালিয়ে এসেছি। "ওরা সুবিধাবাদী", "ওরা সংখ্যার জোরে আমাদের সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখবে", "ওরা ধর্মান্ধ", "ওদের সঙ্গে মেলা যায় না কারণ ওদের মন বোঝা সহজ নয়", "ওরা আমাদের উঠতে দেবে না", "ওরা লম্পট", "ওরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন"—এই "ওদের" সম্বন্ধে বা "গোষ্ঠী" সম্বন্ধে তৈরি ধারণার পরিবর্তে প্রয়োজন অন্য সম্প্রদায়ের 'ব্যক্তি'কে নিজে জেনে মতামত গড়া, যেমন করে নিজের সম্প্রদায়ের কাউকে আমরা লোভী, কাউকে উদার, কাউকে গোঁড়া বা কাউকে আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন বলে জানি। ফলে প্রেমের বা বিদ্বেষের প্রকাশটা সম্প্রদায়ের প্রতি নয়, ব্যক্তির প্রতি হবে এই রকম একটা প্রত্যাশা আমি করি। এতে করে সোসালিষ্ট রিভলিউশানের পথ প্রশস্ত হবে কিনা জানি না কিন্তু নীরব একটি সোস্যাল রিভলিউশান নিশ্চিত ঘটবে।

একত্র খাওয়া থাকা ওঠা বসার পথে বাইরের বাধা আজ অনেকটা কমে গেছে, বাধা যতটুকু আছে তা ভিতরেরই বেশি, কারণ সমাজ আজ নিষিদ্ধ কিছু আহারের জন্য তো দূরের কথা এমন কি নিষিদ্ধ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও একঘরে করে দিতে পারে না। সমাজের শাসন যেহেতু শিথিল হয়েছে তাই ব্যক্তি যদি ইচ্ছা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে তবে তার শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতে তার সেই বাধা আজ আর নেই যা পঁচিশ বছর আগেও ছিল। অথচ এখন মূল্যবোধের এমন একটা বিপর্যয় ঘটেছে দেখছি যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমাজ বা রাষ্ট্র যতদূর এগোবার স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ব্যক্তিমানুষ ততদূর অগ্রসর হতে পারছে না। অস্পৃশ্যতাকে, জাতিভেদকে, পণপ্রথাকে রাষ্ট্র আইনত দূর করলে কি হবে, শিক্ষিত মানুষেরা এর প্রত্যেকটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। তেমনি হিন্দু মুসলমানের মাঝখানে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে সমাজের যে কড়া শাসন ছিল আরো পাঁচটা সামাজিক অনুশাসনের মতই তা আমাদের অজ্ঞাতে লুপ্ত হয়ে গেছে—অথচ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ও বিকার দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও আজ যে প্রবলতর তার পরিচয় আমরা গত বছরই পেয়েছি। অর্থাৎ এসব বিষয়ে সমাজ কিংবা রাষ্ট্র যে স্বাধীনতাটুকু আমাদের দিতে রাজি তার সদ্ব্যবহার আমরা করছি না।

অন্যদিকে দেখুন সাম্প্রদায়িক পার্থক্যও যতখানি ২৫ বছর আগে ছিল তাও আজ নেই। সাজে পোষাকে, আহারে-বিহারে, চিন্তায়-ভাবনায়-ভাষায় আমরা অন্তত বাঙালি হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরের কত কাছাকাছি আছি তা আমরা নিজেরাই জানি না হয়ত। পরস্পর সম্বন্ধে pre conceived notionগুলি ত্যাগ করে কিংবা সেগুলি দূর করবার জন্যই যদি ভালভাবে মেলামেশার সুযোগ ঘটে তবে এক ভাষাভাষী এই সম্প্রদায় দুটি আরো পঞ্চাশ বছর পর দুটি ভিন্ন সম্প্রদায় থাকবে কিনা সে বিষয়েই আমার ঘোর সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ক্রমে যদি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান তাদের বিশেষ আকারটি হারিয়ে ফেলে তবে তাদের স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটে বটে কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের তাতে অপচয় হয় না। এই "স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু" ঘটানই হল আমাদের সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। তবে কি বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য থাকবে না? থাকবে বৈকি, সে হল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নয়।

কুপমণ্ডুক কিংবা আত্মসংস্কৃতির গর্বে অন্ধ মানুষগুলিকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করে অন্য অঞ্চলের, অন্য ভাষার, অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে সব রকমে মিলবার নানা practical উপায় সন্ধান করতেই আমরা আপাতত মন দেব।

নবজাতক শারদীয়া ১৩৭২, পৃঃ ১৩৮-৪৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাবিলনামহ্ থেকে বসুধারা অসম্পূর্ণ পরিচয়ের সূত্রে

এই প্রবন্ধের শুরুতেই কবি আল মাহমুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিনি সম্প্রতি একটি অভিমান ব্যক্ত করেছিলেন—যার থেকে আমার এই বক্তব্যের উদ্ভব।

আল মহমুদ কয়েক দিনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন। এক বন্ধুগৃহে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। কবিকে নিজের কবিতা পাঠ করতে অনুরোধ করলাম আমরা। তিনি তাঁর 'সোনালী কাবিন' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা পাঠ করলেন। তারপর সখেদে বললেন, কয়েক বছর আগে কলকাতার একটি কাব্যপাঠের আসরে এই গ্রন্থেরই একটি কবিতা পাঠ করার পর এক শ্রোতা প্রশ্ন করেন 'কাবিন' শব্দটির অর্থ কী? এই প্রশ্নে আল মাহমুদ বিস্মিত হন। "শত শত বৎসর ধরে পাশাপাশি বাস করার পরেও মুসলমানের এমন একটি সর্বদা ব্যবহৃত ঘরোয়া শব্দ হিন্দুর কাছে এত অপরিচিত ঠেকে কেন? অথচ আমরা তো হিন্দু-সংস্কৃতির সবই জানি। কত কঠিন সংস্কৃত শব্দও আমরা অহরহ ব্যবহার করছি। তাহলে আরবি ফারসি শব্দ হিন্দুরা এত কম বোঝেন কেন?" প্রতিবেশি মুসলমানের প্রতি বাঙালি হিন্দুর মনে কোনো সশ্রদ্ধ কৌতূহল নেই এবং তারা অনুৎসুক বলেই তাঁদের এমন অজ্ঞতা—এই ছিল আল মাহমুদের অনতিব্যক্ত অভিমান।

এক্ষেত্রে তাঁর এই অভিমানটা যে সম্পূর্ণত সংগত নয়, সেটা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই আমিও তাঁকে পালটা জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি 'বসুধারা' শব্দটির অর্থ জানেন?" হঠাৎ এই প্রশ্ন করায় উনি সামান্য একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "কেন?...হ্যাঁ জানি তো...পৃথিবী।" 'বসুধা' কিংবা 'বসুন্ধরা'-র সঙ্গে 'বসুধারা'-র ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকায় ওঁর বোধহয় এটুকু ভ্রম ঘটেছিল।

আল মাহমুদের মতন শব্দসচেতন কবির যে এই শব্দটির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় নেই তার প্রধান কারণ হিন্দুসমাজের যেসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এই শব্দটি, সেই অনুষ্ঠানগুলিই তাঁর অজানা। অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি শুভকাজের সূচনাতেই পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে একটি আভ্যুদয়িক বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করার রীতি আছে। সেই সময়ে প্রাচীরগাত্রে যে কয়েকটি ঘৃতের ধারা ঢালা হয় সেগুলিই বসুধারা। পুরুষানুক্রমে যে-গৃহ-প্রাচীর বসুধারা-চিহ্নিত, তার প্রতি হিন্দুর মনে যে একটু সশ্রদ্ধ দুর্বলতা আছে এটা বোধহয় খুব কম মুসলমানই জানেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তেমনি কজন হিন্দুই বা জানেন যে মুসলিম বিবাহের বিধি অনুযায়ী বর আর কন্যাকে একটি চুক্তি পত্রে সম্মতি দিতে হয়? তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী-রূপে গ্রহণ করছেন, স্বামী স্ত্রীকে কত দেন মোহর দিতে অঙ্গীকার করলেন ইত্যাদি এই প্রতিজ্ঞা পত্রে লিখিত থাকে। বিবাহে একজন 'উকিল' আর কয়েকজন সাক্ষীও উপস্থিত থাকেন। তাঁরাও এই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিবাহের এই চুক্তিপত্রটিকে 'কাবিন নামহ্' বা সংক্ষেপে 'কাবিন্' বলা হয়ে থাকে। দাম্পত্যের পবিত্রমধুর সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত বলে এই শব্দটি মুসলমানের মনে যে মাধুর্য আর পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে আছে, তাও অধিকাংশ হিন্দু জানেন না। তাই কোনো কাব্য গ্রন্থের 'সোনালী কাবিন' নামকরণের রোম্যান্টিক দ্যোতনা এই-বাঙলার অনেক পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন না।

এতদিন তো হিন্দুর বিবাহে অনুরূপ কোনও লিখিত চুক্তি ছিলই না। কিছুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজেও বিবাহ রেজিসট্রি করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। তবু এখনও অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় শালগ্রামশিলা আর অগ্নিকে সাক্ষী মেনে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে। মন্ত্রগুলিতে কোনও অবোধ্য ম্যাজিক নেই, বরং কিছু মিলিত প্রার্থনা আছে। যেমন

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব
যদিদং হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম ইত্যাদি।

[আমার এই হৃদয় তোমার হোক। তোমার এই হৃদয় আমার হোক।]

আবহমানকাল ধরে যেহেতু হিন্দুবিবাহ মন্ত্রপূত (স্যাক্রামেনটাল) তাই চুক্তিবদ্ধ (কনট্র্যাকচুয়াল) বিবাহের কোনো ধারণাই এখানে অনেকের নেই। এবং মুসলিম বিবাহ যে ঠিক কিভাবে সম্পন্ন হয়, এ ব্যাপারে বহু হিন্দু আজও অজ্ঞ।

এই অজ্ঞতার কারণও সবারই জানা। প্রতিবেশী দুই সমাজ পরস্পরের অনুষ্ঠানে এতকাল অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন। হিন্দুদের দিক থেকেই স্পর্শদোষ বাঁচাবার তাগিদে দেওয়ালটা আগে তোলা হয়েছিল, পরবর্তী কালে জেদের বশে মুসলমানও নিজের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক নাগরিক মানুষদের জীবনে এই গোঁড়ামি আর সংকীর্ণতার ধার অনেকটা ক্ষয়ে গেছে বটে, তবু আজও যে দু-চার জন ভাগ্যবান পরস্পরের উৎসব-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ অথবা দাওয়াত পান, তাঁরাও ক্বচিৎ অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন। তাই এখনও পরস্পরের অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে ভালোমতন পরিচয়ই ঘটে নি। ফলে আনুষ্ঠানিক শব্দগুলিও অপরিচিত রয়ে গেছে। ব্যাপারটা দুঃখের, কিন্তু একতরফা অভিযোগের নয়।

এবার 'কাবিন' বা 'কাবিননামহ্' শব্দ দুটি নিয়েও একটু কথা আছে। আমার স্বামীর পরিবারে শুনেছি বলে এগুলি আমার কাছে অপরিচিত নয়। তবু আল মাহমুদ সাহেবের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হবার পরেই বাড়ি ফিরে 'চলন্তিকা' দেখলাম। 'কাবিন' অনুপস্থিত। তার পর একে একে দেখা গেল শুধু রাজশেখর বসু নয় সুবল মিত্র এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও '[illegible]' পর্যন্ত পৌঁছে তবে 'কাবু' হয়েছেন বটে, কিন্তু মধ্যপথে 'কাবিন' বাদ পড়ে গেছে। তখন বাঙালি হিন্দু এ শব্দটি জানেন না ধরেই নিয়ে আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমান আত্মীয়-বন্ধুদের একে একে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম এই শব্দটি তাঁরা জানেন কিনা। মুসলিম ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন একজন বন্ধু—তিনি চব্বিশ পরগনার অধিবাসী—বললেন শব্দটি আদৌ 'কাবিন' নয়। শব্দটি 'ক্বাবিল'। তাঁর উরদু ভাষিণী শ্বশ্রুমাতার মত উল্লেখ করে জানালেন যে এই 'কাবিল' শব্দটি 'কবুল' শব্দ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু বরকন্যা বিবাহের সময় কিছু শর্তসাপেক্ষে এই পবিত্র সম্পর্ককে 'কবুল' করেন, তাই এই চুক্তিপত্রকে 'কাবিল' বা 'কাবিলনামহ' বলা হয়। আমার বড়ো জাও উরদুভাষিণী (এবং বাংলাভাষিণীও বটেন)। তিনি একটু সংকোচ করে বললেন, তাঁর ধারণা শব্দটি 'কাবিন'। এবং আরবি হরফে আমাকে 'কাবিননামহ্' লিখে দেখালেন। খুঁজে-পেতে তাঁর ষাট বছরের পুরোনো কাবিননামহ্‌টিও দেখালেন, কিন্তু তাতে কোথাও ওই শব্দটি লেখা ছিল না। এর পর ক্রমাগত উলটোপালটা সাক্ষ্য পেতে থাকলাম। কলকাতার উরদুভাষিণী এক তরুণী বললেন, তাঁরা চিরকাল 'কাবিল' শব্দটিই শুনে এসেছেন। আমার উত্তর প্রদেশীয়া এক ছাত্রী বললেন, তাঁরা 'কাবিন' বা 'কাবিল' কোনওটিই ব্যবহার করেন না, তাঁরা ওই চুক্তিপত্রকে 'নিকাহ্‌নামহ্', বলেন। যাই হোক অবশেষে আরবিতে এম এ-পাস-করা এক স্নেহাস্পদ শ্রীমান উরদু অভিধানের সাহায্যে নিষ্পত্তি করে দিলেন এই সমস্যার। শব্দটি অবশ্যই 'কাবিন'—এর অর্থ ইকরার বা স্বীকার করা। 'কাবিন্‌নামহ্'-এর অর্থ যে বিবাহের চুক্তিপত্র অভিধানে তাও পাওয়া গেল। এদিকে পশ্চিম বাঙলার মেদিনীপুর, বীরভূম, নদিয়া, তারকেশ্বরবাসী কয়েক জনের কাছে জানা গেল যে তাঁদের পারিবারিক শব্দাবলীতে এ শব্দ দুটির কোনওটিই নেই। এমনকি লিখিত চুক্তির রেওয়াজও নেই কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে। সেখানে মুখে-মুখেই সাক্ষী আর উকিল সব বলা-কওয়া করে নেন, এবং উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনেরা শুনে মনে রাখেন! তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাঙলাভাষী এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের শুধু হিন্দুরা নন মুসলমানেরাও অনেকে 'কাবিন' শব্দটির সঙ্গে মোটেই পরিচিত নন। এই তথ্য আল মাহমুদ সাহেবের অভিমানকে আরো উদ্দীপিত করবে, না প্রশমিত—তা ঠিক অনুমান করতে পারছি না।

তবু একই-ভাষাভাষী এই দুই ধর্মীয় সমাজের দূরত্বটা ভাবনার বিষয় অবশ্যই। বাঙালি মুসলমানের মুখের আর সাহিত্যের ভাষায় হিন্দুরা কখনও কখনও হোঁচট খান একথা সত্য। এটা ইচ্ছাকৃত ন্যাকামি নয়। সম্ভবত পশ্চিম-বাঙলার মুখের ভাষাও একই রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে মাঝে-মাঝে পূর্ব বাঙালির কানে। শুধু তাই নয়, বাঙালি মুসলমানের মানসিকতার সঙ্গেও হিন্দুর পরিচয় যথেষ্ট নয়। তাই একই ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনার মূল্যায়নে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের যখন আসমান-জমিন ফারাক ঘটে যায়, তখন এঁরা খুব অবাক হন। অল্প কাল আগে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা আমার এক সহকর্মিণী একটু বিচলিত হয়ে এসে আমাকে বললে যে ওঁর ক্লাসের একটি মুসলিম ছাত্রী দ্বিজেন্দ্রলালের ঔরঙ্গজীব-চরিত্র চিত্রায়নে বিশেষ আপত্তি করেছে। আমার সহকর্মিণী নাকি তাঁর ছাত্রীকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি যে দ্বিজেন্দ্রলাল অপ্রিয় হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করেই নাটক লিখেছেন। আমিও আমার সহকর্মিণীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারি নি যে হিন্দুর দৃষ্টিকোণ থেকে ঔরঙ্গজীব-চরিত্র যেমন দেখায়, ঐতিহাসিক সত্য নিরূপণের সেটাই একমাত্র পরিপ্রেক্ষিত নয়।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের মানসিক দূরত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—এই এক প্রজন্মকাল পশ্চিম-বাঙলার মানুষ পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি অনীহ ছিলেন। সামান্য কয়েকজন সম্মানিত ব্যতিক্রম ছিলেন অবশ্য। কলকাতা, বলতে গেলে সম্পূর্ণতই, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঢাকার দিক থেকে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম-বাঙলা সম্বন্ধে অগ্রহের অভাব ছিল না এবং নানা বাধা সত্ত্বেও এদিককার বইপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা সেখানে অব্যাহত ছিল। পশ্চিম-বাঙলার ফিল্ম এবং নাটক নিয়েও গভীর আগ্রহ আর উদ্দীপনা ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে। ১৯৭১-এর জনজাগরণ এবং তারপর বাংলাদেশের জন্ম স্বভাবতই পশ্চিমবাঙলায় বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল এবং একটা অস্পষ্ট প্রত্যাশা ছিল যে দুই বাঙলা বুঝি এক হয়ে গেল। সেই উদ্দীপনা আর আগ্রহ আবার ধীরে ধীরে শীতল হয়ে এসেছে, যেহেতু রাষ্ট্রনৈতিক দূরত্ব কিছুই কমে নি। তবু বাঙলাদেশ-ই যে বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র যার স্বীকৃত ভাষা বাঙলা, এতে পশ্চিম-বাঙলার বাঙালিরা যুগপৎ গর্ব আর ঈর্ষাবোধ না করে পারেন না। রাজনৈতিক সীমান্তকে অতিক্রম করে আমাদের ভাষাগত বন্ধন যে বাঙলাদেশের মানুষের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, এ সত্য যত আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে ততই ওই-বাঙলার মানুষের ভাষা আর মন বুঝবার তাগিদ প্রবল হবে এদিকে। আরো একটি কথাও ভুলে থাকা উচিত নয়। পূর্ব-বাঙলার তুলনায় পশ্চিম-বাঙলার মুসলমান এখনও যতই মূক আর পশ্চাৎপদ হোন, এঁরাও সংখ্যায় এই-বাঙলার এক-চতুর্থাংশ। এঁদের চিন্তাভাবনা প্রত্যয় আর বেদনার জগতেও হিন্দুর প্রবেশ বিলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

ইংরেজ রাজত্বের নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠার আগে বাঙলার গ্রামীণ সমাজে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক দূরত্বের চেহারাটা বাস্তবিক কেমন ছিল, হিন্দুর মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল পাঠের আসরে মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিল কিনা, মুসলমানের পুঁথিসাহিত্য হিন্দুর ঘরে ঘরে সাদরে গৃহীত হয়েছিল অথবা হয় নি, দুই সমাজের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভাষায় কতটুকু পার্থক্য ছিল, সম-সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতিক বিকাশ মোটামুটি একই পর্যায়ের ছিল কিনা—ইত্যাদি বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও আপাতত উহ্য থাক। শুধু মনে রাখা যাক যে, কলকাতার নগরকেন্দ্রিক বাঙলা সাহিত্য আর সংস্কৃতির বিকাশে হিন্দু সমাজের আধিপত্য ছিল। কারণ এ যুগে সংস্কৃতির ধারক আর বাহক যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ তার উদ্ভব আর প্রতিষ্ঠা বাঙালি হিন্দুর মধ্যে যখন বেশ ভালোরকম হয়ে গেছে, তখনও মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর দেখা নেই। ফলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণটা হিন্দুরই-নবজাগরণ। রামমোহনের ধর্মভাবনায় ইসলামের প্রভাব কিংবা দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরবোধের প্রকাশে হাফিজের উপস্থিতি ইত্যাদি অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, আরো দূর পশ্চিমের অভিঘাত অনেক বেশি প্রবল হওয়ার ফলেই বোধহয় নবজাগ্রত আধুনিক হিন্দুমানসে মুসলমান আর মুসলিম সংস্কৃতির উপস্থিতি প্রান্তিক। উলটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দিকে, এই জাগরণকে রেনেসাঁস বলা সংগত কিনা, এ প্রশ্ন অবশ্য অন্য অনেকেও করেছেন তবে প্রায় সব বাঙালি মুসলমানের চোখেই এই জাগরণ হিন্দু ধর্ম আর সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় বলেই ঠেকেছে। কাজি আবদুল ওদুদের মতন মুক্তবুদ্ধি মানুষ এই নব জাগরণের সঙ্গে ওয়াহাবি আন্দোলনের মিল পেয়েছেন কিছু। দুই ক্ষেত্রেই বিজিত হৃতগৌরব জাতি নিজের নিজের প্রাচীন ধর্ম আর সংস্কৃতির শিকড়ে ফিরে গিয়ে তার বিশুদ্ধ রূপটি পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণকে শুধু এই লক্ষণে চিহ্নিত করলে যে সুবিচার করা হয় না, তা আজ হয়তো অহিন্দু বুদ্ধিজীবীরাও কেউ কেউ স্বীকার করবেন। ওদুদ সাহেব তাঁর ক্রিয়েটিভ বেঙ্গল-এ লিখেছেন—

Of the front-rank leaders after Rammohon, Debendranath, Keshabchandra, Ramkrishna, Vivekananda and Rabindranath were frankly of religious disposition.

একনিঃশ্বাসে একবাক্যে এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি?

যাই হোক, হিন্দু সমাজের রেনেসাঁস অথবা রিভাইভালের সমকালে প্রতিবেশি মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে যে আলোড়ন এবং আত্মানুসন্ধান চলছিল তার ইতিহাস পাশাপাশি না রাখলে বাঙালি সমাজের সমগ্র চিত্রটা পাওয়া যায় না। ওয়াহাবি এবং পরবর্তী খিলাফত আন্দোলনের ইতিহাস সুবিদিত, কারণ সেগুলি সামাজিক বিস্ফোরণ। কিন্তু আভ্যন্তরিক নানা বিপরীতমুখী শক্তির টানাপোড়েনে দিগভ্রান্ত এবং কচ্ছপের মত নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া মুসলিম সমাজ, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ সে সময়ে করতে পারে নি। তবে সেই যে নীলদর্পণ-খ্যাত পাদরি লং সাহেব, তিনি ১৮৬৯ সালেই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে "মুসলিম সমাজ মরে যায় নি, নিদ্রায় (আত্মবিস্মৃতিতে?) আচ্ছন্ন হয়ে আছে।" তাই সমসাময়িক হিন্দু সমাজ যদি আত্মবিস্মৃত মুসলিম সমাজের দিকে নজর না দিয়ে থাকে, তবে ব্যাপারটা তখন হয়তো অস্বাভাবিক হয় নি। কিন্তু সেদিন মুসলিম সমাজের ভিতরে ভিতরে কোথায় রক্তক্ষরণ হয়ে তাকে অবসন্ন করে রেখেছিল তা আজকের দিনে স্পষ্ট করে জানার প্রয়োজন আছে।

ড. রফিউদ্দীন আহমেদের মতে, এই আত্মবিস্মৃতির ঘোর কাটতে শুরু করে ১৮৭২ সালের প্রথম আদমসুমারির পর। এতকাল যে-বাঙলাদেশকে প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত বলে মনে করা হত, হঠাৎ এই জনগণনার ফলে দেখা গেল, তার শতকরা ৪৮ জন অধিবাসীই মুসলমান। হুগলির পূর্বে আর দক্ষিণে কোনো কোনো জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৬০ ভাগ ছিল তখন। আর বগুড়া, রাজশাহী আর পাবনায় ৭০ ভাগেরও বেশি। এই বিরাট জনসংখ্যার অতিবৃহৎ অংশ দরিদ্র নিরক্ষর চাষী বলেই কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। তা ছাড়া বাঙালি মুসলিম সমাজের আত্মপরিচয়ে সেদিন একটা স্ববিরোধ, একটা আত্মখণ্ডন ছিল। তার নির্মোহ চিত্র ইদানীং বাংলাদেশের আধুনিক তথ্যনিষ্ঠ আত্মানুসন্ধানী বহু গবেষক স্পষ্ট করে তুলছেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় আবিষ্কারের যে যন্ত্রণা, সেটা বাঙালি হিন্দু এখনও ঠিকমতন উপলব্ধি করেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্রাহ্ম হওয়ায় নিজেও এই যন্ত্রণার শিকার হয়ে ছিলেন। তাই এই সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা তাঁকেও করতে হয়েছে। ১৯১২ সালে তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "আমাদের দেশে বর্তমান কালে কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্ম সমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে।" এই তর্কের উত্তরে তাঁর বক্তব্য "আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীত কাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্যলক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

"এরূপ কখনও সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই ; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।"

ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে তিনি 'সমাজ' আখ্যা দিতেই অনিচ্ছুক। যেহেতু ধর্মকে পরিবর্তন করা যায়, তাই ধর্মগত পরিচয় নাকি 'নিত্যলক্ষণ' নয়, সেটা সাম্প্রদায়িক এবং পরিবর্তন-সাপেক্ষ পরিচয়। আবার 'হিন্দু' শব্দটি তাঁর কাছে কেবলমাত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম নয়। আসমুদ্রহিমাচল এই উপমহাদেশীয় ভূখণ্ডের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু। তাঁর এই সমাধান তাঁরই ভাষায় উপস্থিত করি "পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে, কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কি করিয়া?"

"তবে কি মুসলমান অথবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দু সমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই, কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রিস্টান ছিলেন...। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রিস্টান। খ্রিস্টান তাঁদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাঙলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছেন, হিন্দুরা অহর্নিশি তাঁহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাঁহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রিস্টান, এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য, সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে, তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত, অসংগত তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গ্রহণ করা যদি-বা সহজ এবং অসচেতনভাবে হয়তো বা অনেকখানি গৃহীত হয়েছে বলেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় ইতিমধ্যেই হিন্দু সমাজে পুনর্বিলীন হতে চলেছেন, কিন্তু মুসলিম আর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বেলায় ব্যাপারটা তত সহজসাধ্য নয়। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের পক্ষে হিন্দু সমাজের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তা স্থাপন কঠিন হয় নি, কারণ "শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও...বহুশত বৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে।" ফলে, হিন্দুসমাজসমুদ্রে ব্রাহ্ম জলস্তম্ভের উত্থান এবং পুনর্বিলয় একশো দেড়শো বছরেই ঘটতে চলেছে। তুলনায় হিন্দুর উপাসনাবিধি, দর্শন, ভক্তিতত্ত্ব, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইসলামকে, এমনকি বাংলাদেশেও, ততখানি স্পর্শ করে নি। তাই সাতশো আটশো বছরেও ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় যে হিন্দু সমাজে বিলীন হবেন, তার কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। শুদ্ধি-আন্দোলনেও খুব ফল ফলবে, এমন আশা কম! এমনকি সেই 'নিত্য পরিচয়' দিতে একজন ব্রাহ্মর যতখানি মানসিক প্রতিরোধ রয়েছে, একজন মুসলমানের তার চেয়ে অনেক বেশি থাকাই সংগত।

তবু 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের শেষ বাক্যটি আমাদের সব সম্প্রদায়েরই প্রণিধানযোগ্য "যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় একথা কখনো শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত পথে না হলেও 'নিজের পদরক্ষার স্থানটুকু' থেকে বাঙালি মুসলমান কিভাবে নিজের আত্মনির্বাসন ঠেকিয়েছেন সেই ইতিহাস স্মরণে রাখা ভালো। বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানের এই জাগরণও যথাযোগ্য স্থান পাবার অধিকারী। এই জাগরণ এবং আত্মপরিচয় আবিষ্কারের ইতিহাস একটি বিরাট সমাজের সংশয়জীর্ণ দ্বিধাবিভক্ত সত্তার সুস্থ সংহত সত্তায় প্রত্যাবর্তনের যন্ত্রণাময় কিন্তু জয়যুক্ত ইতিহাস।

সমসাময়িক বাঙালি মুসলিম সমাজ ভিতরের আর বাহিরের সমস্যাগুলিকে কিভাবে দেখেছিলেন, বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং প্রতিকার করতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁদের মুখ থেকেই শোনা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' গ্রন্থ থেকে অনেকখানি উদ্ধার করে দিলাম। তা না করে নীরস একটি সারাংশ দেওয়া যেত। কিন্তু বহু পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন ব্যক্তির এই সম্পাদকীয় এবং মন্তব্যগুলি একে তো প্রামাণিক দলিল, তার উপর আবার এমন আবেগসংরক্ত যে তার রসগ্রহণ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা করল না। উদ্ধৃতিগুলি পুনর্বিন্যাস করার সময় মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমপরিণতিকে ধরবার চেষ্টা করেছি। একদিকে তখন তাঁরা ইংরেজ শাসকশ্রেণীর সন্দেহের পাত্র, সুতরাং কৃপানুগ্রহ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বঞ্চিত। অন্যদিকে, সরকারি কৃপাপুষ্ট উন্নতিশীল হিন্দু সমাজের তাঁরা অবজ্ঞার পাত্র। অবস্থাটা খুব সুখের নয়। তাই প্রতিক্রিয়াও অনেক সময়েই বেশ তিক্ত

"ইংরেজকে দেবতার জাতি ও ফেরেশতার সমাজ বলিয়া আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই। অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারাও স্বার্থের দাস।"

"ইংরাজ আমাদের উন্নয়নকার্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাঁহার ভেদনীতিই আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। ইংরাজের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ পার্থক্যের রেখা—তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে। তাই আজ হিন্দু মুসলমান হইতে বহু দূরে—তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে আজ প্রীতির অভাব ঘটিয়াছে।...ইংরাজ ভারতে নানা কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদের পুরুষগৌরব বজায় রাখিয়া তিনি যদি আমাদের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা লাভ করিতেন।"

...মুসলমান জাতি চিরকালই রাজভক্ত। যে জাতি একেশ্বরবাদী, তাঁহারা রাজভক্ত না হইয়া পারেন না। মুসলমানের ধর্মে আঘাত না পড়িলে তাহারা কদাচ রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় না। সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি যে সকল ঘটনায় মুসলমানগণ রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, সে সমস্তই ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট।"

"বর্তমান সময়ে মোসলমানগণের ইংরেজ গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহের সমকক্ষ হওয়াই একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা অন্য জাতির প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাহাদের ধন, মান, প্রাণ এমনকি ধর্ম সর্বস্বত্ব কলুষ-কালিমাময় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ...ধর্মগত কর্তব্য পালন করিতে আপনারা সর্বদাই বাধ্য এবং রাজার আইন ও খোদার আইন পালন করা প্রত্যেক মোসলমানের ধর্মগত কর্তব্য।"

"মুসলমান রাজত্বের দিনে হিন্দু যে আমাদের করুণার ভিখারী হইয়া গৌরবান্বিত হইত, আজ কি তাহা তাহাদের স্মরণ হইতেছে না ; আজ হিন্দু আমাদিগকে কেন ঘৃণা করে?...হিন্দু যদি বুঝিতে পারে মুসলমান তাহাদের নিকট-আত্মীয় এবং প্রতিবাসী ; অনেক দিন তাহারা মুসলমানের নিমক খাইয়াছে, তবেই তাহার স্বদেশদ্রোহিতা ঘুচিবে।"

"কিন্তু পরিতাপের—শুধু পরিতাপের কেন, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে কতিপয় উন্নতমনা ব্যক্তি ব্যতীত হিন্দুমাত্রেই সাধারণত মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা নহে—বরং ইহা প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত সত্য কথা। সেইহেতু এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয় যে সত্যই কি মুসলমান এত ঘৃণার পাত্র?"

"বাংলাদেশের হিন্দুভ্রাতারা মোসলমানদিগের মনে যত প্রকার উপায়ে নীচ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'মোসলমানেরা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ' এই কথাটি সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এই সাংঘাতিক বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া জগদ্বিখ্যাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিজয়ী বীর আরব ইরাণী, তুর্কী এবং পাঠানের সন্তানেরাও আপনাদিগকে চিরদাস, চিরনগণ্য, অর্ধসভ্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বংশজ বলিয়া প্রাণের ভিতরে কোনও প্রকার জাতীয় গৌরব বা শ্রেষ্ঠত্বের উদ্বোধন করে না। এই হীন ধারণা যতদিন পর্যন্ত দূরীভূত না হইবে, সে পর্যন্ত আমাদের ছাত্র ও যুবকদিগের মনে উচ্চ ধারণা ও প্রভূত পরাক্রমের কল্পনার কিছুতেই সঞ্চার হইবে না।"

"আর বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের কি অবস্থা? আমাদের মধ্যেও অধুনা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দুগণের তুলনায় সে সংখ্যা মহার্ণবের সহিত গোষ্পদের তুলনার ন্যায় নিতান্তই তুচ্ছ।...আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাহিত্যিক দুরবস্থার চিত্র এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা চক্ষুহীন লোককেও অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় না।"

"একবার চিন্তা করিয়া দেখ—শক্তির অভাবে, আমরা কেমন অপদার্থ জড়রূপে পরিণত হইয়াছি। এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্মীশূন্য কোনও মুসলমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই। অথচ এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে।"

"হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'কুলীন' আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ 'শরীফ' আছেন। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থলে এইরূপ শরীফদের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে।...এই-সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ কৌলিন্যমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নীচশ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষকশ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করিতে 'বিবাহের পণ' দাবি করিয়া বসেন।...ত্রিশ চল্লিশ টাকা হইতে দুশ পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ের বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।"

"বাঙ্গালার মুসলমানের অধঃপতনের যতগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে 'আশরাফ-আতরাফ' প্রভেদজ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়া চলিয়াছে, আর তার পরিণাম ফলে সমাজ আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

"এই দেশের মাটিতেই যে-সকল মুসলমান পরিবারের উদ্ভব হইয়াছে সেই পরিবারসমূহের অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি ধী-মান, শিক্ষিত, স্বধর্মপরায়ণ ও মার্জিতরুচি হন, তবে তাঁহারা কোন্ হিসাবে আশরাফের নিকট খাটো হইবেন? শরাফতের ইসলামসম্মত যে সংজ্ঞা আছে, সেই সংজ্ঞার মধ্যে যাঁরা পড়িবেন তাঁহারাই আশরাফ, আর সকলে আতরাফ।"

"বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক ধর্মগ্রন্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। ধর্মগ্রন্থের অভাব বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অভাবই বলিতে হইবে।"

...সমাজ বর্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীরসাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করিতে পারিলে প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতিক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ সমাজের উন্নতিকে অন্যূন আরো কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছেন।"

"ভারতে—বিশেষ করে বাঙ্গালায় মোল্লাদের সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতা সকলের মনেই একটা বিশ্রী অসন্তোষের ভাব ক্রমে জাগিয়ে তুলছে।...সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের দিকে যে যথেষ্ট কাজ করছে, তা এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বলা বাহুল্য, মোল্লারা অন্ধের মত কালাকাল বিবেচনা না করে, এই বিকাশের পথও আটকিয়ে রেখেছেন! মোট কথা, এঁদের কার্যকলাপ, হাবভাব পরিষ্কার করে জগৎকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে ইসলাম (?) মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহিত পা ফেলে চলবার মোটেই উপযুক্ত নয়। এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়?"

" 'আরব হামারা, চীন হামারা, হামারা হিন্দুস্তান'—মুসলিম কবি প্যানইসলামিজমের তারিফ বয়ান করতে গিয়ে ভাবে তন্ময় হয়েছেন। যাঁরা কল্পলোকে বাস করেন, তাঁদের কানে এ গানের সুর ভালোই লাগে। কিন্তু জগতের ইতিহাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে।...এমনি করেই জাতীয়তার দাবি সকল যুগে ধর্মের বাঁধন শিথিল করে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজিকার দিনে ক্রুসেড ও জেহাদের পুনরভিনয় সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"বাঙালি সমাজ ধর্মের নামে বড়াই করতে গিয়ে জাতীয়তার দাবিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। ইসলাম যে একটি ধর্ম, জাতি নয় একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বাঙালি মুসলিম—তাঁরা জাতিতে মুসলমান একথাটাই জোর গলায় প্রচার করছেন। তাঁরা 'নেশন' ও 'রিলিজনের' একই অর্থ করে বসেছেন।...আর আজ সহস্র বৎসর বাংলার জলবায়ুতে পুষ্ট মুসলিম সমাজ বাংলাদেশে একঘরে হয়ে আছেন। বাংলা দেশ আজও এঁদের ধাইমা। তাই জাতি জন্মের কথা উঠলে এঁরা বাংলার বাইরে দৃষ্টিপাত করেন।"

"আরবীয় মোছলমানের গৌরব যেমন চীন ও ভারতের মোছলমানের ভোগ্য ও প্রাপ্য, ভারত ও চীনের মোছলমানের গৌরবও তেমনি আরবীয় মোছলমানের প্রাপ্য ও ভোগ্য।...বস্তুত তাহারা ভাবের রাজ্যে, ধর্মের রাজ্যে, কর্তব্য ও কর্মের রাজ্যে পরস্পর এক। শিকলের অসংখ্য কড়া যেমন পরস্পরের সহিত পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ, সমস্ত জগতের মোছলমানগণও তেমনি একত্র সম্বন্ধযুক্ত।"

...এই নেশন বা জাতি সম্বন্ধে মুছলমানের আদর্শ স্বতন্ত্র।...মুছলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্মগত। বিশ্বের সকল মুছলমান মিলিয়া এক অভিন্ন ও অভেদ্য জাতি।... মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্বনাশ হইবে। এই আরবী ভাষাই বিশ্বমুসলমানের মিলনের একমাত্র অবলম্বন।"

"আরবী ও উর্দুকে বাদ দিয়া বাঙলায় বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।...শ্রেয়কে প্রেয়র উপরে স্থান দিতেই হইবে।"

"শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের পক্ষে ন্যূনাধিক উর্দু শিক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জ্ঞান করি।...উর্দূ ভারতের সাধারণ ও ভাবী রাজভাষা হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা ও এই আকাঙ্ক্ষা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করা কি মুসলমানের পক্ষে অনিবার্য নহে?"

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আরব পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে আমরা এদেশে আসিয়াছি; সুতরাং বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা নহে। আমাদের মাতৃভাষা আরবী পারসী না হইলেও নিশ্চয়ই উর্দু।"

"কোন্ গুণে উর্দূ আমাদের বরেণ্য? ভারতের অর্ধেকের বেশি মোসলমান কথা বলেন বাংলায়, আর অবশিষ্ট বলেন বিভিন্ন ভাষায়। তথাপি বাঙালি মোসলমানকে উর্দূ ধরিতে হইবে, আচ্ছা জবরদস্তি বটে!"

"দুনিয়াতে অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দূ না বাঙ্গালি?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। মুসলমান যেদিন হইতে বঙ্গজননীকে নিজের মাতৃরূপে বরণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সংবাদপত্রে আলোচনা বা সাহিত্য সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে বঙ্গভাষাকে তাহারা আপনার মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

"এদেশে মুসলমানের প্রাদুর্ভাব আর বঙ্গভাষার উৎকর্ষ--ইতিহাসের একই পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। মুসলমান বঙ্গ ভাষাকে নিজের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহারাই যে বঙ্গভাষার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দিতেছে।"

"বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"

"ভাষাকে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় শক্তিক্ষয় না করিয়া বঙ্গভাষার ভাবের ঘরে মুসলমানী ভাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ গুণে প্রয়োজন।"

"বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর যখন স্বহস্তে বঙ্গ ভাষার অঙ্গে বেশভূষা পরাইয়া দিতেছিলেন, তিনি 'বাদশার' 'দরবারে' 'মেজর' 'বন্দোবস্ত' না করিয়া 'রাজাধিরাজ চক্রবর্তীর রাজসভায়' 'উচ্চ কাষ্ঠ মঞ্চের' 'আয়োজন' দ্বারা বঙ্গভাষার কোমল বাল্যপদে কঠিন লৌহশৃঙ্খল পরাইয়াছিলেন।"

"বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে আমাদের চলিবে না। আধুনিক বঙ্গভাষা হিন্দু ভাবাপন্ন ইহা সত্য, কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? মুসলমানের ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতাই কি তাহার হেতু নহে?"

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতা রূপে গঠিত না করিতেন, তাহা হইলে মোছলমান সাহিত্যের গতি অর্ধপথে সহসা স্থগিত হইয়া যাইত না।"

"আজকাল ইংরাজী, ফার্সী, আরবী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার যে-সকল শব্দ বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাও একদিন অচল ছিল। অভাবে পড়িয়াই হউক, ভাষার সৌষ্ঠব ও শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই হউক, আর ওই-সকল ভাষার প্রবল প্রতাপে অভিভূত হইয়াই হউক—যাহা একদিন চলিত ছিল না, আজ তাহা বহু পরিমানে চলিয়া যাইতেছে। ইহাতে বাংলা ভাষার উপকারই হইয়াছে।...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"বাংলা ভাষাতেও আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব হিন্দুর অপেক্ষা কম না হইয়া বেশি হইবে।...বাঙ্গলা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার উদরে জন্ম গ্রহণ করিলেও, মোছলমানই তাহাকে আদর করিয়া রাজসিংহাসনের পার্শ্বে স্থান দিয়াছিলেন। তাহার হিন্দু মাতা তাহাকে লেংটি বা ধুতি পরাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মোছলমান আসিয়াই তাহার লেংটি খুলিয়া আচকান পাজামা, চোগা ও টুপিতে তাহাকে শাহজাদা করিয়া তুলিয়াছিলেন।...আমরা প্রয়োজন অনুসারে যেমন দীর্ঘসন্ধিসমাসবহুল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিব, তেমনি দরকারবশতঃ লম্বা চৌড়া আরবী ফার্সী এস্তেমাল করিতেও বিন্দুমাত্র কসুর করিব না।"

"কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপনাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কবি হেম-নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারাণ, নারাণ মধু যদু চুণীরাম পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিৎ চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না।..."

"বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়াই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথমে মোছলেম-হিংসার সূত্রপাত হয়।"

"আমরা দেখিতে পাইতেছি, হিন্দু ও মুসলমানী জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ বিভিন্নমুখীন, একের সহিত অন্যের যোগ তো নাই-ই বরং পরস্পর দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছে। ইহা বড় ভাল কথা নহে।...প্রিয় মুসলমান লেখকগণ!...হিন্দু সমাজের কোন কোন লেখক তোমাদের প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতি কোন কুধারণা পোষণ করিও না। যেমন তাঁহাদের কেহ কেহ তোমাদের বেদনা দিয়াছেন, সেইরূপ অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আবার একান্ত আপনার ন্যায় তোমাদের মনের কালিমাও মুছিয়া দিতেছেন।"

যে চৌত্রিশ জন খ্যাত অখ্যাত নাতিখ্যাত ব্যক্তির মত উদ্ধৃত হল, তাঁদের নাম বা পত্রিকার নাম উল্লেখ করি নি, কারণ আপাতত এই অভিমতগুলিতেই আমার প্রয়োজন। কোনো কোনো অভিমত কোনও পাঠকের অ-বাস্তব বলে যদি মনে হয় তবু মনে রাখা দরকার যে 'বাস্তব'টার এই চেহারাই ধরা পড়েছিল সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো মানুষের মনে। কারণটা যথার্থ বা সংগত হোক না হোক, মানসিক প্রতিক্রিয়াটা এরকমই হয়েছিল। এবং এই প্রতিক্রিয়ার যতটুকু সামাজিক মূল্য সে তাকে দিতেই হবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' কিংবা বিনয় ঘোষের 'সামায়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র' গ্রন্থগুলি একদেশদর্শী। কারণ, বাঙালি মুসলমানের জীবনপরিচিতি এবং মানসভাবনা ওইসব গ্রন্থে স্থান পায় নি। পূর্বসূরীদের এই অনারব্ধ কর্মটি সম্পন্ন করবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক নূরউল ইসলাম, মুসলমানের 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' সংকলন করে দিয়ে। আমার আশঙ্কা, এই গ্রন্থটি সাত-আট বছর আগে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও আমারই মতন আরো অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখানে। সেইজন্যেই এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি, তবু তা এই গ্রন্থের অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

এই স্বল্প সাক্ষ্য থেকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মুসলমানের আসল সমস্যাগুলি বেশ ধরা যাচ্ছে। একটি বিশ্বজনীন ধর্মের গৌরব, সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার বেদনা, মাতৃভাষার প্রতি সহজাত মমতা আর আঞ্চলিক যে সংস্কৃতি ধমনীতে বহমান তার মাধ্যাকর্ষণ—এই চতুষ্কোণ টানাপোড়েনে সেদিনের বাঙালি মুসলমানকে ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল। আর তার মধ্যে রাজনীতি এসে প্রবেশ করে এই সাংস্কৃতিক সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানকেও জটিল করে তুলেছিল। অবশেষে ভারত ভাগ করেও বাঙালি মুসলমান তাঁর ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছতে পারেন নি। অগত্যা বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এবং সেই সঙ্গে চলেছে বাঙালিত্বের প্রতিষ্ঠা। তাই বলে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তিগুলি যে সম্পূর্ণ পরাভূত, তা সম্ভবত নয়।

এই বাঙালিত্বের ধারণা এবং বাস্তব রূপ দুই বাঙলায় যে ঠিক একই রকম হবে, এটা প্রত্যাশা করা সংগত নয়। এইভাবে একই ভাষার দুই দেশে সমান্তরাল বিকাশের শ্রেষ্ঠ নজির ইংরাজি সাহিত্য। বনেদি ইংলন্ডে এবং হঠাৎ-নবাব এমেরিকায় ইংরাজি ভাষা আর সাহিত্য ভিন্ন পথে গিয়েও, অথবা গিয়েই, পরস্পরের সম্পূরক। তারই পুনরাবৃত্তি চলবে জারমান সাহিত্যে এবং বাঙলা সাহিত্যেও। দুই বাঙলার মানুষকেই মেনে নিতে হবে যে ভাষা আর সাহিত্যের মূল কাঠামোয় মিল থাকলেও দুই বাঙলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই দুই দেশের ভাষা আর সাহিত্যে একটা লক্ষণীয় পার্থক্যও থাকবে। কোনও দিক থেকেই এই পার্থক্যকে কৃত্রিম এবং সে কারণেই বর্জনীয় জ্ঞান করা ঠিক হবে না।

এই নৈকট্য আর দূরত্ব দুই দেশের মানুষের মধ্যে যে প্রেম-অপ্রেমের চিরন্তন 'দ্বন্দ্ব' (উভয়ার্থে) বাধিয়ে রেখেছে তারই বার বার প্রতিফলন হবে সাহিত্যে এবং আলাপচারিতেও। বাঙলা ভাষার বিকাশে যদি মুসলিম আনুকূল্য বেশি লাভ হয়ে থাকে, সাহিত্যের বিকাশে হিন্দুর প্রাধান্য এখন পর্যন্ত অস্বীকার করা যায় না। অতএব ভাষার আর সাহিত্যের আদৌ যদি কোনও 'স্বত্ব-স্বামীত্ব' থাকে তবে সেটা হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ভাগ না করে নিয়ে গত্যন্তর নেই। বাঙালি হিন্দু মুসলমানের সামান্য-লক্ষণ এই-যে মাতৃভাষা, এই ভাষাই দুই বাঙলার মানুষের 'নিত্যলক্ষণ'। তাঁদের আসল পরিচয়, তাঁরা বাঙালি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানের মনে একটা উপেক্ষিত হবার অভিমান আছে। হিন্দুর সাহিত্যে মুসলমান সুবিচার পান নি এই দুঃখ যেমন বদ্ধমূল অধিকাংশ মুসলমানের মনে তেমনি হিন্দুর রচিত বিরাট বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র মুসলমানের জীবনযাত্রা মুসলমানের ভাবনাবেদনা অতিক্ষুদ্র স্থান পেয়েছে, এও এক স্থায়ী মনঃক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাপারটা বোধহয় খুবই স্বাভাবিক। যে সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় নেই, যার ভাবনাবেদনায় যথেষ্ট প্রবেশ করেন নি লেখক, তাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যাওয়া বিপজ্জনক। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে হতে পারে। যদিও কবি গোলাম মোস্তাফা বলেছিলেন, "বাংলা ভাষায় কোন কবি এমন করিয়া মুসলমানের প্রাণের কথা বলিতে পারেন নাই...বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও আমরা ইসলাম-বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই।" তবু অন্য কেউ যে খুঁজে পান নি তা কিন্তু নয়। 'দুরাশা' গল্পের বাদশাহ্জাদা বদ্রাওন কুমারীকে স্মরণ করুন। এই কাহিনীর জন্য 'নবনূর' পত্রিকায় জনৈক সমালোচক বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন "রবিবাবুর এই কল্পনায় মুসলমান সমাজ খুবই সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বঙ্গের প্রিয় কবির তো এই কীর্তি, সুতরাং তাঁহাকে ধন্যবাদ!" অতএব বোঝা যাচ্ছে, কারুরই সততা সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়!

অন্য লেখকের কথা বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাই আবার বলি। বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যেও মুসলমানের উপস্থিতি এতই সামান্য বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন, তাঁদের কাছে তথ্য হিসাবে পেশ করি যে তাঁর প্রথম যুগের প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসের এবং অধিকাংশ গল্পের মুখ্য চরিত্রগুলি ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই এটা অব্রাহ্মণের প্রতি সচেতন উপেক্ষা নয়। তাঁর শোভনলাল (বৈদ্যসন্তান)-লাবণ্য দত্ত-এলা দাশগুপ্তরা এসেছেন একেবারে শেষের দিকে। প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাই, আর শচীশ—তাঁরা জাতিতে স্বর্ণবণিক। রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম চরিত্ররাও ব্রাহ্মণ। 'অতিথি' গল্পের 'ব্রাহ্মণ বালক' সম্বন্ধে নামের পাশে ওই অভিধাটিও বারবার সস্নেহে প্রযুক্ত হয়েছে এই কাহিনীতে। এটাই সম্ভবত স্বাভাবিক, কারণ ব্রাহ্মণ-পরিবারের আচার-আচরণের সঙ্গেই ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'পদ্মানদীর মাঝি' লেখা সম্ভব ছিল না, শরৎচন্দ্রের পক্ষেও না। যাঁদের ঘরকন্না, চিন্তাভাবনা কিংবা সুখদুঃখের সঙ্গে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, শুধু কল্পনার সাহায্যে তাঁদের জগতে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। কল্পনার দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে যায়। তখন অনধিকারচর্চার অপরাধে বিড়ম্বিত হতে হয়।

বাঙলা সাহিত্যের এই অভাব ঘোচাবার যথার্থ ক্ষমতা এবং অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরাই এবার এগিয়ে আসছেন। নূতন ভাব, নূতন ভাষা, নূতন মানুষ আর নূতন সমাজচিত্র আমাদের একঘেয়েমি দূর করবে অনেকটা। বাংলাদেশের সাহিত্যকর্মকে অস্বীকার করবার বা সে বিষয়ে অনুৎসুক থাকবার আর উপায় নেই আমাদের। শিল্পসাহিত্যের সত্যিকারের জোর থাকলে নিজের আসন সে কেড়ে নেবেই। ওই-বাঙলার কবিতা আর গবেষণাপ্রসূত রচনা ইতিমধ্যেই এখানে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। ভাষা আর সংস্কৃতির দূরত্ব অনতিক্রম্য কোনো বাধা নয়। এই-বাঙলাতেও গত যুগের অসচেতন ত্রুটি সংশোধন করতে সচেতন প্রয়াসে যখন 'প্রেম নেই' লেখা হয় তখন পাঠকের আগ্রহ পূর্বোক্ত বাধাকে সহজেই অতিক্রম করতে পারে।

নবাবি আমলে এবং তারপরেও বেশ কিছুকাল পারসি ভাষার চর্চা করেছেন হিন্দুরা। শুধু রাজদ্বারে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই যে হিন্দু এই ভাষার ব্যবহার করেছেন তা তো নয়। সাহিত্যের অন্তঃপুরেও আরবি পারসি শব্দের বহুল অনুপ্রবেশ ঘটেছিল স্বাভাবিক ভাবেই, পরবর্তীকালে যেমন ইংরাজির ঘটেছে। মুসলিম সমাজের অভিযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে বাঙলা ভাষার এই স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিহত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানও বলেছেন, "জাতীয়তাবাদ আর হিন্দুজাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হল সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার।" এই হিন্দু নবজাগরণের ফলেই হিন্দুরা সচেতন প্রয়াসে বাঙলা ভাষা থেকে আরবি পারসি শব্দ বর্জন করেছেন যেমন কিনা কাশীর পণ্ডিতরা হিন্দি ভাষার শুদ্ধিকরণ করেছেন সচল আরবি পারসি শব্দের জায়গায় অপ্রচল সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট করিয়ে। হিন্দি আর হিন্দুস্তানি ভাষার সামাজিক আর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এখনও চলছে এবং রাষ্ট্রানুকূল্য সত্ত্বেও হিন্দিকে হিন্দুস্তানি ভাষার কাছে যে অনেকখানি ভূমিত্যাগ করতে হবে, তা এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সযত্নে-সংস্কার-করা হিন্দি কৃত্রিম এবং সেজন্যই এর প্রাণশক্তি তুলনায় কম। হিন্দুস্তানি মাটির অনেক কাছাকাছি বলেই অনেক বেশি প্রাণবন্ত আর সুখশ্রাব্য, অতএব এর অনেকখানি জীবনীশক্তি আছে—একথাও স্বীকার করতে হয়।

বাঙলা ভাষার দুই ভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার পিছনেও যে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধিকরণের মনোভাব প্রবল ছিল, এই মতটি সম্পূর্ণ মেনে নিতে আমার মন রাজি হয় না। বিশেষত এই ব্যাপারে যাঁকে প্রধান আসামি মনে করা হয়ে থাকে সেই বিদ্যাসাগর তো শুদ্ধিকামী 'হিন্দু' পণ্ডিত ছিলেন না। বেনারস সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের সঙ্গে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের যে মৌলিক পার্থক্য ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র তাতে কি হিন্দু পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত হচ্ছিল? এমনকি পাশ্চাত্য দর্শনের যে শাখা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলে প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনবিমুখ দর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে তাকে ঠেকাবার জন্যও শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে তিনি লড়াই করেছিলেন। সেই ব্যালেন টাইন-বিদ্যাসাগর বিতর্কের ঈশ্বরচন্দ্রই যে ভাষাবিষয়ে 'শুদ্ধি'প্রয়াসী হয়ে আরবি-পারসি বর্জন করেছিলেন—এই অভিযোগটা মেনে নিতেও আমার অসুবিধা হয়।

তাঁর শিক্ষাদীক্ষা এবং ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী বাঙলা গদ্যের একটি নূতন শৈলী তিনি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন যা নিত্যব্যবহৃত ভাষা থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। এই সাধু বাঙলা কৃত্রিম অবশ্যই। কিন্তু প্রাত্যহিক ব্যবহার্য যে 'স্বাভাবিক' ভাষা, তা দিয়ে তো তখন তাঁর প্রয়োজন মিটছিল না। জনসাধারণের কথিত ভাষার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করতে গিয়েই আরবি-ফারসির সঙ্গেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন কথিত ভাষাকে আধুনিক চিন্তন-মনন এবং নাগরিক সাহিত্যসৃজনের ভাষায় উন্নীত করতে গিয়ে যদি এই ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করাটাই তিনি উচিত বিচার করে থাকেন তবে তাতে কিছু ভ্রান্তি দর্শানো হয়তো যায়, কিন্তু তাকে সাম্প্রদায়িক-অসূয়া-প্রসূত মনে করলে অন্যায় হয়। "বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতারূপে গঠিত না করিতেন তাহা হইলে মোছলমান সাহিত্যের গতি অর্ধপথে সহসা স্থগিত হইয়া যাইত না"—একটি জটিল সাংস্কৃতিক সমস্যার এটি একটি অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা। আজকের দিনের আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশী সাহিত্যিক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিজীবীদের এ-জাতীয় ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয় বলে বিশ্বাস-করি না। সেকালেও মীর মোশাররফ হোসেন বা কায়কোবাদ এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেন নি।

শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষা এবং ফলত মুখের ভাষাও যে ক্রমেই সংস্কৃত-নির্ভর হয়ে গেল এবং আরবি পারসি ভাষার ব্যবহার সংকুচিত হতে থাকল, হিন্দুর পুনর্জাগরণই এর একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ নয়। নব শিক্ষাব্যবস্থা বোধহয় আরো বড়ো কারণ। তা ছাড়া, শিক্ষিত মহলে আরবি-পারসির কদর আগেও তো রাজানুকূল্যেই ঘটেছে। রাজাবদলের সঙ্গে-সঙ্গে যদি তার অব-মূল্যায়নও ঘটে থাকে, তবে সেটাও কি খুব অস্বাভাবিক? রাজদ্বারে ইংরেজি যত বেশি গৃহীত হতে থাকল আরবি-পারসিও সেই পরিমাণে স্থানচ্যুত হল। আবার লোকসাহিত্যের এবং সাধারণের ভাষার সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের ভাষার যতই দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকল সর্বদাব্যবহৃত আরবি পারসি শব্দের সঙ্গেও তেমনি দূরত্ব সৃষ্টি হল। দীনেশ সেন মশাই ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে, ''বর্তমান কালে গোঁড়া হিন্দুরা দিবারাত্র যে-সকল উর্দূ কি ফারসি শব্দ জিহ্বাগ্রে ব্যবহার করিয়া থাকেন লেখনীমুখে তাহা বদলাইয়া তৎস্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। এইরূপে 'হজম' স্থলে 'পরিপাক' বা 'জীর্ণ', 'খাজনা' স্থলে 'রাজস্ব', 'ইজ্জৎ' স্থলে 'সম্মান'...ইত্যাদি কথার প্রয়োগ করেন।'' কিন্তু বর্জনের তালিকায় কি কেবল আরবি পারসি শব্দই আছে? তদ্ভব শব্দ নেই? চলিত ক্রিয়াপদ নেই? এই গোঁড়ামিটা নাগরিক আভিজাত্যের গোঁড়ামি, শিক্ষিতের উন্নাসিকতা। জিহ্বাগ্রের ক্রিয়াপদ 'খাচ্ছি' যেমন করে লেখনীমুখে 'খাইতেছি' হয়ে যেত, তেমনি করেই 'জমি' ভূমিতে', 'খেসারৎ' 'ক্ষতিপূরণে' ''উন্নীত'' হয়ে যেত। একটা বিশেষ কালে একেই সভ্যভব্য ভাষার রীতি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। আমরাও অল্পবয়সে সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলে শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে যে তিরস্কার লাভ করতাম সেটা তাঁদের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির জন্য তো নয়, ভব্যতার সীমা লঙঘনের জন্যই। তেমনি মুখের ভাষার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে স্বল্পপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করলে যে 'আভিজাত্যে'র বোধ হত তার পিছনে সাম্প্রদায়িক মানসিকতার চেয়েও সামাজিক শ্রেণীভেদের মানসিকতা বোধহয় প্রবলতর ছিল। সবুজপত্রের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যখন চলিত ভাষা গ্রহণ করলেন তখন তাঁর ভাষাকে 'পিরালী' ভাষা বলে নিন্দিত করেছিলেন যিনি তিনিও একজন মুসলিম সাহিত্যিক।

যাই হোক, জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যও স্পাইরালের গতিতে এগিয়ে চলে, প্রায় একই জায়গায় ফিরে এসেও একটু উপরে থাকে। আজকের দিনে তেমন ছুৎমার্গী লেখক আর কজন আছেন যাঁদের 'পানি' স্পর্শ করলেই জাত যায়, কিংবা যাঁরা মান থাকতে 'জল'-স্পর্শ করবেন না? আজকের দিনে কোনো হিন্দুলেখক হয়তো অবনীন্দ্রনাথের মতন সহজ আনন্দে লিখতে পারবেন না, ''শুন গুলমুর্গা ফুল বনের বনমোরগ, ফজিরে উঠি খেলাই রুটি, পালকমুঠি চুজারে রোজ-ব-রোজ।'' কিন্তু এই যে শিবনারায়ণ রায় 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বাংলা দেশ থেকে ফিরে' লিখেছিলেন তাতে 'দেশ'-এর অধিকাংশ পাঠকের কাছে 'শাহাদাৎ', 'বেগানা', 'সরহদ্দ' ইত্যাদি শব্দ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একটু অপরিচিত ঠেকলেও নিশ্চয়ই প্রসঙ্গ থেকে অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হয় নি। এখানে আরবি-পারসির ধারা শুকিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু উরদু ও হিন্দুস্তানির প্রবল ধারা পশ্চিম-বাঙলার বাঙালিকেও অভিভূত করছে বোম্বাই-ফিল্ম, মুশায়রা, গজল ইত্যাদির মারফত। একটু সবুর করুন, এখানেও ক্রমে ক্রমে কাবিননামহ্‌, হেদায়ৎ, নাজায়েজ, খুতবা, মৌলুদ তবলীগ ইত্যাদি শব্দ আর একবার শিখে নেবেন হিন্দু পাঠকেরা। এতে অস্থির হলে চলবে কেন? ধীরে বন্ধু, ধীরে।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৪৫ (১৩৯১) সং ৫, পৃঃ ৪১২-২২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

সলমন রুশদী "মিডনাইট্স্ চিলড্রেন" লিখে কেবল পৃথিবীর সাহিত্যরসিক-সমাজে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু "দ্য সেটানিক ভার্সেজ" লেখার পর শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সারা দুনিয়ায় অসংখ্য লোক তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—অবশ্য বইটা না পড়েই প্রধানত। এমনটা যে হবে তা তিনি একেবারেই ভাবতে পারেন নি একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর এই বই যে অনেকখানি উত্তেজনা এবং উত্তাপও সৃষ্টি করবে এবং প্রচুর বিকোবে, এ বিষয়ে তাঁর প্রকাশকরা যথেষ্ট নিশ্চিতি না পেলেও যে অমন একটা অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতেন একথা আমার অন্তত মনে হয় না। প্রকাশকরা কেউ-কেউ পাকা জহুরি বটে, কিন্তু তাঁদের কষ্টিপাথরে ঘষে যে সাচ্চা সোনার দাগ যাচাই করে নেন সেটি সর্বদা সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য নয়।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রকাশকরাও মোটমুটি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশ একটা গরম জিনিস ছাপতে যাচ্ছেন এবং রুশদীও ভালোই জানতেন কেমন মুখরোচক বস্তু বাজারে ছাড়ছেন। জন্মসূত্রে মুসলমান বলে নয়, ইসলাম ধর্মতত্ত্ব আর মুসলিম ইতিহাসের ব্যুৎপন্ন ছাত্র হিসাবেই, তিনি যে বিষয়ে কলম ধরবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে বিষয়ে তন্ন-তন্ন করে জেনেও নিয়েছিলেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁর রচনায় দিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি কিছুকাল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করেছেন বলেও শোনা যায়।

যে কারণেই হোক, পয়গম্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। হজরৎ মহম্মদ যে-বাণীর বাহক সেই বাণীকেই শয়তানের উক্তি বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। পয়গম্বর যে বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন—তা অনাথাকে আশ্রয় দেবার জন্যই হোক বা শত্রুগোষ্ঠীর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করার জন্যই হোক—এই ব্যাপারটিকেই রুশদীর এত অনৈতিক মনে হয়েছে যে এটা নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আর অরুচিকর কাহিনী রচনা করতে বাধে নি তাঁর। এইরকম একটা বিরূপ মনোভাব থেকেই তিনি স্বল্পাচ্ছাদিত ইতিহাসের যথেচ্ছ বিকৃত চেহারায় ইসলামের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী পরিবেশন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর পারিবারিক ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।

পয়গম্বর, কোরান শরীফ এবং ইসলামের বিষয়ে তাঁর মনে যা-কিছু তীব্র সমালোচনা আছে সেসব নিয়ে সরাসরি প্রবন্ধ লিখে আক্রমণ করাটা তাঁর ধারা নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার ঐতিহাসিক নামধাম বেশ খানিকটা রেখেও দিয়েছেন যাতে তাঁর আক্রমণের উদ্দিষ্ট যাঁরা তাঁদের শনাক্ত করা কঠিন না হয়। কোথাও বা নামধাম, কোথাও ইতিহাস তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই বিকৃত করে নিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর উপন্যাসের বিতর্কিত অধ্যায় দুটি থেকে যা কিছু উদ্ধৃতি আমি ইতস্তত দেখেছি তাতে ইসলামের বাণীবাহকের যে ধরনের সমালোচনা আছে তার ভাষা ও ভঙ্গির ইতরতা আমার পক্ষেও পীড়াদায়ক ঠেকেছে, যদিও আমি নাস্তিক মানুষ। এটাকে রুশদীর অসাধারণ সাহস বা দুঃসাহস যাই বলা হোক না কেন, একথাও বোধ হয় বলা যায় যে এই কাজ করে কতখানি বিপদের ঝুঁকি তিনি নিচ্ছিলেন তা বোধহয় সম্পূর্ণ নিজেও বুঝতে পারেন নি।

নয়তো খোমেইনির ধমকের প্রথম ধাক্কাতেই অতখানি বিচলিত বোধহয় হতেন না। তা ছাড়া, এই যে তিন-চার মাস ধরে পুলিশ প্রহরায় আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে, এ তো সম্ভবত আজীবন চলবে। এতখানি যে প্রাণে বিপন্ন হবেন তা বুঝতে না পারার কারণ কি এই যে বহুকাল পশ্চিম দেশের পারমিসিভ সমাজে বাস করে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল? পরে, আক্ষরিক অর্থে প্রাণের দায়ে, দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন বটে যে কারুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু এটা স্পষ্টতই মিথ্যা কথা। ইসলামের ভিত্তি যে শাস্ত্র তাকেই তিনি শয়তানি গাথা বলেছেন এবং বলার একটা চতুর অনুষঙ্গও খুঁজে বার করেছেন। তাঁর অভিপ্রায়কে ভুল বোঝার কোনো ব্যাপার নেই। মহম্মদকে মেহাউণ্ড আখ্যা দেওয়ায় তাঁর কোনো মৌলিকতা নেই ঠিকই, তবু পাছে কেউ এর আপত্তিকর তাৎপর্য সবটুকু ধরতে না পারে তাই তিনি আগ বাড়িয়ে বলে রেখেছেন,

'Blacks all chose to wear with pride the names they were given in scorn, likewise, our mountain-climbing, prophet-motivated solitary is to be the medieval baby-frightener, the Devil's synonym Mahound.

অর্থাৎ তিনি সচেতনভাবে সুকৌশলে যা করতে চেয়েছেন সেটাই মুসলমান সমাজও স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর শেষতম পুস্তকে যে পদাঘাতটি আছে তা যাঁদের গায়ে লাগবার তাঁদের গায়ে ঠিকই লেগেছে এবং তাঁরা সঙ্গতভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আরো অনেককে ক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত করে তুলেছেন। রুশদী যতটা আশঙ্কা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশিই ক্রুদ্ধ হয়েছেন এঁরা। সবচেয়ে বেশি এই ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিয়েছেন লেখকের প্রতি এক ধর্মগুরুর মারাত্মক প্রাণদণ্ডের ঘোষণা। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে অনেক সময়ই মনে থাকে না সেটা কত দূর ছড়াতে পারে।

খোমেইনি এমন একটা হৈ-চৈ তুলে না দিলে বেশি লোকে বইটা পড়ত না এটা হয়তো ঠিক। যারা পড়ত তারাও বিশেষ কেউ বুঝতে পারত না বলে যাঁরা বলছেন তাঁরা অনেকে দাবি করছেন যে রুশদীর অতি-বিদগ্ধ রচনাশৈলী আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাধারণের অধিগম্য নয়। কেউ বা এসে বললেন, রুশদী জেম্‌স্ জয়েসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উত্তরসূরী...এক পাতা জুড়ে একটা বাক্য লেখেন! দুই লেখকের সম-মানের এমন অকাট্য যুক্তি শোনার পর মিডনাইট্‌স্ চিলড্রেন আর তাঁর প্রথম বই গ্রিমাস হাতের কাছে পেয়ে খুলে বসলাম। বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা না হওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তবে কি দুই প্রস্থ অর্থ আছে এই অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের? আর আমি উপরিতলেই ঠেকে গেছি? যাই হোক একটি বাক্যাংশ আমাকে চমৎকৃত করল 'because in autobiography, as in all literature, what actually happened is less important than what the author can manage to persuade his audience to believe...' এই তো! হাজার কথার এক কথা বলেছেন।

যে লেখক বা ভাবুক সমাজের অনুগামী নন, বরং অগ্রগামী—তিনি এমন কথা বলতেই পারেন যা চিরাচরিত সংস্কারকে আঘাত দেবে। কোনো লেখকের কতটা আঘাত করার নৈতিক অধিকার আছে আর পাঠকের আঘাত গ্রহণ করার নৈতিক দায়িত্বও আছে—এইসব নিয়ে অন্তহীন বিতণ্ডার পরিপ্রেক্ষিতে জানা কথাটাই আর-একবার মনে করিয়ে রাখা যাক। পুরানো সংস্কারকে যাঁরা ভাঙতে চান, নূতন ভাবনাচিন্তা যাঁরা করেন, তাঁরা অনেকেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বহুজনের অভ্যস্ত এবং সযত্নলালিত বিশ্বাসে আর আচার-আচরণে আঘাত দিয়ে থাকেন। স্বয়ং পয়গম্বরও আঘাত দিয়েছিলেন, প্রত্যাঘাতও পেয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও কম আঘাত করেন নি প্রতিপক্ষকে। আরব-পারস্যের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীকে ধ্বংস করেই ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল, একথাও সবাই জানেন।

অর্থাৎ—আঘাতমাত্রই সমাজের বা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর নয়—কোনো-কোনো আঘাত প্রগতির পথ প্রশস্ত করে। আধমরাদের ঘা মেরেই নাকি বাঁচাতে হয়। এইসব কথা আমাদের নিতান্ত অজানা নয়, কিন্তু সব সময়ে মনে থাকে না। তাই বলে আবার সব আঘাতই দেহমনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে, এ দাবি তর্কশাস্ত্রের নিয়মেও টেঁকে না, বাস্তবেও তেমনটা ঘটে না। কোনো-কোনো ট্রম্যা কত মারাত্মক হয় সেও আমাদের জানা আছে। কতখানি আঘাত কিভাবে কোথায় দিলে উপকার হবে, শরীরমনের ক্ষতি করবে না, তা জানেন বিচক্ষণ থেরাপীস্ট। রুশদী তেমন থেরাপীস্ট বলে বেশি লোকের প্রতীতি জন্মায় নি। আচমকা কোমরবন্ধের নীচে আঘাত করে একটা উত্তেজনা এবং অনেকখানি অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এতে বুদ্ধির শুদ্ধি কতখানি হবে তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

প্রতিতুলনায় আর্নল্ড টয়েনবীর সেই রচনার কথা মনে পড়ছে যার জন্য স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার আপিস আক্রান্ত হয়েছিল। কৌতূহল সত্ত্বেও এতদিনেও সেই রচনাটি স্বচক্ষে দেখতে পাই নি। তবে শুনেছি টয়েনবী নাকি তাঁর সেই প্রবন্ধে হজরত মহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির তুলনা করে, কেন তিনি দ্বিতীয় জনের মত পথ ও চারিত্র্যের বেশি গুণগ্রাহী, সেই কথাটাই ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছিলেন। এ জাতীয় বক্তব্যে সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানই একটু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন এবং রাজনীতির ব্যাপারীরা এই ক্ষোভকে ব্যবহার করে অনেকখানি জল ঘোলা করার চেষ্টাও করতে পারে। তবু এই-জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রচনা যেহেতু বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ বা কটূক্তি নয়, সীরিয়স আলোচনা, তাই এ নিয়ে তন্নিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিতর্কের সুযোগ থাকে। প্রতিপক্ষও কিছু যুক্তিতর্ক পেশ করে লেখকের প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে পারেন।

কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয় শুধু লোককে খেপিয়ে দেবার জন্য, সুস্থ মত বিনিময়ের জন্য নয়।

আবার রুশদী যখন বলেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে ঐতিহাসিক বহু চরিত্রের ও নামের সাদৃশ্য নেহাত-ই আপতিক, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর এই আত্মপক্ষসমর্থক উক্তি নিতান্তই কাপুরুষের মিথ্যাভাষণ। এই পর্যন্ত লিখতে-লিখতে খবর পাওয়া গেল আয়াতুল্লাহ খোমেইনির আজ মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মা যথার্জিত শান্তি লাভ করুক। কিন্তু তিনি তাঁর পিছনে আমাদের জন্য বিশেষ শান্তির সম্ভাবনা রেখে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পরেও ধর্মান্ধ বা অর্থগৃধ্নু ঘাতকের হাতে রুশদীর প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা কিছুমাত্র কমে নি।* এই-জাতীয় কোনও ঘাতকের হাতে আত্মবলি না দিয়ে কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও থাকেন তবু তাঁর এই দুর্বল আচরণকে মানবিক দৃষ্টিতে কতখানি নিন্দা করা যায় তার আলোচনায় আমি যাব না। কিন্তু কেউ যখন সক্রেটিস কি ব্রুনোর আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'রুশদী যদি সৎ লেখক হন তাহলে তাঁর রচনার প্রতিটি শব্দ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সমর্থন করে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করাই উচিত, আমি হলে তাই করতাম'—তখন বক্তাকে শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেব যে এত বড়ো কথা বলার অধিকার শুধু তাঁরই জন্মায় যিনি বলবার জন্য আর বেঁচে থাকেন না।

যাই হোক, রুশদী-খোমেইনি নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছি। তাঁর বইখানা এদেশে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত খুশবন্ত সিং ছাড়া আর কে কে সেই বই পড়েছিলেন জানি না। কিন্তু বইটা নিষিদ্ধ হতেই অগুনতি লোকের যে টনক নড়েছিল এবং বহু লোক পড়বার জন্য কুতূহলী হয়েছিলেন, সে কথা ঠিক। বই নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা প্রথমে আমিও অনেকের মতোই খুব অপছন্দ করেছিলাম। দেশে অশান্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রিয় হবার ভয়ে সরকার অব্‌সকিউরান্‌টিস্টদের তোয়াজ করছেন বলে মনে হয়েছিল। (এ ব্যাপারে আমি ভোটের হিসেবটা তেমন বুঝতে পারি না—যদিও সরকারের প্রতি এই দোষারোপ অনেকেই এবং প্রায়ই করে থাকেন। সংখ্যালঘুদের মনরক্ষা করে যদি তাদের সব ভোট-ও পান তবু এই দেশের কোন্ সর্বভারতীয় দলের ইষ্টলাভ হবে, যদি তারই ফলে

* পাছে এ বিষয়ে কারুর মনে কোনো অলীক প্রত্যাশা জাগে তাই আয়াতুল্লাহ্-র মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটেনের মুসলমান সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড. কলিম সিদ্দিকী ঘোষণা করে দিয়েছেন যে রুশদীর প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে। রুশদী যে ধর্মীয় আইন লঙ্ঘন করেছেন তার শাস্তি মৃত্যু! অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি চলে গেলেও হত্যার চেষ্টা চলছে, চলবে।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি যে সংখ্যাগুরু তাদের বিমুখ করেন?)

যাই হোক, নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে মত একটু পালটালাম যখন দেখলাম বোম্বাই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী—যাঁদের অধিকাংশই অমুসলমান—রাজীব গান্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি ছাপলেন। তখন মনে হল বইটাতে বিস্ফোরক কী আছে জানা দরকার। অগত্যা যাঁরা বইটা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মতামত যেখানে যতটুকু হাতের কাছে পেলাম পড়ে দেখলাম। আমি স্বীকার করব যে কেবল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বক্তব্য পড়েই আমার মনে হয়েছে যে ওই বইয়ের বিতর্কিত অংশটা তিনি ভালো করে পড়েছেন এবং সমস্তটা অনুষজ্ঞ ধরতেও পেরেছেন। এদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অন্য কারুর লেখা থেকেই আমার এ প্রত্যয় জন্মায় নি।

সেই সময় থেকেই লেখকের মতপ্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের সব রকম বই-ই অবাধে পড়বার নিরব্যূঢ় অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা গণতান্ত্রিক দাবি উঠেছে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে। আবার রুশদী এবং তাঁর এই বইকে কোনো মতেই ওই স্বাধীনতা বা অধিকার যেন দেওয়া না হয় তার জন্য পালটা দাবিও জোরদার হয়েছে। দুই পক্ষের এই দাবিদারদের মাঝখান দিয়ে স্পষ্ট একটা সাম্প্রদায়িক সীমারেখা টানা যায় বললে বোধহয় অন্যায় বলা হয় না। রুশদীর নিন্দা কোনো মুসলমানের মুখে শুনলেই অন্যপক্ষ নিশ্চিত হচ্ছেন, ইনিও তাহলে আর-সব মুসলমানের মতোই সাম্প্রদায়িক—সম্ভবত মৌলবাদের সমর্থক! আবার যখনই কোনো হিন্দু রুশদীর সমর্থনে মুখ খুলছেন অমনি তাঁর সম্বন্ধে অপর পক্ষের ধারণা জন্মাচ্ছে, ইনিও তাহলে সব হিন্দুর মতই মুসলমানের হেনস্থায় খুশি হন...তাদের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার মত মন নেই। ইদানীং কালে রুশদীর চেয়ে বড়ো অন্য কোনও বিভাজক দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষের মাঝখানে লক্ষ করি নি!

রুশদীর সমর্থকদের বক্তব্য অবশ্য ম্যাস মিডিয়াতে বিশেষ করে পত্রিকাতেই—বেশি পেয়েছি...অন্য পক্ষের কথা মুখে বেশি শুনতে পাই। কারণ এদেশের ম্যাস মিডিয়া তাঁদের হাতে তেমন নেই। এঁরা অনেকেই এসে বলছেন যে যাঁরা লেখকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কোমর বেঁধেছেন তাঁদের আসল উৎসাহের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ততটা নয়। এঁরা বেশির ভাগই ইসলামের কুৎসা ও মুসলমানের অপমানে চিরদিনই আনন্দ পান বলেই এই বই নিয়েও এত মাতামাতি করছেন। যদি নিরপেক্ষভাবে সবারই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করবার জন্য এঁরা উৎসুক হতেন তাহলে "নাইন আওয়ার্স টু রাম" কিংবা "রাম রিটোল্ড" কিংবা "ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য"-ও অবাধে পড়বার অধিকার অর্জন করবার জন্য তাঁরা কোনো আন্দোলন কেন ইতিপূর্বে করেন নি? হিন্দু সমাজ যদি এতই বেশি সমালোচনা-সহিষ্ণু এবং উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহলে আজও ওইসব বইয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে কী করে? আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে। ওই সব লেখকরা রুশদীর তুল্য নামি দামি নন বলেই এবং তাবৎ দুনিয়া ওঁদের হয়ে লড়তে এগিয়ে আসেনি বলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তো ওঁদের রচনা প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের!

আমি তাঁদের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি নি। উক্ত বইগুলির অন্তত একটির উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেখা যাক না হিন্দু সমাজের গার্জিয়ানরা কী বলেন! কিংবা ড. আম্বেদকরের যে বই ("রিড্‌ল্‌স অব হিন্দুইজম্?") মহারাষ্ট্র সরকার ছাপতে রাজি হয়েও এখন হিন্দু মৌলবাদীদের ভয়ে গড়িমসি করছেন, সাপের ছুঁচো গেলার দশায় রয়েছেন বেশ কিছুকাল যাবৎ, সে বইখানি যাতে অখণ্ডিত আকারে অবিলম্বে ছাপা হয় এই দাবিতে একটা আন্দোলন করুন না কেন উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীরা? এই দায়িত্ব কেবল দলিতদের উপরেই বর্তেছে কেন?

পাঁচ ছয় মাস ধরে রুশদীর বই নিয়ে শিক্ষিতসমাজে যে স্পষ্ট দুটি সাম্প্রদায়িক শিবির হয়ে গিয়েছে, এর পিছনেও আছে দেশের সামগ্রিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জের। ইদানীং হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে রামজনমভূমি আর বাবরি মসজিদের প্রবক্তারা জেদাজেদি করে যেখানে নামিয়ে এনেছে তাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আবার যেন তুঙ্গে উঠেছে। ফলে রুশদীর প্রাণদণ্ড ঘোষণায় একদিকে নৈতিক ধিক্কার যেমন সোচ্চার, অন্যদিকে নৈতিক প্রশ্রয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব হলেও সুস্পষ্ট। দুই পক্ষের প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৈষম্যের কারণ বুঝবার জন্য অন্য একটা ব্যাপারের দিকেও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।

ইরানের আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নী। এঁদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন সাধারণভাবে আয়াতুল্লাহ্-র পক্ষে তেমন যাবার কথা নয়। বিশেষত এই আয়াতুল্লাহ্ যেভাবে সুন্নী ইরাকের সঙ্গে ৮ বৎসর ধরে একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে এসেছেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে বিষ গেলার মতো করে সন্ধি স্বীকার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি ভারতীয় মুসলমানের বিরাগ যথেষ্ট প্রবল হবারই কথা ছিল।

কিন্তু আয়াতুল্লাহ্ শিয়া বা সুন্নী যাই হোন না কেন, তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসেও আর একবার ইরানে একটি আদি ও অকৃত্রিম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, স্বৈরাচারী শাহ এবং তাঁর পশ্চিমী আধুনিকতাকে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামের মূলে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করছিলেন, কোরান শরীফের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করছিলেন, সেই পরিমাণেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে সব ধর্মোৎসাহী মুসলমানেরই সমর্থন লাভ করছিলেন। মৌলবাদের একটা আদর্শগত আকর্ষণ তো থাকেই—শুদ্ধতায় ফিরে যাবার একটা আনন্দময় প্রত্যাশা! কিন্তু একদেশদর্শী গোঁড়ামি আর আপোসহীন নিষ্ঠুরতাই মৌলবাদকে ভয়াবহ করে তোলে কার্যক্ষেত্রে। তাই বাস্তবে দেখা গেল অগণিত হত্যার বিভীষিকায় অন্ধকার, রক্তপিচ্ছিল পথে যখন বিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করছিলেন খোমেইনি তখন অমুসলমানের চোখে খোমেইনির ভয়াল ভাবমূর্তি আর মৌলবাদের নঞর্থক দিকটাই বড়ো হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহু মুসলমানের চোখে—শিয়া সম্প্রদায়ের বাইরেও—খোমেইনির ভাবচ্ছবি অমন অবিমিশ্র কালো নয়।

খোমেইনি সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য আছে বলেই তাঁর ফতোয়া সম্বন্ধেও নির্দ্বিধ নিন্দাও যেমন ভারতীয় মুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না, তেমনি সামান্যতম সমর্থনও অমুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা বাতুলতা। খোমেইনির এই প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে না গেলে রুশদীর রচনায় মুসলমান সমাজের বেদনাকে একটু সহানুভূতির সঙ্গে সম্ভবত অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন হিন্দুসমাজ। তা তো হয়নি নি, বরং উলটে মুসলমানের আগ্রাসী চরিত্র বিষয়ে হিন্দুর মনে যে বদ্ধমূল একটা ধারণা আছে তাকেই আরো প্রবল করেছেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি। ঘটনাচক্রে আবার রুশদী সংক্রান্ত ব্যাপারে সুন্নী জগতের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রচারিত হবার আগেই শিয়া পারস্যের প্রতিক্রিয়া যেন আণবিক বোমার মতো ফেটে পড়ল। ফলে এই ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরাও মতামত গঠন করার বেলায় সেখান থেকেই সংকেত গ্রহণ করলেন। ইমাম বুখারির মতো ধর্মীয় নেতাও বলে বসলেন যে আয়াতুল্লাহ্-র বাণী ঈশ্বরের বাণী। এই নির্দেশ ভারতীয় মুসলমানের উপকার করে নি।

এদিকে খোমেইনি এভাবে প্রাণদণ্ড ঘোষণা করার অল্পকাল পরেই কিন্তু রিয়াধে অনুষ্ঠিত ৪৬টি মুসলিম রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রী-সম্মেলনে খোমেইনির ফতোয়াকে ইসলামবিরোধী বলে নিন্দা করা হল। ইরান বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও রুশদীর ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হল না, প্রধানত মিশর ও সৌদি আরবের প্রতিকূলতায়। এই ঘটনাটিকেই সংবাদ হিসেবে এদেশে এবং সর্বদেশের পত্রিকায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভালো খবরের চেয়ে চাঞ্চল্যকর আর অরুচিকর খবরকে আজও তাবৎ দুনিয়ার সাংবাদিক মহল অনেক বেশি প্রশ্রয় দেন...তাই নিয়ে নাচানাচি করেন এবং পাঠককুলকেও মাতিয়ে তোলেন। এই ব্যাপারেও একটা গ্রেশাম্স্ ল কাজ করে। খবরের কাগজে পাতা থেকে মন্দ খবর ভালো খবরকে হটিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য ধর্মগুরু হলেও খোমেইনি যে তড়িঘড়ি হুঙ্কার ছেড়েছিলেন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেটিও তেমন ধর্মবোধে নয়। নিজের দেশের আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে এবং সারা মুসলিম জাহানে তাঁর হৃতস্থান পুনরুদ্ধারের অভিলাষও ছিল ষোলো আনা—একথা সবাই বলেছেন। আবার মুসলিম দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী-সম্মেলনে এই ব্যাপারটাকে যে সরাসরি তাচ্ছিল্য করা হল তার পিছনেও রাজনীতিক রেষারেষি ছিল অনেকখানি। সে যাই হোক, তাতে অন্তত ভালো বই মন্দ হয় নি। এদিকে ইরাকি প্রেসিডেনট সদ্দাম হুসেন বলেছেন, রুশদীর বইয়ের চেয়েও ইসলামের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আয়াতুল্লাহ্-র এই হিংসাত্মক ঘোষণা আর তার অব্যবহিত পরবর্তী শোরগোল। কিন্তু এসব সুবুদ্ধির কথা এদেশে পৌঁছবার আগেই কাশ্মীরে তাণ্ডব হয়ে গেল, বোম্বাইয়ে রুশদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে অনেকের প্রাণ গেল।

পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে লেখককে প্রাণদণ্ডদানের মতো বর্বরতার যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিন্দা করবেন ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়—এটা তাঁদের সমগ্র মানসিকতার বিচারে যেমন স্বাভাবিক, ভারতীয় সম্মানও যে তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন এটাও এদের পরিস্থিতির বিবেচনায় তেমনি স্বাভাবিক। আবার এরই ফলে অনেকেরই মনে হচ্ছে যে আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সপক্ষে গেলেন হিন্দুরা এবং মধ্যযুগীয় স্বৈরতান্ত্রিক-ধর্মতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পক্ষে পড়ে রইলেন মুসলমানরা। পরস্পরের মানসিক দূরত্ব এই কয় মাসে আরো অনেকটা বেড়ে গেল।

অথচ রুশদীর রচনা মুসলমানকে কী ভাবে এবং কত দূর আহত করেছে সেটা হিন্দুরা পুরোপুরি জানেনও না, আপাতত জানবার মতো মনও নেই—কিন্তু জানার প্রয়োজন ছিল। তাই মুসলমানের এহেন ক্ষোভ ও ক্রোধের ঔচিত্যও উপলব্ধি করতে পারছেন না হিন্দু-সম্প্রদায়। হিন্দুধর্ম কোনো একটি শাস্ত্র-নির্ভর নয়। তবু কথায়-কথায় বলা হয়, 'এতে কি বেদ অশুদ্ধ হয়ে গেল?' অর্থাৎ যে কর্ম করলে বেদ অশুদ্ধ হয় তা নিতান্তই গর্হিত ও অকরণীয়। বেদকে অস্বীকার করে যেসব ধর্মের উত্থান ঘটেছিল এদেশে তাদের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রোষ কোন্ সীমায় পৌঁছেছিল স্মরণ করুন। বৌদ্ধধর্ম পাহাড়, সমুদ্র ডিঙিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। আজকের নববৌদ্ধদের প্রতি হিন্দু সমাজের মনোভাবও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা নয়।

প্রতিতুলনায় ইসলামধর্ম কিন্তু ওই একটিমাত্র শাস্ত্র-নির্ভর। যাঁরা কোরান শরীফকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানেন এবং তাঁদের জীবনচর্যার একমাত্র নিরিখ বলে জ্ঞান করেন তাঁদের যদি হঠাৎ বলা হয় ওটা নিতান্তই শয়তানের উক্তি, তাহলে তাঁদের পায়ের তলা থেকে একেবারেই মাটি সরে যায় না কি? ধর্মকে হারিয়ে সলমন রুশদীর হৃদয়ে শুনেছি একটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ যে একেবারে অতল গহ্বরে পড়ে যান...কুটোটিও ধরবার থাকে না, কোরান্ শরীফ হারালে। অতএব তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়বেন, এটা কি অপ্রত্যাশিত? কোনো শাস্ত্রই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় একথা আমি সর্বান্তঃকরণে মানি বলেই উলটো কথাটাও বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে কোনো শাস্ত্রকেই এমন সর্বতোভাবে কলমের এক খোঁচায় বাতিলও করে দেওয়া যায় না। কোন্ শাস্ত্রের কতটা রাখব কতটা ফেলব তার ঝাড়াই-বাছাই যুক্তির কুলো পেতে যদি করা হয় তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। আমার মনে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে তখনই যখন দেখি যুক্তির জায়গা জুড়ে বসেছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর অশ্লীল ইঙ্গিত।

কাইরোর এক সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত ইসলামতত্ত্বজ্ঞ অত্যন্ত উদারভাবে আহ্বান জানিয়েছেন যেন রুশদীর বক্তব্যের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়ে আর-একটি পুস্তক রচনা করা হয়। এ-জাতীয় প্রস্তাব আরো বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীও করেছেন। যেহেতু 'ভ্রান্ত মত নিরসনের ওটাই সভ্যজনস্বীকৃত মানবিক পথ'।...ওই পথেই চিন্তার নানা ধারা পরস্পরকে খণ্ডন ও পূরণ করে এগিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উপাদেয় মত পেশ করেছেন একজন আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী, আলী এ মাযরুই, যিনি এখন কর্নেল ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর মতে রুশদী যেহেতু তাত্ত্বিক প্রবন্ধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বই লেখেন নি, একটি কল্পকথাসম্বলিত উপন্যাস লিখেছেন, তাই তাঁকে যথাযোগ্য জবাব দেবার জন্য আর খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী মহলের পরমতসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর একটি উপন্যাস লিখতে হয়

'The real equivalent of comparative blasphemy would be in portraying the Virgin Mary as a prositute, and Jesus as the son of one of her sexual clients. Also comparable would be any novel based on the thesis that the twelve apostles were Jesus's homosexual lovers and the Last Supper was their last sexual orgy together. It would be interesting to speculate which ones of the leading writers would march in procession in defense of the "rights" of such a novelist.'

আলবার্তো মোরাভিয়া, আর্থার মিলার, সল বেলো, গ্রাহাম গ্রীন ইত্যাদি হাজারখানেক লেখকের কেউই আলী মায্‌রুই-এর সঙ্গে বিতর্কে বা উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে শুনি নি। হলেও এহেন বিকারগ্রস্ত কিন্তু উর্বর মস্তিষ্কের কাদা-ছোড়াছুড়ির ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের যে অপূর্ব বিকাশ দেখা যাবে তার প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই। আমার যে বন্ধুর সাথে এই নিয়ে মাঝে-মাঝেই তর্কবিতর্ক হয়েছে তিনিও বলেছেন, 'গালাগাল দেওয়া আর সাহিত্য রচনা এক জিনিস নয়। সাহিত্য রচনা একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র।' তবে তিনি হয়তো মানতে চাইবেন না যে রুশদীর রচনার অন্ত ওই অংশটা গালাগাল, সাহিত্য রচনা নয়।

কোনো সংশোধনই সম্ভব নয় যখন তাতে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা যুক্ত না হয়—তা ব্যক্তিরই হোক, সমাজেরই হোক বা ধর্মেরই হোক। সমাজবদলের হাতিয়ার হিসাবে মার্কসবাদের উত্থান আর পতন এক জন্মেই দেখতে হবে—এ আমাদের অনেকেরই সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। বরং আমাদের কিশোর বয়সে এইরকম একটা প্রত্যাশা ছিল যে লোভ মাৎসর্য স্বার্থপরতা, প্রভুত্বকামিতা ইত্যাদি মানুষের স্বভাবে যত মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে তার থেকেও উত্তরণ সম্ভব হবে মার্কসবাদী বিপ্লবের সাহায্যে। এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে দেখছি আর যে উপায়েই হোক সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ হলেও এটা আর প্রমাণিত হতে বাকি নেই যে ডাণ্ডা মেরে মনুষ্যচরিত্রের সত্যিকারের সংশোধন সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের উন্নয়নে সহিংস বিপ্লবের সামর্থ্য কতটুকু তার পরিমাপ করা হয়ে যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীতেই—আমাদের চোখের সামনেই। হিংসাত্মক বাক্যই কি লক্ষ্যবেদ করতে পারবে?

তাছাড়া আমরা আশা করেছিলাম বিজ্ঞান আর মার্কসবাদের কল্যাণে ধর্মমূঢ়তা কিছুটা দূর হবে। বিংশ শতাব্দী এদিক দিয়েও আমাদের স্বপ্নভঙ্গের কাল...সব মোহমুক্তি ঘটে চলেছে দ্রুত। বিজ্ঞানই যখন যুক্তির প্রসারে ব্যর্থ হয়েছে তখন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক যদি ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের মতো হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবাক হবার কী আছে? প্রযুক্তির জাদুকাঠির স্পর্শে বহিরঙ্গে যত আধুনিকতা, অন্দর-মহলে কোনো আলো যেন পৌঁছায় না—সেখানে হাজার-হাজার বৎসরের অযৌক্তিক অন্ধকার।

মাঝে-মাঝে কোনো বন্ধু এসে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে মুসলমানের অতিরিক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে উঠবার সময় এসেছে একথা স্বীকার করেন তো।' ইসলামের চোদ্দ শত বৎসরের ইতিহাসে কত যে প্রতিবাদী স্বর উঠেছে এবং কেমন করে ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে তার আমিই বা কতটুকু জানি যে অন্যকে জ্ঞান দেব! অগত্যা তাঁদের কথা অস্বীকার না করেই প্রশ্ন করি, অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস বিষয়েও হিন্দুর স্পর্শকাতরতা কতখানি সে খেয়াল আছে কি? ক-জন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত হিন্দু সন্তান আজও সর্বজনসমক্ষে স্বীকার্য করতে সাহস করবেন, 'সম্প্রতি আমার পিতা গত হয়েছেন, কিন্তু আমার মাকে আমি নিরামিষ আহার ইত্যাদি কৃচ্ছ্রতা পালন থেকে বিরত করেছি—তিনি মাছ মাংস আহার করেন!' আবার আমার তরুণী সহকর্মিণী অধ্যাপিকাদের মধ্যেও দেখি বিজ্ঞানে উচ্চতম ডিগ্রীধারিণীরাও সন্তোষী মায়ের, লুণ্ঠনষষ্ঠীর, শীতলষষ্ঠীর ব্রত পালন ক'রে পরম আত্মসন্তুষ্ট! তা ছাড়া অসংখ্য দীক্ষাগুরু তো আছেনই। এ নিয়ে তর্ক ফাঁদতে গেলে প্রায় মনোমালিন্য ঘটে। এ নাকি ঐতিহ্যে পা রেখে দাঁড়ানোর স্বাস্থ্যকর প্রয়াস। শাহবানুর লাঞ্ছনায় শরীয়তপন্থীদের বহু ধিক্কার দিয়েছিলাম। রূপ কানোয়ার মূক করে দিয়ে গিয়েছে আমাকে। সতীপ্রথা-সমর্থক শঙ্করাচার্যদের নববিধানের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন ক-জন বুদ্ধিজীবী? ধর্মের অনন্ত রহস্য অনুধাবনের পর আর তাঁদের অবসর কই! ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যাগুরুর গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা, স্পর্শকাতরতা অনেক বেশি ব্যপ্ত বলেই চোখে সেগুলি স্বাভাবিক লাগে আর সংখ্যালঘুরটা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঝে-মধ্যে দেখতে পাই বলে চোখে বড়ো বেমানান ঠেকে।

আবার হিংসার কথাতেই ফিরে আসি। আমাদের পলকা সাম্প্রদায়িক শান্তি পাছে ভেঙে পড়ে এই ভয়ে ভারত সরকার "দ্য সেটানিক ভার্সেজ"কে নিষিদ্ধ করেছেন এবং কারণটাও অকপটে স্বীকার করেছেন এটা ভালো। এই সাবধানতাকে সরকারের অহেতুক ভীরুতা যাঁরা মনে করেন তাঁরা তর্কের খাতিরে এই কথাও বলেছেন, 'কই, এত করেও কি সংখ্যালঘুর মন পাওয়া গেল? হিংসাকে ঠেকানো গেল কাশ্মীরে? বোম্বাইয়ে?' প্রথমত বলব, হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছে, সরকারের এই সময়োচিত সাবধানতায় মুসলমান সমাজ সত্যিই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আবার কাশ্মীর কি বোম্বাইয়ে যারা রাজনৈতিক ফায়দা করে নেবার চেষ্টা করেছিল এই সুযোগে, তাদের আন্দোলনকেও শক্ত হাতে দমন করবার নৈতিক অধিকারও সরকার সেজন্যই অর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদল বিরক্ত এই কারণে যে আদৌ ভারতবর্ষে কোথাও কোনো প্রতিবাদ উঠল কেন—আগেভাগে বইটাকে ঠেকিয়েও দাঙ্গাকে ঠেকানো গেল না কেন! এঁরা বুঝেও না বোঝার ভান করছেন যে বইটি নিষিদ্ধ না করলে এইরকম দাঙ্গা সারাদেশব্যাপী হবার আশঙ্কা ছিল যা সামলানো সত্যিই কঠিন হত সরকারের পক্ষে। আর সাবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি ছোটোখাটো অপঘাত ঘটে থাকে তবে তার দোষ সাবধানতায় বর্তায় না। কোনো যুক্তিতেই বলা যায় না যে এত অতিরিক্ত সাবধান না হলে এমনটাও ঘটত না।

এর বিপক্ষে একদল বলছেন, ভারতবর্ষে এই বই নিষিদ্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সারা বিশ্বে তো হয় নি। যেসব দেশে হয় নি সেসব দেশের বিরুদ্ধে...অন্তত তাদের দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ জানাবার গণতান্ত্রিক অধিকার ভারত সরকারের দেওয়া উচিত ছিল। আমি বলব, ছিল না। যে বড়ো অশান্তির আশঙ্কায় ভারত সরকার অধিকাংশ নাগরিকের এই বইটি পড়ার অধিকার হরণ করেছেন, ঠিক ওই যুক্তিতেই কিছুসংখ্যক নাগরিকের প্রতিবাদ জানাবার এই গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করাটা অনৈতিক হয় নি বলেই আমি মনে করি। সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমনতর সব প্ররোচনাকে ঠেকানো, তেমনি বোম্বাইয়ে যাঁরা প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করছিলেন তাঁদেরও ভাবা উচিত ছিল যে এই প্রতিবাদ অশান্তির সুযোগসন্ধানীদের কতখানি প্ররোচনা জোগাতে পারে। শিবসেনা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ঘাঁটিতে বসে আগুন নিয়ে খেলা কি শুধুই নির্বুদ্ধিতা, না অন্য কিছু?

হিংসার কথাটা সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেও ভাবা দরকার। মুসলমান সমাজের কেউ-কেউ মনে করেন খোমেইনির এই হুমকিতে খুব কাজ হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে সবিনয়ে আবেদন-নিবেদন করেও মুসলমান সমাজ সুবিচার বা সমাধান পান নি। কারণ খ্রিস্টান আর মুসলমানের রেষারেষি সেই ক্রুসেডের কাল থেকেই চলছে। তাই মুসলমানের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অবজ্ঞা আর ঈর্ষার মূল আছে বহু গভীরে। খ্রিস্টান দেশগুলি এখন সলমন রুশদীকে ভালো হাতিয়ার পেয়েছে মুসলমানদের হেনস্থা করবার জন্য। তাই এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? রুশদীর বই ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ করা কিংবা ইংল্যান্ডের ধর্ম দ্রোহিতা আইনের আওতা একটু প্রসারিত করে ইসলাম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মেরও স্পর্শকাতর দিকগুলিকে রক্ষা করার আবেদনে ব্রিটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নি। এই পরিস্থিতিতে খোমেইনির হুমকিতেই তবু কিছুটা সংযত হয়েছে লেখক প্রকাশক বিক্রেতারা! শুধু ইংল্যান্ডে কেন, কোথাওই বইটা খোলাখুলিভাবে বিক্রি করতে সাহস করছে না খোমেইনির অনুসারীরা দু-চার জায়গায় বোমা ফেলার পর এবং বোমা ফেলা হবে এই ভয় দেখানোর পর থেকেও।

এই যুক্তি মনকে বড়ো বিষণ্ণ করে। আয়াতুল্লাহ-র হুমকির আওতায় তো অসংখ্য মানুষ এসে পড়ছে ক্রমেই—শুধু রুশদী, তাঁর প্রকাশক আর বিক্রেতারাই নয়। বেলজিয়ামের সবচেয়ে বড়ো মসজিদের টিউনিসীয় ইমাম এবং তাঁর সৌদী আরবীয় সহকারীকেও ব্রাসেল্‌সের মসজিদেই হত্যা করা হয়েছে যেহেতু ওই ইমাম দূরদর্শনের কোনো অনুষ্ঠানে নাকি বলেছিলেন যে খোমেইনির প্রাণদণ্ড দেওয়ার হুমকি অনুচিত কাজ হয়েছে। সুইডেন-প্রবাসী এক পাকিস্তানি যেহেতু ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বইখানা উর্দু-ভাষায় অনুবাদ করা স্থির করেছেন তাই তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে তাঁর মালয়শীয় প্রতিবেশীকে হত্যা করা হল সম্প্রতি স্টকহোমে। এসব কি সমর্থন করা যায়? চোখ রাঙিয়ে, মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে সত্যিই কি কোনো ভাবনাকে ঠেকানো যায়? বরং ওতেই তো প্রতিস্পর্ধা বাড়ে। এই কারণেও যাঁরা মৃত্যুবরণ করবেন তাঁরাও তো অন্যপক্ষের শহীদ হবেন। রুশদী যদি নিহত হন তাহলে বাক্-স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহৎ আদর্শের জন্য তিনি আত্মবলিদান করলেন বলে তাঁকে আরো বেশি সম্মান দেওয়া হবে, তাঁর বই আরো বহু মানুষ বহুকাল ধরে পড়বেন। মোটেই সে-সব পুড়িয়ে ফেলা হবে না।

তা ছাড়া, হত্যা আর হিংসার একচেটিয়া এক্তিয়ার কি শুধু মুসলমানেরই আছে? অন্যরা কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়েই থাকবে? লনডনের বৃহত্তম মসজিদে বোমা ফেলেছিল এক যুবক ২২শে ফেব্রুয়ারিতে। এই সাইপ্রাস-দেশীয় যুবকটি এখন ইংল্যান্ডের নাগরিক। সে নাকি আদালতে অপরাধ স্বীকার করে বলেছে যে স্বাধীনতা হরণ করার জন্য যারা হত্যার ভয় দেখাচ্ছে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এটি স্বাধীনতার সপক্ষে তার লড়াই। বিচারপতি অবশ্য তাকে বুঝিয়ে বলেছেন যে হিংসার জবাবে আরো হিংসা করলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না—তাতে কেবল অরাজকতা বাড়ে।

কেউ-কেউ রুশদীর প্রাণদণ্ড বিষয়ে কাব্য করে বলেছেন, যে-তীর ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে, তাতে রুশদীর নাম লেখা আছে। একদিন না একদিন কোথাও না কোথাও ওই তীর তাঁকে বিদ্ধ করবেই। ব্রিটিশ পুলিশের সাধ্য নেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, মরতে তাঁকে হবেই। এই প্রত্যাশায় যাঁরা পুলকিত হচ্ছেন তাঁদের কাছে নিবেদন করি, সলমন রুশদীর যেদিন ঘাতকের হাতে মৃত্যু হবে সেই দিনটা মুসলমানের গর্ব করার নয়, লজ্জা পাবার দিন হবে। সব অমুসলমানের চোখে সেদিন তারা খানিকটা নীচে নেমে যাবে। কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়। হজরৎ মহম্মদের জ্যোতি এবং ইসলামের মাহাত্ম্য আপন শক্তিতেই চিরস্থায়ী হবে। এমন দুর্দিন কি সত্যিই এসেছে যে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের কীর্তিকে রক্ষা করবার জন্য ভাড়াটে ঘাতকের প্রয়োজন হবে?

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫০ (১৩৯৬) সং, ৩ পৃঃ ১৯৭-২০৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেদিকে আমাদের চোখ পড়েনি

স্বাধীনতা যে ভাঙা দেশ উপহার এনেছিল এবং চোদ্দ পুরুষের ভিটে হতে উন্মূল হয়ে এসে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে করুণ নাটকের সৃষ্টি করেছিল তার বিভীষিকাময় স্মৃতি, তিরিশের ঊর্ধ্ব বয়সী সবারই মনে রয়ে গেছে। কিন্তু এর পাশাপাশিই আর একটি অনুচ্চার, প্রায় নীরব—ও বিষণ্ণ নাটক চলছিল পশ্চিম বাংলার রঙ্গমঞ্চে, যা হয়তো অনেকেরই চোখে পড়েনি। স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, পাকিস্তান সৃষ্টি, ক্রুদ্ধক্ষুব্ধ বেদনার্ত হিন্দুসমাজ, সীমান্তের দুদিক হতে প্রবাহিত ভয়ার্ত জনস্রোত—এ সবের অন্তরালে ছিল একটি স্তব্ধ, বিমূঢ়, লজ্জিত, নিন্দিত ভারতীয় মুসলমান সমাজ—পশ্চিম বাংলায় এঁদের সংখ্যা এক কোটির কিছু কম ছিল। এঁরা তখন নিজেদের যতোই বিড়ম্বিত বোধ করুন এঁদের জন্য কেউ হা-হুতাশের অপব্যয় করেননি। কারণ, "এরাই তো পাকিস্তান চেয়েছিল।" অতএব পাকিস্তান চেয়েও যারা পাকিস্তানে যেতে পারেনি তাদের কান্না চোরের মায়ের অসহায় ও নীরব কান্নার মতো কেউ শুনতে পায়নি।

এক দশকেরও বেশি লেগেছিলো এই বিভ্রান্ত বিমূঢ় সমাজকে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে নিজের স্থান খুঁজে নিতে, মনস্থির করতে এখানে থাকা যাবে, না ওখানেই চলে যাব। এমনতর অস্থির চিত্ততার মধ্যে স্বাধীন ভারতে বাঙালি মুসলমানের যাত্রা শুরু হয়। সে ইতিহাস লিখবার মতো যথেষ্ট মালমশলা আজও সংগ্রহ হয়নি। আমাদের সাহিত্যেও সে কাহিনি বিশেষ নেই। কারণ যাঁরা লিখতে পারেন তাঁরা এই সমাজ এবং এর সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার খবর তেমন রাখেন না। আর যাঁরা এঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের মধ্যে তেমন সহৃদয় অথচ ক্ষমতাবান লেখক তো বিশেষ দেখতে পাই না।

সেদিন সীমান্তের দুই পাশে যে দুটি বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিহাসের পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের না ছিল লক্ষ্যের মিল, না ছিল তৎকালীন অবস্থার মিল। ফলে আজ পঁচিশ বছর পরে দুই বাংলার দুই মুসলমান সমাজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তারও গরমিল আসমান জমীন। এক পক্ষে যখন পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে অপ্রত্যাশিত কিছু বাধা পেয়ে দ্বিগুণ বেগে নব উৎসাহে সৃষ্টি ও অর্জনের ক্ষেত্র প্রসারিত করে চলেছিলেন, নতুন আত্মপরিচয়ে আবিষ্কার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন, অন্য পক্ষে পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজ তখন আত্মকরুণা আর আত্মবিশ্বাসে এবং বৃহত্তর সমাজের সন্দেহ ও ঔদাসীন্যের আবর্তে ক্রমশই নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছিলেন শামুকের মতো। নিজবাসভূমে এবার তাঁরা মনে মনে পরবাসী হলেন। একে আমরা কখনো মাইনরিটি কমপ্লেক্স বলেছি, কখনো দেশদ্রোহিতা বলেছি, কখনো বা পাকপ্রীতি বলেছি। কিন্তু এঁদের বিশেষ সমস্যাগুলি বুঝতে এঁদেরও সাহায্য করিনি ; নিজেরাও ঠিক মতো বুঝিনি। তার ফলে আজ ২৫ বছর দেখছি আমরা যদি বা ওই পারের মুসলমানদের মন কিছুটা বুঝতে পারছি, এ পারের মুসলমানদের মন মোটামুটি অনধিগম্যই রয়ে গেছে! আর এঁদের অন্তঃপুরচারিণী পর্দানশীনাদের মন? সে তো আরও দুর্বোধ্য।

স্বাধীন অথচ অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে অতিরঞ্জিত ভীতির সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ভয় যে শতগুণ হয়ে তাঁদের গ্রাস করে যাঁরা পাকিস্তান হবার পরেও এদেশে পড়ে থাকবেন, এই আশঙ্কা কতজন প্যাকিস্তানীকামী মুসলমানের মনে স্পষ্ট হয়ে প্রথম থেকেই দেখা দিয়েছিল তা জানি না। কিন্তু বাস্তবে যখন তাই অবস্থা দাঁড়ালো তখন মুসলমানরা তাঁদের জানমান সামলাবার তাগিদে সবচেয়ে বেশি বা সংরক্ষিত করতে তৎপর হলেন সে হলো তাঁদের স্ত্রী-সমাজ। তাই শিক্ষা কিংবা সাধারণ জনজীবন থেকে পশ্চিম বাংলার মুসলমান কন্যাদের প্রায় অপসৃতা হতে দেখি স্বাধীনতার পরই প্রথম কিছুকাল।

প্রতিতুলনায় এই পঞ্চাশের দশকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়েদের পক্ষে এক অভাবনীয় আত্মপ্রসারণের যুগ। দেশ বিভাগের মস্তবড় আঘাত লেগেছিল পূর্ব বাংলার প্রতিটি হিন্দু পরিবারে এবং এই বাংলারও বহু সংসারে। ঘর যখন আক্ষরিক অর্থে ভেঙে গেল তখন একান্ত গৃহগত জীবনের নিরাপত্তা, অভ্যস্ত ধারণা আর কর্তব্যের স্বস্তি, আর্থিক সাচ্ছল্য ইত্যাদি সব খুইয়ে অসংখ্য মেয়েকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল,—শুধু নিজের জন্যই নয়, সংসারের জন্যও। ফলে দশ বছরের মধ্যে কলকাতা এবং শহরতলীর দ্রুতবর্ধমান ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আর নানা ধরনের সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থিনী এবং জীবিকাপ্রার্থিনীর সংখ্যা কোথাও দশ গুণ কোথাও বা পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটল যেন প্রায় রাতারাতি। সবটুকুই তার শোভন সুন্দর সুখবহ হয়নি। এই স্ত্রী-স্বাধীনতার মূল্য মাঝে মাঝে বহু লাঞ্ছনা বেদনা ও শ্রম দিয়ে চুকাতে হয়েছে। অনেক চোরাগলি কানাগলির অন্ধকারে বহু মেয়ের আশাভরসা মানসম্মান হারিয়েছে। সেই সামাজিক ইতিহাস আঁকা আছে আমাদের সমসাময়িক সাহিত্যে চলচ্চিত্র নাটকে। তবু এই অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে হিন্দু সমাজের মেয়েরা আজ স্বাধিকারের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন সেখানে পৌঁছতে এই বাংলার মুসলিম মেয়েদের আরও বেশ কিছুদিন লাগবে।

আতঙ্কে অনিশ্চয়তায় পশ্চিম বাংলার মুসলিম সমাজ যখন এখানে নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছিলেন সবরকমে, হিন্দু সমাজ কিন্তু তখন ভয় ও ক্ষয়-ক্ষতিকে পিছনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ফেলে রেখে মাত্র এক তৃতীয়াংশ বাংলায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়েছিলেন। অতএব পাশাপাশি বাস করেও দুই সমাজের মনোভঙ্গিতে ছিল দুস্তর প্রভেদ। তারপর গত পঁচিশ বছরে দেশভাগের বিপর্যয়, বিপুলসংখ্যক শরণার্থী পুনর্বাসনের যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আত্মিক ক্ষয়ক্ষতি, নীতিহীন রাজনীতির নানা জাতীয় নিষ্ঠুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অবশেষে গত বছরে বাংলাদেশ লঙ্কাকাণ্ডের এত বড়ো আঘাতের ভিতর দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজ পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি সারা ভারতেই একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবি করতে পারে। মাঝে মাঝে বিদেশীদের মুখেও এ কথার সমর্থন পেয়ে ভরসা হয় যে, এ ধারণাটা আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়। অবশ্য আমি ভুলিনি যে, বয়স্কর সাক্ষরতা কিংবা সাধারণভাবে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেই আমরা অনেকগুলি রাজ্যের পিছনে পড়ে আছি, শিক্ষার মানে এ-রাজ্যে এমন দ্রুত অবনতি হয়েছে ইদানীং যে এখন অনেকেরই মনে হচ্ছে শিক্ষার নামে এই মহার্ঘ প্রহসনের আর প্রয়োজন কি? সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ক্রমশই পশ্চিম বাংলার পরীক্ষার্থীরা পিছু হটছে। আমাদের রাজ্যে বেকারী যে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে তার তুলনা ভারতবর্ষের খুব কম রাজ্যেই পাওয়া যাবে। এই রাজ্যে গত কয়েক বছরে শিল্পের প্রসার নয়, সংকোচন ঘটেছে—রাজনৈতিক কারণেই প্রধানত। আর্থিক অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এই বাংলার বাঙালির নাভিশ্বাস উঠত যদি না খেত-খামারের কাজ অব্যাহত থাকত। যে "বৈপ্লবিক" রাজনীতির প্রশ্রয়ে কল-কারখানার উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদান, আপিস-আদালতে কাজকর্ম সবই প্রায় অচল হতে বসেছিল সেই রাজনীতির রাহু চাষিদের যে যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাস করতে পারেনি এই আমাদের বহুভাগ্য। অবক্ষয়ের প্রায় শেষ ধাপে পৌঁছেও পশ্চিম বাংলার কৃষি ও কৃষ্টি যে লোপ পায়নি সেই তো পরম বিস্ময়।

এ কথা বলা বোধহয় অন্যায় হবে না যে, গত পঁচিশ বছর এ রাজার কৃষিতে মুসলমানের অবদান যত বেশি হয়েছে কৃষ্টিতে সে তুলনায় কিছু নয়। সংস্কৃতির ধারক-বাহক যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, বাঙালি মুসলমান সমাজে তাঁদের উদ্ভব কিছুটা বিলম্বে হয়েছে। তারপর আবার দেশভাগ হতেই মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ এ অঞ্চল থেকে বলতে গেলে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্মূল হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেন, চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বাণিজ্যের নায্য হিস্যা বুঝে নিতে। মাটি কামড়ে পড়ে রইল যাঁরা মাটির কাছাকাছি ছিল। তাই ২৪ পরগণা, হাওড়া বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার বড় জোতদার, ছোটো চাষি এবং ভূমিহীন খেতমজুর এক বিরাট অংশই মুসলমান। পশ্চিম বাংলার আর্থিক জীবনে এঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বার কয়েক সাধারণ নির্বাচনের কেনাবেচা দেখে নেবার পর থেকে এঁরা নিজেদের রাজনৈতিক গুরুত্বও বেশ অনুভব করতে পারছেন। ছোটোখাটো ব্যবসায় এবং গৃহকেন্দ্রিক শিল্পেও এঁদের চাতুর্য অনস্বীকার্য—এমন কি খেলার মাঠেও। কিন্তু যেখানে এদের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হয় সে হলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। শিক্ষায়, সাহিত্যকর্মে, কলাশিল্পে, অভিনয়ে কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাবে অবশ্যই এবং তাঁরা দুই বাংলার সংস্কৃতি-কর্মীদের পুরোভাগেই আছেন। তবু সংখ্যাগতভাবে এঁদের উপস্থিতি বড়ো নগণ্য। দু'-তিনটি আঙুলের কর গুণলেই ফুরিয়ে যান। তবে সংস্কৃতির যে ক্ষেত্রটিকে আমি এই মন্তব্যের বাইরে রাখব সেটি সংগীত।

মুসলমান সমাজের বিবর্তনের আরও একটি অভাবের উল্লেখ করতে হয়। মধ্যযুগের মানসলোক থেকে বর্তমানে যুগে আসতে সাহায্য করে যে ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার বাঙালি মুসলমান সমাজে তা প্রায় ঘটেনি বললেও চলে। এক ওয়াহাবী আন্দোলন ছাড়া। তারও প্রভাব সমাজের মধ্যে বেশি দূর পৌঁছয়নি। বাঙালি মুসলিম মেয়েদের ভাগ্যকে সহনীয় করবার জন্য জন্মাননি কোনো রামমোহন কি বিদ্যাসাগর। এমন কি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সরকারি ভাবে যে সব সংস্কারের প্রয়াস করা হয়েছে সেগুলিও মুসলিম সমাজকে স্পর্শ করেনি। মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ জাগবে এমন একটা ভয় থেকেই হোক কিংবা সংখ্যালঘুর মানসিক নিরাপত্তাবোধ অবিচল রাখার উদ্দেশ্যেই হোক স্বাধীন ভারতের সরকার সামাজিক সংস্কারমূলক আইন থেকে মুসলমান সমাজ বাইরে রেখেছেন। বিষয়টা সময় সময় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে।

যাই হোক যেহেতু পশ্চিম বাংলায় মুসলমান সমাজ এখনও মূলত গ্রামকেন্দ্রিক, যেহেতু এই সমাজে সংস্কৃতি সচেতন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সবে মাত্র নতুন করে আবার সৃষ্টি হচ্ছে, যেহেতু সংস্কারমূলক চিন্তা ও কর্মের একান্তই অনুপস্থিতি এই সমাজে তাই মেয়েদের অগ্রগতি কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। উন্নতি যতটুকু হলে ভালো হতো তা হয়তো হয়নি, কিন্তু একেবারেই হয়নি এ কথাও বলা চলে না। তা ছাড়া কেন যথেষ্ট উন্নতি হলো না ভবিষ্যতেও কি বাধা হতে পারে সেই বাধা দূর করার উপায় কিছু আছে কি না এ সব আলোচনা করারও কিছু সার্থকতা আছে।

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার আয়োজনে এক মস্তবড়ো পদক্ষেপ। কিন্তু এই শিক্ষা সূত্রটি প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতারা অহিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। কোনো মুসলিম মেয়ে ওই স্কুলে পড়তে পাননি, আজও পান না। কিন্তু বেথুন কলেজে প্রায় প্রথম থেকেই অহিন্দু মেয়েরা পড়াশোনা করার অধিকার পেয়েছেন। ১৯৩৭-৩৮ পর্যন্ত যে সব মুসলিম মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই বেথুন কলেজের ছাত্রী। একটু সংরক্ষণশীল পরিবারের অভিভাবকরা লরেটো কিংবা ডায়সীজনে মেয়েদের পাঠাতে চাইতেন না। ইতিমধ্যে কলকাতার উপরই দুটি ভালো মেয়ে ইস্কুল আভিজাত্য অর্জন করছে। বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের জন্য এবং মুসলিম সমাজের উদ্যোগেই সে দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর একটি আঞ্জুমান গার্লস স্কুল (১৯০৯) অন্যটি সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল (১৯১১)। ১৯৩৬ সাল সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালের আর্থিক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ক্ষমতা পেয়ে হক মন্ত্রিসভা মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মন দেন। ১৯৩৯ সালে বেবর্ন কলেজের প্রতিষ্ঠা হলো বিশেষ করে পর্দানশীনা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এর পর দশ বছর পূর্ণ হবার আগেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। তার আগে আর পরে ঘটলো সেই কলঙ্কময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ফলে মুসলিম সমাজে স্ত্রী শিক্ষার সম্প্রসারণ অকস্মাৎ বাধা পেল ; এর পর কিছুকাল কূর্মাবস্থা। স্বাধীনতার প্রথম ধাক্কাতেই হুড়মুড় করে মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বড়ো অংশ দেশত্যাগ করলেন। ফলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে ইস্কুল-কলেজে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা আগের তুলনার অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর আরও তিন-চার বছরে সেই সংখ্যা কমতে কমতে অনেক প্রতিষ্ঠানেই শতকরা পাঁচটি কি তারও তলায় এসে ঠেকল। কারণ ইতিমধ্যে আরও অনেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে ধীরে-সুস্থে ওদেশে চলে গেলেন ; এখানে তাঁদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই মনে করে। আমাদের পার্ক সার্কাস অঞ্চলের একটি ছোটো ইস্কুলের পরিসংখ্যান দেখলেই কথাটার সত্যতা বোঝা যাবে।

পার্ক সার্কাস গার্লস স্কুলে ১৯৪৮ সালে মোট ৯২টি মেয়ের মধ্যে ৮৬টি মেয়েই ছিল মুসলিম, অর্থাৎ শতকরা ৯৪ জন। ১৯৪১-এ মুসলিম মেয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৮ জনের মধ্যে ১০৫ জন শতকরা হিসেবে ৬৩ জন। এর পর সংখ্যা কিন্তু খুব দ্রুত কমতে লাগল ; ১৯৫২-৫৩ নাগাদ শতকরা ৫ জনেরও কম হয়ে গেল। অবস্থার অল্প অল্প উন্নতি দেখা গেল ষাটের দশকের কাছাকাছি সময়ে এসে। এখন ১৯৭২-এ সেকেন্ডারী বিভাগেই ২৮১ জনের মধ্যে ১১৪ জন মুসলিম মেয়ে। অর্থাৎ আবার শতকরা ৪০ জন উঠেছে সংখ্যা। সারা দেশ জুড়েই মুসলিম স্ত্রী-শিক্ষার ওঠা-পড়ার ছবিটা মোটামুটি এই রকমই। কিন্তু আজ যখন মুসলিম মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ আবার বাড়ছে তখন সে বিষয়ে একটু বিশেষ সরকারি সহায়তা প্রত্যাশা করা কি অন্যায় হবে? এই সেদিনও তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দেশের দুর্বলতর অংশগুলিকে বিশেষ যত্নে অগ্রসর হতে সাহায্য করা হবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় সব সময় পাই না। উদাহরণ হিসেবে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের অবস্থাটাই ধরুন। এই বিদ্যালয়টির সাহসিকা প্রতিষ্ঠত্রী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন বহু কষ্টে এবং নিজের সর্বস্ব দান করে এটি গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে। ১৯৪৮ পর্যন্ত কেবল মুসলিম মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তারপর থেকেই সবার জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হলো, সঙ্গতভাবেই। প্রথমে অল্প অল্প করে এলেও বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই শতকরা পঁচানব্বই জন ছাত্রীই হিন্দু পাওয়া গেল। এখনও তাই। কিন্তু এখন আবার মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এই স্কুলে ভর্তি হবার আগ্রহ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু সোজাসুজি admission test-এর প্রতিযোগীতায় ওরা তেমন পেরে উঠছে না। এক্ষেত্রে ওদের কি সামান্য একটু বিশেষ সুবিধে দেওয়া যায় না? ক্লাসে যদি ৪০টি মেয়ে থাকে তাহলে অন্তত ১০টি মুসলিম মেয়ে তার মধ্যে নিলে, admission test-কে কয়েক বছর একটু শিথিল করে, তবে খুব কি দুর্নীতি হবে? গণতন্ত্রেও তো যার যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতা সে অনুযায়ী সুযোগের সাম্য স্থাপন, সবাইকে সমান অধিকার দেওয়ারই ব্যবহারিক নামান্তর। অবশ্য সব সময় এমন বিশেষ সুযোগ দেবার দরকার করবে না। আমার পাশেই আছে কুইন অব দি মিশন কনভেন্ট। এবার যারা এখান থেকে Indian School Leaving Certificate পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করেছে তাদের মধ্যে ৪/৫ জন মেয়েই মুসলিম।

কেউ কেউ তর্ক করেন দেখেছি যে বহুবিবাহের ফলেই মুসলমান সমাজের লোকসংখ্যা হিন্দু সমাজের চেয়ে দ্রুত বাড়ছে। কথাটা আমার কাছে নির্বোধ এবং অগ্রাহ্য ঠেকে। এইবার যে সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, মুসলিম সমাজে জন্মের আপেক্ষিক হার লক্ষ্যণীয়ভাবে বেশি, তার কারণ পরিবার পরিকল্পনার ধারণা এবং অভ্যাস মুসলিম সমাজে এখনও যথেষ্ট—প্রসারলাভ করেনি। মোল্লা-মৌলবীরা এবং এক শ্রেণির নেতারা যতই উলটো কথা বলে মুসলমানদের উৎসাহিত করুন যে কওম-এর সংখ্যাবৃদ্ধিতেই শক্তিবৃদ্ধি, বেশির ভাগ নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মানুষ তাতে কান দিতে ব্যস্ত নন। বরং সরকারী ও বেসরকারিভাবে এ বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা খুবই অনুপযুক্ত। আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ধর্মীয় বা সামাজিক চিন্তায় মুসলিম মেয়েরা এতদূর অভিভূত নন যে হাঁড়িতে কতটুকু চাল আছে আর ঘরে ক'টি মুখ আছে সে হিসেব করতে তাঁরা অপারগ। পরিবার পরিকল্পনায় তাঁরা মোটেই অনিচ্ছুক নন ; তাঁদের জন্য সুব্যবস্থা চাই অবিলম্বে। আমি কিছুদিন শ্রীযুক্তা চিত্রলেখা ঠাকুরের সঙ্গে পার্ক সার্কাসের বস্তিতে ঘুরেছিলাম কয়েক বছর আগে, পরিবার পরিকল্পনা প্রচার করবার জন্য। দু'চার জায়গা থেকে সামান্য একটু বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য ছাড়া কোনো বাধা তো পাই-ই নি বরং অনেক মেয়েই এগিয়ে এসে উৎসাহভরে ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলেন। কারণ, দারিদ্র্য ও নিজের শারীরিক কষ্টের সঙ্গে তাঁদের যে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাতে ধর্ম আর সমাজ আবছা হয়ে যায়। এমন কি কয়েকটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নীচু গলায় এসে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁদের গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট করার কি কোনো উপায় নেই। কারণ, যে সন্তানগুলি রয়েছে তাদেরই তো দুবেলা পেট ভরে খেতে দিতে পারছেন না। আমরা এ বিষয়ে তাঁদের কোনো সাহায্য করতে পারিনি, কারণ ভ্রূণ বিনষ্ট করা (Medical Termination of pregnency Bill) তখনও আইনসিদ্ধ হয়নি। এই নিয়ে আমার কাজ করার উৎসাহ কমে গেল যখন দেখলাম যে, যাঁদের আমরা উৎসাহিত করে ক্লিনিকে কি হাসপাতালে পাঠাচ্ছিলাম তাঁরা সেখানে যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা পাচ্ছিলেন না, বারবার গিয়ে হয়রান হয়ে ফিরে আসছিলেন। মুসলমান পরিবার পরিকল্পনাবিমুখ, না ভেবে চিন্তে এমন কথা বলার আগে এই সব বস্তিতে বস্তিতে শিশুচিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনার কেন্দ্র স্থাপন করা হোক, সমাজকর্মীরা বস্তির ঘরে ঘরে কাজ করে দেখুন। তার পরে এ বিষয়ে কিছু বলবার অধিকার জন্মাবে। নিজেদের সত্যিকারের মঙ্গল কিসে সে বিষয়ে মুসলমানদের যতটা ধর্মমূঢ় মনে করা হয় তাঁরা যে ততটা নয় সে আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

মুসলিম সমাজের ভিতর থেকে সংস্কার কম হলেও প্রতিবেশি সমাজে যদি সংস্কার ও উন্নতি হয় তবে তার প্রভাব পড়বেই। শিক্ষা, আর্থিক, স্বাধীনতা, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে সমানাধিকার, সুপরিকল্পিত মাতৃত্ব এই সব বিষয়েই মুসলিম সমাজের মেয়েরাও দ্রুত যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠছেন। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিও এই বাংলার মুসলমানদের বহু বিশ্বাস ও অভ্যাসের মূলে নাড়া দিয়েছে। আমার ধারণা, বর্তমান দশকই হবে পশ্চিমবাংলার মুসলিমদের পক্ষে একটি আত্ম-প্রসারণ ও আত্মোন্নতির যুগ। এবং মুসলিম মেয়েরা সেখানে তাঁদের যোগ্য স্থানটি অধিকার করবেন সহজেই। কারণ তাঁদের আত্মবিশ্বাস, অধিকার ও যোগ্যতা হিন্দু মেয়েদের চেয়ে তো কম নয়। সমাজ ও দেশের সরকার যদি তাঁদের দিকে সহায়তার হস্ত প্রসারিত না করেন তবে সে কি তাঁদের অপরাধ?

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫।০৮।১৯৭২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হায় আমার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ!

ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমাদের সামনে একটা আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল মাত্র। ভারতবর্ষ কোনো কালে ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না, এই সাধু সংকল্প সত্ত্বেও চল্লিশ বৎসরে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রটি পর্যন্ত যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ এই যন্ত্রটিকে পরিচালনা করেন যেসব যন্ত্রী তাঁদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে পারেননি। দুই এক প্রজন্মের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস-বিশ্বাসের এত বড় বিবর্তন হয়তো সম্ভব নয় কোনো দেশেই। বিশেষত এই আদর্শের রূপায়ণে তো সরকারি বলপ্রয়োগের স্থান ছিল না। গণতান্ত্রিক দেশ বলে সম্পূর্ণতই নাগরিকদের সদ্‌ভাবনা ও শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করা হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল যে কিছু উচ্চশিক্ষিত উদার মানুষের দৃষ্টান্ত সামজের সর্বস্তরে ক্রমে সঞ্চারিত হবে।

বলপ্রয়োগ করেও যে ধর্মের প্রভাব কাটানো সহজ নয় তার প্রমাণ ইদানীংকালে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে ভুরি ভুরি পাওয়া যাচ্ছে। মার্কসবাদী সমাজে নিরীশ্বরতার চর্চা অঙ্কুশের সাহায্যে করা হচ্ছিল বলে স্বৈরতন্ত্রের জবরদস্তির সামনে কিছু কালের জন্য ধর্মবিশ্বাস পিছু হটেছিল বটে কিন্তু এখন আবার যেমন প্রবল উৎসাহে সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষ্ণ সচেতনা পর্যন্ত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে একটা ব্যাপার অন্তত প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, এই 'ড্রাগ' থেকেও উদ্ধার করা সহজ নয়।

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা যে ঠিকমত আরম্ভই করা যায়নি তার একটা বড় কারণ অবশ্য এই যে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এমন কি আমাদের নেতৃস্থানীয় মানুষদের মনেও যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। 'সেকুলারিজম', ভাষান্তরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটির কি অর্থ ধার্য করা সঙ্গত তা নিয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্যও সবসময়ে হয়নি। অবশ্য সংবিধানের ঘোষণা অনুযায়ী বোঝা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রথম স্তম্ভ হল বিশেষ কোনো একটি ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম বলে গ্রহণ না করা। সব ধর্মের মানুষেরই সমান অধিকার সাব্যস্ত করা।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। নিরপেক্ষভাবে সব ধর্মকেই সরকারি কাজকর্ম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাসন দেওয়া হবে কী? সব ধর্মকেই সরকারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও
আমার বই

~ www.amarboi.com ~

আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত করা হবে? অথবা সব ধর্মেরই প্রতি সমান সহিষ্ণুতা ও আনুকূল্য প্রকাশ করা হবে?

অনেকখানি ধর্মীয় উন্মত্ততার মধ্যে দেশ বিভাগ হয়েছিল এবং স্বাধীনতা এসেছিল। তবু যে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এই রাষ্ট্রকে কোনো বিশেষ ধর্মের অনুসারী বলে চিহ্নিত করা হয়নি এতে আমাদের একটা মস্ত বড় নৈতিক বিজয় হয়েছিল বলে আমরা অনেকেই এখনও মনে করি। চর্তুদিকে মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পরিবৃত হয়েও যে সেদিন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ভারত গ্রহণ করতে চেয়েছিল একে প্রশংসা না করে পারা যায় না। অবশ্য এর ব্যবহারিক প্রয়োজনও ছিল। কিছু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের সেদিন বুঝতে ভুল হয়নি যে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটা চোখের সামনে রাখতে পারলে এই দেশটাকে 'ধর্মযুদ্ধ' অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ থেকে অনেকটা রক্ষা করা যাবে। তা ছাড়া এই দেশের হিন্দু ও মুসলমান যে দুটি ভিন্ন নেশন-মুসলিম লীগের এই তত্ত্ব তো কংগ্রেস কোনো দিন নীতিগতভাবে স্বীকার করেনি, ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো কংগ্রেসী নেতা যাই মনে করেন। তাই ভারত বিভাগ স্বীকার করতে বাধ্য হবার পরেও দেশের মানুষের মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর করবার জন্যই হিন্দু ও অহিন্দু নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করবার একটা দায় আমাদের ছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে রেশারেশি করে যদি ভারতকে আমরা হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতাম তবে সেটা লজ্জাজনক আত্মখণ্ডন হত। তা না করে আমরা একদিকে যেমন দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম তেমনি সারা বিশ্বের চোখেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলাম আমরা।

হিন্দু সমাজের একটা গর্ব আছে যে, ইসলাম কিংবা খ্রিস্টধর্মের মতো পরধর্ম-অসহিষ্ণু নয় হিন্দুধর্ম এবং অন্য ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরণ করে নিজে মতে আনতেও উৎসাহী নয়। নানা ধর্মমত যে একই ঈশ্বরে পৌঁছবার নানা পথ এই কথা মেনে নিতে হিন্দুর মনে কোনো প্রতিরোধ নেই। ফলে সদ্য স্বাধীনতা লাভের আনন্দে ও ঔদার্যে এই দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ বোধ করেছিল সেদিনকার সংখ্যাগুরু সমাজ।

এই আত্মপ্রসাদ এমন আত্মধিক্কারে পরিণত হয়েছে কেন এখন? এর কারণ হিসাবে সব চেয়ে সরবে যে কথা বলা হচ্ছে তা এই ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি গোঁড়ামি আর মানসিক সংকীর্ণতা আঁকড়ে ধরে আছে পাছে তাদের সাম্প্রদায়িক আইডেন্‌টিটি লোপ পেয়ে যায়। সমাজের মূলস্রোত থেকে তারা সযত্নে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। অথচ তারা নিজেদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বার্থ ষোলা আনা গুছিয়ে নিচ্ছে! সরকারের চোখে তারা ধর্মের ষাঁড়, তাঁদের গায়ে আঁচড়টি লাগবার জো নেই। কিন্তু সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের স্বার্থের দিকে তাকাবার কেউ নেই। অতএব তাদের আক্ষেপ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হল সজ্জন, ধর্মনিষ্ঠ শিখও সৎব্যক্তি, ধর্মনিষ্ঠ খ্রিস্টানও হল সৎ নাগরিক কিন্তু হিন্দু যদি ধর্মনিষ্ঠ হয় তবেই যত দোষ, তাহলেই তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হবে। সমাজ সংস্কার ও প্রগতির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নামে হিন্দুর ব্যক্তিগত আইনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল কিন্তু মুসলমান কি ক্যাথলিকের ব্যক্তিগত আইনে হাত দিতে সাহস করেনি সরকার। পরিবার পরিকল্পনার নীতি হিন্দুর উপর চাপানো হচ্ছে কিন্তু মুসলমানরা, খ্রিস্টানরা তা গ্রহণ করছে না বলে তাদের জনসংখ্যা নাকি হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে! শিগগিরই তাদের সংখ্যাগত অনুপাত হিন্দুসমাজের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে যাবে বলে এখন থেকেই তারা দুর্ভাবনায় পড়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি গুরুতর কারণে এবার নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদেই হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য ডাক দিয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই আত্মরক্ষার জন্য প্রথম দাবি আমাদের সংবিধান সংশোধন করতে হবে, এই রাষ্ট্রকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে হবে। নইলে, দুর্বল হিন্দুর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে না। হিন্দুর স্বার্থরক্ষা সম্ভব নয়।

অসম রাজ্যে অহমীয়াভাষীদের তুলনায় অন্য জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে এইরকম একটা আতঙ্ক থেকে বিদেশী বিতাড়ন ও অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীকে নানাভাবে নির্যাতন করা শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে Xenophobia (জেনোফোবিয়া) বা ভিন্ন জনগোষ্ঠীর আতঙ্ক কী ভীষণ মরীয়া আর মারমুখী করে তুলতে পারে একটি স্বভাবত শান্ত ও সহিষ্ণু সমাজকেও। আর এই আতঙ্ককে যদি একটি চিত্তগ্রাহী সমাজতত্ত্বের উপর দাঁড় করানো যায় আর সেই সঙ্গে হিটলারের মতো একজন নির্বিবেক প্রায়োন্মাদ একনায়ক জনগণের সমর্থন লাভ করতে পারে তাহলে একটা অতি সভ্য দেশেও বর্বরতার কোন্ সীমায় নেমে যেতে পারে তার বীভৎস স্মৃতি লোপ পাবার সময় এখনও আসেনি। কোনো সমাজের ধর্ম, সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু অংশকেই যদি বিপন্ন বলে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় প্রচারের সাহায্যে, তাহলে তো অসঙ্গত হলেও এক যুক্তিহীন প্রচণ্ড আতঙ্ক আর বিবেকজ্ঞানহীন জঙ্গী মনোভাব সৃষ্টি করা যায় সংখ্যাগুরু জনমানসে। এ জাতীয় সামাজিক দুঃখজনক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যাবে ইউরোপে ফ্যাসীবাদের উত্থানের ইতিহাসে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট স্বামী চিন্ময়ানন্দ সম্প্রতি কলকাতায় একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের ৮৫ ভাগ মানুষ হিন্দু, অথচ তারা অবহেলিত এবং তাদের স্বার্থকে বলি দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুকে তুষ্ট করার জন্য। এই বিরাট হিন্দু সমাজকে জাগিয়ে তুলতে হবে যেন তারা আত্মরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হয়।

তাহলে কি ভারতরাষ্ট্রকে আগাগোড়া পরিচালনা করছে অবশিষ্ট ঐ শতকরা ১৫ ভাগ লোক আর তাদের শুভানুধ্যায়ীরা? হঠাৎ নিজের দেশেই এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে পড়েছে ৮৫ ভাগ লোক? এটা কোন্ রাজনৈতিক যাদুবলে সম্ভব তা আমার অন্তত বোধগম্য নয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নাকি দেশকে সংহত এবং ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করতে চায়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কি ভাবে এড়ানো যাবে যদি 'হিন্দু জাগরণের প্রথম উপলক্ষই হয় মন্দির মসজিদের একটি ঐতিহাসিক বিবাদকে গায়ের জোরে সমাধান করবার জন্য বিচারালয়ের রায়কে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবারা এই সংঘর্ষে সারা দেশের এবং দেশের বাইরে থেকেও হিন্দুদের জড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে বাস্তু ইট পুজোর বিধান দেওয়া হয়েছে। এই উদ্ভাবনায় রাজনৈতিক চাতুর্যের পরিচয় আছে। ধর্ম যখন রাজনীতির সেবাদাস হয় তখন ধর্মের নামে চূড়ান্ত অধার্মিক আচরণও সঙ্গত ঠেকে। নয়ত দেশে আইন আদালত থাকা সত্ত্বেও কি এমন ঘোষণা সুস্থ মনের সমর্থন পেতে পারে যে জোর যার মুল্লুক তার?

তাহলে কি আমরা এই দেশেও ফ্যাসীবাদের অবাধ জয়যাত্রা দেখব এবার? কিন্তু জার্মানী ছিল তুলনায় অনেক ছোট একটি দেশ। সেখানকার সংখ্যাগুরু খ্রিস্টান সমাজের চরিত্র হিন্দু সমাজের তুলনায় ছিল অনেক বেশি সংহত-সমধর্মী। তাই ইহুদী আতঙ্ক জাগিয়ে তুলে ফ্যাসীবাদের উত্থান যত সহজ হয়েছিল তত সহজ বোধহয় হবে না এই দেশে। একে তো আমাদের দেশটা বিরাট তায় আবার নানা ভাষাগোষ্ঠী আর বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সাংস্কৃতিক ও মুক্ত জাতিগত বৈচিত্র্যও রয়েছে। সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের ভিতরেই যে বিভেদ রয়েছে উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে মুসলমানবিদ্বেষ খুঁচিয়ে তুলেও সেই বিভেদ দূর করা যাবে কি? স্বামী অগ্নিবেশকে এখনও হিন্দুর মন্দিরে হরিজনকে প্রবেশাধিকার দেবার জন্য ব্যর্থ লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কাঁসি রামের লড়াই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে নয় এবং তাঁর অনুগামীরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বশংবদ নয়। তাই হঠাৎ একজন বাল থ্যাকারে কিম্বা স্বামী চিন্ময়ানন্দের নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষের হিন্দু-সমাজ হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেপে উঠবে এমন তো এখনও মনে হচ্ছে না। তবে আজ ভাগলপুরে কাল মীরাটে নরমেধ যজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া হবে, এ তো বোঝাই যাচ্ছে।

ইতিহাসের অবিচারকে সংশোধন করার পবিত্র দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা। তাহলে মুসলমানদের অবিচার শুধু কেন আর্যদের অধিকারের কথাও তাঁরা বিবেচনা করুন। আর্যরা এদেশের দ্রাবিড় ও আদিবাসীদের প্রতি যে অবিচার করেছিল তার সংশোধন করবে কে? জানি না কোন সর্বনাশা বুদ্ধিতে তাঁরা দেশ জুড়ে গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন। অযোধ্যার একটি অত্যন্ত স্থানীয় বিবাদকে তাঁরা সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য দুর্গাপূজাকে পর্যন্ত ইট পুজোয় পরিণত করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আমার ধারণা ছিল বিপন্ন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ফতোয়া দিলে মুসলমান সমাজেরই বিরাট অংশ হিতাহিত বিচার না করে অন্ধভাবে সর্বনাশের দিকে ছুটে যায়। এখন দেখছি ঠিক একই রকম বিধান দিয়ে হিন্দু সমাজেরও যে অংশের অন্ধ আনুগত্য আকর্ষণ করা যায় সেই অংশটিও নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়।

আমাদের একটা আত্মসন্তোষ ছিল যে যুক্তিবাদী বাঙালিকে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালিকে এই উন্মত্ততা স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের আত্মসন্তোষে চিড় ধরিয়ে চার হাজার ইট এই রাজ্য থেকেও যাত্রা করেছে। বাঙালিকে বীরত্বে দীক্ষা দেবার জন্য ভাগিনেয়ী

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরলা দেবী যখন বীরাষ্টমী ব্রত প্রচলন করেন এবং বীরপূজার জন্য জনৈক রাজা প্রতাপাদিত্যকে বাঙালির আদর্শ করে তুলবার চেষ্টা করেন তখন নাকি মাতুল রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করে বলেছিলেন, প্রয়োজন যেমন নানা উদ্ভাবনার জন্ম দেয় তেমনি সরলাও প্রতাপাদিত্য নামে জনৈক বাঙালি বীরের জন্ম দিয়েছেন। আমি ভাবছি এই বেদ উপনিষদের দেশে রাজনৈতিক মাথা ভাঙাভাঙির প্রয়োজন কি এতই তীব্র হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত ইটকেও পূজাবেদীর উপর বসাতে হল? এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও গিয়ে পৌরহিত্যের আসনে বসলেন? বাঙালির বড় গর্বের সেই উনিশ শতকীয় রেঁনেসাঁসের রেশটুকুও বুঝি আজ মিলিয়ে গেল!

কিন্তু এই আগুন নিয়ে খেলা কোথায় নিয়ে যাবে দেশকে ভাবতে দিশেহারা বোধ করছি। খালিস্তানী গেরিলাদের আঞ্চলিক হিংস্রতাকে দমন করতে আমরা হিমসিম খাচ্ছি। এ জাতীয় গৃহযুদ্ধ কি এবার আমরা রাজ্যে রাজ্যে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে যেতে দেখব? এই দেশের বৌদ্ধিক আবহাওয়া কিরকম হবে তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সংখ্যাগুরু সমাজের উপরেই, বিশেষ করে সে সমাজের আকার যদি সংখ্যালঘুর পাঁচগুণেরও বেশি হয়। একথাও ঠিক যে সংখ্যালঘুর মানসিকতার সঙ্গে নিরন্তর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলতেই থাকবে এবং সংখ্যালঘুরা যদি গোঁড়ামি আর আত্মকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে উঠতে না চায় তাহলে সংখ্যাগুরুর উপর তার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই। কিন্তু সংখ্যাগুরু সমাজও যদি ঘোষিত ভাবে গোঁড়ামি আর যুক্তিহীনতাকেই পথ বলে গ্রহণ করে তাহলে আর মুক্তির উপায় নেই।

ভারতকথা, ১৯।০৯।১৯৮৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় মুসলমান সমাজে আজকের মেয়েরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আপনাদের সভায় আজ মুসলমান মহিলাদের সমস্যা বিষয়ে দু-চার কথা বলার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে মুসলমান মহিলাদের যথার্থ প্রতিনিধি আমি নই। সত্যি বলতে কি হিন্দু মুসলমান কোনো সমাজই আমাকে প্রতিনিধি বলে দাবি করবার জন্য ব্যগ্র নয়। সে যাই হোক দুই সমাজের মাঝখানে থাকার একটা সুবিধাও তো আছে। আমি সেই সুবিধাটুকুর ষোলো আনা সুযোগ নিয়ে আমার বক্তব্য পেশ করব।

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের যে অংশটির সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সেটি প্রধানত মধ্যহিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত অংশ। তাই মুসলমান মেয়েদের সমস্যাগুলিই বেশি প্রাধান্য পাবে। তবু এই গণ্ডি অতিক্রম করে সমাজের নিম্নতর অংশের চেহারাটিও যে আমি দেখতে চেষ্টা করি না তা নয়।

আরো একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া যাক। এ দেশের এই দুটি প্রতিবেশী সম্প্রদায় আধো পরিচয় আর আধো অপরিচয়ের কুয়াশার ভিতর দিয়ে পরস্পরের যে ছবি এঁকে নিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ নয়। মুসলমান সমাজের মেয়েরা পুরুষের যতখানি অধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় বলে আমাদের ধারণা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রায় চোদ্দশো বৎসর আগে মুসলমান মেয়েদের কিছু অধিকার আইন সিদ্ধ হয়েছিল যা সমসাময়িক পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজের মেয়েরা তো পানই নি, এখনো অনেক তথাকথিত অগ্রসর সমাজেও সেগুলি গৃহীত হয় নি। পিতার বা মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার এত শত বৎসর ধরে মুসলমান মেয়েরা পেতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছেন যে তাতে করে একটা কর্তৃত্বের এবং অধিকার বোধের ভাব আমি লক্ষ্য করেছি আমার শ্বশুরকুলের মহিলাদের মধ্যে, যেটা আমার পিতৃকুলের মহিলাদের মধ্যে তেমন দেখি নি। 'ঘরজামাই' কথাটা হিন্দু সমাজের পুরুষের পক্ষে যতটা মর্যাদাহানিকর মনে করা হয়েছে চিরকাল, মুসলমান সমাজে ঠিক ততটা নয়। কারণ, আইনত স্ত্রী যে সম্পত্তির অধিকারিণী, স্বামীস্ত্রী দুজনে মিলে প্রথম থেকেই সেই সম্পত্তির ভোগদখল নিলে তাতে অসম্মানের কি থাকতে পারে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার বিবাহ-সম্পর্ক ব্যাপারটার প্রতি দুই সমাজের মেয়েদের চিরাগত মনোভাবেও একটু পার্থক্য আছে। স্ত্রী পুরুষের হৃদয়ের সম্পর্ক যদিও হৃদয়ের ধর্ম মেনেই চলে সব সমাজেই তবু বহু শত বৎসর ধরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ বলে তার একটা অস্পষ্ট অশুভ আশঙ্কা মুসলমান মেয়েদের অবচেতনে হাজার বৎসর ধরে একটি বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি করে রেখেছে যার সমতুল্য কিছু এতকাল হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ততটা স্পষ্ট ছিল না, এখন হচ্ছে। যাই হোক এর ফলে একটা ভয় আবার একটা আত্মনির্ভরতার ভাবও মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এসে গেছে। স্বামী স্ত্রীর তথাকথিত জন্ম-জন্মান্তরের যে বন্ধন খণ্ডাবার উপায় Hindu Code Bill পাস হবার আগে পর্যন্ত ছিল না, তাকে মাথা নত করে মেনে নেবার শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে চিরকাল। ইহকালে এই বন্ধন যত যন্ত্রণাদায়কই হোক না, তার সঙ্গে আপস করে নেবার মেরুদণ্ডহীন মনোভঙ্গিই হাজার হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছে এই মনুপরাশরের দেশে। আমরা হিন্দু নারীর আশ্চর্য পাতিব্রত্য আর সতীত্বের গুণগান করে একে কায়েম করে রাখতে পেরেছি। কিন্তু তার ফলে মেয়েদের ব্যক্তিসত্তাকে এতকাল যেভাবে খর্ব করা হয়েছে আর পুরুষদের ব্যক্তিসত্তাকে যে ভাবে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তোলা হয়েছে তার সংশোধন এক আধ প্রজন্মে হবে বলে মনে হয় না। আইন করে সমান অধিকার দিয়েও না। পিতৃ সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-বঞ্চিতা কন্যা যে যৌতুক পেত তাই ছিল তার স্ত্রীধন এবং নিজেকে ভরণ পোষণ করতে অক্ষম অশিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে এই স্ত্রীধনের প্রতি লোভ অক্ষমার্হ নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এখনো অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা কন্যারাও যে পরিমাণ পণ যৌতুক পিতার কাছ থেকে আদায় করে শ্বশুর-ঘর করতে যাওয়ার কোনো আত্ম-অবমাননা বোধ করেন না এবং তার পরেও নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে পিতৃ-সম্পত্তিতে ভাইয়ের সমান অংশ দাবি করতে তাঁদের তো লজ্জা হয় না। নতুন অধিকার পাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আত্মসম্মানবোধের তো সৃষ্টি হয় নি এখনো। কন্যাদের মানসিকতায় যেমন বিশেষ কিছু বদল হয় নি তেমনি শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্বামীর আচরণেও তেমন কিছু উন্নতি হয় নি। প্রাপ্তবয়স্কা, এমন-কি চাকুরিজীবী বধূর কাছেও তাঁরা এই সাবেকি বাধ্যতা আর আত্মসমর্পণই প্রত্যাশা করেন।

এই-সব ব্যাপারে দুই সম্প্রদায়ের মনোভাবে এখন খুব যে একটা পার্থক্য আর আছে তা নয়। তবে আমি একটা যে পার্থক্যের কথা বলতে চাইছিলাম সেটাকে আরো স্পষ্ট করে বোধ হয় এইভাবে বলা যায় যে মুসলমান মেয়েরা বহুকাল যাবৎ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয়ে আসছেন বলে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও চিরকাল আইনসিদ্ধ ও সহজ বলেও তাঁরা শ্বশুরকুলের উপর কোনোদিনই তেমন একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন না—না আর্থিক দিক থেকে, না মনের দিক থেকে। যেমনটা এই সেদিন পর্যন্ত হিন্দু মেয়েরা ছিলেন। এই কথাটা মনে রাখলে মুসলিম সমাজে আজ যে ধুলোর ঝড় উঠেছে শাহবানুকে কেন্দ্র করে তার ভিতর দিকে মুসলমান মেয়েরা সমস্যাটাকে কেমন দেখেন তার যথাযথ প্রেক্ষিতটা বোঝা সহজ হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইদানীং আমাকে মাঝে মাঝেই হিন্দু সমাজের অনেকে প্রশ্ন করেছেন, এই যে শাহবানু স্বামীর কাছ থেকে এত কষ্টে খোরপোষ আদায় করলেন সেটা গোঁড়া ধর্মান্ধরা কেড়ে নিতে চেষ্টা করছে দেখেও মুসলমান মেয়েরা গর্জে উঠছে না কেন? শিক্ষিতা মেয়েদেরও গর্জে না ওঠার প্রধান কারণ যে নিজের ধর্ম ও সনাতন রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য এ কথা ঠিক। সংখ্যালঘু বলেই যে এই আনুগত্য আরো নির্দ্বিধ এ-কথাও অস্বীকার করা যাবে না। কারণ সব দেশের সংখ্যালঘুদেরই সব সময় মনে হতে থাকে যে নানা অছিলায় তাঁদের স্বকীয় রীতিনীতি আর ঐতিহ্যকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। সম্প্রতি ঠিক একই মনোভাবের পরিচয় পেলাম বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে। তাঁরাও তাঁদের ব্যক্তিগত আইন বিষয়ে সমান সংরক্ষণশীল। পূর্ববাংলার হিন্দু-কন্যারা এখনো পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পান না, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারী নন, স্বামী একাধিক বিবাহ করলেও আইনত তা প্রতিরোধ করতে পারেন না। এবং এই অধিকারগুলি পাবার জন্য তাঁরা এমন-কিছু আগ্রহীও নন।

অর্থাৎ দুই দেশেরই সংখ্যালঘুরা পরিবর্তন বিমুখ, তাঁদের সনাতন রীতিনীতিগুলি আঁকড়ে ধরে রাখতে চান যতই কেননা তাতে তাঁদের ক্ষতি হোক। আর শুধু কি সংখ্যালঘুরাই যুক্তিহীনভাবে রক্ষণশীল, সংখ্যাগুরুরা নয়? এদেশে বর্ণহিন্দু সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষেরা কতজন বিবাহের ব্যাপারে আজও জাত গোত্রকে অগ্রাহ্য করতে পারেন? কতজনই বা শিক্ষিত অন্ত্যজ বা তপশীলী সম্প্রদায়ের বধূ বা জামাতাকে সাদরে ঘরে তুলে আনতে পারেন? এগুলি কি হিন্দু সমাজের ক্ষতি করছে না? আত্মবিরোধকে জিইয়ে রাখছে না? এমন-কি বিধবার আহার-বিহারের ব্যাপারেও সনাতন প্রথাকে ভাঙবার সাহসই বা ক জনার আছে?

তাই, যখন দেখি যে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনমাস কাল পার হয়ে গেলে প্রাক্তন স্বামীর (অধুনা পরপুরুষের) কাছ থেকে খোরপোষ নেওয়া হারাম—এরকম ফতোয়া দিতে থাকে মোল্লারা এবং সেটাকেও বিধির বিধান বলে মেনে নেবার চেষ্টা করেন মুসলমান মেয়েরা, তখন অবাক হই না। অবশ্য কোনো কোনো শিক্ষিতা মুসলমান মহিলাকে এ কথাও বলতে শুনেছি যে 'পরপুরুষের' কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে আত্মসম্মানে বাধা উচিত। অর্থাৎ ধর্মের দোহাই দিয়ে, সাম্প্রদায়িক আইডেনটিটি রক্ষার দোহাই দিয়ে, এমন-কি আত্মসম্মানের দোহাই দিয়েও স্বেচ্ছাচারী পুরুষের হাতে নিগৃহীতা মহিলাদেরও অধিকাংশই আজও মুখ বুজে থাকারই পক্ষপাতী। তা ছাড়া গর্জে ওঠার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার এটাও যেন খেয়াল থাকে। আশার কথা হলো যে শাহবানুকে নিয়ে এত হৈ চৈ হয়ে যাবার পরেও অতি সম্প্রতি কালে মার্চ মাসের গোড়ায় মুর্শিদাবাদের দোলনা খাতুন নামের এক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মাসে মাসে চারশো টাকা খোরপোষ দেবার জন্য আদেশ দিয়েছে আদালত। এই রায় দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শামসুদ্দিন আহমেদ। মামলা চলাকালীন সময়ের জন্য প্রায় ১৬ হাজার টাকাও মিটিয়ে দিতে বলেছেন তিনি। জানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না পশ্চিমবাংলার ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা এখন দোলনা খাতুন ও তার পিতাকে হেনস্থা করার কোনো পরিকল্পনা করছে কিনা। তবে ইন্দোরের শাহবানু পুলিশের যে সাহায্য পান নি মুর্শিদাবাদের দোলনা খাতুন প্রয়োজন হলে যেন সেই সাহায্য পান, মার্কসবাদী সরকারের কাছে এই প্রত্যাশা করা যায় কি? তা ছাড়া শোনা যাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টে চন্দ্রচূড়ের রায় বার হবার পর পশ্চিমবাংলারও নানা আদালতে নাকি ৪০/৫০টি খোরপোষের মামলা দায়ের হয়ে গেছে। দিন কয়েক আগে দিল্লিতে মধু লিমায়ে বলেছেন সারা ভারতবর্ষে ইতিপূর্বেই এই ধরনের যে অসংখ্য মামলা শুরু হয়েছিল তার একটিও কেউ প্রত্যাহার করেন নি ধর্মান্ধদের চাপে। এভাবে নীরবে চোখের আড়ালে পরিবর্তন হতেই থাকবে, যদি না রাজীব গান্ধীর নির্বোধ ও নিষ্ঠুর বিলটি আইনে পরিণত হয়ে সব পথ রুদ্ধ করে দেয়। ভাত দেবার কেউ নয় আর কিল দেবার গোঁসাই যে ধর্মান্ধ নেতারা সেই-সব শাহাবুদ্দিনরা এই পরিবর্তনকে ঠেকাতে পারবেন না, কারণ গরজ বড় বালাই।

হ্যাঁ, এ রাজ্যের মুসলমান মেয়েদের বেশ কিছু সমস্যা আছে যেগুলি হিন্দু মেয়েদের একেবারে নেই এমন নয়, কিন্তু তুলনায় একটু হয়তো কম আছে। প্রথম যে সমস্যার কথা মনে পড়ছে সে হলো শিক্ষার সুযোগ। সহশিক্ষায় মুসলমান অভিভাবকরা অধিকাংশই নারাজ আর কেবলমাত্র মেয়েদের স্কুলেও অনেক সময় ভর্তি হবার সুযোগ পায় না মুসলমান মেয়েরা, কারণ হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। ফলে গ্রামের দিকে বিশেষ করে এবং শহরেও মুসলমান মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট নেই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কলকাতার মুসলিম সমাজের ভীষণ একটা ক্ষোভ যে শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলটি যদিও শিক্ষার অনগ্রসর মুসলমান মেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল একদিন, আজ সেখানে বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান মেয়েরা শতকরা পাঁচজনও প্রবেশাধিকার পায় না প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না বলে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণ নীতির বিষময় ফল সারা দেশ জুড়েই দেখছি। তবু যারা পিছিয়ে আছে তাদের এগিয়ে না আনলে সারা দেশের মঙ্গল নেই। রবীন্দ্রনাথের সেই সাবধান বাণী যেন ভুলে না যাই : 'পশচাতে রাখিছ যারে সে তোমারে পশচাতে টানিছে।' তাই মুসলমান সমাজের জন্য, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার এবং আবাসিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত দরকার। এই মেয়েরা যত বেশি আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে ততই তারা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হবে এবং পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে পারবে। বলা বোধ হয় বাহুল্য নয় যে আমি কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদের জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই না। বরং আরো অনেক বেশি সংখ্যায় আবাসিক স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাই যেখানে মুসলমান মেয়েরা সহজে প্রবেশাধিকার পায়। একেই তো সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধা প্রচুর, পর্দা থেকে বার হয়ে এসে পড়াশোনা করার জন্যই যথেষ্ট প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়, তার ওপর শিক্ষার সুযোগও যদি যথেষ্ট করে না দেওয়া হয় তা হলে মুসলমান মেয়েরা এগিয়ে আসবে কি করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে আর একটি সমস্যাও প্রবল হয়ে উঠেছে যা কোনো কালে মুসলমান সমাজে ছিল না। মুসলমান সমাজের সনাতন প্রথা ছিল এই বিবাহের ব্যাপারে পাত্রপক্ষ উপযাচক হয়ে কন্যার অভিভাবকের কাছে গিয়ে কন্যাটিকে প্রার্থনা করবেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হলে কন্যার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ অলংকার উপঢৌকন দিয়ে, তার জন্য সম্মান-দক্ষিণা হিসাবে একটা ভদ্ররকম দেনমোহর কবুল করে, কন্যার সম্মতি লাভ করে তবে বিবাহ সম্পন্ন হবে। কিন্তু এই ভদ্র রীতি কী দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, বিশেষ করে দেশভাগের পরে! এখন পণ-যৌতুকের বর্বরতায় মুসলমান সমাজও সমান জর্জরিত। নিরক্ষর, দিন এনে দিন খাওয়া পাত্রও নগদ টাকার উপর ঘড়ি, সাইকেল, ট্রানজিস্টার রেডিও দাবি করে। এই ব্যাপারে সংখ্যাগুরু সমাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করায় তাদের লজ্জা নেই।

স্বামী-পরিত্যক্তার সংখ্যা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের নিম্নতম স্তরেই সব চেয়ে বেশি। যে মেয়েরা আমাদের ঘরে ঘরে কাজ করে, শহরে চাল পাচার করে, বে-আইনি মদ চোলাই ও ফিরি করে এরা অনেকেই স্বামী-পরিত্যক্তা, এদের কেউ বা সাকিনা, কেউ বা শঙ্করী। যারা স্বামী-পরিত্যক্তা নয় তাদেরও অনেকেরই স্বামী হয় উপার্জনে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক। স্ত্রীপুত্রের দায়িত্ব নিতে নারাজ কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনের শুধু অন্ন নয় নেশাভাং খেতেও লজ্জা বোধ করে না এমন স্বামী মুসলমান বস্তিতেও যত আছে হিন্দু বস্তিতেও তার কম নেই। এরা স্ত্রীর অন্নদাতা না হলেও অন্নদাসও মোটেই নয়। চোখ রাঙিয়ে, মারধোর করে কিংবা নেহাতই স্ত্রীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এরা স্ত্রীদের শোষণ করে চলেছে। এসব ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলার প্রশ্নই ওঠে না। ওঠে মধ্যবিত্ত ঘরে। এবং সমাজের এই স্তরেই মুসলমান মেয়েরা তুলনায় অবিচার পান বেশি, কারণ তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা হিন্দু-মেয়েদের চেয়ে কম, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সাহসও বেশি নেই। একাধিক বিবাহ এবং তালাক সহজ, দেনমোহর আদায় করা কঠিন। কারণ আদালতে যাবার ধৈর্য ও ক্ষমতা ক'জন রাখে? অতএব মুসলমান মেয়েদের যন্ত্রণাও বেশি।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারেও মুসলমান মেয়েদের আসল বাধা তাদের অবরোধ, তাদের পর্দাপ্রথা। নির্বিচারে সন্তান-সংখ্যা বাড়িয়ে এদেশের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে চায় এমন একটা প্রচার খুবই চলছে। কিন্তু মুসলমান পুরুষদের আয় যেহেতু হিন্দু পুরুষদের চেয়ে কিছু বেশি নয় তাই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতাও যে তাদের বেশি আছে এমন নয়। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানের ঘরেও সন্তান-সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। গ্রামাঞ্চলে ও বস্তিতে যে কমছে না, সেটা অশিক্ষা ও পর্দার জন্য। মুসলমান মেয়েরা এখনো পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যেতে হিন্দু মেয়েদের চেয়ে বেশি সংকোচ বোধ করে। তাই পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সমাজসেবিকার ঘরে ঘরে গিয়ে এ ব্যাপারে সাহায্য করা উচিত, পরামর্শ দেওয়া উচিত। পার্ক সার্কাসের বস্তি অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার কাজে গিয়ে আমার যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখেছি মেয়েদের মনে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কোনো প্রতিরোধ নেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বললেই চলে। কিন্তু পুরুষদের ডিঙিয়ে কিছু করতে তারা সাহস পায় না। পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যাওয়াটা বেহায়াপনা এবং সেখানে গিয়ে জন্মনিরোধের ব্যবস্থা করে এলে মেয়েরা সহজেই অসতী হবে এই ধারণাটা মুসলমান পুরুষের মধ্যে তুলনায় বেশি প্রবল।

ক-দিন আগে মহিলাদের একটি সভা ডাকা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তালাকপ্রাপ্তা মুসলিম মহিলাদের অধিকার রক্ষা বিলের প্রতিবাদ করা। অথচ দেখা গেল সেখানে কয়েকটি শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা, যাঁরা পোশাকে-আশাকে লক্ষণীয় রকম আধুনিকা এবং চাকরি-বাকরি করছেন বলে আর্থিক দিক থেকেও আত্মনির্ভরশীলা, বেশ স্পষ্ট ভাষায় ঐ বিলের সমর্থন ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের নিন্দা করলেন। এই অপ্রত্যাশিত আচরণের পিছনে আছে প্রধানত এমন একটা মনোভাব যে সুপ্রিম কোর্টের রায় মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতির ত্রুটি প্রমাণ করতেই প্রধানত চেষ্টা করেছে, অতএব সেই চেষ্টাকে যে-কোনো ভাবে পরাহত করতেই হবে। তা ছাড়াও একটা মানসিকতা কাজ করছে। এই মহিলারা মনে করেন যতটুকু স্বাধীনতা পেয়েছি সেই ঢের, তার জন্যই কৃতজ্ঞ থাকা ভালো সমাজের কাছে, বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়—নিজেদের অধিকার রক্ষার নামে। নইলে শেষে আমাদের শিক্ষাদীক্ষাকেই দোষ দিতে থাকবে সমাজ। পারিবারিক অশান্তির কথা ভেবেই হোক অথবা সামাজিক সমালোচনা ও শাস্তির ভয়েই হোক, এঁরা অতিরিক্ত সাবধানী। এঁদের অনেকেরই ব্যক্তিগত মতামত এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত মতামত সব সময় এক নয়। আমার একজন আত্মীয়া তো অকপটেই বলল, 'আমি ঐ বিলের নিন্দা করে কোনো statement-এ সই করতে পারব না। ওরে বাবা, শেষে উর্দু কাগজগুলিতে আমার character assassination (চরিত্র হনন) শুরু হয়ে যাবে, তখন আমার স্কুলের খুব ক্ষতি হবে।' কয়েক বৎসর ধরে সে একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে পার্ক সার্কাসে।

যাই হোক, এই ভাবে মুসলমান মেয়েদের সমস্যার ফিরিস্তি আরো লম্বা করা যায়। তা না করে আজ একজনের একটা অদ্ভুত ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলে শেষ করব—এমন সমস্যা আর কোনো সমাজে পাওয়া যাবে না। আমার পরিচিতা একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যার কথা বলছি, ধরে নেওয়া যাক তার নাম আফসানা। বছর দশেক আগে বেশ ধুমধাম করে নিজের নির্বাচিত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল আফসানার। পাঁচ-ছয় বছর তারা সুখে-শান্তিতেই ছিল, একটি ছেলেও হয়েছিল। তার পর থেকে তাদের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল অন্য একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে। অশান্তি এত তীব্র হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত অভিভাবকেরা মাঝে পড়ে দুপক্ষের সম্মতিতেই তালাকের ব্যবস্থা করলেন। ছেলেটিকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে এল আফসানা—আবার পড়াশোনা করতে লাগল, একা হাতেই ছেলেকেও মানুষ করতে থাকল, মাঝে মাঝে শুধু ছেলের বাপ ছেলেকে দেখতে আসত। এখন বছর খানেক ধরে শুনছি তার প্রাক্তন স্বামীর মতিগতি ফিরেছে। সেই মেয়েও তাকে বিবাহ করে নি। সন্তানের প্রতি তার টান ছিলই এখন সন্তানও তার খুব অনুরক্ত হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উঠেছে—ফলে প্রায়ই সে আফসানার কাছে যাওয়া-আসা করছে। আফসানা দুরধিগম্যা হয়ে গিয়ে তার প্রতি আকর্ষণও প্রবল হয়েছে। সম্প্রতি এমন কথাও নাকি সে আফসানাকে বলছে, 'তখন তোমারই বা কি হলো, আমারও মাথার ঠিক ছিল না—তালাকটা না দিলেই তো আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যেত।' অথচ এই ঠিকঠাক করে নেওয়া এখন প্রায় অসম্ভব, যতই কেননা আফসানা ও তার স্বামীর অনুতপ্ত হৃদয় আবার মিলিত হতে চাক। কারণ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এবার আফসানার অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহ হতে হবে এবং দৈহিক সম্পর্কও ঘটতে হবে এই দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে। তারপর যদি এই স্বামী তালাক দিতে রাজি হন তা হলে তালাক পেয়ে তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি অপেক্ষা করে দেখা যায় এই দ্বিতীয় বিবাহের ফলে সে সন্তানসম্ভবা হয় নি তবেই তিন মাস পর আফসানা আবার তার প্রথম স্বামীকে বিবাহ করতে পারবে। এই ধর্মীয় শর্ত পালন করবার সামান্যতম প্রবৃত্তি আফসানার নেই। একে সে তার নারীত্বের অবমাননা বলে মনে করে। অতএব এ পথে যাবার কথা সে ভাবতেই পারছে না। অথচ ছেলের জন্য এবং নিজের জন্যও তার স্বামীকে সে দূরে সরিয়ে রাখতেও পারছে না। সে যখন তাকে ভালোবাসে এবং তাকে ক্ষমাও করেছে তখন সম্পর্ক পুনঃস্থাপন তো অত্যন্তই সংগত। কিন্তু এটা সম্ভব হতে পারে হয় সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পুনর্বিবাহ ছাড়াই প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বসবাস করলে, নয় সমাজ থেকে বার হয়ে গিয়ে সিভিল অ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ করলে। প্রথম আচরণটি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জেনা বা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে, দ্বিতীয় আচরণে আত্মীয়স্বজন ক্ষুব্ধ হবেন, তারা ইসলামকে ত্যাগ করেছে বলে।

যাই হোক, এমন সমস্যায় আর কোনো সমাজের মেয়েরা পড়ে কি? শরীয়তের বিধান না হৃদয় ও বুদ্ধির নির্দেশ—কোন্‌টা সে মানবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখিও দাঁড়াতেই হবে মুসলমান সমাজকে, আজই হোক বা কাল।

বারোমাস, বর্ষ ৭ (১৯৮৬), সং ২, পৃঃ ৭৬-৮০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-মুসলমান সাংকর বিবাহের সমস্যা

নিত্যদিনই খবরের কাগজে দু'চারটি বিবাহের করুণ পরিণতির খবর থাকে। কোথাও মধ্যবয়সী মহিলাটি গলায় দড়ি দিয়েছেন, কোথাও বা তার শিশু সন্তানদের গায়ে আগুন দিয়ে নিজের গায়েও আগুন ধরিয়েছেন কোনো অভিমানিনী রমনী। বিষ খাওয়া, জলে ঝাঁপ দেওয়া বা চলন্ত ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ার সংবাদও বিরল নয়। নানা ধরনের বধূ নির্যাতনের ঘটনা তো সংবাদপত্র পাঠকের নিত্য সেব্য। অন্য পক্ষে বিবাহিত পুরুষদের যন্ত্রণা অতটা নাটকীয়ভাবে ফেটে না পড়লেও কম মর্মান্তিক কিন্তু হয় না। প্রায়ই দেখেছি স্ত্রী পুত্রের মন যোগাতে অক্ষম 'অপদার্থ' পুরুষ নানা ভাবে আত্মাবমাননার শিকার হন। এ জাতীয় তথ্য সংবাদপত্রের উপজীব্য না হলেও সংবেদনশীল সাহিত্যিকের দৃষ্টি এড়ায় না। জাতগোত্র মিলিয়ে, দেনা পাওনার হিসেব মিটিয়ে, উভয় পক্ষের আত্মীয় বন্ধুর আশীর্বাদ মাথায় করে সুসম্পন্ন হওয়া শুভ বিবাহেরও এহেন অশুভ পরিণতি যে প্রায়ই ঘটে থাকে একথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না।

তবু সাংকর বিবাহ সম্বন্ধেই সাধারণের মন বিশেষভাবে বিরূপ কারণ অনেকেরই ধারণা এ ধরনের বিবাহ কখনই সুখের হয় না। বিবাহ কিসে সুখের হয়—কুল, বিত্ত, বিদ্যা, না রূপে তার সঠিক হদিশ আমরা আজও জানি না। অন্য দিকে একথাও স্বীকার করতেই হবে যে জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্মের অনেকখানি বৈষম্য থাকলে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক পরিবেশে মানিয়ে নেবার বেলায় কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হতেই পারে।

সামাজিক সমস্যা নিয়ে আপাতত শুধু এটুকু বলব যে সর্বদেশে সর্বকালে বিবাদমান প্রতিস্পর্ধী গোষ্ঠী একে অপরের নারীদের প্রতি লোভের দৃষ্টি দিয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের জানমাল ও জেনানাকে সর্বপ্রযত্নে শত্রুপক্ষের গ্রাস থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, রক্ষা করতে না পারাটাকেই সবচেয়ে বেশি আত্মধিক্কারের কারণ বলে গণ্য করেছে। এই আদিম মনোভাবেরই কিছুটা জের আজও দেখা যায় যখন 'অপর' সম্প্রদায়ের কোনো পুরুষ 'আমাদের সম্প্রদায়ের কোনো কন্যাকে বিবাহ করতে সক্ষম হয়। এই বিবাহকে প্রায় কন্যা-অপহরণের সামিল মনে করা হতে থাকে। এবং কন্যার পিতৃ সম্প্রদায় নিজেদের যেন কিছুটা অপদস্থ এবং অপমানিতও মনে করতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথচ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যত দীর্ঘকালীন তিক্ত বিরোধ আছে তার বেশ কিছুটা স্থায়ী ও মধুর সমাধান হতে পারে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে। সাদা-কালো, জু-জেন্টাইল, ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্ট, হরিজন-বর্ণহিন্দুর মধ্যে যথার্থ মিলন হতে পারে বিবাহের মাধ্যমেই। আমাদের এই উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধেরও চিরকালীন সমাধান মুসলমানের শুদ্ধীকরণে নেই, নেই হিন্দুর ধর্মান্তরণে। ঐভাবে দল ভারি করার চেষ্টা শুধু হাস্যকর নয়, বিপজ্জনকও। পারস্পরিক উগ্র ঘৃণা আর বিদ্বেষের ধার ক্রমে ক্ষয়ে যাবে তখনই যখন যথার্থ ভালোবাসার টানে ঘরে ঘরে সহাবস্থান সম্ভব হবে। ঘনিষ্ঠতম সহাবস্থানেই শেষ সমাধান। অন্য বিকল্প, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে ঝুটোপুটি চালিয়ে যাওয়া, যেমন চলছে মীরাটে, চলছে আমেদাবাদে। তাই জগৎ জুড়ে সব ধর্ম, বর্ণ ও মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই সাংকর বিবাহ সামাজিক সৌহার্দ্যের জন্যই কাম্য, বিশেষ করে সেই সব দেশে যেখানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিভিন্ন গোষ্ঠী পাশাপাশি এসে বাস করতে বাধ্য হয়েছে। যে ভৌগোলিক দূরত্ব অন্তত প্রাত্যহিক সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করতে পারে সে দূরত্বটুকুও যখন থাকে না তখন মানবিক সম্পর্ক স্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর কি?

সাংকর সন্তান বিষয়ে যে আতঙ্ক বহুযুগ আগে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ("সঙ্করো নরকায়ৈব"...) কিংবা বিংশ শতাব্দীতে এ্যাডলফ হিটলার প্রচার করেছেন সেই আতঙ্ক যাঁদের মজ্জায় প্রবেশ করেছে তাঁদের ভয় দূর করবার মন্ত্র আমি জানি না। তবে এটুকু জানি যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের মতে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ জাতির ধারণা এখন একটা মিথ, একটা অলীক কল্পনা। সম্পূর্ণ অবিমিশ্র জাতি আজ এস্কিমোদের মধ্যে কিংবা বুশম্যানদের মধ্যেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এবং জাতি হিসেবে অবিমিশ্র থাকায় কোনো বিশেষ গৌরব আছে বলেও সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে-মানব গোষ্ঠী যত মিশ্র ততই অধিক তার দৈহিক ও আত্মিক ঐশ্বর্য।

যাই হোক ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিই বরং একটু বিশদ আলোচনা করা যাক। বিবাহে একটা পারস্পরিক বনিবনা বা অভিযোজনের প্রশ্ন সর্বদাই থাকে। এ বিষয়ে ক্রমশ দৃষ্টিভঙ্গি পালটে যাচ্ছে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান দুই সমাজে ঠিক সমানতালে পালটাচ্ছে না। যে কালে স্ত্রীলোককে তরল পদার্থ এবং পুরুষকে আধার বলে গণ্য করা হতো, সেকালে হয়তো সব সমাজেই প্রত্যাশা করা যেত যে বধূটি যে পাত্রে পড়েছে অবিলম্বে সে পাত্রেরই আকার নেবে। তবে মনোবিজ্ঞানীরা বোধহয় স্বীকার করবেন না যে এমন কোনো কাল ছিল যেকালে সব মহিলাই অত্যন্ত নমনীয় ছিলেন এবং পুরুষমাত্রেই ধাতব পাত্রের দার্ঢ্য লক্ষ্য করা যেত। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে স্মরণ করুন। অবশ্য আশৈশব চরিত্র গঠনের বেলায় ঐ গৃহীত সামাজিক আদর্শের একটা চাপ থাকতো ছেলেমেয়েদের ওপর। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো মানুষের স্বভাব সমাজকে অনেকটা অগ্রাহ্য করেই নিজের ধারায় গড়ে উঠত নিশ্চয়ই। ফলে স্বামী বা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের সংঘাত সেইকালেও ঘটতো যেকালে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভাবনা এমন প্রবল হয়ে ওঠেনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ যখন অনেক সমাজেই ক্রমে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এবং মনোবিজ্ঞানীরাও মনে করছেন যে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবল ও পরিণত ব্যক্তি সত্তা গড়ে তোলাই সমাজের পক্ষে শ্রেয় তখন ধরেই নিতে হবে যে বিবাহিত জীবনে অভিযোজনের ব্যাপারটাও এক তরফা না হয়ে পারস্পরিক হওয়া দরকার। পুরুষ যথাস্থানে অবিচল থাকবে এবং নারী যথাসাধ্য নিজের চিন্তাভাবনা অভ্যাসকে ঢেলে সাজবে এই প্রত্যাশা আর ন্যায্য বলে মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মেই কিছু স্ত্রী পুরুষ অবিচল ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন, তাঁদের তুলনায় অন্য কিছু পুরুষ ও নারীর ব্যক্তিসত্তা নমনীয় থাকে। এই প্রথম শ্রেণির একটি পুরুষ যদি সম শ্রেণিরই একটি নারীর সঙ্গে পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হন তাহলে তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত প্রায় অনিবার্য। তার ওপর যদি কোনো পক্ষের এমন দুর্ভাগ্যজনক ধারণা থাকে যে কোনো রকম মানিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা লজ্জাকর আত্মসমর্পণ তাহলে তো ফল আরও মারাত্মক হবেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলমান বিবাহে একটা মস্ত বড় দায়িত্ব থাকে উভয় পক্ষেই যথাসাধ্য মানিয়ে নেবার। নানা ভ্রান্ত ধারণা এবং পরিবার পরিজনের প্ররোচনা এই মানিয়ে নেবার ইচ্ছাকে শিথিল করে, একথা ঠিক। অন্য একটি সত্যিকারের সমস্যা এই যে হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতা কিছু বেশি আছে। ততখানি মুসলমান সমাজে এখনও নেই বলে এবং তালাকের ভয়ও যথেষ্ট প্রবল বলে মুসলমান ঘরের মেয়েরা অনেকটা ভীরু এবং অধীনতা স্বীকার করতে বেশি অভ্যস্ত। হিন্দু স্ত্রীরা প্রায়ই ততখানি নমনীয় হন না যতটা নমনীয়তা তাঁদের মুসলমান স্বামীর সংসারে প্রত্যাশা করা হয়। ফলে সাংসারিক অশান্তির সৃষ্টি হয় অনেক সময়েই। এখনও পর্যন্ত হিন্দুর ঘরে যত মুসলমান স্ত্রী আছেন তার তুলনায় মুসলমানের ঘরে হিন্দু স্ত্রী আছেন অনেক বেশি। তাই হিন্দু-মুসলমান বিবাহের এই সমস্যাটা সহজেই চোখে পড়ে। ক্রমে মুসলমান মেয়েরাও যত শিক্ষায় দীক্ষায় এগিয়ে আসবেন এবং স্বেচ্ছায় হিন্দু স্বামী গ্রহণ করতে সাহসী হবেন (হতে হবে কারণ এখানে অন্তত তালাকের ভয় কম থাকবে, রেজিস্ট্রেশন হবে বলে), ততই অন্যদিককার সমস্যার সামান্য লক্ষণও কিছু দেখা যাবে মনে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব যত বেশি থাকে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য তাঁদের ততই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। তবে উভয় প্রান্ত বিন্দু থেকেই এগিয়ে এসে মধ্যপথে মেলা ভালো, তাতেই সম্পর্কটা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। নয়ত তাঁরই চরিত্রে পরবর্তীকালে বেশি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে যাঁকে বাধ্য হয়ে বেশি মানিয়ে নিতে হয়েছে। আর দূরত্ব যতই বেশি থাক না কেন, যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে কোনো দূরত্বই যে অনতিক্রম্য নয় তার প্রমাণ অসংখ্য নারী পুরুষ ইতিপূর্বেই দিয়েছেন হাজার হাজার বৎসর ধরে। সাংকর বিবাহ তো আজকের ব্যাপার নয়—চিরকালই ঘটেছে।

আজকের দিনে আশেপাশে তাকিয়ে দেখি যে প্রাক্ পরিণয় পর্বে পূর্বরাগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জোয়ার হয়তো বড় বড় বাধাও ভাসিয়ে নিয়ে যায় অথচ বিবাহোত্তর কালে প্রেমের উচ্ছ্বাসে যখন কিছুটা ভাটা পড়ে তখন সংসার যাত্রার ছোটখাট বিরোধগুলিও পর্বত প্রমাণ ঠেকতে থাকে। স্বামী স্ত্রী অবধারিত মতানৈক্যগুলিও হয়তো সাম্প্রদায়িক রূপ ধরতে থাকে। হিন্দু মুসলমানের এই মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটায় একটু বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি হয় যদি না স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ে সমান শ্রদ্ধা কৌতূহল ও গ্রহিষ্ণুতা থাকে। মজা হচ্ছে যে পূর্বরাগের পর্যায়ে হয়তো দেখা গেল দু'পক্ষেই এই অনুকূল মনোভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে, অথচ বিবাহের পর গার্হস্থ্য জীবন রচনার বেলায় দেখা গেল কেউ কাউকে সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে রাজি নন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, আহার ও বেশভূষার রুচিতে, সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে, বিশেষ করে পুত্র সন্তান হলে তার খতনা অনুষ্ঠান নিয়ে মুসলমানটি কট্টর মুসলমান এবং হিন্দুটি গোঁড়া হিন্দু হয়ে ওঠেন।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য বিবাহের সময় থেকেই টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায় মনে মনে কোন্ মতে বিবাহ হবে? অধিকাংশ এ জাতীয় বিবাহেই দেখা যায় মুসলমান পক্ষটির এবং তাঁর পরিবারেরও দাবি থাকে যে অন্য পক্ষ যেন পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলেই শরিয়ত-বিধি মতে যথার্থ বিবাহ হতে পারবে। ধর্ম নিরপেক্ষ সরকারি আইন সঙ্গত বিবাহ বিষয়ে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের মনে প্রতিরোধ বেশি। এত বেশি যে আমাদের পুত্রতুল্য একটি যুবকও আমাদের সিভিল ম্যারেজের বৈধতা অস্বীকার করে অরুচিকর বিদ্রূপ করতে সংকোচ বোধ করেনি।

পূর্বরাগ যখন বেশ গভীর থাকে তখন ধর্মান্তরণের ব্যাপারটা কেউ কেউ সাগ্রহে মেনে নেন সুবিধাজনক বলে, কেউ বা পরবর্তী কিছু ব্যবহারিক অসুবিধা এড়াবার আশাতেও ধর্মান্তরিত হন। আবার কেউ বা অনুপায় হয়ে ধর্মান্তরণ মেনে নেন যেহেতু হৃদয়ের সম্পর্ক ততদিনে এতদূর গড়িয়েছে যে পশ্চাদপসরণ আর সম্ভব নয়। অথচ এই পর্যায়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়ে মনে মনে একটা ক্ষোভও লালন করেন কেউ কেউ। নানা রকমই দেখেছি।

একজন খ্রিস্টান মহিলা যিনি বিবাহ করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এখন স্বামীর মৃত্যুর পর আবার দেখছি প্রাক্ বিবাহ কালের নাম ব্যবহার করছেন খ্রিস্টান পল্লীতে বাস করতে গিয়ে। জানি না তাঁর পুত্র দু'টিও নাম পালটেছে কিনা। অথচ তাঁর স্বর্গীয়া পিসশাশুড়ির সম্পত্তিতে তাঁর কিছু দাবি জানিয়ে চিঠিও লিখেছেন দেখলাম—অবশ্য আগেভাগে সাবধান করে দিয়েছেন যে তাঁর চিঠির উত্তর দেবার সময় তাঁর নাম যেন আর বিলকিস বেগম না লেখা হয়। এখন আবার তিনি রেণুকা বারোই। আর একজন হিন্দুমহিলা একবার আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন যে তাঁর মুসলমান স্বামীটি শ্বশুর কুলের মনস্তুটির জন্য নাকি কালীঘাটে গিয়ে হিন্দু হয়েছিলেন। সেটা সম্ভব কিনা জানি না। হিন্দু হবার পর তাঁর নাম ও পদবী কি হয়েছিল সেটা জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না—তাঁর মূঢ়তায় এমনই বিমূঢ় বোধ করছিলাম। পরবর্তীকালে এই শুদ্ধাকৃত 'হিন্দু' ভদ্রলোকের আহারে বিহারে বিশ্বাসে আচরণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হিন্দুয়ানী কিছু না দেখে আশ্বস্ত বোধ করেছি। এবং যতদূর জানি, ভদ্রলোকের নিজের পরিবারের কাছে এই ধর্মান্তরণের ঘটনাটা ৩৫ বৎসর ধরে গোপনই রয়ে গেছে। এহেন "খাচ্ছি কিন্তু গিলছি না" ধর্মান্তরণে তাঁর পত্নীর কী পরমার্থ লাভ হয়েছিল জানি না। আর ধর্মটা না হয় রাতারাতি পালটে ফেলা গেল, কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিসত্তা থেকে একটা বিশেষ সমাজের সাংস্কৃতিক সব প্রভাব কি নিঃশেষে মুছে ফেলা সম্ভব? যখন ধর্ম অন্তরের সম্পদ না হয়ে প্রয়োজন মাফিক খোলসের মতন ধারণ বা বর্জন করার বস্তু হয় তখন সত্য ধর্মের যে কত দূর অবমাননা ঘটে তা এই 'ধার্মিক' মানুষদের কেন বোধগম্য হয় না তা ভেবে পাই না। সম্ভবত, 'আমার জন্য কেউ তার ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজি'—এই ভাবনায় একটা অহমিকার তৃপ্তি হয়।

আমার অভিজ্ঞতায় বলে যে বাঙালি হিন্দু সমাজে শুদ্ধিকরণ ব্যাপারটার উপর বিশেষ কেউ গুরুত্ব দেন না, রাজস্থান কি মধ্যপ্রদেশের আর্যসমাজীরা দিলেও। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শুদ্ধিকরণ বিষয়ে কি মত পোষণ করে জানি না। বাঙালি হিন্দু বরং কালচারার কন্‌কোয়েস্ট বা সাংস্কৃতিক বিজয়ে বেশি তৃপ্তি বোধ করেন। অন্য পক্ষে ধর্মান্তরিত না করতে পারলে মুসলমান সমাজের অনেকেই মনে করেন তাঁদের হার হয়ে গেল। পুণ্যার্জনের একটা মস্ত সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল এমন মনে করবার মতন লোকও কম নেই। গ্রামাঞ্চলে এই অপরাধে শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত হয়। মুর্শিদাবাদের ডোমকল নিবাসী হজরৎ আলি তাঁর চাচাদের হাতে অনেক মারধর খেয়ে অবশেষে আলাদা সংসার পেতেছেন তৃপ্তি মণ্ডলকে নিয়ে। একান্নবর্তী পরিবারের প্রচণ্ড ক্ষোভ, কেন তৃপ্তিকে ধর্মান্তরিত করলেন না হজরৎ আলি। কলকাতার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে পাওয়া তাঁদের বিবাহের দলিলকে ধর্তব্যের মধ্যেই জ্ঞান করছে না হজরৎ আলির পরিবার। তবু তাঁরা দু'জনে মাথা উঁচু করেই সংসার করে চলেছে ওই অনুন্নত রক্ষণশীল পরিবেশেই, ঘরে বসে দু'জনেই ছেলেমেয়েদে পড়িয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করছেন নিজেদের। এদিকে শুধু মুসলমান সমাজ নয় হিন্দু সমাজও তাঁদের অনমনীয় সংকল্পকে ভাঙবার জন্য নিত্যই নানারকম ভীতিপ্রদর্শন আর অত্যাচার করে চলেছে। তাঁদের এই বিপদে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পুলিসের কাছ থেকেও কোনো প্রোটেকশান তাঁরা পাননি।

যাই হোক, ধর্মে মুসলমান হলেও আচার আচরণে আহারে বিহারে নামে নিশানায় খুব একটা যদি পার্থক্য না থাকে তাহলে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর পক্ষে তাকে গ্রহণ করা তত কঠিন হয় না বলেই দেখি। এই কারণেই বাঙালি মুসলমানের তুলনায় বাঙালি খ্রিস্টানের সঙ্গে তাঁরা বেশি নৈকট্য বোধ করেন। গত চার পাঁচ দশকে বাঙালি খ্রিস্টান এই সাংস্কৃতিক দূরত্বকে আরো কমিয়ে এনেছেন বলেই মনে হয় আমার। সৌভাগ্যবশত তাঁদের মধ্যে কোনো মৌলবাদী তাগিদ কিংবা আত্মপরিচয় বিলোপের আশংকা তত প্রবল নয়, যদিও তাঁরা সম্প্রদায় হিসেবে খুবই ক্ষুদ্র এবং সে পরিমাণে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা আরো বেশি কঠিন।

হিন্দু ও মুসলমানের নাম পরিচয় ও রীতিনীতির পার্থক্য মিশ্র বিবাহে কিছুটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অস্বস্তির কারণ হয়। তাই ঘরের বৌ হয়ে এলে নমিতাকে রেহানা এবং পারভীনকে পার্বতী বলে ডেকে একটু আরাম বোধ করেন কোনো কোনো শ্বশুর পরিবার। বধূর নামটা পালটাতে হয় বিশেষ করে রক্ষণশীল অঞ্চলে, সময়ে অসময়ে পাড়া প্রতিবেশির কাছে জবাবদিহি এবং আত্মীয় আগন্তুকদের অস্বস্তিকর প্রশ্ন এড়াবার জন্যেও। অর্থাৎ ভিন জাতের মেয়েদের যতদূর সম্ভব স্বজাতের বলে চালিয়ে নিতে না পারলে স্বস্তি নেই। ফলে চেহারায় ছবিতেও নমিতা ও পারভীনকে একটু সমঝে বুঝে চলতে হয়। নমিতা শাঁখা সিঁদুর পরার জন্য জেদ ধরলে সেটাকে শ্বশুর কুলে অন্যায় জেদ বলেই মনে করা হয়, আর পারভীন শাঁখা সিঁদুর পরলে শ্বশুর কুল পুলকিত হন, "বাঃ এই তো, কে বলবে মুসলমানের মেয়ে!" উলটোদিকে নমিতা না পরলে পিতৃকূল ক্ষুণ্ণ হন, পারভীন পরলে পিতৃকূল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন, মেয়েটা আত্মসম্মান একেবারেই বিসর্জন দিল। দু'জনের কাছেই পিতৃপরিবারের কখনও ব্যক্ত কখন অব্যক্ত প্রত্যাশা থাকে "অজাতে বিয়ে করেছে সে আর কি করা, কিন্তু নিষিদ্ধ কিছু যেন না খায়।"

নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের মধ্যে মহান মিলন দেখবার মতন দৃষ্টির প্রসার বা মনের ঔদার্য কোনো সম্প্রদায়েই বেশি লোকের মধ্যে নেই। 'আমার মতনটি হলেই তবে আমি তোমাকে গ্রহণ করবো', এই হল মনোগত ব্যক্তব্য—মুখে যাই বলি না কেন। ধর্ম প্রায়ই বড় অসহিষ্ণু, প্রায়ই তার কঠিন নির্দেশ 'হয় আমার পথ নাও, নয় অন্য পথ ধর।' তুলনায় সংস্কৃতি অনেকটা সহিষ্ণু। গ্রহিষ্ণুও বলা যেতে পারে। বিচিত্র সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণকে একত্র করা কঠিন নয় তত! আমাদের জীবনে ও চারিত্র্যে এই সযত্ন-উপচিত উপকরণগুলি বিপুল ঐশ্বর্য এনে দিতে পারে।

নাত ও নামগান সুগীত হলে আমার মতন অধার্মিকেরও কিছুক্ষণ শুনতে আপত্তি নেই যদি না মধ্যরাতে কর্ণপটহ বিদারণ করে মাইক বাহিত হয়ে আসে। কাওয়ালী এবং কীর্তন দুইই আমার শুনতে ভালো লাগে। কখনও কোনো সুন্দরীর করপল্লবে মেহেদীর অলঙ্করণ যেমন চোখকে তৃপ্তি দেয় তেমনি আবার কোনো রমণীর চরণ দু'টিতে অলক্তক-রাগও বেশ মনোহর লাগে। —কোনো সম্প্রদায় বিশেষের লক্ষণ হিসাবে আমি ওগুলোকে দেখি না, দেখি সৌন্দর্য সৃষ্টির চিরন্তন উপকরণ রূপে। আমাদের পুত্রের বিবাহে উৎসবগৃহ সজ্জার উপকরণ হিসাবে আলপনা ও পিতলের পিলসুজে জ্বলন্ত প্রদীপ দেখে একজন নাকি মন্তব্য করেছিলেন, হিন্দুয়ানীর আর কিছুই বাকি রাখিনি আমরা, সম্ভবত চতুর্দিকে টুনি বাল্ব জ্বললে সেটা যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ মনে হতো। যাই হোক অতিথিদের আতর-দান বিষয়ে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে শুনিনি। কিন্তু দুই-ই তো সুন্দর, দুই-ই তো শোভন—একটু মুক্ত দৃষ্টিতে কি দেখা যায় না? হিন্দু-মুসলমানের গৃহসজ্জায়, পোশাকেআশাকে, আহারে আপ্যায়নে, শিল্পে সাহিত্যে কত অমূল্য সম্পদ রয়েছে যা একই সঙ্গে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাহলে ঘরে কালীর ছবি থাকবে না কাবার ছবি থাকবে তাই নিয়ে কাজিয়া করেন কেন স্বামী স্ত্রী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পাছে ধর্মীয় আত্মপরিচিতি লুপ্ত হয় তাই আজ কত যে হানাহানি দেশজুড়ে। দেখে অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের মনুষ্য পরিচয়টা যে ইতোমধ্যে লুপ্ত হতে বসেছে, তার পশুত্বটাই যে দাঁত নখ বার করে নিজেকে জাহির করছে, তার কি হবে? যে মনুষ্যত্ব সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঊর্ধ্বে, যে মনুষ্যত্বকে বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, অনন্ত জিজ্ঞাসা দিয়ে আর অসীম মমতা দিয়ে লালন করতে হয় তারই সূতিকাগৃহ হতে পারে না কি সাংকর বিবাহের সংসার?

বর্তমান, ২৫।০৫।১৯৮৭ ০১।০৬।১৯৮৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দুই বাংলা

বাংলাদেশ নিয়ে এই মাতমাতি মুজিবুর রহমানকে নিয়ে এই উচ্ছ্বাস পশ্চিমবাংলার অনেক মুসলমান পছন্দ করছেন না। এই নিয়ে বহু প্রশ্ন, কিছু বিদ্রুপ কিছু বা হতাশা মিশ্রিত মন্তব্য শুনতে পাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষে এটা বোঝা কি খুব কঠিন যে পাকিস্তান ধসে পড়ার অর্থ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে এক হতে পারে না? এই উপমহাদেশে রাজাগোপালচারী—কিংবা জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো গুটি দুই চার মানুষ ছাড়া আর প্রায় কোনো হিন্দুই পাকিস্তানকে মনে মনে মেনে নেয়নি। ফলে আজ যখন পাকিস্তানের বুনিয়াদ টলে উঠেছে তখন মুখ্যত সেই কারণেই হিন্দুরা খুশি এ কথা গোপন করে লাভ নেই। তবু বাংলাদেশের একটা বিরাট জনসংখ্যা আরও একটি কারণে খুশি। পূর্ব বাংলার বাঙালী মুসলমান ফিরেছে আজ মায়ের ডাকে। একদিন যে বাঙালী মুসলমান বলতেন—হিন্দুর সাহিত্যে আমাদের স্থান নেই। সেই মুসলমানই আজ হিন্দুর লেখা গান গেয়ে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করছেন বাঙালিকে বাঁচিয়ে রাখছেন—আশায়। এরপর এই বাংলায় অধিকাংশ হিন্দুরও যে হৃদয়ে টান পড়বে এতো বলাবাহুল্য।

কিন্তু পশ্চিমবাংলার মুসলমানের প্রতিক্রিয়া ঠিক একই রকম না হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। যে সব মুসলমান দেশ ভাগ হবার পরও নানা কারণে এদিকেই থেকে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশরই মনে পাকিস্তান সম্বন্ধে একটা দরদ, একটা প্রত্যাশা স্বভাবতই ছিল যা কোনো হিন্দুর মনে থাকা সম্ভব নয়। এখানে আবার একটা দাঙ্গা বাধলে হয়তো শেষ পর্যন্ত সেখানেই চলে যেতে হবে। এখানে চাকরির বাজারে যে তীব্র প্রতিযোগিতা তাতে ব্যর্থকাম হলে হয়তো ঢাকা চট্টগ্রাম কি খুলনায় ছেলের একটা চাকরি মিলবে। এদিকে মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলেও ওদিকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় পাকিস্তান সম্বন্ধে কি করে এদিককার মুসলমানের মন বিরূপ হতে পারে? পশ্চিমবাংলার বহু মুসলমানের কাছেই তাই পূর্ব পাকিস্তান একটা ভরসা, একটা আশ্রয়ের মতো ছিল। অতএব পাকিস্তান ধসে পড়ছে দেখে এদিককার মুসলমান যে বিচলিত বিভ্রান্ত এমন কি ক্রুদ্ধও বোধ করতে পারেন এটা প্রত্যাশিত।

কিন্তু প্রত্যাশিত হলেও যুক্তিযুক্ত নয়, মঙ্গলকরও নয়। 'বাংলাদেশে' অর্থাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানে ২৩ বছর ধরে যা ঘটছিল তার খবর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এদিকে কেউই আমরা তেমন রাখিনি।—ফলে আজ যখন বিস্ফোরণের মতো এসে এত বড় ঘটনাটা আমাদের চমকে দিল তখন একদল উল্লসিত, একদল বিমর্ষ বিভ্রান্ত। যাঁরা উল্লসিত তাঁরাও যে সবাই সঙ্গত কারণে উল্লসিত তা নয়, যাঁরা বিভ্রান্ত ও বিমর্ষ তাঁরাও মনে হয় ব্যাপারটাকে যথাযথ বুঝতে পারছেন না।

এই বাংলায় যে-সব মুসলমান যাঁরা আজ আশাহত ও উদভ্রান্ত বোধ করছেন, যাঁরা বলছেন মুজিবুর রহমানের অসহিষ্ণুতা ও হঠকারিতা বাঙালী মুসলমানের সর্বনাশ ডেকে এনেছে, যাঁরা বাঙালী হিন্দুর উচ্ছ্বাস দেখে দ্বিগুণ সন্দিগ্ধ হয়ে "বাংলাদেশের" এই মহান আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারছেন না, তাঁদের কাছে আমার এই সবিনয় নিবেদন। কেন এই বাংলার মুসলমানেরও পায়ের তলার মাটি আজও কেঁপে উঠেছে তা আমি বুঝতে পারি, বুঝতে পারি কেন সর্বান্তঃকরণে তাঁরা মুজিবুর রহমানের জয়যাত্রাকে আশীর্বাদ করতে পারেননি। কারণ তাঁদের একটি বড় আশার বাসা ভেঙে গেছে। এবং তাঁরা মনে করছেন এমনভাবে তা ভেঙে দেবার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল না।

কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের অমোঘ ইঙ্গিত যেদিকে ছিল এই বাংলায় অনেক মুসলমান সেদিকে চোখ বন্ধ করে ছিলেন। শুধু ধর্মের মিলটুকু মূলধন করে ভিন্ন ভাষাভাষী আর ভিন্ন সংস্কৃতিপুষ্ট ১২০০ মাইল দূরবর্তী দুটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীরা একদা একটা রাষ্ট্র গড়েছিলেন। এই অভূতপূর্ব রাষ্ট্র পাকিস্তান কতদিন টিকবে তা নিয়ে তখনই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন হিতৈষী এবং বিদ্বেষীরা। ২৩ বছর পর আজ দেখা যাচ্ছে সন্দেহটা অমূলক ছিল না। কিন্তু কি করে যে এই সন্দেহটা সত্যে পরিণত হয়ে উঠল ক্রমে তার খবর কি পশ্চিমবাংলার মুসলমান রেখেছিলেন?

খবরটা এই। বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি এমন কি বাঙালী মুসলমানের বিদ্যাবুদ্ধি আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও গোড়া থেকেই গভীর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানীরা। অসভ্য বাঙালীকে সুসভ্য করার জন্য উর্দু শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা—হিন্দু স্পর্শদুষ্ট বাংলা সংস্কৃতি ভুলিয়ে খাঁটি ইসলামী এবং উন্নত পাঞ্জাবী সংস্কৃতি দান করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু গোঁয়ার বাঙালীরা বার বার সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। তবে তার মূল্য দিতে হয়েছে বহু বীরের রক্ত ও মাতার অশ্রু। মুখের ভাষা ও হৃদয়ের সম্পদ, বাঙালীর সংস্কৃতি তারা কেড়ে নিতে না পারলেও চাকরি-বাকরির সিংহভাগ দখল করেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানিরা—সামরিক বিভাগেও বাঙালী মুসলমান বিশেষ পাত্তা পাননি। তাও বোধহয় বাঙালী মুসলমানের সহ্য হতো যদি না বাঙালী চাষী বাঙালীর মজুরের রক্ত জল করে অর্জন করা বৈদেশিক মুদ্রা লাহোর করাচী রাওয়ালপিণ্ডিকেই বছরের পর বছর বেশি পুষ্ট করে চলত। পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক স্বাচ্ছল্য পূর্ব বাংলার পরিশ্রমে, অথচ পশ্চিম পাস্তিানের সর্বপ্রকার তাচ্ছিল্যও ঐ বাঙালীদের প্রতি। এই অসহনীয় অবস্থা পূর্ব বাংলার মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছিল। ফলে ধর্মের ঐক্যকে দীর্ণ করে বাঙালিত্বের স্বাভিমান জেগে উঠছিল। কিন্তু সেটা উপলব্ধি করতে পারেননি এই দিককার মুসলমানদের অনেকেই। এঁরা সংখ্যালঘুর স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী এঁদের মুসলিম স্বাজাত্যবোধকে আঁকড়ে ধরে আছেন এদিকে। ফলে এঁরা আজও 'প্রথমে মুসলমান এবং পরে বাঙালী' রয়ে গেছেন—কিন্তু ওঁরা প্রথমে বাঙালী ও পরে মুসলমান হয়ে উঠেছেন। এই তফাৎটুকুর জন্যই এ বাংলার বহু মুসলমান আজ ঐ বাংলার মুসলমানের এই মরণপণ সংগ্রামের তাৎপর্য বুঝতে পারছেন না। একে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমর্থনও করতে পারছেন না। ইতিহাসের এমনতর পরিহাস এই প্রথম নয়।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই বাংলার মুসলমানের কাছেও ক্রমে কয়েকটা কথা পরিষ্কার হবে—প্রথম ধাক্কার বিমূঢ় ভাবটা কেটে গেলে। প্রথমত স্বাধীন বাংলার জন্য লড়াই পাকিস্তানের বুনিয়াদ গুঁড়িয়ে দিলেও এই উপমহাদেশের মুসলমানের এতে সর্বনাশ নয়, মঙ্গলই হবে। এই আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অভুতপূর্ব বিপ্লব বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এই সংগ্রামের নায়ক মুজিবুর রহমান একদিন বিশ্বের ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে গণ্য হবেন, কারণ শুধু পুব বাংলার মুসলমানকে নয়, সারা ভারতের মুসলমানকেই তিনি এক মহত্তর পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

যাঁরা ভয় পাচ্ছেন স্বাধীন বাংলা স্বাধীন থাকবে না, ভারতের কুক্ষিগত হবে তাঁদের বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ থাকলে এ কথা বুঝতে কষ্ট হতো না যে মুজিবুর রহমানের বাংলাকে বন্ধুভাবাপন্ন স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পেলে ভারতের যত লাভ একে কুক্ষিগত করে ভারতের তত লাভ নেই। স্বাধীন ও মিত্র বাংলাদেশ আমাদের সামরিক ব্যয় কমিয়ে দেবে কারণ পূর্ব সীমান্তে সমরসজ্জা কম করা চলবে। বাণিজ্যেরও উন্নতি হবে। চীন এবং আমাদের মাঝখানে একটি শক্ত ঘাঁটি থাকবে গণতন্ত্রের। অন্য পক্ষে স্বাধীন বাংলাকে কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করলে সারা পৃথিবীতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া স্বাধীন বাংলার ভিতর থেকে তখন যে বিদ্রোহ দেখা দেবে তা দমন করতে আমাদের আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতিও হবে প্রচুর। দুই বাংলা এক হবার বিরুদ্ধে দুদিকেই মানসিক প্রতিরোধ কম নয়। সে বিষয়টি বিশদ আলোচনা-সাপেক্ষ। তবে একটা কথা সম্ভবত অনেকের কাছেই স্পষ্ট যে, দুই বাংলা এক হয়ে আবার একটি মুসলিম সংখ্যাগুরু রাজ্য হবে এই সম্ভাবনাটা বহু হিন্দুর কাছেই উপাদেয় ঠেকবে না। অন্যদিকে, পূর্ব বাংলার মুসলমান চাকরি বাকরি, রাজ্যশাসন কিংবা সংস্কৃতির চর্চায় আর একবার এখনই হিন্দুর প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত বলে আমার মনে হয় না। অতএব আগ্রহটা দুদিকেই মুখ্যত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকে—রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের পক্ষে ততটা নয়। স্বাধীন বাংলা ও ভারতবর্ষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলে এই উপ-মহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার ধার ক্ষয়ে যাবে এবং দুই সম্প্রদায়েরই হৃদয়ক্ষত অনেকটা নিরাময় হবে বলে আমার বিশ্বাস। ধর্মভিত্তিক একটি সামরিক সরকারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়ে উঠলে আধুনিক ধ্যানধারণা সম্পন্ন মানুষ তাকে প্রগতি বলেই চিনবেন আশা করি।

এই সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের দাবী করে কারণ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এমন সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে অহিংস অসহযোগে প্রবৃত্ত করতে ইতিপূর্বে আর কেউ পারেননি। মনে রাখা ভালো যে, গান্ধীজীর প্রতিপক্ষ ছিল একটি সভ্য সরকার ও জাতি যার স্বদেশে গণতন্ত্রের এবং একটি উদার সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছিল। আর মুজিবুর রহমানের প্রতিপক্ষ একটি ধর্মান্ধ সামরিক শক্তি যা গণতন্ত্র বা উদার কোনো সংস্কৃতির ধার ধারে না। জনতাকে ক্ষেপিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানো সহজ, কিন্তু তাদের বুঝিয়ে একটি গঠনমূলক অসহযোগিতার পরিকল্পনায় যুক্ত করা যে তত সহজ নয় তা বার বার গান্ধীজি উপলব্ধি করেছিলেন। মুজিবুর রহমান সেই কঠিন ব্রত অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য পালন করেছিলেন এবং ভীত ক্রুদ্ধ ইয়াহিয়া খান উন্মত্তের মতো এই নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে এই অহিংস অসহযোগ তিনি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারতেন সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ নেই। কারণ মুজিবের শক্তির উৎস বন্দুকের নলে নয়, তাঁর শক্তির উৎস আত্মনিয়ন্ত্রিত জনসাধারণের সমর্থনে, শ্রদ্ধার আত্মদানে। শুধু মুজিবুর রহমানের নয় তাঁর অনুগামীদেরও দেখলাম জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। এই জনতা মরবার জন্য যত প্রস্তুত হয়েছিলেন মারবার জন্য তত নয়। যদি মারবার শিক্ষা আগে থেকেই নিয়ে রাখতেন তাঁরা তবে কোনো ইয়াহিয়ার ফৌজের সাধ্য ছিল না। এক সপ্তাহ এই জনসমুদ্রের সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষ যে মুজিবের ডাকে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এই মহত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করতে পারে শুধু তারাই যাদের বুদ্ধি বিবেককে আচ্ছন্ন করে রেখেছে কোনো সংকীর্ণ শাস্ত্রবাক্য—সে আধুনিক রাজনীতি শাস্ত্রই হোক আর সুপ্রাচীন ধর্মশাস্ত্র। পৃথিবী ইতিপূর্বে কতবার এমনতর বীরত্বের পরিচয় পেয়েছে সে হিসেব ইতিহাসের পণ্ডিতরা করবেন। কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আজ যাঁরা এই বীরকে শ্রদ্ধা করতে পারছেন না, এই বীরত্বের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছেন না তাঁরা বড় হতভাগ্য। জাতীয় নেতা নির্বাচনে ভুল আগেও হয়নি এমন নয়, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালী যদি এই ভুল আবার করে তবে তার সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। মুজিবুর রহমান আজ আর একটি 'নাম' নয়, মুজিবুর রহমান আজ একটি 'ভাবনা'। এই ভাবনায় ভাবিত না হতে পারলে ইতিহাস আমাদের করুণা করবে।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ০৩।০৫।১৯৭১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুক্তিফৌজী

শেখ মুজিব মুক্তিফৌজ গঠন করার কথা ভাবেননি, তার জন্য যথেষ্ট সময়ও পাননি। তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বাংলাদেশের মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন বটে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার কথা ; কিন্তু তখন তিনি সম্ভবত বিদ্রোহী জনগণের এমন একটি আন্দোলনের কথাই ভেবেছিলেন যা সুপরিকল্পিত না হলেও স্বতঃস্ফূর্ত এবং দেশময় পরিব্যাপ্ত বলেই দ্রুত উদ্দেশ্য সাধন করবে। ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষে যা হয়েছিল তারই আরও ব্যাপ্ত, সংহত এবং তীব্রতর একটি রূপ বোধহয় শেখ মুজিবের মনে ছিল। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন জনগণের এই সম্মিলিত দাবী এবং সোচ্চার ইচ্ছাকে বেশিদিন অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা সামরিক সরকারেরও হবে না। এত প্রবল একটি আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার জন্য যে পরিমাণ রক্তপাত আর যত রকমের অত্যাচার প্রয়োজন ততখানি সরকার স্বদেশে তো দূরের কথা কোনো উপনিবেশেও সহজে করে না। পাকিস্তানী জঙ্গী সরকার বাংলাদেশে নিপীড়ন ও অত্যাচারকে যে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত তার এক ভগ্নাংশও যে ঘটবে বলে শেখ সাহেব পূর্বাহ্নেই অনুমান করতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না। এই কারণেই সম্ভবত East Pakistan Rifles কিম্বা East Bengal Regiment-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা বা তাদের কোনো নির্দেশ দেবার কথা তিনি ভাবেননি যদিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত E. B. R., E. P. R. এবং পুলিশ বাহিনী ব্যাকুলভাবে তাঁর হুকুমের অপেক্ষায় ছিল বলে শুনেছি অনেক অফিসারের মুখে। ২৫শে রাত্রে অতর্কিতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী প্রথমেই E. B. R., E. P. R. এবং পুলিশের বহুঘাঁটি আক্রমণ করে তখন কিন্তু এঁরা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেননি। তারও আগে কোনো কোনো ক্যান্টনমেন্টে এবং ছোটখাটো ঘাঁটিতেও যখন বাঙালী সৈনিকদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হয় তখন নানা যায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ হয়েছিল। কিন্তু অপ্রস্তুত থাকার ফলে এই অসমযুদ্ধে বাঙালীদের অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। এমন কি পুলিশ ব্যারাকে স্ত্রীলোক ও শিশুরাও পাকিস্তানী বীরপুঙ্গবদের "জেহাদের" শিকার হয়েছিল। ঘটনা পরম্পরা যে এভাবে মোড় নেবে, এরকম নেকড়ের মতো যে সারা দেশের ওপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তা শেখ সাহেব আগে থেকে টের পেয়েছিলেন কিনা, পেয়ে থাকলে সকলকে সাবধান করে দিলেন না কেন, এই সব নিয়ে বিস্তর জল্পনা কল্পনা করতে দেখেছি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুক্তিফৌজের ছেলেদের এবং বাংলাদেশ থেকে আগত অন্যান্য নানা শ্রেণীর মানুষকেও।

যদিও ২৫শে মার্চের আগে "মুক্তিবাহিনী" গড়ার কথা তেমন করে কেউ ভাবেননি, ২৬শে অথবা ২৭শে থেকেই কিন্তু স্বতোৎসারিত ভাবে মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠতে থাকে ছোট ছোট শহরে, এমন কি গ্রামে গঞ্জে। রাজধানীতে সেই রাত্রে সুপরিকল্পিত হত্যা এবং ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল বটে কার্ফিউ জারি করে, কিন্তু সারা দেশ তো পড়েছিল। অধিকাংশ স্থানেই তখনও পাকিস্তানী সৈন্য পৌঁছতে পারেনি। তবে বহু জায়গায় সেই মধ্যরাত্রেই ইয়াহিয়ার পলায়ন ও ঢাকায় জঙ্গী তাণ্ডবের কাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে পরদিন থেকেই ছেলেরা নিকটতম E. P. R. ঘাঁটিতে গিয়ে অস্ত্র শিক্ষা নেওয়া, অস্ত্র সংগ্রহ করা ইত্যাদি শুরু করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে মুক্তিফৌজ যখন বাংলাদেশ সরকারের সুগঠিত সামরিক বাহিনী হয়ে উঠল তখন E. P. R., E. B. R. ইত্যাদি এদের নেতৃত্ব করেছিল বটে কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এই মুক্তিবাহিনী জনসাধারণের বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের স্বতোৎসারিত দেশপ্রীতির ফলেই গড়ে উঠেছিল। অতএব এই সংগ্রাম যথার্থই জনতার সংগ্রাম, কোনো বিপ্লবী দল এর নেতৃত্ব না করলেও, কোনো ছকে বাঁধা বিপ্লবী বুলি এর উৎসাহ না জোগালেও।

মুক্তিবাহিনীতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণা, শিক্ষাদীক্ষা কি জাতীয় সে কথা জানবার জন্য কৌতূহল আমার প্রথম থেকেই ছিল। কি আহুতি দিয়ে এমন যজ্ঞ হয়, কারা এই সংগ্রামী ছেলেরা, কারা আছে এই দেশব্যাপী জাগরণের পুরোভাগে তা জানবার আগ্রহে এই নয় মাস ব্যাপী সংগ্রামের নানা পর্যায়ে, নানা ধরনের মুক্তিযোদ্ধাদের আমি দেখেছি এবং বুঝবার চেষ্টা করেছি। মুক্তিফৌজ (M. F.) অথবা নিয়মিত বাহিনী এবং ফ্রিডম ফাইটার্স (F. F) অথবা অনিয়মিত বাহিনী—এই দুই শ্রেণীর যোদ্ধাদেরই আমি দেখেছি। আবার ঢাকা কিংবা কুমিল্লা শহরে যে সব ছেলেরা আপনা থেকেই কাজ শুরু করেছিল এবং বিশেষ করে ঢাকায় কতগুলি সার্থক অপারেশন করেছিল তাদের সঙ্গেও কথা বলেছি। অবশ্য মুজিব বাহিনীর কোনো ছেলের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়নি। আমার এই সামান্য এবং তটস্থ অভিজ্ঞতা এক-সূত্রে কিংবা দুচারিটি সূত্রে গেঁথে তোলা কঠিন। কারণ বড় মিশ্র, বড় বিচিত্র এঁদের চরিত্র। একদিকে দেখেছি আশৈশব ইংরাজি-ইস্কুলের ছাত্র, অকালে সার্ত্র-পড়া সাড়ে পনেরো বছরের ছেলে নদীমের কাঁধে যেমন রাইফেল, অন্যদিকে পঁয়তাল্লিশ বছরের শান্তশিষ্ট গৃহী মানুষ, ওষুধের ব্যবসায়ী টুনু ভাইয়ের কাঁধেও তেমনি রাইফেল। উভয়েই একই সঙ্গে হয়তো অপারেশানে গেছেন লুঙ্গি পরে, কোমরে গামছা বেঁধে একজন রোজা রেখেছেন, একজন রাখেনি। আবার মাদারীপুরের নৌ-গেরিলা যে ছেলেটি বলেছিল "আমাদের 'গেরামের' ১৬০ জন ছেলেকে এক রাত্রে ক্যাপটেন শওকত নৌকায় পাঠিয়ে দেন ইন্‌ডিয়ার বর্ডারে ট্রেনিং নেবার জন্য আমি 'মায়েরে' ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি, আমার মায়ের এত 'ছেনেহ' আর ভয় ছিল আমার জন্য যে রাত্রে আমার জামার সঙ্গে নিজের শাড়ির খুঁট বেঁধে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘুমাত", তারই সঙ্গে এল তাদের ট্রেনার, পাক নেভির পূর্বতন সাবমেরিনার, যে ১৬ বছর বয়সে বিমাতার স্নেহহীন সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে করাচীতে জাহাজের চাকরী নেয়। ২৫শে মার্চে সে ছিল ফ্রান্সে তোলন বন্দরে, Daphne সাবমেরিনের বিষয়ে জেনে শুনে নিতে গিয়েছিল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আর সাতজন বাঙালীকে নিয়ে সে তোলোন থেকে পালিয়ে আসে ভারতে, মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেবার জ্বলন্ত আগ্রহ নিয়ে। অর্থাৎ অত্যন্ত ভিন্ন জাতীয় শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধ এই মুক্তিফৌজীদের।

তবু তারা কি করে এক সূত্রে বাঁধা পড়ল শত সহস্রটি প্রাণ সে কথাই ভাবছিলাম। আমার যতটুকু পরিচয় এঁদের সঙ্গে তাতে কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দিশা পেয়েছি এঁদের চরিত্রের, অনেকটাই তার অপ্রত্যাশিত ছিল—অন্তত আমার কাছে। এই কারণেই এঁদের ঘনিষ্ঠভাবে জানার মধ্যে আমি একটা আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছিলাম।

আমার একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা এই যে, মুক্তি-সংগ্রামের অধিকাংশই কোনো রাজনীতির ধার ধারতেন না এই সংগ্রামে যোগ দেবার আগে, অর্থাৎ পূর্বাশ্রমে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে দেখিনি এমন নয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত কিংবা অন্য উগ্রতর অথবা গোপনতর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছেলের সংখ্যা সমগ্র মুক্তি যোদ্ধাদের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম হলেও একেবারেই ছিল না এমন নয়। তবে এদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে আমি ভাবতাম যে মুক্তি যোদ্ধারা বুঝি সবাই আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী কিংবা সমর্থক। কিন্তু এখন বুঝলাম যে যাঁরা নিজে থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই সংগ্রামে তাঁদের মনে স্বদেশ সম্বন্ধে একটি দীপ্ত চেতনা অবশ্যই ছিল, বাঙালী ও বাঙলাদেশের ঐ লাঞ্ছনা তাঁদের মর্মে গভীর বেদনা ও তীব্র প্রতিকারস্পৃহা জাগিয়েছিলও বটে কিন্তু এঁদের শতকরা পঁচানব্বুই জনই কোনো রাজনৈতিক দলেরই সমর্থক ছিলেন না। গত নির্বাচনে এঁদের মধ্যে যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা "শেখ মুজিব"কেই দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সাধারণ ভাবে এঁরা আওয়ামী লীগের অনুগামী এমন কথাও বলা সঙ্গত হবে না বোধ হয়। বরং "রাজনীতি করা" বেশ কিছু ছেলে আর ছাত্রনেতা "নির্বোধের মতো" যুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য ছুটে না গিয়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছিল পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য। দেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন মুক্তিফৌজী যুবক এবং কিশোরদের একটি অংশ মনে হলো একটু বামপন্থী বা তথাকথিত প্রগতিশীল মতের সমর্থক। শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে যে নেতৃত্বের অভাব এবং সে কারণেই যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার জন্য দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা এবং বিভ্রান্তি মুক্তিফৌজীদের অনেকের মধ্যে খুব স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। তাঁদের প্রায়ই বলতে শুনেছি, "আমরা দেশের জন্য লড়ছি, দেশের মানুষ জান-মান নিয়ে খেয়ে-পরে বাঁচবে সেই জন্য লড়ছি ; কোনো দলকে গদীতে বসাবার জন্য লড়ছি না।" এই সংগ্রামের শেষে কি ধরণের সরকার হবে সে বিষয়ে যখনই কথা উঠতো তখন ওঁদের বলতে শুনতাম, "আমরা আর সুবিধাবাদীর সরকার চাই না যারা নিজের লোকেদের লাইসেন্স পারমিট বাঁটবে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নিজেদের জন্য বাড়ি গাড়ি বানাবে। এবারে নূতন সমাজ চাই, সেখানে আর কোনো রকম্ শোষণ চলবে না।” এই নতুন ধরণের সমাজ যে ঠিক কি ধরণের হবে সে বিষয়ে অবশ্য অধিকাংশেরই মনে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তবে অনেককে বলতে শুনতাম যে দেশের তরুণ সমাজ জেগেছে, তারাই এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ করছে, অতএব এবার তারাই নতুন শাসকদের ঠিক পথে রাখবে। এরপরও যারা ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করবে তাদের আর ঠাঁই হবে না বাংলাদেশে। কোনো কোনো ছেলে অবশ্য তখন বলতো, “এতো আশা না করাই ভালো। যারা আদর্শবাদী, যারা দেশকে ভালো বাসে তারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা হয়তো স্বাধীনতা দেখবার জন্য বেঁচেও থাকবে না। আর এদের রক্তে কেনা স্বাধীনতার পর যারা গিয়ে সরদারী করবে তারা আজ লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে আরামে বসে আছে।” এমনি আশা-নিরাশায়, ভাবনায় দুর্ভাবনায় দোদুল্যমান ছিল তারা, তবু মনে হতো একটি মানুষের উপরই তাদের সবার আশা ভরসা। সবাই তারা সেই একটি ব্যক্তির পিছনে ছিল, একই দলের পিছনে না থাকলেও। যে অরাজকতা, ক্ষমতা নিয়ে অক্ষমদের ও সুযোগসন্ধানীদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ির ভয় তারা করছিল সে ভয় নিশ্চয়ই আজ তাদের কেটে গেছে শেখ মুজিব সুস্থ দেহে দেশে ফিরে আসবার পর। আমরা ঐ রক্তস্নাত দেশের দিকে তাকিয়ে আছি, আশা করি ঐ তরুণ উৎসাহ আর কষ্টার্জিত কর্মক্ষমতা এবার নিঃসঙ্কোচে দেশ গড়ার কাজে উৎসারিত হবে। যারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াই করেছিল তারা নিশ্চয়ই যথাযোগ্য স্বীকৃতিও পাবে এবং গঠন কর্মে তারা অনিমন্ত্রিত থাকবে না, ভয়ে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হবে না।

এদেশের বহু মুসলমান ভয় পেয়েছেন যে পূর্ববাংলা থেকে এবার ইসলাম লোপ পেল। ধর্মনিরপেক্ষতার কথাবার্তা এঁদের পছন্দ হয়নি, অনেকটা সে কারণেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে এঁরা খোলা মনে মেনে নিতে পারেননি। কলকাতাবাসী এক ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলে তখন ঢাকায়। গত জুন মাসে যখন তাঁর হিতৈষী কেউ তাঁর পুত্রের কুশলবার্তা জানতে চাইলেন তিনি বুক ফুলিয়ে বললেন, “আমার ছেলে মরে যাক, কিন্তু পাকিস্তান বেঁচে থাক।” আজ যখন পাকিস্তানের নাভিশ্বাস উঠেছে বাংলা দেশে কিন্তু তাঁর ছেলে সেখানে অক্ষত এবং সুখে আছে তখন তাঁর মনে কতটা ক্ষোভ সঞ্চার হয়েছে জানি না। কিন্তু একথা জানি যে গত এক বছরের এত ঘটনার কথা শুনেও এদেশে বহু মুসলমান মনে করেন যে পাকিস্তানী সৈনিকেরা যা করছিল তাতেই ইসলাম এবং ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা হচ্ছিল আর বাংলাদেশের মানুষ ঐ ধর্ম ও ধর্মরাষ্ট্রকে বর্জন করেছে। এঁরা লাহোর করাচীর রেডিও শোনেন, এখন আর ঢাকার রেডিওতে এঁদের রুচি নেই। আর ভারতীয় সংবাদপত্র কিংবা বেতারকে এঁরা আদৌ বিশ্বাস করেন না। এ অবস্থায় এঁদের চোখ খুলতে এবং মোহ ভঙ্গ হতে বিলম্ব হবে বলেই মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে ইসলামকে রক্ষা করার জন্যই একদা যে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল সেই পাকিস্তানেরই এক অংশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইসলামের এই "শোচনীয় অবহেলা" তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। অন্যপক্ষে একজন মুসলমান খুশি হয়ে বললেন, "ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও হিন্দু থাকা যায় কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হলে আর মুসলমান থাকা যায় না। কারণ মুসলমানদের কাছে তার ধর্ম সবচেয়ে বড় এবং ধর্মকে সচেতন স্বীকৃতি দান অত্যাবশ্যক, নইলে সে আর মুসলমান থাকে না।" ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ওঠায় যাঁরা এখন পূর্ববাংলায় ইসলাম বিপন্ন মনে করে মর্মাহত কিংবা যিনি এবার বাংলাদেশ "ইসলামের নিগড়মুক্ত" হয়েছে ভেবে উল্লসিত তাঁদের কোনো পক্ষই বোধহয় সঠিক জানেন না পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিফৌজীরাও এখনও স্বধর্মে কতখানি প্রতিষ্ঠিত। মুক্তিফৌজের ছেলেরা অন্তত কোনো অর্থে "অধার্মিক" নয়। দুচার জন বেশ চিন্তাশীল ছেলেও দেখেছি বটে যারা জাগতিক আরও বহু বিষয়ে পড়াশোনা চিন্তাভাবনা করলেও ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিংবা ধর্মের নামে দেশ জুড়ে যে অধর্মাচার চলছিল তখন সে বিষয়ে তিক্ত মন্তব্য করেছে। অনেকটা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার ফলেই কেউ কেউ হয়তো সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধেই বীতশ্রদ্ধ বা Sceptic হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক ছেলের মুখেই শুনেছি "যারা আমাদের খাঁটি মুসলমান বানাবার জন্য এত নির্যাতন এত অপমান করেছে তাদের চেয়ে অনেক ভালো মুসলমান আমরা। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বাঙালীদের মধ্যে যত ধর্মভয় আর ধর্মবিশ্বাস আছে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে অতটা আছে কিনা সন্দেহ!" আমি একথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখিনি কোনো। বরং মুক্তিফৌজের ছেলেদের মধ্যে প্রায়ই দেখেছি ধর্মে গভীর বিশ্বাস এবং ধর্মাচারেও কঠিন নিষ্ঠা। রমজানের সময় মুক্তিফৌজের শিবিরে গিয়ে দেখেছি প্রায় প্রত্যেকেই রোজা রাখছেন। অথচ অনেক দিনই অপারেশানের কাজে দুপুরের পরই শিবির থেকে রওয়ানা হয়ে যেতে হতো তাঁদের। দশ মাইল জলে কাদায় কি বালির চড়ায় কি মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে ভরা দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে সারা পথ পায়ে হেঁটে হয়তো অপারেশানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে। বেলা আড়াইটা তিনটাতেই ছোলা গুড় কি কিছু ফল বেঁধে নিয়ে তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেছেন ; যেখানে সূর্যাস্ত হবে সেইখানেই রোজা খুলে ইফতারী করা হবে, সবাই মিলে নামাজ পড়া হবে। তারপর আবার অপারেশানের কাজে লাগবেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "রোজা রেখে এত দূর পথ হাঁটতে, এই সব কঠিন কাজ করতে ক্লান্ত বোধ করেন না?" একজন হেসে বললেন, "না, মনের জোর পাই আরও।" এঁদের মধ্যে প্রায় সবারই নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে ধর্ম তাঁদের সহায় অতএব ধর্মাচারকেও তাঁরা বাদ দেননি। বরং যে নির্বিচার হত্যা, যে অকারণ অত্যাচার এমন কি ধর্মের নামেও মনুষ্যত্বের যে নির্মম অবমাননার কাহিনী তাঁদের মুখেই শুনেছি তাতে অবাক হয়ে ভাবতাম এর পরও মঙ্গলময় ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখা কি সম্ভব?

প্রায় প্রথম থেকেই ঢাকা শহরের ওপরে কয়েকটি নির্ভিক তরুণ পাকিস্তানী সৈনিকের কড়া পাহারা সত্ত্বেও অপারেশান চালিয়ে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে ছিল রুমী, বদী, আজাদ, কাজি, স্বপন, বাশর, জুয়েল, বাদল, আলম এবং আরও অনেকে। ২৯শে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগস্ট রাত্রে এই ছেলেদের ধরবার জন্য সাতটি বাড়িতে একই সময় হানা দেয় পাকিস্তানী সৈনিকেরা। কাজি এবং আরও কয়েকজন সে রাত্রে মগবাজারে আজাদের বাড়িতে ঘুমিয়েছিল। যখন ঘুম ভাঙল রাত দেড়টায় তখন তারা দেখে সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলেছে। সেই রাত্রে একজন অফিসারের হাত থেকে আচমকা stengun কেড়ে নিয়ে সাতজনকে হতাহত করে কাজি কিভাবে সেই ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে এসেছিল সেই কাহিনী সবিস্তার লেখার স্থান এটা নয়। কিন্তু গালে টোল-পরা লাজুক সহাস্যমুখ এই ছেলেটি তার কাহিনী বলা যখন শেষ করল তাকে জিজ্ঞেস করলাম "তুমি আর একদিন আসবে না তোমার বন্ধুদের গল্পটা শেষ করার জন্য?" সে বলল, "আমাদের শিগগিরই officer's training নেবার জন্য কোথায় যেন পাঠিয়ে দেবে। তার আগে আমি আজমীড় শরীফ যেতে চাই—যেভাবে জান নিয়ে এসেছি! কাল আমি আজমীড় শরীফ যাব দুদিনের জন্য।" আমি একটু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখ সরল সহাস্য। তার কিশোর বন্ধু ও অনুগামী জুয়েলকে সে রাত্রে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে বলে শুনে এসেছে সে। তবু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিশ নেই, ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা নেই। আর সারা ভারত জুড়ে কতজন যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছেন, 'গেল গেল ইসলাম গেল বাংলা দেশ থেকে।'

এ ছাড়া আরও একটি চারিত্রিক গুণ লক্ষ্য করেছি মুক্তিফৌজীদের মধ্যে যার কথা বলেই এই নিবন্ধটি শেষ করব। এরা মানুষ হিসেবে অনেকেই অপ্রত্যাশিত রকম সরল, সোজা। আমি আজন্ম নাগরিক। যে মানসিকতা, যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিদিন আমার চতুর্দিকে দেখতে পাই তার সঙ্গে তুলনায় এদের অনেককে প্রায় শিশুর মতো সরল মনে হতো আমার। আমি যাদের দেখেছি তাদের অনেকেই শহরবাসী, পোষাক-আসাকে আমাদের চেয়ে ওদের গায়ে বিলিতি গন্ধ বেশী, অনেকের বাড়িতেই বিদেশী গাড়ি আছে, নানা রকম শৌখিনতায় বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়তো এদের অনেকেই। তবু মনে হতো এদের নাগরিক sophistication কম। প্রেম ও বিদ্বেষে ওরা যেন একটু বেশি অভিভূত হয় আমাদের চেয়ে। আদর্শকে একালেও অবিশ্বাস্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিয়েছে অনেকে। অনুরাগ, বিরাগ, কৃতজ্ঞতা, প্রতিহিংসা সবই প্রবলভাবে প্রকাশ করে। সবচেয়ে অবাক হতাম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছেলেরা, যারা অবলীলায় রাইফেল, রিভলভার চালায় তারাও বাড়ির জন্য, মায়ের জন্য মন কেমন করার কথা নিঃসঙ্কোচে বলত—একটু আদর যত্ন পেলে যেন চিরজন্মের মত কেনা হয়ে গেল এমন ভাব দেখাত। Existentialist সাহিত্যের কল্যাণে আমরা এখন মেনে নিয়েছি যে সকালে মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রবাহুতের মতো যোগ দিয়ে বিকেলে বান্ধবীর সঙ্গে সমুদ্রস্নানে যাওয়াটাই সাবালকত্বের লক্ষণ। তাই আজকাল কেউ যদি বলে "আমি সব সময় আমার আম্মার কথা ভাবি, আমার আম্মার যদি কিছু ক্ষতি হতো পাকিস্তানী আর্মির হাতে তাহলে আমি মনে মনে ঠিক টের পেতাম—" তখন বিস্ময় বোধ না করে পারি না। ছ সাত মাস বাড়ির কোনো খবর না পেয়ে নিজেই নিজেকে ভরসা দিচ্ছিল। এই ছেলেটি পেটে limpet mine বেঁধে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাইল সাঁতার কেটে গিয়ে জাহাজ ডুবিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফরিদপুরে যখন নিরাপদে বাড়ি ফিরে ছেলেটি প্রথমদিন পুকুরে স্নান করছে তখন তার মা তাড়াতাড়ি কাঁসার বাটিতে করে কাঁচা দুধ এনে ছেলের মাথায় ঢেলে দিলেন, ছেলের সব বিপদ-বালাই কেটে যাবে তাতে। কুসংস্কার হয়তো! কিন্তু মায়ের ব্যাকুলতাটা? অবশ্য এখন আবার মায়ের জন্য ছেলের, ছেলের জন্য মায়ের ভালোবাসাকেও সংস্কার বলে ঝেড়ে ফেলার যুগ। যাই হোক এই সব মায়ের ছেলেরা কিন্তু বাঙালী হলেও মানুষের মতো মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছে দুনিয়ার সামনে। এই দেশের মানুষ এবং এঁদের নেতাও যত সহজে হাসেন কাঁদেন তাতে মনে হয় পরিবার, পরিজন, ভাইবেরাদরের জন্য এঁদের প্রাণের টান এখনও প্রবল। আশা করি সেই টান স্বার্থের টানাপোড়েনে শিথিল হবে না, ক্ষমতার কলঙ্ক মেখে বিবর্ণ হবে না।

নবজাতক ৮ম বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ১৩৭৮ পৃঃ ২০৮-১৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রভাতেই অন্ধকার?

১৯৭১ সালে 'বাংলা দেশ' থেকে যেসব ছেলেরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকটির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছিল আমার। একটি ছেলেকে ভালো লাগত তার সারল্য আর সাহসের জন্য। ভারতবর্ষে এসে সে মুক্তি ফৌজে যোগ দেয়। জলপথে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের শিক্ষা নিয়েছিল মুর্শিদাবাদের কাছে ভাগীরথী নদীতে। পরে সে চট্টগ্রাম বন্দরে কর্ণফুলির মোহানায় কয়েকটি আক্রমণে যোগ দিয়েছিল শুনেছিলাম। এদেশে আসার আগে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পড়ছিল। মাঝে মাঝেই এই ছেলেটি বলতো, "দিদি, আমাদের সবচেয়ে এখানে যা ভালো লাগে সে হল আপনাদের স্বাধীনতা। আমার যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে মনে পড়ে না কখনও আমাদের দেশে সকলকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে, খোলাখুলি সরকারের সমালোচনা করতে দেখেছি। আমাদের দেশে কত তো সরকার বদল হল, এক্কেকবার উত্তেজনার ঢেউ উঠেছে, কিন্তু তারপরেই সব চুপ চুপ। গত ছ'সাত মাস হঠাৎ বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল অবশ্য, আবার তো দেখছেন ইয়াহিয়ার গুলিতে সব স্তব্ধ করে দিল। আমাদের পালিয়ে আসতে হল।"

ছেলেটির এই প্রশংসা আমাকে খুব আরাম দিত। কারণ বাংলাদেশ থেকে আসা মধ্যবিত্ত মানুষরা অনেকেই কখনও সোজাসুজি কখনও বা আভাসে জানিয়ে দিতেন যে তাঁরা ওখানে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাচ্ছল্য ভোগ করেন। হা-হুতাশ করতেন ফেলে আসা গাড়ি বাড়ি কার্পেট-ফ্রিজ ইত্যাদির জন্য। এমনকি ওখানকার বহু অধ্যাপকও যে কথা বলেননি সে কথা ঐ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রটি বলত—"আইয়ুব খানের আমল থেকেই আমাদের আয়েশে রেখে বোবা বানিয়ে ফেলেছে। এর চেয়ে আপনাদের দারিদ্র্য আমার ভালো লাগে। এখানে যেন খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া যায়।"

তাকে ভরসা দিয়ে বলতাম, "তোমরা যে ত্যাগ করছো এর মূল্যে নিশ্চয়ই তোমরাও এমনি স্বাধীনতা পাবে। যে ভয় আর ত্রাসের আবহাওয়ায় মানুষের শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, মাথা নীচু হয়ে আসে তেমন আবহাওয়া নিশ্চয়ই তোমরা আর ফিরে আসতে দেবে না।" আমি জানি না সেই ছেলে আজ কোথায়, হয়তো সেও একটা আয়েশী চাকরী পেয়েছে এবং স্বাধীনতার চেয়ে আরামকেই জীবনে বেশি দামী মনে করতে পারছে। কিন্তু তার কথাগুলি ঘুরে ফিরেই আমার মনে হয়। যা তাদের ছিল না, আজও তারা তা পায়নি, এত প্রাণের বিনিময়েও পায়নি। অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে, অবিশ্বাস আর হিংস্রতা বিষাক্ত করে তুলেছে তাদের বাতাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাইকেল মধুসূদনের সেই বিখ্যাত উক্তি "একে একে নিভিছে দেউটি।" পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে আরও একটি সর্বজনপরিচিত উক্তি ঃ "A light is out," সত্যিই কি গণতন্ত্রের প্রদীপ এশিয়ার জন্য নয়? দু'শ পরাধীন বৎসরের অন্ধকার কেটে গিয়ে যখন শর্বরী পোহাল তখন শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, সমস্ত এশিয়ার বুক থেকেই বণিকের মানদণ্ড-রাজদণ্ড সবই আস্তে আস্তে অপসৃত হয়ে গেল। দেখাদেখি আফ্রিকারও অনেকগুলি দেশ মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। কিন্তু সত্যিকারের স্বাধীন হল কটি দেশ? বহুকালের জড়তা অন্ধতা অবিচার আর বঞ্চনার অবসান হবে বলে মনে হয়েছিল। বিপুল সংখ্যক মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন নেহরুর মতো কয়েকটি নেতা। সেই স্বপ্ন কি মরীচিকায় মিলিয়ে গেল এই কটি বছরেই?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি যখন নিজের নিজের মতো করে নতুন সমাজ গড়বার কাজে হাত দিয়েছিল তখন পশ্চিমের কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর অর্থবিজ্ঞানীকে ভারত ও চীনের অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য পোষণ করতে দেখতাম। দারিদ্র্য অশিক্ষা আর হাজার হাজার বছরের সামাজিক অবিচার থেকে কোন দেশ কত দ্রুত মুক্তি পায় এই ছিল তাঁদের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের বিষয়। যেহেতু এই দুই দেশ অত্যন্ত ভিন্ন ধরণের দুই পথ বেছে নিয়েছিল তাই তাঁদের মনে হতো যেন গণতান্ত্রিক আর সাম্যবাদী পদ্ধতির মধ্যে এক প্রতিযোগিতা চলছে এই দুই দেশে। যে পদ্ধতি স্বল্পতর সময়ে সমাজকে ঢেলে সাজাতে পারবে, দারিদ্র্য দূর করতে পারবে, মানুষকে সুখী করতে পারবে সেই পদ্ধতিকেই এশিয়া আর আফ্রিকার আর সব অনুন্নত দেশগুলিও সার্থকতর পদ্ধতি ধরে নিয়ে অনুসরণ করবে এই ছিল তাঁদের ধারণা। তাঁরা এই দুই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার চরিত্র, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার আয়োজন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে প্রায়ই মন্তব্য.করতেন "এ যেন খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।" যেহেতু এই বিশেষজ্ঞরা অধিকাংশই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ছিল কচ্ছপের দিকেই, যদিও কচ্ছপের এই দুঃসহণীয় শ্লথ গতির নিন্দা করতে ছাড়েননি। তাঁদের মনে হয়েছিল, খরগোশ এই দৌড়ে আপাতত জিতবে ঠিকই কিন্তু কচ্ছপ যে পথ বেছে নিয়েছে সে পথেই মানুষের মঙ্গল বেশি। অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা নির্মম হাতে খর্ব করে, মানুষগুলিকে বিরাট এক রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে নিরুপায় কিন্তু কুশলী কলকব্জায় পরিণত করে দেশের উৎপাদন বাড়ান যায় ঠিকই, ঘরবাড়ি ইস্কুল কলেজ ফ্যাক্টরী বিজ্ঞানশালা সবই রাতারাতি বানিয়ে ফেলাও যায় বটে কিন্তু নিশ্চিত গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে নাগরিকদের যে দাসত্বের বন্ধন মেনে নিতে হয় রাষ্ট্রের কাছে তাতে শেষ পর্যন্ত সমাজের এবং ব্যক্তি-মানুষের মঙ্গল নেই।

অবশ্য স্বীকার করা ভালো যে এ দুয়ের মধ্যে বেছে নেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। যখন দেশের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন আমরা মেটাতে পারিনি তখন 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' কি একটা অন্তঃসারশূন্য ধারণা নয়? প্রত্যেকটি নাগরিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘরে ঘরে আর্থিক স্বাচ্ছল্য পৌঁছে দেবার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব না করে যদি উপায় না-ই থাকে তবে অবশ্য বলতেই হয় যে বর্তমানে যেহেতু অধিকাংশ নিরন্ন মানুষের পক্ষেই ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনোই অর্থ নেই তখন এই মানুষগুলিকে বরং পশুর পর্যায় থেকে মানুষের পদবীতে তুলে আনা হোক, কিছু মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলাসনা হয় উহ্য থাক। রুটি ছাড়া তো প্রাণ বাঁচে না, মনুষ্যত্বও রক্ষা পায় না।

কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আর অর্থনৈতিক উন্নতির মধ্যে যে ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক নয়, তাদের মুখ দেখাদেখিও চলতে পারে, তার নির্ব্যূঢ় প্রমাণ কি আমরা যুদ্ধোত্তর জাপান আর পশ্চিম জার্মানীতে পেয়ে যাইনি? শুধু চীন আর ভারতের প্রতিযোগিতাতেই এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে কেন? গত মহাযুদ্ধে যে দুটি দেশ সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল, পরাজয়ের অপমানে যাদের আত্মবিশ্বাস ভেঙে পড়ার কথা ছিল তাদের অর্থনীতিই দ্রুততম গতিতে ঐশ্বর্যের শিখরে পৌঁছেছে, এবং মাত্র এক প্রজন্মকালেই। সমৃদ্ধির ঐ মান চীন কেন, সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষেও দুরধিগম্য। অথচ এর জন্য এই দুটি দেশের জনসাধারণকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের পদতলে অঞ্জলি দিতে তো হয়নি।

দুঃখ এই যে আমরা ভুলে যাই (১) কোথাও কোথাও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব না করেও সমৃদ্ধি শৃঙ্খলা এসেছে; (২) কোথাও বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেই সমৃদ্ধি-শৃঙ্খলা লাভ হয়েছে; কোথাও আবার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করেও সমৃদ্ধি-শৃঙ্খলা আসেনি। আমরা যদি এই তৃতীয় দলেই গিয়ে পড়ি তাহলে আর একবার ভেবে দেখা দরকার নয় কি যে সমৃদ্ধি আর শৃঙ্খলা অর্জন করার জন্য সত্যিকারের অপরিহার্য শর্তটি কি? আমরা দাঁড়কাকও হলাম না, ময়ূরও হলাম না, জাতও গেল পেটও ভরল না—এই যদি আমাদের ভবিতব্য বলে মেনে নিই তবে ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপেই আমাদের স্থান হবে।

আর্থার কোয়েসলার যখন তাঁর সাধের সাম্যবাদী দেশে বিশ্বমানবের স্বর্গসাধনা ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখলেন, যখন তা ব্যক্তিস্বাধীনতাবঞ্চিত মানুষের কারাগার হয়ে উঠল তখন তাঁর চোখে মধ্যাহ্নেই অন্ধকার নেমে এল। আটাশ বছর আগে এক মধ্যরাতে নিয়তির সঙ্গে অভিসারে (tryst with destiny) বার হয়েছিল ভারতের কোটি কোটি মানুষ। সেদিন তাদের ঠিক পথটি ধরিয়ে দিতে ভুল করেননি নেতারা। স্বাধীনতা প্রভাতেই তারা দেখল বঞ্চিতকে, দলিতকে, অন্ত্যজকে, নারীকে মাথা তুলে বাঁচবার সেইসব অধিকার দেওয়া হল যা যে-কোনো দেশের মানুষের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু। দরিদ্রতম মানুষটিও শুনেছিল যে সে স্বাধীন দেশের নাগরিক, তার স্বাধীনতা হরণ করার ক্ষমতা কারুর নেই। দেশের সংবিধান তার রক্ষাকবচ। কিন্তু সেই প্রভাত গড়িয়ে মধ্যাহ্নে পৌঁছবার আগেই এশিয়া আফ্রিকার ঘনায়মান অন্ধকার এখানেও নেমে আসবে না তো?

ভাবনা চিন্তা, পৃঃ ৮৫-৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঙলা দেশ

কাইফি আজমী

আমি তো একটা দেশ নই যে গুঁড়িয়ে শেষ করবে আমায়
কোনও প্রাচীরও নই যে ভূমিসাৎ করবে আমায়
কোনও সীমানা নই আমি যে মুছে ফেলবে আমাকে
এই যে পৃথিবীর পুরনো মানচিত্র
মেলে রেখেছ তোমার টেবিলে
এ শুধু আঁকা বাঁকা রেখা ছাড়া আর কিছু নয়
এর মাঝে কোথায় খুঁজছ তুমি আমায়?
আমি উন্মাদের এক বাসনা
দলিত মানুষের আমি কঠিন প্রাণ
মানুষ যখন মানুষের রক্ত পান করে
লুণ্ঠন যখন যায় সীমা ছাড়িয়ে
জুলুম যখন হয় নিঃসীম
তখন হঠাৎ আমি দেখা দিই কোনও এক কোণে
কোনও এক বুক থেকে উথলে এসে পড়ি।
এর আগেও আমায় হয়ত তুমি দেখেছ
কখনও পূর্বে কখনও পশ্চিমে
কখনও নগরে, কখনও বা গ্রামে
কখনও জনপদে কখনও অরণ্যে
আমার শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস, ভূগোল কিছু নেই
আর এমনই সেই ইতিহাস
যা পড়ানোও যায় না।
তবু লোকে চুপি চুপি পড়ে
যে আমি কখনও বিজয়ী, কখনও বা হয়েছি পরাজিত
কখনও অত্যাচারীকে চড়িয়েছি শূলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আবার কখনও বা নিজেই শূলে চড়েছি।
তফাৎ শুধু এই আমার অত্যাচারীরা তো মরে যায়
আমি কিন্তু মরি না, মরতে পারি না

কী নির্বোধ তুমি!
তুমি যে ট্যাঙ্ক ভিক্ষা পেয়েছ
তাই নিয়ে চড়াও হয়েছে আমার বুকে
রাত দিন করেছো নাপাম বর্ষণ
দেখো ক্লান্ত হয়ে পড়বে।
বলো, আমার কোন হাতে পরাবে শিকল
আমার হাত যে সাত কোটি
কোন মাথাটি দেহ থেকে করবে বিচ্যুত
আমার কাঁধের উপর যে সাত কোটি মাথা।

নবজাতক, বর্ষ ৮ (১৩৭৮) পৃঃ ১৮৭-১৮৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'জাতীয় বিদ্যালয়'

ইংরেজের গোলামখানা থেকে মুক্তি দেবার দুঃসাহসে ভর করে এবং বিদেশী শাসকের ভ্রূকুটি আর আর্থিক অনুদারতাকে অগ্রাহ্য করেও সেবাগ্রাম কিংবা শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিনব এবং সাহসিক কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যাদবপুরের জাতীয় বিদ্যালয়, যার দ্বারোদঘাটন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। ......আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।'

সে একটা যুগ ছিল যখন বিদেশী সরকারের বৃহৎ স্কন্ধে আমাদের অনেক দোষত্রুটির দায় চাপিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু আজ সেই 'সুবিধাটুকু' আর নেই। অতএব স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে যত কিছু অ-কৃতকর্ম এবং কৃত-অপকর্ম আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সবটুকুরই দায়িত্ব আমাদের মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। গণতন্ত্রে শুধু যে শাসন-ব্যবস্থার বেলাতেই আমরা নাগরিকরা যেমনটির যোগ্য তেমনটিই পাই তা নয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার বেলাও তাই—আরও অনেক কিছুর সম্বন্ধেই সে-কথা বলা চলে। আমাদের শিক্ষা অব্যবস্থার যে সমস্যাগুলি নিয়ে প্রায়ই কেউ কেউ উষ্মা, ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৌলিক প্রশ্নও করা দরকার। এডুকেশন কমিশন/কমিটি ইত্যাদির রিপোর্টে বিধৃত মূল্যবান পরামর্শগুলি বাদ দিয়ে শিক্ষা বিষয়ে 'নতুন' চিন্তা করার এবং সেই চিন্তাকে মূলধন করে 'নতুন' ইস্কুল করার দুঃসাহস ইদানীং আমরা দেখতে পাইনি কেন?

শিক্ষার দুনিয়ায় হাওয়া সাধারণের চাহিদা যেদিকে সেদিকেই বইছে। ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর ইস্কুল যে শুধু সারা কলকাতাই নয়, মফঃস্বল শহরগুলিও ছেয়ে ফেলেছে তার সব চেয়ে বড় কারণ তো এই যে আমরা মধ্যবিত্ত জনসাধারণ তাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাই। বিদেশী মিশনরীরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরিঙ্গি বানাবার মতলব আঁটছে কিংবা এই ইস্কুলগুলি খ্রীস্টান বানাবার কারখানা এ জাতীয় বস্তাপচা অভিযোগ শিশু-সুলভ। আসল কথা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত আমরা মেনে নিয়েছি যে, ঐ ইস্কুলেই এখনও পড়াশোনা কিছু হয় এবং আজ পর্যন্ত এর চেয়ে ভালো ইস্কুল তৈরী করে আমরা খুব একটা দেখাতে পারিনি, অতএব সাধারণের মনও আকর্ষণ করতে পারিনি। তাছাড়া সবাই জানেন যে ইংরেজি ইস্কুল চালানোর 'অপরাধটা' একমাত্র মিশনারীরাই করছেন না এবং মিশনরীরা সারা দেশ জুড়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য আঞ্চলিক ভাষার ইস্কুলও প্রচুর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে থাকেন। অন্যপক্ষে ইংরেজি ইস্কুল প্রতিষ্ঠার উৎসাহও আবার শুধু অবাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমিত নয়, এই শিক্ষা-ব্যবসায় যে একই কালে কত অর্থপ্রদ এবং যশস্কর তা 'আদর্শবাদী' বাঙালী ও এমনকি 'প্রগতিবাদী' বাঙালীরাও বেশ টের পেয়ে গেছেন। অতএব আমরা যেমনটা চাই তেমনটাই সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের চতুর্দিকে। কিন্তু আমাদের কি চাওয়া উচিত তার একটা ধারণা দেওয়া কিংবা সেই চাওয়াটাকে একটা উঁচু তারে বেঁধে দেওয়ার মতো মানুষ আর নেই। আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের আশা তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্য রেখার কাছাকাছি।' আমাদের ছেলেদের গোলাম আর কেরানী বানাবার জন্য ইংরেজ তো আর এদেশে বসে নেই কিন্তু সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে আজও আমাদের প্রত্যাশা ঐ চাকরী ছাড়া আর কিছু নয়।এমনকি কৃষি বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে এসেও চাকরীই আমাদের শেষ গন্তব্য।

জনসাধারণকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত করে তুলবার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সর্বজনীন এবং অবশ্য গ্রহণীয় করা দরকার হয় একথা সবাই জানেন। তবে আবশ্যিক শিক্ষার কতখানি দায়িত্ব সরকার সরাসরি নিজের কাঁধে নিতে পারে তা নির্ভর করে তার আর্থিক সচ্ছলতার উপর। পশ্চিম বাংলায় এখন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করা যায়নি। দেশের সমগ্র প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী উদ্যোগ যেহেতু অত্যন্তই অল্প, তাই আজও সমাজের চিন্তাশীল আদর্শবাদী কর্মোন্মুখ মানুষদের উপর এর দায়িত্ব কিছুটা বর্তায়। এমনকি সচ্ছল ও আদর্শ গণতন্ত্রেও, যেখানে শিক্ষার সবটুকু আয়োজনই সরকার করতে সক্ষম সেখানেও শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অধিকার নাগরিকদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয় না। কারণ এ জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় ও পদ্ধতিতে অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করা হয়। আমরা-পরিচালিত শিক্ষাসত্রে দিনানুদৈনিক ব্যবস্থা যতই কেন না উচ্চাঙ্গের হোক নতুন চিন্তার এবং এক্সপেরিমেন্টের সেখানে সুযোগ নেই। যাই হোক, আমাদের গণতন্ত্রী সরকার আজও যেহেতু শিক্ষাদানের সিংহভাগ ছেড়ে রেখেছেন জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও উদ্যোগের উপর তখন এ দায়িত্ব আমাদের নিতেই হয়েছে। নয়ত শিক্ষার জন্য এখন দূরতম গ্রামে গঞ্জেও যে চাহিদা জেগে উঠেছে, তা মেটাবে কে? এই সরকারী-বেসরকারী মিলিত উদ্যোগ যতই কেন সামান্য হোক স্বাধীনতার পর এদেশেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'অভূতপূর্ব' বিস্তার ঘটেছে শিক্ষার। কারণ 'ভূতপূর্ব' ব্যবস্থা, তা এ্যাডাম সাহেব তার জন্য যতই কেন না চোখের জল ফেলে থাকুন, 'মানে'র বিচারে এবং 'বিস্তারে'র হিসেবেও এমন কিছু দুরতিক্রম্য ছিল না। আজ যে-কোনো গ্রামেও দু-চারটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে পাওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলি যথার্থ 'জাতীয় বিদ্যালয়' হয়ে উঠেছে কি? গত পঁচিশ বছরে যে প্রজন্ম ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, তাদের কি অভূতপূর্ব কিছু দিতে পেরেছি আমরা? প্রাক্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগগুলি ছিল এ জাতীয়—

(১) আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই সেই শিক্ষার ফলে দেশের কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি।

(২) শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাবিধি বিজাতীয় হওয়ায় না বুঝে মুখস্থ করে পাস করা এবং ডিগ্রি পেয়ে চাকরীতে ঢোকাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

(৩) 'এই মানসিক শক্তিহ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষা'-ক্রমে আমাদের হৃদয়মন বিবেকবুদ্ধিকে পরাস্ত করে আমাদের অপদার্থ করে ফেলেছিল।

(৪) আমাদের ভাষা, আমাদের ঐতিহ্য ও আমাদের সংস্কৃতি বিষয়ে ঐ শিক্ষা আমাদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করছিল।

(৫) শিক্ষিত ইংরেজিনবীশ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিরক্ষর দেশবাসীর দুস্তর বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল।......ইত্যাদি।

অবশ্যই স্বাধীনদেশের নতুন শিক্ষাধারা শিক্ষাকে আনন্দের, প্রয়োজনের ও গর্বের বস্তু করে তুলতে পেরেছে কিনা সে প্রশ্ন উঠবে। উত্তর আমরা সবাই জানি। কিন্তু কেন এমনটা হোলো? বলা যায়, তার কারণও বহু আগেই নির্ণয় করা হয়ে গেছে: 'আমরা জানি, দেশের মঙ্গল সাধনের দায়িত্ব গবর্নমেন্টের অতএব আমাদের অভাব কী আছে না আছে, তাহা না বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই।.....আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব কিন্তু পথ করা না করা সে অন্যের হাত—তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।'

এককালে পরাধীন দেশে গভীর অর্থ সঙ্কটের মধ্যেও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্ত চমকপ্রদ এবং মূল্যবান কিছু আয়োজন হয়েছিল, আজ এই গরীব দেশের সামর্থ্যের তুলনায় অপরিসীম অর্থানুকূল্য পেয়েও নতুন কিছু হওয়া দূরে থাক, সেই প্রাক্তন গর্বের বস্তুগুলিকেও আমরা আর সজীব রাখতে পারছি না। বাংলাদেশে আমরা গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষাকে কোনোদিনই তেমন শ্রদ্ধা করিনি। কিন্তু শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তো আজও বছরে বছরে কত উৎসাহ দেখি বসন্তোৎসব, পৌষ উৎসবের দর্শকদের মধ্যে। কিন্তু সেখানকার শিক্ষাধারা দেশের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া দূরে থাক, সেখানেই ক্রমে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতন তো একটা দ্রষ্টব্য যাদুঘর নয়, ওটা একটা জীবন্ত কর্মধারা, একটা ভাব। বুনিয়াদী শিক্ষা 'শিল্প সচেতন' বাঙালীর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারলেও শান্তিনিকেতনী শিক্ষা তো করা উচিত ছিল। কিছুটা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই কলানবগ্রাম বা ঠাকুরপুকুরের ব্রতচারী বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুরু হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু কত অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানগুলির সে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেছে। কেন? 'যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায়, সে দেশের কল্যাণ নাই।' নরেন্দ্রপুরের মতো আরো দু-একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের নাম করা যায় হয়ত, কিন্তু তাদের মত প্রতিষ্ঠান আর কত! তবে অল্পদিনেই নরেন্দ্রপুরের যে বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ধরনের স্কুল সম্বন্ধে সাধারণ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা কঠিন নয়। কিন্তু এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে নিষ্ঠা, চারিত্র্য আর আদর্শবোধ প্রয়োজন হয়, তা পাওয়াই সহজ নয় আজকের দিনে। তুলনায় আদর্শের ভড়ং নিয়ে জমকালো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অনেক সহজ। তাতে আমাদের চোখ ধাঁধায়, প্রতিষ্ঠাতাদের 'পারমার্থিক' লাভও কিছু কম নয়। এমন কি আমাদের শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদাধিকারীরাও যেন বুঝতে পারেন না আমরা কি চাই, কি ধরনের বিদ্যালয় আমাদের গর্বের বস্তু হতে পারে। পাঁচ-হাজারী সাত-হাজারী ইস্কুল-কলেজের বিরাট প্রাসাদ দেখে, পরীক্ষায় কটা 'প্লেস' দখল হয়েছে তার হিসেব কষে আমরা উদ্বাহু হয়ে তাদের অভিনন্দিত করি। কিন্তু খোঁজ করি না যে, ঐ সব শিক্ষাসত্রে শিক্ষক ও ছাত্রদের একটা কাজ চালাবার মতো লাইব্রেরী পর্যন্ত আছে কিনা, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দেহমনকে ছড়িয়ে দেবার মতো একটা খেলার মাঠ আছে কিনা, দু-তিন শিফটে পড়া মুখস্থ করিয়ে দেওয়া ছাড়া তাদের আত্মপ্রকাশের আর কোনো ক্ষেত্র করে দেওয়া হয় কিনা। ঠাঁট-ঠমক, পোশাক-আসাক এমন আমাদের মাতিয়ে দেয় যে ছেলেরা সত্যিকারের কি আয়ত্ত করলো সেকথা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে যাই।

অথচ শান্তিনিকেতন তো ছিল এসব অসার উপকরণবাহুল্যেরই প্রতিবাদ। তৎকালীন শিক্ষা-ব্যবস্থাটা বিদেশী শাসকের হাত থেকে পাওয়া বলে নয়, ব্যবস্থাটা সামাজিক এবং ব্যক্তি-মানুষের প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রতুল ছিলো বলেই আমাদের গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আজ যদি স্বদেশী সরকার কিংবা স্বদেশবাসীর হাত থেকেও তেমনি ঠুঁটো শিক্ষা আর মেকী তালিম ছড়াতে থাকে তাহলে দোষী করার লোক বাইরে না খুঁজে আমাদের ভিতরের দিকেই খোঁজা ভালো।

একদিকে যে সরকারী স্কুল-কলেজগুলি এতকাল অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত ছিলো সেগুলির দ্রুত অবনতি ঘটছে। অন্যদিকে গ্রামে-গঞ্জেও দেখতে পাওয়া যাবে সরকারী অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা মস্ত বড় বড় মালটিপারপাস ইস্কুল কিংবা কলেজ—পরিবেশের সঙ্গে সেগুলি বড়ই সঙ্গতিহীন। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে হয়ত বলতেন, এগুলি শিক্ষিত বেকার গড়ার কারখানা। ঐই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে স্থানীয় সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার, উৎসব-ব্যসনের প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই। কেবলমাত্র বাৎসরিক বন্যার সময় গৃহহীনরা স্কুল বা কলেজ বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় এবং মাসখানেকে সেগুলিকে অব্যবহার্য করে রেখে চলে যায়। তারপর আবার সেগুলিতে সরকারী টাকার কলি ফিরিয়ে 'পড়াশোনা' শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের কোনো আশা-ভরসার প্রতীকও নয় এবং সমাজের সঙ্গে কোনো যথার্থ মঙ্গলকর্মে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুক্তও নয়। এই বিরাট বাড়িগুলিকে অন্তত আংশিকভাবেও বয়স্কশিক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় বলে শুনিনি। ইস্কুলের বা কলেজের পাঠাগারের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও হয় না যাতে স্বাধীন জনসাধারণও যোগ দিয়ে উপকৃত হবে। তাহলে এগুলিকে আমরা কি হিসাবে 'জাতীয় বিদ্যালয়' বলব? যে 'জাতীয় বিদ্যালযের' উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাও কালে এক বৃহৎ বিজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ স্বদেশী আদর্শে, স্বদেশের সত্যিকারের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রায় কিছুই করিনি। তাহলে নানা জাতের স্নাতক নয়, শুধু মানুষ গড়ার দায়িত্বটা নেবে কে?

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৬।০৬।৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা নাকি শিক্ষার মূলোচ্ছেদ

দেশ স্বাধীন হবার পর গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথাকথিত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ে চলেছে বলে আমার ধারণা। স্বাধীনতা লাভ করতে না করতেই গান্ধিজি নিহত হলেন। এই ঘটনা আমাদের নেতাদের বিবেককে ধাক্কা দিল। অনেকটা হয়তো সে কারণেই গান্ধিজির প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ বলে গ্রহণ করা হল।

তবে জাকির হোসেনের পরামর্শে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ কর্মকেন্দ্রিক ও স্বয়ম্ভর করার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হল। যদিও বহু ব্যয় করে এই কাজ শুরু করা হয়েছিল তবু প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এই আদর্শে খানিকটা ঢেলে সাজানো হয়েছিল। মধ্যশিক্ষার স্তরকে সামান্য একটু স্পর্শ করেছিল মাত্র, যেমন কর্মশিক্ষাকে একটি বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। বেশ কয়েকটি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বুনিয়াদি আদর্শে গড়ে তুলে বেশ সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও গান্ধিজির শিক্ষাব্যবস্থার শিকড় এই দেশের মাটিতে প্রবেশ করতে পারে নি। দেশের মাটি থেকে দেশের প্রয়োজন বিবেচনা করে যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা গান্ধিজির করেছিলেন তা ধোপে টিকল না। মধ্যবিত্ত সমাজ তো তাকে গ্রহণ করেই নি, এমন কি গ্রামীণ নিম্নবিত্ত সমাজও এর উপকারিতা উপলব্ধি করল না।

তারপর থেকে একের পর এক বহু এডুকেশন কমিটি তৈরি হয়েছে,বহু আদেশ নির্দেশ এসেছে কিন্তু কাজের কাজ খুব অল্পই হয়েছে। এর মূল কারণ কিন্তু এই নয় যে ওইসব কমিটির ধ্যানধারণায় বা নির্দেশে খুব কিছু ভুল ছিল। আসল সমস্যাটা ছিল এই যে, দেশের বাস্তব পরিস্থিতিটাকে কেউই তেমন বুঝে দেখবার চেষ্টা করেননি। যেমন কিনা মালটিপার্পাস শিক্ষাব্যবস্থার ধারণা অনুযায়ী মধ্যশিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাতটি ধারায় বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর ক্ষমতা অনুযায়ী এক একটি ধারাকে নির্বাচন করার নীতিটি খুবই যুক্তিসংগত ছিল। কিন্তু দেশে এমন স্কুল খুবই কম চালু করা গিয়েছিল যেখানে তিনটি বা চারটি ধারার বেশি পাঠক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। সরকারি অনুদান সত্ত্বেও অর্থাভাব ছিল। সবচেয়ে বেশি অভাব ছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের। ছুতোরের কাজ, চাষবাসের কাজ, কলকব্জা মেরামতির

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাজ হাতে কলমে যাঁরা শিখিয়ে দিতে পারতেন তাঁরা নিজেরা নিরক্ষর বলে এইসব বিদ্যার তাত্ত্বিক দিক বুঝিয়ে দেওয়া বা আলোচনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ বহুমুখি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুশিক্ষিত চাষি ও কারিগর গড়ে তোলা। শুধু কেতাবি বিদ্যা অর্জন নয়।

আমাদের বামপন্থী সরকার গত পনের কুড়ি বছর ধরে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে তাতেও এই বাস্তববোধের অভাব আছে। কেন আছে, সেই আলোচনায় পুরোপুরি না গিয়ে কেবলমাত্র ইংরেজি পঠন পাঠনের ব্যাপারটাই অল্প একটু তুলে ধরছি। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত হতে পারে না। তবে আমাদের মতো বহুভাষি দেশে কোনো একটি আঞ্চলিক ভাষাকে সেই অঞ্চলে বসবাসকারী সব মানুষের মাতৃভাষা বলে দাবি করা যায় না। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষাই একমাত্র মাতৃভাষা নয়। তাই বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজিকে বিকল্প মাধ্যম হিসেবে যদি না গ্রহণ করা হয়, তাহলে বহু অবাঙ্গালি মানুষের অত্যন্ত অসুবিধে সৃষ্টি করা হয়। অথচ এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে বামপন্থী সরকার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিকে নানাভাবে উৎপীড়ন করা চলেছিল। উৎপীড়ন বলতে যা বোঝায় ঠিক সেটাই হচ্ছিল।

সত্যি বলতে কি এদেশেও প্রাথমিক পর্যায়ে একটিমাত্র ভাষা শিক্ষা যথেষ্ট বলে মনে করা যেত এবং ইংরেজি শেখানোর প্রয়োজন হত না যদি না অল্পসল্প ইংরেজি জ্ঞানের প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রেই আজও থাকত। যারা প্রাথমিক পর্যায়ের পরে পড়াশোনা করবার সুযোগ পাবে না তাদেরও জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিছুটা ইংরেজি জ্ঞানের প্রয়োজন ঘটছে। এই সামান্য বিষয়টি অনেক আলোচনা সমালোচনা ও আন্দোলনের পরে এতদিনে সরকারের বোধগম্য হয়েছে। এখন নতুন করে এই বছর থেকে ক্লাস ফাইভে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে।

কিন্তু ক্লাস সিক্স থেকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য Learning English নামে ধারাবাহিক পাঠ্যপুস্তকগুলিকে গেলাবার যে সরকারি চেষ্টা গত দশ পনেরো বছর ধরে হয়ে চলেছে তাতে ছাত্র এবং শিক্ষকরা জেরবার হয়ে যাচ্ছে। অথচ সরকারী বিষনজরে আছে যেসব ইংরেজি স্কুল, —সেখানে এই বইগুলি কোনো সমস্যাই সৃষ্টি করছে না। কারণ সেখানে ছাত্র এবং শিক্ষকরা ইংরেজিতে কথোপকথন করতে অভ্যস্ত। তাই প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া বা নির্দেশ দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেওয়ায় কোনো অসুবিধা তাদের বেলা হচ্ছে না। কিন্তু বাংলা মাধ্যম স্কুলে Learning English প্রথম ভাগ দিয়ে ক্লাস সিক্স-এ ইংরেজি পঠন-পাঠন শুরু করার মতো নির্বুদ্ধিতা কি করে এত বছর ধরে চলে আসছে—সেটাই অবিশ্বাস্য। এইসব স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকরা প্রায় কেউই ইংরেজি কথোপকথনে অভ্যস্ত নয়। অধিকাংশই একটি দুটি ইংরেজি প্রশ্নও নির্ভুলভাবে করতে পারেন না। অতএব Question Bank ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। যাঁরা নিজেরা একটি দরকারি চিঠি নির্ভুল ইংরেজিতে লিখতে পারেন না, কখনও ইংরেজি পত্রিকাটি পর্যন্ত পড়েন না—তাঁদের একমাস-দেড়মাস ট্রেনিং দিয়ে Learning English জাতীয় বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়াবার যোগ্য করে তোলা যায়—এ কথা এই পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের কি করে মনে হল? এই বইগুলির দোষ ত্রুটি আমি উদাহরণসহ তুলে ধরতে পারছি না কারণ ঠিক এই মুহূর্তে বইগুলি আমার হাতে নেই।

কিন্তু আমাদের খেলাঘর বিদ্যালয়ে আমরা বহু চেষ্টা করেও এমন শিক্ষক পাচ্ছি না যিনি এই বইগুলি পড়ে বোঝেন এবং ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে পারেন। আমার বিশ্বাস সমস্ত চব্বিশ পরগনার সব গ্রামীণ বিদ্যালয়েরই এই দুরবস্থা। ফলে ইংরেজি শিক্ষার যন্ত্রণা আর ঘুচল না। এখন শিক্ষক আর ছাত্র দুই পক্ষকেই মুখস্থ করে প্রশ্ন করতে হয় এবং মুখস্থ করে উত্তর দিতে হয়। আর উত্তর দেবার ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব ভাষা-ব্যবহার-বর্জিত করে ভাষা শিক্ষার মূল উচ্ছেদ করা হয়েছে। অথচ মাধ্যমিক পর্যায়ে অঢেল নম্বর পাওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে, শিক্ষার মর্যাদা না বুঝেই।

শ্রয়ণস্থল, বর্ষ ১ (১৯৯৬) সং ৬, পৃঃ ৭-৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ইংরাজির নির্বাসন নয়

ভাষা নিয়ে আর একবার ভাববার সময় এসেছে মনে হয়। আমাদের সমস্যাটা সরল নয় এবং জোর করে একটা রাজনৈতিক সমাধান চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় একটা গণতান্ত্রিক দেশে। প্রায় এক কুড়ি সুপরিণত ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে এ দেশে এবং একেকটি ভাষাগোষ্ঠী যেহেতু সুনির্দিষ্ট একেকটি অঞ্চলে বসবাস করছেন তখন সব ভাষাকটিকে একাকার করে তার সুরাহা সহজ নয়। বিশেষত আমরা যখন সমস্ত আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা, বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি গালভরা আদর্শগুলিকে অহরহই পুনরাবৃত্তি করে আসছি। এরই মাঝখানে সম্প্রতি লোকসভায় শ্রীরাজনারায়ণ ভাষা বিষয়ে যে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সেটা তাঁর অন্যবিধ পাঁচটা ক্ষ্যাপামিরই একটা মাত্র নয়। তাঁর আচরণে আজ উত্তর-পশ্চিম-মধ্য ভারতের একটি বিস্তৃত অঞ্চলের সাধারণ ও নেতৃস্থানীয় বহু মানুষেরই মনোভাবের প্রকাশ দেখছি। তাঁরা মাথা গুণতিতে দলে ভারী বলেই ধরে নিয়েছেন যে তাঁরা হিন্দী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখতে বাধ্য নন। এবং পূর্বে সরকারীভাবে স্বীকৃত ত্রিভাষাসূত্রকেও তাঁরা নিজেদের সুবিধামত কার্যত এক ভাষা সূত্রে পরিণত করতে পারেন, বাকি ভারতবর্ষ যাই করুক না কেন।

অবশ্য আমি লক্ষ্য করেছি, হিন্দী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে বলে থাকেন যে আপনারাও নিজের নিজের মাতৃভাষায় কথা বলুন আপত্তি নেই। কেবল ঐ বিজাতীয় ইংরিজি ভাষাটা ব্যবহার করবেন না। এই উদারতার পিছনে চাতুরীটা ধরবার জন্য ভীষণ কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ইংরিজিই যে তাঁদের প্রধান শত্রু এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একবার ঐ শত্রুকে হটাতে পারলেই যে তাঁরা ফাঁকা ময়দান পেয়ে যাবেন এতে তাঁদের সন্দেহ নেই। সত্যিই তো আর মালয়ালী অহমিয়া বাঙালী কোঁকনী নেপালী মণিপুরীরা লোকসভাকে একটি টাওয়ার অব বেবেলে পরিণত করতে চাইবেন না। আমাদের প্রতিনিধিরা সেখানে মাতৃভাষায় কলরব করবার বিরল সুখের সন্ধানে তো যান না, নিজের নিজের রাজ্যের কিছু জীবনমরণ সমস্যা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বক্তব্য সর্বভারতীয় এই প্রতিনিধি সভায় পৌঁছে দেওয়ার দরকার হয়। সেই প্রয়োজন সাধনের মাধ্যম হিসাবে ইংরিজিকে বাতিল করতে পারলে তখন তারা প্রাণের দায়ে হিন্দীতে বলতে শুরু করবেন—এই হল রাজনারায়ণ-গোষ্ঠীর নাতিগূঢ় প্রত্যাশা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরও যেটা আমার বিপজ্জনক ঠেকে সে হল ইংরিজির ব্যবহারকে প্রায় দেশদ্রোহিতা জ্ঞান করা। যিনি ইংরিজিবর্জনের ব্যাপারে যত সরব তিনি তত বড় দেশপ্রেমী। এক পক্ষের অসহিষ্ণুতা অন্য পক্ষকেও অসহিষ্ণু হতে প্ররোচিত করে। শ্রীরাজনারায়ণ যদি 'প্রতিজ্ঞা' করেন যে তিনি তাঁর মাতৃভাষা 'হিন্দী' ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলবেন না, তবে কেউ কেউ কেন এমন প্রতিজ্ঞা করবেন না যে তাঁরা 'ইংরিজি' ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা কইবেন না? ইংরিজিও এদেশের অনেকের মাতৃভাষা—এবং সে কথা সরকারীভাবে অস্বীকৃত নয়।

অথচ সারা দেশ জুড়ে দেখছি ইংরিজি সম্বন্ধে একটা ambivalence—আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটি পরস্পরবিরোধী দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। একদিকে একদল তাকে নির্বাসন দণ্ড দিতে কোমর বেঁধেছেন, অন্যদিকে ইংরিজি-প্রীতি প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ্যে—এমন কি হিন্দী অঞ্চলেও। দেশ স্বাধীন হবার পর ঠিক ত্রিশ বছর কেটে গেছে। এই ত্রিশ বছরে অপ্রত্যাশিত যা কিছু ঘটেছে এদেশে তার মধ্যে একটা নিশ্চয়ই এই যে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে ইংরিজি মাধ্যমে পড়াশোনা করার উৎসাহ অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সরকারী আনুকূল্য না পেয়েও—বরং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও—ইংরিজির জনপ্রিয়তা হিন্দীকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। এই শহরেই ১৯৪৭ সালে যতগুলি ইংরিজি মাধ্যম স্কুল ছিল এখন নিশ্চয়ই তার চতুর্গুণেরও বেশি আছে।

এ নিয়ে আমি হুতাশ ততটা করি না যত কৌতূহল বোধ করি। উচ্চবিত্তের কথা বাদ দিলাম। মধ্যবিত্ত এমন কি নিম্নমধ্যবিত্ত মা-বাপও আজ যেভাবে মুক্তকচ্ছ হয়ে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করে ছেলেমেয়েদের ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করার জন্য প্রাণপণ করেন তাতে অন্তত একথাটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে ইংরিজি শেখার ব্যবহারিক মূল্য বেড়েছে। বাড়া উচিত ছিল কি ছিল না সেটা আপাতত আমার বিচার্য নয়। কিন্তু ইংরিজি যে নিজগুণেই (অথবা আমাদের দোষে?) আমাদের জাতীয় জীবনের একটি অপরিহার্য ভাষা হয়ে উঠেছে এবং প্রতি বৎসর আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এদেশে ইংরিজিকেই আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম জ্ঞান করছেন এতে তো সন্দেহ নেই। আবার ইংরিজি ছাড়া অন্য কোনো মাতৃভাষা নেই এমন একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ ছড়িয়ে আছেন শুধু নাগাল্যান্ডেই নয়, ভারতের আরও বহু প্রান্তে। এঁদের অভারতীয় ঘোষণা না করে তো ইংরিজিকে অভারতীয় জ্ঞান করা যাবে না।

তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা দীক্ষায় ইংরিজির স্থান হবে গৌণ। আমরা প্রধানত যে যার মাতৃভাষাতেই শিক্ষা গ্রহণ করব—তাতেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মঙ্গল হবে। অন্তত স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত আমরা যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছি তাতে করে শিক্ষাদান ও গ্রহণ সহজতর হবে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর থেকেই একাধিক ভাষা শেখাও প্রয়োজন এবং সেদিক থেকে ইংরিজির একটা বিশিষ্ট স্থান আজও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গতভাবেই রয়েছে। মনে রাখা ভাল যে পৃথিবীর বহু দেশেই, এমন কি সাম্যবাদী দেশেও ইংরিজি শেখার আগ্রহ বেড়েছে। আমরা একদিন ইংরেজের প্রজা ছিলাম বলেই ইংরিজি বর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ না হলে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না এ যুক্তি আমি সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারি না। মাতৃভাষার শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন করেও সে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যই যদি আমরা ইংরিজির সহায়তা আরও বহুকাল গ্রহণ করি তাতে ক্ষতি কি? ইংরিজিকে তেমন করে আত্মস্থ করতে পারলে জাতীয় আত্মসম্মানও ক্ষুণ্ণ হবে না, শিক্ষার মানও ক্ষুণ্ণ হবে না।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরিজির অপরিহার্য নয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষায় ইংরিজির সহায়তা কিছুদূর পর্যন্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতি রাজ্যেই অধিকাংশ বিদ্যালয়ের মাধ্যম সেই আঞ্চলিক ভাষাই হবে, এই নীতি মেনে নিয়েও বলব যে-কোনো রাজ্যেই এমন কোনো আইন করা, যেমনটা বিহারে করা হয়েছে, অত্যন্ত অসঙ্গত হবে যে সে অঞ্চলে ইংরিজি বা অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও চলবে না। জাতীয় সংহতির স্বার্থেই আমরা বরং চাই যে প্রতি রাজ্যেই অন্য রাজ্যের ভাষাভাষীরা যদি যথেষ্ট সংখ্যায় থাকেন এবং উৎসাহী হন তবে যেন তাঁদের নিজের নিজের ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এটা আমাদের অন্যতম মৌলিক অধিকার।

ইংরিজি-মাধ্যম ইস্কুলের উপরও খড়্গ হস্ত হলে চলবে কেন? অন্য সব কারণ বাদ দিলেও অন্তত একটি কারণ স্মরণ রাখা দরকার। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহু লোককে সর্বদাই জীবিকা ও অন্যান্য কারণে সপরিবারে ভ্রাম্যমাণ থাক্‌তে হবে, থাকাই উচিত। তাঁদের পুত্রকন্যারা কোথাও মারাঠী ভাষায়, কোথাও ওড়িয়াতে কোথাও বা তেলেগুতে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে একি আশা করা যায়? তা ছাড়া বাঙলা দেশে বসে কোনো বাঙালী মা-বাবা যদি ইংরিজি মাধ্যমেই সন্তানকে পড়াশোনা করাতে চান তাতেই বা ক্ষুব্ধ কিংবা ক্রুদ্ধ হবার কি আছে? একদল ছেলেমেয়ে এর ফলে কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে, এটা এদেশে এখনও কোনো যুক্তি নয়। যেসব ছেলেমেয়েরা অন্নবস্ত্র শিক্ষা কিছুই পাচ্ছে না তাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের ছেলেমেয়েরা আজন্ম যে কত বিশেষ সুবিধা পেয়ে চলেছে সে অসাম্য দূর করার জন্য আমরা কে কি করছি। সুযোগ-সুবিধা বন্টনের ব্যাপারে কোনো সত্যিকারের সমনীতি আমরা গ্রহণ করেছি কি?

আপাতত যে রাজনৈতিক সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সে হল সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা নিয়ে। যাকে বলা হয় Link language অথবা lingua franca—সেই পদ কাকে দেওয়া হবে? এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরিজি ও হিন্দী এই দুই ভাষাই এ কাজ করে আসছিল স্বাধীন ভারতে। এবার ইংরিজিকে সে পদ থেকে বরখাস্ত করে একমাত্র হিন্দীকেই বহাল করার দাবি ক্রমেই প্রবল ও সোচ্চার হয়ে উঠছে হিন্দী অঞ্চলে। অথচ নেহরু বলেছিলেন এ দাবি যখন অহিন্দী ভাষী অঞ্চল থেকে উঠবে তখনই তাকে মেনে নেওয়ার সময় আসবে। এদিকে ইংরিজিকে আজই নির্বাসনে না পাঠালে হিন্দীভাষীদের স্বাজাত্যাভিমান রক্ষা হয় না। এবং তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে অহিন্দীভাষীরা এ-বিষয়ে সমান উত্তেজিত নন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপাতত দেখছি যে আন্তর্জাতিক সংযোগের সমস্যা বাদ দিলেও সর্বভারতীয় সংযোগের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তরের কথা স্পষ্ট করে ভাবতে হবে। সংযোগ তো শুধু রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরেই নয়, তার চেয়েও বহুগুণ বড় এবং বহু গুরুতর সংযোগের ক্ষেত্র হল সাংস্কৃতিক যোগ। এই ক্ষেত্রটির সযত্ন পরিচর্যার উপরই ভারতের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত। এই সংযোগের মাধ্যম গত একশত বছর ধরে ইংরিজিই প্রধানত। আমরা যে গতিতে গত ত্রিশ বছর হিন্দী আয়ত্ত করেছি তাতে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা অসঙ্গত শোনাবে না নিশ্চয়ই যে পঞ্চাশ বছর পরেও সর্বভারতীয় বিজ্ঞানসম্মেলন, অথবা নিখিল ভারত দর্শন মহাসভা, অথবা অখিল ভারত সাহিত্য সভাতেও ইংরিজিই হবে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম। সেখানে বাঙালী অহমিয়া তামিল ওড়িয়া প্রতিনিধিরা হিন্দীতে প্রবন্ধ পাঠ করবেন বা আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবেন এতটা এখনও প্রত্যাশা করতে পারি না। দেশ স্বাধীন হবার পরেই হিন্দী শেখার যতটুকু উৎসাহ ছিল অহিন্দীভাষী অঞ্চলে এখন তাতেও ভাটা পড়েছে। অচিরেই জোয়ার আসার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না, জবরদস্তির ফলে তো নয়ই।

যদি আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে ইংরিজি আজও অপরিহার্য বোধ হয়, যদি সর্বভারতীয় সমস্ত সংযোগের ব্যাপারেও ইংরিজি আজও আমাদের কাছে বেশি সুবিধাজনক ঠেকে তবে হিন্দী শিখতে আমরা বাধ্য হবো কি শুধু এই কারণে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কোনো আঞ্চলিক সরকারের কিছু মন্ত্রী ও আমলারা ঘোষণা করেছেন যে ইংরিজিতে তাঁদের সঙ্গে পাত্র-ব্যবহার করলে সে সব পত্রের একমাত্র গতি হবে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি? এই অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ প্রয়োজন।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ০১।১০।৭৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সৎভাবে পড়লে এই পাঠ্যসূচিতেও কাজ হত

ইংরেজ আমলে কোনোরকমে নাম সই করতে পারাটাকেই সাক্ষরতার সমার্থক বলে ধরে নেওয়া হত। এটা প্রায় ১৯৩৭ সালের কথা। এরপরে খবরের কাগজ পড়া, কিছু চিঠিপত্র লেখা বা নোটিশ পড়ার মতন বিষয়কে অবশ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৭-এর পর আমাদের দেশে শিক্ষা নিয়ে কোঠারি কমিশন সহ একাধিক কমিশন বসে। সাক্ষরতা ও গণনা—দুটোকে পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের কথা, এ ব্যাপারে আমরা ইংরেজ আমলের থেকে বিশেষ এগুতে তো পারিইনি বরং আমাদের গোলটাকে আরো নামিয়ে আনা হয়েছে।

এই সাক্ষরতা নিয়ে চারদিকে এক ব্যাপক মিথ্যাচার চলছে। বলা হচ্ছে মেদিনীপুর বর্ধমান সব সাক্ষর হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলো একেবারে মিথ্যে কথা। শতকরা ৯৫ জন নাম পর্যন্ত স্বাক্ষর করতে পারেন না। অথচ ভুল পরিসংখ্যান দিয়ে সাক্ষরতা কর্মসূচির মহিমা প্রচার করা হচ্ছে। আগের চাইতে আমাদের গোলটা তো নেমেছেই; কিন্তু সেটুকুও আমরা অর্জন করতে পারিনি। রাস্তাঘাটে সাক্ষরতা সংক্রান্ত হোর্ডিং-এ যে খরচা হচ্ছে, তার ছিটেফোঁটাও পাচ্ছে না সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলো। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে রীতিমতন ধুঁকছে এই সাক্ষরতা কর্মসূচি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক সময়ে বেঙ্গল সোশ্যাল লিগ এই কর্মসূচিতে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছিল। তবে আস্তে আস্তে তারা লোকবল হারাতে থাকে। তারপর সরকারি অধিগ্রহণ এর ক্ষতি করে।

শিক্ষার সাথে মূল্যবোধের প্রশ্নটা আজ খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে হা-হুতাশ করা হচ্ছে চারিদিকে। আসলে এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে সময়ের সাথে সাথে পুরনো মূল্যবোধগুলোও পালটে যাচ্ছে। আর আমরা ব্যক্তির দিকটা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি বলে দেখা যাচ্চে যে 'উচ্চ শিক্ষিত'দের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কোন বালাই নেই। আসলে আমরা একজন ছাত্রকে তৈরিই করছি রফতানি যোগ্য করে। অর্থাৎ যে ভাল রেজাল্ট করবে এবং তারপর বিদেশ যাবে।

প্রকৃত শিক্ষার কাঠামো কী হবে তা নিয়ে গান্ধী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু এখানে মুশকিলটা হল, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে অনেকেরই পুরনো শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এক অদ্ভুত ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। এই কারণে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখা গেছে যে যখনই কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছে শিক্ষা কাঠামোয়, জনগণ তা বাতিল করেছে। পুরনো ব্যাপারটাকে আমরা কিছুতেইই ছাড়িয়ে আসতে. পারছি না। এর ওপর রয়েছে শিক্ষক শিক্ষণের (Teacher's Training) সমস্যাও।

তবে নতুন কিছু করলেই তা সবসময় ভাল হয়—এই ধারণাও কিন্তু ঠিক নয়। এখন ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে যে ইংরেজি বই চালু রয়েছে, এটা একটা বিরাট জোচ্চুরি। ইংরেজিতে কথা বলার পরিবেশ তো আমাদের এখানে নেই। আর শিক্ষকরাও সেভাবে পড়ান না। তাই আগের পদ্ধতিতে ট্রানস্লেশনের মধ্যে দিয়ে তবু কিছুটা ইংরেজি শেখা যেত।

বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় এই পাঠ্যসূচিও যদি সৎভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা আমাদের থাকত তাহলেও কিছু কাজ হত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষা বিতর্কের শেষ কোথায়?

ব্যক্তি মানুষের মতোই হয়তো প্রত্যেকটি সমাজেরও জন্ম লগ্নেই তার ভাগ্যে কিছু সমস্যা লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। অন্তত আমাদের ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়। বহুভাষা বহুধর্মী, বহুজাতিক এই দেশের অন্যান্যরা অসংখ্য সমস্যার মতন ভাষা সমস্যারও কোনো আশু সমাধান হবে বা চিরকালের মতন একটা সমাধান সেরে ফেলা যাবে বলে তো মনে হয় না। অবশ্য আসমুদ্র হিমাচল এই দেশ যদি কোনো এক দোর্দণ্ড-প্রতাপ ডিকটেটরের হাতে পড়ে একভাষা একলিপি এক শিক্ষাব্যবস্থা মাথা পেতে নেয় তবে অন্য কথা। আপাতত সেরকম কোনো সমাধান ভারতীয় রাজনীতির দিগন্তেও দেখা যাচ্ছে না। যা দেখা যাচ্ছে তা হলো অর্থনীতি রাজনীতির সর্বক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি আর অপদার্থতার যোগফলে সৃষ্ট এক সীমাহীন সাহারা। অবশ্য সমান বিপ্লবের জ্যোতিষীরা হয়তো বলবেন। 'এর ফলেই ত্বরান্বিত হবে বিপ্লব।' অবস্থার যত বেশি অবনতি হবে বিপ্লবের পথ তত পরিষ্কার করে অবশেষে সর্বহারার এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন সেই নায়ক শল্য চিকিৎসকের যত নির্মম ছুরিকায় রোগাক্রান্ত প্রত্যঙ্গগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রোগমুক্ত করবেন এই বিরাটকায় থল-থলে বৃদ্ধভারতীয় সমাজদেহকে। দেখা যাক।

আপাতত তেমন কোনো আশা-আশঙ্কায় দ্বিধাগ্রস্ত নয় আমার মন। মহাকালের ভার নেবার জন্য যাঁরা জন্মাবেন তাঁরাই নেবেন। কিন্তু যতক্ষণ সেই ক্ষণজন্মার আবির্ভূত না হচ্ছেন আমাদের গুটিয়ে বসে অপেক্ষা করলে তো চলবে না। আমাদের মতন ক্ষুদ্র মানুষদেরও ইতিমধ্যে কিছু করণীয় কিছু ভাবনীয় আছে। আমাদের নিজস্ব ইতিহাস যে বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সে বিষয় যদি কিছু নির্মোহ চিন্তা সম্ভব হয়, যদি সম্ভব হয় আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও জাতীয় আত্মম্ভরিতা থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়া, তবে হয়তো চিরকালীন না হোক স্বল্পকালীন কোনো সমাধানই খুঁজে বার করা যায় আমাদের ভাষা সমস্যার। অবশ্য এত বড় দেশের সমস্যাটাও যেমন বড় মাপের তার মোকাবিলা করার জন্য সাহস আর দূরদৃষ্টিও চাই বৃহৎ পরিমাণ। কিন্তু বিধাতা প্রমাণ সাইজের ভারতীয় গড়তে গড়তে বার বার তো রামমোহন—বিদ্যাসাগর গড়েন না।

জাপান সাহস [illegible] ের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করেছে স্বদেশী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষায়। জ্ঞান ধার করেছে সেই জ্ঞানের বাহন হিসাবে ভাষাও ধার করেছে—কিন্তু দ্রুত নিজের ভাষায় ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে সেই জ্ঞানকে রূপান্তরিত করেছে, আত্মকরণ করেছে। বিদ্যা শুধু নয় মুখস্থ নয় আত্মস্থও হয়েছে। কিন্তু জাপানের ভৌগলিক আয়তন তেমন বিরাট কিছু নয় লোকসংখ্যা যতই হোক দেশটা ছোটই, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দূরত্ব দুরাতিক্রম নয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দূরত্বও নগণ্য। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও শিক্ষাদীক্ষার ভাষা সারা দেশ জুড়ে একটিই। ফলে সর্বপ্রান্তে এই ভাষার চর্চা করায় কোনো অন্তর্বিরোধের সম্ভাবনা বা ভাষাগত ঈর্ষার আশঙ্কা ছিল না। কেবল মাত্র ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সঙ্গে পশ্চিমের যা কিছু দেয় তাকে জাপানীরা সযত্নে আহরণ করে নিয়েছেন। ঐ তিনটি গুণের অভাব জাপানী চরিত্রে নেই, তদুপরি আছে এক ভাষার সুবিধা। কিন্তু এই কাজটাই আমাদের পক্ষে ষোলো গুণ বেশি কঠিন, শুধুমাত্র সংবিধানস্বীকৃত ভাষার হিসেবেই, আর যদি সেই সঙ্গে আমাদের আলস্য, কর্মবিমুখতা আরও যূথবদ্ধ কর্মে অক্ষমতার হিসেব করি তবে হয়তো একশ ষোলো গুণ বেশি কঠিন। ভারতীয়দের কোনো একটি ভাষা নেই যে ভাষার নামই ভারতীয় ভাষা বা Indian language। প্রায় দেড় ডজন সমান সমান পরিণত ভাষা নিয়ে আমরা যে সমস্যায় পড়েছি তার আয়তন মহাদেশিক। তুলনায় সুইজারল্যান্ডের তিনটি ভাষার যুগপৎ ব্যবহার অতি তুচ্ছ সমস্যা।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকাই যে সর্বাগ্রগণ্য এতো একটা অবিসংবাদিত সত্য। কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই সত্যকেও নিরঙ্কুশ স্বীকৃতি দিতে কখনও কখনও অসুবিধা হয়। প্রত্যেকটি ভারতীয়ই তাঁর মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষালাভ করার অধিকারী। কিন্তু প্রত্যেকটি মাতৃভাষা ততখানি দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন করেছে কি, ততদূর বিকশিত ও পরিণত হয়েছে কি? এ ব্যাপারে যে ভারতীয় ভাষার দাবী সবচেয়ে উত্তুঙ্গ সেই হিন্দি ভাষাও কি বিহার উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান ইত্যাদি অঞ্চলের মেডিকেল কলেজ, ইনজিনীয়ারিং কলেজে গৃহীত হয়েছে? ৩৪ বছর ধরে অনেকখানি সরকারী পৃষ্ঠপোষণ এবং বেসরকারী উদ্দীপনা ও তৎপরতা সত্ত্বেও সে ভাষা এতখানি এগিয়ে নেই যে অন্য ভাষাভাষীরা ইংরিজির আঁচল ছেড়ে হিন্দির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে।

ইংরিজি, ফরাসী, জর্মান, রাশিয়ান কিংবা জাপানী ভাষার প্রতি আজ যে জগৎজোড়া শ্রদ্ধা ও আস্থা সে তো এই কারণে নয় যে এগুলি পরাক্রান্ত উপনিবেশিক জাতির ভাষা, বর্তমান শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সে-যুক্তি বাতিল হয়ে গেছে। সংস্কৃতির নানা বিভাগে এই ভাষা গোষ্ঠীর মানুষদের অবদান এত অসামান্য যে সে সবের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ, সে সবের সুফল ভোগ করার প্রত্যাশা আজ সারা বিশ্বের মানুষের। তাই তাদের ভাষা শেখার জন্য অন্যদের এত উৎসাহ। হিন্দী ভাষাভাষী মানুষও যখন সংস্কৃতির নানাক্ষেত্রে নানা মৌলিক কীর্তি স্থাপন করবেন তখন আপনা থেকেই সারা দেশের এবং বিদেশেরও দৃষ্টি সেদিকে যাবে—হিন্দী ফিল্মের কল্যাণে এখনই গিয়েছে। কিন্তু একটা গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী ফতোয়া দিয়েই কোনো একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষাকে রাজা, আর সব ভাষাকে প্রজা বানিয়ে ফেলা যায় না। বাঁচার লড়াইয়ে যে ভাষা টিকে থাকবে, যুগের সঙ্গে নিজেকে পালটাতে পারবে, পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে, সে ভাষাই টিঁকে থাকবে। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা যাক্।

অর্থাৎ আমার বক্তব্য বোধ হয় আর অস্পষ্ট নেই। আমরা কি কি ভাষা শিখব, কোনটা কেন শিখব সে নিয়ে ভাবনা চিন্তার আজই অবসান হয়নি। নেহেরুর ত্রিভাষা সূত্র কিংবা কোঠারী কমিশনের ছকে দেওয়া Thre language formula পাবার পরেও, শুভেচ্ছার ভোজবাজিতে সমাধান ঘটেনি আজো। 'পবিত্র ত্রিভাষা সূত্র'কে সর্বপ্রথমে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন হিন্দিভাষীরাই, কারণ হিন্দি ও ইংরেজি শেখার পর তৃতীয় কোনো ভাষা শেখার কিসের গরজ তাঁদের? তাঁরা দুটি ভাষা শিখেই দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা করেন কিন্তু অহিন্দি ভাষী ভারতীয় নিজের মাতৃভাষা ও ইংরিজি শেখার পরেও আর একটি ভাষার বোঝা যদি কাঁধে নিতে অনিচ্ছুক হন অমনি তাঁর দেশাত্মবোধের ঘাটতি ধিক্কার অর্জন করে, তাঁর ভারতীয়ত্বে এবং জাতীয় মর্যাদাবোধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। হিন্দির প্রতি আমার আজন্ম প্রীতি সত্ত্বেও এই অবিচার আমার মর্মে লাগে।

যাই হোক যেহেতু ইস্কুলের পাঠ্য তালিকায় সংস্কৃত এখন আর অবশ্য পাঠ নেই, তাই তিন বছর ধরে তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি শিক্ষায় আমার আপত্তি নেই, তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লাভ খুব একটা হয় না। কারণ তারপরেও রেলের রিজার্ভেশান শ্লিপে নিজের নাম পড়তে পারেন না অধিকাংশ বাঙালী। আর হিন্দির "কা কে কী কো' বিভক্তিগুলি তো বাঙালির পক্ষে এক দুরধিগম্য রহস্য! কোনো আত্মসম্মান-সম্পন্ন বাঙালি "বাপকো বেটা অওর সিপাইকো ঘোড়া" ছাড়া অন্য কিছু বলেন না। এই অক্ষমতায় যে অযত্ন আর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তা তেমনি দুঃখের যেমন দুঃখের হিন্দীভাষীদের অন্য ভারতীয় ভাষা শেখার অনিচ্ছা।

কিন্তু একথা তো মানতেই হবে যে দায়ে না পড়লে কেউ ঘাড় পেতে ভার বয় না—ভাষার ভারও নয়। কিন্তু "দায়" সম্বন্ধেই একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া যায়। আমাদের চিন্তা ভাবনার আধুনিকীকরণ, সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্রুত যোগ-স্থাপন আর জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভাষাগত অন্তর্বিরোধ প্রশমন—এগুলি আমাদের যথেষ্ট "দায়" বলে গণ্য নয়। অন্তত আমাদের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ করেন যে সব দূরদৃষ্টিহীন রাজনীতি ব্যবসায়ীরা তাঁরা এগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। দিলে ইংরিজি ভাষার প্রতি তাঁদের অন্ধ বিদ্বেষ এমন তীব্র রূপ নিত না। অন্যদিকে জাতীয় আত্মসম্মান বজায় রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ "দায়" বুঝি বর্তেছে হিন্দী ভাষার উপরেই। তিন চতুর্থাংশ ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাক না থাক, অগণ্য অনিকেতন ভারতবাসী পথের উপরেই তাদের জন্মমৃত্যুর লীলা করে চলুক না কেন, তাতে জাতীয় ভাবমূর্তি ম্লান হয় না। হয় কেবল মাত্র U.N.O.-তে হিন্দীর স্বীকৃতি না হলে। অতএব গৌরী সেনের টাকায় সেই স্বীকৃতি ক্রয় করে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার 'দায়" করদাতা ভারতীয়দের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এটুকুই তবু আশার কথা যে এই বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়ে যায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর Anglieist Classicist বিতর্ক আজও নবরূপে বৃহত্তর আকারে সম্মুখে উপস্থিত। গত শতকের গোড়ার দিকে সংস্কৃত বিদ্যায় পারঙ্গম কিছু ইংরেজ সন্তান উইলিয়াম জোন্‌স্‌, কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ ভ্রাতৃদ্বয় ইত্যাদি প্রাচ্য বিদ্যা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনে উৎসাহী হয়ে ভারতবাসীদের জন্য যে পাঠক্রমের বিধান দিয়েছিলেন তাই যদি সেদিন অনুসরণ করা হতো তবে তাঁদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ থাকুক না কেন আমরা কূপমণ্ডুক হয়েই থাকতাম। এদেশে জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে যেত কিন্তু ব্যাকরণের সূত্র ও দুচারখানি কাব্য মুখস্থ করেই এবং স্মৃতি আর ন্যায়ের ভাষ্য কপচে।

সৌভাগ্যবশত রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, স্যার হাইড ইস্টের মতন গুটি কয়েক মানুষ ছিলেন যাঁরা আধুনিক শিক্ষার, ইংরিজি-বাহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজন নয়, আত্মিক প্রয়োজনও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই প্রয়োজন বুঝবার জন্য যে দূরদৃষ্টি ও সাহসের দরকার তা বীরসিংহের সিংহ-শিশুটিতে ছিল। তাই তিনি নিজে সংস্কৃত কলেজের যাবতীয় পাঠ্য—ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ—সবই অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পরেও ইংরিজি শেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে সেই ভাষা ও ভাষাবাহিত বিদ্যা এত দূর আয়ত্ত করেছিলেন যে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ব্যালেন্টাইনের পরামর্শের বিরোধিতা করে বলতে পেরেছিলেন যে বিশপ বার্ক্‌লের প্রিন্সিপল্‌স্‌ অব হিউম্যান নলেজ আমাদের দেশে পাঠ্য করা এই কারণে অনুচিত হবে যে "বেদান্তের মতবাদ, যা অত্যন্ত বেশি ভাব মার্গের জিনিস এবং যা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়, তার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের মন পরিষিক্ত হয়ে আছে। এর প্রভাব জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বাস্তব জীবনের প্রতি তাদের উদাসীন করে দিয়েছে। বার্কলের মতবাদ কতকটা এই ধরণের বলে আশঙ্কা হয় যে জীবন সম্বন্ধে এই বৈদ্যান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্য দর্শন দ্বারা সমর্থিত হলে তাঁর দেশের লোকেদের জাগতিক ব্যাপারে অগ্রগতির চেষ্টার প্রতি বিরূপতা বাড়বে।" এত স্বচ্ছ চিন্তা আর বলিষ্ঠ ও মৌলিক মতামত দেবার মতন মানুষ আজ আর নেই কি? থাকলে কেন ইংরিজি শেখার কথা বললে কেউ মনে করেন যে তাতে মাতৃভাষার সর্বনাশ হবে কিংবা হিন্দীর মসনদ টলে যাবে। তবে প্রাসঙ্গিক বলে স্মরণ করিয়ে নেওয়া ভালো যে, যে-কালে বিদ্যাসাগর গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে নিজের ইংরিজি জ্ঞানের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন সেই একই কালে আরও এক গৃহশিক্ষকের কাছে হিন্দীর পাঠও নিচ্ছিলেন। দুয়ের মধ্যে তখন কোনো বিরোধ তিনি দেখতে পাননি।

কিন্তু রাজনৈতিক মতলববাজি আবহাওয়াকে এতই বিষিয়ে রেখেছে আজ যে ভায়া শেখার বা না শেখার ব্যাপারে শিক্ষাগত প্রয়োজন-অপ্রয়োজনটা বড় কথা নয়—বড় কথা হল কোনটা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ভাষা আর কোনটা স্বদেশী পুঁজিবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভাষা সেই বুঝে বিধান দেওয়া হবে কোন ভাষাটা অচ্ছুৎ। এহেন সংকীর্ণ অদূরদর্শী নীতি দিয়ে বহুদিন বহু লোকের ক্ষতি করা গেলেও কিন্তু চিরকাল সব লোক তা মেনে নেবে না এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

শারদীয় তথ্য কেন্দ্র, বর্ষ ১ (১৩৮৮) সং ৫-৬, পৃষ্ঠা ২২০-২২৩।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Ideas and Experiments in Education

The campus is restless today. Amidst the din created by accusations and counter-accusations one shrill voice reaches your ears easily. It is that of the political parties which in a chorus denounce the police and the administration for violation of the sanctity of the educational institutions. I too join in the denunciation, but my denunciation is not unqualified.

Before I ask the police to keep off the sacred precincts of our educational institutions, I will ask ourselves, the teachers and the students, how much reverence do we have for these 'temples of knowledge' ? Also, how worthy are these institutions of invoking worshipfulness in us ? One important characteristic of the present generation, perhaps, is a loss of the sense of reverence. Poets who claim to breathe the spirit of the day have lost their wordsworthian reverence for Nature. Family life or conjugal fidelity are no longer objects of reverence for many. A similar loss of reverence for educational institutions is a matter of everyday experience.

I still remember my first day at the university, i. e., Patna University. How full of pride and reverence I was inspite of my Students Federation affiliation. We walked quietly through the long corridors and talked in a hushed voice and waited in the gallery with bated breath to respond when the roll numbers were called. One year later my first introduction to Visva Bharati inspired in me a greater sense of joy and reverence. About fifteen years have passed since then. But from what I see today I feel, compared to our days, not even one fifteenth of the student community experience that reverential pride on their first introduction to the University. Just as not being able to love one's mother, leaves a serious deficiency in a person's make up, so does not-being-able-to-respect-one's-ulma mater leaves some dan-gerous chasms in one's value pattern. I am quite aware that I am sounding like a blithering fool lamenting for the good old days. But yet I believe that there are many among the bright young things too who do not discard all the age-old

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

objects and feelings as so much dead wood. If it were true fifty years ago, it is true even today that without some positive and rich sentiments life soon bores you and goads you to seek excitement through perverse means.

The emotions of pride, elation or reverence are traditionally associated with youth as much as are arrogance and over-confidence. Sometimes I try to find out from my students what their objects of pride, elation or reverence are and on most occasions I do not get a definite answer. But then most of my students come from excessively sheltered middle class and upper middle class homes which are culturally and linguistically alien to this city. The majority of my students have no idea of the agony, despair and bewilderment which most of Bengal has experienced during the last twenty-five years. They are, even now, quite secure on the traditional values and know nothing of the torments of standing on the quick sand of shifting values. So first hand experience of students reveals very little of the atmosphere of the unquiet campus which is so characteristic of West Bengal today. By and large, students of our college are apathetic to most of the issues which bring the sky down in many other colleges of this city. Undoubtedly, it is easier for us, the teaching staff of our college. But this does not spare us the anxiety and inconvinience which the whole city suffers with every spell of student unrest.

When I hear from some admiring eyewitness or enthusiastic supporter about the heroic battle that Calcutta University students put up against the police or of the discomfiture of the police in the hands of the Presidency College students, I keep asking myself, do these young men take pride in these so-called revolutionary acts? Do they have genuine reverence for their political ideals, organisations and leaders ? Are they capable of that youthful elation which comes from some longed for achievement or realisation of something beautiful somewhere ? I have no definite answer but I have grave doubts. I have seen a few of these student leaders from a little distance and through some one who is deeply sympathetic to them. My first impression was that of the crafty and cynical men of the world. They were not so flushed with political idealism ; did not keep promises and a few appeared to be quite publicity conscious too. Many of them betrayed lack of political education and also a shocking concern for strategy rather than for truth. Where are those positive sentiments which inspire young people to build a brave new world for themselves ? The horizon appears bleak and

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

empty to me. Is it because I am myopic or because objectively there are no stars worthy of our gaze ?

But this is only half of the sad truth which depresses me so. The other half concerns ourselves. If students do not experience that sense of wonder and respect for their institutions, I do not know how much of the responsibility ought to lie on our shoulders. But that there is some responsibility which we must own is obvious to any one. We have managed to reduce ourselves to lecturers only—one more aid for the students for crossing the hurdles of university examinations. The lofty place which every Education Commission indicates for us in its report is a dream that will never be fulfilled in the future. It is very difficult to state what we teachers really aspire for. We are neither seriously careerist nor apathetic enough about career so that our energy could be diverted toward some more useful ends. In fact I have not heard of another lot of such moral and intellectual cowards anywhere in the world. We have neither the courage nor the capacity to discuss honest differences of opinion with our students. We are too afraid of being branded as something. We cannot even ask our girls to cover themselves adequately during the class hours or the boys not to ape the latest hideous sartorial fashions. And who will, therefore, expect us to restrain our students from indulging in acts which do not preserve the sanctity of the educational institutions ? While we scream to condemn the police for violence against students or for violating the sanctity of school, college or university premises, we do not as much as whisper a warning to our students to the effect that the educational institutions should not be turned into bastions to conduct operations against the police or even for their unseemly conduct in the examination halls. These omissions on our part are not purposive because the majority among us are not ideologically committed in their favour— We do not warn our students or try to dissuade them only because we do not possess strong and straight enough backbones to stand upto our students and say 'No' I know of a few, very few, teachers who have shown this courage 'to become unpleasant' and they are not respected less for this. But, by and large, we prefer to follow the path of least resistance when we have to confront our students. The commonly heard excuses in justification of such conduct are "Its' of no use opposing them" "They are excitable —avoid them" "Lets' have peace—let them have their way" etc. Such attitude on our part at best may inspire pity in our students for us, "the priests of the temples of

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

knowledge." At worst, it invokes scorn. It is not that eternal phenomenon of age distrusting the youth and youth suspecting the age. It is something worse.

University Women's Association Newsletter, 13.2.68

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

EDUCATION AND SOCIAL CHANGE

Education can become an instrument of social change when we educate people to remove untouchability or to adopt family planning measures or to share agricultural land and implements through cooperative farming

This social role of education is obvious to all in this age of improved techniques of mass communication. Such education (or propaganda?) is carried on by every government. If effective, such education can forestall violent revolution and open the way to gradual and planned change.

But what is not so obvious is that the inevitable pace of change in a society should be allowed to reflect in the curriculum as well as co-curricular activities, in the class-room, in the method oi teaching, in our approach to the students. Schools have always been very conscious of their conservative role as the preserver and disseminater of cultural heritage and tradition. Naturally, therefore, the education system of every country holds it as its primary duty to maintain the status quo to perpetuate the existing condition. Even today we are so shackled by tradition that our schools for the most part are resistent to social change — either to serve as an instrument of social change or to reflect the changes in social reality. "By and large we consider the school to be a training ground for initiative adjustment to an established society" as Karl Mannheim says. The elder universities are always very suspicious of the new-fangled notions of philosophy, literature or even science. Nothing but those ideas which have proved their vintage find their acceptance in the syllabus. If in other countries the gap between the existing reality and the academic syllabus and text books of a university is that of 25 years, in our country it is more than twice as much. The universities often become establishments of vested interest in vintage knowledge and true research and genuine adventure of ideas

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

are not only frowned upon, these are often ruthlessly discouraged. And these venerable institutions turn themselves into the instruments for disseminating outdated information, for mechanically examining the students and for distributing degrees and diplomas.

UNBEARABLE

This is more or less the pattern in most countries. With us the condition becomes more unbearable because we do not even discharge the above mentioned traditional responsibilities efficiently. Inefficiency breeds corruption and vice versa.

If we analyse the causes of the daily rampages in the university campus, we will not fail to notice that the conditions were already explosive. The futility of an out-moded education would not have been so obviously exploitable by a militant political philosophy, if at least the traditional routine duties of the educational instiutions were performed with sincerity. That was the minimum we could do to stem the wave of restlessness in the campus.

But now, perhaps, we have reached a stage when more fundamental reforms and deeper reflection into these problems are necessary.

One important social change that has led us to a sudden expansion of educational facilities, is an attitude towards higher education. The craving for higher education among the women, among the urban lower-middle class and even among the agrarian population is unprecedented. Naturally, therefore, in West Bengal itself educational facilities in a physical sense have been increased more than five fold since Independence. What I mean is the number of educational institutions has increased about five times. This "education explosion" has brought in its train problems which were not appreciated adequately. Lack of a really diversified system of education for a diversified school-going population, inadequacy of accommodation and lack of a hundred other essential amenities do not bother me as much as the fatal deficiency in human material does. The sudden spurt in education required a tremendous supply of teachers. Quantity of course has been increased. But quality is not gained overnight. The entire education system has been vitiated more by a cultural deficiency in material conditions. I will try to be more explicit. For all the stages of education, primary, secondary and tertiary, the available teaching personnel is pathetically deficient in quality. The majority of these teachers come to teach because they have nothing better to do. They as students were not

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

interested in learning and knowing and naturally enough they do not get any intellectual or moral satisfaction from teaching. The meagre financial gain is, therefore, not compensated for by any intellectual thrill or moral satisfaction. So frustration deepens. Inefficiency and bitterness seem to be the most frequently encountered traits in the teaching population. What else comes in the train of inefficiency and cynicism is better not discussed.

ANOTHER SIDE

There is another side of this human deficiency. This is to be found among the students. Since Independence every year now we are receiving a larger number of students who happen to be the first generation of literates in the family. I am not advocating a policy of restricting educational facilities to a few. I am only pointing out an inevitable social consequence which may very well be a passing one. This problem originates in the cultural lag of those students who do not have a back ground that may help them to absorb the educational gain. Such students naturally acquire a smattering of information without gaining much culturally. Their cultural deficiency lowers the general intellectual and moral tone of the institutions and also of the out-side world. These neo-literate will continue to be a social problem till they learn to share the values which education should give us. What a social menace these young people have become is known to any one who is acquainted with the neo-literate suburban population of Bengal. Bihar and Orissa. They have lost their traditional unsophisticated moral sense and have not acquired the so-called middle class morality which preserves social stability.

It is correct to say that normally we cannot expect to have better human material in the educational institutions than what we have in the rest of the society. But all educational institutions are expected to be small, even artificially created, ideal communities within the community. Is it too much to demand then, that for some years at least, the best human material should be diverted to the teaching profession on an emergency basis? The best products of the highest education are required not to man the hospitals or the administrative services or to build the dams and bridges. They are required to man the educational institutions which are the most important nation-building workshops. We are paying amply for not having taken proper care of this supremely important construction work. On the other hand though primary and

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

secondary education should be available to all, the university is meant for a few — the really deserving few. The open-door policy of our universities has proved disastrous academically and socially. Even among the unworthy, university degrees have roused aspiration which no society can fulfil. Besides, of all the levels of education the tertiary level or the Universities suffer most by admitting students who are intellectually ill-equipped and culturally so handicapped that they tend to denounce and debase aggressively whatever is beyond them. Reverence for higher education is too much to expect these days. At least some tolerance must be there to make any fruitful activity possible at all in the universities.

TRANSITION

I will draw attention to one more need of the changing social situation. We call our country a developing one. At least it suggests a transition. This transition is evident not only in the economic sphere it has a political aspect and an even more important social aspect. The transition, planned or otherwise, needs to be scrutinized and evaluated constantly. Such eternal vigilance can come most suitably from the educational institutions. Especially during times of rapid change, educational institutions have a responsibility to play the role of social critics. The measures taken by the state in all spheres of community life or the innovations made by any autonomous body must be constantly examined by the academicians. Even if the Khosla Committee's recommendation in favour of greater permissiveness in films creates a ripple of enthusiasm in the educational circles, we are left completely apathetic by a bill brought before the parliament to abolish the use of a language or to promote the use of another and at times only politically motivated, dogmatic criticisms are heard from partisan students and teachers when important decisions are taken. We have yet to build a tradition of dispassionate academic study of momentous issues. Only those academicians whose integrity is beyond question can act as social critics and give a shape to the public opinion. For this the academicians conduct has to beyond reproach. Yet during this time when character slaughter is the most handy instrument in the hands of some political parties it is difficult to ensure that a person's integrity will not be questioned even if he does not subscribe to some shade of popular political dogmatism. If we cannot respect some people and accept their guidance then it is more a social

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

loss. But such traditions, once broken, are not rebuilt in a day. It needs integrity, it needs patience and it needs greater tolerance than what we have in our atmosphere today.

Amrita Bazar Patrika. March 24, 1971

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সামাজিক সমস্যা ও স্ত্রী স্বাধীনতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়েরা আজ কতটা অবলা

দিনতারিণী চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম এই কলকাতা শহরেই, তবে এই শতাব্দীতে নয়। জীবনের আশি বছর কেটেছে মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের যে অপরিসর গৃহে সেখানে বোধহয় তিনি দুবছর বয়সে এসেছিলেন। তাঁর যখন ইস্কুলে যাবার বয়স সে সময়ে বাগবাজারের কিছু ভাগ্যবতী মেয়ে নিবেদিতার ইস্কুলে যেত বটে কিন্তু দিনতারিণী দেবীর মনেও পড়ে না তিনি নিজে মহাকালী পাঠশালায় কয়েক মাস কি পড়েছিলেন। তারপরে আর কোনোদিন কোনো কারণেই এই বাড়ির বাইরে যান নি, গঙ্গাস্নানেও না। এমন কি শ্বশুর বাড়িও যেতে হয়নি এই কুলীন কন্যাটিকে। কারণ পিঠোপিঠি দুই বোন মায়ারাণী আর দিনতারিণীর উপযুক্ত ঘর-বর জোটাতে পারেন নি তাঁদের অভিভাবক অগ্রজ। অগ্যতা সদর দরজায় তালা এঁটে তবে দুপুর বেলায় কাজে যেতে হত অভিভাবকটিকে! নয়ত বাড়ির অনূঢ়া কন্যাদের রক্ষা করার আর উপায় কি? পরে যখনই কোনো কন্যার বিবাহ বা পুত্রের উপনয়ন হয়েছে বাড়িতে তখন আত্মীয় কুটুম্বদের নিন্দা এড়াতে কয়েকদিনের জন্য তাঁদের আত্মগোপন করতে হয়েছে একটি অন্ধকার চোরকুঠুরিতে। অতিথিরা পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে গেলে পরে সেই ভয়ানক অবরোধ থেকে কন্যাদুটি মুক্তি পেতেন হাতে পায়ে ইঁদুর-কামড়ের ক্ষত নিয়ে।

মায়া দেবী নেই, দিনতারিণী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলাম এই বৈশাখে, কেবল চাক্ষুষ উপলব্ধি করবার জন্য অবলা কাকে বলে। শুধুই কি অবলা? অবোলাও। অভিযোগ জানাবার ভাষা পর্যন্ত তাঁর শেখা হয়নি। 'কপালে ছিল না তাই বিয়ে হয়নি। তবু তো দাদা সংসারে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নইলে কোথায় ভেসে যেতুম।' নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?' কেবল মাত্র উদয়াস্ত নয়, সূর্যোদয়ের দু ঘণ্টা আগে থেকে, সূর্যাস্তের পাঁচ ঘন্টা পর পর্যন্ত সংসারের ক্লান্তিহীন সেবা করে দুবেলা দু-মুঠো আহারের অধিকার পেয়েই তাঁরা বিধাতা ও গুরুজনে আস্থা অটল রেখেছিলেন।

এর তুল্য অসহায়তা আজও যে নেই তা নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক—নানা কারণেই আছে। পুরুষ প্রাধান্যও বহু দূরপনেয় দুঃখের আবর্ত সৃষ্টি করে রেখেছে মেয়েদের জন্য। পরিসংখ্যান নির্ভর এই যুগে হিসাব নিলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে এইসব প্রতিবন্ধক-পীড়িত মেয়েরাই সমাজের বারো আনা। কিন্তু অত্যন্ত কালো এই পরিপ্রেক্ষিতের সামনে আমার মতো কিছু মেয়ের অবস্থাটা যখন এনে দাঁড় করাই তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অবাক হয়ে ভাবি কী অভাবিতপূর্ব স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা! আমাদের ধর্মবিশ্বাস, আমাদের রাজনৈতিক ধারণা, আমাদের দৈনন্দিন আচার আচরণ, আমরা কি পড়বো, কি লিখবো, কি ভাববো, কোনটা করবো অথবা কোনটা করবো না—এর কোনো দিকেই বাইরের কোনো অনুশাসনের দৌরাত্ম্য আজ আমরা আর অনুভব করি না। অন্তত আমাদের পুরুষ আত্মীয়-বন্ধুরা যতটা করেন তার চেয়ে বেশি করি না।

এই আমরা, যারা শিক্ষায় জীবিকায় কিংবা সাংসারিক জীবনে পুরুষের সমান সুবিধা কিংবা অসুবিধা ভোগ করছি, তাদেরও অনেকে দেখি কেমন একটা অবলা-কমপ্লেক্সে ভোগেন। অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে পুরুষের দ্বারা নিজেদের খণ্ডিত, বঞ্চিত, অবরুদ্ধ বা শাসিত মনে করেন। আর এই অবিচারের জন্য মনে ক্ষোভ আর হতাশা জমতে থাকে। এ জাতীয় দুঃখবোধ যে কতটা বাস্তব কারণে আর কতটা স্বকল্পিত, সেটা আমি সব সময় বুঝে উঠতে পারি না। 'স্বকল্পিত' শব্দটা বোধহয় বেশি বলা হল, বরং বলা যায় কতটা 'নিজের সৃষ্টি'। কল্পনায় সৃষ্টি নয়, বাস্তবে। একটু ভেবে চিন্তে বুঝিয়ে সমঝিয়ে নিতে পারলে বোধহয় সংসারের পাঁচজনকে অনেকখানি যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে সম্মত করা যায়। আবহমান কালের অনেকগুলি অভ্যাস ভেঙে জীবনযাত্রাটা গৃহিণীদের পক্ষে সুবিধাজনক করে নেওয়া সম্ভব। নয়ত সারাদিন একই চাকরী করে দিনান্তে বাড়ি এসে কর্তা বসেন অসমাপ্ত খবরের কাগজ নিয়ে অবসর বিনোদন করতে আর গৃহিণীকে ছুটতে হয় রান্নাঘরে কর্তার রসনা-বিনোদনের আয়োজনে—তবে খুশী মনে নয়। মেয়েদের মর্ষকামী দুঃখবিলাসী স্বভাবও কি এর জন্য কিছু পরিমানে দায়ী নয়?

এতদিনে এদেশে যে কিছু মেয়ে অন্তত স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠাতা হতে পেরেছে সে ব্যাপারে মেয়েদের কোনো সচেতন আন্দোলন ছিল না। এটা ঘটেছেও ধীরে ধীরে, এক ধাক্কায় হঠাৎ একটা নতুন জীবনে উত্তরণ হয়নি। অনেক সময় আবার বাইরের দিক থেকে হয়ত বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু মনটা সে পরিমাণে অগ্রসর হয়নি। ফলে সমাজের এবং নিজেদেরও জীর্ণ বহু অভ্যাস, চিন্তায় এবং কর্মে আজও যেতে যেতে রয়ে গেছে। এই অসমাপ্ত আধুনিকীকরণ শুধু যে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য তাও নয়, আমাদের পুরুষ সমাজেও এটা অহরহ দেখতে পাই। একটি উদাহরণ সবারই জানা আছে ঃ বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে তুকতাক দৈবাদেশ মাদুলি-মানত গ্রহরত্ন কুষ্ঠি-ঠিকুজি কোনো কিছুরই বিরোধ নেই এদেশে। যদিও আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার বয়সও একশ বছর হয়ে এল। ঠিক ঐভাবেই আধুনিকা মেয়েদের অভ্যাসে এবং চিন্তায়ও বহু আত্মখণ্ডন দেখতে পাওয়া যাবে।

এ জাতীয় খণ্ডিত সত্তার একটি প্রকাশ দেখি, নিজের শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মেয়েদের ধারণায়। শিক্ষাদীক্ষা আইন কানুন আর্থিক সঙ্গতি রাজনৈতিক অধিকার সবই যেসব মেয়েদের সপক্ষে আছে তাদেরও অনেকের জড়তা কাটেনি। নিজের দায়িত্বে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বেশ দ্বিধা, 'দেখি ওঁকে জিজ্ঞেস করে'। খাঁচার পাখিকে হঠাৎ আকাশে ছেড়ে দিলে তার যে উড়তে অনিচ্ছা, এ হয়ত অনেকটা সেই রকমের। কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে হয়, দুর্বল হওয়ার ফলে যেসব প্রশ্রয় এবং দায়িত্ব হতে মুক্তি সৃষ্টির আদিকাল থেকে মেয়েরা ভোগ করে এসেছে সেগুলি এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সাবালিকা হতে বুঝি অনেক মেয়েই চায় না। 'অবলা' থাকায় যেন একটা কায়েমী স্বার্থ আছে। অথচ অন্য দিকে আবার ছোট বড় নানা রকম স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাপারে অনেক মেয়েরই তো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যোগ দেখতে পাই। এ ব্যাপারে সামান্য এবং মহীয়সীরা সমান ক্ষিপ্র ও চতুর। দিনকালের অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী নিশ্চয়ই নিজের সেই উক্তি প্রত্যাহার করতেন।' (সত্যবাদিনী বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন তো!) :—

দণ্ডনীতি ভেদনীতি
কূটনীতি কতশত—পুরুষের রীতি
পুরুষেই জানে। বলের বিরোধে বল,
ছলের বিরোধে কত জেগে উঠে ছল,
কৌশলে কৌশল হানে ; মোরা থাকি দূরে
আপনার গৃহকর্মে শান্ত অন্তঃপুরে—'

সেই শান্ত অন্তঃপুর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই 'পুরুষের রীতিনীতি'তে আমরা কেমন পারঙ্গম হয়ে উঠেছি তা লক্ষ্য করে অহঙ্কার হয়।

এককালে দুর্বলের যা অস্ত্র ছিল তার সাহায্যেই বহু মেয়ে বড় বড় সংসারের রাস ধরে রাখত। ছলে, কিন্তু বলে নয়, এবং কৌশলেও, তা ছাড়া সেবায় বশ করে রাখতে পারত সবাইকে। আজ কিন্তু সংসারের বাইরে এসে যেসব কর্মক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে মেয়েরা সেখানে সেবার সুযোগ কম। তবে অন্য দুই উপায়ের ঢালাও উপযোগ করা চলে। অতএব নারীচিত্তের ঐ সাবেক বৃত্তিগুলি ইদানীং ঘরে বাইরে প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়েছে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হবার। তা ছাড়া বাহুবল না থাকলেও আইনের বল যে আছে সেও এক নব-উপলব্ধ শক্তি। আজকের দিনে পুরুষও তো পুরুষকে জব্দ করার জন্য বাহুবল তেমন একটা ব্যবহার করে না। ভোট আছে, ভেটো আছে, দলগড়া-দলভাঙা আছে, ইনজাংশান আছে, কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট আছে। কতশত বৈধ উপায়ে ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায় দুর্বিনীতকে বিনীত করার জন্য। অথচ মেয়েদের ঐ একটি মস্ত বড় অস্ত্র ছিল, যেটি মরচে পড়ে শিগগিরই অব্যবহার্য হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। সামাজিক প্রথাসিদ্ধভাবে যদিও এই কল্যাণকর অস্ত্রবিদ্যা শুধু মেয়েদেরই আয়ত্ত করার কথা তবু গান্ধীজির মতো কিছু পুরুষ, যাঁদের পৌরুষ তেমন ঠুনকো নয়, এর সার্থক ব্যবহার করতে পেরেছেন। আর এরই বলে মাদার টেরেসা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান একজন মানুষ। দীনতারিণী দেবীর সেবা প্রতিদিন দাতা ও গ্রহীতাকে দীনতর করেছে। কিন্তু যিনি স্বনির্বাচিত সার্থকতার পথে নিঃশেষ সেবায় প্রতিদিন আরও একটু তুলে ধরছেন নিজের ও অপরের মনুষ্যত্বকে, সেই সবলাকে প্রত্যক্ষ করেও তাকে আমরা সবলা বলব না?

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮।১২।৭৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্মশাসন ও স্ত্রী স্বাধীনতা

শিল্পের যন্ত্রায়ণ যেমন করে মানুষকে একদিকে অভাবিতপূর্ব অবসর দিয়েছে অন্য দিকে মুক্তি দিয়েছে হাড়ভাঙা একঘেয়ে খাটুনী থেকে ঠিক তেমনি করেই জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক উপায়ও এই শতাব্দীর মেয়েদের জীবনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তি আনছে। শিল্পে উন্নত দেশগুলিতে অবশ্য বেশ কয়েক দশক আগেই থেকেই এই পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। তার ভালোমন্দ নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পের যন্ত্রায়ণ যদিও বা কিছুটা সুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল আগে থেকেই পরিবারের আয়তন সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করাটা বলতে গেলে এখনও শুধু মধ্যবিত্ত আর উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজেই সীমিত রয়েছে। তবু তার ফলে বাঙালী নাগরিক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের জীবনযাত্রা এবং জীবনবোধ এক জন্ম কালেই কতখানি পালটে গেছে তা লক্ষ্য করার মতো।

প্রাকস্বাধীনতা কালের মেয়েদের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর কালের মেয়েদের তুলনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। সবচেয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন বোধহয় এই যে ১৯৪৭ সালের পর থেকে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মেয়েরা, বিশেষ করে উন্মূল পরিবারের মেয়েরা ইস্কুল কলেজে আর উপার্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নেমেছে—প্রধানত সাংসারিক তাগিদেই। দেশ ভাগের ফলে এক বিরাট সংখ্যক মেয়ে শুধু সাত পুরুষের ভিটে থেকেই নয়, সাত পুরুষের চিন্তাভাবনা বিশ্বাস অভ্যাস থেকেও চ্যুত হয়েছে। এর ফলে আর্থিক নির্ভরতা কিংবা-সামাজিক বৈষম্যের বেড়িগুলি ক্রমে ক্রমে তাদের পা থেকে খসে গিয়ে স্বাধিকারের পথ প্রশস্ত করেছে। তা ছাড়াও প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সন্তান ধারণ ও পালনের যে জৈব দায়িত্ব অনেক সময় তাদের বৃহত্তর সার্থকতার পথে অন্তরায় হোত, এতকাল পরে বিজ্ঞানের কল্যাণে তারও একটা সমাধান সম্ভব হয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ বৈজ্ঞানিক উপায় মেয়েদের স্বাধীনতাকে প্রায় নিরঙ্কুশ করেছে এতদিনে, এ দেশেও।

সংসারে দাসী, ভৃত্য, পাচক জাতীয় কয়েকটি সেবক থাকা সত্ত্বেও রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধার যে বিরামহীন চক্র তাতেই বাঁধা থাকতো গতকালের মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবনযৌবন। কারণ সাত আটটি সন্তান আর বৃহৎ আত্মীয়-পরিজনগোষ্ঠীর সেবা-যত্ন করে তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন বলতে খুব কিছু আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থাকতো না। অন্তত জীবনের সবচেয়ে সৃষ্টিক্ষম আর সম্প্রসারণ-উৎসুক কালটাই কেটে যেত সংসারের কাজে। ভারতীয় দাম্পত্যজীবনের আর সংসার-ধর্মের আধ্যাত্মিক সার্থকতার কথা তো আমরা আজন্ম শুনে এসেছি। তবে চোখে যা পড়ত তা এই যে অধিকাংশ মেয়েরই মহত্তর কোনো আগ্রহের বিষয় ছিল না, এমন কি একটা ভালো বই মন দিয়ে পড়বার মতো না ছিল শিক্ষা, না সময়। সহজবোধ্য গল্প-উপন্যাস, খুব বেশি হলে হয়ত কিছু সৎগুরু প্রসঙ্গ—এই ছিল ঐ সংসার পরিচালনা-ক্লান্ত মনের জন্য নিদ্রাকর্ষণের উপকরণ ; সৎ সাহিত্য পাঠের ফলে চিৎপ্রকর্ষের যে কিছু সাহায্য হবে তারও সম্ভাবনা ছিল কম। তাঁদের অভিজ্ঞতার জগতটাও যেমন ছিলো ঐ অন্তঃপুরের চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা, চিন্তা ভাবনা কল্পনার আকাশটাও ছিল তেমনি ঐ এক ফালি—যতটুকু না হলে নয় গোছের। এ সবেরই ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়, তবে সে তো ব্যতিক্রমই।

ফলে মেয়েমানুষ বা মেয়েছেলে বলতে পুরুষ মানুষের চোখে যে বস্তুটি পড়তো তার আত্মত্যাগ, সেবা তিতিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে যতই কেন না স্বদেশী সাহিত্যে আর বিদেশী বক্তৃতার ওজস্বিনী শব্দের ফলাও চাষ করা হোক, আসলে পুরুষের মনের ভাব ছিল পদ্মানদীর মাঝির সেই কুবের জেলের মতোই—'তা শুইনা তর কাম কি? মাইয়ালোক চুপ মাইরা থাক। পোলা বিয়ানের লাইগা পিরথিমিমে আইছস বিয়া পোলা যত পারস, রাও করস কেরে?' চোদ্দ পনের বছর বয়সে কুবের জেলের এই উক্তি আমাকে যে পরিমাণ বিমূঢ় করেছিল আমার পড়া ইংরিজি-বাংলা সাহিত্যের খুব কম উক্তিই ততটা আহত করেছে আমাকে। তার একটা কারণ বোধহয় এই যে কুবের জেলের এই উক্তির প্রতিধ্বনি আরো একটু পরিশীলিত ভাষায় শিক্ষিত মানুষের মুখেও যে শোনা যেত না তা নয়। স্ত্রীলোকের ঐ অনতিক্রম্য বিধিলিপিটি মর্মান্তিক ভাবে শ্বাসরোধী বলে মনে হয়েছিল। ত্রিশের দশকে যারা বালিকা ছিল এবং পঞ্চাশে গৃহিণী হয়েছে এদেশে, তাদের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কি এই নয় যে বালিকা বয়সে যা মনে হয়েছিল তাদের অমোঘ বিধিলিপি, যৌবনে তারা ললাটের সেই লিখনকে নিজের হাতে মার্জনা করে নতুন কিছু লিখে নিতে পেরেছে? এই যে 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' অকল্পনীয় অধিকার বহু মেয়ে অর্জন করতে পেরেছে এক প্রজন্মেই কিংবা প্রধানত জৈব অস্তিত্ব থেকে এই যে আজ মেয়েদের মানসিক অস্তিত্বে উত্তরণের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, এ সবই একদিকে শিক্ষা অন্যদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজ উপায় আয়ত্ত হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

কেউ কেউ হতাশ করেন সেই সদ্যবিগত যুগটার জন্য যখন পুরুষ-সুরক্ষিত নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মেয়েরা সংসারের শ্রী এবং নিজেদের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার কাজেই সবটুকু মনোযোগ দিতেন। আজকের জীবনের ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতার ফলে আর নানা ব্যাপারে মেয়েদের মনোযোগ ছড়িয়ে পড়ার ফলেও সংসার শিল্পটাই নাকি দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে। মেয়েরা হচ্ছেন শ্রীহীনা মাধুর্য নেই তাঁদের জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্বভাবে। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বৃহৎ সংসারের অসংখ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অযৌক্তিক দায় দায়িত্ব নিয়ে যাঁদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকতো না, যাঁদের যৌবনের যে কোনো ঘটনায় কাল নির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায় ছিল 'কে তখন পেটে আর কে তখন কোলে।' যাঁদের প্রতি পদক্ষেপ হাজার রকম নিষেধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাঁরাই সুখী ছিলেন তৃপ্ত ছিলেন শ্রীমণ্ডিতা ছিলেন এ কথা আজ যাঁরা বলেন বলুন কিন্তু তাঁদের জীবনের বঞ্চনা, দীর্ঘশ্বাস অবিচার এখনই ইতিহাসের বিষয় তো হয়ে যায়নি—এখনও পাশাপাশি তাঁদের দেখা যায় প্রায়ই। কোনো কালেই অধিকাংশ মেয়ে এত নির্বোধ ছিল না যে কোনটা বঞ্চনা কোনটা অত্যাচার কিংবা অবিচার তা তারা বুঝতেই পারতো না—মুখ ফুটে কিছু বলার ক্ষমতা না থাকলেও।

মেয়েদের মধ্যে শ্রীর চর্চা অধিকাংশ পুরুষের কাছে চিরদিনই যত প্রিয়, ধী-র চর্চা ততখানি নয়। গুণবতীর চেয়ে রূপবতী হওয়াটাই এখনও মেয়েদের পক্ষে বেশি প্রয়োজন ; পশ্চিমের নারী-স্বাধীনতার মধ্যাহ্নেও আজ দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের চিত্ত জয়ের জন্য নারীর আয়োজন বাড়ছে বই কমছে না। যে চিত্রাঙ্গদারা কেবল 'পুরুষের বিদ্যা' শিক্ষা করেন আর মনোহরণের কলায় দীক্ষা নিতে অবহেলা করেন তাঁরা স্বামী নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় প্রায়ই হেরে যান। অর্থাৎ রূপের আদর, মেয়েলি ছলাকলার আদর বায়লজিকাল প্রয়োজনে চিরকালই থাকবে। কিন্তু পুরুষের পক্ষেও যেমন ঐটাই একমাত্র আগ্রহের বিষয় নয় মেয়েদের বেলাতেও ঐ বায়লজিকাল সার্থকতাই তার মানবজন্মের সম্পূর্ণ চরিতার্থতা তো নয়। তাদেরও হৃদয় মনের অসংখ্য সুপ্ত বৃত্তি নানা দিকে তৃপ্তি খোঁজে। যখন বলা হয় ভালোবাসা মেয়েদের জীবনের সবটুকু কিন্তু পুরুষের জীবনের অংশমাত্র তখন কাব্য করেই বলা হয়ে থাকে যে মেয়েদের বেলায় তার জীবনের বায়লজিকাল লক্ষ্যটাই সবটুকু আর পুরুষের পক্ষেই সম্ভব সে সবের ঊর্ধ্বে উঠে জ্ঞানের, সৌন্দর্যের, মঙ্গলের চর্চা। এই ধারণাটাও সম্ভবত পালটাবার দিন এসেছে। সূর্য যেমন পৃথিবীর চারদিকে আর ঘোরে না, কর্মের জ্ঞানের আর সৌন্দর্যের জগতটাও শুধু পুরুষের চিত্তমণ্ডল অধিকার করেই থাকে না। কিন্তু এতকাল মেয়েদের বায়লজিকাল দায়িত্ব তার মন, তার সময়, তার সমস্ত শক্তিকে এতই ব্যাপৃত রেখেছে যে অন্য কোনো সার্থকতার ক্ষেত্রে খুঁজে নেবার মতো বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত থাকেনি।

জৈব কর্তব্যটা, সন্তান ধারণ ও পালন করার দায়িত্বটা অধিকাংশ মেয়ের কাছে চিরদিনই অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়েই থাকবে, কিন্তু যদি সেটা পরিমিত হয় তবেই ; এবং এই কর্তব্য যদি বিপুল আকার ধরে তার অন্য সব চরিতার্থতার পথ বন্ধ না করে দেয়। সন্তানের শরীর মন গড়ে তোলার কাজেও যে একটা মহৎ অভিজ্ঞতা আছে সে কথাই বা অস্বীকার করবো কি করে? কিন্তু তার বাইরেও তো মস্ত একটা জগৎ আছে। সেখানে ব্রাত্য হয়ে থাকবে কেন মেয়েরা? আজ যেমন করে বিজ্ঞান বহু মানুষকে প্রয়োজনের কর্ম থেকে বেশ কিছুটা অবসর দিয়ে সেই অবসরকে নানা মহৎ মানবিক মূল্যে ভরে দেবার সুযোগ দিচ্ছে তেমনি বিজ্ঞানের কল্যাণেই আজ মেয়েরা অনেকখানি অবসর পাচ্ছে তাদের সেই অবশ্যকর্তব্য থেকে যা সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই তাদের সবটুকু দেহমনকে ব্যাপৃত রেখেছে। তাদের এই মুক্তি এবার সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেবে নতুন নতুন ক্ষেত্রে নিজেদের আবিষ্কার করবার, মহত্তর কিছু চিত্তবৃত্তির চর্চা করবার। শুধু মননহীন শ্রী নয়, ধীর-র সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন হয়, এতকাল পর মেয়েদের জীবনেও তার অবসর আসছে। তাই সমাজের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণ যদি বা শুধু একটা আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়, মেয়েদের জীবনে কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণ একটা আত্মিক সমস্যার সমাধান।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৮।১১।৭৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অধিকার রক্ষা না অধিকার হরণ?

তালাকপ্রাপ্তা মুসলমান মহিলাদের অধিকার রক্ষা কল্পে একটি আইন পাশ হয়ে গেছে মাস কয়েক আগে। তারপর থেকেই গোরস্থানের নীরবতা লক্ষ্য করছি সেইসব নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আসমুদ্র হিমাচল মুসলমান সমাজকে খেপিয়ে তুলেছিলেন শরীয়ত রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে সরকারকে দিয়ে এই আইনটি পাশ করিয়ে নেবার জন্য। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টে শাহবানুর পক্ষে রায় দেবার সময়ে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেছিলেন যে, নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম মহিলারা তালাক পাবার পর স্বামীর কাছ থেকে মাসোহারা পেলে শরীয়তের বিধান তো লংঘন করা হয়ই না বরং এটাই পবিত্র কোরাণের শিক্ষার অনুকূল পুণ্য কর্ম। মুসলমান সমাজকে তাঁদেরই ধর্ম ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যাওয়াতেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে গোঁড়া নেতাদের। এই 'আস্পর্ধা'-র সঙ্গে ছিল আবার চন্দ্রচূড়ের আর একটি মন্তব্য যে মানবিকতার প্রয়োজনেই এখন সব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন একই রকম হওয়া উচিত। এরই প্রতিক্রিয়ায় ধর্মের জিগির দিয়ে এমন গেল গেল রব তুলেছিলেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা যে মনে হচ্ছিল এ দেশে মুসলমানদের ধর্ম বা সংস্কৃতি কিছুই আর নিরাপদ নয়। দেশ জুড়ে এমন মারমুখী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন যে রাজীব গান্ধীর অপরিণত বুদ্ধি দুর্বলচিত্ত সরকার ভয় পেয়ে তড়িঘড়ি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে নস্যাৎ করে দিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করে ফেলেছেন মুসলমান সমাজের মান রক্ষা করার আশায়।

মনরক্ষা তো হলো, মানরক্ষা হলো কি? তালাকপ্রাপ্তা অপমানিতা মহিলাদের মানরক্ষা হবে তো এই নতুন আইনে? তা যদি হবার আশা থাকত তাহলে গত এক বৎসর ধরে যাঁরা এতো লম্ফঝম্প করছিলেন তাঁরা হঠাৎ এভাবে চুপ হয়ে যেতেন না। তাঁরা তো কেবল স্বামী নন, কন্যার পিতা, ভগ্নীর ভ্রাতাও তো বটেন। স্বামী হিসাবে না হয় তাঁরা অবাঞ্ছিতা স্ত্রীর দায়িত্ব এড়াতে পারলেন, যথেচ্ছ তালাক দেবার পর খোরপোষের দায়িত্ব না নিয়ে। কিন্তু পিতার দায়িত্ব, ভাইয়ের কর্তব্য এড়াবেন কি করে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই তালাক পাওয়া মেয়েরা পেটের দায়ে পরের বাড়ী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাসীবৃত্তি করলে, পথে ভিক্ষা করলে এমন কি বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও ধর্ম বিপন্ন হয় না। ধর্ম বিপন্ন হয় শুধু তখনই যদি প্রাক্তন স্বামী কোনো অনাথা অসহায়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে খোরাকী দিতে বাধ্য হয়। এই ভণ্ডামীকে আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না নিজেদের কাছ থেকেও। কারণ যাঁরা এই আইন পাশ করিয়ে নেবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন তাঁরাও বুঝতে পারছেন যে এবার তাঁদের ঘরেও তো আত্মজারা, সহোদরারা তালাক পেয়ে এসে উঠবেন, চিরকালই উঠতেন দুমুঠো অন্নের প্রত্যাশায়। ইদানীং তবু চেষ্টা চরিত্র করলে কখন কখনও খোরপোষ আদায় করা যেত তাদের স্বামীদের কাছ থেকে, এখন আর সেটাও পাওয়া যাবে না। অবশ্য দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা না থাকলেও তাঁরাও অনায়াসে এরপর থেকে ওয়াকফ্ বোর্ডের আপিস দেখিয়ে দিয়ে এই হতভাগিনীদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন। ভালো, এসব সত্বেও বিপন্ন শরীয়তকে বাঁচানো তো গেল। সরকারের এবং সুপ্রিম কোর্টের মুখেও ঝামা ঘষে দেওয়া গেল। ভবিষ্যতে মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনে হাত দিতে যাবার আগে যেন পাঁচবার তারা ভেবে দেখে।

যাই হোক সমাজ কি পেল না পেল তা সমাজের মাথারা ভেবে দেখতে থাকুন, মুসলমান সমাজের মহিলারা কি পেলেন এবং কি হারালেন সেটা আমরা একটু খতিয়ে দেখি। এতদিন আর যে কোনো ভারতীয় নাগরিকার মতন একজন মুসলমান নাগরিকাও ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৫ ধারা অনুযায়ী একটা অধিকার দাবী করতে পারতেন। তালাক পাবার পর যদি নিজেকে এবং নাবালক সন্তানদের ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হতেন তিনি কিংবা বাপ-ভাইয়ের কাছে আশ্রয় পাবার আশা না থাকতো তাহলে আদালতে গিয়ে প্রাক্তন স্বামী এবং সন্তানদের পিতার কাছ থেকে মাসোহারা দাবী করতে পারতেন। মনে রাখা ভালো যে এই রকম দাবী শাহবানুর আগেও শত শত মুসলমান মহিলা করেছেন সারা ভারতের বহু আদালতে। সেই সব দাবী গৃহীতও হয়েছে এবং আদালতের হুকুমে স্বামীরা মাসোহারা দিতে বাধ্যও হয়েছেন। তখন কিন্তু তাতে শরীয়ত বিপন্ন হয়নি। এ কথাও জানা ভালো যে শাহবানুর মামলা যখন চলছিল তখন ঐ রকম আরো কয়েক শ মামলাও চলছিল নানা আদালতে, কিন্তু তার একটিও কেউ প্রত্যাহার করেননি, শরীয়তপন্থীদের শাহবানু বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন চলার কালে। তারপরেও প্রত্যাহার কেউ করেছেন বলে শুনিনি। তবে নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে স্বামীরা এবার প্রাক্তন স্ত্রীদের যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবেন অনেকেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১২৫ ধারার সুবিধা মুসলমান মেয়েরা আর পাবেন না বলে স্বামীদের তো আর খোরপোষ দেবার দায়িত্ব রইল না।

নতুন আইন অনুযায়ী দায়িত্ব এখন বাপের, যদি অবশ্য এই দুর্ভোগ ভোগ করবার জন্য তিনি বেঁচে থাকেন এবং পণ যৌতুকসহ বিয়ে দেবার পরেও সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে তালাক পাওয়া কন্যা ও নাতি-নাতনীদের ভরণ-পোষণ করবার। বাপ না পারলে ভাইকে দায়িত্ব নিতে হবে যদি অবশ্য ভাইয়ের সামর্থ্য থাকে এবং ভাইয়ের সংসারে এই বাড়তি উৎপাত সাদরে গ্রহণ করতে আপত্তি না করেন ভ্রাতৃজায়া। বাপ ভাই বিমুখ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বা অপারগ হলে সচ্ছল আত্মীয়দের উপরেও দায়িত্ব বর্তাতে পারে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে। যথেষ্ট কারণ না দেখিয়ে যদি তিনি হুকুম অগ্রাহ্য করেন তাহলে নাকি তাঁর বছর খানেক জেলও হতে পারে! কি সুবিচার রে! যে লোক বিবাহকে ভাঙলো সন্তানের জনক হলো তার সব দায় থেকে মুক্তি। অথচ সচ্ছল অবস্থা বলেই কাছের বা দূরের আত্মীয়ের অব্যাহতি নেই। অবশ্য এই ভাঁওতাটা যে খুব কাজে লাগবে না সেটা সরকারের বিল প্রণয়নকর্তার মোটা মাথাতেও ঢুকেছে। তাই তাঁরা শেষ আশ্রয় দেখিয়ে দিয়েছেন ওয়াকফ্ বোর্ডকে। অর্থাৎ আগে যেখানে ভারতীয় নাগরিকা হিসাবে তিনি আইনতঃ স্বামীর কাছ থেকেই কিছু আদায় করতে অধিকারিণী ছিলেন এখন মুসলমান নাগরিকা হিসাবে তিনি দুটি ভাতের জন্য সন্তানদের হাত ধরে ক্রমান্বয়ে বাপ, ভাই, আত্মীয় স্বজন এবং অবশেষে ওয়াকফ্ বোর্ডের দ্বারস্থ হতে থাকবেন দেখবার জন্য যে কে মেহেরবান হয়ে তাঁর দায়িত্ব নেবেন। উন্নতি বই কি মেয়েদের ভাগ্যের! তা ছাড়া এখন থেকে যাঁরা ওয়াকফ্ করবেন তাঁদের বিশেষ করে লিখে রেখে যেতে হবে যেন তাঁদের সম্পত্তির আয় থেকে দুজন চারজন কি দশজন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে খোরপোশ দেওয়া হয়।

যাই হোক নতুন আইনের এই অতি সুন্দর এবং সম্মানজনক (!) ব্যবস্থায় সমাজের আর সবাই যতই না কেন হাঁফ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হোন যে যাক্ শরীয়ত রক্ষা পেল, আদতে তালাক পাওয়া মেয়েরা এবং তাঁদের অভিভাবকরা কিন্তু আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন না অধিকার রক্ষার এই অপূর্ব আয়োজনে। আর সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে তালাকের ভয় নেই এমন কন্যাই বা দেশে ক'জন আছেন, অভিভাবকই বা ক'জন আছেন? এমন একটি আইন পাশ করার জন্য যাঁরা জেদ ধরে ছিলেন তাঁদের কি আজ মনে হচ্ছে না যে নাকের বদলে নরুণ পেলেন?

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সব ঘটনা থেকেই আমাদের কিছু শিখবার থাকে। গত এক বছরের ঘটনাবলী থেকেও কিছু শিক্ষা হলো বই কি। প্রথমতঃ আরো একবার দেখা গেল যে প্রায়ই ব্যক্তির বা গোষ্ঠির অহংকার তৃপ্ত করতে গিয়ে ভালোমন্দ বা মঙ্গল-অমঙ্গলের বিচারটা গৌণ হয়ে যায়। আমার ধর্ম বা আমার সমাজের সবই ভালো, অপরের কাছ থেকে শিখবার আমাদের কিছু নেই এমন একটা অহংকার এবং গোঁড়ামী মুসলমান সমাজের অনেকের মনেই বদ্ধমূল। ফলে তাঁদের কাছে সমালোচনা বা সংস্কারের প্রয়াস মাত্রই সর্ব্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবার যোগ্য। আত্মসমালোচনা বা আত্মসংস্কার যখন রামমোহন বা বিদ্যাসাগর করেছিলেন তখন তাঁদের পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তাঁদের চরিত্রহনন তো বটেই প্রাণহননের চেষ্টাও কম হয়নি। তাই মুসলমান সমাজেও প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলমান সমাজের পশ্চিমীকরণের কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু আরো মৌলিক সংস্কারের কথা বলবার মতন মানুষেরও আজ প্রয়োজন আছে। যা পরিবর্ত্তন বা আধুনিকীকরণ ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে ঘটে চলেছে মুসলমান সমাজেও তা যেন অলক্ষ্যে অস্বীকৃতভাবে ঘটে চলেছে। তা ছাড়া কাজে যাই করি মুখে অন্তত বলতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হবে ইসলাম যে পথ দেখিয়েছে তার অভ্রান্ততা প্রশ্নাতীত, এ এক চিরন্তন সত্য পথ—সর্ব দেশে সর্বকালে সর্ব মানুষের পক্ষেই এই হোল শ্রেষ্ঠ পথ যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর এই পথের স্রষ্টা। যে এই মৌলিক বিশ্বাসে সন্দেহ প্রকাশ করবে সেই ইসলামের শত্রু। শাস্ত্রের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্য থেকে কিভাবে যুক্তির পথে মানবিকতার পথে একটি সম্পূর্ণ সমাজকে সহানুভূতির সঙ্গে নিয়ে আসা যায় সেটা ভেবে দেখতে হবে সব আধুনিক মানুষকেই।

দ্বিতীয়তঃ যে কথা আরো একবার বোঝা গেল তা হলো এই যে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মাথার উপর আজ এমন কোনো নেতৃত্ব নেই যা ওই সমাজের যথার্থ মঙ্গল কিসে তা বুঝে দেখতে চেষ্টা করবে এবং সেদিকে সমাজকে পরিচালনা করবে। সুস্থ ও যুক্তিবাদী চিন্তায় সক্ষম, সমাজের যে সাংস্কৃতিবান একটি ক্ষুদ্র অংশ আছে তার প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর এতই ক্ষীণ যে সরকারও তাকে গ্রাহ্য করবার যোগ্য বলে মনে করে না। বিশ্ববিখ্যাত সলীম আলি কিংবা দেশবিখ্যাত খাজা আহমেদ আব্বাস, মুমীম রজা, বদরুদ্দিন তৈয়বজী, দানিয়েল লতীফার মতন যেসব মানুষ মুসলমান সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে আছেন, তাঁদের না আছে সম্মান সরকারের কাছে, না নিজের সমাজের কাছে। নয়ত এদের মতন মানুষরা যে বিলের বিরোধীতা করেছিলেন কঠোর ভাষায়, সেই বিলকে অবলীলায় পাশ করে আইন বানিয়ে ফেলা গেল কি করে? তাঁদের কথার তো কানাকড়ি দাম দিল না সরকার। অর্থাৎ সরকার বোঝে কেবল ভোটের অংক আর রাজনৈতিক চাপ। শুভ-অশুভ বিচারের দায়িত্ব তার নয়।

এই অভিজ্ঞতাগুলির মর্ম আজ আমাদের অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। শুধু মুসলমান সমাজ নয় সমগ্র দেশে যত যুক্তিবাদী মুক্তমনা মানুষ আছেন তাঁদের সকলকেই এবার ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সব রকম মূঢ়তার বিরুদ্ধে। নয়ত অচিরে তাঁদের সব স্বাধীনতা—চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা—লোপ করে দেবে ভোট-লোলুপ সরকার এবং ভ্রান্ত ধর্মান্ধ জনসাধারণ। হিন্দু সমাজে আজ কোনো কোনো ধর্মান্ধ ব্যক্তি কি ভয়াবহ ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সাধারণ মানুষকে বিপদে টেনে নিয়ে চলেছেন তার সব চেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ মহারাষ্ট্রে বাল ঠাকরের শিবসেনা। এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাল ঠাকরের এত দূর দুঃসাহস যে অহিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে নামবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহের আহ্বান জানাতে পারেন খোলাখুলি! আর সরকার এ সবের অসহায় দর্শক মাত্র, যতক্ষণ আগুন জ্বলে না উঠছে ততক্ষণ তার কিছু করণীয় নেই। অথচ হিংসাত্মক কাজ কর্মে প্ররোচনা দেওয়া এ দেশের ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। অর্থাৎ আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগ কর্তা নেই।

গণতন্ত্র ভয়াবহ হয়ে ওঠে তখনই যখন মিথ্যা ভয় দেখিয়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির লোভ দেখিয়ে বেশীর ভাগ মানুষকে এত দূর খেপিয়ে তোলা হয় যে যুক্তিহীন মূঢ় আচরণে সহজেই তাদের প্রবৃত্ত করা যায়। তখন ভোটের জোরেই ফ্যাসিস্টরা গদী দখল করতে পারে। আজকে মহারাষ্ট্রে সেই হুমকিই দিচ্ছেন বাল ঠাকরে। বলা বাহুল্য এটা ফাঁকা আওয়াজ নয়। তাঁর আশা পূরণ হতে বিলম্ব হবে না বলেই আমাদের আশঙ্কা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গভীর সর্বনাশকে ঠেকাবে কে?

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদী মানুষরা সংখ্যায় অল্প—তাঁরাই এ দেশের যথার্থ সংখ্যালঘু। শুধু সংখ্যালঘু হলেও তত দুর্ভাবনার কথা হতো না। তাঁরা আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নও বটেন। বিচ্ছিন্ন বলেই প্রয়োজন মত তাঁদের সংগঠিত শক্তি দিয়ে অশুভ শক্তিকে ঠেকাবার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন না। অথচ সংকীর্ণ মতান্ধ অসহিষ্ণু কোনো হিংসাশ্রয়ী ফ্যাশিষ্ট দল যদি ক্ষমতায় আসে তবে সবার প্রথমে এই উদার মতাবলম্বী যুক্তিবাদী লোকেদেরই নিশ্চিহ্ন করে দেবে। সেই দুর্দিন আসন্ন।

কিন্তু যতদিন না দেশ ঐ রকম একটা স্বৈরতন্ত্রের কুক্ষীগত হচ্ছে ততদিন আমাদের কিছু করণীয় আছে। সে কথাটা কি আমরা সবাই মিলে একবার ভেবে দেখব না?

কবির চিঠি, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃঃ ৫-৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা

বলতে গেলে কলকাতার মেয়েদের চমকপ্রদ কীর্তিগুলি প্রায় বেশির ভাগই ১৯২১-এর আগে ঘটে গেছে। বাকি ছিল বোধহয় সাহেব গভর্ণরকে গুলী করা, গিরিশৃঙ্গ জয় করা আর উড়ো জাহাজ চালানো। কিন্তু এসবে একালের বাঙালী তত অবাক হয়নি, যতটা হয়েছিল জুতো মোজা পরা মেয়েদের সেকালে বেথুন সাহেবের ইস্কুলে যেতে দেখে। ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুল থেকে দুটি কন্যা প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। একজন প্রথম বিভাগ পেতে পেতেও পেলেন না মাত্র একটি নম্বর কম পড়ায়। সেই কন্যার অভূতপূর্ব কীর্তিতে কলকাতা থেকে ঢাকা পর্যন্ত তখন জয় জয়কার! কত পুরস্কার, কত অভিনন্দন। ইংরেজি-বাংলা কাগজেপত্রে সে কি লেখালেখির ধুম। শুনেছি সেই কাদম্বিনী বসু বি. এ. কিংবা চন্দ্রমুখী বসু এম. এ-রা যখন কারুর বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন কৌতূহলী দর্শকের ভীড় জমে যেত পাড়ায়। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস-রাও চমকে দিয়েছিলেন বটে বাংলাদেশকে। কিন্তু এঁদের কিংবা লক্ষ্মী পাল, সুদীপ্তা সেন, দুর্বা ব্যানার্জিদের দেখবার জন্য তেমন লোক জমে বলে তো শুনি না। খবরের কাগজের রিপোর্টারের সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎকারের সরস বিবরণ, এমনকি সুজয়া গুহ, কমলা সাহার মতো বীরাঙ্গনাদের শোচনীয় পরিসমাপ্তির করুণ কাহিনীও ঘরে বসে পড়ে অবলীলাক্রমে ভুলে যেতে পারে আজকের বাঙালী পাঠক-পাঠিকা। প্রতি তুলনায় কি আলোড়নটাই না জাগিয়ে ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সেই বধূ যিনি পার্ক স্ট্রীট দিয়ে স্বামীর পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে যেতেন গড়ের মাঠে। বির্জিতলাও-এর সান্ধ্য আসরের প্রাণস্বরূপা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর শহরজোড়া খ্যাতি ছিল ; কলকাতার বিদগ্ধ সমাজ আকৃষ্ট হতেন সেই আসরে। এদেশের ভদ্র শিক্ষিত সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সহজ-স্বাভাবিক মেলামেশার সেই তো প্রথম সূচনা। আজকাল বাঙালী মেয়ে বিদেশে শ্বশুর-ঘর অথবা স্বামীর-ঘর করতে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯০৭ সালে হরিপ্রভা তাগেদা যখন জাপান যাত্রা করেন জাপানী স্বামীর সঙ্গে তখন চমকে উঠবার মতো একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে। তাঁর লেখা "বঙ্গ মহিলার জাপান যাত্রা" সেকালের বাঙালী যত আগ্রহে পড়েছেন, আজ কোনো বঙ্গমহিলা যদি দক্ষিণ মেরু কিংবা চন্দ্রেও যাত্রা করেন, তবু তাঁর কাহিনী অত আগ্রহ নিয়ে আজকের বাঙালী পড়বেন কিনা সন্দেহ। আর ঠাকুরবাড়ির কন্যা সরলা দেবীকে তো ক্ষণজন্মা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মেয়ে মনে করা হতো। সাহিত্যচর্চা আর রাজানীতি থেকে শুরু করে কি না করেছেন তিনি।

তুলনায় আজকের মেয়েদের কীর্তিগুলি যেন চোখেই পড়ে না—নাড়া দেয় না তেমন করে। কিংবা বলা যায় বিস্ময়বোধ করার জন্য যে অকৃত্রিম সারল্যের প্রয়োজন তাই বোধহয় লোপ পেয়েছে দেশ থেকে। অথচ ভেবে অবাক হই কি যুগান্তরটাই না ঘটে গেছে গত পঞ্চাশ বছরে এই কলকাতার বুকে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরটাতেই এই শহরের পথ থেকে পাল্‌কী অপসৃত হয়েছিল। ; বড় ঘরের মেয়েদের পাল্‌কী শুদ্ধ চুবিয়ে তুলে গঙ্গাস্নান করানোর নিরাপদ রীতি আরও আগেই উঠে গেছে। তবু দিবালোকে কলকাতার রাজপথে ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রায় দেখাই যেত না। এর সঙ্গে তুলনা করতে হয় বর্তমান যুগের বেলা দশটার ডালহৌসী স্কোয়ারের চেহারা। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যখন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা মেডিকেল গ্রাজুয়েট ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (অর্থাৎ সেই কাদম্বিনী বসু) সভাপতি স্যার ফিরোজ শাহ মেহতাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সবাই বিস্ময়ে গর্বে অভিভূত। সেদিন তাঁকে দেখে এ্যানি বেসান্টের মনে হয়েছিল এই মহিলা ভারতের নারী জাগরণের মূর্ত প্রতীক। হাঁ তখন পর্যন্ত প্রতীক মাত্র। কারণ স্ত্রীশিক্ষা কিংবা নারী-জাগরণ তখন সীমিত ছিল কলকাতার গোনাগুন্‌তি কয়েকটি পরিবারে। সে সময়ে যাঁদের নাম বাঙালীর মুখে মুখে ফিরতো তাঁদের মধ্যে ছিলেন লিলিয়ান পালিত, প্রথম মহিলা ইশান স্কলার ; সরলাবালা মিত্র, হিন্দু ঘরের বিধবা যিনি ১৯০৭ সালে শিক্ষণ শিক্ষার জন্য বৃত্তি নিয়ে ইংলন্ড গিয়েছিলেন তটিনী গুপ্ত (পরে দাস) যিনি ১৯১২ সালে সম্মিলিত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। তাছাড়া ছিলেন কামিনী রায় বি. এ., কুমুদিনী খাস্তগীর বি. এ., সুজাতা বসু এম এড, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী বি. এ., প্রিয়ংবদা দেবী বি. এ., শান্তা দেবী বি. এ., সীতা দেবী বি. এ. ইত্যাদি আরও কত বিদূষী! কলকাতার নারী-জাগরণ ইতিহাসের কয়েকটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু তখনও এই নগরের কটি মেয়েই বা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছিলেন? সে ছিল একক কীর্তির যুগ। এঁরা যেন সন্ধ্যার আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মাত্র তারকা। আকাশ ভরা তারার ঐশ্বর্য তখনও দেখা দেয়নি। কলকাতার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ভালো রকম ব্যাপ্ত হতে আরও এক প্রজন্ম-কাল কেটে গেল। তাছাড়া কলকাতার স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে তদানীন্তন ডি. পি. আই একটি মজার মন্তব্য করেছিলেন ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মতে যে সব মেয়েরা সে বছরে পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশেরই আদি নিবাস কলকাতা নয়, পূর্ববঙ্গ। সে যাই হোক, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত শিক্ষায় সমাজ-সংস্কারে রাজনীতিতে সাহিত্য চর্চায় আমরা যে মেয়েদের দেখি তাঁদের গুণ যতোই থাক না কেন, সংখ্যা তাঁদের অতি নগণ্য ছিল।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতকের বিশ বাইশ বছর পর্যন্ত নারী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষার একটি শীর্ণ ধারা প্রবহমান ছিল সমাজের উচ্চ গিরিশৃঙ্গে এবার তা মেনে এল সাধারণ্যের সমতলে। নারী জাগরণের সেই ক্ষীণতোয়া কয়েক দশকেই এতো বিস্তার লাভ করেছে যে একে প্রায় জোয়ার আসা নদী মনে হয়। আপাতত দু-একটি মাত্র উদাহরণ দিই। ১৯৩২-৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে একটি কেবল মহিলা ছিলেন, রবীন্দ্র ভারতীর বর্তমান উপাচার্যা ডঃ রমা চৌধুরী। আর আজ কলকাতার সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শন বিভাগে মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি বলে শুনতে পাই। ১৮৮১ সালে প্রথম যখন দুটি মেয়ে (অবলা দাস ও এলেন দ্যাক্রু) কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন, তখন কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিতে রাজী হননি। তাই চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে তাঁদের মাদ্রাজ যেতে হয়েছিল। কিন্তু দু বছর পরই মেডিকেল কলেজের রুদ্ধদ্বার আন্দোলনের মুখে খুলে গেল। এখন প্রতি বছরে চিকিৎসা বিদ্যায় যাঁরা স্নাতক হন, তাঁদের একটি বড় অংশই মহিলা। তাছাড়া নার্সিং তো বলতে গেলে মেয়েদেরই জীবিকা হয়ে উঠেছে। আইন কিংবা সাংবাদিকতাতে তো মহিলারা আছেনই, তাছাড়া এনজিনিয়ারিং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, এমনকি পুলিশের চাকরীও আর মেয়েদের অনধিগম্য নয়। তা ছাড়া কিছু চাকরী আছে যা প্রায় মেয়েদেরই একচেটিয়া হয়ে গেছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?" প্রশ্ন করেছিলেন বটে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সারা ভারতেই এবং বিশেষ করে এই কলকাতায় নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে পুরুষেরাই অনেক বেশি প্রয়াস করেছেন দেখতে পাই। কেবলমাত্র মহিলাদেরই নেতৃত্বে নারীর মুক্তির আন্দোলন (Women's Lib.) তেমন করে এদেশে কোনোকালেই দানা বাঁধেনি মোটে। বলতে গেলে তার দরকারই হয়নি। বরং ইংলন্ডে যে সময়ে মেয়েরা ভোটের অধিকার পাবার জন্য আন্দোলন করছিলেন, সে সময়েই বাংলাদেশের একটি তেজস্বিনী মেয়ে (সরলা দেবী) নিজের সমাজের ছেলেদের জাগিয়ে তোলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাদের মধ্যে বীর্য আর আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করার জন্য প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি প্রবর্তন করেছিলেন। অন্যপক্ষে রামমোহন-বিদ্যাসাগর এদেশের নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন মূঢ় সমাজের সঙ্গে। সেই লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনোমোহন ঘোষ, আনন্দ মোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি আরও বহু খ্যাত অখ্যাত মানুষ। নানা সম্প্রদায়ের খ্রিস্টান মিশনারীরা এবং ব্রাহ্মরাও দলবদ্ধভাবে ছিলেন এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ভারতের তথা বাঙলার মেয়েরাও পুরুষের হাত থেকে বিনা আয়াসে শেষ যে মহৎ উপহারটি পেয়েছেন সেটি হিন্দু কোড বিল। অবশ্য আমাদের সব সম্প্রদায়ের মেয়েরাই যদি এই অধিকারগুলি পেতেন তবে আরও সুখের হতো।

গত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই এই শহরের মহিলারা নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান করেছেন নানা উদ্দেশ্যে। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন, নারী কর্মমন্দির,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সখি সমিতি, বিধবা শিল্পাশ্রম, মহিলা কর্মী সংসদ, মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘ, দীপালী সংঘ, সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি—কত আর নাম করব! পত্রিকা সম্পাদনা হয়তো করেছেন আরও বেশি বঙ্গবাসিনী, বালক, বিরহিণী, অন্তঃপুর, গৃহলক্ষ্মী, হিন্দু ললনা, বেগম, মুকুল, আন্নেসা, জয়শ্রী, বঙ্গলক্ষ্মী, বুলবুল, মেয়েদের কথা, মহিলা, শ্রীমতী, ঘরে-বাইরে, সখী সংবাদ...এরপরও কত নাম বাদ পড়ল। এর অনেকগুলিই অল্পদিনে লীলা সংবরণ করেছিল বটে। তবু মেয়েদের আত্মপ্রকাশের এবং আত্মনির্ভরতার কিছু ক্ষেত্র অবশ্যই প্রস্তুত করে দিয়েছিল। কিন্তু এই সব মহিলা-প্রতিষ্ঠান বা মেয়েলী পত্রিকা যে মস্ত বড়ো একটা কিছু করতে পেরেছিল কিংবা পুরুষশাসিত সমাজের সঙ্গে লড়াই করে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল এমনতর দাবী হয়তো করা চলে না। বরং আমাদের সৌভাগ্য যে পশ্চিমের অগ্রসরতম দেশের মেয়েদেরও যতখানি যুদ্ধ করতে হয়েছে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ আর সরকারের সঙ্গে আমাদের তার কিছুই করতে হয়নি। গত দুশো বছর ধরে এদেশে ধর্মান্ধতা, নিষ্ঠুর কু-সংস্কার, নারীদ্বেষ আর নারী-অবমাননার সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন প্রধানতঃ কিছু হৃদয়বান পুরুষেই। আমরা তাঁদের হাত থেকে উপহার পেয়েছি শিক্ষা, সম্মান, অধিকার। ফলে আমাদের নারী জাগরণের ইতিহাস কখনোই পুরুষ বনাম নারীর যুদ্ধের ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। আমরা কেড়ে নিইনি বলেই সম্ভবত নারীকে দেশের সর্বময়ী কর্ত্রী করে দিতেও পুরুষের পৌরুষে আঘাত লাগেনি এদেশে। ফিলিপ স্প্র্যাট্ হয়তো এর মনোবিকলনগত ব্যাখ্যা দেবেন। বলবেন এ হলো মাতৃ-মনোনিবদ্ধতার (mother fixation) প্রকাশ। এদেশের পুরুষ যে কখনও সাবালক হয় না তার এহেন প্রকাশ ধর্মে, সমাজে, গার্হস্থ্যে অহরহ পাওয়া যাবে! যদি তাই হয় তবে হোক। কিন্তু আমাদের প্রাচ্য সমাজে অসুখী নিঃসঙ্গ মানুষ হয়তো আজও অনেক কম। আশা করা যাক শিল্পায়নে আরও উন্নতি হলেও আমাদের জীবনবোধে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসবে না।

পঞ্চাশ বছরে আগেকার তুলনায় এই নগরের জমি ও বাসস্থানের উপর, তাছাড়া নাগরিক সুখসুবিধার উপরও চাপ অন্তত হাজার গুণ বেড়েছে। ১৯২০-২১-এর পর থেকে বহুলোক এসেছেন জীবিকার টানে কারণ এই নগরে ও নগরের আশে-পাশে বহু শিল্পসংস্থা গড়ে উঠেছে। আর ছিল শিক্ষাদীক্ষার সুবিধা। তাছাড়া নাগরিক জীবনের কিছু স্বাচ্ছন্দ্যও আছে। তাই ক্রমাগত কলকাতা মানুষকে টানছে ; ১৯২১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছিল, তা এই সব স্বাভাবিক কারণেই। তারপরে ৬।৭ বছরে এক অস্বাভাবিক জন বৃদ্ধি হল দেশ বিভাগের ফলে। তারপর আবার ১৯৫২ সালের পর থেকে বৃদ্ধির হার নাকি অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কমই। তাছাড়া গত ৩।৪ বছরের রাজনৈতিক অশান্তি এবং শিল্পসংস্থাগুলিতে অস্থিরতার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নাকি আরও কমেছে বলে অনুমান করা হয়।

যাই হোক, যেভাবে বন্যার মতো দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়লেন তাঁদের সঙ্গে তাল রেখে বাড়ি-ঘর তৈরী করা, শহরের সুখ-সুবিধাকে আশে-পাশের অঞ্চলে প্রসারিত করা এবং কর্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি এই দরিদ্র দেশে। বৃহত্তর কলকাতার বহু অংশেই এখনও খোলা নর্দমা রয়ে গেছে, পানীয় জল আসে টিউবওয়েল থেকে এবং তাছাড়া সেপটিক ট্যাঙ্ক নেই। ফলে আবাসযোগ্য বস্তীর ঘরে মাথা গুঁজতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। C. M. D. A যা হিসেব দিয়েছে, তাতে দেখি গড়পড়তা কলকাতার এক একটি ছোটো ঘরে তিনজনেরও বেশি বাস করে। শতকরা ৩০টি বাড়িতে কোনো কল নেই। শতকরা ১২টি বাড়িতে কোনো নিজস্ব পায়খানা নেই। আলাদা বাথরুম আর রান্নাঘর যে কত বাড়িতে নেই, সে হিসেব আর নাই দিলাম, কারণ কলকাতার ১/৪ মানুষ যে বস্তীর মধ্যে বাস করেন এ তো সবাই জানেন। এর বেশির ভাগ চাপটা পড়ে গৃহবদ্ধ মেয়েদের উপর।

তাছাড়া আরও একটি বিরাট সংখ্যক ভাসমান নাগরিক আছেন এই শহরে যাঁদের জন্য বস্তীর চালাও জোটে না। এঁরা ফুটপাথে বাস করেন। এমনটা পৃথিবীর আর কোনো শহরে আছে কিনা সন্দেহ। এঁদের উপজীবিকা দিনমজুরী, রিক্শা কিংবা ঠেলা গাড়ি টানা, ছোটোখাটো জিনিষ ফেরী করা, ভিক্ষা করা। কয়েকটি গরু, খাটিয়া আর হাঁড়ি এবং উনুন নিয়ে পশ্চিম থেকে আগত কিছু দুগ্ধ ব্যবসায়ীও ফুটপাথে বাস করেন শোনা যায়। এই বস্তীবাসী এবং ফুটপাথবাসীদের অধিকাংশই তাঁদের পরিবার-পরিজনকে গ্রামে বা মফঃস্বলে রেখে এসেছেন। এখানে জীবিকা অর্জন করে যথাসাধ্য দেশে পাঠান। প্রধানত এদের উপস্থিতির ফলেই এই শহরবাসীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। সারা পশ্চিম বাংলাতেই পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। কলকাতায় এই বৈষম্যটা আরও প্রকট। প্রতি হাজারজন পুরুষে ৭০০ জন মেয়ে আছে কিনা সন্দেহ। তার ফলে কিছু সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে।

বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া আর অন্যদিকে কল্যাণী থেকে কল্যাণপুর পর্যন্ত অঞ্চলকে কেউ কেউ বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ফেলেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলের লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ পূর্ব বাংলা থেকে দেশ বিভাগের পরে এসেছেন। সরকারী, বেসরকারী প্রচেষ্টায় এবং বিশেষত ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে গত কুড়ি বছরে বেশ কিছু বাড়ি তৈরী হয়েছে। এতে উচ্চবিত্ত এবং মধ্য-বিত্তের গৃহ সমস্যার যদি বা কিছু সুরাহা হয়েছে, বস্তীবাসীদের দুঃখের শেষ অবিলম্বে হবে বলে মনে হয় না। অন্যদিকে কলকাতার পথে গাড়িও বেড়েছে হাজার গুণ, ঘোড়া কমলে কি হবে! ফলে রাস্তাঘাটে গাড়ির ভীড় যেমন বেড়েছে অসম্ভব রকম, তেমনি মবিলের ধোঁয়ায় এই শহরের হাওয়া এতদূর দূষিত হয়েছে যে সেইদিক থেকে পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলির সঙ্গে আমরা পাল্লা দিতে পারি।

অর্থাৎ এই শহরে কয়েক পুরুষ যাবৎ যে মধ্যবিত্ত পরিবার বাস করছেন, সে পরিবারের ঠাকুরমা কলেজে পড়া নাতনীকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারবেন, তাঁদের কাল কতো ভালো ছিল। জিনিষপত্রের তখন আজকের তুলনায় জলের দাম ; কলকাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পথঘাট ঝকঝকে তকতকে ছিল, দুবেলা জল ঢেলে ধোয়া হতো ; গঙ্গার ধারে সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে যাওয়া যেতো—অর্থাৎ গঙ্গার ধার বলতে এখনকার মতো ঐ ম্যান অব-ওয়ার জেটির কাছে কয়েক গজ মাত্র রাস্তা বোঝাতো না! কলকাতার পার্কগুলি এমন ন্যাড়া ছিল না। অনেকেরই নিজের বাড়ি ছিল, সেই সঙ্গে এক চিলতে বাগানও ছিল, নারকেল, লেবু কি কলা গাছের। ভাড়া বাড়িতে যারা থাকতো—অর্থাৎ যাদের "চালচুলো ছিল না" তাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতেও লোকের দ্বিধা হতো তখন। আজ গড়ের মাঠকে দেখলে কে বুঝবে কি গর্ব করার মতো বস্তু ছিল ঐ মাঠ! ইডেন গার্ডেনের কি দুর্দশা হয়েছে, সে আর তিনি স্বচক্ষে দেখেননি আশা করা যায়, কারণ ক্রিকেটে তাঁর অভিরুচি থাকার কথা নয়। এত শুনে তবু কি নাতনী ঠাকুরমার সঙ্গে কাল-বদল করতে রাজী হবে? রাজী হলে কি তাকে বুদ্ধিমতী বলবো আমরা? নাতনীর বাসস্থানের পরিসর কমেছে, সারা দিনের অবসরও কমেছে, কিন্তু তার পায়ের শিকল কেটেছে। নাতনীর কালে এই শহরের পথঘাট আর আকাশ অনেক বেশি অপরিচ্ছন্ন হয়েছে বটে—কিন্তু নাতনীর মন অন্য যে এক নতুন আকাশে উড়বার অধিকার পেয়েছে সে আকাশের খবর জানা ছিল না ঠাকুরমার। ঠাকুরমার ঘোমটা-টানা শাসন মানা জীবন আজ কত দূরে মনে হয়—নাতনী পেয়েছে শিক্ষার অধিকার, স্বাধীন উপার্জনের অধিকার, পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার, নিরঙ্কুশ দাম্পত্য ও তার অভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আর পরিবার পরিকল্পনার উপায়। বলতে গেলে এই পঞ্চশীলের উপর আজকের মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত। অতএব আজকের নাগরিকরা কি পঞ্চাশ বছর আগেকার মেয়েদের তুলনায় বেশি সুখী? জীবন যত জটিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হচ্ছে ততই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জীবন থেকেই "সরল সহজ সুখ" দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। তাই বর্তমান কলকাতার মেয়েরা বেশি সুখী কিনা বলা কঠিন। তবে নিঃসংশয়ে বলা যায় আজকের মেয়েরা স্বমর্যাদায় বেশি প্রতিষ্ঠিত। শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের নিশ্চিন্ত (?) আশ্রয় থেকে ক্রমে তারা চ্যুত হচ্ছে। আর এই স্বাধীনতার আবশ্যিক অনুষঙ্গ যে ঝড়-ঝাপটা তাতে পড়ে নাকানি-চোবানিও তাকে যথেষ্ট খেতে হচ্ছে। কিন্তু আমৃত্যু নাবালিকা হয়ে থাকার অমর্যাদার পরিবর্তে তারা পাচ্ছে যথাসময়ে সাবালিকা হবার দুঃখ। মানুষ্যধর্মের বিবেচনায় একেই আমি শ্রেয়তর জ্ঞান করি।

শাস্ত্রে বলেছে কন্যাপ্যেবম্ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। ঐ অপি-টুকু লক্ষ্য করবার মতো! এতকাল অভিভাবকেরা করেও ছিলেন বটে। অর্থাৎ ছেলেদের পড়িয়ে-শিখিয়ে যদি সঙ্গতি অবশিষ্ট থাকতো তাহলে মেয়েদের ভাগ্যে শিক্ষার উদ্বৃত্ত ছিঁটেফোঁটা এসে পড়তো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে এই শহর কলকাতায় পশ্চিমী হাওয়া বইতে শুরু করায় অভিভাবকেরা শাস্ত্রের ঐ নির্দেশ থেকে এক পা এগিয়ে গেলেন। তাতে আবার বিদেশী শাসকের আনুকূল্য পাওয়া গেল, বিদেশী মিশনারীদের উৎসাহ তো ছিল। ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুলের পত্তন। তারপর দেখতে দেখতে কত রকমের কত ইস্কুলে গড়ে উঠল। একদিকে লা মার্টিনিয়ের, লরেটো, ডায়োসীজান—অন্যদিকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, এমনকি মহাকালী পাঠশালা পর্যন্ত। তবে মেয়েদের শিক্ষার আরও বড় ঢেউটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোধহয় এলো নন-কো-অপারেশানের পর পরই।

১৯১৯ সালের আইনে শিক্ষার ভার পড়ল প্রাদেশিক সরকার এবং নির্বাচিত মন্ত্রীর উপর। ফলে এরপর থেকে কলকাতার মুসলিম মেয়েদেরও শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। বেথুন সাহেবের 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' তৈরী হয়েছিল হিন্দু মেয়েদের জন্যই—প্রথম প্রথম সেখানে অহিন্দু ছাত্রীদের নেওয়া হতো না। কিন্তু ১৮৭৯ সালে যখন একই বাড়িতে কলেজও শুরু হয়, তখন কলেজে অহিন্দু ছাত্রীদের নেওয়ায় বাধা হয়নি। কলেজের প্রথম অহিন্দু ছাত্রী মিস এলেন দ্যাক্রু ভর্তি হয়েছিল ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। অবশ্য খ্রিস্টান মেয়েদের স্কুল-কলেজের অভাব প্রথম থেকেই ছিল না। অভাব ছিল বরং মুসলমান মেয়েদের জন্য। খ্রিস্টান মিশনারী-পরিচালিত ইস্কুলে মুসলিম মেয়েদের নিতে বাধা ছিল না। কিন্তু সেসব ইস্কুলে পড়ে মেয়ে 'মেমসাহেব হয়ে যাবে' এরকম ভয় রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারেও ছিল। তাছাড়া মুসলমান মেয়েদের পক্ষে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করার বাধা তো আরও প্রবলই ছিল। তাই যে স্কুলে পুরোপুরি ভারতীয় আবহাওয়া আছে, কিছুটা পর্দা আছে সেখানে তবু মুসলমান মেয়েরা যেতে পারতেন, কিন্তু সে রকম কোনো কোনো স্কুলে আবার তাঁদের প্রবেশলাভ সহজ ছিল না। মুসলিম মেয়েদের এই বাধা দূর করতে এগিয়ে আসেন বেগম রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেন। প্রায় একক প্রয়াসে ১৯১১ সালে একটি স্কুল গড়ে তোলেন এই মহিলা। প্রথম এ স্কুল শুরু হয় ওয়েলেসলী অঞ্চলে মুসলমান বসতির মাঝখানে। তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধাসাধি করে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন তিনি। আজ তাঁর এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্যই অভিভাবকদের সাধাসাধি করতে হয়। শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল শুরু করবার দু বছর আগেই ১৯০৯ সালে মুসলিম মেয়েদের জন্য আর একটি স্কুল শুরু হয়—আঞ্জুমান গার্লস স্কুল। প্রায় ৩০ বছর পর বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যই পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ। অবশ্য ইতিপূর্বেই বেথুন কলেজ থেকে মুসলিম মেয়েরা অনেকেই পাশ করেছেন। ১৯৩৮ সালে কাজি আখতার বানু বেথুন থেকে দর্শনে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন, তিনি সেবার মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন।

যাই হোক ১৯২২-২৭ এর সরকারী বিবৃতিতে (The Ninth Quinquennial Review) দেখি মন্তব্য রয়েছে 'এবার বালিকা বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ১৯২৭-৩২ সালের পরিক্রমায় দেখি রয়েছে 'a burst of enthusiasm swept girls into schools with unparalleled repidity...Government with the full concurrence of Legislative councills poured out large sums of money on women's education which would have been regarded as beyond the realm of practical politics ten years previously.' শিক্ষার জন্য এই নবজাগ্রত আগ্রহ আপন বেগেই কলকাতা নগরীর ঘরে ঘরে এসে পৌঁছল। পনের বছর পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আরও দ্রুত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অভূতপূর্ব বিস্তার হলো স্ত্রীশিক্ষার। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু মধ্যবিত্তরা প্রায় সবাই এসে পৌঁছলেন প্রধানত কলকাতা শহরে ও শহরতলীতে—যা নিয়ে আজকের বৃহত্তর কলকাতা। কলকাতার চেয়ে কয়েক বছর দেরীতে ইস্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে ঢাকায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার কলকাতার চেয়ে বেশিই ছিল। শুধু কলকাতার ইস্কুল-কলেজ নয়, প্রায় সমগ্র পূর্ব ভারতেরই স্ত্রী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকতার কাজে পূর্ব বাংলার মেয়েরাই বেশি সংখ্যায় যোগ দিয়েছেন প্রথম থেকেই। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা-আগত মধ্যবিত্তদের উৎসাহে এবং প্রভাবে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চলন আরও বাড়ল। তাছাড়া অর্থনৈতিক প্রয়োজনও ছিল। উদ্বাস্তু পিতারা কন্যাকেও উপার্জনক্ষম করে তুলতে সঙ্কোচ করেননি। এর প্রভাবও অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তদের উপরে পড়ল।

সাধারণ্যে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য আগ্রহ আজ যতখানি বেড়েছে আয়োজন সে পরিমাণে করে ওঠা সম্ভব হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে ক্রমেই এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৫১ সালে শিক্ষা বিস্তারে এ রাজ্য ছিল চতুর্থ। ১৯৬১ সালে পশ্চিম বাংলার স্থান নেমে গিয়ে হয়েছে সপ্তম। ১৯৭১ সালের হিসেব আমাদের হাতে নেই। কিন্তু সবাই জানেন ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার বিশেষত কলকাতার শিক্ষা বিস্তারে উন্নতি তো দূরে থাক, বনেদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও স্পষ্ট অবনতি হয়েছে। তাই আমরা গত দশ বছরে নামতে নামতে সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, সে খবর বোধহয় না জানাই ভালো। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার শতকরা মাত্র ৪০ জন পুরুষ এবং শতকরা ১৭ জন মাত্র স্ত্রীলোক সাক্ষর। বলাবাহুল্য কেবল কলকাতার হিসাব নিলে সাক্ষরতার হার আরও একটি উঁচু হবে—কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা ভারতবর্ষের অনেক কটি শহরের চেয়ে এ বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

এ রাজ্যে আটত্রিশ হাজার গ্রামের মধ্যে দুই হাজার সাতশো গ্রামে নাকি পাঠশালা বলতেও কিছু নেই। তবু শতকরা যতগুলি ছেলেমেয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় (৮৪%) সমসংখ্যক ছেলেমেয়ে (৬৫%) কলকাতায় সে সুযোগ পায় না। ১৯৬৩ সালে আইন করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। যদিও কলকাতা কর্পোরেশন এই অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ খুব কম ছেলেমেয়েকেই দিতে পারছে তবু দেখা যায় কলকাতায় ৬৯% জন মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পায় আর গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬৫% জন মেয়ে। তবে ছেলেদের বেলা এই হার উল্টে যায়। ১৯৫৮ সালে গ্রামীণ ছাত্রীদের ক্লাস v থেকে viii পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়ার ৫ বছরের মধ্যে নাকি ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে যায়। কিন্তু ঐ পর্যায়ের ছাত্রীরা কলকাতায় এ সুবিধা যদি তখনই পেত, তাহলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আরও বেশি প্রসার হতো বই কি। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বেলায় দেখি যে এই পর্যায়ের শিক্ষাকে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে গিয়ে মহা অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়ে আছে। আগেকার ধাঁচের এক ধারার (one stream) স্কুল সবগুলিকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রূপান্তরিত করা যায়নি। আবার বহু ধারার স্কুলও (multipurose) সার্থকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কার্যতঃ ২।৩টির বেশি ধারার (stream) আয়োজন প্রায় কোনো বালিকা বিদ্যালয়েই করা যায়নি অনেকটা উপযুক্ত মহিলা শিক্ষিকার অভাবেও। এতে করে কলকাতার মেয়েদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া অন্তত মেয়েদের জন্য এখনও ঘরে পড়ে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মেয়েদের হারও অভাবিত রকম বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে এঁদের সংখ্যা ছিল ১২% সমগ্র ছাত্র সমাজের তুলনায়। ১৯৬২-৬৩ সালে দেখি ২৫% জনই ছাত্রী। উচ্চশিক্ষার জন্য চাহিদা কলকাতার মেয়েদের মধ্যে যতটা দেখা যায় তেমন আর অন্য শহরে দেখা যায় না। সারা ভারতবর্ষে নাকি ১৯৬৪-৬৫ সালে যতজন উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মেয়ে, কলকাতায় এদের সংখ্যা ২৫। অবশ্য অর্থকরী শিক্ষা—যেমন চিকিৎসা বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, কমার্স, চার্টার্ড একাউন্টেন্সী ইত্যাদিতে শতকরা হার মাত্র ৫জন।

মেয়েদের শিক্ষার প্রথম যুগে যদিও উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত চিত্তের উন্মেষ, তবু বড় ঘরের কিছু মেয়েও সামাজিক বাধা অগ্রাহ্য করে অর্থকরী শিক্ষার দিকে গিয়েছিলেন। সমাজ সেবার আদর্শ ছিল তাঁদের সামনে। মেডিকেল কলেজে ১৮৮৩ সালের পর থেকেই মেয়েদের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। কিছুদিন পর ক্যাম্পবেল স্কুল খোলা হলে সেখানেও মেয়েরা প্রবেশাধিকার পেলেন। এছাড়া নার্সিং এবং শিক্ষকতাই ছিল তখন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উপার্জনের উপায়। গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েদের সামনে উপার্জনের কত পথই যে খুলে গেছে, তার পুরো হিসেব দেওয়া সহজ নয়। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল-এডভোকেট থেকে শুরু করে অফিসের স্টেনোগ্রাফার, ফার্মের রিসেপশানিস্ট, বিমানের সেবিকা, দোকানের পসারিণী সবেতেই শিক্ষিতা মেয়েরা আছেন। ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস আর টেলিফোনের চাকরী তো আছেই। বরং গরীব ঘরের নিরক্ষরা মেয়ের জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রই অনেকটা সীমিত। গ্রামের দিকে চাষবাসের কাজ আর খনি অঞ্চলে খনি মজুরী তারা করতে পারে বটে তবে কলকাতার মতো শহরে পরিচারিকার কাজ ছাড়া খুব আর কিছু খোলা নেই তাদের সামনে। বিড়ি বাঁধা, ঠোঙা বানানো, ফেরী করা ইত্যাদিও তারা জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করে বটে। কোনো কোনো ফ্যাক্টরীতে আজকাল মেয়েদের নেওয়া হয়। কিন্তু রেডিও, টেলিফোন-যন্ত্র কিংবা শেলাই কল তৈরীর কারখানায় চাকরী পাওয়ার জন্যও কিছু পড়াশোনা জানা দরকার হয়।

এই শহরের মেয়েরা এখন বিপুল সংখ্যায় উপার্জন করতে যাচ্ছেন বলে সংসারের চেহারাও ক্রমে পালটাচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সংসারে মেয়েদের নতুন মর্যাদা এনে দিয়েছে। যে মেয়ে রোজগার করেন কিংবা না করলেও করতে পারেন প্রয়োজন হলেই, সে মেয়ের মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মূল্য না দিয়ে উপায় নেই। এর ফলে মেয়েদেরও নিজের উপর আস্থা বেড়েছে। নিরুপায় আশ্রিত চিরকালই অবজ্ঞেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়েক বছর আগে শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী স্টেটসম্যান পত্রিকায় চাকুরীজীবিনীদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ ফেঁদেছিলেন। তার বক্তব্য ছিল যারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মোহে চাকুরী করতে ছোটেন তাঁরা তাদের শখ মেটাতে গিয়ে সংসারকে করেন বিপর্যস্ত, স্বামীকে অসুখী ; আর নিজের জন্য ডেকে আনেন অপমান আর লাঞ্ছনা। কেনা-বেচার নির্মম জগতের সংস্পর্শে এসে স্বভাব হয় রুক্ষ পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেহের স্বাস্থ্য, মনের মাধুর্য সবই হারাতে হয়। স্বামীর সর্বময় কর্তৃত্ব অসহনীয় হয় বলে যাঁরা উপার্জন করতে বার হন তাঁরা ভুলে যান যে, স্বামী যদি কোনো কারণে ভর্ৎসনাও করেন তবু আবার গলা জড়িয়ে ধরে স্ত্রীর মান ভাঙান, কিন্তু অফিসের কর্তৃপক্ষের তিরস্কার তো নির্জলা অপমান! বিবাহের জন্য অপেক্ষা করার কালটা যে কুমারী কন্যা চাকুরী করেন, তাঁরও অবস্থা কিছু ভালো নয়। তিনি আর নাকি মোটেই অনাঘ্রাত পুষ্পটি থাকেন না। বহু পুরুষ বন্ধুর করপীড়নে করপল্লব হয় কর্কশ!...তবে মনে হয় বাঙলাদেশের বিবাহার্থী যুবকেরা এবং এঁদের পিতামাতারা নীরদবাবুর সঙ্গে একমত নন। বিয়ের বাজারে চাকুরী করা মেয়েদের চাহিদা ক্রমে কি পরিমাণ বাড়ছে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রী স্তম্ভে। রাঢ়ী বারেন্দ্র সদ্‌গোপ শাণ্ডিল্যের অরণ্যে বেশি খুঁজতে হবে না, সহজেই চোখে পড়বে 'বয়স্থা উপার্জনক্ষমা'-র জন্য আবেদন। মেয়েদের উপার্জন করতে যেতে হয়, শুধু যে শখ আর জেদ মেটাবার জন্য নয়, মধ্যবিত্ত সংসারের অভাব মেটাতেই যে বহু স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই রোজগারে বার হতে হয় একথাটা নীরদবাবুর মতই আরও কেউ কেউ বুঝতে চান না। তাই মেয়েদের চাকুরী করাটা তাঁদের চোখে প্রায় অপরাধ, বলতে গেলে স্বামী-সন্তানের প্রতি প্রায় যেন অবিচারের পর্যায়ে পড়ে! চাকুরী করা কোন মেয়ে সংসারকে কতখানি অবহেলা করেন, তার মুখরোচক বর্ণনা কখন কখনও অনুদার প্রতিবেশিনীর মুখে শোনা যাবে। অবশ্য প্রশংসারও অভাব হয় না। ঘরে বাইরে যে মেয়ে সমানভাবে সামলান অনেক সময়ই তা সবিস্ময় সাধুভাষণও লাভ করে।

চাকুরীজীবিনীকে মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে নানা জাতীয় কিছু মেয়েলী সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। কোনো কোনো চাকুরীতে আজকাল কর্তৃপক্ষ মহিলা কর্মীদের সুখ-সুবিধা বিষয়ে আগের চেয়ে সচেতন হয়েছেন, কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও করেন তাঁদের জন্য বিশেষ করে যে সব মেয়েরা হাতের কাজ করেন, কি গতর খাটিয়ে রোজগার করেন, তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু আইনও আছে। তবে একটি সমস্যায় প্রায় সব চাকুরীজীবিনী মাকেই পড়তে হয়। সন্তান যখন ছোটো থাকে, তখন তাকে ভালোভাবে দেখা-শোনা করা এবং সেই সঙ্গে চাকুরীকেও অবহেলা না করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। মায়ের শরীর ও মনের উপরও খুব চাপ পড়ে। শিশুকে মানুষ করে মা যে সমাজের এক মস্ত সেবা করছেন, সেকথা আমাদের প্রায় মনেই থাকে না। এই দরকারী কথাটা মনে রেখে মাকে আরও একটু সাহায্য করা উচিত সমাজের। আংশিক মাইনের, এমনকি বিনা মাইনেতেও দীর্ঘ ছুটি দেওয়া, কাজের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময় কমিয়ে দেওয়া—ইত্যাদি কি করা যায় না? তাছাড়া কলকাতা শহরে creche জাতীয় তো কিছু নেই বললেই চলে। কোনো কোনো factory-র সঙ্গে এখন এ জাতীয় শিশু পালনাগার তৈরী করা হচ্ছে। টালা পার্কে অস্ট্রেলিয়ার অর্থানুকূল্যে এমন একটি তৈরী হয়েছিল, জানি না এখনও তা চলছে কিনা। সব রকম চাকুরী করা মায়েদের জন্যই অসংখ্য শিশু পালনাগার প্রয়োজন সারা কলকাতা জুড়ে। নয়ত মন দিয়ে বাইরের কাজ করা মায়ের পক্ষে কঠিন হয়। সর্বক্ষণের জন্য ভৃত্য রাখার সামর্থ্যই বা ক'টি মধ্যবিত্ত মা-বাপের আছে?

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে সত্যিই নারীর মর্যাদা আজ বেড়েছে কিনা এ প্রসঙ্গে একটি অস্বস্তিকর বিতর্ক প্রায়ই ওঠে দেখি। সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে অনেক মেয়ে আজ যে ধরনের আচরণ করেন কিংবা বিজ্ঞাপনে অথবা চলচ্চিত্রে যেভাবে নিজেদের পণ্য করেন, তাতে কি মেয়েদের প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা বাড়ে? এই বিজ্ঞাপন-পরিচালিত যুগে নানা চিত্তহারী বিজ্ঞাপনে নিজের দেহকে নানাভাবে দান করে উপার্জন করেন অনেকে। এসব দেখে মনে হয় আজও বুঝি রমণী-জীবনের চরম সার্থকতা পুরুষের চিত্তহরণ করাতেই। প্রাচীনরা সক্ষোভে প্রশ্ন করেন, এতে কি আধুনিকাদের আত্মসম্মানে লাগে না? এ প্রশ্নের চট করে দু কথায় উত্তর দেওয়া যায় না। তাই বরং ২।৩টি প্রতি-প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হব আপাতত। মেয়েদের জৈব প্রেরণাকে যে সমাজ ব্যবসায়ের মূলধন করে সে সমাজের বিরুদ্ধে কি কিছু বলার নেই? নারীদেহের উপর যেমন বিজ্ঞাপনের ঝোঁক আছে, তেমনি এক উলটো ঝোঁকও কি নেই আর এক শ্রেণীর বিজ্ঞাপনে?—যা দেখে হঠাৎ মনে হয় পুরুষের জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য রমণীর হৃদয়-মন-চক্ষুকে আকর্ষণ করা। তাছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় কুকর্ম যে পুরুষরা করে তাদের জন্য যদি পুরুষ-মাত্রেরই মাথা হেঁট না হয়, তাহলে এই বৈশ্য যুগের প্ররোচনায় কিছু মেয়ে তাঁদের রূপ-যৌবনকে পণ্য করলেই তাতে সমস্ত নারী জাতির লজ্জিত হবার কি আছে জানি না। পুরুষকে বিচার করবার সময় যেমন পুরুষমাত্রকেই পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে দেখি না, একটি বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে দেখি—নারীর বেলায়ও সে অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। যাদের আমরা কম জানি তাদের বেলাতেই ব্যক্তিবিশেষকে গোষ্ঠীর প্রতিভু মনে করে থাকি। প্রত্যেকটি নারীর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, যেমন প্রত্যেকটি পুরুষেরও আছে—আমরা প্রত্যেকে শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যই দায়ী হতে পারি, আর কারুর ব্যবহারের জন্য নয়। যদি গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার ঘর থেকে পথে বেরিয়ে আসা মেয়েরা কিছু অর্জন করে থাকেন, তা হয়তো এই যে এখন আর দূর থেকে আবছা দেখে তাঁদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

মেয়েদের জীবিকার কথা আগেই যখন উঠেছে, তখন তাঁদের আদিমতম ব্যবসা সম্বন্ধেও দু কথা বলা দরকার। আমরা অবশ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছইনি যাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারব যে, সমাজের রীতিনীতি নারীর প্রতি যতই উদার ও সহানুভূতিশীল হোক, অসহায়া সব নারীরই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভরণপোষণের দায়িত্ব যদি রাষ্ট্র নেয়ও তবু মানুষের সমাজ থেকে দেহোপজীবিকা নির্মূল করে দেওয়া যাবেনা কোনোদিন। পশ্চিমের অত্যন্ত ধনী এবং শিথিলতম (permissive society) সমাজেও তো এই বৃত্তিধারিণীদের সংখ্যা কমছে না? আইন করে এই ব্যবসায়কে জনসাধারণের পক্ষে কম বিপজ্জনক কিংবা কম বিরক্তিকর করা যায়, কিন্তু তুলে দেওয়া যায় না। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের এই শহরে এবং শহরতলীতে অবশ্য শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন বেড়েছে, গ্রামীণ সমাজের নীতিবোধ শহরে এসে যত শিথিল হয়েছে, নিসঙ্গ পুরুষের সংখ্য যে পরিমাণে বহুগুণিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবসায়েরও প্রসার হয়েছে। শুধু লাইসেন্স নেওয়া নির্দিষ্ট পাড়াতেই নয়—অন্যত্রও। তবে আমাদের সমাজে, কেন এই বারাঙ্গনারা একাজে এসেছে এ প্রশ্ন করলে, আজও সেই সনাতন উত্তরগুলিই শুনতে হবে। সেই দারিদ্র্য, সেই সংসারের অবিচার, সেই নীতিহীন হৃদয়হীন কোনো পুরুষের টানে ঘর ছাড়া! অর্থাৎ ব্যাপারটা নিতান্তই সোজাসুজি। আমাদের সামাজিক জটিলতা এখনও তত বাড়েনি যে মনোবিজ্ঞানী বারাঙ্গনাদের এই ব্যবসায় গ্রহণ করার কারণ হিসাবে তেমন interesting মনোবিকার খুঁজে পাবেন কিছু। সম্প্রতি কয়েকটি ছোটোখাটো অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে যে এদের অধিকাংশই নিরক্ষরা, চাষীর ঘরের মেয়ে এদের মধ্যে বড় একটি সংখ্যাকে নানা প্রত্যাশা দিয়ে যাকে বলে 'ফুসলিয়া আনা' হয়েছে। আর কেউ কেউ হয়তো শুনে অবাক হবেন যে কুমারী কিংবা বিধবার তুলনায় সধবার সংখ্যা কম নয় এ ব্যবসায়ে। নারী-হিতৈষী কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারের সাহায্যে মাঝে মাঝে এদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে হয়তো। কিন্তু ফল তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হয় না। যে সমাজে নিরপরাধা ধর্ষিতা হতভাগিনীরা ঘর পায় না আজও সে সমাজে বারাঙ্গনারা ঘর পাবে এ কি সম্ভব? আমাদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে জড়িয়ে আছে নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং অবিচারের এমনি এক করুণ কাহিনী। আর এই বিংশ-শতাব্দীর মধ্যকালে সুস্থ মাথায় এই দুর্ভাগিনীদের সৎ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আত্মহত্যা করার জন্য। আজও আমাদের সমাজ "নারীর অপরাধ' বিচারের বেলায় মোটামুটি অগ্নিপরীক্ষার যুগেই রয়ে গেছে।

তবু ভারতের সংবিধান, ভারতের আইন সামনের দিকেই হাঁটছে। তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয় গুটিকয়েক মহানুভব দেশ-নেতাকে। কি ভাগ্য তাঁরা দেশের মানুষের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন! মুসলমান মেয়েরা চিরকালই পৈতৃক সম্পত্তির এবং মায়ের সম্পত্তিরও অধিকারিণী, ভাইয়ের সমান অধিকার না থাকলেও। কিন্তু দায়ভাগ-মিতাক্ষরা-শাসিত সমাজ নারীকে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার দেয়নি। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করে নতুন আইনে মেয়েরাও আজ ছেলেদের মতোই পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকারিণী। অবশ্য আইনকে ফাঁকি দেবার উপায়ও বার হয়ে গেছে। কিন্তু সব সময়ে সেজন্য বাপ-মাকেও দোষী করা যায় না। লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে যে, দেশের যে-অংশ শিক্ষায় সংস্কৃতিকে পিছিয়ে আছে তার তুলনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলকাতা শহরেই কন্যার বিবাহে খরচ উত্তরোত্তর বাড়ছে। পণ নেওয়াও বেআইনী বটে, কিন্তু পণ নেওয়ার ঝোঁক ইদানীং বেড়েছে বই কমেনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগে এই শহরের যুবকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আত্মসম্মানবোধ জেগেছিল। তখন অনেকেই পণ এবং যৌতুক নিতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এখন বহু উচ্চ-শিক্ষিত জামাতাও শ্বশুরের কাছ থেকে পণ নিতে, বিদেশ-যাত্রার খরচ নিতে কিংবা অপরিমিত যৌতুক নিতে লজ্জা পান না। বরং বাড়ি-গাড়ি-ফ্রিজিডেয়ার-রেডিওগ্রামের মূল্যে নিজের মূল্যের পরিমাপ করে শ্বশুর-প্রদত্ত যৌতুককে জাহির করতেও ভালবাসেন দেখি। যৌতুক দেওয়া নেওয়ায় এক অসম্ভব বাড়াবাড়ি, ঘরে ঘরে প্রায় রেষারেষি শুরু হয়েছে মনে হয়। তার চেয়েও যা দুঃখের এবং লজ্জার সে হল এ বিষয়ে কন্যাদের চেতনার অভাব এমনকি লোভও দেখেছি কোনো কোনো পাত্রীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রী পাওয়া মেয়েও তো দেখি অপমানিতা হন না, প্রতিবাদ করেন না তাঁর জন্য পণ দিতে হলে কিংবা অপরিমিত যৌতুক দাবী করলে। তাঁদের আত্মসম্মানে তো লাগেই না বরং যৌতুক যথোপযুক্ত না হলে পিতার কাছে কোনো কোনো কন্যা অনুযোগ জানান এমনও দেখেছি। অতএব একবার বিবাহের সময় সর্বস্বান্ত হয়ে অর্থ ঢালবার পর আবার পিতা ও ভ্রাতা যদি কন্যাকে সম্পত্তিরও অংশ না দিতে চান, তবে দোষ দেওয়া যায় না। তবে যে দেশে নারীকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়ার চেয়ে চিতায় তুলে দেওয়া সহজ মনে হতো সে দেশে যে সমান-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইন হয়েছে এবং আইন মেনেও চলেছেন অনেকে এতো কমখানি উন্নতি নয়!

বিবাহ-বিচ্ছেদের বৈধতা স্বীকার করে সনাতন শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। যা ছিল জন্মজন্মান্তরের বন্ধন তা যদি গলার ফাঁস হয়ে ওঠে তবে তাকে এক জন্মেই ছিন্ন করা যায় আজ। হিন্দু কোড বিল গৃহীত হবার পরই এত বিরাট সংখ্যায় বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য রাজদ্বারে আবেদন এসেছিল এই শহরেই যে তাতে করে একটি সযত্নে-লালিত বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল। এই আইন যখন প্রণীত হচ্ছিল, তখন অনেকেই বলেছেন এবং লিখেছেন যে হিন্দু মেয়েরা যেহেতু স্বামীকে দেবতা এবং বিবাহকে অচ্ছেদ্য জ্ঞান করতে অভ্যস্ত যুগ যুগান্তর হতে, তাই বিবাহ বিচ্ছেদের আইন তো অপ্রয়োজনীয় বটেই তদুপরি এই আইন চালু হয়ে গেলে তাদের সামনে একটা মন্দ পথই খুলে দেওয়া হবে। বছর কুড়ি আগেই এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়েছে যাঁরা ভেবেছিলেন হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় না বলেই শাস্ত্রে এর বিধান নেই তাঁদের বিশ্বাস ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, আবার যাঁরা ভেবেছিলেন, এই কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলে আধুনিকাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ধুম পড়ে যাবে তাঁদেরও ভুল ভেঙেছে। বরং যে অবস্থায় ঘর ভাঙতে না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা তেমন অসহনীয় অবস্থাকে মাথা পেতে নিতে কেউ আর বাধ্য নয়। কিন্তু মুসলমান ও ক্যাথলিক সমাজের মেয়েরা আজও এ ব্যাপারে সুবিচার পান না। অবশ্য এই দুই ধর্মের বিধান মোটেই এক নয়। ক্যাথলিক পুরুষও বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা একাধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিবাহ করতে পারেন না। মুসলমান স্বামী যদি একাধিক বিবাহ করেন এবং কোনো স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহারও করেন, তবু (শাস্ত্র যাই বলুক) সেই মেয়ে নিরুপায়। যদিও অন্যপক্ষে বিনা অপরাধেই, এমনকি ঝোঁকের বশেও স্ত্রীকে ত্যাগ করা সহজ। যদিও বহু মুসলিম দেশেই এই অবিচারের সম্ভাবনাকে আইন করে খর্ব করা হয়েছে, তবু বহু মুসলমানের দেশ এই ভারতবর্ষে এখনও মুসলিম মেয়েরা ও জাতীয় অবিচার মেনে নিতে বাধ্য। হয়তো 'বাংলাদেশের' সৎ প্রভাবে উৎসাহিত হয়ে কলকাতার শিক্ষিতা মুসলিম মেয়েরাও অদূর-ভবিষ্যতে এমনতর দাবী করবেন। দুপক্ষ থেকেই সঙ্গত কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব হলে তবেই নিরঙ্কুশ ও সসম্মান দাম্পত্যেরও সম্ভাবনা বাড়ে। অবশ্য ভাঙা-ঘরের সন্তানরা সমাজের পক্ষে মস্ত এক সমস্যা একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে অসুখী মা-বাপের সঙ্গে বাস করে যে সন্তান সেও কম অসুখী হয় না। আর পৃথিবীতে আজও এমন কোনো বিবাহ-ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি যাতে দম্পতি-মাত্রেই সুখী হবে। তাই সংসার ভাঙবার আইন না থাকলেই এ সব সমস্যাও থাকবে না একথা কেউ বিশ্বাস করেন কি?

আধুনিকা মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার আর এক মস্ত সহায় বিজ্ঞান। অসময়ে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ আজ আর ব্যাহত করতে পারে না। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়ে যে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন অনেকখানি ভারমুক্ত হয়েছে সে বিষয়ে বোধহয় মতান্তর হবে না। ষষ্ঠীর অকৃপণ আশীর্বাদ এক সময় মেয়েদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে জৈবিক চাহিদা মেটাতেই সমস্ত মন সমস্তক্ষণ চলে যেত। এমনকি মাতৃত্বের যে পরমসুন্দর অভিজ্ঞতা তাও প্রায় বিভীষিকা হয়ে উঠতো অনেকের পক্ষে—আজও তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না তা নয়। কিন্তু এ অবস্থাকে ঠেকানো এবং মাতৃত্বকে অত্যন্ত বাঞ্ছিত ও সুখজনক করার উপায় আজ আছে। হয়তো কয়েক শতাব্দী ধরে মেয়েরাও যদি সংসারভারে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে না থাকেন, তাহলে তাঁদেরও সৃষ্টিশীলতার উদ্‌গতি (sublimation) হবে এবং একদিন মেয়েদের মধ্যেও অসামান্য প্রতিভার (genius) এমন অভাব আর থাকবে না।

সৃষ্টিশীল কর্মে কলকাতার মহিলারা গত দুই প্রজন্মে যে যথেষ্ট অভিরুচি ও অভূতপূর্ব উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন এ হয়তো অসংকোচে বলা যায়। কথা সাহিত্যে, কাব্যে তাঁদের একটি বিশিষ্ট দান আছে এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মে এই মেয়েলি ছাপ থাকায় অধিকাংশ মহিলা লেখিকা হয়তো লজ্জিত নন যদিও কেউ কেউ হয়তো "মহিলা-লেখিকা" বলে উল্লেখিত হতেও অপমানিতা বোধ করেন। বিজ্ঞানে যদিও মহিলারা সম্প্রতি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তবু মননধর্মী সাহিত্যে মহিলারা খুব কিছু আজও দিতে পারেননি, চার প্রজন্মকাল কলেজী শিক্ষার মধ্যে থেকেও। অবশ্য সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে পিছিয়ে না থাকলেও কলকাতার পুরুষ সমাজই বা এমনকি ভুরি ভুরি মননধর্মী, সাহিত্য রচনা করে যাচ্ছেন?

সম্প্রতিকালে কলকাতার মঞ্চে, কলকাতার চলচ্চিত্রে যে সব মহিলারা খ্যাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অর্জন করেছেন, গর্ব করে বলা যায় যে তাঁরা অধিকাংশই রূপ্ আর জৌলুষ-সর্বস্ব নন। শিল্পবোধ, অভিনয়-কুশলতা আর আঙ্গিক নিষ্ঠা নিশ্চয়ই কলকাতার অভিনেত্রী সমাজকে একটি শীর্ষস্থানের অধিকার দিয়েছে। চলচ্চিত্র-পরিচালনাতেও মহিলারা শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের অন্য রাজ্যে আজও বাঙালীর সুনাম আছে কলা সচেতনতার জন্য। কলকাতায় চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, ছবি ইত্যাদি নিয়ে যা মাতামাতি হয় মহিলারা তার নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। নৃত্যের কোনো যুগাগত ঐতিহ্য না থাকলেও এই পঞ্চাশ বছরে কলকাতার ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্যের রুচি ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত শান্তিনিকেতনের প্রভাবে। এই ব্যাপারে সারা ভারতবর্ষেরই আদর্শ হয়েছিলেন কলকাতার মেয়েরা। ছবি আঁকায়, মূর্তি গড়ায় এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় না দিলেও ঐ শিল্পেও মহিলারা বিরল নন। তবে শান্তিনিকেতনের প্রভাবেই আবার মহিলা-জনোচিত কিছু শিল্পকর্ম প্রথমত কলকাতায় এবং কলকাতার আদর্শে পরে সারা ভারতেই প্রসার পেয়েছে। এই সব প্রসঙ্গে নাম উল্লেখে বিরত রইলাম, নয়ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ একটি নামাবলী হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া মহিলাবিশেষের কৃতিত্বের চেয়েও পঞ্চাশ বছরে এই শহরের নারী সমাজের বিবর্তনই আমার বিচার্য।

উপসংহারে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। ইংরিজি শিক্ষা বনাম সংস্কৃত শিক্ষা অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন না প্রাচ্যশিক্ষার প্রসার এই নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক জমে উঠেছিল প্রায় দেড়শ বছর আগের কলকাতায় তার একটি মূল প্রশ্ন ছিল উল্লিখিত কোন্ শিক্ষাধারাটি আমাদের সমাজকে সনাতন ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং ব্যক্তি মানুষকে উন্মূল করবে না। তারপর যখন মেয়েদের পশ্চিমী ধারায় শিক্ষা দেবার চেষ্টা হলো তখন স্বভাবতই এই দুর্ভাবনাটা আরও প্রবল হলো। জুতো পায়ে ইস্কুল-কলেজে গিয়ে এবং দু পাতা ইংরিজি পড়ে মেয়েরা যে মেমসাহেব হয়ে উঠবে, ("বিবিজান চলে যান লবেজান করে"), দেবদ্বিজে ভক্তি গুরুজনের সেবা, সংসার ধর্ম পালন করা, স্বামীর প্রতি বাধ্যতা সবই ভুলে যাবে এ বিষয়ে অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন এবং নারী শিক্ষার প্রবক্তারাও যে সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন তা নয়। এ শহরে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হবার পর একশ বছরেরও বেশি পার হয়ে গেছে। কলকাতার মেয়েরা যে সাধারণভাবে বিশেষ উন্মূল হননি একথায় নিশ্চয়ই কেউ তেমন আপত্তি করবেন না, শুধু সেই দু একজন ছাড়া যাঁরা আজও প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, হিন্দু-ললনারা স্বেচ্ছায় সাগ্রহে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতেন। ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে তুলনা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এই শহরের মেয়েদের মূল ভারতীয়তায় আজও যথেষ্ট প্রোথিত রয়েছে। এমনকি বহিরঙ্গে যাঁদের তীব্র পশ্চিমী ছাপ, মাঝে মাঝে দেখে প্রায় হতাশ লাগে যে তেমন মেয়েরাও মানৎ করেন, তাগাতাবিজ বাঁধেন, সাবেককালের না হলেও নব্য ধাঁচের গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। অর্থাৎ মনে মনে ঠাকুরমার মনের সঙ্গে মিল প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশিই আছে।

ভারতীয়,সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য হলো বিজাতীয় প্রভাবকে আত্মসাৎ করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধার ক্ষইয়ে দেওয়া। আর এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবত ভারতীয় মেয়েদের চরিত্রে পুরুষদের চেয়েও, বেশি। কলকাতার সৃষ্টিকাল থেকে বিদেশী প্রভাব খুব প্রবলভাবে পড়েছে এই শহরের মানুষের জীবনে। তার ফলে কলকাতার স্ত্রী-পুরুষ অনেকে এক সময়ে টাল সামলাতে না পেরে একটু টলোমলো হয়েছিলেন হয়তো। কিন্তু শিক্ষা যত বাহির থেকে অন্তরে প্রবেশ করেছে, ততই তাঁরা স্ব-সমাজের ঐতিহ্যেও আত্মস্থ হয়েছেন। তাছাড়া এই শতাব্দীর গোড়া থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুবাতাসও বইছিল। এতদিন পরে যুগের হাওয়ায় আজ যদি বা এই শহরের পুরুষ সমাজের কেউ কেই বিবিক্ত সত্তার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছেন মহিলাদের মধ্যে সে ধরণের allenation-এর বোধ বলতে গেলে দুর্লভ। হয়তো মহিলাদের স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতাই আছে এর মূলে, তাছাড়া আছে স্ব সংস্কৃতিতে আস্থা—কিংবা আস্থার চেয়েও কিছু বেশি, প্রায় গর্ব। তাই বিলিতিয়ানা যে কালে ভারতবর্ষের আর সব বড় বড় শহরের মেয়েদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, তখনও কলকাতার মেয়েরা পোষাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, বিশ্বাসে-ভাবনায় তাঁদের ভারতীয়তা মোটামুটি বজায় রাখতে পেরেছেন। ব্যতিক্রম যা আছে তা নগণ্য।

পুরনো ধরণের পরিবার হয়তো ভেঙে গেছে তবু সেই পারিবারিক দায়দায়িত্ব আধুনিকারাও ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি পেয়ে, উপার্জনক্ষম হয়েও বিবাহের ব্যাপারে পিতামাতার নির্দেশ বিনাদ্বিধায় মেনে যাঁরা নিতে পারেন, তাঁদের সংখ্যা কম নয়, শতকরা পঁচাত্তরজন আধুনিকাই এ ব্যাপারে অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য প্রণয়জ বিবাহ এবং অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের সংখ্যা বাড়ছে। তবে সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে উপার্জনক্ষম কন্যা যদি জ্যেষ্ঠাসন্তান হন এবং সাংসারিক দায়িত্ব গ্রহণ করার দরকার হয়, তাহলে অনেক সময়েই ছোট ভাইবোনেরা মানুষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকেন। এমনটা পাশ্চাত্য সমাজে নিশ্চয়ই বিরল। সনাতন মূল্যবোধ কিছুটা অবশিষ্ট না থাকলে এই আত্মত্যাগ হয়তো আর সম্ভব হতো না। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েরা যদি কিছুটা সচেতন থাকেন, তাহলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য শিল্পায়ণ এদেশে আমদানী করা সত্ত্বেও ঐ সমাজের কতগুলি দুঃখ-জনক সামাজিক পরিস্থিতির পুনরাবর্তন হয়তো সময়ে ঠেকাতে পারবেন। বৃদ্ধ মা-বাপ সম্বন্ধে সনাতন সহিষ্ণুতার কিছুটা চর্চা করা, বৃদ্ধ বলেই সমাজ থেকে বাতিল না করে দেওয়া, সংসারে তাঁদের ঠাঁই দেওয়া—এসব ব্যাপারে আধুনিকারা যদি সনাতন মূল্যবোধ ধরে রাখেন, তাহলে হয়তে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনিশ্চয়তা, অতঃপর বিষণ্ণতায় ভুগবেন না।

যাই হোক সনাতন ঐতিহ্যে ও আধুনিক শিক্ষায় গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা শক্ত মাটিই এবং সমসাময়িক যুগের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও নিজেদের স্থৈর্য এবং মহিমা একেবারে হারাননি।

আনন্দবাজার পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৭৮, পৃঃ ১৭৩-৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সরলা দেবী

হিশেব ক'রে মনে হয় গত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকেই 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি সভার খবর ছিল! "মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়াচাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ যুবকের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা—ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভূজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।"

এই "দশভূজা" সম্বন্ধে বিপিন পাল 'Young India'-তে টিপ্পনী কেটেছিলেন —"As necessity is the mother of invention; Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal."

উক্ত বঙ্গললনাটির জন্ম জোড়াসাঁকোর "ভিতরের তেতলার একটি রোদে ফাটা কাঠের ঘরে", কোনো এক "ললিতা সপ্তমী তিথিতে"। তবে ললিতা সপ্তমী তিথির এই জাতিকা কী ক'রে "বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল"-এর লেখিকা এবং বীরাষ্টমী ব্রতের প্রতিষ্ঠাত্রী হয়ে উঠলেন সেকথা ভাবছিলাম। স্পষ্ট কোনো কারণ দর্শাতে না পারলেও মনে হয় তাঁর স্মৃতিচারণের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি থেকে কিছু হদিশ পাওয়া যাবে।

"ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মায়ের কোলছাড়া হয়ে জোড়াসাঁকোর শিশুরা এক একটি দুগ্ধদাত্রী দাই ও এক একটি পর্যবেক্ষণকারিণী পরিচারিকার হস্তে ন্যস্ত হতো, মায়ের সঙ্গে তাদের আর কোন সম্পর্ক থাকত না। আমারও রইল না। ...আমাদের মা (স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথের ন-দিদি) অগম্য রাণীর মত দূরে দূরে থাকতেন। ...মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি। মাসিদের ধাতেও এসব ছিল না। শুনেছি কর্তা-দিদিমার (রবীন্দ্রনাথের মা) কাছ থেকেই তাঁরা এই ঔদাসীন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। বড় মান্‌ষের মেয়েদের এই ছিল বনেদী পেট্রিশিয়ন চাল।"

"দিদি (হিরণ্ময়ী দেবী, ১৮৭০) প্রথম সন্তান ব'লে মা বাবার আদুরে মেয়ে, দাদা (জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, ১৮৭১) প্রথম পুত্র বলে আদুরে, আমি আর একটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়ে মাত্র। তাই বৈদিক ঋষিকুমার শুনঃশেফের মত আমার জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পৃষ্ঠপটে একটা অনাদরের পর্দা টানা। ...শাসনে শাসনেই গড়ে উঠেছি আমি, আদরে স্নেহে নয়।”

“বাড়ি ভিতরের অঞ্চলে আমার অভিভাবিকা মঙ্গলা দাসী, বাইরের অঞ্চলে অভিভাবক সতীশ পণ্ডিত—দুই-ই প্রহারমূর্তি। মঙ্গলা দাসীর ছিল হাতের মার সতীশ পণ্ডিতের ছিল রুলের মার। ...এই দুই...আগুনের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হত।”

তদুপরি সন্তান সম্বন্ধে প্রায় নির্মমরূপে উদাসীনা “মায়ের ঘরে এক প্রকাণ্ড পালঙ্ক। সেই পালঙ্কের উপর মাসি, মামী ও দিদিদের প্রায় নিত্যই মধ্যাহ্ন থেকে গড়ান পার্টি জমত। তাস খেলার অবসরে কাঁচা সরষে তেল মাখা টাটকা মুড়ি, ফুলুরি ও বেগুনির রসাস্বাদন, বর্ষা হলে সাঁৎলাভাজি—এই ছিল পার্টির মূল প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে কোনো কোনো দিন একটু বৈচিত্র্য ঢোকান হত গানে বা মায়ের রচিত কবিতা আবৃত্তিতে। আমরা তিনটি ভাই বোন ঘুরে ফিরে সেখানে ফস করে এক একবার হাজির হতুম—যদি এক মুঠো মুড়ি বা এক আধটা ফুলুরি ভুলে আমাদের মুখে কেউ পুরে দেয়। কিন্তু আমরা তাঁদের গ্রাহ্যের মধ্যেই বড় একটা আসতুম না, বেশিক্ষণ দাঁড়াবার হুকুমও ছিল না, চকিতেই সরে পড়তে হত।’...

“এই পালঙ্ক সম্মিলনী দেখে আমার মনে মনে একটা ধারণা বসে গিয়েছিল পালঙ্কই হল প্রত্যেক মায়ের স্বাভাবিক বসবার জায়গা। মায়েরা কখনো মাটিতে বসে না।”

এতৎসত্ত্বেও নিজেই আবার বলেছেন, “মায়ের আদরে অভিমানে তুলতুলে হইনি, নিজের প্রতি অনুকম্পায় কাতরহৃদয় হইনি, নিজেটাকে ভুলেই শক্ত সমর্থমনা হয়ে মানুষ হয়েছি।” অবশ্য “নিজেটাকে ভুলে” যেতে পেরেছিলেন যে তাঁর আত্মজীবনী থেকে তার সমর্থন তত না মিললেও একথা স্পষ্টই চোখে পড়ে যে মানুষটি শক্ত ও সমর্থমনা হয়ে উঠেছিলেন একশ' বছর আগে জন্মান একটি মেয়ের পক্ষে একেবারেই অভাবিত রকম। বৈধব্যকালে তাঁর প্রৌঢ় বয়সের একটি আলোক চিত্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হলো এমন ঠোঁট, নাক আর চোখের চাউনি বীরাঙ্গনাকেই মানায় বটে। এমন কি যৌবনের সেই গলায় মুক্তোর সাতনরী এবং এলায়িত কুন্তলে মুক্তোর মালা পরা মহিলাটির ভাবে ভঙ্গিতে মোহিনী নারী নয়, “শক্ত সমর্থমনা” নেত্রীটির ছাঁদ পরিষ্কার।

সাধে কি এই নাতনিটির জন্য দেবেন্দ্রনাথ অমন চমৎকার বিবাহের প্রস্তাব এনেছিলেন? বেথুন কলেজ থেকে সতেরো বছর বয়সে বি এ পাশ করবার পর সংস্কৃত-তে এম এ পড়তে শুরু ক'রেও পড়া আর হলো না, তখন সরলা দেবীর রোখ চাপলো চাকরি ক'রে স্বাধীন হবেন। মহীশূরে মহারানী গার্লস স্কুলে একটি চাকরির খবর মিললো। কিন্তু যদিও তখন যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লজ্জায় অপমানে সঙ্গছাড়া করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির বধূ গভর্মেন্ট হাউসের পার্টিতে গিয়ে, যদিও বাড়ির সাবেককালের ভৃত্যদের চোখে জল এসেছিল যখন সেই বধূ বিলেত যাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্য দেউড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে গাড়িতে গিয়ে চড়েছিলেন, এবং যদিও মায়ের তীব্র আপত্তি ("তুই কি শেষে মেয়েদের নিয়ে মেমদের মতো গড়ের মাঠে ব্যাড়াতে যাবি নাকি?") সত্ত্বেও শুধু লুকিয়ে বেড়াতে নয়, পার্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে পাশাপাশি ঘোড়ায় বধূকে সওয়ার ক'রে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন ঠাকুরবাড়ির ছেলে—তবু ঘরের মেয়ে চাকরি করতে যাবে একথাটা বড়ো বিসদৃশ ঠেকেছিল প্রায় সবারই কানে। মেজোমামা সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর "মাকে বাবামশায়কে (জানকীনাথ ঘোষাল) বিরক্ত করে করে অবশেষে বাবুমশায়ের সক্রোধ সম্মতি পেলুম। বাকী রইল কর্তা দাদামশায়কে জানান, তাঁর সম্মতি নেওয়া।" দেবেন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি, শুধু জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী (সরলা দেবীর বড় মাসিমা) মারফৎ জানালেন, "সরলা যদি অঙ্গীকার করে জীবনে কখনো বিয়ে করবে না, তাহলে আমি তার তলোয়ারের সঙ্গে বিয়ে দিই যাবার আগে।" এই বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের জবরদস্তি তাঁর ভুবনবিখ্যাত ছেলেটিও অগ্রাহ্য করতে পারেননি। কিন্তু নাতনিটি কানেই তুললেন না এ পরামর্শ। চ'লে গেলেন মহীশূর, সাতারা থেকে মহীশূর পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ গেলেন সঙ্গে। পরে নাকি এক কৌতূহলী ছাত্রী সরলা দেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাকে যে uncle পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তিনি matricide না patricide?"

খুব বেশিদিন এই চাকরি করা হয়নি তাঁর, নানা কারণেই। ম্যালেরিয়াও একটা কারণ। তবে ঐ অল্পদিনেই সংস্কৃত চর্চা এবং বেহালা চর্চা জ'মে উঠেছিল। তাছাড়া শিখতে শুরু করলেন রুদ্রবীণা ; বীণকার আচার্যের সঙ্গে সংস্কৃত ছাড়া আর বাক্যালাপের মাধ্যম ছিল না। কলকাতায় থাকতে পিয়ানোয় একদিন মুনলাইট সোনাটা শুনিয়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্রকে মুগ্ধ করেছিলেন "মরি! মরি! কি সুন্দর।" এবার হাত দিলেন রুদ্রবীণায় আর মহীশূরী বেহালায় "য়ুরোপীয় বেহালা বাজানোর ধরণ এবং মহীশূরী বেহালা বাজানোর ধরণে অনেক তফাৎ। কলকাতায় প্রফেসার মাঞ্জাতা নামে জনৈক ইতালীয়ানের কাছে কিছুদিন বেহালা শিখেছিলাম।" কিন্তু অল্পদিন পরেই ম্যালেরিয়া সারাতে কলকাতায় ফিরলে সবাই জিজ্ঞেস করলেন, "কি চাকরীর শখ মিটল, স্বাধীন হবার শখ মিটল?" সরলাদেবীর মতে "চাকরীর শখ মিটেছিল বটে কিন্তু স্বাধীন হবার শখ মেটেনি। শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার শখ ব্যাপক হয়ে জাতি ও দেশগত স্বাধীনতার শখের রূপ নিলে। শখ আর শখমাত্র রইল না, cause-এর আকার ধারণ করলে।"

এই "cause" তাঁকে টেনে নিয়ে গেল শক্তির সাধনায়। যদিও ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে অর্থ দিয়ে অস্ত্র শিক্ষার জন্য ওস্তাদ পাঠিয়ে সাহায্য করেছিলেন, নিজে কিন্তু গুপ্ত সমিতির দিকে ঝুঁকলেন না। স্থাপন করলেন রাখী বাঁধার দল। ভারতবর্ষের মানচিত্রকে প্রণাম ক'রে, সরলা দেবীর হাত থেকে রাখী প'রে, দলের সভ্যরা শপথ নিলেন, ভারতের সেবা করবেন। এইবার তাঁর রুদ্রবীণা শেখা হাতে রচিত হ'লো শক্তির পূজা। কুস্তি তলোয়ার বক্সিং শিক্ষা দেওয়া হ'তে লাগলো ছেলেদের। মনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাখা ভালো যে সমসাময়িক ইংলন্ডে তখন নারীমুক্তির আন্দোলন চলছে, ভোটের অধিকার দাবি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মহিলাটি কিন্তু পুরুষকে পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন। এর জন্য একটি বাঙালি হীরো দরকার ছিল। অতএব প্রতাপাদিত্যকে ঘ'ষে-মেজে দাঁড় করালেন সরলা দেবী। 'বৌ ঠাকুরাণীর হাটে' যে-প্রতাপাদিত্যকে সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, স্পষ্টতই তেমন ব্যক্তি যুবমনের নায়ক হ'তে পারেন না। এই নিয়ে দীনেশ সেন মারফৎ মামা-ভাগ্নীতে নাকি একটু বিতর্কও হয়েছিল। তবে সরলা দেবীর ক্ষোভ মিটিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য, এবং তাঁর দেখাদেখি অমর দত্তের প্রতাপাদিত্য। সরলাদেবীর এই বীরপূজার প্রবর্তন দেখে সুরেন বাঁড়ুজ্যের 'Bengalee' নাকি লিখেছিল, "সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন surprise spring করছেন—আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়, অতঃকিম?" অন্তত কয়েকটি surprise বেশ জমজমাট হয়েছিল মনে হয়। জনৈক হিন্দুস্থানী জমিদারের কাছ থেকে চেয়ে আনা হীরা জহরতের হাণ্ডিলওয়ালা একটি তলোয়ারের পূজার 'আয়োজন হয়েছিল এলবার্ট হল ভাড়া ক'রে। ব্যাপার যখন বেশ খানিকটা গড়ালো তখন রাজদ্রোহাত্মক কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে সহযোগী উদ্যোক্তারা নাকি কেউ কেউ ভঙ্গ দিয়েছিলেন, এমন কি এলবার্ট হলের পরিচালকরাও পেছপাও হ'য়ে ভাড়ার টাকা ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সরলা দেবী কি পিছু হটবার পাত্রী? এলবার্ট হলের পরিচালকদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের জন্য মামলা করবেন বলে শাসালেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পুজোটা কাছাকাছিই কোনো মাড়োয়ারির থিয়েটার ভাড়া ক'রেই সারা হ'লো। খুব ধুমধাম হয়েছিল। মাড়োয়ারি নাকি ভাড়ার টাকা পেয়ে বলেছিলেন, "আপনারা তলোয়ার পূজা করেন, নাচেন, কুঁদেন—সে আপনারা জানেন। আমার কি?"...বাঙালির বীরত্ব চর্চায় দেখা যাচ্ছে চিরকালই অভিনবত্ব ছিল, দু-বছর আগেও আর একবার আমাদের সে কথা মনে হয়েছিল।

আবার সরলা দেবীর বীরাষ্টমী ব্রত ও বীরত্ব চর্চা এক এলাহি কাণ্ড। ব্রতের জন্য স্তোত্র রচনা করেছিলেন, প্রসিদ্ধ স্বদেশী আশুতোষ ঘোষ:

"বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলি দদাম্যহম্
বঙ্গাধিপং মহাশৌর্যং প্রতাপাদিত্য বীরেশম্..." ইত্যাদি।

সংস্কৃত স্তোত্র আওড়ে ব্রত উদযাপন হ'লেও সেই সঙ্গেই বীর যুবকদের স্বহস্তে পুরস্কার দেবার জন্য আমন্ত্রিত হ'য়ে এলেন মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের একজন মহিলা। লেসের পর্দা ঘেরা সভামঞ্চ থেকে হাত বাড়িয়ে তিনি উপহার দিলেন—ছোরা তলোয়ার লাঠি, আর বীরাষ্টমী পদক, যার একদিকে লেখা "বীরোভব", অন্যদিকে "দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"।

কিপলিঙ বাঙালীকে কোনো এক গল্পে "বাঙালি গিদ্দর" (বাঙালি শেয়াল) আখ্যা দেওয়াতে সরলা দেবী যে তাঁকে একখানি ওজস্বিনী পত্র লিখেছিলেন সে কথা কি আজ আর কেউ জানেন? সেই পত্রে ছিল "আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছো সে কলঙ্ক ঘোচানোর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভাইদের একজন কারও সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক, যে কোনো অস্ত্রে তুমি ইচ্ছা করো, নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও। আজ হ'তে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।" জনৈক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ইতিমধ্যে পাঁচ বছরে তিনিও বাঙালি ছেলেদের অস্ত্রচর্চার পারদর্শী ক'রে তোলায় মন দিলেন। গৎকা আর তলোয়ার চালানোয় সিদ্ধহস্ত জনৈক মুসলমান ওস্তাদ প্রফেসর মার্তাজাকে (মুর্তাজা?) নিয়ে এলেন ছেলেদের গুরু ক'রে। তবে পাঁচ বছর পর কিপলিঙ এই দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন ব'লে তো আমরা শুনিনি।

ছেলেদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই ব্রাহ্মিকা অবশেষে জাপানি শিল্পীর আঁকা এক কালীর ছবি প্রতিষ্ঠা করলেন ক্লাব ঘরে। বরোদার মহারাজাকে সেই ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সরলা দেবী। মহারাজা ছবির দিকে এক নজর দেখে সরলা দেবীর দিকেই সোজাসুজি তাকিয়ে বলেছিলেন "কোন্ কালী দেখবো? এই কালী না ঐ কালী!" এই জাতীয় উক্তি ডঃ মহেন্দ্র সরকার নিবেদিতার বক্তৃতা শুনেও নাকি করেছিলেন। "এতোদিন কালো কালী ছিল, তাই রক্ষে। এ শাদা-কালী এসে দাঁড়ালে এ দেশকে পৌত্তলিকতা থেকে আর বাঁচানো যাবে না।"

কিন্তু শুধু বাঙালি ছেলেদের মানুষ ক'রেই তাঁর উৎসাহ অবসিত হয়নি। "বাঙলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্শে এসে আমার স্বদেশপ্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল।' তাই 'সখি সমিতি', 'বিধবাশ্রমে' মন উঠল না—এবার মন গেল 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল', 'ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন' গ'ড়ে তোলায়, পাঞ্জাবের আর্যসমাজী আন্দোলনের সঙ্গে বাঙলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের যোগ সাধনে। তাছাড়া জাতীয় কংগ্রেসে তো তাঁর গৌরবময় ভূমিকা ছিলই। কংগ্রেসের কোনো এক অধিবেশনের জন্যই তো রচনা করেছিলেন ঃ

"অতীত গৌরব বাহিনী মর্মবাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান।
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান।"

[যখন তিনি "চিনি গো চিনি তোমার ওগো বিদেশিনী" কিংবা "হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও" গানগুলিতে সুর দিচ্ছিলেন সেই দিনগুলি মনে হয় কতো দূর। কবি মাতুলটি তাঁর এই বিরাট কর্মযজ্ঞ থেকে দূরে দূরেই ছিলেন বলে মনে হয়]। এবার তিনি কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার কোর গ'ড়ে তুলে তাদের সারা বছর drill ও discipline শেখবার প্রস্তাব করলেন।

ক্রমে একদিন তাঁর এই আত্মনিয়ন্ত্রণের আগ্রহ, স্বাধীনতার সাধনা ভারতের সীমা ছাড়িয়ে গেল। ঠাকুরবাড়ির অনেকেই তখন প্রিন্স ওকাকুরা কাকুজোর গুণমুগ্ধ বন্ধু। তিনি এসে বলেছেন "Asia is one" এবং এশিয়ার মুক্তির পথ "Victory from within or death from without."। ফলে রুশ জাপানের যুদ্ধ বাধলে জাপানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্য বাঙালিদের একটি রেডক্রস গড়ার রাসনা হ'লো সরলা দেবীর। অনেকেই টাকা দিয়ে এবং সেবা দিয়ে সাহায্য করতে চাইলেন। "দেখলুম দেশে প্রাণের অভাব নেই, খালি জ্বালিয়ে দেবার দেশলাই কাঠি একটি চাই।" তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি নাকি সেন্ট জন্‌স অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েসন-এর ট্রেনিং নিতে যাননি, "তাদের ক্লাস শুধু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিতেই ভরা"। এই দেশলাই কাঠিটি বেশ কিছু বাঙালি ছেলেকে তো উদ্দীপ্ত ক'রে ট্রেনিং নেওয়ায় লাগিয়ে দিলেন, জাপান পাঠাবেন বলে, কিন্তু এদিকে জাপানি গভর্নমেন্ট ইস্তাহার দিলেন "বহু জাতি আমাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ ক'রে আহতদের সেবার জন্য স্ব স্ব রেডক্রস-সেবকদের পাঠাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে জানানো হচ্ছে যে এই সাহায্য প্রস্তাবের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু এস্থলে কোনো বিদেশীর সাহায্য গ্রহণে আমরা পরাঙ্মুখ"। দেখা যাচ্ছে প্রিন্স ওকাকুরার বাণী "এশিয়া ইজ ওয়ান" তখনও জাপান সরকারের রাজনীতি-দর্শনকে প্রভাবিত করেনি। পরে সরলা দেবী বলেছিলেন, "আজ দেখি 'এসিয়া এক' এই বুলিটির ভিতর এক দারুণ গুলি লুকিয়ে রেখেছিল, সেটি সুযোগ মত বেরিয়ে পড়ে তামাম এসিয়াকে বিব্রত করে তুলবে, সেটি হচ্ছে জাপানের অধীনতায়। হোক না এ লৌহপাশ এসিয়াটিক স্যাকরার হাতে গড়া স্বদেশী জিনিষ।"

তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি নানা কাজের ঘূর্ণিপাকে কোথা দিয়ে যে চ'লে যাচ্ছিল। এক হাতে 'ভারতী' সম্পাদনা করছেন, অন্য হাতে 'লক্ষ্মী ভাণ্ডার' 'স্বদেশী স্টোরস' চালাচ্ছেন। এর মধ্যে হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে আহ্বান এলো তাঁর পরবর্তী বিলেত যাত্রার সঙ্গিনী হবার জন্য—"মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনাবার জন্য।" কিন্তু "আমার নিজের অপ্রস্তুততা, সঙ্কোচ এবং অভিভাবকদের অমত (আশ্চর্য!) এই দুই-ই প্রবলভাবে বাধা দিলো। নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি চ'লে গেলেন। সেই তাঁর বাণী-বাহিনী হল।" তবে কয়েক বৎসর পর মায়াবতীতে উপনিষদ চর্চা করতে যাওয়ার সময় অভিভাবকরা নিশ্চয়ই বাদ সাধেননি, কিন্তু মায়ের অসুখ জানিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনেই বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁরা। অবশ্য এহেন বীরাঙ্গনার বর কলকাতা "বদ্ধোমান কি কনু জনশন" থেকে এলে মানাবে কেন? তাই এলেন ভারতীয় শৌর্যের পীঠস্থান পাঞ্জাব থেকে—তবে "বীরের বেশে" নয়। পাগড়িটি মাথায় আছে বটে কিন্তু সযত্ন-লালিত অভিজাত সন্তান ব'লেই মনে হয় ছবি দেখে।

বিবাহ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল লাহোরের আর্য সমাজীদের মধ্যে। ১৯২৩ সালে স্বামীর মৃত্যু হ'লো। একমাত্র পুত্রকে নিয়ে আবার কলকাতা ফিরে এলেন শেষ জীবন কাটাবার জন্য। কিন্তু দেশের জল-হাওয়ার গুণে ক্রমে অধ্যাত্ম জীবনের দিকেই ঝোঁক গেল তাঁর। আচার্য শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার কাছে দীক্ষা নিয়ে গুরুপদে মন দিলেন! এ কেমন আত্মখণ্ডন?

আজ যখন কাসিয়াবাগান বস্তিতে মেয়েদের শেলাই ক্লাস দেখতে যাবো তখন মনে পড়বে এই কাসিয়াবাগানেই অস্ত্রশিক্ষার ক্লাব করেছিলেন, তিনি নিজে হাজিরা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খাতা নিয়ে হাজির থাকতেন ছেলেদের "যথাসাময়িকতা—punctuality" শেখাবেন ব'লে। এই আধ মাইলের মধ্যেই ৬০।৭০ বছর আগেকার ঐ মহীয়সী মহিলাটি নানা কর্মের পরিকল্পনা নিয়ে আত্মীয়-বন্ধুদের খেপিয়ে বেড়িয়েছেন। কাসিয়াবাগান, ২৬ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ৬ নম্বর সানি পার্ক, ঝাউতলা, ১৯ নম্বর স্টোর রোড (এখন বিড়লাদের বালিকা বিদ্যালয়), ১৪ নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, ১ নম্বর ব্রাইট স্ট্রীট, ৪ নম্বর থিয়েটার রোড, ৪৯ নম্বর পার্ক স্ট্রীট—সবই আজ আর-পাঁচটি ঠিকানার মতোই সাধারণ হ'য়ে গেছে, পরে গ'ড়ে ওঠা অসংখ্য বাড়ির ভিড়ে প্রায়-অদৃশ্য হ'য়ে পড়েছে ; শুধু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটিতে মিউজিয়াম এবং মেয়ে ইস্কুল হয়ে সামান্যতার ধূলা লাগেনি। তবে সরলা দেবী হঠাৎ ক'রে এলে তাঁদের ঐ শত স্মৃতি জড়ানো মামাবাড়িটাও বোধহয় চিনতে পারবেন না।

কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃঃ ৩৮-৪৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়টি তার প্রতিষ্ঠাত্রীকে ভোলেনি, নানা উপলক্ষে আজও নিবেদিতার ঋণ স্বীকার করে থাকে দেখি। কিন্তু মধ্য কলকাতার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের কজন শিক্ষিকা না ছাত্রী এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী সম্বন্ধে অবহিত জানতে কৌতূহল হয়। রোকেয়া ২১ বছর ধরে তাঁর সবটুকু অর্থ এবং সবটুকু বিত্ত দিয়ে লালন করেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়টিকেই এবং এর জোয়াল কাঁধে নিয়ে অসময়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। সাহিত্য চর্চাও তিনি করেছেন বটে, অবসর সময়ে কিন্তু সেই সাহিত্য অকপটভাবে সমাজসেবী সাহিত্য। আর এই সমাজসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাঁর ঐ বিদ্যালয়।

নিবেদিতার অকালমৃত্যু আর রোকেয়ার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দুয়েরই তারিখ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ। নেহাৎই দুটি ঘটনার সমাপতন কিন্তু তবু লক্ষণীয়। সুলতানস ড্রিম এর লেখিকা মিসেস আর এস হোসেন কখনও নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন কিনা তা জানা নেই, তবে নিবেদিতার কার্যকলাপ বিষয়ে এই জাগ্রতচেতন মহিলা ভাগলপুরে বা বিহারের ছোটখাটো শহরে বসেও যে অবহিত ছিলেন সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ আইরিশ অগ্নিশিখার কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই এই বঙ্গললনার কলমের আঁচড়ে।—মানকুমারী বসুর অশ্রুসিক্ত কাব্য একদিন বঙ্গীয়া পাঠিকাদের প্রাণের বস্তু ছিল।

> কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব
> আর কিছু নাহি পারি
> ক ফোঁটা নয়নবারি
> ভগিনী! তোদেরি তরে
> বিজনে ঢালিব।”

পড়ে রোকেয়া মন্তব্য করেছিলেন ঃ আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল কাঁদিয়া মরিতে ব্যয় করিলেন, ব্যস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়াই তো আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি!

তিনি কাঁদবার পাত্রী নন, বরং তার হাতের কলম যেন বিদ্রোহের ঝাণ্ডা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন!...বুক ঠুকিয়া বল সব! আমরা পশু নই। বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই বল কন্যে! আমরা জড়াউ অলঙ্কাররূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল আমরা মানুষ। আর কার্যতঃ দেখাও যে আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক।" অথবা রোকেয়ার সেই ঘোষণা যা পুরুষ সমাজকে তখন বড়ো ক্রুদ্ধ করেছিল "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব।"

তাঁর প্রথম বই মতীচূর। মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এই গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন 'সমাজ সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা।' কলমকে তিনি কখনও কখনও চাবুকের মতন ব্যবহার করেছেন হয়তো ঠিকই। তা ছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধেরও আগে এমন সব কথা বলতে পেরেছেন যা বলতে বা লিখতে আজও খুব কম মুসলমানেরই সাহসে কুলোয়। যাঁহারা স্বীয় পরগম্বরের নামে কিংবা ভগ্ন মসজিদের একখণ্ড ইষ্টকের অবমাননায় প্রাণদানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন?" ...আহা মহম্মদীয় আইন পুস্তকের মসিরেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে।" কিন্তু এ জাতীয় মন্তব্য করেছেন বলেই তাঁকে প্রহরণধারিণী সংহাররূপিণী মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। তিনি আঘাত দিয়ে জড়তা কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন স্ব সমাজের বিবেককে ধর্মচেতনাকে জাগাবার চেষ্টায়।

তবু তাঁর কীর্তির বিচার করে আজ আর কারুর এত বড় মিথ্যাভাষণের সাহস কি হবে 'তদ্দারা সমাজের কোনো ক্ষতি বা অভাবপূরণ হয়নি? তিনি নিজেই বলেছিলেন বটে যে "সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে" তবু এই একটি মহিলা তাঁর প্রায় একক প্রয়াসে বাঙালী মুসলমানের অন্তঃপুরে আধুনিক শিক্ষার আলো যতখানি পৌঁছে দিয়েছেন তেমনটা এই একশো বছরে আর কেউ করেননি। বেদনায় কাতর হয়ে যদি তিনি বলে থাকেন—"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন"—তবে আজ নিশ্চয়ই অনেকেই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন এবং তাঁর অসম সৎসাহসে বিস্ময় বোধ না করে পারবেন না।

তবু মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে তিনি কখনোই চিন্তায় বা আচরণে ভারসাম্য হারাননি। স্পষ্ট ভাষায় একথাও বলেছেন, "পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। ...আমাদের উচিত যে তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি।" মার পুরুষবিদ্বেষী তিনি হবেন কি করে? তাঁর অগ্রজ এবং তাঁর স্বামীই তো হাতে করে গড়েছেন তাঁকে। ইংরেজি উর্দু এবং বাংলায় ঘরে বসেই সেই সুশিক্ষা তাঁকে দিতে পেরেছিলেন যার ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র সাহসী মনের সৃষ্টি হয়েছিল। সমবয়সী হিন্দুকন্যাদের মতন বেথুন কলেজে যাবার সুযোগ তাঁর হয়নি। তবু তাঁর ইংরেজি রচনায় ইংরেজ বন্ধুও সংশোধনের প্রয়োজন দেখেন নি। আর কী স্বামীই না তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন! স্বামী তাঁর সম্পত্তির একটি বড় অংশ স্ত্রীশিক্ষার জন্য তাঁর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

আবার ধর্মের অপজাত্য বিষয়ে তাঁর ক্ষোভ, আক্রোশ, বিদ্রূপ যতই কেন না তীব্র হয়ে প্রকাশ পাক, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তবু ধর্ম সম্বন্ধে এমন স্বচ্ছ যুক্তিবাদী দৃষ্টি যে-কোনো সমাজে আজও দুর্লভ। এ্যানি বেসান্টের "ইসলাম" বিষয়ে বক্তৃতা সযত্নে অনুবাদ করেছিলেন—"নুর-ইসলাম।" হজরত মহম্মদের জীবন ও উপদেশকে এ্যানি বেসান্ট আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করেছিলেন বলেই তাঁর বক্তৃতায় রোকেয়া মোহিত হয়েছিলেন। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি সব বিষয়েই রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত আধুনিক, যদিও জন্মেছিলেন ঠিক একশো বছর আগে এবং বেশ রক্ষণশীল একটি পরিবারে যেখানে বাংলা পাঠে কন্যার চারিত্রিক অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হতো।

তাঁর যুক্তিবাদী মনের একটি পরিচয় দিই তাঁর রচনা থেকেই—"পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বর প্রেরিত কিনা, তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। যদি ঈশ্বর কোনো দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এশিয়ার সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইওরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর।

এই মহিলার চিন্তার স্বতন্ত্র কত দূর ছিল তার আর এক প্রমাণ মিস মেয়োর মাদার ইন্ডিয়া বিষয়ে তাঁর মন্তব্য। গান্ধী রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সবাই যে বইকে ড্রেন ইনসপেকটের-এর রিপোর্ট বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন সেই বই সম্বন্ধে রোকেয়ার বক্তব্য বোধ হয় নারী সমাজেরই বক্তব্য কারণ মিস মেয়ো ভারতীয় মেয়েদের দুর্দশা বিষয়ে যা বলেছিলেন সে কি নিতান্ত মিথ্যা কথা? রোকেয়া লিখেছিলেন—"এ দেশীয় কর্তারা বলেন, ভারত মাতা পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই। ...ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পরতা ১০ কোটি পুরুষ তো আছেই। সে ঢাকে কাঠি ঠুকিবার জন্য মিস মেয়োর দরকার কি? মিস মেয়োর প্রয়োজন সেই কথা কহিতে যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলে নাই—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ কুড়ি বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে নাই—আজ মিস মেয়োর গর্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে।"

রোকেয়ার কলম ছিল জোরালো কিন্তু এ ঠিক শিল্পীর কলম নয়। উচিত কথা নির্দ্বিধায় ঋজু ভাষায় বলার সাহস তাঁর ছিল এবং অনেক সময়ই তাঁর গুরুভার বক্তব্য কিংবা নিষ্ঠুর বিদ্রূপেও পরিহাসের সুর লেগে গদ্য হয়েছে সরস। আবার যদিও তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাদীক্ষা অনেকখানিই উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের মারফৎ তবু তাঁর বাংলা ঈর্ষণীয়ভাবে সবল এবং সরল। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। সে সময়ে বাঙালী মুসলমান সমাজ নিজের মুখের ভাষা বিষয়ে গভীর হীনম্মন্যতায় ভুগতেন এবং সভ্য বলে পরিচিত হবার জন্য যেন তেন প্রকারে উর্দু লবজ আওড়াতেন। অথচ ঠিক ঐ যুগেই রোকেয়া তাঁর দিদির প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাঁর 'মতীচুর' দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গপত্রে যেহেতু দিদিই তাঁকে বাংলা শিখিয়ে ছিলেন এবং উর্দু ভাষায় পরিবৃত থাকার সময়েও বাংলা চর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। আবার রোকেয়ার স্বতোৎসারিত বাংলা রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে আরবী ফারসী শব্দের খুব ছড়াছড়ি নেই, আবার যেখানে আছে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই আছে। কোনো কৃত্রিম ঢেউয়ের ঠেলায় তাঁর ভাষা বানচাল হয়নি। রোকেয়ার সাহিত্যিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে ১৩৩৬ সালে আবদুল ওদুদ লিখেছিলেন "শুধু মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে নয়, গোটা বাংলার নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে মিসেস আর এস হোসেনের স্থান অতি উচ্চে—সর্বোচ্চ কিনা তা এখনও বলতে পারছি না, কিন্তু সময় সময় তাই মনে হয়। এমন একটা মার্জিত অথচ প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত বাংলাদেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও সুপ্রাপ্যও নয়।" তাঁর সাহিত্য-কীর্তির অসম্মান না করেও বোধ হয় বলা অসঙ্গত হবে না যে এই দীপ্তিময়ী মহিলার প্রতিভা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে যত না প্রকাশ পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, সমাজকে ঢেলে সাজাবার আগ্রহে। সমাজচেতনা ও সাহসে তাঁর জুড়ি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে সরলা দেবী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় নেই। তাঁর পরিচয় রয়েছে চিত্রাঙ্গদার—

> পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
> সে নহি নহি,
> হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
> সে নহি নহি।
> যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে, সম্মতি
> দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
> পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৪।৫।১৯৮০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তা দেবী চিরকালের আধুনিকা

রবীন্দ্রনাথ একবার জনৈকা আধুনিকাকে মৃদু তিরস্কার করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'আধুনিকা ছিল না কো হেনকাল ছিল না।' জন্মসূত্রে যে পরিবেশ পেয়েছিলেন শান্তা দেবী সীতা দেবী তাতে ভাবনাচিন্তায় ও কাজে আধুনিক না হওয়াই তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল। তার ওপর আবার জন্মসূত্রেই যে প্রতিভার উত্তরাধিকার তাঁদের মধ্যে বর্তেছিল তার জোরে রবীন্দ্রনাথের অবশিষ্ট উক্তিটিও তাঁরা অনায়াসেই দাবি করতে পারেন

'কখনো দিয়েছে দেখা হেন প্রভাশালিনী।
শুধু একালিনী নয়, যারা চিরকালিনী।'

সীতা শান্তা নাম দুটি বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্যাম-দেশীয় যমজের মতন দেখা দিয়েছিল এক নান্দনিক মাধুর্য নিয়ে। আর কিছু না হোক অন্তত হিন্দুস্থানী উপকথার দৌলতেই এই একজোড়া নাম আগামী শতাব্দীর শিশুদের দরবারেও পৌঁছে যাবে। অবশ্য ১৯১৮ সালে 'উদ্যানলতা' উপন্যাসের লেখিকা হিসাবে "সংযুক্তা দেবী" নামের আড়ালে এই দুই সহোদরা তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাবনায় ও আত্মপ্রকাশে এই দুজনের যতই কেন মাধুর্য থাকুক না, এঁরা মানুষ হিসেবে স্পষ্টতই দুজন খুব ভিন্ন ধরনের ছিলেন, বিশিষ্ট চারিত্র্যমণ্ডিত দুটি পৃথক ব্যক্তি সত্তা। তাই এঁদের একজনের বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই অপরের উল্লেখ যেমন অপরিহার্য তেমনি আবার দুজনের সম্বন্ধে এক যাত্রায় সব কথা বলে ফেলাও অসম্ভব। কিন্তু একটা কথা দুজনের সম্বন্ধেই সমান জোর দিয়ে বলা যায় যে এই লেখিকা দুটির বিস্মৃতপ্রায় রচনাগুলি যদি আমরা আর একবার ঝেড়ে বেছে তুলে লুপ্তির গ্রাস থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি তবে বাংলা সাহিত্যের কিছু চিরন্তন সম্পদ রক্ষা পাবে।

আপাতত শান্তা দেবীর কিছু রচনার উল্লেখ করি যার মূল্য সমসাময়িক কালেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সম্প্রতি প্রবাসীর কিছু কাটাকাটা প্রাচীন সংখ্যায় শান্তা দেবীর কয়েকটি প্রবন্ধ পড়লাম। প্রবন্ধের বিষয় বিতর্কিত এবং এই বিতর্কের আজো অবসান হয়নি। শান্তা দেবীর নিজের ভাষাই পেশ করি ঃ "মুক্ত মন, জাগ্রত দৃষ্টি ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিজ প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব জাতির অর্দ্ধাংশেরই কি কেবল এই লক্ষ্য লাভ করা দরকার?" মানবজাতির বঞ্চিত

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপরার্দ্ধের পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করেছিলেন শান্তা দেবী ১৩৩০ সালে প্রবাসীতে লেখা একটি প্রবন্ধের উপসংহারে। না, বরং বলা উচিত এক জোড়া প্রবন্ধের, ওই বৎসরেই পৌষ আর মাঘ মাসে প্রকাশিত। নামঃ "নারী সমস্যা।" এই নামকরণ বিষয়েও লেখিকার মন্তব্য উপভোগ্য ঃ "জগতের সকল রকম জ্ঞানলাভের, সকল নির্মল আনন্দ উপভোগের, সর্বদেশ ভ্রমণের ও প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, নিজ জীবনের সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, শুনিতে পাই, অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরই যদি 'মানুষ' শব্দের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে আমরা যাহা শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রে এই প্রকার লোকেদের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর বিবাহ ও বৈধবের কথা উঠিলেই ইহাদের অধিকাংশের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই 'নর সমস্যা' বলিয়া যদিও কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই, তবু 'নারী সমস্যা'র কথা শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।"

১৯২৩ সালেই ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এই লেখিকা নাকি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন নারী সমস্যার কথা শুনতে শুনতে। তার পরেও তাঁর জীবিতকালের আরো ৬১ বছর ধরে অবিশ্রান্ত চলেছে এই সমস্যার আলোচনা বিশ্বজুড়ে। ইতিমধ্যে সমস্যাটার চেহারাও হয়তো পালটেছে কিছুটা কিন্তু পৃথিবীর বিরাট অংশে এর একটা কাজ চলা গোছের সমাধান আজও দূর অস্ত। হয়তো চিরদিনই তাই থাকবে, অতএব এই বিতর্কেরও শেষ হবে না, যতই কেন তা শ্রান্তিকর ঠেকুক। আমরা যারা জন্মাবধি পুরুষের তুল্য সমানাধিকার পেয়ে এসেছি এবং সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী অংশের যারা মানুষ সেই আমাদের কাছে নারী সমস্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি সব সময়ে ভালো লাগে না সত্যিই। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত Feminist নই এবং আমার কাছে বঞ্চিত অসহায় মানুষদের তালিকায় সর্ব প্রথমেই মহিলারা আসেন না। কিন্তু প্রতি তুলনায় শান্তাদেবীর সমসাময়িক কালের ছবিটা যখন তাঁর লেখার মারফৎ আর একবার মনে পড়ে যায় তখন স্বীকার না করে পারি না যে কলম হাতে করে সম্মুখ সমরে নামা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। আজ যখন অলিতে গলিতে বি-এ, এম-এ পাস করা মেয়েদের ছড়াছড়ি তখন কি সব সময়ে খেয়াল থাকে যে বেথুন ইস্কুলের ছাত্রী হওয়াটাই এককালে কী দুঃসাহসের ও বিদ্রুপের বিষয় ছিল! সেই কালটা খুব দূরবর্তী কাল নয়, আমাদেরই মায়েদের বাল্যকাল এবং বিদ্রূপ মাঝে মাঝে শালীনতা ভব্যতার সব সীমা ছাড়িয়ে যেত।

শান্তাদেবী নারী সমস্যার সমসাময়িক ও চিরন্তন দুটি দিকই বেশ শক্ত হাতে ধরেছিলেন। সমসাময়িক কালের যে আপত্তিগুলি বিতর্কে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল প্রথমে তার উল্লেখ করবো। বেথুন স্কুল কলেজে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা যে তখন গৃহে ও সমাজে কী সর্বনাশা বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাই নিয়ে সনাতন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পন্থী প্রতিপক্ষ বেশ সরব হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরে শান্তাদেবী লিখেছিলেন, "কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক পত্রে প্রায় প্রতি মাসেই এইরূপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাণপূর্ণ প্রবন্ধাদি দেখা যাইতেছে। লেখক-লেখিকার রচনা দেখিয়ে বোধহয়, আমাদের দেশে বুঝিবা অন্তত দু'চার লাখ মেয়েই হাতা বেড়ি ফেলিয়া শামলা মাথায় দিয়া উকিল ব্যারিস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বসিয়াছেন, কম করিয়া ১০/১৫ হাজার অন্তঃপুরিকা হয়তো বুট ও বনেট পরিয়া রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী স্কুল কলেজে মেয়ে আর ধরে না, অফিসে আদালতে মহিলা কর্মচারীর ভিড়ে হাঁটা চলা দুস্কর এবং ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত শিশুপাল দিবারাত্রি মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক-লেখিকারা দেশের এই ঘোর দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য দুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। কিন্তু হায়রে বিড়ম্বনা। এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের মুষ্টিমেয় বালিকার 'বোধোদয়' ও 'স্টেপ বাই স্টেপ'-এর বিরুদ্ধে এ বিরাট অভিযান কেন?"

"স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, যৌবনবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এই সকল লেখক-লেখিকার আহার নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে।'

রক্ষণশীলদের সেই বিরাট অভিযান যে ব্যর্থ হয়েছে তাতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আজ আমরা। ওই বুট আর বনেটটুকু বাদ দিলে সনাতনীদের কাল্পনিক বিভিষিকার বাকিটা এই ষাট বছরেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে, শুধু এই মহানগরে নয়, ছোট ছোট মফঃস্বল শহরেও। তাঁরা যে আশঙ্কা করেছিলেন 'এই চাকুরী সমস্যার দিনে শিক্ষিতা রমণীরা পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া সমস্যা জটিলতর করিবেন' তাকে শান্তাদেবী তখন অযথা ভয় বলে মনে করেছিলেন কিন্তু কার্যত দেখা গেল এই প্রজন্মকালের মধ্যেই ভয়টা সত্য হয়ে উঠলো—দেশবিভাগ তার একটা মস্তবড় কারণ যা তাঁরা কেউই তখন কল্পনা করতে পারেননি। সে যাইহোক প্রতিপক্ষের ভয়কে বিদ্রূপ করে স্ত্রী স্বাধীনতার যে ভয়াবহ ছবি শান্তাদেবী এঁকেছিলেন দেখা গেল উভয় পক্ষকেই অপ্রস্তুত করে দিয়ে সেই বিভীষিকাই এখন বাস্তব হয়েছে কিন্তু যত বড় সর্বনাশের আশঙ্কা সনাতনীরা করেছিলেন ততবড় হয়নি দেশের, কিংবা সনাতনীরা দলে কমে গিয়ে আজ এমন কোণঠাসা হয়ে গিয়েছেন যে সেদিনের মতন সরবে ধিক্কার দেবার সাহসই আর তাঁদের নেই। এক দেশবিভাগেই স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, যৌবনে বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে যত বিরূপতা ছিল সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বটে কিন্তু 'নারীসমস্যা' একটা রয়েই গেছে। তার চেহারা বদল হয়েছে মাত্র।

নানা সামাজিক অর্থ-নৈতিক চাপে স্ত্রীশিক্ষা আজ একটি স্বীকৃত চাহিদা—সমাজের যে স্তরে খাওয়া পরার চাহিদা মেটে না সে স্তরে শিক্ষার চাহিদাও মেটে না ঠিকই তবে আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের ক্ষতি করে একথা মনে মনে যাঁরা ভাবেন ভাবুন, খুব সংকীর্ণ অশিক্ষিত মানুষ ছাড়া কেউ মুখ ফুটে বলতে সাহস করেন না আর। স্ত্রী স্বাধীনতার কুফল নিয়ে এখনও মাঝে মধ্যে কথা ওঠে ঠিকই। তবে চিরকাল স্বাধীনতা পেয়েও তার অপব্যবহার আর উচ্ছৃঙ্খলতার আকর্ষণ বহু পুরুষ মানুষ যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এখনও সংবরণ করতে না পেরে থাকেন তবে অতি সম্প্রতি অর্জিত স্ত্রী স্বাধীনতার কোনো অপব্যবহার হবে না এটাই বা কি করে আশা করা যায়? স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে শান্তাদেবীর একটি মন্তব্য লক্ষ্য করুন "একটা বিদেশী জাতি আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে কি না দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয় আমরা বলি, আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্দুকের মোহর যে কৃপা করিয়া উহারা না দিলে আমরা পাইব না। অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমরা সর্বদাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি 'তাইত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিৎ?' স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন না যে তাহার জীবন সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন কিনা।"

বাল্যবিবাহের সমস্যাটা অবশ্য জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির মতোই আমাদের পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ সমাজের দেশজোড়া অশিক্ষা আর কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আলাদা করে ওটাকে উপড়ে ফেলা সহজ নয়। তবু শহুরে মানুষের দেখাদেখি গ্রামের মানুষেরাও, অন্তত পশ্চিমবাংলায়, কন্যার বিবাহের বয়স আগের চেয়ে অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাল্যবিবাহ যত কমেছে বাল্যবিধবার সংখ্যাও ততই কমেছে। বিদ্যাসাগরের কালেও এই সমস্যাটা প্রধানত উচ্চবর্ণেরই সমস্যা ছিল। নিম্নবর্ণে বিধবার বিবাহ সেকালেও অনেকটা ছিল, একালেও আছে। উচ্চবর্ণের মেয়েরা যেহেতু আজ অনেকেই পড়াশোনা করছে আগের মতন অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ বা বৈধব্য ঘটছে না তাই এই সমস্যাটা আর বিরাট সামাজিক আকার নিচ্ছে না, নেহাৎই ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে থাকছে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে। হিন্দুরমণীর জন্ম-জন্মান্তরের বিবাহবন্ধন আজ অবলীলায় আলিপুর কোর্টে জজসাহেবের এক রায়েই কেটে দেওয়া যাচ্ছে। তাই পুনর্বিবাহ, সে বিধবারই হোক বা ডিভোর্সিরই হোক, কিছু স্বল্পস্থায়ী মুখরোচক পরচর্চার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় না।

অথচ এই সমস্যাগুলিই তখন কী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করত। খড়্গহস্ত রক্ষণশীলরা আধুনিক আধুনিকাদের প্রতি যে বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতেন তার ঠিকমতন মোকাবেলা করার জন্য শান্তাদেবীর মতন আধুনিকাদেরই দরকার ছিল। লেখিকার যুক্তি, তথ্য আর সুরুচিসম্পন্ন সরস উপহাস উদ্ধৃতিযোগ্য "আধুনিক লেখক-লেখিকাদের কাহারও কাহারও ধারণা যে যতদিন হিন্দু নারীর অক্ষর পরিচয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজি অক্ষর পরিচয়, না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা প্রত্যেকে একাধারে সতীলক্ষ্মী সীতাসাবিত্রী পদ্মিনী অহল্যাবাঈ লক্ষ্মীবাঈ হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করেন ; কিন্তু যে মুহূর্তে এ বি সি ডি-র সাক্ষাৎ পান, অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়া 'সখের মেম সাহেব' হইয়া ওঠেন। আশ্চর্য, যে হিন্দু নারী কতশত রাবণ দুর্যোধনের প্রলোভন এড়াইয়া কর্তব্যপথে অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্ঝা ঝড়েও 'প্রাতে অঙ্গণে গোবর ছড়া' দিতে বিরত হন না, যে হিন্দু নারী পুরুষকে অঞ্চল চাপা না দিয়া 'জাগাইয়া চেতন করিয়া দিতেছেন', যে হিন্দু নারী শত শত 'শয়তানের শয়তানী পদ্মিনীর মতো পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন', সে হিন্দু নারী 'অবরোধ প্রথা' 'বিবাহ বিবাহ' প্রভৃতি বাজে চিন্তার দিকে ঘৃণাভরেও মন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেন নাই, সেই হিন্দু নারীই সামান্য দুইখানা বর্ণপরিচয় ও ইংরেজি প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্তব্য ভুলিয়া কুপথের পঙ্কিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন। শুধু তাহাই নহে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যাঁহারা শতশত রাবণ দুর্যোধনমর্দিনা, দৈনিক পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় তাহাদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষণ্ডের হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যে বঙ্গনারী সেবাপরিচর্যায় পুরুষের 'সকল জ্বালা যন্ত্রণা' জুড়াইয়া দিতেছেন, আদমসুমারির রিপোর্টে দেখা যায় তাহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নির্মম হাতে স্বামীপুত্রকে তুলিয়া দিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। আদর্শ মাতা বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর দুইটি নয়, দশটি নয়, ৫০/৬০ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশু যমালয়ে যাইতেছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেই বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক মৃত্যু কেবল মায়ের দোষেই হয় না ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা ধাত্রী থাকিলে এবং মাতা ও তাঁহার সম্পর্কীয়া মহিলারা সূতিকাগার ও শিশুপালন সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা হইলে অনেক শিশুর মৃত্যু নিবারণ করা যাইত।" "মাসিক পত্রে দেখিতে পাই 'ভীরু পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ লইলে, হিন্দু নারী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া' তাহাকে জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়েছে! কিন্তু খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্ছিত জাতভাইকে ফেলিয়া সহস্র পুরুষ যখন উর্দ্ধশ্বাসে নারীর অঞ্চলের শরণ লইতে দৌড় দেন, তখন কয়জন নারী তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা গুণ্ডার ছোরার ভয়ে রাস্তার দুই ধারের পুরুষ যখন দরজায় হুড়কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া স্বামীপুত্রকে বিপন্নের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। হিন্দু নারী নাকি 'কখনও অন্যায় ও ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারে নাই', তাই আহারে বিহারে কথায় কাজে হাঁটিতে চলিতে পুরুষদের 'নিষ্ঠাবত্তার' আর অন্ত নাই।...কর্মপ্রাণ কত ধুরন্ধর যে কলিকাতার স্থান-বিশেষে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভূভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারাই বা কে ঠিকানা রাখে? দেবী নাম দেয়া কত হিন্দু নারী যে শাশুড়ি, ননদ ও স্বামী প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ লইতেছেন, তাহাও প্রতিদিনের দৈনিক পত্রিকার ফাইল ঘাঁটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে 'যেসব পদ্মিনীরা শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেন' বলিয়া মাসিক পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, আজকাল খবরের কাগজে দেখি তাঁহারা পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিংবা স্বামীকে চরিতার্থ করিবার সদুদ্দেশ্যে যখন তখন কেরোসিন গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ৩৫৫০টি রমণী বাংলাদেশে আত্মহত্যা করিয়াছে। 'অবরোধপ্রথা'-ও নাকি আমাদের মধ্যে নাই, তাহা 'পূর্বে মুসলমান নবাব বাদশার হারেমে ছিল।' 'অসূর্যস্পশ্যারূপা', 'অন্তঃপুরিকা' প্রভৃতি কথাগুলি তাহা হইলে আরবী কি ফারসী! তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের মুখ না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে গাড়ি ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এরূপ স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনা কোন দেশের? পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, সূতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে ভুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া পরলোক যাত্রা করে কাহারা?...

'বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় গৌরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ দ্বারা তাহা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।"

এমন চমৎকার তেজী লেখা যে, সরাসরি তার আস্বাদ আপনাদের দিতে না পারলে ভালো লাগত না। এ জাতীয় অসংখ্য রচনা প্রাচীন মাসিক পত্রের পাতা থেকে তুলে এনে সংকলন করা হবে কিনা জানি না, তাই কীটের পাকস্থলীতে চিরকালের মতন তা জীর্ণ হবার আগে আমাদের পাতে আরো কিছু তুলে আনি। আধুনিক শিক্ষাবস্থার সংক্ষিপ্ত সুন্দর একটি পরিকল্পনা পরিবেশন করার সময় সনাতনপন্থী শিক্ষাকে আঘাত করতে ছাড়েননি ...লেখকের মতে বেথুন কলেজের শিক্ষার পরিবর্তে মহাকালী পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালী পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, উহা যে প্রশংসার যোগ্য তাহা অবশ্যই উহাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু মহাকালী পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহা যে কেন ভূতলে স্বর্গ না আনিয়া অকালে স্বর্গযাত্রা করিতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহারাই জানেন। লেখক একজন মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীর শিবপুজা, শাশুড়ি ভক্তি ও অন্নপূর্ণাত্বের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বেথুন কলেজের শিক্ষিতাকে পাঠককে 'কল্পনা' করিয়া লইতে বলিয়াছেন। বাস্তবকে যে 'কল্পনার চক্ষে' দেখিয়া সমালোচনা করিতে হয় তাহা আমরা ইতিপূর্বে জানিতাম না। লেখকের কল্পিতা বধু প্রথম তাঁহার কল্পলোকে প্রবেশ করিলেন বুট ও বনেট পরিয়া, তাহার পর অশুচি হস্তে পূজার সামগ্রী ছুঁইয়া ও আরো অনেক অঘটন ঘটাইয়া শাশুড়িকে খানসামা করিয়া লেখকের মস্তিষ্ক-রঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত করিলেন। শাশুড়িকে খানসামা করিতে যদিও কোনো শিক্ষিতাকে দেখি নাই তবু ধরা যাক শাশুড়ি, পুত্র ও পুত্রবধূকে পরিবেশন করিয়া কোথাও খাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতিপুত্রকন্যাকে খাওয়ানোটা চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে করেন, পথের কাঙালকেও রাঁধিয়া খাওয়ানো তাঁহার কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারা বধূ এমন কি অপরাধ করিল যে, তাহাকে যত্ন করিয়া পরিবেশন করিয়া খাইতে দিলেই শাশুড়ির সম্ভ্রমের হানি হইবে? বেথুন কলেজের শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেট কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, বুট ও দুই চারিটা দুগ্ধপোষ্য বালিকা ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই।...বাংলাদেশই ভারতবর্ষের সবটা নয়, বাঙালি হিন্দুই একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অন্য অনেক প্রদেশের হিন্দু মহিলাদিগকে চামড়ার জুতা পরিতে দেখিয়াছি। বাঙালি হিন্দু পুরুষেরা তো ঠনঠনে তালতলার চটির পরিবর্তে বুট পরেন। তাহাতে তো হিন্দুত্ব লোপ পায় না।'...

"বেথুন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রন্ধন করিতে দেখিয়াছি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এবং একজনেরও হিস্টিরিয়া আমি দেখি নাই। কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্ত্রী লোকেরও হিস্টিরিয়া হয়।...বাজে কথার উত্তর না দিয়া স্ত্রী শিক্ষার সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা আছে।"

তাঁর এই অনেক কথা অল্প পরিসরের মধ্যেও এমন সুন্দর গুছিয়ে বলেছেন যে সর্বকালের স্ত্রীশিক্ষার জন্যই এর একটা স্থায়ীমূল্য আছে। আজও মেয়েদের Vocational guidance দেবার সময় এগুলি মনে রাখা অত্যন্ত দরকার। রচনার এই অংশটাই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং এর একটা স্থায়ী মূল্য রয়েছে। আজকের দিনেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম বা Curriculum স্থির করার সময় লেখিকার ব্যবহারিক পরামর্শগুলি কাজে লাগবে। কি ধরনের শিক্ষা মেয়েদের অত্যন্ত প্রয়োজন তার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই সনাতনীদের একটি দাবি মেনে নিয়ে বলছেন, "এমন কি গৃহই স্ত্রীলোকের সমস্ত জীবনের একমাত্র কেন্দ্র যদি তাহলে এই গৃহধর্ম পালন করিতে হইলে কি কি বিদ্যা জানা উচিত তাহা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক।" "রমণীদের কাজ সংসার পরিচালনায় স্বামীকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করা, সন্তানদের গড়িয়া তোলা ও জীবনযুদ্ধের উপযোগী করা, বৃদ্ধবৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়দের পরিচর্যা করা, তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর মত কাব্যসাহিত্য চর্চা করা" ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি কাজের জন্যই যে বিজ্ঞান সম্মত প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং-এর প্রয়োজন সেই কথাটিই ধৈর্য ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন লেখিকা।

মহিলাদের গার্হস্থ ভূমিকাকেই প্রধান স্থান দিয়ে এবং সেই ভূমিকাকে অহরহ কত চিন্তা, পরিশ্রম ও যত্ন দিয়ে পালন করতে হয় তার বিশদ বর্ণনা করে অবশেষে মৃদু কণ্ঠে স্মরণ করিয়া দিয়েছেন যে "সংসার ধর্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবসর থাকে। এই অবসর কালটা নিজের ও পরিবার পরিজনের পক্ষে সুখকর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জ্ঞান থাকা স্ত্রী-লোকের দরকার। যে পরিবারে অর্থাভাব আছে সেখানে অবসর কালে অর্থকরী বিদ্যার চর্চাই বুদ্ধির কাজ।" তাছাড়া বেশ সাবধানেই একথাও বলেছেন যে "বিবাহের পূর্বে এবং সন্তানসন্ততি বড় হইয়া গেলে মেয়েরা যদি গৃহের বাহিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন কি দেশ ও সমাজ হিতকর কাজ করেন তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত বেশি হইবে।' গার্হস্থ পরিবেশে স্বনিযুক্ত অর্থকরী কাজ কি কি করা যায়, ঘরের বাইরে কোন্ কোন্ কাজে পুরুষের সহকর্মী হয়ে তার ভাব লাঘব করা যায় এবং শিক্ষকতা ও নার্সিং ছাড়াও একালে আরো কত অসংখ্য কাজের পক্ষে মেয়েরা বিশেষভাবে উপযুক্ত—এ সব কথাই লেখিকা ভেবেছেন, এসব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং আগ্রহী নারী পুরুষকে পথ দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে গৃহে ও সমাজে কর্মবিভাগ, শ্রমবিভাগের প্রয়োজন অবশ্যই আছে তবু অধিকাংশ কাজই এমন যে তাকে পুরুষালি বা মেয়েলি বলে চিহ্নিত করে দেওয়া যায় না। মেয়েদের কোন্ কাজের অধিকার দেওয়া সঙ্গত হবে বা হবে না সে তর্কের উত্তরে এমন কথাও বলেছেন, 'মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অনুসারেই যদি তাহাকে অধিকার দিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয় তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে নির্বোধ পুরুষের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে অধিকার দান করা চলে।'

শেষকালে এসেছে সেই বহু উচ্চারিত প্রসঙ্গ আজ পর্যন্ত "নারী পুরুষের মতো উচ্চদরের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতি ক্ষীণপ্রভ এবং সংখ্যায়ও এই সকল নারী ওই জাতীয় পুরুষদের অপেক্ষা অনেক কম।" এই যুক্তিশরে যেহেতু আজও মহিলারা ঘায়েল হয়ে থাকেন তাই এর জবাবে শান্তা দেবী যা যা বলেছেন সেগুলি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার।

প্রথমতঃ "সমগ্র পুরুষ জাতি ধরিয়া যদি বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মানুষের তুলনায় জগতের সর্বদেশে ও সর্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভাবান মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।...অথচ মানুষের সৃষ্টিকাল হইতে পুরুষ শিক্ষার ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন। নারীর সেরূপ এবং ততটা সুযোগ আগে তো পানই নাই, এখনও পাইতেছেন না।...সর্বাধিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাবান ও অমরকীর্তিমান পুরুষের সংখ্যা যদি এতো কম হয়, তাহা হইলে সুযোগহীনা নারীর অমরকীর্তি না-থাকাটা লজ্জার দুঃখের বা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নারীর অমরকীর্তি আছে।" "সুতরাং, একজন অহল্যাবাই, একজন ঝান্সীর রাণী কি একজন জোয়ান অব আর্ক অথবা একজন ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই।"

শান্তা দেবীর দ্বিতীয় উত্তর "জগতে মুষ্টিমেয় মহামানব লইয়াই মানুষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ যে মহামণীষার কীর্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মতো এক একবার এক এক স্থানে জ্বালিয়া দিয়া যান, তাহাকে সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহায্যে নিত্য ব্যবহারের বস্তু করিয়া তুলেন।" "নারীর যদি সৃজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশে তো সে সাহায্য করিতে পারে। সুর শিক্ষার ফলে নারী যদি সুর সৃষ্টি করিতে না পারে, তবু কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তো দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান রাজ্যে কোনো নূতন আবিষ্কার যদি নারী নাই করিতে পারে তবু ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ সংসারের বহু কার্যসিদ্ধি তো সে করিতে পারে।"

লেখিকার তৃতীয় উত্তর 'সচরাচর একটি তর্ক শোনা যায়, যে, গৃহের বাহিরের কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে তো উঠতেই পারে না, এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। রাজনীতিক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।" "বহির্জগতের কোনো কর্মক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না, ইহা বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না।" (এখানে জনান্তিকে বলা যায় যে গোল্‌ডা মায়ার ইন্দিরা গান্ধী ও মার্গারেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থ্যাচারের আবির্ভাবের পর পুরুষরা আর বোধহয় এক্ষেত্রে একাধিপত্যের দাবি করবেন না!)। যাইহোক শান্তাদেবী স্বল্পকাল পূর্বেকার প্রথম মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'সমগ্র ইয়োরোপ জুড়িয়া যে সর্বগ্রাসী সমরানল কয় বৎসর পূর্বে জ্বলিয়াছিল, তখন ঘর সংসার পুত্রকন্যা স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলকে ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চা ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূরে ঠেলিয়া,—এক কথায় সভ্যজগতের সমস্ত দায়িত্ব ও জ্ঞানানুশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ ও শক্তিমান পুরুষ মাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্বনাশী অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথা কি শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন না? কিন্তু সমস্ত পুরুষশক্তির এই নির্মম অবহেলার ফলে ইয়োরোপের বৃদ্ধবৃদ্ধা শিশু ও নারীগণ কি জহরব্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া বিরহ-বেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল?...বর্তমান ইয়োরোপের চলতি ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট মহাদেশের জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল ইয়োরোপের নারীরা তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়াছিল, বস্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছিল, নিরানন্দের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। বাণিজ্য ব্যবসায় আপিস আদালত যানবাহন, কলকব্জা, চিকিৎসা সেবা, দেনা পাওনা, কাগজপত্র, হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধানই তাহারা করিয়াছিল।...ব্রিটিশ এ্যাডজুটান্ট জেনারেল টু দি ফোর্সেজ বলিয়াছিলেন, 'প্রায় সকল কার্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।'...'প্রথম প্রচেষ্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা পুরুষদের প্রবর্তিত পথে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। হইতে পারে, এই পথ চলার ব্যাপারে কোনোদিন তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন রকম পথ আবিষ্কার করিবেন, যে পথের শেষে তাঁহারা হয়তো এমন সকল সৌন্দর্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন যাহা পুরুষোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অর্জিত বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নূতনত্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন নাই, এবং সেজন্যই তাহা অমূল্য হইবে।' এই উত্তরের শেষাংটিতে অভিনবত্ব আছে স্বীকার করতেই হবে।

চতুর্থ উত্তরটিও ভালো 'শৃঙ্খলিত দেহমনে স্ত্রীলোক যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার অপেক্ষা বেশি দেওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহার মানসিক শক্তি ও প্রতিভাকে পূর্বে যেখানে কেবল সংসার রচনায় লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ অন্য কাজে দিতে পারিবেন।' এখনও তো বেশির ভাগ দেশেই মহিলাদের এই উদ্বৃত্ত শক্তিকে নানা ক্ষেত্রে নিয়োগ করার মতন যথেষ্ট সুযোগই সৃষ্টি হয়নি, তাই এই নিয়োগ থেকে যে সুফল ফলতে পারে তাঁকে গোলায় তুলবার সময় এখনও আসেনি, বলাই বাহুল্য।

আমি লেখিকার রচনায় ক্রমবিন্যাস খানিকটা ভেঙ্গে তাঁর শেষ উত্তরটি এবার পেশ করি। মহিলাদের প্রতিভা বুদ্ধি ও শক্তি এখন পর্যন্ত যে ক্ষেত্রে অবারিত উৎসারের সুযোগ পেয়েছে সেখানে তাদের সিদ্ধি যে পুরুষের সিদ্ধিকে ছাড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে সে কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন লেখিকা 'মাতৃস্নেহ জগতে যতখানি আদর্শ স্থানে পৌঁছাইতে পারিয়াছে—পিতৃস্নেহ তেমন পারে নাই। পাতিব্রত্যে নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, পত্নীপ্রেমে পুরুষ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। স্নেহপ্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে নারী যেমন নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছে পুরুষ তাহা পারেন নাই।'...'বহির্জগতেও মাতৃস্নেহের এরূপ কার্যক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা এখনও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই!'

উদ্ধৃতির বাহুল্যে আপনাদের শ্রান্ত করে তুলেছি কি? আমার কিন্তু এখনও আশা মেটেনি। প্রবন্ধগুলি যদি আদ্যোপান্ত তুলে দিতে পারতাম তবেই বোধহয় ঠিকমতন বোঝানো যেত তথ্যে রসে ও যুক্তিতে এই লেখিকার রচনা কত সমৃদ্ধ! আরো একটি ছোট প্রবন্ধের উল্লেখ করি যার শিরোনাম নাম। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমরা যদি ইংরেজের দেখাদেখি 'মিস' ও 'মিসেসের' সমাদর না করিতাম তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা বড় সমস্যার সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালি মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া তাহাকে সম্পত্তির সামিল করিয়া দেওয়ার নিয়মও এ দেশে ছিল না। তাঁহারা সকলেই শ্রীমতী মিস অথবা মিসেস নাহেন।'

তাই লেখিকা সমাধান দিয়েছিলেন 'তাঁহারা আজীবন দেবী লিখিলে ঘরের কি বাহিরের খুব বেশি ক্ষতি হইবে না, উপরন্তু নিজস্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে।' একজন পাঠক এর উত্তরে যা লিখেছিলেন তা আরো যুক্তিসঙ্গত 'স্ত্রীলোক মায়ের নামের সহিত দেবী এই কৃত্রিম শব্দের dead uniformity সৃষ্টি করবার প্রয়োজন কি?...'দেবী' শব্দ ব্যবহারে অহিন্দুর আপত্তি থাকতে পারে এবং তজ্জন্য তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। পদবীহীন নাম ব্যবহারে কোনো সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র-প্রয়াসী বাঙালি মহিলাগণ এই নূতনত্ব প্রবর্তন করুন ; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।" ষাট বছর আগেকার এই সব আলোচনা আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যাই হোক আজ এই লেখিকার বেশি পরিচিত রচনাগুলির কোনো আলোচনা করিনি। বছর দশ বারো আগে ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেই যখন কয়েকজন জ্যেষ্ঠা লেখিকা, শান্তাদেবী, সীতাদেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, গিরিবালা দেবী এবং শৈলবালা ঘোষজায়াকে সম্বর্দ্ধিত করার আয়োজন হয়েছিল তখন শান্তাদেবীর পরিচয় দান উপলক্ষে ("পঞ্চদশী") আমি তাঁর 'চিরন্তনী' 'জীবনদোলা' 'সিঁথির সিঁদুর' 'অলখ ঘোরা' ইত্যাদির অল্প একটু উল্লেখ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওই সমগ্র রচনাবলী পুনর্মুদ্রণের দায়িত্ব কোনো ব্যবসায়ী প্রকাশক গ্রহণ করবেন তার আশা কম। কিন্তু কোনো একটি সাময়িক পত্রিকা যদি বিগতযুগের সৎসাহিত্য থেকে সংকলন করে নিয়মিত উপহার দেওয়া স্থির করেন তবে উৎসাহী পাঠকের অভাব হবে না এবং এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচয় হলে সাহিত্য-রুচিরও প্রসার ঘটবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শান্তাদেবীর কলমে কথাসাহিত্যই যদিও আমরা বেশি পেয়েছি, আমার ধারণা তাঁর মন ও তাঁর কলম প্রবন্ধ রচনায় আরো সিদ্ধহস্ত ছিল। প্রবাসীর পৃষ্ঠায় কয়েকটি ছোট গল্প পড়লাম যেগুলি নেহাৎ গল্প নয়, যাতে প্রবন্ধের উপাদান রয়েছে। কোনোটাতে আছে চা বাগিচার আড়কাঠিদের উৎপাতের কথা কোনো টাতে বা গণযৌতুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী কোনো কন্যার কাহিনি। হয়তো ঠিক একই কালে তাঁর পিতা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে আড়কাঠিদের কি করে উৎসাদন করা যায় তার পরিকল্পনা দিচ্ছেন। শান্তা দেবীর পরিণত বয়সে রচিত পিতৃজীবনী 'রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা' গত শতকের শেষ পঁচিশ বছরের এবং এই শতকের প্রথমার্দ্ধের একটি মূল্যবান দলিল। এই দলিল রচনায় তিনি নৈর্ব্যক্তিকতা, তথ্যনিষ্ঠা ও মৃদু রসবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাময়িক পত্রের প্রবন্ধগুলিতেও। প্রবাসী ও Modern Review তো কেবলমাত্র দুটি পত্রিকা ছিল না রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের পক্ষে, ছিল একটা সামগ্রিক জীবন-পরিবেশ। রমেশ মজুমদার বলেছিলেন 'রামানন্দ জনগুরু।' তবে জন-শিক্ষার জন্য তিনি যতই আত্যন্তিকভাবে নিজেকে দিয়ে থাকুন না কেন গৃহকে তিনি অবহেলা করেননি। তার সুফল তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে বর্তেছিল। তা ছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল আবহাওয়া। আর শৈশবে বাংলাদেশের বাইরে এলাহাবাদে মানুষ হওয়ার ফলে এঁদের চারিত্র্যে আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়েছিল। এ সবেরই সম্মিলিত ফল ঐ যুক্তিনিষ্ঠ চিরপ্রগতিশীল মন।

আজ একে একে রামানন্দের পুত্রকন্যারা সবাই চলে গেলেন। কিন্তু সপরিবারে রামানন্দ সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, স্বাদেশিকতায় যে কীর্তিটুকু রেখে গেছেন তাকে অবহেলায় নষ্ট না করার দায়িত্ব আমাদের। আমার এই রচনা শেষ করতে গিয়ে আর একবার মনে পড়ছে, পূর্বোক্ত জ্যেষ্ঠা লেখিকা সম্বর্দ্ধনা সভায় সীতাদেবীর সেই প্রশ্ন 'আমাদের যুগে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা কত কম ছিল, আর কত বাধা ছিল মেয়েদের। তবু তো আমরা অনেকে তখন লিখেছি। কিন্তু আজকে যখন স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার এতখানি প্রসার হয়েছে তখন লেখিকার সংখ্যা এতো কম কেন?' এতদিন ধরে ভেবে ভেবেও একটা সদুত্তর দাঁড় করতে পারিনি আজো?

গোধূলি মন, বর্ষ ২৬ (১৩৯১), সং ৮, পৃঃ ৭-১৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রীতি ও তার অপ্রীতিকর জীবন

প্রতিবন্ধী মানুষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমরা অন্ধ, আমাদের মন অসাড়। দুর্বলের জন্য, দুঃখীর জন্য, দৈবের হাতে জখম হওয়া মানুষের জন্য যে সহজাত সহানুভূতি থাকে তারও অভাব অহরহ চোখে পড়ে। এটা কি আমাদের কর্মবাদবাহিত সংস্কৃতির একটা বৈশিষ্ট্য? এই প্রতিবন্ধী বর্ষে রাজধানীতেই অন্ধদের শোভাযাত্রার উপর পুলিশী হামলা হয়ে গেল, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজেদের দাবী জানাবার জন্য যাচ্ছিলেন। দেশজুড়ে তাই নিয়ে ধিক্কার উঠল না। তাতে প্রতিবন্ধীদের সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বোধহয় কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

অন্য দেশে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য চিন্তা ভাবনা করে তাঁদের প্রতিবন্ধক কমিয়ে আনবার জন্য নিত্য কত নতুন নতুন আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা অনেকেই তাদের সম্বন্ধে কোনোরকম দায়িত্বই বিশেষ বোধ করি না। দায়িত্ব বোধ করা দূরে থাকুক সামান্য মানবিক অনুভূতিরও যে কত অভাব তার উদাহরণ দিই আমার পরিচিতা একটি কন্যার অভিজ্ঞতা থেকে।

প্রীতি (তার সবটুকু নাম ব্যবহার করার অনুমতি সে আমাকে দেয় নি) আর পাঁচটি শিশুর মতনই সর্বাঙ্গ সুন্দর অবয়ব নিয়ে জন্মেছিল। হঠাৎ তার চার বছর বয়সে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। নাইট্রিক অ্যাসিড ছলকে পড়ে মুখের বাঁ দিকটা এবং দেহের অনেকখানি ভীষণভাবে পুড়ে যায়। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই বালিকা শেষ পর্যন্ত জয়ী হল বটে কিন্তু ততদিনে বীভৎসভাবে জখম হয়ে গেছে সে। বাঁ চোখটি গেছে, বাঁ কানটি নেই। নাক ঠোঁট গলার প্রকৃতি-রচিত প্রাক্তন আদল ভেঙেচুরে এমন দাঁড়াল যেন শিল্পীর গড়া একটি সুন্দর প্রতিমার মুখের আধখানা গলিয়ে দলা পাকিয়ে মানুষী চেহারাখানা লুপ্ত করে দেবার চেষ্টা করেছে দানবের হাত।

কখনও ডাক্তার, কখনও বন্ধু, কখনও সমাজসেবী, কখনও বা সহৃদয় নাগরিকের চেহারা ধরেই ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া এই মানুষগুলির ঘায়ে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতে পারি। পারি না কি? পারবার জন্য কতটুকুই বা শ্রম, ত্যাগ কিংবা ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন হয়? অথচ ঐটুকুও আমরা সব সময় করি না। করি তো না-ই বরং তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিই।

সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলছিল প্রীতি। বলছিল, 'প্রতিবন্ধী বর্ষে এই যে সব বড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বড় কথা বলা হচ্ছে, ভণ্ডামি করা হচ্ছে, এতে কারুর কোনো উপকার হবে? এসব না করে যদি শুধু একটু সামাজিক স্বীকৃতি আমাদের দেবার চেষ্টা করা হত তাহলেই মানুষের মতন মাথা উঁচু করে পথ চলতে পারতাম।' একটু আহত হয়ে বললাম, 'ভণ্ডামি বলছো কেন? কেউ কেউ তো সত্যিই চেষ্টা করছে প্রতিবন্ধীদের বাধা কিছুটা দূর করবার?' প্রীতি একটু অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'তারা সংখ্যায় ক'জন এই আটষট্টি কোটি মানুষের দেশে? বরং সংখ্যায় অনেক বেশি তারাই যারা আমাদের প্রতিবন্ধক-কে আমাদের অপরাধ মনে করে, অহরহ নানাভাবে আমাদের নির্যাতন করে। এই প্রতিবন্ধী বর্ষে মস্ত বড় বড় কাজ করবার দরকার নেই, শুধু আমি যে একটা মানুষ উদ্ভট কোনো জন্তু নই এটুকু সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?'

মানুষের নির্বোধ বর্বরতা মানুষকে কতদূর যন্ত্রণা দিতে পারে, তার একটুখানি প্রীতির অভিজ্ঞতা থেকেই শোনা যাক। সপ্তাহ কয়েক আগে সে কলেজ স্ট্রীট থেকে বালিগঞ্জে ফিরছিল। দোতালা বাসের ওপর তলায় একেবারে সমানের দিকে বসেছিল সে। বাস দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি আসতেই সে নামবার জন্য সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এমন সময় চার পাঁচটি ছোকরার নজর পড়ল তার উপর। তারা সুবেশ, তারা কলেজের ছাত্রও হতে পারে, পাসকরা বেকারও হতে পারে। তাদের হাসাহাসি ও মন্তব্য অগ্রাহ্য করেই প্রীতি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, —'দ্যাখ দ্যাখ এমন আর দেখতে পাবি না, চিড়িয়াখানাতেও এমন জীব নেই, ...নিশ্চয়ই আমেরিকা থেকে নতুন আমদানি।'

প্রীতিকে তাদের অস্বাভাবিক লেগেছিল কারণ তার কপালের খানিকটা সে ঘন চুল দিয়ে কিছুটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। তার কাঁচের চোখটিকে একটু আড়াল করে রাখবার জন্য তার চশমার একটি কাঁচ রঙিন। প্রায় পঁচিশ ত্রিশবার কষ্টকর প্লাস্টিক সার্জারি করার পরেও মুখের আদল এখনও সম্পূর্ণ হয় নি; কান, একদিকের গাল, চোখের পাতা আর চিবুকের গড়ন অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কাজ চলছে। তা ছাড়া সারাটা শরীর গভীরভাবে পুড়ে যাওয়ার ফলে এবং মুখটিকে ঠিকমতন গড়ার প্রয়োজনে (pedicle grafting) শরীরের নানা অংশ কেটে কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তার সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে যে আঁটে সাঁটো শাড়ি ব্লাউজ পরা তার পক্ষে একটু কষ্টকর। তাই সে ঢিলেঢালা কুর্তা আর লম্বা প্যান্ট পরে। তাকে একটি ছোটখাট চোদ্দ পনের বছরের ছেলে বলেও ভুল হতে পারে। পোশাকে এবং চেহারায় এই সামান্য অসাধারণত্ব টুকুই ঐ ছেলেদের প্ররোচিত করেছিল এ জাতীয় নির্বোধ নিষ্ঠুর মন্তব্য করতে। এবং শুধু মন্তব্য নয়। ওদের হাসাহাসি অগ্রাহ্য করে প্রীতি যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন একজন তার তালুর ওপর একটু টোকা মেরে বললো, 'দেখি তো শব্দ করে কিনা'—আর একজন তার কাঁধের উপর ছড়িয়া থাকা চুলে একটু টান দিল। প্রথম দু'বার চুলের টান সে অগ্রাহ্য করেছিল কিন্তু তৃতীয়বার যখন একটু জোরে টানল তখন প্রীতির ধৈর্যচ্যুতি হল। যে ছেলেটি চুল টানছিল তাকে প্রীতি ঘুরে একটি ঘুঁষি মারল। ব্যস্ আর যায় কোথায়, সেই ছেলে এবং তার চারজন সঙ্গী এক সঙ্গে প্রীতির মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চাঁটি পিঠে ঘুষি মারতে শুরু করল। এক গাড়ি লোকের চোখের সামনে ঐ ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটিকে চারটি বাঙালী বীর বেশ কয়েক মিনিট লাঞ্ছনা করে চলবার পর একজন ভদ্রলোক হৈ হৈ করে উঠলেন, 'করছেন কি, করছেন কি আপনারা? ইনি একজন ভদ্রমহিলা সেটাও কি ভুলে গেছেন?' তখন প্রথম যে ছেলেটি মেরেছিল সে এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বললো, 'কিছু মনে করবেন না, ভুল হয়ে গেছে।' প্রীতি তার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি। সে তখন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। কোনোরকমে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে নেমে দিশেহারার মতন দাঁড়িয়ে রইল। সে ভেবে পেল না কোন্ অপরাধে তার এই লাঞ্ছনা।

এই ঘটনাটি সভ্যতাভিমানী বাঙালীর গর্বের শহর কলকাতার 'সভ্যতম' অঞ্চলে ঘটেছিল। বড় বাজারে নয়, ট্যাংরায় নয়, পার্ক সার্কসে নয়, রিফিউজি অধ্যুষিত কোনো কলোনীতে নয়। অবশ্য প্রীতি এই শহরের অন্যান্য অঞ্চলে, শহরতলীতে, গাঁয়ে গঞ্জেও নানাভাবে লাঞ্ছনা লাভ করেছে, তবে এতদূর ইতিপূর্বে গড়ায় নি। কিছুদিন আগে একবার হাওড়া স্টেশনে একটা বাস থেকে নেমে আর একটা বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল সে। তার বাসের সহযাত্রীরা এবং আরও অনেকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল আর নানা রকম মন্তব্য করতে থাকল। শুধু একজন বুড়ো মানুষ পাক দিয়ে যেতে যেতে সখেদে মন্তব্য করলেন 'এরা আর দেখার জিনিস পেল না।' এরকম প্রায়ই ঘটে, তবু প্রীতি ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে রাজি নয়। সাহস করে একা একাই ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র, প্রায়ই কাঁধের ব্যাগে একটি ক্যামেরা থাকে।

প্রীতি ছেলেবেলা থেকে একটি কনভেন্টে থেকে পড়াশোনা করেছিল বলে তার স্কুল জীবনে তেমন বেদনা দায়ক ঘটনা কিছু ঘটেনি। বরং নান্‌দের সতর্কতার ফলে তার সহপাঠিনীরা সব সময়েই তার সঙ্গে খুব সহৃদয় ব্যবহার করতো—শিশুদের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়নি সেখানে। হাসি আনন্দ পড়াশোনা খেলাধূলায় ভরা সেইগুলি ছিল তার জীবনের সুন্দরতম দিন। স্কুল ছেড়ে কলেজে এল, বি. এ পাশ করল। কিছুকাল যাবৎ সাংবাদিকতার ক্লাস করছে। সেই সঙ্গে একটি বিখ্যাত মিশনারী কলেজের অফিসে সে কাজ করে। তার উপার্জনের বেশির ভাগটাই সে খরচ করে ক্যামেরার পিছনে।

প্রীতি বার বার আমাকে বলে, 'আমার জন্য ভাববেন না, আমি যথেষ্ট শক্ত আছি। কিন্তু বেশিরভাগ প্রতিবন্ধীর আমার মতন মনের জোর নেই' এতটুকু বিরূপ ইঙ্গিতে তারা মুষড়ে পড়ে। গায়ে পড়া সহানুভূতি, নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যদ্বানী, নির্বোধ কৌতূহল তাদের খুব কষ্ট দেয়। আসল কথা কি জানেন, অনেকে ভুলেই যায় যে আমরাও মানুষ, একটু বেশি স্পর্শকাতর মানুষ, কিম্ভুত কিমাকার দ্রষ্টব্য জন্তু নই। সুযোগ সুবিধা সব সময় হাতে তুলে হয়ত কেউ দিতে পারে না, এই গরীব দেশে যেখানে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষরাই সুযোগ পায় না সেখানে প্রতিবন্ধীরা যে আরও বেশি বঞ্চিত হবে এ আমরা মেনে নিয়েছি। কিন্তু একটু ভদ্র সহৃদয় ব্যবহার, অন্তত একটু সামাজিক সভ্য আচরণও কি আমরা আশা করতে পারি না ভাগ্যবান 'স্বাভাবিক' মানুষদের কাছ থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রীতির শৈশবের অক্ষত হাসিখুশির ছবি দেখেছিলাম তার এ্যালবামে। তার পাশাপাশি সে তার কৈশোরের একটি ছবি লাগিয়ে তার নিচে লিখে রেখেছে, 'আমি গাই জীবনের গান।' সেই ছবির মুখে বাঁশি। যখন আমি তার কাছে ঐ ছবি দুটি চাইলাম সে একটু ইতস্তত করল। ছবি না দিলে চলে না। শেষকালে তিনটি ছবি সে এনে দিল। হাসিখুশি শিশুটিকে দেখিয়ে সে বললো, 'একে আমি চিনি না, একে আমার মনে নেই।' তার কৈশরিক ছবি সম্বন্ধে বললো, 'এটাই আসল আমি। এ কিন্তু হার মানবে না, তবে এর কোনো অহঙ্কারও নেই। যত উপরেই উঠি আকাশ তো আরও কত উর্ধ্বে! তলিয়ে গেলেও ভয় পাই না, পায়ের তলায় যে সমুদ্র তার তল নেই।'

কিন্তু তৃতীয় একটি ছবিও আছে। যে শরীর আমাদের এত গর্বের এত আনন্দের এত অহঙ্কারের সেই শরীরই কি নিঃসীম বেদনা আর লজ্জা দিতে পারে তা সব সময়ে মনে থাকে না। এই ছবিতে তার একটু নীরব সাক্ষ্য রয়েছে।'

আজকাল, ০১।০৬।৮১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরা কি ঘর পাবে না কখনও

ছুটির অপরাহ্নে বিমল করের 'দ্বীপ' পড়ে শোনাচ্ছিলাম আমার কর্তাকে। পৃষ্ঠা চারেক নীরবে শুনবার পর 'ম্যাজিক মাউন্টেন' এর সঙ্গে তুলনা করে কিছু একটা বলছিলেন কিন্তু বাধা পড়ল। পর্দার ফাঁক দিয়ে সসঙ্কোচে গলা বাড়াল আমাদের রান্না ঘরের অধিষ্ঠাত্রী নূরজাহান বিবি। সাধারণত না ডাকলে ও সামনে আসে না, হঠাৎ গল্প বিষয়ে তার এতটা কৌতূহল লক্ষ্য করে অবাক হলাম, "কি ব্যাপার?" ও একটু হাঁফাচ্ছিল উত্তেজনায়। কয়েক সেকেণ্ড দম নিয়ে জানাল, "আমাদের বাজারে চাল বিক্রী করে একটি মেয়ে, ও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করে গেটের কাছে। ও এখন এসে বলছে কি ওর বোনের একটা মেয়ে হয়েছে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। কিন্তু ওরা নাকি তাকে মানুষ করতে পারবে না, তাই হাসপাতালেই ছেড়ে চলে আসবে ভাবছে। আপনি কি ওকে নেবেন? আপনি তো একবার বলছিলেন যে আপনাদের এতিমখানায় (অনাথ আশ্রম) নিতে পারেন। তাই আমি ওকে বলে এসেছি যে আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

"ক'দিনের হয়েছে বাচ্চাটি?"

"এই সাত আট দিনের হবে। আজ হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেবে, তাই আজই সন্ধ্যায় নিয়ে আসতে হবে, যদি আনতে হয়।" আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কয়েক মিনিট। একেবারে বিনা নোটিসে এক জলজ্যান্ত মানুষের দায়িত্ব এভাবে নেওয়া যায়? তাছাড়া আমাদের অনাথ আশ্রমে পাঁচ বছরের নীচে কেউ নেই এখন। তাদের মাঝখানে এইটুকু শিশুর দায়িত্ব নেবার মতো ব্যবস্থা করতে ক'দিন লাগবে সেটাও চটপট হিসেব করে উঠতে পারছিলাম না। আমার নিজের সংসারে তো এতটুকু বাড়তি ঠাঁই নেই। অথচ ভাল করে ভেবে চিন্তে এ ব্যাপারে মন স্থির করার মতো যথেষ্ট সময়ও নেই হাতে। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার তো একটু পরেই শুরু হয়ে যাব। তখনই তো শিশুটিকে নিয়ে বা না নিয়ে চলে আসতে হবে। একটু দ্বিধা করেও 'খেলাঘর'-এর ভরসায় রাজি হয়ে গেলাম। বললাম "নিয়ে আসতে বল বাচ্চাটিকে, ফেলে আসার দরকার নেই। আমরা ওকে নিয়ে নেব ঠিকই—তবে কয়েকটা দিন কি নিজের কাছে রাখতে পারবে না ওরা?"

"দেখি জি[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অঘ্রাণ সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে নামতেই সকন্যক একটি কিশোরী এসে দাঁড়াল আমার সামনে, ঘরের আলো আড়াল করে। তার পেছনে তার চেয়ে বেশী বয়সের আর একটি স্ত্রীলোক তার মুখে কিছুটা আলো পড়েছে। তার আবার বাঁ চোখের কোলে এক ফোঁটা জল আটকে আছে। স্টুডিও হলে না হয় মনে করতাম এক ফোঁটা গ্লিসারিন। যাইহোক, বিষণ্ণ মুখ, এক ফোঁটা চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ও বেশ একটা আবেগঘন মুহূর্ত তৈরী করে ফেলল। জ্যেষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি ওর কে হও?

"মামাতো বোন।"

"ওকি তোমার কাছেই থাকে? কোথায় থাকো তোমরা?"

"এই তো হোটেলের পাশে ফুটের ওপর। থাকার জায়গা থাকলে কি আর পেটের ছেলে নিজের হাতে তুলে দিয়ে দিই। (মনে মনে ভাবলাম কলকাতার ফুটপাথকে তো শুনি হাজার হাজার পরিবার বসবাসের পক্ষে যথেষ্ট ভাল জায়গা মনে করে)। ওর স্বামীটা ওকে ফেলে পালিয়েছে, বিহারী লোক—তার যে আগের বউ ছেলে ছিল সে কি আর আমরা জানতাম? এখন এই বাচ্চা নিয়ে ওর দাঁড়াবার ঠাঁই নেই।" মামাতো বোন ফোঁপাতে শুরু করল। কন্যার মায়ের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, তার কিন্তু চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। আলোটা পিছনে পড়েছে বলে তার মুখ একটু অস্পষ্ট। মাথাটি সামান্য ঝুঁকিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, একটা সরু লাল পেড়ে আধময়লা শাড়িতে শিশুটিকে জড়িয়ে বুকের কাছে ধরে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি?"

মাথা না তুলেই অস্ফুট কি বললো। তাই আবার শুধাতে হল। এবার শুনে মনে হল ওর নাম 'রাহিলা'।

তোমার আর ছেলে মেয়ে আছে? মাথা নাড়ল, যার অর্থ 'না'।

"এই প্রথম?"

"হ্যাঁ", আবার মাথা নড়ল।

"তবে দিয়ে দিচ্ছ কেন?"

মামাতো বোন বলল, "কি খাওয়াবে মা? নিজেই তো কয়েক মাস কুঠিতে কাজ করে দুটি খেতে পাচ্ছিল। তাও তো সেখানে ওরা মোটে বুঝতেই পারেনি এতদিন! এখন এই কচি ছেলে নিয়ে গেলে কি ওরা রাখবে? আর সেখান থেকেও তো না বলে হঠাৎ চলে এসেছে। শরীর খারাপ লাগতে তখন আমার কাছে এল কাঁদতে কাঁদতে আগে তো কথা শোনেনি আমাদের, এখন বিপদে পড়ে এসেছে। ফেলি কি করে? এখন আপনি যদি মেয়েটাকে রাখেন তো কুঠিতে ফিরে গিয়ে বলতে পারব যে, হঠাৎ জ্বর হওয়ায় কদিন কাজে যেতে পারেনি।"

পরিকল্পনাটি তো পরিপাটি।

"দিচ্ছ তো আমায়, পরে আবার কান্নাকাটি করে ফেরৎ চাইবে না তো?"

"খাওয়াবে কি যে ফেরৎ চাইবে?"

"তবু ওর স্বামী যদি এসে দাবি করে?"

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"হুঁঃ—ও আবার এমুখো হবে?"

দুজনের ভাবভঙ্গি কয়েক মিনিট লক্ষ্য করলাম। আজ এই মুহূর্তে রাহিলার কাছ থেকে কোনো কথা পাওয়া যাবে বলে মনে হল না। ভাবলাম, "বিধির প্রথম দান এ বিশ্ব সংসারে/মাতৃস্নেহ, কেন সেই দেবতার ধন/আপন সন্তান হতে করিলে হরণ/সে কথার দিয়ো না উত্তর"। আমার নীরবতা দেখে আমাকে দ্বিধাগ্রস্থ মনে করে মামাতো দিদি আবার বক্তৃতা শুরু করল, "এমনিতে তো হাসপাতালেই চাইছিল ওরা মেয়েটাকে। বলছিল কি, মেয়েটাকে রেখে যা তোকে ভাল ভাল ওষুধ দেব খাবার, তোকে ঘায়ে লাগাবার লাল ওষুধ দেব—খুব ভারী অপারেশন করে খুব কষ্ট পেয়ে হয়েছে তো মেয়েটা?"

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "বল কি হাসপাতালে রেখে দিতে চেয়েছিল তোমাদের মেয়েকে? এমন কথা তো কখনও শুনিনি?"

"হাঁ চাইছিল বই কি—শুধু আমি কিনা ঐ বুবুকে (নূরজাহানকে ইঙ্গিত করে) আগেই কথা দিয়ে দিয়েছি, তাই নিয়ে এলাম আপনার জন্য।"

"বেশ ভাল করেছ, কিন্তু কয়েকটা দিন রাখতে পারবে তো নিজেদের কাছে? আমি ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করে নিই, নয়ত হঠাৎ ওকে কোথায় রাখব?"

"কিন্তু আমরাই বা কোথায় নিয়ে যাব ওকে? কি খাওয়াব?"

"কেন তোমরা যেখানে থাক, সেখানেই নিয়ে যাবে। ওর খাওয়ার খরচটা না হয় আমিই দেব এখন।"

এবার মামাতো দিদি খোলসা করে বলল, "আমরা তো এক সাথে থাকি না। আমার একটা ছোটো ঘর আছে, স্বামী আছে, সেখানে তো ঐ কচি ছেলে নিয়ে উঠতে দেবে না।"

"কেন?"

"সে মা অনেক কথা।" এরপর অশ্রু বিগলিতা শুভার্থিনী মামাতো দিদির আর কোনো কথা শুনতে ইচ্ছা হলো না। অগত্যা দ্রুত ব্যবস্থা করতে হল। আসলে এ দায়িত্ব যে নেবে আমার সেই তরুণী সহযোগিণীর অদম্য উৎসাহ ও নিপুণ ব্যবস্থাপনায় চটপট সব ঠিক হয়ে গেল। এরপর একটা সময় আসে যখন জননীকে বলতে হয়, 'এবার তুমি নিজের হাতে তুলে দিয়ে দাও তোমার মেয়েকে।'

কতজনের কাছ থেকে কত দানই তো পেয়েছি জীবনে, কিন্তু ইতিপূর্বে এ-জাতীয় দান গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা আর হয় নি। সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দেবার সময় কুন্তীর অবস্থাটা বহুবার কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করেছি। ঠিক সেই মুহূর্তে চোখে জল বা মুখে বিলাপ না থাকলেও কুন্তীরও সর্বাঙ্গ যে একটু কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, সে কথা আজ অনুমান করতে পারলাম। যে-কারণেই হোক না কেন, যে মা তার সদ্যোজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করে বা করতে বাধ্য হয়, তার চোখের জল বোধ হয় শুকিয়েই যায়। নীরবে নত নেত্রে রাহিলা তার সন্তানকে তুলে দিল—মুখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক করেই রাখল। মামুলি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "মেয়ে তো মানুষ করে লোকে পরকে দিয়ে দেবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জন্যই। তুমি মানুষ না করে দশ দিনেই দিয়ে দিলে। ওর কপালে যা লেখা সেখানেই সে থাকবে। তোমার কোলে জন্মালেও তোমার কাছে থাকতে ও আসে নি। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যত কষ্ট করেছ সারা জীবন তা যেন ওকে করতে না হয় সেটুকু আমি দেখব।"

ও আমার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল। এতগুলি ভাল ভাল কথা যে বললাম তার কিছুই সে বুঝতে পারল কিনা বোঝা গেল না। ওর শূন্য দুটি হাত, ইষৎ ফোলানো ঠোঁট, আর অশ্রুহীন চোখ আমার সহ্য হচ্ছিল না। বললাম, "কাল তুমি একবার এসো, আজ না হয় যাও।" আস্তে আস্তে কোনো কথা না বলেই সে চলে গেল।

মাদার টেরেসার শিশুভবনে কত শিশু কতভাবেই আসে শুনেছি। আমাদের অনাথ আশ্রমে ইতিপূর্বে এমনভাবে কোনো মা তার নবজাতককে দিয়ে যায় নি। এরপর এমনতর ঘটনায় নিশ্চয়ই আর বিচলিত হব না। কিন্তু মায়ের কোল থেকে এই যাকে আমি নিলাম এতো ছোট একটি মানুষ, এর ভবিষ্যৎ কি? অনাথ আশ্রম ছাড়া কি আর কোনো ঘরে স্থান হবে না এর? অনাথ আশ্রম নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চয়ই কিন্তু 'গৃহ' তো নয়। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে হলে একটি শিশুর জন্য ল্যাকটোজেন, ফ্যারেকস ইত্যাদির যত প্রয়োজন, তার চেয়ে তো অনেক বেশি প্রয়োজন নিজস্ব একটি মায়ের কোল, একান্ত নিজের একটি পিতার স্নেহদৃষ্টি। এই যে যাদের 'জন্মরাত্রে' ভাগ্য ফেলে গেছে অনাদরে 'নামহীন, গৃহহীন' এদের জন্য ঘর পাওয়া, পালক পিতামাতা পাওয়া প্রায় অসম্ভব এদেশে। বন্ধু ও পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম দেখেছি। আমাদের বিত্তবান, স্বাস্থ্যবান নিঃসন্তান দম্পতিরাও সহজে পোষ্য নিতে চান না। জাত, গোত্র, গায়ের বর্ণ সবই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মুসলমান সমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজ তো এবিষয়ে উদার ছিল, দত্তক বা পোষ্য নিতে তো বাধা ছিল না। কিন্তু এযুগের রাধা আর অধিরথদের গৃহ এত অনাতিথেয় কেন?

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২১।০১।৭৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বরণীয়া-বরণ

এই দশকের ঠিক গোড়ার দিকে কিছু তরুণ উন্মাদ হয়ে মাথা কুটতে শুরু করেছিল এবং "বাংলাদেশ" (আমাদের) জুড়ে এমন এক তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল যার ফলে প্রতিদিন মনে হচ্ছিল—আমাদের জীবনে শ্রদ্ধেয় কি কিছু আর বাকি আছে? বিদ্যাসাগর আশুতোষের মুণ্ডচ্ছেদ করে, গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের মুখে আলকাতরা মেখে তারা সরবে ঘোষণা করেছিলো "আমাদের চেয়ে যাঁরা বয়স্ক এবং পরিণতবুদ্ধি তাঁরাও তাঁদের আচরণে প্রতিদিন এই নেতাদের লাঞ্ছিত করছেন—আমরা আরও স্পষ্ট করে তাঁদেরই অনুকরণ করছি।" একথার কোনো মুখভাঙা জবাব আমার তখন মাথায় আসে নি। কিন্তু আমি যেহেতু ভণ্ডামির চেয়েও নির্লজ্জ কদাচারকে বেশি ভয় পাই তাই ঐ তরুণদের বুক ফুলিয়ে সব কিছুকে অশ্রদ্ধা করাটাকে মেনে নিতে পারি নি: কারণ যারা ভণ্ড তারা অন্তত নিজেদের অপরাধ বিষয়ে সচেতন এবং সঙ্কুচিত। তবু অস্বীকার করব না যে এই উন্মত্ত তাণ্ডব আরও অনেকের মত আমারও মনে তখন সংশয় জাগিয়েছিল যে সম্ভবত আমরা কোনো কিছুকেই সত্যি শ্রদ্ধা করি না, যা কিছুকে শ্রদ্ধেয় বলি তা সবই আসলে ফাঁকা আর মেকী।

ইদানীং বছর খানেক অবশ্য হাওয়া আবার অন্য দিকে ঘুরেছিল। তাই ২৬ শে নভেম্বর ছয়টি সত্তর-উত্তীর্ণা এককালের সুপরিচিতা লেখিকাকে শ্রদ্ধা জানাবার সময় মনে হলো আমাদের সব কিছু হারায় নি। এই তো প্রসন্নমুখী কয়েকটি মহিলা তাঁদের উপস্থিতি দিয়ে ভরসা দিলেন, একাল সেকাল পেরিয়ে যে চিরকাল আছে সেই চিরকালের পথ ধরে মানুষের যে শোভাযাত্রা সেই শোভাযাত্রার সাথে কিছুকাল এঁরা কয়েকটি মশাল জ্বালিয়ে পথ আলো করে গিয়েছিলেন। আজকের পথের ধুলো আর ধোঁয়ার মাঝেও বহুদূর থেকে সেই সব আলোর অল্পস্বল্প আভাস আমাদের ভরসা দেয় যে সব কিছু হারিয়ে যায় না।

মহিলা স্নাতক সংস্থা এবং সাহিত্যিকা রবীন্দ্রসদনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেদিন সকালে উৎসুক সশ্রদ্ধ দর্শকপূর্ণ রবীন্দ্রসদনে সম্বর্দ্ধিতা হয়েছিলেন শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী, শ্রীযুক্তা সীতা দেবী, শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া এবং শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী। এঁরা যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবাই কলম বন্ধ করে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন তা নয়। কেউ কেউ এখনও লিখে চলেছেন। তা ছাড়া এঁদের সাংসারিক জীবনের নিভৃত গণ্ডীটুকুতে যদি প্রবেশাধিকার অর্জন করতে পারেন কেউ তাহলে এঁদের সঙ্গে আলাপ করে বহু মণিমুক্তা কুড়িয়ে আনতে পারবেন। শিশু-সাহিত্য, স্মৃতিচারণ, কথা সাহিত্য, সামাজিক সাংস্কৃতিক নানা বিষয়ে নিবন্ধ, সমাজ-রাজনীতি-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা, চিত্রকর্ম ইত্যাদি বহুক্ষেত্রেই এঁরা এঁদের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শান্তা দেবী এই সভায় তাঁর ভাষণে অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই দাবী জানিয়েছেন ঃ "আমাদের যা কাজ তার কোনো স্থায়ী মূল্য আছে কি না, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই তার বিচার হোক—মহিলা লেখিকা বলে ঘেরাটোপ দেওয়া কোনো ক্ষেত্রের মধ্যে নয়, কেবল মহিলাদের আয়োজিত সম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়ে নয়।" এ তো প্রায় চিত্রাঙ্গদার প্রতিধ্বনি ঃ

"পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্দ্ধে সে নহি নহি
হেলা করি মোরে রাখিবে পাছে সে নহি নহি।"

যদি স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবার লেখা পাশাপাশি রেখে শুধু সাহিত্যিক মূল্য যাচাই হয় তখনই "পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।" এই দেশের পাঠক-সমালোচক সমাজের কাছে শান্তা দেবী প্রমুখাৎ এই দাবী সব কালের লেখিকারাই করতে পারেন। এঁরা যে যুগে জন্মেছিলেন, আত্মপ্রকাশের পথে বিরূপ সমাজের কাছ থেকে যে ধরণের বাধা পেয়েছিলেন সে সব স্মরণ করে তাঁদের এই অভিমান সঙ্গত বলেই মনে হয় যে তাঁদের নিরপেক্ষ কোনো মূল্যায়ণ আজও হয় নি আজ সমসাময়িক ভারতবর্ষে মহিলা-স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যুৎসাহী (feminist) হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু যে যুগে কোনো লেখিকার নাম দেখলে "বিজ্ঞ" পাঠকরা মনে করতেন, "এ নিশ্চয়ই কোনো পুরুষের ছদ্মনাম—নইলে মেয়েদের কলমে এত আসে না" ; যে যুগে ভাদ্রবৌ প্রবাসীতে উপন্যাস লিখেছেন শুনে ভাসুর অন্নজল ত্যাগ করে মাথায় হাত দিয়ে বসতেন ; যে যুগে পড়াশুনা জানাটাই মেয়েদের পক্ষে চরিত্রনাশের সামিল ছিল কারণ "তাহলেই তো কোন্‌দিন কাকে চিঠি লিখে তার সঙ্গে বার হয়ে যাবে"—সে যুগে মেয়ে হয়ে জন্মে যদি এঁদের মনে অভিযোগ থাকে যে তাঁরা অবিচার ও অসমবিচার পেয়েছেন তাহলে কি খুব অসঙ্গত বলা যাবে?

এই বরণীয়া সেকালিনী মহিলাদের সেদিন সভার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার পড়েছিল ছয়জন একালিনী মহিলার উপর। শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় পুণ্যলতা দেবীর সাহিত্যিকর্মকে দু ভাগে ভাগ করে বলেন যে শিশু সাহিত্য এবং স্মৃতিচারণ সাহিত্য দুয়েতেই এঁর সমান দক্ষতা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে প্রথম যুগের "সন্দেশে" ইনি যাঁদের মন ভুলিয়েছিলেন গল্প লিখে সম্প্রতি নব পর্যায়ের "সন্দেশে" তাঁদেরই নাতী নাতনীদের চিত্ত মোহন করে যাচ্ছেন তেমনি অনায়াসে। এই তিন প্রজন্মের ভেদ এমন অক্লেশে ঘোচালেন কেমন করে? এঁর স্মৃতি-চারণা "ছেলে বেলার দিন" যত সুপরিচিত "একাল যখন এল" তত পরিচিত না হওয়ার কারণ এই যে আনন্দবাজারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর এখনও এটি বইয়ের আকারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হলে এটি নাকি আরও বেশি সমাদর পাবে। এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সেদিন পুণ্যলতা দেবীর লেখা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন সেটি পুনরুদ্ধার না করে পারছি না।

"তাও জানো না তাও জানো না
আমি ভেলকি রাম ভূতের ছানা?"
"ছানা আবার কি, তুমি তো বুড়ো?"
বুড়ো বল্‌লে কোন্ আক্কেলে?
কি আসে যায় দাড়ি পাকলে?
মনটি কচি কিংবা ঝুনা,
তাই দিয়ে যায় বয়স গোণা।
তাও জানো না, তাও জানো না?"

এই ভাষার যাদুকরী কি সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, লীলা মজুমদারের রক্তসূত্রের পাওয়া না উপেন্দ্রকিশোর রচিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে?

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবীকে পরিচিত করার ভার পড়েছিল গৌরী আইয়ুবের ওপর। আচার্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও অধ্যাপক কালিদাস নাগের জায়া হয়েও ইনি যে স্বমহিমায় ভাস্বর সেটাই তো বিস্ময়কর। এই শতাব্দীর প্রথম পাদে সীতা দেবী শান্তা দেবী যুগ্ম নক্ষত্রের মতো বাংলা সাহিত্যের আকাশে শোভা পাচ্ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই ভগ্নীদুটি আধুনিক শিক্ষা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের যে সম্পদ নিয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন তা সত্যিই ঈর্ষ্যণীয়। যদিও এঁদের যুক্ত রচনায় কোনো গরমিল বা ভিন্ন দুটি হাতের ছাঁদ ধরতে না পেরে একই সময়ে তৃপ্তি ও বিভ্রান্তি বোধ করেন পাঠকরা তবু একথা অনস্বীকার্য যে এঁদের প্রত্যেকেরই অনন্য ব্যক্তিত্ব তাঁদের সাহিত্যকর্মেও ফুটে উঠেছে। আশা করি একদিন শান্তা দেবীর দাবী স্বীকার করে তাঁর "জীবন দোলা", "চিরন্তনী" "অলখঝোরা-র" নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ হবে। তবে এখনই বলা যায় যে তাঁর "ফুটকী" "শিক্ষার পরীক্ষা" ইত্যাদি গল্প বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদের পর্যায়ে পড়ে। তা ছাড়া রয়েছে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণাকর্ম : 'ভারত মুক্তি সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা।' ইউরোপে আমেরিকায় ভারতীয় সাহিত্য ও সমাজের প্রামাণিক চিত্র তুলে ধরবার দুর্লভ দায়িত্ব পেয়েছেন ক'জন বা বঙ্গললনা? শান্তা দেবী সেই দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতামালায়। পরবর্তী জীবনে ছবি আঁকেন নি বলেই আজ আর কেউ জানে না যে অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুর কাছে তিনি ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছিলেন এবং তাঁর ছবি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের প্রশংসা পেয়েছিল।

শান্তা দেবীর অনুজা সীতাদেবীর সঙ্গে সভার পরিচয় করালেন শ্রীমতীতপতী রায়। কথা সাহিত্য ও স্মৃতিচারণ সাহিত্যে এঁর কিছু চিরকালীন দান আছে। "মাতৃঋণ", "জন্ম স্বত্ব", "বন্যা", "মাটির বাসা", "ক্ষণিকের অতিথি", "পরভৃতিকা" ইত্যাদি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের উৎসাহী পাঠক আজও মিলবে। তা ছাড়া রয়েছে রবীন্দ্রনাথের "পুণ্যস্মৃতি"। সেই স্মৃতিচারণের স্বাদগ্রহণও পুণ্যময় অভিজ্ঞতা। স্বামী শ্রীসুধীর চৌধুরী সাহিত্য ক্ষেত্রে যদিও স্বল্পভাষী তবু তাঁর উপন্যাস "শৃঙ্খল" এক সময়ে বাঙালী পাঠককে প্রশংসা-মুখর করে তুলেছিল। এই একটি স্বামীই সেদিন সভায় উপস্থিত থেকে সভাকে সুন্দর করেছিলেন। উজ্জ্বল লাল পাড়ের শাড়িখানি পরে সীতাদেবী আর পাঁচটি লেখিকার মধ্যে তাঁর সৌভাগ্যের গৌরবে মণ্ডিতা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে যে প্রশ্ন করেন সেটি আজকের শিক্ষিতা মেয়েদের ভাবিয়ে তুলছে না কেন? আজ মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার তো অভাবিত প্রসার হয়েছে তাঁদের সময়ের তুলনায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আজও লেখিকার সংখ্যা এত কম কেন?

গিরিবালা দেবীর পরিচয় দিলেন সন্ধ্যা ভাদুড়ি। সাহিত্যক্ষমতা রক্তে প্রবাহিত হয়—এর সপক্ষে প্রমাণ যথেষ্ট নেই। কিন্তু এই লেখিকার বাংলা সাহিত্যে দান শুধু স্বরচিত কথা-সাহিত্য নয়, ইনি একটি সুলেখিরকারও জন্ম দিয়েছেন যাঁর নাম বাণী রায়। গিরিবালা দেবী স্বল্পভাষিণী এবং নিভৃতচারিণী। তাঁর সাহিত্য কর্মেও তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যটুকু বেশ ধরা পড়ে। উনি একাধারে উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী ও কবিতায় তাঁর আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছেন। তাঁর প্রথম গল্প "ছলনা" প্রকাশিত হয় "মানসী ও মর্মবাণী"-তে। "রূপহীনা" "দান প্রতিদান", "খণ্ডমেঘ" ইত্যাদি উপন্যাস কয়টি তাঁর জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। ওঁর "রায়বাড়ি" উপন্যাস আবার পুস্তকাকারে বার হচ্ছে। এখনো এই লেখিকার কলম চলছে। "কালিয়" পত্রিকায় এঁর "আমীর আলির ঘাট" নামে উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে বার হচ্ছে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার সঙ্গে পরিচয় করালেন কল্যাণী দত্ত। এঁর প্রথম উপন্যাসই বাংলাদেশের পাঠক সমাজে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছিলো। প্রবাসী পত্রিকায় "শেখ আন্দু" পড়ে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে নাকি লেডি অবলা বসু ধিক্কার দিয়ে পত্র লেখেন। এই উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন যে হিন্দু মধ্যবিত্ত কন্যার সঙ্গে মুসলমান ড্রাইভারের এই প্রণয় কাহিনি পড়বার পর মা বাবারা কি করে এর পর থেকে ইস্কুলের বাসে মেয়েদের পড়তে পাঠাবেন? নিজের পরিবারেও বাধা কম পান নি ইনি। সবচেয়ে বড় ভাগ্যের মার এলো যখন স্বামী উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হন। এই স্বামীই ছিলেন সাহিত্যচর্চার দুঃসাহসিকতায় উৎসাহদাতা। স্বামীর মৃত্যু, সংসারের নিষ্ঠুরতা, সমাজের বিরূপতা সব কিছুকে ইনি হাসি মুখে জয় করে আজও প্রসন্নমুখে সাহিত্যচর্চা করে চলেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে "নমিতা", "জন্ম অপরাধী", "জন্ম অভিশপ্তা" "ইমানদার" ইত্যাদি এক কালে নাম করেছিল। "শেখ আন্দুর" পুনঃ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করায় বললেন ঢাকায় যেন কাকে উনি ১০/১২ বছর আগে সর্বস্বত্ব বিক্রী করে দিয়েছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী সম্বন্ধে বললেন মহাশ্বেতা দেবী। এঁর সম্বন্ধে মহাশ্বেতা লিখেছেন, "জ্যোতির্ময়ী দেবী এখনো নিজেকে নিয়ে শিশুর মত হাসতে পারেন। এখনো উনি লেখেন এবং রীতিমত ভালো লেখেন। ওঁর "সোনা রূপা নয়" সঙ্কলনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বহু গল্পই বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অথচ এই লেখিকা পাঠক সমাজে সম্যক পরিচিত নন।......যদি আজও কোনো পাঠক "আগাছা" বা "ধাপি" বা "রাজযোটক" পড়ে দেখেন, জ্যোতির্ময়ী দেবীর ভাবাবেগ বর্জিত অথচ অনুভূতিগভীর, অনুকম্পা-প্রখর, নির্মল বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যগুণে অভিভূত হবেন। ওঁর "এপার গঙ্গা"ও "বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ" প্রমুখ উপন্যাসদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময়ী দেবী যদি তাঁর যথাযোগ্য সমাদর ও পরিচিতি না পেয়ে থাকেন, সে লজ্জা আমাদের, সে ক্ষতি পাঠকের।...

এই শেষ বাক্যটি সম্ভবত উপরোক্ত ছটি লেখিকা সম্বন্ধেই ন্যূনাধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়। এঁদের যোগ্যতা যতটুকু ছিল তার যথাযোগ্য পরিমাপ হয়েছে কি? এঁদের লেখা আজ প্রায় অবলুপ্ত। তার যদি কিছুটা পুনরুদ্ধার করা যেত এবং পাঠকদের সামনে ধরে দেওয়া যেত তাহলে তাঁরাই আর একবার বিচার করতেন এঁদের সাহিত্য কর্মের চিরকালীন মূল্য কিছু আছে কি না।

নবজাতক, বর্ষ ৯ (১৩৮০), সং ২, পৃঃ ১৯০-৯৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপ্রয়োজনীয়

(১)

ঊনিশ শ' একাত্তরের এপ্রিল শেষ হয় হয়। বাংলা বৈশাখ। সীমান্ত পেরিয়ে আবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ আসছে। জিজ্ঞেস করলে বলত 'জয়বাংলা' থেকে আসছি। করুণ শোনাত কথাটা। 'জয়বাংলা'-কে তখন বুটের তলায় পিষছে খান সেনারা। ব্যাধতাড়িত জন্তুর মতন মানুষগুলি ছুটে আসতো সীমান্তের দিকে। সীমান্ত পার হয়ে তারা ধুঁকতে শুরু করত।

সেদিন বনগাঁ হয়ে বয়ড়ার দিকে যাচ্ছিলাম আমরা একটা জীপে করে। নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের দুটি ছাত্র ছিলেন সঙ্গে ; বয়ড়া সীমান্তে আমাদের ফার্স্ট এড ক্যাম্পে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। রোজই তখন বুলেটের চোট খাওয়া কয়েকটি মানুষ কপোতাক্ষী পার হয়ে এপারে আসছিল। তাদের চিকিৎসা করা ছাড়াও অন্যদের কলেরার ইন্‌জেকশান দিতে হচ্ছিল, শরণার্থীদের মধ্যে নানারকম অসুস্থ মানুষও ছিলেন।

বৈশাখের তপ্ত দিন কিন্তু নয় সেটা। অসময়ে আকাশে দুদিন থেকে একটু মেঘ করে তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল একেকবার। আমরা ঐ জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম, 'ঘরছাড়া করেও মাথায় ঐ মেঘের আস্তরণটুকু রেখেছ।' আট দশ মাইল পথ ধরে ওদের পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, রিক্সায়—এমন কি বাসের ছাতে বসেও আসতে দেখলাম। অবশ্য তখনও সারা পথ জুড়ে জমাট জনস্রোতটা শুরু হয়নি। একেকটা দল দেখতে পাই, আবার হয়ত কিছুটা ফাঁকা। তারপর আবার কিছু লোক আসছে মাথায় জঙ্গম সমস্ত সম্পত্তি চাপিয়ে। আমরা ছুটছি উল্টোমুখে সীমান্তের দিকে। সরকারী বাঁধানো সড়কের দুপাশে ক্ষেত, মাঝে মাঝে কোনো জায়গায় শরণার্থী ক্যাম্প উঠছে, তাঁবু পড়ছে, তেরপলের নীচে খিচুড়ি চড়েছে মস্ত বড় বড় লোহার কড়ায়।

বড় একটা আমবাগানে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা ক্যাম্পের পাশে বেশ ছড়ানো ভীড় দেখলাম। তারপর কিন্তু পথ যত চলতে লাগলাম ভীড় তত ক্ষীণ হয়ে হয়ে এক সময়ে একবারেই শেষ হয়ে গেল। এমনি মিনিট পনের জীপ ছুটছে, দেখি এক বৃদ্ধা খুট খুট করে হেঁটে চলেছে—হাতে বেঢপ একটা লাঠি—সঙ্গে সম্পত্তি বলতে পরনের ময়লা থানখানি ছাড়া আর কিছু দেখলাম না। মাথা নীচু করে এক তালে সে হেঁটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চলেছে, ভঙ্গীটা পাতিহাঁসের চলার ভঙ্গী—দুদিকে দুলে দুলে। অনেক দূর পর্যন্ত তার সামনে পেছনে কেউ নেই। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে দেহ, মাথায় কদমছাঁট পাকা চুল, পিঠটা অনাবৃত—শাড়ির আঁচলখানা চাদরের মত গলার দুপাশ থেকে ঝুলছে সামনের দিকে। জানি না কত পথ সে হেঁটে এসেছিল। জানি না কোথাও সে আশ্রয় পেয়েছিল কিনা। কিন্তু এরকম নিঃসঙ্গ একান্ত চলা আমি আর দেখি নি।

(২)

রাজকুমার সিদ্ধার্থ নাকি একটিবার রাজপুরী থেকে বেড়াতে বার হয়েই জরামৃত্যুব্যাধিবৈরাগ্য সব দেখে ফেলেছিলেন। আমি কিন্তু জীবিকার্জনে বার হয়ে প্রতিদিন একটি দৃশ্য দেখি, একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। জমকালো নতুন হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল। তার প্রায় উল্টো দিকেই উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা দোতালা বাড়ি। অনেকখানি জমির ওপর, দুটো ডানাওয়ালা বাড়িখানার দোতলার সব ক'টি ঘরই ঝুলবারান্দা দিয়ে ঘেরা ; বেশ প্রশস্ত বারান্দা। সেই বারান্দায় নানা ধরণের চেয়ার পেতে বসে আছেন কিছু মানুষ, বাতিল হওয়া মানুষ—সংসারে আর তাঁদের কিছু দরকার নেই। কেউ কেউ আবার সবুজ রঙ করা কাঠের রেলিং-এর উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পথের আনাগোনা দেখছেন, উৎসুক শিশুর মতো। যে জীবন আজ দূর থেকে তাঁদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে সরে যায়, যে স্রোত থেকে তাঁরা সরে গিয়ে তট-স্থ হয়ে আছেন আজ, সেই স্রোতের দিকেই উন্মনা হয়ে তাকিয়ে থাকেন কেউ কেউ।

বাড়িটার একটি ডানায় থাকেন মহিলারা, একটিতে দেখি পুরুষদের। মেয়েরা কেউ কেউ বোনেন ; কিংবা হাতে সেলাই থাকে, চোখে চশমা। মনে হয় কথাও বলছেন পরস্পরের সঙ্গে। পুরুষেরা কেউ কেউ কিন্তু আধ হাত দূরে বসা অন্য মানুষটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন নিরাসক্ত মনে হয়। পুরুষরা কি বেশি নিঃসঙ্গ? চলমান যানে থাকায় আমার চোখ সরে যায় তাঁদের বাড়ির সামনের একটা দেয়ালে, তাতে খোদাই করা একটি মূর্তি—মনে হয় ঈশ্বরপুত্র যিশুর মূর্তি, তাঁর কোলে স্নেহের আশ্রয় পেয়েছে একটি শিশু। দ্বিতীয় শৈশবে সমাজ সংসার পরিত্যক্ত কিছু শিশু আশ্রয় পেয়েছে যে মস্ত বড় প্রাচীর ঘেরা বাড়িটিতে সেটি আমার এক বিস্ময়। একদিন বড় লোহার একটি গেট একটুখানি ফাঁক ছিল, দেখলাম চমৎকার একটি ঘাসে ঢাকা বাগান, আমগাছ। কল্পনায় সেই আমগাছে একটি দোলনা দুলিয়ে দিলাম। অমন বাগান থাকতে বিষণ্ণ মুখে ঝুল বারান্দায় বসে থাকা কেন? আহা বাগান যে প্রাচীরে ঘেরা—বিশ্বসংসারকে আড়ালে করে দেয়। ঐ বারান্দা থেকে তবু তো কিছুটা দেখা যায় চেনা বিশ্বকে।

ঐ বিশ্বে ফিরে যাওয়ার রথটি তার রাজকীয় মহিমা নিয়ে মাঝে মাঝে দেখি দাঁড়িয়ে থাকে গেটের সামনে, কালো গাড়ি, ওপর দিকটা কাঁচে ঘেরা, ঝক ঝকে রেলিং দেওয়া মাঝখানে—শবাধারটি ধরবার জন্য। আহা দূর হোক ঐ রথ। আরও ক'দিন বিষণ্ণ চোখ মেলে দেখুন তাঁরা এই জীবন স্রোতকে। ক'দিনের দেখা বই তো নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

(৩)

ডান পা-টা টানতে টানতে সামনে এসে বসে পড়লো কাসেমের মা, হাউ হাউ করে কেঁদে বলল 'আপনার ঘরে একটু ঠাঁই থাকলে আমি আর ফিরে যেতাম না।' কাসেমের মা মানুষটা বেশ ভারিক্কে আর তেজী ছিল। এখন দেহও শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, অভিমান অহঙ্কারও বেশি কিছু বাকি নেই। চোখের জলে ঝাপসা চশমাখানি খুলে মেঝের উপর রাখল চোখ মুছবার জন্য। বললাম, 'এই শরীর নিয়ে কেন এলে তুমি এত দূর থেকে?'

'আমি কি আসি? বউ যে পাঠিয়ে দিলে। বলে কি খেটে খেগে যা, আর না পারিস মেগে খা।'

'বাঃ তুমি যে এত কাল খেটে খেটে ঘর তুললে তার বেলা? তোমাকেই বার করে দেবে এখন তোমার ঘর থেকে?'

'হুঁ তাই তো বুলছে! উ নিজের টাকায় নাকি ঘর তুলেছিল—'

'আর ছেলে কি বলে তোমার?'

'আমাকেই বকে, বলে চুপ করে থাকতে পার না? চুপ করেই তো থাকি! কিন্তু দশবার শুনলে একবার তো বলবো?' বলে সে সমর্থনের আশায় আমার দিকে তাকিয়ে আবার হু হু করে কেঁদে উঠল।

বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ঐ একবার বলার বিলাসিতাটাও ছাড়তে হবে। সে চুপ করে রইল। এইটুকু ছেলে কোলে নিয়ে সে স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছিল। বাড়ী বাড়ী খেটে সেই ছেলেকে মানুষ করে বিয়ে দিয়েছিল। বন্দুকের ফ্যাক্টরীতে মোটামুটি ভালই চাকরী করছে সে। কিন্তু তাই বলে সাতটি মেয়ে একটি ছেলে মানুষ করে ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয়। তাই নাতী নাতনীর মুখ চেয়ে দাদী খেটে গেছে যতকাল সাধ্য ছিল। আজ সে অপ্রয়োজনীয়। আমার কাছেও!

বললাম, 'যাও তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—তিনটের ট্রেনটা যদি ধরতে পারো তো রাত্তিরটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেশ পৌঁছে যাবে।'

টাকা পয়সা হিসেব করে হাতে দিতে সে চোখ মুছে খুঁটে সেসব বেঁধে পেট-কোঁচরে গুঁজে রাখল। বল্লো, 'আর দেখা হবে না।' বলে কাঁদল।

ওর সঙ্গে আর দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাটা আমার কাছে ততটা শোকাবহ না মনে হওয়ায় অপরাধী বোধ করলাম। খাওয়া দাওয়া কাজকর্ম সেরে উঁকি মেরে দেখি কাসেমের মা জোহরের নামাজ পড়ছে। মানুষটা ধার্মিক, চিরকাল দেখেছি রোজানামাজ করে এসেছে। সে কারণে ভৃত্যমহলে সে যেন একটু বিশিষ্ট ছিল। ওর কি হবে ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে দেখি সেই জায়নামাজের উপরই অন্য মনে বসে ঝাপ্‌সা চোখে তাকিয়ে আছে পাশের বাড়ির চিলে কোঠার দিকে। ঈশ্বর আর সন্তান এই দুইই ছিল তার ভরসা। একজন তো আশ্রয় দিল না। আর একজন কি দেবেন?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথকে—
পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গ-ঘেঁসা দুর্মূল্য কিছুরে
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে, প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে, প্রতিদিন ধরি ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

নবজাতক, বর্ষ ৯ (১৩৮০), সং ৪, পৃঃ ২৭৫-৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমালোচনা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঙলা সমালোচনা

('আজকাল' পত্রিকার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে)

গ্রন্থ-সমালোচনা বিষয়ে আমি নিজেকে কোনো মত দেবার যোগ্য মনে করছি না। প্রধানত দুটো কাগজের সমালোচনা নিয়মিত দেখি, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার রিভিউ নিবন্ধগুলো আর 'দেশ' পত্রিকার পুস্তকসমালোচনা। তার মধ্যেও আমার নিজের উৎসাহের ক্ষেত্র অনুযায়ী খানিকটা বোধ নিয়ে পড়ি।

সম্প্রতি অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সমালোচনা অংশটি নাড়াচাড়া করে দেখছিলাম, কিন্তু সেগুলো এত সংক্ষিপ্ত যে সমালোচনার বদলে নোটিস বা পরিচয় বললেই হয়। তাতে পাঠকের কোনো লাভ হয় না। আমি আশা করেছিলাম 'কলেজ স্ট্রিট' পত্রিকাটিতে সমালোচনার একটা বড়ো অংশ থাকবে, কিন্তু থাকেনি।

সমালোচনার মান নীচু বললেই যে কথা প্রথমেই তাই মনে আসে, তা হল সমালোচকরা যথেষ্ট যত্ন নিয়ে সমালোচনা করেন না। তাছাড়া আর একটি কারণ মনে হয় যোগ্য লোকের হাতে সমালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয় না। আবার যোগ্য লোকের অভাবও রয়েছে ; বিশেষত যদি কোনো বৃত্তিমূলক বিষয় হয়, অনেক সময়েই যোগ্য সমালোচক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এমনিতেই আমাদের সত্য কথা বলার খুব যে একটা অভ্যাস আছে তা নয়, আসলে অপ্রিয় সত্য কথা বলার জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক মান থাকা প্রয়োজন সেটা আমরা অনেক সময়েই রাখতে পারি না। আমাদের ভালো লাগা, মন্দ লাগা অনেক সময়েই ব্যক্তিগত হয়ে যায়। তাই নৈর্ব্যক্তিক মান সামনে রেখে সমালোচনা করার অভ্যাস তৈরি হয়নি। এবং কারও বইয়ের আলোচনা করলে লেখকের মনে হয় যে তাঁর ব্যক্তিগত সমালোচনা করা হল। কিংবা বইয়ের মতামতের সমালোচনা করলে সেটাও নৈর্ব্যক্তিকভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতাও অনেকের থাকে না। অন্যদিকে আবার খুব রুষ্ট হয়ে অপ্রিয়ভাষণ করার অভ্যাসও অনেকেরই রয়েছে।

আমি নিজে সমালোচনা খুব বেশি করেছি তা নয়। তবে যত সমালোচনা এযাবৎ করেছি সেসব ক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হয় যে কোনোরকমের বহিরাঙ্গীন চাপ আমি কখনও অনুভব করিনি। বরং আমি নিজের মধ্যে একটা চাপ প্রায় সবসময়েই অনুভব করেছি, সেটা হল, যে কেউ খেটেখুটে বই লিখেছেন অথচ সেটা বিশেষ কিছু হয়নি,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তা বললে তাঁর ক্ষতি হতে পারে। তাই সেই কাজটা আমি করব কিনা, এটা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে।

পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ বলতে কী বুঝব? আমি যা দেখি, আমার অল্পস্বল্প অভিজ্ঞতায়, পাশ্চাত্যের পুস্তক সমালোচনা প্রায়ই বেশ একটা পাঠযোগ্য প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। সমালোচনার ক্ষেত্রটিকে মনোগ্রাহী করে তোলার দিকে সকলেরই ঝোঁক রয়েছে। তুলনায় বাংলা সমালোচনায় প্রায়শই পাণ্ডিত্যের কচকচি। বইয়ের মূল বক্তব্য এড়িয়ে গিয়ে, অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ প্রসঙ্গগুলো বড়ো হয়ে ওঠে বাংলা সমালোচনায়। পাশ্চাত্যের হুবহু অনুসরণ হয়ত স্বাস্থ্যসম্মত হবে না, কিন্তু সমালোচনাও যে একটা বিশেষ ধরনের শিল্প প্রকরণ, সত্যবাদী হয়েও তার যে চিত্তাকর্ষক হবার দায় আছে। এ কথা বাঙালি সমালোচকদের মনে রাখা ভাল।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে শুধু বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রেই নয় সব দেশের সব ভাষার সমালোচনাতেই সমালোচ্য কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বইকে অন্ততপক্ষে তিনজন সমালোচকের কাছ থেকে সমালোচনা সংগ্রহ করে পাশাপাশি প্রকাশ করা বোধহয় ভালো, তাতে পাঠক অনেক বেশি নিরপেক্ষ ধারণা পাবে। সব বইয়ের ক্ষেত্রে এ কাজ সম্ভব না হলেও, কখনও কখনও এরকম করে দেখা যেতে পারে পাঠকেরা পছন্দ করছেন কিনা। আর একটা কাজও করা যায়, কোনো কোনো বইয়ের জন্য পাঠকের মতামত আহ্বান করে বেছে নিয়ে তার থেকে ৮/১০ জনের মতামত যদি প্রকাশ করা যায় তাহলে সেরকম মতামতের জন্য যেহেতু টাকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তাই ওরকম মতামত আন্তরিকভাবেই পাঠাবেন সাধারণ পাঠকজনেরা। সেক্ষেত্রে আমারও মনে হয়, লেখকের কাছে পাঠকসমাজের প্রত্যক্ষ সমালোচনা বোধহয় অনেক বেশি সহায়ক হবে, সমালোচনা সাহিত্যেরও যথার্থই উন্নতি হবে, লেখকরাও উপকৃত হবেন, যত্ন করে বই পড়ার অভ্যাসও খানিকটা তৈরি হতে থাকবে, ক্রমাগত মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্ত থাকার ফলে পাঠকেরাও ক্রমশ দায়িত্বশীল ও মনোযোগী পাঠক হয়ে উঠবেন।

আজকাল, ০৩।০৫।৮৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কী বই পড়েছেন

অত্যন্ত অস্বস্তি আর অনিচ্ছার সঙ্গে যুগান্তরের কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছি। আমার এমন নির্বোধ অহঙ্কার নেই যে ভাববো আমার নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিরাও জানতে উৎসুক হবেন যে আমি এখন কি পড়ছি বা কি লিখবার পরিকল্পনা করছি। জানি বটে, আজকের সংবাদপত্র সর্বশক্তিমান, চাইলে আমার মতন ছোটো মাপের মানুষকেও বড়ো করতে পারে, আবার বড়োকেও ছোটো করতে পারে। সংবাদপত্র কাউকে তোলে, কাউকে ফেলে, কাউকে ভাঙে, কাউকে বা গড়ে—কিন্তু আমার মতো অনতিখ্যাত মানুষ এই সব ভাঙাগড়ার আবর্তের বাইরে থাকতে পারলে আরাম পায় এই কথাটা প্রতিবেদক মশাইকে বোঝাতে পারলাম না।

আগামী বছরেই আমার যাট পূর্ণ হবে। এখন পর্যন্তও এমন কিছু লিখতে পারিনি যার দৌলতে আমি এর পরে কি লিখতে চাই তা জানবার জন্য বঙ্গীয় পাঠককূল আকুল হবেন। তবু প্রশ্নের জবাব তো দিতেই হবে। একটি নিভৃত উচ্চাশার কথাই বলি যা হয়ত কোনো কালেই পূর্ণ হবে না। বেশ কিছুকাল যাবৎ মনে মনে ভাবছি, পশ্চিম বাংলার মুসলমান সমাজকে নিয়ে, দেশ ভাঙার পর থেকে এই সমাজের ভাঙাগড়া নিয়ে একটি উপন্যাস লিখব। আজও যে এই লেখায় হাত দিতে সাহস পাইনি তার আসল কারণ একটা সংশয়। চল্লিশ বৎসর ঘনিষ্ঠ থেকেও ঠিক মতন ঠাহর করতে পারি না এই সমাজের 'অন্তঃমহলে' কতখানি প্রবেশ করতে পেরেছি। মুখের এবং ভাবনার ভাষা যতটুকু রপ্ত করতে পেরেছি তাতেও যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় অর্জিত হয়নি।

এখন কি পড়ছি তাও নাকি কবুল করতে হবে। গত এক মাস ধরে—অর্থাৎ যখন থেকে কলেজে পড়ানোর বার্ষিক চাপ একটু কমেছে তখন থেকে দু'টি বই পড়েছি। একটি হল, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্না পাকিস্তান—নতুন ভাবনা। আর অন্যটি Stanley Walpert-এর Jinnah of Pakistan।

সম্ভবত বছর দুয়েক আগে 'আনন্দবাজারে' একটি মূল্যবান সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল দেশভাগ বিষয়ে পশ্চিম বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মতামত। বিস্মিত হয়েছিলাম দেখে যে বেশ কয়েকজন প্রিয় লেখক দেশভাগের সবটুকু দায় মুসলমানদের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতারও সন্ধান করেছিলেন তাদেরই মধ্যে। এই বদ্ধ আবহাওয়ায় শৈলেশবাবুর বইটা যেন একটু তাজা হাওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এনে দেয়। সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসের ওই বিতর্কিত অধ্যায়টিকে পুণর্মূল্যায়ন করার সত্যনিষ্ঠ প্রয়াস দেখে উৎসাহিত বোধ করলাম। আরও অনেকের মতো তাঁরও চোখে ভারতীয় রাজনীতি মঞ্চের খল-নায়ক ছিলেন জিন্নাহ্। কিন্তু কিভাবে তাঁর মনের বদ্ধ অর্গলে প্রথম আঘাত পড়ল পঞ্চাশের দশকে এবং ক্রমে জিন্নাহ্‌কে নতুন করে আবিষ্কার করলেন তারই কাহিনি তাঁর এই বইখানি। এই বইয়ে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। তাঁর একটি মন্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে উল্লেখ করার মতো "এদেশে অগ্রাধিকার যদি কারও থাকে তবে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের রেড ইন্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়। হিন্দু নয়। সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। জিন্না প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু পুনরুজ্জীবনকামী শাখা। প্যান-ইসলামিজমের মতো প্যান হিন্দুইজম্।"

সাম্প্রতিক ভারতীয় ইতিহাসও একটি মহাকাব্যের মতো সাহিত্য কর্মের জন্ম দিতে পারে যদি তেমন সক্ষম ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের হাতে পড়ে। এই বিয়োগান্তক নাটকের দুই করুণ চরিত্র গান্ধী এবং জিন্নাহ্। হায় এ কি সমাপন।

এমন লেখা কে লিখতে পারবেন? Stanley Walpert নয় অবশ্য। উনি বলেছেন, Few individuals significantly alter the course of history. Fewer still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation-State. Mohammad Ali Jinnah did all three! চমৎকার বাচনভঙ্গি। কিন্তু যে সমদৃষ্টি থাকলে ইতিহাসের নিরাসক্ত বোধ নিয়ে সাহিত্যরচনা সম্ভব তা তাঁর নেই। গান্ধী সম্বন্ধে এক বিদ্বেষজাত অন্ধতা যেন তাঁর আছে। এমন কি কেউ আসবেন যিনি এই দুই ব্যক্তিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে তাঁদের ট্র্যাজিক ব্যর্থতার কাহিনি লিখতে পারবেন? যদি পারেন তাহলে সে হবে আর একটি মহাভারত।

যুগান্তর, ১৫।০৫।৯০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই কুড়ির সমৃদ্ধ ভূয়োদর্শন

(সমালোচনা তিন কুড়ি দশ—অশোক মিত্র)

চল্লিশের দশকে নাতিখ্যাত হলেও পরবর্তীকালে ভুবনজোড়া খ্যাতিমান এক ভারতীয়ের আত্মজীবনীটির কথা এখন সবাই জানেন। ওই সুলিখিত কিন্তু বহুবিতর্কিত আত্মজীবনীর সমালোচনা লিখতে গিয়ে জনৈক বিদগ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'বইটা আগাগোড়া উত্তম পুরুষ একবচনের কথা দিয়েই ঠাসা।' এই 'নির্বোধ উক্তিতে' উত্যক্ত হয়ে ওই আত্মজীবনীর লেখক বক্রোক্তি করেছিলেন, 'আত্মজীবনী যে প্রথম পুরুষ বহুবচনের কথায় ঠাসা থাকে তা তো জানতাম না।'

আমাদের আলোচ্য এই আত্মজীবনীটির তিনটে খণ্ডকে কিন্তু প্রথম পুরুষ বহুবচনের মিছিল বলা চলে। খণ্ড তিনটির পরিশিষ্টেও যে নির্দেশিকা যুক্ত হয়েছে তাতে শুধু একটু নজরহানি দিলেই আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ মিলবে। তবে সেই মিছিলের ভিড় ছাপিয়েও উত্তম পুরুষ একবচনের চেহারাটি আগাগোড়াই আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। যে অগণিত মানুষকে স্পর্শ করে লেখক শ্রীঅশোক মিত্র মশাইয়ের জীবন খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর মতো দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে, তাঁদের বহুজনের উপস্থিতি তাঁর জীবনকেও যেমন তেমনি তাঁর জীবনস্মৃতিকেও সরস ও সার্থক করেছে। তাঁর সমৃদ্ধ ভূয়োদর্শনের কাহিনি রক্তে-মাংসে এমন জীবন্ত হয়ে উঠত না, যদি না বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র মানুষ নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর কলমে এমন করে দেখা দিতেন। এই সব সমসাময়িক মানুষ আর ঘটনার নিরন্তর আনাগোনায় আত্মজীবনী অনেকখানি মানবিক ঐশ্বর্য আর সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে।

লেখক কীর্তিমান স্বনামধন্য। তবে সমনামা প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয়-বিভ্রাটের আশঙ্কা ঘটে বলে এঁর আই. সি. এস. পরিচয়টিও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। লেখকের এই বইয়ের নাম যদিও 'তিন কুড়ি দশ' তবু প্রস্তুত এই তিন খণ্ডে লেখক নিজের জীবনের দ্বিতীয় কুড়িতে প্রায় পৌঁছেই তাঁর জীবনকাহিনীকে আপাতত শেষ করে দিয়েছেন। 'আপাতত' এই কারণে বলছি যে, শোনা যাচ্ছে চতুর্থ খণ্ডও অদূর ভবিষ্যতে হাতে পাবার আশা আছে। এই দীর্ঘ কাহিনির (সর্বসাকুল্যে ৭০৬ পৃষ্ঠা) জাতি-নির্ণয় করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'এটি মুখ্যত আমার স্মৃতিকথা। আত্মীয়-পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে দৈনন্দিন হাসিকান্না ঠাট্টা-আড্ডার সঙ্গে, আমার জীবনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতি গ্রন্থিতে ভারতেরও বৃহত্তর জগতের ঘটনাবলি যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে গেছে তারই ব্যক্তিগত বিবরণ এতে আছে।' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, তাঁদের একমাত্র সন্তানের জন্ম যেদিন হয় সেদিনই স্তালিনগ্রাদকে জার্মান অবরোধমুক্ত করবার জন্য রুশ প্রত্যাঘাত শুরু হয়। স্ত্রীর কঠিন প্রসবের জন্য উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলি নিশ্চয়ই বিশেষ এক তীব্রতা লাভ করেছিল বিশ্বের ওঠাপড়া ভাঙাগড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

লেখকের নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা ও বিষয়ের বর্ণনা প্রায়ই বেশ উপাদেয় হয়েছে। পদে পদে কত চেনা মানুষ ও জানা ঘটনাকেও ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখার আনন্দ পেয়েছি। তবু স্বীকার করছি যে, এই খণ্ডগুলিকে যে সযত্নে সংরক্ষণ করব, বারবার খুলে দেখব, তা কিন্তু ওই সাম্প্রতিক 'ইতিহাস' অংশেরই জন্য। তিনি প্রচলিত অর্থে ইতিহাস লিখতে বসেননি বটে তবু নিজেও জানতেন যে, 'সে সময়ের ঘটনাবলি সম্বন্ধে আমার তৎকালীন ধ্যান-ধারণা স্মৃতির থলি থেকে বার করে গেঁথে গেঁথে চলাই আমার উদ্দেশ্য, তবে সন-তারিখ দেয়া ঘটনাবলি ও অন্যদের উক্তি থেকে একটি নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসও নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।' তা সত্ত্বেও ব্যক্তিসম্পর্ক-বিরহিত নীরক্ত পাণ্ডুর ইতিহাস এটি নয়। যদি হতো তাহলে হয়ত আমাদের মতো অ-বিশেষজ্ঞ পাঠকের এতখানি আগ্রহের বস্তু হত না। তথ্যের ভারে ও তত্ত্বের বিশ্লেষণে এই রচনার সাহিত্যিক রসও হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ণ হত। বর্তমান মূল্যমানে খণ্ড তিনটির মূল্য অত্যন্তই সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও একত্রে তিনটি খণ্ডই সীমিত-সাধ্য সাধারণ বাঙালি পাঠকের হস্তগত নাও হতে পারে। তাই এই পুস্তকটির সুবিস্তৃত পরিধির কিছুটা বিশদ পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত হবে না বলেই আমার ধারণা।

জনৈক অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ব্যক্তির কাহিনিটি একটি বড়ো পটভূমিকায় স্থাপিত হয়েছে বলে এবং মাঝে মাঝে জগৎ-জোড়া ঘটনারাশির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে বলেও প্রায়ই নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক জীবনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। আবার নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস অংশটিও একটি ব্যক্তির প্রাণরসে জারিত হয়ে প্রায় এপিক উপন্যাসের মাত্রা পেয়েছে, অপরিকল্পিত গভীরতাও লাভ করেছে। লক্ষ করবার বিষয় যে, লেখকের জন্ম-সাল ১৯১৭! এ বিষয়ে তিনি অবশ্য কোনো মন্তব্য করেননি। ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসে পরবর্তী দুই কুড়ি বছর বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে অর্থবহ কাল, তাতে সন্দেহ নেই। হয়ত সে কারণেই লেখক পরে সসঙ্কোচে অনুভব করেছেন, 'তখন বুঝতে পারিনি, এখন সব কিছু স্মরণ করলে বুঝতে পারি, সারা জগতে তখন যে বিপর্যয় চলছিল তার অনুপাতে আমার জগৎ কত ছোট্ট, নিতান্ত নগণ্য আর অলীক ছিল।' এ রকমই কি হয় না? যুগান্তকারী কত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রায়ই ব্যক্তি-মানুষের জীবনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ব্যক্তিকে তেমন করে স্পর্শও করে না হয়ত। ব্রহ্মদেশ থেকে যে সময়ে শিশুবৃদ্ধসহ হাজার হাজার ভারতীয় নদীনালা বনজঙ্গল পার হয়ে 'লং মার্চ' করছিলেন স্বদেশের দিকে, অসুস্থ মুমূর্ষু ক্ষুধার্ত মানুষ খোলা আকাশের তলায় দিনের পর দিন কাটাচ্ছিলেন, সে সময়েই ডাক বাংলোর একটা ঘরের দখল নিয়ে যে তিনি 'অধিকারের লড়াই' লড়ছিলেন এটা ভাবতে পরে হয়ত তাঁর ভালো লাগেনি. কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সারা দেশ জুড়ে প্রায় সব মানুষই তো যে যার সংকীর্ণ বৃত্তে ওইভাবেই ঘুরপাক খাচ্ছিল তখন।

এই লেখকের চারিত্র্যে এবং রচনাশৈলীতেও রোমান্টিকতা আর সাংসারিকতার চমৎকার একটা মিশাল ঘটেছে যা সচরাচর দেখা যায় না। একজন সেনসাস কমিশনার যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যেরও বিদগ্ধ সমালোচক হবেন, তাও সাধারণত কেউ আশা করে না। সেনসাস কমিশনার হিসাবেও তিনি জনগণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও যে সব নূতন নূতন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ক্রমে উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন, তাতে সমাজতাত্ত্বিকরা ও অর্থনীতিবিদরা তো উপকৃত হয়েছেনই ; কারণ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এই সব তথ্য অপরিহার্য। তবে সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও এগুলি আগ্রহের বিষয় হওয়া উচিত। কারণ দেশের 'ক্ষুধা ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার ভূগোল' ততখানিই জানা দরকার যতখানি তাঁরা জানেন রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ত্রিবিধ উৎস কিংবা আধুনিক বাংলা নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকের উপর পূর্ব ইয়োরোপীয় নাটকের প্রভাব সম্বন্ধে। জীবনের প্রতি এই লেখকের একটি অখণ্ডিত নিটোল দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় জানার কোনো ক্ষেত্রই তাঁর পক্ষে তুচ্ছ বলে অবহেলা করবার মতো নয়। এমন সর্বত্রগামী কৌতূহল থাকার ফলেই বোধ হয় নানা আপাতবিশ্লিষ্ট ব্যাপারও তাঁর স্মরণে রয়ে গিয়েছে।

সংখ্যা স্মরণে রাখার ব্যাপারে আমার বিশেষ দৈন্য থাকায় সসম্ভ্রমে লক্ষ করেছি তিনি কী অবলীলায় ফিরিস্তি দিয়ে গিয়েছেন, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে লন্ডনের কোন দোকান থেকে কত শিলিং দরে কটি প্যান্ট কিনেছিলেন, গ্রেট ইস্টার্ন, পেলিটি বা ফারপোর কোথায় কত দরে পাঁচ কোর্স বা তিন কোর্সের লাঞ্চ পাওয়া যেত, ওয়েটারকে কত বকশিস দেওয়া দস্তুর ছিল, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার কোন পেপারে কত নম্বর পেয়েছিলেন, বাগদত্তা বিয়ের দিনে পরবেন বলে মহীশূর সিল্কে লাগাবার জন্য কত দামের বেনারসী পাড় কিনেছিলেন, তাঁদের মফস্বলের সংসার থেকে গৃহিণী আভার সপ্তাহ খানেকের অনুপস্থিতিকালে ৫৬টা ডিমের মধ্যে কটি ডিমের হিসেব মিলছিল না ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি তো নিশ্চয়ই তাঁর নোটবুকে লিখে রাখেননি, যেমন করে লিখে রাখতেন চাকুরির প্রত্যেক স্টেশানের অধস্তন কর্মচারীদের এমনকি তাদের পরিবারবর্গেরও নামধাম। তাঁর জীবনটা যেমন করে মেল ট্রেনের গতিতে ছুটে চলেছিল, তাতে তাঁর বিবরণে প্রত্যেকটি স্টেশানের খুঁটিনাটি অন্তরঙ্গ বিষয়ে এমন তথ্যের সমারোহ সত্যিই আশ্চর্য করে। এরই পাশাপাশি রয়েছে, উদাহরণত, তাঁর স্বাধীনতাদিবসের অনাবিল কৈশোরিক উচ্ছ্বাসের স্মৃতি। 'মুক্তাফলের মতো দুগ্ধাভ, লাবণ্যময়, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের প্রশান্ত প্রত্যূষে হ্বাইনগার্টনারের পরিচালনায়...নবম সিম্ফনির আনন্দস্তব মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হবার আগে যন্ত্রসংগীতের প্রথম 'বার'গুলিও তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে আনন্দসংগীত যখন ধ্বনিত হল, প্রায় সেই মুহূর্তে রক্তিম সূর্য সৃষ্টির আশীর্বাদ বহন করে পূর্ব দিগন্তে যেন লাফ দিয়ে ভেসে উঠল।' এর পর বেটোফেনের সৃষ্টিকর্তাকে সকৃতজ্ঞ অর্ঘ নিবেদনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীত বাজিয়ে লেখক তাঁর দেহমনকে পবিত্র বোধ করেছিলেন। নেহরুর সেদিনকার অবিস্মরণীয় বক্তৃতা... 'সারা জগৎ যখন ঘুমিয়ে থাকবে ভারত তখন তার নিয়তির অভিসারে যাবে...' ইত্যাদি সত্ত্বেও সমসাময়িক বাঙালি লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই কি ওই দিবসটি সম্বন্ধে কিছুটা নীরব নিরুত্তাপ ছিলেন? কারণ আর কারও রচনায় তেমন স্মরণীয় কোনও বিবরণ দেখেছি বলে মনে পড়ছে না এখনই। তাই মিত্রমশাইয়ের এই উচ্ছ্বাস বিশেষ করে চোখে পড়েছে। এবং জানতেও ইচ্ছা করছে, সেদিনের সেই ত্রিশ বছরের যুবক সিবিলিয়ানের ইন্টেলেকচুয়াল বন্ধুরাও কি অনুরূপ আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন? কারণ আমার বয়সী ইস্কুল-কলেজের পড়ুয়া যারা ওইদিনে 'তিরঙ্গা ঝান্ডার' বন্দনায় গদগদ হয়েছিল তাদেরও অনতিবিলম্বে মোহমুক্তি ঘটেছিল যখন 'রাজনীতিতে পাকা' দাদা-দিদিরা ঘোষণা করেছিলেন, 'ইয়ে আজাদী ঝুঠা হৈ'। আমরা লজ্জিত হয়ে মেনে নিয়েছিলাম অমনতর উচ্ছ্বাস বুঝি কেবল আমাদের মতো অপরিণতবুদ্ধিদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। অবশ্য লেখক এ কথাও জানিয়েছেন, 'পতাকা তোলার পর আমরা ভূদেব ভবনের (চন্দননগরের) দোতলায় গঙ্গার বুকে খোলা রেলিং ঘেরা ছাদে চা খেতে সমবেত হলুম, তখন হঠাৎ আমার বুক কে যেন বিষাদের সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরল।' এই আজাদী ঝুঠা হোক বা না হোক, ওই বিষাদটাই বোধহয় সেদিন আরও সর্বব্যাপী অনুভূতি ছিল এই অঞ্চলে। অবশিষ্ট ভারতবর্ষে হয়ত নয়। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের খাঁড়া যে বাঙালি আর পাঞ্জাবিদের দু ভাগ করে ফেলেছিল তাদের তাৎক্ষণিক উল্লাসকে গভীর বিষাদ অচিরেই গ্রাস করবে এটাই ছিল ভবিতব্য। খণ্ডিত দেশের মানুষজন যে সহসা দুই ভিন্ন দেশের নাগরিক হয়ে গেল,...দেশ দুটি যে পরস্পরের পক্ষে দুরধিগম্য হয়ে যাচ্ছে, এই বোধ অপরিসীম বিষাদ ছাড়া আর কী-ই বা সৃষ্টি করতে পারত? তাই স্বাধীনতা-দিবসের আবেগ আজ যাঁরা স্মরণ করতে পারেন তাঁদের পক্ষে সেই স্মৃতি অবিমিশ্র আনন্দের নয় বলেই সেই প্রত্যূষের এমন আবেগোচ্ছল অকপট বর্ণনা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে।

সদ্য ইংল্যান্ড-প্রত্যাগত আই. সি. এস. পুত্রের মতিগতি শখ-শৌখিনতা তাঁর কড়া ধাতের পিতার (যাঁর উনিশ শতকের সব ভালো আদর্শের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ) সম্পূর্ণ মনঃপূত না হওয়ায় পিতা নাকি তখনকার প্রচলিত একটি শ্লেষোক্তি উচ্চারণ করে পুত্রকে ব্যথা দিয়েছিলেন। পুত্রের ভাষায় 'আমি না হব ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান, না সিভিল্ বা ভদ্রসভ্য, না সার্ভিস বা লোকহিতব্রতী।'

সমাজতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ এ সব নাকি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার—means of social control! এর সাহায্যে বিপথগামী ব্যক্তিকে পথে আনা হয়। এ ক্ষেত্রে যে সত্যিই শ্লেষের সুফল ফলেছিল, তাঁকে পিতার অভীষ্ট পথেই নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং সারাটা জীবনই তিনি এই বিদ্রূপতাত্মক 'ভবিষ্যদ্বাণীকে' যে ব্যর্থ প্রমাণ করেছিলেন তার অজস্র সাক্ষ্য রয়েছে এই বৃত্তান্তে।

তবে পিতা এমন শ্লেষোক্তি না করলে পুত্রের জীবনটা উল্টো খাতে বইত এমন কথাও আমি বলছি না। কারণ সত্যিই তো মনে মনে নিজেকে তিনি যে আদর্শে তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন এবং পরিবারের কাছ থেকে আশৈশব যে ঐতিহ্যের সংস্কার তিনি লাভ করেছিলেন তাতেই তাঁর চরিত্রের পাকা ভিত গড়া হয়ে গিয়েছিল। ('শুধু এইটুকু বলতে পারি বাবা ও মা আমার মনে 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' তার সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা ও বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।') তবে এই শ্লেষবাক্যটি নিশ্চয়ই চিরকাল তাঁর চেতনে-অবচেতনে একটি সতর্কবাণীর মতো কাজ করেছে—বিশেষ করে তাঁর চাকুরির ক্ষেত্রে। এক বছরের অক্সফোর্ড-বাস এবং অগ্রজ আই. সি. এস.-দের জীবনযাত্রার সাহেবিয়ানা তাঁকে খানিকটা প্রভাবিত করে থাকলেও ভারসাম্য রক্ষা করার মতো বিপরীত ভাবনা ও প্রবর্তনা শুধু তাঁরই নয়, আরও কোনো কোনো সমজীবীর মনেও নিশ্চয়ই কাজ করছিল।

ফলে এঁরা কেউ কেউ মনে-প্রাণে ভারতীয় হয়ে ওঠাকেই ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার 'পাপক্ষালনের' যথার্থ উপায় বলে স্থির করেছিলেন। নয়তো অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈবাল গুপ্ত, সত্যেন রায় এবং স্বয়ং লেখকের মতো সিভিলিয়ানদের আমরা পেতাম না। এক দিকে সরকারের শাসন নীতি-পদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের গ্লানি, অন্য দিকে স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ ও আশা, ব্রিটিশ ভারতীয় নির্বিশেষে এই দোটানা তাঁদের অনেকেরই মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত। সেই দ্বন্দ্বের ইনি কী ভাবে কতটা নিরসন করবার চেষ্টা করেছিলেন, দুটি বিপরীত জগতে বাস করেও মানসিক স্থৈর্য এবং ভারতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন তার বৃত্তান্তও পাঠককে স্পর্শ করবে।

আর 'সিভিল' হবার কথা যখন উঠলই তখন মিত্র মশাইয়ের নিজের ভাষায় তাঁর কর্মজীবনের একেবারে গোড়ার দিককার একটি অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিতে হয়

'গৌরনদী গ্রামে আমি জীবনে সব থেকে অন্যায় ও অভদ্র আচরণ করি। এর জন্য অবশ্য আমি আর জামান দুজনেই সমান দায়ী, বরং আমার মনে হয় জামান না থাকলে আমি বোধ হয় ততটা বেয়াদপি করতুম না। কিন্তু দুজনেই যদিও একই শাস্তি পেয়েছি তবু যেহেতু আমার জন্যই ঘটনাটি মুখ্যত ঘটে, সে জন্য বাড়তি দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়। গৌরনদীর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলায় আগে থাকতে আমরা থাকার অনুমতি চেয়ে লিখিত-পড়িত ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম। পৌঁছে দেখি জেলা বোর্ডের দুটি অফিসার আমাদের জন্য বরাদ্দ দুটি ঘরই দখল করে আছেন। আইনত ডাক বাংলার ঘরের উপর দাবি তাঁদেরই সব থেকে বেশি, অতএব তাঁরা কিছু অন্যায় করেননি। সম্ভবত দুজনের কেউই মনে করেননি যে, বছরের প্রথম দিনই—এবং তখন সেটি ছুটির দিন হত—আমরা কাজপাগল হয়ে ছুটে আসব। বিশেষত যখন প্রথা ছিল আগের দিন সারা রাত হই-হল্লা করে কাটানো। অফিসার দুটি ভদ্রতা করে পরের দিন দুটি ঘরই ছেড়ে দেবেন বললেন, তবে ওই রাত্রে তাঁরা একটি ঘর নিজেদের জন্য রাখতে চাইলেন। এ প্রস্তাবে খুব বেশি অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের জেদ চেপে গেল, আমাদের অধিকার ছাড়ব কেন? এই অধিকারের লড়াইয়ের পিছনে অবশ্য চাকরির গরমও ছিল ফলে আমরা ভদ্রতা, সভ্যতা, বংশগত শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাঁদের ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খালি করতে বাধ্য করলুম। তাঁরা চলে গেলেন। আমরা সদর্পে দুজন দুই ঘর দখল করলুম। ভুলে গেলুম যে, মাথা ফুলে গিয়ে আমি হয়ত আর সিভিল থাকব না। দিন বেশ তাড়াতাড়ি কাটল। অফিসাররা সদরে গিয়ে নালিশ করায় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে অনুযোগ জানালেন। আমরা যদি ইংরেজ হতুম তাহলে হয়ত ব্যাপারটা এত দূর গড়াত না। ইংরেজ সেটেলমেন্ট অফিসার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দু পক্ষকে ডেকে মিষ্টি কথায় মিটিয়ে দিতেন আমি জানি ১৯৪৩ সালে এই ধরনের একটি ঘটনায় দায়ী হয়ে নারায়ণগঞ্জের এস. ডি. ও-কে কোনও হাঙ্গামা পোহাতে হয়নি। কিন্তু পরে যখনই বিষয়টি সম্বন্ধে ভেবেছি তখনই মনকে বুঝিয়েছি, যা হয়েছিল ভালোর জন্যই হয়েছিল, তার কারণ জীবনে দ্বিতীয়বার এ ভুল করিনি। এ. ডব্লিউ, হ্যাচবার্নওয়েল (সেটেলমেন্ট অফিসার) মৃদু ভর্ৎসনা করে আমাকে আর জামানকে একটি করে চিঠি লিখলেন, আমরা যেন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে লিখি তাঁর দুটি অফিসারকে আমাদের ক্ষমাপ্রার্থনা জানিয়ে। আমরা হয়ত তাই করতুম যদি না হ্যাচবার্নওয়েল উপর-পড়া হয়ে তিনদিনের দিন—অর্থাৎ যেদিন তাঁর চিঠিটি এসে পৌঁছল, সেদিনই—নিজে গৌরনদীর বাংলায় বিকালে হাজির হয়ে আভার সমুখে আমাদের উপর বকাবকি করতেন। এ অবস্থায় অবশ্য জামানের মেজাজ খারাপ হওয়া ন্যায্য, আমার নয়। ফলে আমরা তাঁর উপরে মেজাজ দেখিয়ে তাঁকে ফেরত দিলুম। মার্চ মাসে আমি যখন মুন্সীগঞ্জে, তখন আমার কাছে চিফ সেক্রেটারির একটি কড়া আদেশ এল, চিঠি পাবা মাত্র আমি যেন জেলা বোর্ডের অফিসার দুটি আর হ্যাচবার্নওয়েলের কাছে বিনাশর্তে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখি এবং সেই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনার কথা যেন চিফ সেক্রেটারিকেও জানাই। তা যদি না করি তা হলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি সেই মতো লিখলুম। এর এক মাস পরে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে. এল. লিউয়েলিনের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম যে, ঘটনাটির বিষয়ে আমার চাকরির খাতায় একটি বিরূপ মন্তব্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই চিঠিতে লিউয়েলিন নরম ভাষায় আরও লিখলেন, তিনি আশা করেন ভবিষ্যতে আমার কাজ দিয়ে আমি এই বিরুদ্ধ মন্তব্যটিকে নাকচ করাবার চেষ্টা করব। আরও লিখলেন, একজন আই. সি. এস. অফিসার হয়ে আমি যেন নিজের হকের থেকে পরের হক রক্ষা করতে বেশি সচেষ্ট হই এবং আমি যেন এমন কিছু না বলি বা করি যার জন্য জনসাধারণের চোখে আমাকে খেলো বা নীচু হতে হয়।'

শেষ বাক্যটি বিশেষভাবে লক্ষ করুন। এই ঘটনাটা বর্ণনা করবার আগেই লেখক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ঝালকাটি পৌঁছে সেখানে এক মাসের যুগ্ম ক্যাম্পে আরাম ও আহারের কী এলাহী নবাবী বন্দোবস্ত উপভোগ করেছিলেন। সেই 'স্বর্ণযুগে' রেলওয়ে কেটারার সোরাবজি কোম্পানির পান-ভোজনের আয়োজন আর কলকাতা থেকে সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল ঘুরে ঢাকা যাওয়ার রিভার অ্যান্ড স্টিম নেভিগেশান কোম্পানির আদর-আপ্যায়নের যে লোভনীয় বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে আজকের ট্রেন-যাত্রী স্টিমার-যাত্রীদের ঈর্ষাও হবে না, কারণ তাদের বিশ্বাসই হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

না। ঝালকাটিতেও ক্যাম্পের কেন্দ্রবিন্দু নাকি ছিল 'মেস তাঁবু' আর দিনে তিনবার সেখানে ব্রেক ফাস্ট (আশা করি আমার বেলাতেও শব্দটি ছাপাখানার কল্যাণে ফার্স্ট হয়ে যাবে না) লাঞ্চ ও ডিনার। লেখক দেখে-শুনে মন্তব্য করেছেন, 'তাতে বুঝলুম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা এ দেশে কী পরিমাণ কর্তৃত্ব ও সেবা ভোগ করেছেন, আর তার ফলে তাঁদের নৈতিক চরিত্রে, স্বভাবে ও ব্যবহারে কতখানি বিকার আসা সম্ভব হত।' এই পরিপ্রেক্ষিতে পড়লে গৌরনদী ডাকবাংলায় ওই শিক্ষানবিস প্রশাসক-যুগলের আচরণ আরও বোধগম্য এবং কিছুটা ক্ষমার্হ ঠেকে। বরং এমন রাজদুলাল-সুলভ আদরে রেখেও যে এদের এমন শাসনে রাখা হত সেটাই তো আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকছে। বলা বাহুল্য, অখণ্ডিত এই উপমহাদেশকে যে মাত্র হাজার-খানেক আই. সি. এস. অফিসার দিয়ে চালানো সম্ভব ছিল তা নিশ্চয়ই আদ্যোপান্ত এই কঠিন নিয়ন্ত্রণের ফলেই।

আমার বিশ্বাস, উপরের ওই দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠকরা অপছন্দ করেননি। এবং পাঠকরা নিশ্চয়ই মনে মনে তুলনা করে দেখেছেন যে, ওই 'জঘন্য সাম্রাজ্যবাদের' যুগেও সরকারি আমলাদের আচরণ যে নীতিবোধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হত আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে। প্রশাসনিক ঔদ্ধত্য ও ওই ধরনের অন্যায় আচরণ তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আজকাল দলীয় স্বার্থে যখন নিষ্ঠুরতম অমানবিক আচরণও ঘটে যায় তার জন্যেও কোথায় যে সুবিচার প্রার্থনা করা যাবে, কেউ জানে না। সাম্যবাদী সরকারের মুখ্যমন্ত্রীও স্বয়ং বানতলার ঘটনাকে কিভাবে লঘু করে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছিলেন, জনসাধারণের সম্মিলিত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও কেমন বধির হয়ে ছিলেন সেই সাম্প্রতিক ঘটনা এখনও ভুলে যাবার সময় হয়নি।

অতঃপর সার্ভিস বা লোকহিতব্রতের প্রসঙ্গটাও এসে পড়ে। এবং এই প্রসঙ্গেও আমি আবার একটি উদ্ধৃতি দেব—তবে তত দীর্ঘ নয়। একটি মাত্র প্যারাগ্রাফ

'গৌরনদীতে এই চার সপ্তাহ ধরে আমরা আমিন ও কানুনগোদের চেষ্টায় এবং নিজেরা যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করে শিখলুম, কী করে আমাদের সমাজের স্তরের পর স্তরে, ভণ্ডামি, দুমুখো কথা আর কাজ, লোকের ক্ষতি করবার প্রবণতা ও ক্ষমতা, দেশের চৈতন্যের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে, বিশেষত আমাদের কৃষি-নির্ভর গ্রামসমাজে। এই সঙ্গে বুঝলুম এই চরিত্র বিকারের পিছনে, আমাদের সরকারি কাঠামোয় ছোটো বড়ো আমলা-ফয়লাদের ঘাঁতঘোঁত বুঝে সময়সুবিধামতো, কলকাঠি নাড়ার সুযোগ কত সর্বব্যাপী। বিশেষত সেই সব সুযোগ যদি রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবায় নিযুক্ত হয়। একদিকে চৌথালা, অন্য দিকে লালুপ্রসাদ, আর একদিকে জঙ্গল সাঁওতাল কি এক দিনে হয়!'

আমরা রাজনৈতিক পরাধীনতাকেই সমস্ত দুঃখের মূল বলে মনে করেছিলাম। এই মূলকে উপড়ে ফেলতে পারলেই আর সব সমস্যা আপনা থেকে সহজেই দূর হয়ে যাবে এমন একটা সরল বিশ্বাস—রবীন্দ্রনাথের অজস্র সতর্কবাণী সত্ত্বেও—অনেকেরই মনে ছিল। গান্ধিজি যখন ইংরেজদের বলেন, 'হয় আমাদের ঈশ্বরের হাতে, নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সর্বনাশের হাতে ছেড়ে দিয়েই তোমরা বিদায় হও'...তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বর চট করে হাত গুটিয়ে সরে দাঁড়িয়ে 'তথাস্তু' বলেছিলেন। ফলে যা হবার তাই হল। আর এক বার শর্বরী পোহাতেই বণিকরা যখন মানদণ্ড-রাজদণ্ড সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্হিত হল তখন দ্রুত এবং অতি অনায়াসে সাম্রাজ্যবাদীর আমলাতন্ত্র গণতান্ত্রিক লোকপীড়ন যন্ত্রে পরিণত হল। আমাদের এই সর্বনাশের বীজ আসলে কোথায় উপ্ত ছিল তারও তো কিছুটা হদিস পাওয়া গেল উপরে উদ্ধৃত প্যারাগ্রাফেই।

এর পরেও অবসরপ্রাপ্ত এই প্রশাসক মশাই দুঃখ করে লিখেছেন, 'পূর্বে সর্বোচ্চ স্তর থেকে স্তরে স্তরে তৃণমূল পর্যন্ত যে নিয়মিত তদারক, অনুশাসন ও পরিদর্শনের কাঠামো ছিল তা এখন বিলোপের পথে।' কিন্তু এগুলি তো রোগের উপসর্গ মাত্র, রোগের কারণ নয়। কারণটা আমরা সবাই জানি সমগ্র সমাজের, বিশেষ করে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের নৈতিক অধঃপাত আর লোভ এবং তারই সংক্রামণে প্রশাসনেরও পচন। যার ফলে হর্ষদ মেহতারা এখন আর খলনায়ক নয়, বরং যুবসমাজের ঈর্ষা ও অনুকরণের পাত্র। সেখান থেকে স্তরে স্তরে তৃণমূল পর্যন্ত এখন ছড়িয়ে পড়েছে লোভ আর অনর্জিত উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা। কাকে আমরা ঠেকাব!

অতঃপর এই প্রসঙ্গে আরও একটু শুনুন '১৯৪৩ সালে মন্ত্রী সুরাবর্দীর নামে লোকে দুর্নাম দিত, তিনি নাকি তাঁর সম্প্রদায়ের অনেককে সরবরাহ ব্যবসায়ে নামিয়েছিলেন ; কিন্তু কেউ এ অভিযোগ করেনি যে, তিনি নিজের পকেট ভারী করেছিলেন। নিজের পকেট ভারী করা ঘৃণার বিষয় ছিল, আজকালকার মতো শ্রদ্ধা বা বাহবার বিষয় ছিল না। ১৯৪৬ সালে আই. সি. এস., এস. কে. ঘোষের ড্যালহৌজি স্কোয়ারে স্টিভন হাউস কেনার সংবাদ সারা দেশে ভূমিকম্পের মতো ভীতি সঞ্চার করে। ১৯৫৫ সালে আমি কয়েক মাসের জন্য দুর্নীতিদমন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ছিলুম। তখন গেজেটেড কর্মচারীদের মধ্যে চুরি বা উৎকোচের অভিযোগ হাতে গোনা যেত, বলা যায়।'

এ তো প্রায় ফা হিয়েন কি হিউয়েন সাং-এর বিবরণ মনে হচ্ছে। আজ পশ্চিম বাংলাতেও প্রাইমারি স্তর থেকেই শিক্ষকতার চাকরির জন্য লক্ষ টাকা উৎকোচ দেওয়াটাই নাকি দস্তুর। ওই টাকায় নানা স্তরের সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিকে তুষ্ট করা হয়। পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দেবার নামে রাজনৈতিক দাদাদেরও পরিতৃপ্ত করা হয়। আর এই উপায়ে চাকুরিটা একবার পেয়ে গেলে তখন আর তাঁকে শিক্ষকতা করতে হয় না, পার্টির কাজ করলেই চলে। আর এই যে 'দেহি দেহি কেবলম্'—এই লোভের প্রসারিত হস্ত ধাপে ধাপে কত উপর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তার পরিমাণও কত আকাশ-ছোঁয়া হতে পারে সে তো বফর্স কেলেঙ্কারি, হর্ষদ কেলেঙ্কারির নিরপেক্ষ দর্শকও জানে। এক-একটা কেলেঙ্কারি প্রথমটায় হয়ত ভূমিকম্পের মতোই ভীতির সঞ্চার করে এখনও, কে কোন্ জালে ধরা পড়ে, কিংবা কোথায় কার সারা জীবনের সঞ্চয় মারা পড়ে...কে জানে! কিন্তু অবিলম্বে মিডিয়ার কল্যাণে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপাদেয় রহস্য-রোমাঞ্চের কাহিনি হয়ে সমাজের নীতি-বোধকেই অসাড় করে ফেলে।

আমার বিবেচনায় এই বইয়ের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অংশ হল এই দুই কালের—সাম্রাজ্যবাদের এবং সাধারণতন্ত্রের—প্রশাসন নীতি ও ব্যবস্থার তুলনামূলক কিছু বিবরণ। শ্রীঅশোক মিত্র প্রশাসক-জীবন শুরু করেছিলেন ইংরেজ রাজত্বের শেষ দশায়। সামাজ্যবাদের শেষ কামড় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিক্রমপুরে মন্বন্তরের মোকাবেলা করার সময়। তা ছাড়া সাইক্লোনে বিধ্বস্ত মেদিনীপুর জেলাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ডিনায়েল ও অপসারণের নীতির সাহায্যে কীভাবে দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সে কথা প্রশাসনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কারও আর অজানা ছিল না। আবার ওই মন্বন্তরের দায়িত্ব কালোবাজারি আর মজুতদারদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের গ্রেফতার করা, তাদের মজুত তল্লাশি করে প্রায় শূন্য গুদাম সিল করা ইত্যাদি প্রহসনেও জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল প্রশাসনকে। অথচ কী তৎপরতার সঙ্গে সরকারের তৎকালীন রাজনৈতিক শুভানুধ্যায়ীরা সুচতুর প্রচার চালিয়ে সরকারকে জনরোষ থেকে রক্ষা করেছিল। ফলে বিনা প্রতিবাদে পনের হাজার মানুষ কলকাতার ফুটপাথে, এমন কি খাবারের দোকানের সামনেও অনাহারে পড়ে থেকে মারা যায়। একটিও মুদির দোকান কি খাবারের দোকান কোথাও লুট হয়নি। মিত্র মশাই লিখেছেন, '১৯৪২ থেকে ১৯৪৬-এর শেষ পর্যন্ত যে-সব ঘটনা ঘটে তার প্রতিটি শাণিত তরোয়ালের মতো একের পর এক আমার বুকে বেঁধে।' এই পাঁচ-ছয় বছরের গোলামির অভিজ্ঞতা নিয়ে সদ্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শামিল হন নবীন উৎসাহে। তাঁর সেই স্বাধীনতা-দিবসের আবেগ-উদ্দীপনার কথা তো আগেই বলেছি।

এখন আমরা অহরহ হা-হুতাশ করি যে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধসে পড়ছে। কিন্তু এর কোথায় কোনো গলদ কিভাবে দূর করা যেতে পারে সে বিষয়ে আমরা সবাই খুব বিভ্রান্ত। কেউ মনে করেন শেষন্ হয়ত কিছু একটা করতে পারবেন গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। সাধারণ মানুষরা আর কি করতে পারে? কতটুকুই বা তাদের শক্তি! কিন্তু যে দু-চারজন মানুষ এখনও গঠনাত্মক কিছু সহজ-সাধ্য পরামর্শ দিতে সক্ষম তাঁদের মধ্যে শ্রীঅশোক মিত্র মশাই নিঃসন্দেহে একজন। প্রশাসনের মূল থেকে শীর্ষ পর্যন্ত যেহেতু তাঁর নখদর্পণে তাই তিনি গলদটা যেমন চট করে ধরতে পারেন, তেমনি কিছু সম্ভবপর প্রতিবিধানের পরামর্শও দিতে পারেন। বামফ্রন্ট সরকার তো খুব ঢাক পিটিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। আজ ওই পঞ্চায়েতের দৌরাত্ম্যে গ্রামজীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রায়ই ভুক্তভোগীদের মুখে তার বিবরণ শুনে উদ্বিগ্ন বোধ করি। বিশেষত প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দখলের যে জঘন্য রাজনীতি প্রচলিত হয়ে গেছে তাতেই সবচেয়ে সর্বনাশ হচ্ছে। আবহমানকাল থেকে গ্রামের ইস্কুল-মাস্টার যে শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন সেই মাস্টারমশাইরা এখন পার্টির দাসানুদাস। এ-হেন পঞ্চায়েতের তুলনায় প্রাক্-স্বাধীনতাকালের ইউনিয়ন বোর্ড যে অনেক বেশি জনকল্যাণ করতে পারত তাতে মিত্র মশাইয়ের মতো আমাদের অনেকের মনেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো সন্দেহ নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে আজকের মতো নারীপুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার ছিল না বটে, 'কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের ম্যানুয়ালে কিছু সদর্থক নিয়মপদ্ধতি ছিল যা বজায় থাকলে পঞ্চায়েতগুলির কার্যরীতি ও ব্যবহারে অনেক বেশি সততা, সমদর্শিতা ও নিঃস্বার্থ সেবা পাওয়া যেত, জনসাধারণের অর্থ নয়ছয় হত না, বিশেষ বিশেষ পদাধিকারীদের পকেটে যেত না।'

মিত্রমশাইয়ের উপর্যুক্ত কথাগুলি কি কারও কানে পৌঁছাবে? নির্বাচনের ব্যাপারে গণতান্ত্রিক ভঙ্গিমাটুকু রক্ষা করে, কিন্তু পদে পদে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের সাহায্যে যেভাবে পঞ্চায়েতগুলিও দখল করা হয়েছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকেও কোনও জনসেবা প্রত্যাশা করা অবশ্যই বাতুলতা। তবু মিত্রমশাই আশাবাদী। তাঁর পরামর্শ 'ইউনিয়ন বোর্ডের তরফে যে সব ট্যাকস আদায়ের অধিকার ছিল, সেগুলি আরও পরিশ্রুত করলে কতকগুলি পূর্তকাজে খরচের বাধ্য-বাধকতা থাকত। সেই সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থিক স্তরের আনুপাতিক সহযোগিতা পাওয়া যেত। ...ফলে যে অর্থব্যয় হয় তার পরিমাপে ভোগ্য ফল অনেক বেশি ফলত।' কিন্তু সেই ফল ফলাবার জন্য এখন কে আর ব্যস্ত? ওপর থেকে শতচ্ছিদ্র পাত্রে টাকা ঢেলে যাদের অধঃপাতের আর বাড়ি গাড়ি করবার পথ সুগম করা হচ্ছে—তারা অন্তত নয়।

তাই এই সব পরামর্শ অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এই নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব যাঁদের হাতে তাঁদের জ্ঞানের অভাব সম্ভবত ততখানি নয় যতখানি ইচ্ছার অভাব। যে রাজনীতির—পার্টি নির্বিশেষে বলছি—কোনো দূরদৃষ্টি নেই, সত্যিকারের জনসেবা বা সমাজ-উন্নয়নের কোনো আগ্রহই নেই, এমন কি আত্মরক্ষার উপযুক্ত সুবুদ্ধিও নেই, তারা সহসা এইসব জনহিতকর পরামর্শ নিতে যাবেই বা কেন?

বরং আরও উপরের স্তরের প্রশাসকদের জন্য লেখক যেসব অগ্রজসুলভ পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি হয়ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ নাও হতে পারে। ট্যুর করা, মফস্বলে রাত কাটানো, নিয়মিত ইন্‌সপেক্‌শন করা, কোনো সমস্যা দেখলে দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, আর প্রতিকারের ব্যবস্থায় স্থানীয় মানুষের উদ্যোগকে যথাসম্ভব ব্যবহার করা...ইত্যাদি কাজগুলি তো তেমন কঠিন নয়। তবু যথেষ্ট পরিমাণে সৎ-অভিনিবেশের অভাবে এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার অভাবেও কাজগুলি ঠিকমতো করা হয় না—হয় না বলেই প্রশাসনেও ধসারোগ ধরেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় লেখকের জামুরিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের অভিজ্ঞতা। ঘটনাটা ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসের। বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীঅশোক মিত্র সস্ত্রীক মোটরে ৪ঠা জানুয়ারি আসানসোল যাবার সময়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর ঘেরাও হন। না, 'ঘেরাও' শব্দটির প্রয়োগ এখানে ঠিক হল না ; কারণ এই রাজনৈতিক হাতিয়ারটির ব্যবহার আরও ১৫/১৬ বছর পরে শুরু হয় প্রথম যুক্ত ফ্রন্টের আমলে। যাই হোক, সেদিন তাঁদের পথের ধারে শ' তিনেক অতিদরিদ্র মহিলা ও তাদের ছেলেমেয়েরা শতচ্ছিন্ন কাপড় গায়ে পৌষের শীতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তারা শুনেছিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেদিন ওই পথে যাবেন, এবং তাঁকে তাদের দুরবস্থার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা জানানোই ছিল উদ্দেশ্য। পাশেই তাদের কাঁটা-তারে ঘেরা ক্যাম্প ছিল। ওদের দেখে গাড়ি থামিয়ে নামলে পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং তাঁর গৃহিণীকে ওই মহিলারা 'জোর করে কিছুক্ষণের জন্য ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে গেলেন। যে-অবহেলায় তাঁরা আছেন তার কথা বলতে গিয়ে মনের সমস্ত দুঃখ ও ক্ষোভ যেন ফেটে পড়ল। 'যাই হোক, তাদের দুরবস্থা সবই তাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন। শীঘ্রই আবার ফিরে গিয়ে সাধ্যমত কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন তাঁরা বিদায় নিতে চাইলেন তখন উদ্বাস্তু শিবিরের বাসিন্দারা 'আরও আধ ঘণ্টা ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে সরকারের বাপান্ত করেন।' কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে, ওই প্রতিশ্রুতি সবই ধাপ্পা।

কিন্তু এই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটির তৎপরতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনমন্ত্রী রেণুকা রায় এবং পুনর্বাসন সেক্রেটারি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল। ১০/১১ জানুয়ারির মধ্যেই দুজন পদস্থ কর্মচারীসহ পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী ক্যাম্পে পৌঁছে যায়। ১৯ জানুয়ারি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আবার সস্ত্রীক উদ্বাস্তু শিবিরে ফিরে যান, '৬ দিন তাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থেকে ক্যাম্পের সব ব্যবস্থা গুছিয়ে দেবার জন্য।' তখন সকলেরই মুখে দেখি স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনার হাসি ও কৃতজ্ঞতার চাউনি। বিশেষত তাঁদের মুখে যাঁরা ৪ জানুয়ারি আমাদের উপর সব থেকে বেশি তর্জন-গর্জন করেছিলেন।'

'অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের থাকবার জন্য একটি লম্বা গুদাম ঘরের এক কোণে তাঁরা আভা আর আমার জন্য মেঝেতে জায়গা করে দিলেন। ছেলে-মেয়েদের ঘরে একসঙ্গে শোবার ব্যবস্থায় আমরা খুশি হলুম।' এর পর ৬ দিন সরেজমিন থেকে শিবিরবাসীদের সঙ্গে সোৎসাহে কাজ করে এবং ২৩ জানুয়ারি মহাসমারোহে নেতাজির জন্মদিন উদ্‌যাপন করে ২৫ যখন তাঁরা বিদায় নেন এবারের বিদায়-সম্ভাষণ যে সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের হয়েছিল তা তো সবাই অনুমান করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে লেখক আরও জানিয়েছেন, 'সরকার ২৩ জানুয়ারির মধ্যে কাজ চালাবার মতো ব্যবস্থা করে স্থানীয় জেলা বোর্ড ও আশেপাশের অঞ্চল থেকে শিক্ষক ও চিকিৎসার কর্মীদের আনিয়ে ক্যাম্পের কাজে লাগিয়ে দেন। ...ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হবার আগে কারিগরি ও হস্তশিক্ষা প্রশিক্ষণের জন্য সমস্ত শিক্ষকরা তিন মাসের মতো প্রশিক্ষার কাঁচা মাল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্যাম্পে যোগ দেন। আমার জীবনে এই ছয় দিন হল এক স্মরণীয় কাল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে, দশ বছরে একটি সারা দেশকে দৈনন্দিন সমস্ত কাজের উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়ে, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়ে, আমাদের মতো নিতান্ত গরিব অবস্থাতেই আটপৌরে অথচ স্থায়ী ব্যবস্থা করে সাধারণের জীবনমানে যথেষ্ট উন্নতি করা যায়, যার জন্য আমরা জগৎসভার সকলের কাছে গর্বভরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।'

গত সাতচল্লিশ বছরে প্রশাসনের কাঠামোয় অনেকখানি ঘুণ ধরা সত্ত্বেও বোধ হয় প্রশাসকরা ইচ্ছা করলে এইভাবে আজও কিছু কাজ করতে পারেন, যদি না তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুরা তাঁদের নানাভাবে পথভ্রষ্ট করেন এবং অপব্যবহার করেন। জেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পর জেলা রাতারাতি সাক্ষর করে ফেলার যে সাজানো খেলা চলছে, যে খেলায় উপরাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত জড়িয়ে ফেলা যায়, সেই রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজিতে আজ প্রশাসকদের স্থান কোথায়? দেশের মানুষের সামনেই তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে না কি? বর্ধমান, মেদিনীপুর, ইত্যাদি জেলার বর্তমান সাক্ষরতার যথার্থ হার কেরলার পর্যায়ে পৌঁছেছে কিনা তার পরীক্ষা করে দেখে প্রাক্তন সেনসাস কমিশনার সাহেব কি নিজের অভিমত আমাদের জানাতে পারেন?

প্রশাসকদের পক্ষে গ্রামে-গঞ্জে সরেজমিনে উপস্থিত থাকা যে কত প্রয়োজন সেসব অনেকবার লেখক সবিস্তার আলোচনা করেছেন। পাঠকরা তাঁর পরামর্শের গুরুত্ব বিবেচনা করে দেখতে পারেন। আজকাল জিপ, মোটর এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ডিজেল ও পেট্রলের সরবরাহ থাকায় এখন প্রশাসকরা দিনমানে পরিদর্শনের কাজ তড়িঘড়ি সেরে বাড়ি ফিরে নিজের নিজের শয্যায় রাত্রিবাস করতে পারেন। কিন্তু পরিদর্শনের কাজটা তাতে ঠিকমতন হয় না। আগে নিয়ম ছিল যে, থানা স্তরের অফিসার থেকে শুরু করে উচ্চতম অফিসার পর্যন্ত প্রত্যেককে মাসের মধ্যে কয়েক রাত্রি নিজের এলাকার বাইরে রাত্রিবাস করতে হত। এভাবে তাঁরা গ্রামের এবং পারিপার্শ্বিকের যাবতীয় সুখ-সুবিধা, অভাব-অব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখতে পেতেন, স্বকর্ণে শুনতে পেতেন। এই প্রত্যক্ষ জানা সুপ্রশাসকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কয়েক রাত্রি কোনও গ্রামে এভাবে ক্যাম্প করে বাস করলে স্থানীয় গরিব দুঃখীরা সঙ্কোচ কাটিয়ে এবং ভদ্রলোকদের বেড়া এড়িয়ে রাত্রে বা ভোরে গুটি গুটি এসে নিরিবিলিতে দেখা করে মনের কথা বলতে পারে। আগে তারা ভদ্রলোকদের ভয় করত, এখন ক্যাডারদের। তাদের সামনে মুখ খুলতে চায় না। আজকের রাজনৈতিক দল বা কর্মীদের অত্যাচার থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে হলে এইভাবে গ্রামে বাস করতে হবে।

চাকুরিজীবনে প্রবেশ করা অবধি গ্রামে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই তিনি দেশকে, সমাজকে, দেশের মানুষকে চিনতে শিখেছিলেন। রাজনীতি আর সামাজিক রীতি সম্বন্ধে চোখ খুলে গিয়েছিল। বই-পড়া বিদ্যাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে পেরেছিলেন। সব চেয়ে বড়ো কথা, তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়গুলিও এভাবেই তৈরি হয়েছিল। দেশের প্রতি দায়বদ্ধ বোধ করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জাত আবেগ থেকেই। তাঁর এই কমিট্‌মেন্ট আত্মজীবনীটিকে এক বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে...এবং বইটিকে শুধু উপভোগ্য নয়, খুব প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। বিশেষ করে নবীন ও আদর্শবাদী প্রশাসকদের পক্ষে। আমার ধারণা আদর্শবাদী প্রশাসক শব্দ দুটি এখনও সোনার পাথরবাটি হয়ে যায়নি। তাঁর গ্রামীণ অভিজ্ঞতায় উনি ক্রমে বুঝতে শিখেছিলেন, মার্কসীয় তত্ত্বের আর্থিক শ্রেণীর সঙ্গে ভারতীয় বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক 'জাতে'র মিলই বা কোথায়, গরমিলই বা কিরকম। তাঁর ধারণা হয়েছিল,

...পশ্চিমী সমাজজাত, এমন কি তাদের পূর্বযুগের ফিউডাল সমাজ-জাত শ্রেণিদের মধ্যে দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনযাত্রার বৈষম্যের ফলে যে দূরত্ব, বিরোধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ও বৈরীভাব গড়ে উঠে বৈপ্লবিক আচরণের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতার চেতনা সম্ভব হত, আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম-প্রসূত জাতগুলির অন্যোন্য-নির্ভরতা ও আবহমান কাল ধরে গেঁথে-যাওয়া হীনম্মন্যতার ফলে সে চেতনা স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠা দুষ্কর। আরও দেখলুম অধিকাংশ সি. পি. আই. কর্মী যেহেতু উঁচু বা মাঝারি জাত থেকে আসেন সেহেতু তাঁদের অধিকাংশ সামাজিক আর্থিক সমতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শুধু অচেতন নয়, অন্তরে অন্তরে বিরোধী থাকেন। তাঁরা বড়ো জোর অনুকম্পা ও দয়া পর্যন্ত যান, কিন্তু সমতা নৈব নৈব চ। ভেরিয়ার এলউইনের মতো ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উঁচু ডিগ্রিওয়ালা, উচ্চমধ্য শ্রেণিজাত লোকের পক্ষে মধ্যপ্রদেশের আদিম জাতির নিরক্ষর মহিলাকে বিবাহ করে বিবাহোত্তর সন্তানদের আপন বলে মানুষ করা কীভাবে সম্ভব হয় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু আমি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উঁচু বা মাঝারি জাতের কোনও হিন্দুকে, শুধু বাংলা কেন, ভারতের কোথাও কোনও আদিম জাতির বা নিতান্ত নীচু জাত, যেমন কিনা ডোম, বাগদী, ধাঙড় মহিলার সঙ্গে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতে দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার বরাবরই মনে হয়েছে এই ধরনের বিবাহ ও জীবনযাত্রা যে-কোনও ভারতীয় সাম্যবাদী কর্মীর জীবনে একটি নীতিগত ও মানবিক পরীক্ষা।'

(আমি কেবল একটি ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক নেতার নাম জানি। ইনি বিপ্লবী শঙ্কর গুহ নিয়োগী। মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলে খনি-শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার সময়ে স্থানীয় একটি নিরক্ষর মহিলা শ্রমিককে বিবাহ করেন, তাঁকে নিজের রাজনৈতিক কাজে টেনে নেন। তাঁদের তিনটি সন্তান যথেষ্ট সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। মদ্যপান বর্জন আন্দোলন করতে গিয়ে মদ্যব্যবসায়ীদের হাতে নিয়োগীজি তিন বছর আগে নিহত হয়েছেন।)

এবার আমি সম্পূর্ণ অন্য একটি বিষয়ে চলে যেতে চাই। তা হলে এই আত্মজীবনীর পরিধি সম্বন্ধে পাঠকের আরও খানিকটা ধারণা হবে। এই বিষয়টি নিয়ে লেখক অবশ্য কোনও বিস্তৃত আলোচনা করেননি। মাত্র একটি প্যারাগ্রাফে যেন একটি ভাবনাকে শিমুল তুলোর বীজের মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন। কোনও যোগ্য বাঙালি বা বাঙালিনীর উর্বর চিত্তভূমিতে গিয়ে পড়লে হয়ত বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নতুন ফসল ফলতে পারে। বাঙালির অনেক কিছু আছে কিন্তু নিজস্ব কোনও নৃত্যের ঐতিহ্য নেই। যেমন আছে মণিপুরে কিংবা আসামে। কেরল, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যার তো বিপুল ধ্রুপদী ঐশ্বর্য আছে। ছৌ-নৃত্যকে তো ওই পর্যায়ে ফেলা বা তোলা যায় না। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন বটে এবং কখনও তাকে প্রশংসা করে, কখনও বা বিদ্রূপ করে শান্তিনিকেতনী নৃত্য বা রাবীন্দ্রিক নৃত্য বলা হয়ে থাকে। গোড়ায় নাকি সেটা এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনৃত্যের মতো ছিল। পরে মণিপুরী নৃত্য-গুরুদের এনে তাকে একটি পরিশীলিত সুবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেন রবীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবীরা। কালে তাতে কথাকলি রীতিও যোগ করা হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওইভাবে প্রয়োজনমতো ভরতনাট্যম, ওড়িশী এমন কি কথককেরও মিশাল ঘটলেই বা ক্ষতি কি, যদি না বিসদৃশ কিছু হয়ে ওঠে কিংবা রবীন্দ্রসংগীত আর রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য আপন জাতিচ্যুত হয়। 'কৃত্রিম' বলে গাল দিয়ে আজ আর কোনও কিছুকে অচ্ছুত করে রাখা চলে না। নিজের সংগীতের বেলায় রবীন্দ্রনাথ কোনও গায়ককে ইচ্ছামতন সুরতান সৃষ্টি করার স্বাধীনতা দেননি। কিন্তু তাঁর গানের বা নৃত্যনাট্যের সঙ্গে নৃত্য যোজনা করার ব্যাপারে নর্তক-নর্তকীদের তো পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে প্রতিভা এবং শিক্ষা ছিল তার জোরে তিনি ভৈরবী কি খাম্বাজ রাগকেও নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে তাতেই নিজস্ব এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পেরেছেন যে, তাকে রাবীন্দ্রিক বলেও চিহ্নিত করা যায়। এবং যাকে অবিকৃত রক্ষা করার জন্য তাঁর আত্যন্তিক চেষ্টা ছিল। নৃত্যে তাঁর কোনও শিক্ষা বা প্রতিভা তো ছিল না, তবে একটা বোধ নিশ্চয়ই ছিল। যাই হোক, রবীন্দ্রনৃত্য বলে তো কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারেননি। কিন্তু অপরের কল্পনাকে এবং প্রতিভাকে এই দিকে বিকশিত করার মতো একটি উর্বর ক্ষেত্র তো তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন।

এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে লেখকের পরবর্তী ভাবনা নেহাত অলস কল্পনা বলে মনে হবে না। বাঁকুড়ায় যখন তাঁর কর্মস্থল ছিল সে সময়ে একবার কুমোরদের গ্রাম পাঁচমুড়া দেখে ফিরছিলেন। পাঁচমুড়া সেই বাঁকুড়ার কালো ঘোড়ার গ্রাম। আরও অবশ্য নানারকম পূজার উপকরণ আর গার্হস্থ্য তৈজসপত্রও তৈরি হত সেখানে। পাঁচমুড়া থেকে ফেরার পথে মিত্রমশাই বিষ্ণুপুরের টেরাকটা মন্দির দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হন। বিশেষ করে জোড়বাংলা মন্দিরের ভিতরের দেয়ালগুলির উপরে অজস্র ভঙ্গি ও মুদ্রায় খোদিত নাচের ইঁটগুলি দেখে। তখন তাঁর প্রতীতি হয় যে, যামিনী রায় মশাই যে বলতেন কালীঘাটের পট বা পটুয়াশিল্প তাঁর সৃজনশিল্পের উৎস ছিল না, ছিল বিষ্ণুপুরী মন্দিরের গায়ের টেরাকটা মূর্তি, পাঁচমুড়ার মূর্তি ইত্যাদি, সে কথা কত সত্য! পরে ১৯৫৮ থেকে '৮৩ পর্যন্ত দিল্লিতে থাকাকালে লেখক নাকি প্রায়ই সংগীত নাটক আকাদেমির কর্তৃপক্ষকে বলেছেন, 'বিষ্ণুপুর সংগীত ঘরানা যেমন একটি বিশিষ্ট সংগীত-ঐতিহ্য, সেখানে নৃত্যকলারও নিশ্চয় একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল যার প্রমাণ রয়েছে বাংলার টেরাকটায়। এই ঐতিহ্য সম্ভবত ওড়িশা ঐতিহ্যের সঙ্গে সহোদরা-সম্বন্ধে জড়িত, এবং ওড়িশী ঐতিহ্য যেমন গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে সঞ্জীবিত হয়ে সমৃদ্ধ রূপ ধারণ করেছে, অনুরূপ অনুশীলনে বিষ্ণুপুরী ঐতিহ্যও সঞ্জীবিত হতে পারে। আসলে আমাদের যুগে ওড়িশী ধারা তো কোনারক, পুরী, ভুবনেশ্বরের মন্দিররাজির গাত্র থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে নিবেদিত প্রাণ পণ্ডিত, গায়ক ও নর্তক-নর্তকীদের আপ্রাণ আগ্রহে ও পরিশ্রমে। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে সে আগ্রহের বিন্দুমাত্র আজও দেখা গেল না।' কোনও শিল্প বা কলার ধারাকে আকাদেমির কর্তৃপক্ষ তো পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন না, লালনও কতখানি তাঁরা করতে পারেন জানি না। সেকালে পালন করতেন রাজা-বাদশারা, একালে লালন করেন সাধারণ গুণগ্রাহী মানুষ। তবে সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের জন্য চাই প্রতিভাবান শিল্পী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কলাকার। উড়িষ্যার মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যের একটা জীবন্ত ধারা—একটি পরম্পরা তো প্রবাহিত ছিল, তাঁদের প্রতিভাবান নৃত্যগুরুরা ছিলেন। বাংলাদেশে তো বহুকাল তেমন কিছু জীবিত পরম্পরা নেই। কিন্তু তবু নতুন করে আশা করতে দোষ কি? এখন তো নানা ঘরানায় সুশিক্ষিত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বাঙালি নৃত্যশিল্পী রয়েছেন। পশ্চিমী নাচের ধারাকে অনুসরণ করেও তো নতুন কিছু করার চেষ্টা চলছে আধুনিক বাংলা নাচে। তা হলে কল্পনাসমৃদ্ধ, প্রতিভাময়ী কোনও মঞ্জুশ্রী চাকি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকলায় ও মূর্তিকলায় নূতন করে একটি নৃত্যধারা সৃজনের উৎস সন্ধান করতে পারেন না কি? একটি অকর্ষিত ক্ষেত্র পড়ে আছে। হয়ত আবাদ করলে ফলত সোনা।

এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ। এই আত্মজীবনীতে লেখকের যে উদার মুক্ত মন, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আর বহুদর্শীসুলভ পরিপক্কতার পরিচয় রয়েছে তাতে মতবিরোধের খুব বেশি অবকাশ ছিল না। তাই বলে বিতর্কিত প্রসঙ্গ কিছুই নেই এমন নয়। তবে আমি সেগুলি এখন পর্যন্ত এড়িয়ে গিয়েছি। এবার দু-চারটি ওই জাতীয় প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়।

যেমন কিনা লেখক আক্ষেপ করেছেন, কেন গান্ধিজি বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সরাসরি শূদ্ররাজের ভবিষ্যৎ ঘোষণা করলেন না, 'যে বিবর্তন তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছলেন, ঠিক সেই ধাপ থেকে গান্ধিজি কেন শুরু করলেন না?' কেন শুধু রামরাজ্যের কথাই বলতেন! হিন্দু বর্ণাশ্রমকে মার্কসিস্টরা পরোক্ষে মেনে নিলেও গান্ধিজি স্ব-ঘোষিত ভাবেই বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী ছিলেন ; কারণ তাঁর মতে বর্ণাশ্রম-ই হিন্দু-সমাজের ভিত্তি। কেন, গান্ধিজি হরিজনদের শিক্ষাগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জীবিকাগত কোনও সমস্যারই আমূল সংস্কারের দিকে জাতিকে আহ্বান করলেন না? তা যদি করতেন তা হলে তিনি ডঃ আম্বেদকরের পালের হাওয়া নিজের দিকে টেনে দিতে পারতেন। ন্যায়ের জন্য লড়াই করার বদলে দয়া ও সহমর্মিতার কথা বলে তিনি আম্বেদকরের হৃদয় জয় করতে পারেননি। ইত্যাদি।

এই সব প্রশ্নের অল্পে নিষ্পত্তি করা কঠিন। আমরা কি চাই—আপস ও সংস্কারের রাজনীতি অথবা সংঘর্ষ ও আমূল পরিবর্তনের রাজনীতি? গান্ধিজির অহিংস পথ মেনে নিলে আমূল পরিবর্তন কতটা দ্রুত হওয়া সম্ভব ছিল? বিশেষত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও যখন একই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। শূদ্ররাজ, না অন্ত্যোদয়? অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই কি হিন্দু সমাজের মূলেই আঘাত ছিল না? আমূল সংস্কার ব্যাপারটা কি? আর বক্তৃতায় বার কয়েক কিছু একটা ঘোষণা করলেই কি বাস্তবে তা ঘটতে শুরু করে? বিবেকানন্দের নেতৃত্বে শূদ্ররাজের লক্ষে হিন্দু সমাজের বিবর্তন কোথায় গিয়ে ঠিক পৌঁছেছিল যেখান থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেই গান্ধিজি মনজিলে পৌঁছে যেতেন?...একটি পুস্তক সমালোচনার পরিধিতে এত সব প্রসঙ্গের অবতারণা কুলায় না। অতএব গান্ধিজির ১৯২৬ সালের একটি উক্তি দিয়েই এই বিতর্ককে ধামা চাপা দিচ্ছি 'It has been my experience that I am always true (correct) from my point of view, and am often wrong from the point of

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

view of my honest critics. I know that we are both right from our respective points of view.' আপাতত আমিও এই বিষয়ে গান্ধিজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে জৈন অনেকান্তবাদী সহিষ্ণুতাই অবলম্বন করলাম। আরও একটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। গ্রামে গ্রামে বন্ধকী তমসুকের নাগপাশে কি ভাবে চাষীদের নাভিশ্বাস উঠছে তা স্বচক্ষে দেখার ফলে লেখকের মনে ক্ষোভ হয়েছিল যে, 'রবীন্দ্রনাথের মতো সজাগ ব্যক্তিও, নিজের হাতে জমিদারি পরিচালনার ফলে, যাঁর বন্ধকী তমসুক এবং সেই ব্যবসায়ের ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞান ছিল—অথবা 'রায়তের কথা'র লেখক প্রমথ চৌধুরীও এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষে সহজানন্দ বা ভাসানীকে সমর্থন জানাননি। তা যদি করতেন তা হলে বঙ্গদেশের জীবন অত তাড়াতাড়ি এবং অত ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষে দুষ্ট হয়ে এত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করত না।' আমাদের আদর্শ ব্যক্তিরা কেন যথাসময়ে যথাকর্তব্য করতে পারেননি, কেন কায়েমি শ্রেণি-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মৌল অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষে দাঁড়াতে পারেননি...এসব ভাবলে মনে আশাভঙ্গজনিত বেদনাবোধ হয় ঠিকই। কিন্তু সেদিন তাঁরা হিন্দু মহাজনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে মুসলমান খাতকদের পক্ষে দাঁড়ালেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ অন্য কোনও রন্ধ্র দিয়ে আরও দ্রুত প্রবেশ করত কিনা, অর্থনৈতিক শোষণের পরিবর্তে তখন সাংস্কৃতিক দমন ও দলনই অভিযোগের বৃহত্তর কারণ হত কি না এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু অনুমান করা যায় কি? ঘটনাপরম্পরার যে কার্যকারণ শৃঙ্খলা সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাকে চূড়ান্ত করে শেষ পর্যন্ত দেশটাকে ভাঙালো তা এতই জটিল হয়ে উঠেছিল যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকুরি নিয়ে কাড়াকাড়ি, কিংবা হিন্দু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসে মুসলিম নেতাদের এলিয়েনেশন, কিংবা নেতৃত্বের লড়াইয়ে জিন্নাহ্ সাহেবের আহত অহমিকা...কোন্‌টা যে কতখানি বিস্ফোরক কারণ ছিল ঠিক বুঝতে পারি না। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিকে যে আগে থেকে আটঘাট বেঁধে কতদূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায় সে বিষয়েও কি নতুন করে সংশয় দেখা দিচ্ছে না? বিবর্তন ও প্রগতির যেসব তৈরি ছক আমরা আজ পর্যন্ত হাতে পেয়েছি সেগুলি কতখানি স্বয়ংক্রিয় আর কতখানি মানুষের হাতে নিয়ন্ত্রিত তারও তো হিসেব করা সহজ নয়। অবশ্য তা সত্ত্বেও এ কথা মানি যে, তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধানেও দূরের দিকে দৃষ্টিকে নিবন্ধ রাখতে হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বহু চেষ্টা করেও গান্ধিজি অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ বাঙলা কংগ্রেসকে ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংযুক্ত সরকার গঠন করাতে পারেননি বলে কংগ্রেসের সর্বনাশী অদূরদর্শিতায় লেখকের খেদ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সেই মহতী বিনষ্টির ফলেও কি কংগ্রেসের কোনও শিক্ষা হয়েছে? সি. পি. এম./বি. জে. পি. শমন শিয়রে নিয়েও কি আত্মঘাতী কোন্দল চালিয়ে যাচ্ছে না? এই সব দেখে কি মনে হয় না যে, বেশির ভাগ মানুষই ইতিহাসের কাছ থেকে শিক্ষার মতো বুদ্ধি ধরে না?

অতঃপর লেখকের একটি তৃতীয় ক্ষোভের প্রসঙ্গ। এটি নেহরুর বিরুদ্ধে। এই ক্ষোভের বিষয়টি যদিও বেশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন তবু ক্ষোভের কারণটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেন সূচি-মুখে বিদ্ধ করা হয়নি। একটু এলিয়ে গিয়েছে। যতটুকু বুঝেছি ব্যক্ত করবার চেষ্টা করি। প্রথমে অবশ্য তিনি নেহরুর পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-চেতনা, বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাসের মূল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নেহরুর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেছেন। 'কি ভাবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যুগেই বর্ণাশ্রম শনি প্রবেশের অমোঘ রন্ধ্র হিসাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে নেহরুর মতো জ্ঞান খুব কম নেতারই ছিল।' এরপর বাঙলার তথা ভারতের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে জাত-পাত সংক্রান্ত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তাঁর দুজন পণ্ডিত সহকর্মী জনগণনা বিভাগে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভারতীয়দের 'বিধর্মীকরণ স্রোত' (ধর্মান্তরণ) বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তার বিশদ বিবরণ আছে। বলা বাহুল্য, বর্ণবিদ্বেষই যে গত কয়েক শত বৎসর ধর্মান্তরণের সবচেয়ে বড়ো কারণ তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। এমনকি পশ্চিমবাংলাতেও জনগণনাভিত্তিক অনুসন্ধানে এই ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। না হবার কারণই বা কি থাকতে পারে? বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যখন কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত যেসব মানুষরা মন্তব্য করেছিলেন, 'কি, কেয়টের—কৈবর্তের—বাচ্চা হবে সি. ই. ও.?' তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন আজও ঘটেনি। তপসিলিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা তাঁদের অন্তর্জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যাই হোক, দেশের এ-হেন পরিস্থিতি বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আম্বেদকর-সমর্থিত সিভিল কোড বিল কেন কার্যকরী হল না? 'আজ যদি সিভিল কোড আইন হত তা হলে আমাদের সমাজের অনেক আপদ চুকে যেত। ক্ষোভ হয় এ বিষয়ে তিনি কেন নেহরুর কাছ থেকে উপযুক্ত সমর্থন ও সাহায্য পাননি।'

হিন্দু কোড বিল পাস না করে ভারতীয় কোড বিল পাস করলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের যে 'সংখ্যালঘু তোষণ' নিয়ে অভিযোগ তার একটা বড়ো কারণ দূর হত সন্দেহ নেই। কিন্তু আইন পাস করলেই যদি সামাজিক দূরত্ব (Social distance) ও যুগ-যুগের ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করা যেত তবে তো ৪০ বছর আগেই হরিজনরা উচ্চবর্ণের কোল পেত; অস্পৃশ্যতা কি বেআইনি হয়ে যায়নি? এ জাতীয় আইন প্রণয়ন করার আগে ও পরে যে প্রবল গণ-আন্দোলন করে আইনকে জনচিত্তে গৃহীত করা প্রয়োজন ছিল সে কাজটাও কি কেবল গান্ধি আর নেহরুর একার দায় ছিল? না একার পক্ষে সম্ভব ছিল? দেশের শিক্ষিত সমাজ সে দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিলেন বা করছেন যে, আজ, তাঁদের বাদ দিয়ে কেবল ওই নেতাদের দিকেই অভিযোগের তর্জনী নির্দেশ করা চলে? তা ছাড়া, আমার মনে হয় দেশভাগের অপরাধে অপরাধী, দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিরাপত্তাবোধহীন সংখ্যালঘুদের উপর কেন ইন্ডিয়ান সিভিল কোড আইন চাপিয়ে দিতে নেহরু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা মিত্রমশাই আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন বলেই আমার ধারণা। নেহরুর তথাকথিত বহু দুর্বল-চিত্ত আচরণের মূলে যে ছিল তাঁর অস্থিমজ্জাগত গণতান্ত্রিক মেজাজ এবং এ ক্ষেত্রে অন্তত আম্বেদকরের প্রতি কোনো অসূয়া বা অবজ্ঞা নয়—এটাও কি বলার দরকার করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নেহরুর প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা ও আস্থা অপরিসীম। তাঁর ভাষায় 'মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই ছিলেন বোধ হয় একমাত্র ভারতীয়, সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সর্বজন সম্মানার্হ বিশ্বনাগরিক।' প্রথম থেকেই অতি ছোট মাপের মানুষরাও বড়ো গলা করে নেহরুর মিশ্র অর্থনীতি, জোট নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ইত্যাদির ভূয়সী নিন্দায় মুখর। কিন্তু মিত্র মশাই নেহরুর বহু সুকৃতির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তবু তিনি সক্ষোভে বলেছেন, "আমাদের দেশের শক্তি-বৃদ্ধির জন্যে মানবিক, সামাজিক, আর্থিক ও জীবিকার সুযোগের সমতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এবং এই সমীকরণের পক্ষে তিনি দৃঢ় পদে অগ্রসর হননি।" "অতএব তাঁর বিদেশনীতির...পাশে আমি এক কথায় একে গার্হস্থ্য নীতির অবহেলা বলব।"

এ ক্ষেত্রেও নেহরুর সপক্ষে দু-একটি কথা বলে এই আলোচনা সাঙ্গ করব। দেশের স্বাধীনতালাভ ও নেহরুর মৃত্যুর মধ্যবর্তী সতেরোটি বছর নিশ্চয়ই এই বিরাট, প্রাচীন ও অনড় দেশের পক্ষে খুব দীর্ঘ একটা কাল নয়। এই কালসীমার মধ্যেই গণতান্ত্রিক উপায়ে, সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে নয়, ভারী শিল্পের ভিত্তিস্থাপন, খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ংভরতা, গণতান্ত্রিক রাজনীতির বুনিয়াদ তৈরি করা (এটা আর কটি এশীয় দেশে সম্ভব হয়েছে?)...এমন কি পৃথিবীর জটিলতম ভাষা-সমস্যায় জর্জর দেশে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দেবার চেষ্টা...ইত্যাদি নানা ব্যাপারে উনি যতটা করতে পেরেছিলেন তার পরেও কি এই ক্ষোভ সাজে? দেশে, বিদেশে, এমন কি নিজের মন্ত্রিসভাতেও প্রতি পদে কতখানি প্রতিকূলতার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল সে তো লেখকের অজানা নেই। এই সতেরো বছরে দুবার সীমান্তে আক্রমণ সামাল দিতে হয়েছিল। কাশ্মীর-হায়দ্রাবাদ-জুনাগড়-গোয়ার সামরিক কার্যকলাপ কম শিরঃপীড়া সৃষ্টি করেনি। কয়েক হাজার বছর ধরে বর্ণবিভক্ত প্রায় ফিউডাল স্থবির একটি সমাজে গণতান্ত্রিক পথে সমতা আনা কি এত দ্রুত সম্ভব? গণতান্ত্রিক কাঠামোকে গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টির চেষ্টাই কি সমতার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নয়? পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনা কি অর্থনৈতিক সমতার লক্ষ্যেই অভিনব পদক্ষেপ ছিল না? এগুলি কি অত্যন্ত মূলগতভাবেই গার্হস্থ্যনীতি ছিল না? হিন্দু কোড বিলের সাহায্যে হিন্দু মেয়েদের বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যেসব অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছিলেন তা কি নারী-পুরুষের সমতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল না? যে ত্রিভাষা সূত্র দিয়ে অহিন্দিভাষীদের ক্ষোভ দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাও কি ভাষাভিত্তিক সমতা রক্ষার প্রয়াস নয়? আরও কেন হল না সে কথা সব সময়েই বলা যায়। কিন্তু যতটুকু হল তার সুফলও জনসাধারণের হাতের নাগালে এনে দেবার চেষ্টা আমরা কে কতটুকু করেছি? গণতন্ত্রে না আমরা প্রত্যেকেই স্বশাসিত? তর্ক থাক। অবশেষে এবার আমারও সামান্য একটু ক্ষোভ প্রকাশ করি। সুপাঠ্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসমৃদ্ধ এই কাহিনি পড়তে পড়তে দু-একবার একটু হোঁচট খেয়েছি। লেখকের অধিকাংশ মতামত আমার গ্রহণীয় মনে হলেও অল্পস্বল্প আপত্তি তো থাকবেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি বিস্তৃত কিছু আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করেননি। তবে, দু-একটি ছুটকো মন্তব্য চোখে লাগল। 'শেষের কবিতা' বিষয়ে তাঁর কৈশোরিক অভিমত তো তিনি নিজেই খানিকটা প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে লেখক আগের মতোই 'বিরক্তি' বোধ করেন কিনা জানতে ইচ্ছা করে। দেশে দেশে বৈপ্লবিক দলের এবং সন্ত্রাসবাদীদের অন্দরমহলের কত কাহিনিই তো আমরা জেনেছি। জর্জ অরওয়েল এমন কি স্প্যানিশ সিভিল ওয়ারেরও যে প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন সে-সব পড়বার পরেও বিপ্লবের গলিঘুঁজি সম্বন্ধে খুব কি মোহ কারও অবশিষ্ট আছে? রবীন্দ্রোত্তর কবি-সাহিত্যিকদের মূল্যায়নে অনেক সময়েই একমত হয়েছি...কখনও বা মতে মেলেনি। তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু শক্ড্ হয়েছি সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্যে 'সুধীন দত্ত বাংলা সাহিত্যে কয়েকটি স্বল্পজীবী জারজ শিশু করে যান, যাঁরা তাঁর বংশরক্ষা করতে পারেনি।' এটা কিন্তু লেখকের প্রাপ্তবয়সের মত। আমার প্রথম আপত্তি এই যে, এটা সাহিত্যবিচারের ভাষা নয়। এ-জাতীয় ভাষা এক কালে তথাকথিত প্রগতিশীল সমালোচকরা বিরুদ্ধপক্ষ সম্বন্ধে ব্যবহার করতেন। আমার ধারণা ছিল ১৯৯০-এ এই ভাষা anachronistic হয়ে গিয়েছে।

আমি সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং ওই তৎসম শব্দবহুল কৃত্রিম ভাষায় লেখা কবিতাও বেশ উপভোগ করি। তাঁর ভাষার কয়েকটি মজার মুদ্রাদোষ মেনে নিলে ভাষাটি মোটেই অবোধ্য ঠেকে না, কারণ তাঁর বক্তব্যের বুনটে লজিকাল ধাঁচ আছে। এমন কি কবিতাতেও যে এক ধরনের আরোহি-অবরোহি যুক্তির বিন্যাস থাকে তাও আমার ভালো লাগে। মিত্রমশাইয়ের নিশ্চয়ই অপাঠ্য মনে হয়। তাতে আমি কিন্তু বিচলিত বোধ করছি না। ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

ওই সমালোচনার ভাষা সংক্রান্ত আমার দ্বিতীয় আপত্তিটা একেবারে অন্য জাতের। সেটা বলার আগে অন্যত্র-বিবৃত লেখকের একটি রসিকতার উল্লেখ করছি, স্কটিশদের কৃপণতা বিষয়ে। 'মজার' গল্পটি এই যে, কোনও গলফ ক্লাবের এক ক্যাডি ঘণ্টা তিনেক এক স্কটিশ ভদ্রলোকের তল্পি বয়ে তাঁর পিছন পিছন ঘোরার পর মাত্র তিন পেনি বকশিস পেয়ে ভীষণ চটে যায়। শোধ তুলবার জন্য ওই ক্যাডি তখন ভদ্রলোককে বলে যে, তাঁর হাত দেখে সে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব নির্ভুল বলে দেবে...তার জন্য বাড়তি পয়সা দিতে হবে না। ভদ্রলোক তো খুশি হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন। ছোকরা প্রথমে বলে, 'বর্তমানটা বলি? ...আপনি ব্যাচিলর।' মিলে যাওয়ায় ভদ্রলোক মহাখুশি। এর পর ক্যাডি বলে, 'আপনি ভবিষ্যতেও ব্যাচিলরই থাকবেন।' ভদ্রলোক আরও খুশি। 'এবার ভূতটা বলি?...আপনার বাবাও ছিলেন ব্যাচিলর।' বলেই, ভদ্রলোক হৃদয়ঙ্গম করার আগেই ভোঁ দৌড়।

এবার অত্যন্ত বেরসিকের মতো আমার আপত্তিটা পেশ করি। কেউ কোনো অন্যায় করলে তাকে 'জারজ' বলে কেন গাল দেওয়া হয় এটা আমার একেবারেই বোধগম্য হয় না। নিজের জন্মের জন্য যেহেতু কাউকে দায়ী করা যায় না তাই কেউ যদি জারজ বা কানীন হয় তবে সেটা তার নিজের অসামাজিক কর্মের ফলে নয়। অপরাধ যদি হয়ে থাকে তবে সেটা তার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীব। গাল যদি দিতেই হয়, তাদেরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের নাগালের মধ্যে না পেয়ে সন্তানকে অপমান করার চেষ্টা কেমনতর বিচার? আধুনিক সমাজে তো বিবাহ-বহির্ভূত সন্তানকেও আইনত সব রকম অধিকার ও সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। তাই এই নিষ্ঠুর শব্দটি কি আজও আধুনিক মানুষের ভাষা থেকে বর্জন করার সময় আসেনি? আমি নিশ্চিত, আমার এই সামান্য আপত্তি মিত্রমশাই মার্জনা করবেন।

এই তিন খণ্ড গ্রন্থের সুন্দরতম অংশ বোধ হয় বাংলার মফস্বল-জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। লেখকের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে, তিনি ভারতবর্ষের ৩৬৪টি জেলার মধ্যে ৩০০টি জেলা ঘুরে দেখেছেন। যাঁরা তাঁর মতো এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী নন তাঁরাও অন্তত বাংলার অধিকাংশ জেলা 'মনসা' ভ্রমণের আনন্দ পাবেন এই রচনায়। লেখকের সঙ্গী হয়ে বাংলাকে—স্বপ্নসম অপসৃত পূর্ব বাংলাকেও—দেখার আনন্দ সহজে ভুলবার নয়। লেখকের নিজের ছেলেবেলার অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। প্রথম খণ্ডে তারও অংশভাগ হন পাঠক। তাঁর পিতা যেহেতু বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ছিলেন তাই অল্পদিন পর পরই সপরিবার জেলা থেকে জেলায় স্থানান্তরিত হতেন।

লেখক নিজেকে সর্বদা ঘটি বলে অভিহিত করেছেন, যেহেতু তাঁর পিতৃকুল হুগলি ও মাতৃকুল বর্ধমান নিবাসী ছিলেন। তাই 'ঘটির' দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলি বোধ হয় বেশি চোখে পড়ত। কিন্তু 'বারেন্দ্র মনের সঙ্গে ঘটি মন তাল রাখতে অক্ষম'—এটা নিশ্চয়ই তাঁর পরবর্তী জীবনে আহৃত ধারণা। কারণ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়ং, দার্জিলিং, রংপুর, দিনাজপুর ঘুরে যখন তাঁরা পাবনা এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো। পরে বয়ঃসন্ধিতে বর্ধমানে আসার ফলে নিশ্চয়ই তাঁর সাংস্কৃতিক শিকড় সবল হবার সুযোগ পেয়েছিল।

কলকাতার চেয়ে প্রাচীনতর এবং নিঃসন্দেহে অভিজাততর এই শহরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বুনিয়াদী বঙ্গ সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠকের মনে কিছুটা আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারত। যদি না ইতোমধ্যে কলকাতা একটা হাইড্রার মতো অবশিষ্ট পশ্চিম বাংলার অর্থ বিত্ত রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে গ্রাস করে বসে থাকত। কৃত্রিম উপায়ে গড়ে তোলা উপনগরী কল্যাণীর তো চল্লিশ বছরেও বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটল না। বরং দুর্গাপুর তার তুলনায় প্রাণবন্ত জনপদ হয়ে উঠেছে মনে হয়। কিন্তু কলকাতা ও আসানসোল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত বর্ধমান যদি যথাসময়ে সরকারি ও বেসরকারি আনুকূল্য পেত তবে হয়ত পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় মহানগরী বলে গর্বের বস্তু হয়ে থাকত। বোম্বাইয়ের ঔজ্জ্বল্য যেমন পুণের আভিজাত্যকে নিষ্প্রভ করতে পারেনি। কারণ এই নগরী (বর্ধমান) 'কয়েক শতাব্দী ধরে আস্তে আস্তে ভেবেচিন্তে, যত্ন করে গড়ে তোলা, এবং অনেক যুগ ধরে এখানে মানুষ শহুরে আবহাওয়ায় বাস করছে। পৌর সংগঠন আর পৌর ব্যবস্থাও এখানে বেশ ফলাও করে চালু।'

দেখা যাচ্ছে, ষাট বছর আগেও বহু বাঙালি 'সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, পৌর সুখ সুবিধা ও বিদ্যার্জনের কেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানকে কলকাতার সঙ্গে প্রায় সমান স্থান দিতেন।' কলকাতায় পাট উঠিয়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবতেন না। অথচ এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বর্ধমানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেও এই নগরীর এতখানি স্বাস্থ্যোদ্ধার হল না যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও সবাই কলকাতা থেকে পাট উঠিয়ে বর্ধমানে গিয়ে বাস করেন। চিত্ত, উদ্যম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বর্ধমানের যে নিজস্ব গরিমা ছিল তা লুপ্ত হয়েছে, সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর আত্মসম্মানী বর্ধমানবাসী রাজাও নেই, প্রজাও নেই।

আই. সি. এস.-এ যোগ দিয়ে দেশে ফিরেই লেখক শিক্ষা-নবিস হয়ে প্রথম যান কৃষ্ণনগর ও পরে বাখরগঞ্জ। সেই সব অভিজ্ঞতার কিছু উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে. এর পরে ঠিকমতন প্রশাসনের ভার নিয়ে যান মুন্সীগঞ্জে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়টায় একদিকে ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র গতি, আর অন্য দিকে আঞ্চলিক পরিবেশ ও মনুষ্য চরিত্র পর্যবেক্ষণের অসাধারণ সুযোগ হয় তাঁর। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে জার্মানি ও জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্মক্ষেত্রে অগাস্ট বিপ্লবের মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং তার চেয়ে বহুগুণ মর্মবিদারী অভিজ্ঞতা হয়েছিল মন্বন্তরের সময়ে বিক্রমপুরের অন্নহীন মানুষের ক্ষুধা মেটাবার নিদারুণ করুণ প্রয়াস।

অগাস্ট বিপ্লবের প্রসঙ্গে লেখকের একটি স্মরণীয় মন্তব্য উল্লেখ না করে পারছি না 'এ বিষয়ে আমার একটি খুব সরল নিরিখ ছিল। কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা রাখতে গিয়ে যদি আমার মনে হত যে, আই. বি. আমার উপর নজর রাখছে, তা হলে আমার মনে হত যে, তাঁর সঙ্গে আলাপ রাখাটা আমার নৈতিক দায়িত্ব, এবং নিজের পক্ষে উপকারী। ঠিক যেমন কৃষ্ণনগরে থাকতে গোঁফ বাবু (কমরেড অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধে আমার মনে হত। কিন্তু উল্টো পক্ষে, যদি কারও সঙ্গে আলাপ বা সম্পর্ক রাখার সময়ে আমার মনে হত, ব্যাপারটা আই. বি.-র তরফ থেকে আমার পক্ষে নিরাপদ, তা হলে বুঝতুম নৈতিক ক্ষেত্রে আমি কিছু ঝুঁকি নিচ্ছি না। ১৯৪২-এর অগাস্ট থেকে ১৯৪৭-এর গোড়া পর্যন্ত, অর্থাৎ অগাস্ট আন্দোলন থেকে পার্টিশন পর্যন্ত, আমার কেন জানি না কংগ্রেস কর্মীদের সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট কর্মীদের প্রত্যেকের থেকে বেশি শ্রদ্ধা ছিল, যদিও আমি সব সময়ে কংগ্রেস মতবাদ গ্রহণ করতে পারতুম না।' শেষ করার আগে মনে পড়ছে আইনস্টাইনের একটি বাক্য এই লেখকের খুব প্রিয় যাঁরা নিজের চোখ দিয়ে দেখেন এবং নিজের মন দিয়ে অনুভব করেন তেমন মানুষের সংখ্যা অল্প। আমি নিশ্চয়ই এতক্ষণে যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পেরেছি যে, এই অসমাপ্ত আত্মজীবনীর লেখক ওই নিতান্ত সংখ্যালঘুর দলেই আছেন। এমন চক্ষুষ্মান, হৃদয়বান ব্যক্তির অভিজ্ঞতার অংশভাগ হওয়া আনন্দের। তাঁর সঙ্গে অল্পস্বল্প মতানৈক্যও আশা করি দুঃখের হবে না।

দেশ, ১১।০২।১৯৯৫, পৃঃ ১৩১-২১

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-গবেষণার এক অভিনব ধারা

১

বিদুষী, বহুভাষাবিদ কেতকী কুশারী ডাইসন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একাধারে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু, গবেষক, সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন সাহিত্যবোদ্ধা এবং কৃতী সাহিত্যিক। তাঁর রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ দুটি নিয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচনা শুনছি। এতদিনে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকটা বিলম্বে হলেও দু-চার কথা বলবার আগ্রহ বোধ করছি, হয়ত বা সেকথা আগেই কেউ লিখেছেন, জানি না।

মলাটের ঘোষণা অনুযায়ী 'অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত এই বই' "রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" 'যেন এক নদী যার একটি ধারা কেতকী কুশারী ডাইসনের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, অপর ধারা তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।' গঙ্গ যমুনার এই মিলিত ধারায় নামবার আগেই মনে কিছু সংশয় যে জেগেছিল অস্বীকার করব না। কারণ গবেষককে হতে হয় নির্মোহ অনুসন্ধানী—তথ্যভিত্তিক, বিষয়নিষ্ঠ তত্ত্ব গঠনে সিদ্ধহস্ত। কথাসাহিত্যিকের জাত আলাদা—তাঁর সংরক্ত হৃদয়ের আলিঙ্গনে বিষয় ও বিষয়ী পরস্পরে ওতপ্রোত হয়। বুঝতে পারছিলাম না যে কেমন করে একই রচনায় একই ব্যক্তি গবেষক আর ঔপন্যাসিকের দ্বৈত ভূমিকায় দুই মেরুতে দোলকের মতো আন্দোলিত হতে থাকবেন—কখনও তিনি তন্নিষ্ঠ গবেষক, কখনও তদাপ্লুত শিল্পী। তবে একটা চ্যালেঞ্জ তো বটেই! ভাবছিলাম কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়ত বা হয়েও উঠতে পারে এই অভিনব আঙ্গিকে। তা ছাড়া সাহিত্যরচনার ব্যাকরণ-না-মানা এই 'সিংহরিণ' সম্বন্ধে কৌতূহলও বোধ করছিলাম বই কি!

বইখানি তন্ন তন্ন করে পড়লাম। কিন্তু কেন যে এমন একটি শ্যামদেশীয় যমজ প্রসব করা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন মনে হল বুঝতে পারলাম না। এই প্রসূতি তো প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার নন। কীজাতীয় সাইকোলজিক্যাল কমপালশান বা তীব্র মানসিক চাপ ছিল যার ফলে একটি গবেষণার প্রতিবেদন এবং একটি উপন্যাস এভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়েছে? যাই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ধরতে না পারলেও একথা ধরে নেওয়া যায় যে 'তাঁর লেখার গঠন বাইরে থেকে চাপানো নয়, ভিতরের তাগিদে ভিতর থেকেই হয়ে ওঠা "অরগ্যানিক" বা জৈব।' এই আঙ্গিকেও কি বলা হবে psychic kaleidoscope?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখিকা নিজেই কবুল করেছেন যে, 'মনের কোনও এক নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, যাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, 'থীম' দুটি আমার চৈতন্যে সংসক্ত হয়ে গেল।' তবে এই সংসক্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সজ্ঞান সাহিত্যকর্মও বটে। পরস্পর সংসক্ত এই 'থীম' একটি সযত্নপ্রসাধিত সাহিত্যরচনার রূপ নিয়েই তো ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ তো মোটেই মনোবিকলন-প্রক্রিয়ার মুক্ত অনুষঙ্গে প্রাপ্ত আপাত-বিক্ষিপ্ত আলাপচারণা নয়। তবু উদ্দেশ্য খুঁজবার জন্য লেখিকার নিরজ্ঞান মনে ডুবুরি নামাবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। রচনার উপরিতলকেই সাবধানে অনুধাবন করে আমার মতো সাধারণ পাঠক-পাঠিকা যতটুকু বুঝতে ও উপভোগ করতে সক্ষম, তার ভিত্তিতেই আলোচনা করা যাক।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসের নায়িকা অনামিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তার এক সেফার্দিক ইহুদী বান্ধবী এমিলিয়ার সাহায্যে লাদিনো উপভাষার লোকগীতি অনুবাদ করছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি একটি পুস্তক-সমালোচনা ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর যে প্রামাণ্য জীবনী ডরিস মায়ার রচনা করেছেন, তারই। অধ্যায়ের একেবারে শেষে পৌঁছে জানা গেল পুস্তকসমালোচনাটি শ্রীমতী অনামিকাই লিখেছে, এবং সদ্য ডাকে দিয়ে এসেছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে কলকাতার 'দেশ' বা 'জিজ্ঞাসা'র উদ্দেশে। অর্থাৎ এই অধ্যায়েও উপন্যাস চলছে—তবে 'গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা'-র সঙ্গে এবার তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। এবং নিশ্চিত জানা গেল, 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পো-'র সন্ধানে যে যাত্রা করেছে সে এই 'অনামিকা'। অথচ বইয়ের মলাট পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি কেতকী কুশারী ডাইসন। শুনেছিলাম যেন এই সন্ধানী গবেষণাকর্মের জন্যই তিনি আনন্দ-পুরস্কৃত-ও হয়েছিলেন।

দুজনের অভেদ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটি প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল। ডরিস মায়ার রচিত জীবনীতে এবং তাঁকে অনুসরণ করে পুস্তক-সমালোচনা লেখিকার (অনামিকা/কেতকী যে-ই হোন) রচনাতেও জানা গেল যে এই বৃত্তান্তের ঝোঁকটা ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর 'love life'-এর উপরে তত নয়, যতটা কিনা 'loves of her life'-এর উপর জেনে খুব ভালো লেগেছিল। কারণ মহিলাদের 'loves of life' বিষয়ে পুরুষরা তো উদাসীন বটেই—মহিলারা নিজেরাও খুব আগ্রহী বলে মনে হয় না। মূল বিষয় থেকে খানিকটা সরে গিয়েও প্রসঙ্গটা একটু আলোচনা করা অনুচিত হবে না।

আবহমান কালের পুরুষশাসিত সমাজে একই পুরুষের শয্যায় 'শৃঙ্খলিতা' মহিলারা স্বাধিকারের লড়াই ঘোষণা করতে গেলে প্রায়ই তাঁরা তাঁদের 'লাভ লাইফ' নিয়ে এমন জট পাকিয়ে ফেলেন যে তার ফাঁস ছাড়াতেই সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় দেখি। অথচ কোনও মহিলার বেলাতেও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ প্রকাশের জন্য আরও যে-কিছু ভালোবাসার যোগ্য বস্তু—'লাভস্ অব লাইফ'—থাকতে পারে বা থাকা প্রয়োজন একথা এখনও এদেশের 'পরমা'-রা ভুলেই থাকেন যেন। তবে কি নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যাটাই প্রথম, এবং প্রায়শই শেষ, রণক্ষেত্র হয়ে থাকবে? 'মৃণাল'কে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছিলেন। বাঙালি মেয়েদের আধাআধি গড়ে ছেড়ে দিয়েছেন বলে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর যে নালিশ ছিল তারই সুবিচার করতে গিয়ে বোধহয় 'মৃণাল'কে একটা পূর্ণ ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ বাঙলা ১৩২১ সালেই বাঙালি মেয়ের ইমানসিয়েসিয়ন/লিবারেসিয়নের (কেতকীর যা পছন্দ বলুন) যে স্বরূপ কল্পনা করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আজও সেখানে আমাদের অনেকেরই কল্পনা এবং দাবিদাওয়া পৌঁছাতে পারছে না কেন?

স্ত্রীশিক্ষা ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ব্যাপ্ত হয়েছে। এদেশেও অনেক শিক্ষিতা মেয়ে অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছেন। আইনের জোরে মেয়েদের সামাজিক অধিকারও কিছুটা সুরক্ষিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে মাতৃত্বকে গ্রহণ বা বর্জন করবার যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা আমাদের মা-ঠাকুরমাদের কালে অভাবিত ছিল। এর পরেও কি আমাদের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হবে এক শয্যার পরিবর্তে একাধিক শয্যায় আমাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে? তাহলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, রাজনীতি, বিপন্ন মানুষের দুঃখমোচন ইতাদি অসংখ্য যেসব কাজ/'প্যাশন'/'লাভ' মহিলাদেরও মাতিয়ে রাখতে পারত সেই দিকে আমাদের আত্মপ্রকাশ যে আজও এত ক্ষীণ, এত দ্বিধাজড়িত থাকবে এতে আর অবাক হবার কী আছে? অথচ 'মৃণাল' তো তার মনুষ্যত্বের পূর্ব অধিকার অর্জন করবার জন্যই, নিজের বিবেকবুদ্ধি মতো চলবার জন্যই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে বার হয়ে মেজ বউয়ের খোলস খসিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। গার্গী-বাচক্লবীর তুল্য লড়িয়ে মেয়ে আজও যে বিশেষ দেখতে পাই না তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখনও আমাদের নারীমুক্তির ধারণাটাই স্পষ্ট নয়।

এদিকে আলোচ্য এই অত্যাধুনিক কাহিনীতেও দেখছি 'অনামিকা জানে, আজও একটি মেয়ের প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা কত সুকঠিন।' মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরের আদরিণী কন্যা যাঁরা শিক্ষাদীক্ষার সবটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের এই অত্যন্ত অসম সমাজব্যবস্থার মধ্যেও, তাঁরাও আর কতদিন এই অভিমানী অভিযোগ নিয়ে বসে থাকবেন জানি না। অন্যদিকে পুরুষের আত্মপ্রকাশ তথা আত্মবিকাশের পথও কি এই সমাজের সর্বত্র গোলাপের পাপড়িতে ঢাকা? দুনিয়ার তাবৎ মেয়েদেরই কি একটি প্রতিবন্ধী-শ্রেণিভুক্ত করা যায়?

প্রত্যেকটি কৃতী ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর পিছনে আছেন অনেকজন করে সুযোগ-বঞ্চিতা এমিলিয়া। একথা ঠিক। তবে সব যুগে সব দেশে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেকটি সার্থক মানুষের আড়ালে যে ঝরে পড়েন অসংখ্য 'mute inglorious Milton' সে কথাও তো মিথ্যা নয়। 'কৃতী মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মানসতা বিষয়ে, যা নারী-আন্দোলনের পথে একটি বিপজ্জনক গর্তস্বরূপ' তার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন লেখিকা। 'কিছু কিছু মেয়ে আছেন, যাঁরা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় কিছুটা সফলতা লাভ করতে পেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন এবং মনে করেন যে তাঁরা পুরোপুরি 'মুক্ত'। তাঁরা ভাবেন যে এ লড়াইয়ে সব দুর্গ জেতা হয়ে গেছে; পৃথিবীর কোটি-কোটি পরাধীন মেয়েদের কথা তাঁরা ভাবতে চান না। সে-বিষয়ে যে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনও দায়িত্ব আছে তাও মনে করেন না। নারীর মুক্তিসংগ্রামে এই মেয়েদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় ঘরের শত্রু বিভীষণের।'

যদিও পুরুষনিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় বিশেষ কোনও সফলতা অর্জন করে উঠতে পারি নি, আপাতত বিভীষণ প্রতিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলি পুরুষ হোক, স্ত্রীলোক হোক কোনও সামাজিক মানুষই কি পুরোপুরি 'মুক্ত' হতে পারে, সমাজের কাছে কিছু স্বাধীনতা সমর্পণ করেই কি তার বিনিময়ে আশ্রয় পাই না আমরা? আর প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা একজন পুরুষের পক্ষেও কি কম সুকঠিন? সমাজ-সংসারে হাজার রকম আরোপিত ভূমিকা কি পুরুষের আত্মপ্রকাশের পথও কণ্টকিত করে রাখে না? ভূমিকাশাসিত সমাজে পুরুষ-ই কি মুক্ত-মঞ্চের স্বয়ংশাসিত নায়ক?

যাই হোক, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের পুরোভাগে যেসব মহিলারা রয়েছেন—সব দুর্গ একে-একে জয় করে নেবার জন্য সেমিনার, সিম্পোসিয়াম-ওয়ার্কশপে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন নানা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফাউনডেশানের অর্থানুকূল্যে, তাঁরা কোটি-কোটি পরাধীনা মেয়েদের 'মুক্ত' করার ব্যাপারে কতটুকু কী ভাবেন এবং তাদের জন্য কী করেন জানতে ইচ্ছা করে। 'মুক্ত' মহিলাদের মধ্যেও তো বেশ একটি সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা পুরুষশাসিত সমাজে গাছেরও খান, তলারও কুড়ান ; এক হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন আবার অন্য হাতে মূঢ় পুরুষদের শোষণও করেন দেখি। সেই সঙ্গে সময়ে অসময়ে নারীজন্মের বঞ্চনা নিয়ে হা-হুতাশ করেই স্বজাতির প্রতি কর্তব্য সমাধা করেন। ফলে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে একদিকে গুটিকয় কৃতী মহিলা মই বেয়ে সমাজের সর্বত্র মগডালে উঠে পড়েছেন, অন্যদিকে বঞ্চনাসীমার তলায় যে মানুষগুলি নাকানি-চোবানি খাচ্ছে তাঁদের সত্তর ভাগই মহিলা। এবং জগৎব্যাপী উইমেন্স লিব আন্দোলনের মাঝখানেও এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনতর ফেমিনাইজেশন অব পভার্টির পাশাপাশি উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো ঠেকে।

কথা হচ্ছিল ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুরুষ-সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে এই ভদ্রমহিলা শক্ত হাতে মোকাবেলা করার পর সেসবকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর-দূর ক্ষেত্রে। এই গবেষণাকর্মের কল্যাণে আমরা সেসবের সবিস্তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। অনামিকার মনে হয়, 'ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্কে বাঙালিদের প্রচলিত ধারণাটাও বড্ড সংকীর্ণ, সীমিত। ওই কপোতবিবরবদ্ধ ধারণাটার চাইতে তিনি যে অনেক বড়ো' একথাটা আমাদের কারুর-কারুর সম্পূর্ণ অজানা হয়ত ছিল না। কিন্তু কতটা যে বড়ো তার পরিচয় এতদিনে ঠিকমতো পাওয়া গেল। 'ভিকতোরিয়া ওকাম্পো শুধুই রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নয়, আপন প্রতিভা ও কীর্তির জোরেও বাঙালিদের কাছ থেকে স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন'—এই উক্তির সমর্থনে তাঁর কর্মকীর্তির দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে। 'নারীমুক্তি-সংগ্রামী ফেমিনিস্ট ভিকতোরিয়া, স্বাধীনতা-পিপাসু স্বাধীনতাসংগ্রামী ফ্যাশিজমবিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিকতোরিয়া, সাহিত্যরসিক সংগীতরসিক শিল্পরসিক আবৃত্তিকার অভিনেত্রী হতে চাওয়া লেখিকা ভিকতোরিয়া, সমুদ্রপ্রেমিক বৃক্ষপ্রেমিক ক্যাকটাসের সমঝদার ভিকতোরিয়া, আলোকপিয়াসী মিষ্টিক রবীন্দ্রভক্ত ভিকতোরিয়া, বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সেতুবন্ধন ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ধ্বজাবাহক ভিকতোরিয়া, সুন্দরী-লাজুক-সংবেদনশীল এবং তৎসত্ত্বেও 'জাঁদরেল পুরুষমানুষ' ভিকতোরিয়া, অগণিত বিখ্যাত নরনারীর বান্ধবী ভিকতোরিয়া...' আর কত চাই? এত ধারায় নিজেকে ছড়িয়ে দেবার মতো যাঁর অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি ছিল নিঃসন্দেহে তিনি 'মুক্ত' নারীর একটি সম্পূর্ণ প্রতিমা। যদি অবশ্য রক্তমাংসের দেহে সম্পূর্ণতা লাভ করা সত্যিই সম্ভব হয়।

যাক, এবার গবেষণা থেকে উপন্যাসের দিকে তাকানো যাক। অবশ্য উপন্যাস আর গবেষণা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়েছে অধ্যায়ের পর অধ্যায়। অনামিকার কৃতী মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ স্বামী রঞ্জনের অপঘাত মৃত্যুর পরেও সে কিশোর ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ব্রিটেনেই থেকে যাবে ঠিক করে। বীমা ও ক্ষতিপূরণের টাকায় হিসেব করে চললে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও তাদের কুলিয়ে যাবে। তা ছাড়া আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের মতো করে বাঁচবার স্বাধীনতা এ সমাজে বেশি, এবং অনামিকা নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে বরাবর। অতএব দেশে আত্মীয়স্বজনের মাঝে না ফিরে যাওয়াই ঠিক করল।

'অনেক দিন আগে কলকাতায় অনামিকা যখন ছিল তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী, তখনও অসাহিত্যিক নানান বিষয়ে কৌতূহল ছিল তার। রঞ্জনের সান্নিধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের জগৎটাকে ক্রমশ পিছনে ফেলে এসেছে। ...এখন তার সাহিত্যচেতনা বৃহত্তর বিশ্বচেতনারই অন্তর্ভুক্ত।' বর্তমানে সংসার ও সন্তান পালনের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বোক্ত অনুবাদ আর গবেষণার কাজেই সে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। 'এই যে বিজয়াকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এটা তো রুটির জন্য নয়, স্রেফ লেবার অফ লাভ।' তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের সূত্রে কলকাতায় থাকতেই ফরাসি ও জর্মান শিখেছিল। তারপর নিজের তাগিদে ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ ও তার উপভাষা লাদিনোর দিকে।

অনামিকার শুভানুধ্যায়িনী বয়োজ্যেষ্ঠা বান্ধবী এমিলিয়ার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল রঞ্জনের রোগিণী হিসাবে। এখন এই বান্ধবীই সব ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড়ো সহায়। লাদিনো থেকে অনুবাদের কাজেও সাহায্য করেন, আবার গবেষণার ব্যাপারে নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য করেন—কখনও ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিজের উপর টেনে নেন। এবং দেখা গেল অনামিকার অকাল বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য তিনিই তাকে একটু *ঠেলে* দেন পূর্বপরিচিত অশনির দিকে। অশনিও ইয়োরোপে অভিবাসী বাঙালি। ওলন্দাজ স্ত্রী এবং কন্যাসহ একটি সংসার আছে বটে আমস্টারডামে। কিন্তু কাজের সূত্রে ইয়োরোপের নানা জায়গায় তাকে থাকতে হয়। আপাতত অশনি বেশ কিছুকাল একাকী লণ্ডনবাসী।

ভিকতোরিয়া ওকাম্পো বিষয়ে তথ্যের সন্ধানে টটনেস-সংলগ্ন ডার্টিংটন হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যেতে হয় অনামিকাকে। শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার কাজে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত ছিলেন যে লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট তিনিই আবার রবীন্দ্রনাথের আর্জেনটিনা সফরে তাঁর সচিব ও সহচর ছিলেন। তাই ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথ রূপকথায় এল্‌ম্‌হার্স্টেরও একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। কবির সান্নিধ্যে যে জীবনদর্শন আয়ত্ত করেছিলেন এল্‌ম্‌হার্স্ট তাই পরে রূপ পেয়েছিল তাঁর এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে। তাই অনামিকার আরব্ধ গবেষণাসূত্রে ডার্টিংটন হলে যেতেই হয় মূল্যবান তথ্যের সন্ধানে।

দেখা গেল এ সময়েই ঘটনাচক্রে অশনিও পৌঁছে গিয়েছে ওই অঞ্চলে। ঠিকানা এবং উৎসাহ অবশ্যই এমিলিয়া জুগিয়েছিলেন। রঞ্জনের মৃত্যুর পর সেই প্রথম ছেলেমেয়েদের ছেড়ে অনামিকার বাইরে আসা। অশনির সঙ্গে ইতিপূর্বে কিছু অন্তরঙ্গ পত্রবিনিময় এবং বন্ধুত্ব হয়েছে। অভ্যস্ত সংসারজীবনের বাইরে তার ইনটেলেকচুয়াল কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ অশনির আবির্ভাব তার মুক্তির আর-এক দিগন্ত খুলে দেয়।

এর পর ঘটনা দ্রুত গড়ায়। সারাদিন এল্‌ম্‌হার্স্ট রেকর্ড্‌স্‌ অফিসে বসে কাজ করার পর একদিন সন্ধ্যায় অশনির সঙ্গে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে পানভোজনের পর প্রচণ্ড মাথা ধরে অনামিকার। অত রাত্রে দেখা যায় অশনির হোটেলের ঘরেই শুধু পাওয়া সম্ভব মাথাব্যথার জন্য অ্যানাডিন যা না পেলে সে মরেই যাবে মনে হয়। অতএব দশ মাইল পাড়ি দিতে হয়। তবে গাড়িতে যেতে-যেতে অত 'সাংঘাতিক' মাথাব্যথা নিয়েই অশনির পাশে বসে একটি 'দারুণ মিষ্টি' লাদিনো লোকগীতি গেয়ে শোনায় অনামিকা। বাঙলায় তার অনুবাদটাও শুনিয়ে দেয়

চাঁদের আলোয় এক রাতে
বেড়াতে গিয়েছিলাম
দেখলাম এক ছোকরাকে,
আঁখি ঠারলো সে আমাকে
তখনই কাফেতে টেনে নিলো
দুটি ছোট্ট চুমু দিয়ে দিলো

জোর কদমে এগিয়ে যায় প্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতা—শুধু যা অপ্রত্যাশিত তা হল এইখানে বইয়ের ছাব্বিশ অধ্যায়ে এসে হঠাৎ সাধু ভাষার ব্যবহার! কেন? ব্যাপারটাকে যেন কেউ লঘু বলে মনে না করে? আটপৌরে বাঙলা ভাষায় 'রহঃকেলি'-র প্রতিশব্দ কি অশ্লীল শোনায় তাঁর কানে? স্ত্রী শব্দটা যেসব বাঙালি ভদ্রলোকদের কানে অশ্লীল ঠেকে তাঁরা তাঁদের 'ওয়াইফ' বলে উল্লেখ করেন দেখি। এখানে ঘটনা ও বর্ণনায় যে-কবিতা যে-পবিত্রতাদাবি করেন লেখিকা আমার মনে হয় তার জন্য তৎসম শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক ছিল না।

এদিকে অনামিকার মনে হয় 'যে-দৈব বেলফাস্টের একটি রেস্তোরাঁতে রঞ্জনের উপর শেলবর্ষণ করিয়াছিল, সেই দৈবই টটনেসের একটি রেস্তোরাঁতে অনামিকাকে অশনির সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।' দেখা যাচ্ছে ইমানশিপেটেড মহিলারাও প্রয়োজনমত দৈবের উপর খানিকটা দায়িত্ব চাপিয়ে আরাম বোধ করেন। অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক্ষেত্রে 'অনামিকার বোধ হইল সে সত্যই স্বাধীন ও আধুনিক নারী কিনা, সহসা তাহার কঠিন পরীক্ষার লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পরম্পরাগত কোনও নিষেধের সংকেত খুঁজিয়া পাইল না। বস্তুত অশনির সহিত রাত্রিযাপনের আইডিয়াটির প্রতি সে কোনও বিকর্ষণ অনুভব করিল না শুধু তাহাই নহে, বরঞ্চ আকর্ষণই অনুভব করিল।' ভালো কথা।

তবে রজনীশেষে অশনির আচরণে কিছুটা অশোভন (অথবা সাবধানী?) তাড়া ছিল। তাই অনামিকা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, 'কাল রাত্রে তোমার কাছে থাকিতে বলিয়াছিলে। থাকিয়াছি। যেই ভোর হইয়াছে, তোমার প্রয়োজন মিটিয়াছে, অমনি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ, ঘরের বাহির হইবার জন্য তাড়া দিতেছ।' ...একজন স্বাধীন আধুনিক মহিলার মুখে এই অভিমানের ভাষাটা আমার কানে বেশ বেমানান ঠেকছে। প্রয়োজনটা কি শুধু একতরফা অশনির ছিল? সে কি কোনও নাবালিকাকে ফুসলিয়ে এনে ঘরে তুলেছিল? এই ভাষায় যে মহিলা-জনোচিত প্রতিন্যাসটা ধরা পড়ছে তা যে আবহমান কালের সেই নারীর যে-নারী পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়—তাকে ব্যবহার করার শক্তি ধরে না। অনামিকা কি সেই জাতীয়া?

সে রাত্রে অশনির শয্যায় অংশগ্রহণ করে তার অনেক প্রাক্তন অভিজ্ঞতাই অনামিকা জেনে নিয়েছিল। জীবন-জীবিকা, নারী, স্ত্রী, আত্মজা ইত্যাদি বহু ব্যাপারেই অশনি নিজেকে অসঙ্কোচে যতটা প্রকাশ করেছিল তাতে অনামিকার চোখে মোহ-অঞ্জন লাগার কোনও কারণ ছিল না। সকাল বেলায় কথায় কথায় অনামিকা তাকে 'ধুরন্ধর নাগর' বলে অভিহিত করায় অশনি উল্লসিত হয়ে জানায়, 'অতীতে আমি সত্যিই পারদর্শী প্রেমিক ছিলাম। রমণীগণ আমার রতিকুশলতার কত প্রশংসা করিত।' অতএব বোঝা গেল যে এটা দুজন প্রাপ্তবয়স্ক আধুনিক মানুষের সহজ স্বাভাবিক মোহমুক্ত সৌহার্দ্য-বিনিময়। অথবা অনামিকার ভাষায় হয়তো 'টেনডারনেসের' পারস্পরিক প্রয়োজন মেটানো। তবে তারও একটা অভিভব, একটা মুগ্ধতা কখনও-সখনও থাকতেই পারে বলে অনুমান করি। কিন্তু অনামিকার বেলায় গত রাত্রির সুরটা কেটে যায় অশনির প্রভাতী ব্যস্ততায়।

তাই দুর্বোধ্য ঠেকে অনামিকার বিষণ্ণতা। ঘণ্টাখানেক পরে নিজের হোটেলে বসে সামনে কফি নিয়ে প্রাতরাশের অপেক্ষা করছে—অশনি তাড়াহুড়ো করে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তখনও তার স্নান ও কাপড় পালটানো হয়নি বলে অধোবাসে অস্বস্তিকর সিক্ততা অনুভব করছে। জানলার বাইরে তখন বরফ পড়ছে। অনামিকা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে আবৃত্তি করে

I think
love is like that ; merciful as snow
bandaging the bruised earth,
while making the green grow.

আধুনিকারাও এত অল্পে 'bruised' হন? আর এখানে আর-একবার সেই 'too

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

often profaned' শব্দটির ব্যবহারে আমার সেকেলে মন হায় হায় করে উঠল।

এরপর কাহিনী যে-মোড় নেয় তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত না হলেও অনামিকা এবং পাঠকদেরও একটু বিমূঢ় করে বইকি! কিছুকাল পরে অনামিকার আগ্রহাতিশয্যে অশনি জানায় যে সামনের ছুটিতে তারা নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রাইটনে কয়েকদিন একসঙ্গে ছুটি কাটাতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্পষ্ট লেখে 'আমার শুভেচ্ছা হোক তোমার পাথেয়। তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি সুখী হও। কিন্তু আমাকে তুমি বিছানায় পাবে না।' তবু যথাসময়ে যথাস্থানে অশনি এসে যোগ দেয় কন্যা বাঁশিকে নিয়ে। সেই সঙ্গে তার নতুন শয্যাসঙ্গিনী আধা-ওলন্দাজ আধা-ইন্দোনেশিয় মারগ্রিটকে নিয়ে আসে—তার বয়স এমন যে প্রথমে মনে হয় বাঁশিরই বন্ধু বুঝি। তবে নাবালক কিশোর-কিশোরীদেরও বুঝতে দেরি হয় না। অথচ এরই মাঝখানে ধুরন্ধর নাগর অনামিকাকে ভরসা দেয় 'আমার মন কি বলছে জানো? বলছে, তোমার সঙ্গে আমার ভারী সুন্দর একটা কিছু হবে,—ভবিষ্যতে...এখন তারই টিউনিং আপের সময়। সেই তার বাঁধায় তোমার সহযোগিতা লাগবে।'

এবার অনামিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, 'তাহলে অত তাড়াহুড়ো করে আমাকে শোয়ানোর কী দরকার ছিল? আমি কি তোমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিলাম, আজ রাত্রে তোমার ঘরে একটু ঠাঁই দাও অশনিদা?' হায় খণ্ডিতা নারী! আধুনিক স্বাধীন রমণীর গুমর এত সহজে খানখান হয়ে গেল? চিরকালের এক্স্প্লয়টেড সামান্যা মেয়ের মতো কপালে করাঘাত। পড়তে যে লজ্জা করে! কিন্তু এর পরেও নাকি অশনি তাকে 'বিশাল এক তীর্থে নিয়ে যেতে' চায়। 'যেখানে সহজ আর কঠিন, ক্ষণিক আর চিরন্তন, অর্ডিনারি আর মিরাকুলাস ইত্যাদি বৈপরীত্যকে' সে মেলাবে। তার জন্য অনামিকাকে কিছুটা পথশ্রম স্বীকার করতে হবে। এমন মহৎ প্রত্যাশা জাগাবার পরে যে যার ঘরে শুতে যায়। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভোররাতে জেগে উঠে বাথরুমে যায় অনামিকা। দেখে, 'টয়লেটের জলে একটা জন্মনিরোধক ভাসছে।' অনামিকা চোখ বন্ধ করে একটা 'বিস্ফোরক শোক সবলে অবদমন করে বাথরুম ব্যবহার করে বেরিয়ে আসে।' এতটাই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল অনামিকাকে!

কিন্তু বুঝতে পারি না, অনামিকার আশা করার ক্ষমতা অসীম, না তার নির্বুদ্ধিতা। তাই 'অশনি যে ঠিক কী চায় তা এখনও অনামিকার কাছে তেমন একটা স্পষ্ট না। তবুও তার মনে হয় যে অশনিও তাদের সম্পর্কটাকে সুন্দরতর সমৃদ্ধতর করে তুলতে চাইছে।' ...আবার মনের কোণে সে অনুভব করে অশনির ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকিবাজি থেকে যাচ্ছে, যা প্রকৃত সৌহার্দ্যের পরিপোষক নয়।

এরপর উপন্যাস শেষ হতে আর খুব দেরি হয় না যদিও অবশ্য বইয়ের অর্ধেকের বেশি জুড়ে আছে এই পরগাছা। ব্রাইটনের শোকাবহ অভিজ্ঞতার পরেও অনামিকা আশা ছাড়ে না। কিছুকাল পরে আবার চিঠি লেখে। অশনি ভদ্রলোক। সে সংক্ষিপ্ত হলেও সর্বদা চিঠির জবাব দেয়। এবারে জানায় যে সে-ফুরসত পায়নি চাকরির নানা ধান্দায়। 'তবে সত্যি কথা বলতে কি আসল কারণটা অকারণ মারগ্রিট। তার শান্ত গভীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাবণ্য আমাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে রেখেছে এর বেশি আর কি বলার আছে।'

অনামিকার আছে, কারণ যথাস্থানে মানে-মানে নিরস্ত হওয়া তার স্বভাবে নেই। এবার সে দীর্ঘ পত্র লেখে। তাতে ফকল্যান্ড সংকট, স্বদেশ আর্জেনটিনার প্রতি ভিকতোরিয়ার মনোভাব ইত্যাদি আলোচনার সঙ্গে এমন কথাও জানায়, 'আমাদের বয়সে ভালোবাসাগুলিকে ওয়ান অ্যাট আ টাইম পদ্ধতিতে নিয়মিত করার কোনও মানে হয় না...' অতএব...।

অবশেষে অশনির দীর্ঘতম এবং তিরিক্ষি জবাব। বক্তব্য অতি স্পষ্ট 'এত জ্ঞান দাও কেন বল তো? আমি কাকে কখন কিভাবে ভালোবাসব তা কি শুধু আমারই কনসার্ন নয়? ...তোমার যৌনতার ক্ষুধা আছে, মৌনতার ক্ষুধা নেই। ওইখানেই তোমার সাথে আমার মস্ত প্রভেদ। এবং সেজন্যেই তোমার আমার সংলাপ এ জন্মে সম্ভব নয়।...

...আর ভালো লাগছে না। আর কথা বাড়াতে চাই না, আমি থামতে চাই।'

আমরাও কি চাই না? আমাদেরই কি ভালো লাগছে? তবু আরও একটু কথা বলা বাকি থাকে উপন্যাস বিষয়ে। কারণ ইতিপূর্বে ব্রাইটন থেকে ফেরার অল্প পরেই শুভেচ্ছাবাহী কার্ড পাঠিয়ে অনামিকা অশনির কাছ থেকে একটি 'সংক্ষিপ্ত নোট' পেয়েছিল। তাতে ছিল, 'তোমার কি মনে হয় না, মিশা, যে বিরহের বাঁশি, মিলনের বাঁশির চাইতেও বেশি মধুর, বেশি নিবিড়?' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে বসে অনামিকা মন্তব্য করে 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই যে একটা বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ বিরহের cult—হ্যাঁ কাল্‌ট ছাড়া আর কী বলা যাবে একে, অশনি কি একে নিজের অন্তঃস্থ করে নেয়নি? আমাকেও কি তাতে যোগ দিতে বলছে না? ব্যাপার কী? যার এককালে প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন শয্যাসঙ্গিনী লাগত, সে কি এখন কবিগুরুর মতন বিরহবেদনা মন্থন করে কবিতা লিখতে চায়?'

উপন্যাস ও গবেষণা সমান্তরালে চলতে-চলতে এখানে এসে পরস্পরকে আর-একবার স্পর্শ করে। আগেও করে নি এমন নয়। কিন্তু এখানে এসে আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়। একে যদি অসহ্য ধৃষ্টতা বলে আমার মনে হয়ে থাকে তবে কেতকী এবং তাঁর মুগ্ধ পাঠকরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন না। তবে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ বলে সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু যেখানে বিচারটা নান্দনিক সেখানেও আমি নীতিবিশুদ্ধতার গজকাঠি নিয়ে বসেছি এমন অপবাদ আমি স্বীকার করব না। এবং এমনতর ধিক্কার শুনেও অনুতপ্ত হব না। আমার কষ্ট হয়েছে এই জন্য যে এমন সংবেদী লেখিকার কাছ থেকে আমি আর-একটু সফিস্টিকেশান প্রত্যাশা করেছিলাম। এযুগে লঘুগুরুজ্ঞানের অভাব নিয়ে গঞ্জনা দিলে সেটা পরিহাসের ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং সাহিত্যের দৃষ্টিতেও আমরা কি স্থূল আর সুকুমারের তফাত করব না। কোন্ সংবেদনাটা খাঁটি আর কোন্‌টা মেকি তারও বিচার করব না? পরিমিতিবোধ না হয় নাই দাবি করলাম, কিন্তু বুদ্ধির বিচারেও কি সবই তুল্যমূল্য?

এবারে বলি যে, যেমন করে 'দোস্তী রোটির' পরত দুটি সাবধানে পরস্পর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় তেমনি করে এই গবেষণাকর্মকে উপন্যাস থেকে পৃথক করে যখন দেখি মুগ্ধ হই। পৃথক করার কষ্ট স্বীকার করতেই হল এবং কী বস্তু যে এই গবেষণার গায়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেও দেড় হাজারের বেশি শব্দ ব্যবহার করতে হল। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেবার সময় আমার কলম সরছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত দেওয়াই ঠিক করলাম—কারণ মনে হল স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাই ভালো কোথায় আমার আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সমান্তরালে অশনি-অনামিকার যে কাহিনি কেতকী পরিবেশন করেছেন তা কাল্পনিক হোক, আত্মজৈবনিক হোক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওই কাহিনির স্থান ওখানে হতে পারে না—যৌক্তিক, নান্দনিক কোনও বিচারেই। পাঠককে ওই বস্তু গলাধঃকরণ করিয়ে লেখিকা কৃতজ্ঞতাভাজন হননি।

সত্য যে মাঝে-মাঝেই কল্পকাহিনীর চেয়েও বেশি চিত্তহারী হয়, একথা কেতকীর অজানা নয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই স্বল্পজ্ঞাত কাহিনিটি তার মানবিক সাহিত্যিক আবেদনে কী অসম্ভব সুন্দর তা কেতকীর চেয়ে বেশি আর কজন জানেন? তবুও এই বইয়ে খাদ মেশাতে হল?

সত্য কাহিনীটি প্রথম থেকেই খুব নাটকীয়। একেবারেই অপ্রত্যাশিত অপরিকল্পিত এই পরিচয় সম্বন্ধে বলাই যায়, 'কী ছিল বিধাতার মনে।' তবে 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে যত নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভিকতোরিয়া ওকাম্পোই ছিলেন ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে বুদ্ধিবৃত্তিতে শিল্পবোধে রবীন্দ্রনাথের উচ্চতার সবথেকে কাছাকাছি'—এ বিষয়ে দ্বিমত হবার আশঙ্কা না থাকলেও সত্যের খাতিরে মনে রাখা ভালো যে, 'ছিলেন' না বলে 'হয়ে উঠেছিলেন' বললে আরও যথার্থ হয়। কারণ ১৯২৪-এ যখন প্রথম পরিচয় হয় আর্জেনটিনায় তখনও ভিকতোরিয়া খুব কিছু হয়ে ওঠেননি। তবে একটা প্রস্তুতিপর্ব, একটা ভাঙাগড়া যে চলছিল তাঁর জীবনে তা হয়তো টের পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ সালে ইয়োরোপে যখন শেষবারে দেখা হয় তখন আরও পরিণত, আরও প্রত্যয়সম্পন্না একজন মহিলাকে পেয়েছিলেন যিনি অবলীলায় চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন প্যারিসের রসিক সমাজে। কিন্তু ভিকতোরিয়ার যে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা তা তখনও দূরে। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রবাসের দিন যিনি মাধুর্যসুধায় ভরে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রচৈতন্যে যাঁর স্থায়ী অবস্থানের স্পষ্ট স্বাক্ষর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পাওয়া গিয়েছে

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

তাঁকে কৃতী মহিলা হতেই হবে এমন কোনও প্রয়োজন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ছিল না! রবীন্দ্রনাথের 'নারীভাবনা' নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কেতকী,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনোজ্ঞ এবং উপভোগ্যও। সর্বত্র হয়তো বিতর্কের ঊর্ধ্বেও নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। এই বিশেষ নারীতেই ফিরে আসি।

যে-দুমাস বুয়েনোস আইরেসে রবীন্দ্রনাথ এল্‌ম্‌হার্স্ট সহ ভিকতোরিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই দুই মাসেই একটি জীবনব্যাপী সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারটা খুব মসৃণ ছিল না। ভাষা, সংস্কৃতি, বয়স, অভিজ্ঞতার পটভূমি ইত্যাদির বেড়া ডিঙিয়ে তিনটি মানুষের সম্পর্ক যে টানাপোড়েনে বোনা হচ্ছিল, তার অতি উপাদেয় বর্ণনা পেয়েছি আমরা এই বইয়ে। 'অনেক মানবিক সম্পর্কের মতো ভিকতোরিয়া ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও যে আলো আঁধারি ছিল' তার উপর তীব্র সার্চলাইট ফেলে অনেক কিছুই আমাদের চোখের সামনে তুলে এনে দিয়েছেন লেখিকা। কখন-সখনও গবেষণার সীমা ছাড়িয়ে জল্পনায় হয়তো চপলতার স্পর্শও লেগেছে (ভিকতোরিয়া আর এল্‌ম্‌হার্স্ট 'মুসলমান হয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারতেন' কিনা কিংবা যদি ওঁরা দুজনে আইনের ধার না ধেরে এবং ও-সমস্ত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে স্রেফ শান্তিনিকেতনে এসে 'লিভ টুগেদার' করতে চাইতেন তাহলে ওঁদের ঘটক তথা গুরুদেব সে ব্যবস্থা অনুমোদন করতেন কি?')। কিন্তু যেভাবে এই তিন ব্যক্তির জটিল বহুতল-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে গভীর মমতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা। কার কোথায় বাধা ছিল, কোথায় যে প্রতিহত হচ্ছিল ত্রয়ী সম্পর্কের ঋজুধারা, তার হৃদয়গ্রাহী বুদ্ধিগ্রাহী বিশ্লেষণ আমরা পেয়েছি। এই কাহিনি যে শেষ পর্যন্ত এক ট্র্যাজিক মাত্রা পায়, তার মূলেও আমরা পৌঁছাই অত্যন্ত ইনটারেস্টিং এই চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সদ্য-উদ্‌ঘাটিত কিছু তথ্যের সাহায্যে। সেজন্য লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই।

সিস্টার নিবেদিতা কিংবা মীরা বেনকে ভারতীয় মন সহজে বোঝে এবং শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। ভিকতোরিয়া অন্য জাতের মহিলা। আধুনিক যুগের জটিল সংঘাতে গড়া—যদিও কালের দিক থেকে এঁরা পরস্পরের খুব একটা দূরবর্তী নন। ভিকতোরিয়াকে সম্পূর্ণ করে জানতে হলে অবশ্যই 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' যেতে হবে। কিন্তু মনে একটু খেদও থাকে। হীরে ফেলে যে আঁচলে কাঁচ বাঁধে, তাকে আমরা করুণা করি। কিন্তু যে হীরে আর কাঁচ দুয়েরই বেসাতি করে এবং হীরের সাথে কাঁচও গছিয়ে দিতে চায়, তাকে কী করব?

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২ (১৩৯[illegible] সংখ্যা [illegible]–১২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-গবেষণার একটি অভিনব ধারা

২

শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের বাঙলা বইটি বন্ধ করে ইংরিজি বইখানা খুলে খুব আরাম বোধ হয়েছিল। প্রথমত চোখে। নাভানার ছাপাই ও কাগজ যেমন চোখের পক্ষে কষ্টকর, সাহিত্য একাডেমির প্রকাশনা তেমনি নয়নশোভন।

তারপর বইয়ের ভাষা। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' পড়তে-পড়তে একেক বার ধন্দ লাগছিল যে এ আমারই মাতৃভাষা পড়ছি তো! তাঁর বাকশৈলীর কিঞ্চিৎ নমুনা পেশ করি 'আত্মার লঘিমা ঘটক উত্তেজনা...' 'ভূ-ত্বকের অস্থির থালাগুলি...' 'জননী মৃত্যু যে কতখানি প্রবল ছিল... 'একটি কি দুটি ব্যক্তি পাখী...' 'কালিই যে তার শ্রেণি মিত্র... 'রোদ যা কিনা অনুমানাত্মক ঈশ্বরের হাসি-ভরা মুখ...'; 'কমলাকে নেহরু তুলিত করেছিলেন...'; 'আমার মন মুখের আপতিক কথাদের মাধ্যমে...' 'নানা শ্রেণির মূলক চিন্তকদের মধ্যে...' ; ইত্যাদি। এগুলিকে কতখানি সিরিয়াসলি নেওয়া যায় ভেবে পাই নি। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের মুখে 'আত্মীয়তার চাষ' অথবা 'স্পৃষ্ট হলাম' শুনলে কৌতুক বোধ করা যায় বটে।

কিন্তু স্বচ্ছন্দপ্রবহমান অথচ গভীর অর্থবহ গদ্য যে ইনি লিখতে পারেন না তা নয়। প্রায়ই অসচেতনভাবে লিখে ফেলেন। তারই সঙ্গে আবার যখন কষ্টকৃত বাক্‌ভঙ্গি যুক্ত হয় তখন সেই বন্ধুর ভাষার উপর হোঁচট খেতে-খেতে প্রাণমন আর্ত হয়। মনে কাতর প্রশ্ন ওঠে এই খামখেয়ালিপনার কি নিতান্তই প্রয়োজন ছিল?

ওদিকে In Your Blossoming Flower Garden-এ যেমন অনায়াস দক্ষতায় ইংল্যান্ডেশ্বরীর মাতৃভাষায় নিজের বক্তব্যকে যুক্তিসহ এবং উপাদেয় করে তুলতে পেরেছেন কেতকী তা ঈর্ষণীয়। প্রায় পৌনে পাঁচশ পৃষ্ঠার তথ্য- ও ব্যাখ্যান-সম্বলিত বইখানি যে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সংযোজন, একথাটা আমার অনেক আগেই বহু যোগ্যতর ব্যক্তি বলেছেন বলে অনুমান করি।

বইয়ের বিষয় রবীন্দ্রনাথ। বরং আরও সীমিত করে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি গভীর অভিজ্ঞতা—যার ঋজু কাব্যিক উল্লেখ প্রথম পাওয়া গিয়েছিল 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়। 'পূরবী'তে যতটুকু ধরা পড়েছিল তাতেই তাঁর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘনিষ্ঠ জনেরা এবং পাঠকেরাও অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন আরও জানবার জন্য। তাই অনুসন্ধান থেমে থাকে নি। তাঁর অন্যান্য রচনায় এবং প্রধানত ছবিতেই সেই অভিজ্ঞতার 'তির্যক' উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন কেউ-কেউ। উদ্যমী গবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন সেই পথেই আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। ইতিপূর্বে যা অজ্ঞাত ছিল এমন কিছু নিতান্ত ব্যক্তিগত—এবং কারও বা মনে হতেও পারে যে সর্বজনসমক্ষে অনুচ্চারণীয়—কিছু প্রসঙ্গও 'ফাঁস' করে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ-নামধারী পবিত্র 'দেবপ্রতিম' সত্তাটিও আসলে রক্তমাংসেরই মানুষ ছিলেন। কার সাধ্য অস্বীকার করে?

যাই হোক, রবীন্দ্রসাহিত্যের মনোযোগী পাঠকেরা ষাট-পঁয়ষট্টি বছর ধরেই 'পূরবী' কাব্যের উদ্দিষ্টা বিজয়া ওরফে ভিকতোরিয়া ওকাম্পো সম্বন্ধে মৃদু এবং মধুর কৌতূহল পোষণ করে এসেছেন। কেতকীর আলোচ্য বিষয়টি একান্তই বাঙালি ঔৎসুক্যের ব্যাপার ছিল এতকাল। কিন্তু এই ইংরিজি বইখানির কল্যাণে সঙ্গতভাবেই ব্যাপারটা এতদিনে আন্তর্জাতিক কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠল। কিন্তু কবি ও কবিকৃতির সঙ্গে যতখানি পরিচয় থাকলে এই ঘটনাটি, আর সুদীর্ঘ ও ঘটনাবহুল রবীন্দ্রজীবনের উপর এই ঘটনার প্রভাবকে, যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পারবেন এবং তার ঠিকমতো মূল্যায়নও করতে পারবেন তেমন পরিচয় ইংরিজি বইয়ের বিশ্বব্যাপী পাঠকদের শতকরা দশজনেরও থাকা সম্ভব কিনা—এ প্রশ্ন করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না।

অগত্যা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের বিধিমতো পরিচয় করিয়ে দেবার একটা দায় এই লেখিকার পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না। এই দায়িত্ব যদিও খুবই যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করেছেন, তবু মাত্র পনেরো পৃষ্ঠার পরিসরে বিদেশিদের জন্য টেলিস্কোপের উলটো দিক দিয়ে দেখা যে ছবি ধরে দেওয়া হয়েছে তা পড়তে-পড়তে একটা অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এই একটি মানুষই যে আমাদের এত কিছু ছিলেন এই ব্যাপারটাই বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে কিনা বিদেশিদের কাছে সেই ভাবনাটা প্রায় দুর্ভাবনা হয়ে উঠেছিল আমার মনে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি এবং ১৫/১৬ কোটি মানুষের এই ভাষাটা নিতান্ত পিছিয়ে-থাকা ভাষা নয়। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সংগীতকার। ভারতীয় চিত্রশিল্পে তিনিই আধুনিকতার পথিকৃৎ। এতটা হলেই কি যথেষ্টর বেশি হত না? তিনিই যে আবার শিক্ষা নিয়ে সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং একটি অভিনব আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা তিনি, সেই তথ্যটাও তুচ্ছ নয়। সেই সূত্রে একথাও বলতে হয় যে তাঁর দেশ যখন জাতীয়তাবাদের আবেগে উদ্বেল তখনই স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবনাকে রূপ দিয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করেই। আবার গ্রামীণ পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত তাঁর এই বিশ্বভারতীর মাধ্যমেই পল্লীসংগঠন-উন্নয়নের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন হাতেকলমে। এই রবীন্দ্রনাথই যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য 'মরুবিজয়ের কেতন' উড়িয়েছিলেন ৬০ বছর আগে সে খবর আজকের সবুজ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কজন রাখেন জানি না। এদেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আরও যে কতকিছুর পথিকৃৎ তিনি তার তালিকা যত দীর্ঘ করা হবে ততই কি ক্লান্তি এবং অবিশ্বাসের রেখা গভীরতর হবে না সদ্য-পরিচিত পাঠকের মুখে? বিশেষ করে এই প্রতিবেদন যদি পেশ করি তাঁর কোনও বাক্‌সর্বস্ব স্বভাষী, তাহলে তো বিদেশির মনে এমনতর আশঙ্কা হতেই পারে যে বীরপূজার উচ্ছ্বাসে পরিমিতিবোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ওই-দেশি পাঠকের উপকারার্থে একটি উপাদেয় তুলনা দিয়েছেন লেখিকা—'To use western categories he is a poet in his own right but if he appears to be, for his people, a Shakespeare and Schubert and a Bob Dylan rolled into one, that is by virtue of the time and place and tradition in which he was born, which made such an evolution possible.' এরই সঙ্গে আবার একটি ভ্যান গগকেও যদি রোল করা হত তাহলে অবিশ্বাসের ভ্রূ-কুঞ্চন আরও কত গভীর হত তাই ভাবছি।

নিজেরই হাতে পাতা এত সুবিস্তৃত জালে যিনি এমন করে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তিনিই যে আবার মাঝে-মাঝেই তার বাঁধন কেটে বেরিয়ে পড়তে পারতেন 'ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো' এটাও একটা বিস্ময়। এলমহার্স্ট সহৃদয়তার সঙ্গে লিখেছিলেন, 'All through his life the introspective artist-mystic in Tagore had to try and make peace with the crusading philosopher-humanist. The one longed for the peace and leisure in which to dream and, surrounded by the beauties of nature, to create in song, music, colour, poetry or drama, and the other to be off on one worthy mission after another to the ends of the earth.' তাঁর স্বদেশবাসীরা কয়েকজন বেশ কিছুকাল ধরে বলে চলেছেন যে নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকেই নাকি তাঁকে গুরুগিরিরি নেশায় পেয়েছিল। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার বাণী পশ্চিমের বস্তুবাদী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার একটি স্বনির্বাচিত ভূমিকা গ্রহণ করে ফেলেছিলেন বলেই তাঁর এত ঘন-ঘন বিদেশযাত্রা। ব্যাপারটা যে মেকি সেকথা বলতেও কেউ-কেউ ছাড়েননি। হবেও বা। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে, জীর্ণ দেহেও যে তাঁর 'মনোবৃক্ষের পাতাগুলি রসলোলুপ ছিল', একটা কিশোরসুলভ ঔৎসুক্য যে কোনওদিনই তাঁকে ছেড়ে যায়নি, এটুকু দাবি করলে কি তাঁর প্রতি খুব বেশি পক্ষপাতিত্ব করা হয়ে যায়?

তবে সদ্য চীন থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এসেই যখন তেষট্টি বছরের বৃদ্ধটি আবার পেরুর দিকে পা বাড়িয়েছিলেন তখন দক্ষিণ গোলার্ধের প্রতি কৌতূহলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বভারতীর সদাশূন্য অর্থভাণ্ডারে কিছু প্রাপ্তির আশা। পেরুর সরকার তাঁদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই বিশিষ্ট অতিথিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরতি পথে মেক্সিকো যাবার প্রস্তাবেও তিনি সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরু কি মেক্সিকো কোথাও আর পৌঁছাতেই পারলেন না। সেসব বাতিল করে অসুস্থ দেহে আর্জেনটিনায় থেকে যেতে হয়েছিল চিকিৎসা আর বিশ্রামের জন্য। অথচ সেখানে থাকার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তবে রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসের উপর দিয়ে যাবার সময় তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন সেখানেও বেশ ফলাও করেই করা হয়েছিল।

এই উপলক্ষে La Nacion পত্রিকায় এক মহিলা একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার শিরোনাম ছিল 'রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের আনন্দ'। রচনাটির উপসংহার ছিল এইরকম 'Bimala (the heroine of 'The Home and the world') used to wake up silently at dawn to take the dust of Nikhil's feet. She felt the need for this humble gesture. That act, which amongst her people constitutes the symbol of true respect, was necessary for her.

Bimala's gesture is the only word I can find with which to express myself, and it is with such proof of respect that I salute Rabindranath Tagore.'—এই লেখিকা ভিকতোরিয়া ওকাম্পো তখনও রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখেননি। কিন্তু আঁদ্রে জিদ-এর অনূদিত ফরাসি গীতাঞ্জলি আরও দশ বছর আগেই পড়ে অভিভূত হয়েছিলেন, তা ছাড়াও *Sadhana, The Home and the World, The Gardener, Chitra* ইত্যাদিও ক্রমে তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। কেতকীর বইয়ে *La Nacion* পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃত এই অংশটুকু পড়ে কোনও না বাঙালির দেহ রোমাঞ্চিত হবে? দুই পক্ষেরই কী পরম সৌভাগ্য যে ঘটনাক্রমে এঁরই অতিথি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শতবর্ষ পরে তাঁর কাব্য কৌতূহলভরে যে পড়বে তার প্রতি কবির কত আগ্রহ। লিখেছিলেন,

আজিকার কোনও রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে—

কিন্তু সহস্র-সহস্র যোজন দূরে বসে যে-যুবতী তাঁর বই পড়েই দূর বাঙলাদেশের একটি দাম্পত্য-প্রথার তাৎপর্য এত দূর বুঝতে পেরেছিলেন এবং এমন চমৎকার তার প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন নিজের রচনায়, যিনি রবীন্দ্রনাথকে আতিথ্য দিতে পেরে ধন্য মনে করেছিলেন নিজেকে, তাঁকে জানতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি আগ্রহ বোধ করেছিলেন? অথবা জানতে চেষ্টা করেছিলেন? এমনকী জানতে কৌতূহল হয় যে তাঁর ওই স্প্যানিশ নিবন্ধটি কেউ কি তাঁকে অনুবাদ করে শুনিয়েছিল, যখন তিনি তাঁরই গৃহে অতিথি ছিলেন?

আত্মরত কবি লিখেছিলেন বটে,

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, তোমারে যে জানি আমি জানি—

কিন্তু সেই কল্যাণীর ব্যক্তিস্বরূপকে তিনি কতটুকু জানতে চেষ্টা করেছিলেন সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহল হয় বই কি। বিশেষত সেই অভিমানিনী নারী যখন নিজেই লিখেছিলেন 'You will never know *how* I have read your books, Gurudev, and you even don't care a *damn* to know. I feel it strongly.' শুধু যে তাঁকেই জানবার আগ্রহ দেখাননি রবীন্দ্রনাথ তাই নয়, এমনকী ভিকতোরিয়া যে রবীন্দ্ররচনা কতখানি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পড়েছেন এবং বুঝেছেন সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি—এটাই ছিল তাঁর আরও বড়ো বেদনার কারণ। অন্যত্র তিনি লিখেছিলেন, 'Rabi Babu can say or write nothing that is not already living its obscure life at the roots of my being. That is why he can't escape *me*, no matter how ignorant of *me* he is.'

ভিকতোরিয়ার এই 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' অভিমানের মূলে কী ছিল? কেতকীর আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই মহিলাও তাঁর অভিজ্ঞতায় জানতেন যে 'কৃতী পুরুষেরা মেয়েদের কাছ থেকে প্রধানত প্রত্যাশা করেন প্রেরণাদাত্রীর ভূমিকা, সমানে-সমানে সৌহার্দ্য আর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নয়।' অবশ্য কেতকী একথাও বলেছেন যে অন্যদের প্রতিতুলনায় 'রবীন্দ্রনাথই আজীবন ভিকতোরিয়াকে পৃষ্ঠপোষকত্ব-বর্জিত আন্তরিক সৌহার্দ্য উপহার দিতে পেরেছিলেন।' নারীপুরুষের সহজ বন্ধুত্বের পথে আর-একটা বড়ো বাধাও মাঝে-মাঝে দেখা দেয়। যে-নারীর ব্যক্তিত্বে কোনও পুরুষ আকৃষ্ট হন তিনি যদি প্রেমিকা হতেও আগ্রহী না হন তাহলে অনেক সময়ই পুরুষটি প্রত্যাখ্যাত বোধ করে আহত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ভিকতোরিয়ার সে-জাতীয় অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বারকয়েক ঘটেছিল—একবার কাউনট কাইজারলিঙ-এর সঙ্গেও। তবে 'রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বৈশিষ্টটা এই যে রবীন্দ্রনাথের বিবেচক সংযমের ফলে সম্পর্কটা কোনও পর্যায়েই ঝটিকাক্ষুব্ধ বা বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি।' জেনে আশ্বস্ত বোধ করি।

তবু কেন এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কটা এমন ছাড়া-ছাড়া রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত?

> তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
> হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
> তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
> দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
> হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
> এমন কি মোর আছে দিতে।—

এমনতর আশঙ্কা তো আসতেই পারে বৃদ্ধ কবির। তা ছাড়া আরও যেসব প্রতিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভিতরেই তাও তন্ন-তন্ন করে বিশ্লেষণ করেছেন কেতকী। অন্য দুজনেরও স্বভাবের এবং জীবনের যে কোনও বাধা ছিল না কোথাও তাও তো নয়।

এই ত্রয়ী সম্পর্ক গোড়া থেকেই কেমন জটিল রূপ ধরেছিল তার দিনানুদৈনিক বিবরণ আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অতিথি সেই সময়েই ভিকতোরিয়া Red Oleanders পড়েন। 'রক্তকরবী' রূপক নাটকে যে তিনজন মানুষের বাস্তব সম্পর্কের ছায়া পড়েছে বলে পুরানো জল্পনা শুনেছি তাঁদের শনাক্তকরণ ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তন-বিশ্লেষণ লেখিকা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন বটে। তবে সবটুকু পড়ে আমার অ-সাহিত্যিক কৌতূহল চরিতার্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 'রক্তকরবী' নাটকটিকে আগে যেমন বুঝেছিলাম সেই বোঝা আর-একটু গভীরতর হল কি? কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাতে কোনও নতুন মাত্রা যুক্ত হল কি? হতে পারে অন্য কোনও পাঠকের বেলায় হয়েছে। কিন্তু আমার সাহিত্যিক অনুভব কোনও দিক থেকে যে সমৃদ্ধতর হয়েছে--এমনটা মনে হল না।

এবার আর্জেনটিনার জীবনরঙ্গমঞ্চে Red Oleanders-এর সমান্তরাল একটি ঘটনা ঘটে উঠছিল বলে লেখিকার আলোচনা থেকে জানা গেল। পুরুষ দুজন সেই 'রক্তকরবী'-কাহিনির দুটি পুরুষই কবি এবং তাঁর সচিব ও ভ্রমণসহচর—'রাজা' ও 'রঞ্জন'। তবে নারীটি সম্পূর্ণ অন্য একজন—অর্থাৎ ভিকতোরিয়া ওকাম্পো এবার 'নন্দিনী'। রক্তকরবীর বেলায় জীবনের ছায়া পড়েছিল নাটকে, এবার নাটকের অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা গেল জীবনে—অবশ্য এক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে কোনও কার্য-কারণসম্পর্ক নেই। এই গবেষণাকে অলস কল্পনা বলব না মোটেই, বরং বেশ সযত্ন-বিন্যস্ত কল্পনা এটি। এবং প্রাসঙ্গিক যে ব্যাখ্যান পাওয়া গেল সেটিও উপাদেয়। গোড়া থেকেই সম্পর্কটা যে একটা বেদনাদায়ক আবর্তে পড়ে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং ভুলবোঝাবুঝি বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছিল তা জানা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বুয়েনোস এয়ারিস ছেড়ে চলে আসার আগেই যে তিনজনের সৌহার্দ্য অনেকটা সহজ স্বাভাবিক রূপ পেয়েছিল একথাও ঠিক।

ভিকতোরিয়ার এতখানি প্রাথমিক আগ্রহ এবং সে কারণেই রবীন্দ্রনাথেরও নানা প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা সত্ত্বেও তাঁদের দ্বিতীয় এবং শেষবার দেখা হবার আগে কেন যে প্রায় ছয়-ছয়টি মহামূল্যবান বৎসর বৃথা কেটে গেল তার আসল কারণ ভিকতোরিয়ার জীবনের জটিলতাতেই নিহিত ছিল মনে হয়. এবং এখনও তা সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়নি—কখনও হবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু ১৯৩০ সালে প্যারিসে যে 'ফিরে দেখা' সেও তো এক আশ্চর্য আতসবাজির মতো জ্বলে উঠেই নিভে যাওয়া।

তবে তার পরেও যা পড়ে রইল তা মোটেই 'শুধু ধূলি শুধু ছাই' নয়। সম্পর্কটা ধিকিধিকি করে জ্বলছিল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত। তাছাড়া দুজনের ভাণ্ডারেই কিছু অক্ষয় ধন যে জমা পড়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। সে বিষয়ে অনেকেই যে কৌতূহলবোধ করেছিল সেটাও স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজে থেকেই বলেছিলেন,

আরও একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

কিন্তু তিনি যতটুকু খুঁজে দিতে রাজি ছিলেন ততটুকুতেই আমাদের ক্ষুধা মিটবে, এমন কি কথা আছে? এবং 'জাগায়ে রাখিবে চিরদিন/সকরুণ তাহারি বারতা'—এই স্বীকারোক্তির পরেও সন্ধান চলতেই থাকে। ১৯২৪-পরবর্তী কালে কবির সৃজনকর্মের পিছনে ভিকতোরিয়াই যে প্রধান প্রেরণাদাত্রী, Muse, তা নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু নাকি নিরঙ্কুশ প্রমাণের সন্ধান করছিলেন কেতকী।

প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে দু পক্ষের ভালোবাসাকেই চুল চিরে বিচার করা হয়েছে। আদৌ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ভালোবাসা' বা 'love' শব্দটি ওঁদের পক্ষে প্রযোজ্য কিনা, হলেও বা কতখানি প্রযোজ্য, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। কোন্ পক্ষের ভালোবাসায় কতখানি আধ্যাত্মিক আকুলতা আর কতখানি দেহজ আকর্ষণ ছিল তারও নিক্তিমাপা বিশদ বিচার করেছেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দৈহিক আকর্ষণের সুনিশ্চিত যে প্রমাণ 'আবিষ্কার' করেছিলেন বুয়েনোস এয়ারিসে গিয়ে ভিকতোরিয়ার কাগজপত্র ঘেঁটে, সেটিই সোৎসাহে পেশ করেছেন! সেই ঘটনাটুকুর বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাঁর আত্মজীবনীর ফরাসি খসড়ায়। পেয়ে লেখিকার মনে হয়েছে, 'It was evidently her hope that one day the detail would be retrieved by a researcher and given due value'! বিধিনির্দিষ্ট এই দায়িত্বে নিজেকে দেখতে পেয়ে কেতকী পরম সন্তোষের সঙ্গে জানান যে রবীন্দ্রনাথের ওই মৃদু সন্তর্পণ স্পর্শটুকু ভিকতোরিয়া প্রত্যাখ্যান তো করেনেই নি, বরং 'motherly tenderness'-এর বশে বৃদ্ধের ভুল ভাঙাবার কোনও চেষ্টাও করেননি। 'It was this connivance in the game, no matter how spiritual her own sentiments, that enabled her to become his Muse.'!

এই ব্যাখ্যায় হতবাক বোধ করেছি। ওই অভিজ্ঞতাকে নিজের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে নিয়েই নাকি 'Tagore really did think that he had received a woman's love from Victoria Ocampo'! আরও বিশদ করে বলা হয়েছে যে 'without his perception of the presence of an erotic element in the relationship' রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না। কিংবা বলা যায়, কেতকীই নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না। এবং 'She could become a Muse for him only because he thought it was the real thing'। রবীন্দ্রনাথ কি এতই স্থূলবোধসম্পন্ন ছিলেন যে ভিকতোরিয়ার ওই নিষ্ক্রিয় 'সহযোগিতা'-টুকুর ফলেই এতখানি আশ্বাস পেয়ে গেলেন? ওদিকে তাঁর বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করবার দুদিন পরেই তো আবেগ-উচ্ছ্বসিতা ভিকতোরিয়ার কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—'This can be had only from a woman's love and I have been hoping for a long time that I do deserve it.

'I feel today that the precious gift has come to me from you' কেতকী যাকে 'real thing' মনে করছেন, এই 'precious gift' কি তাহলে সেই 'real thing' নয়? কিন্তু ওই অল্পকালের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

ওই যাকে রবীন্দ্রনাথের 'erotic overture' বলেছেন কেতকী, তার কোনও সুযোগ যদি নাই মিলত, কিংবা ব্যাপারটা ঘটে থাকলেও তার কোনও প্রমাণ ভিকতোরিয়া এভাবে রেখে না যেতেন, অথচ অন্য যা চিঠিপত্র স্মৃতিচারণ তা সবই যেমনকার তেমনি পেতাম আমরা, তাহলে তা থেকেও কি বলা অসঙ্গত হত যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক ঘটেছিল? তাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণের তীব্রতা অনুভব করার জন্য ওই সাক্ষ্যপ্রমাণই কি যথেষ্ট ছিল না? বাইরের ও ভিতরের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই সম্পর্কের পূর্ণ বিকাশ যদি নাই ঘটে থাকে তবু যতটুকু ঘটেছিল তার দূরপ্রসারী ছায়া কোনও পক্ষই এড়াতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ তো নয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোর ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে

তা সত্ত্বেও ভিকতোরিয়াকে তাঁর Muse বলা সঙ্গত হত না? ওই 'erotic element'-এর 'চাক্ষুষ' প্রমাণ কি এতই অপরিহার্য ছিল?

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করে বুঝবার পক্ষে যে ঘটনাটিকে অনুধাবন করা কেতকী প্রায় অপরিহার্য মনে করেছেন এবং এই সোনার চাবি আচমকা হাতে পেয়ে গিয়ে উল্লসিত হয়েছেন, তাঁর বইয়ে সেই ঘটনার বর্ণনা—ভিকতোরিয়ার জবানিতে হলেও—অত্যন্তই মর্মাহত করেছে অনেককে। সেটা বোধহয় লেখিকার কাছেও অপ্রত্যাশিত ঠেকেনি। কেন তাঁরা মর্মাহত হয়েছেন তাও তাঁর অজানা নয়। কোনও মানুষই যে মানুষী দুর্বলতার উর্ধ্বে নন একথা আমরা জানি বটে, তবু যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তাঁর কোনও-কোনও মানুষী দুর্বলতার কথা—বিশেষত তা যদি অন্য কারুর কোনও ক্ষতি করে না থাকে—তাহলে তার প্রকাশ্য আলোচনা করতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি। অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বলি, 'থাক, ও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার—ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।' এই কুণ্ঠা যৌক্তিক না অযৌক্তিক, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তা ছাড়া কোনও সত্যই অরুচিকর নয়, অনাবৃত সত্যকে জানলে কারুর ক্ষতি হয় না বরং জানতে না-চাওয়ার মধ্যে অপরিণত বয়সের দুর্বলচিত্ততা আছে এমন সব কথাও নিয়তই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমেই হোক বা ভক্তিতেই হোক, যে-রোম্যানটিকতা আছে, শুধু যা মনোরম তাই দেখার ঝোঁক আছে—এটাও কি নিতান্তই তাচ্ছিল্য করবার বস্তু? এর কি কোনোই প্রয়োজন নেই জীবনে? সব মোহমুক্তির পর যা অবশিষ্ট থাকে সেই 'সত্যামৃত' কি সব তৃষ্ণা মেটায়?

আরও একটা কথাও মনে হয়। আমার প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় জন সম্বন্ধে কোনও সত্য কথা, যা অপরকে জানাতে তাঁর নিজের প্রবল আপত্তি হত বলে আমি নিশ্চিত জানি, সেকথা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করার নৈতিক অধিকার কি আমার আছে? বিশেষ করে যে ঘটনা না জানলে কারুর কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই? একটি ঘটনা মনে পড়ছে।

আমি এক অশীতিপর অকৃতদার, অসুস্থ মানুষকে মাঝে-মাঝে দেখতে যেতাম। এককালে তিনি বিদগ্ধ সমাজে খুবই আদৃত ব্যক্তি ছিলেন। সকাল এগারোটা নাগাদ তাঁর কাছে গিয়ে মাঝে-মাঝেই তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন পেতাম। একদিন গিয়ে ভেজানো দরজার পাল্লা একটু ঠেলে ঢুকতে গিয়েই ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তাঁর তক্তপোশের বিছানায় মাথা ঠেকিয়ে দীর্ঘকায় মানুষটি শরীর দুমড়ে একটা চটা-ওটা কলাইকরা piss-pot-এর উপর বহুকষ্টে বসেছিলেন। কোষ্ঠকাঠিন্যে এবং অর্শে কষ্ট পেতেন বলে শুনেছিলাম। তাঁকে ওইভাবে সেকেনডের ভগ্নাংশকাল দেখার অভিজ্ঞতা, মানুষের অসহায়তম কোনও অবস্থার ছবি চিরকালের জন্য আমার মনে এঁকে দিয়েছে। আমি সরে এসেই প্রথমে বালক ভৃত্যটির খোঁজ করলাম যার জিম্মায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে রেখে দিয়েছিলেন। বিবেচনাহীন বালক পাল্লা দুটি আড় করে রেখে বেশ খানিকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সময় অবসর পাওয়া গেল ভেবে হয়ত পাড়া বেড়াতে চলে গিয়েছিল।

আজও পরিচিত জনদের কাছে তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গেলে ঘটনাটি উল্লেখ করতে পারি না শুধু এইজন্য যে আমি তাঁকে ওইভাবে দেখে ফেলেছিলাম একথা জানতে পারলে তিনি লজ্জায় মরে যেতেন। আর তাঁর নাম করে এই বর্ণনা কারুর কাছে করেছি জানলে...নাঃ, ভাবা যায় না।

আমরা কখনও কখনও কি আমাদের জিভ এবং কলমকে শুধু এই জন্যই সংযত করি না যে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার যিনি পাত্র তাঁকে যা ব্যথা দিতে পারত কিছুতেই তা বলতে ইচ্ছা করে না। অবশ্য এই ইচ্ছা না করাটাও (বিশেষ করে তিনি যখন বেঁচেই নেই) নিতান্তই অপরিণতবয়স্কের মনঃপ্রতিন্যাস হতে পারে ; নির্মম সত্য সন্ধানের জন্য যে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় তার অভাব বলেও মনে হতে পারে। হোক, তবু আমি নিরুপায়। কোন্‌টা divine quest আর কোন্‌টা unholy curiosity—নিজের মতন করে তার তফাত না করেও পারি না—যদিও জানি প্রাপ্তবয়স্ক সত্যসন্ধানীদের তা আর করতে নেই।

রবীন্দ্রনাথের ভাবরূপ ম্লান হবার আশঙ্কাও কেউ-কেউ প্রকাশ করেছেন শুনেছি। এই আশঙ্কাটাই সবচেয়ে ছেলেমানুষি। অসামান্য গুণবান-রূপবান এবং অসময়ে মৃতদার এই মানুষটি জীবনের ৬৫ বৎসর ধরে যে পরিমাণ অসূয়ার শিকার হয়েছেন, তার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। শুধু তিনি নন, তাঁর শান্তিনিকেতনও বাঙালির বহু অসুস্থ কল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশ সমাজপতি থেকে শুরু করে সজনীকান্ত দাস, রামাশ্যামাযদু—কত জনই তো কালি ছিটিয়েছেন তাঁর গায়ে! সত্তর পার হবার পরেও কোনও এক কাগজ লিখল রবীন্দ্রনাথ venereal disease-এ ভুগছেন! অত ছেনির ঘায়েও যদি তাঁর ভাবমূর্তি বিকৃত না হয়ে থাকে, তাহলে জনৈকা উত্তরসূরীর সামান্য একটু সত্যভাষণে কী এমন সর্বনাশ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের? আর সেই 'সর্বনাশ' ঠেকাবার দায়ও আমার মতো ছোটো মাপের মানুষের উপর বর্তায়নি।

আমার দুর্ভাবনা অন্যত্র। শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কি রবীন্দ্রসাহিত্য নয়, এমনকী তাঁর সবখানি কীর্তির চেয়েও যে রবীন্দ্রনাথ নামে মানুষটা অনেক বড়ো আশ্রয় দিতে পারে এই ছন্নছাড়া যুগকে, তাঁকে খুঁজতে বার হয়ে সে কথাটাই যেন ভুলে না যাই।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২ (১৩৯[illegible]-২৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে

চতুরঙ্গ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আমাকে প্রত্যুত্তর দেবার সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবু অকৃতজ্ঞের মতো বলি যে ডঃ কেতকী কুশারী ডাইসনের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বই দুটির যে-সমালোচনা আমি করেছিলাম সেটি প্রকাশ করার সময় আমার যে-পরিচয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনারা দিয়েছিলেন তাতে আমার উপকার করেননি। 'মননশীল লেখিকা', 'বিবেকের তাড়নায়' লিখি ইত্যাদি বলে আমাকে বড়ো বেশি ভালনারেবল করে দিয়েছেন।

অন্যদিকে আপনি যে সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সাধ্যও আপাতত আমার নেই। চার-পাঁচ মাস ধরে আমার বইপত্র থেকে ১২০০ মাইল দূরে পড়ে আছি। এমনকী ডঃ কুশারী ডাইসনের বই দুটিও হাতের কাছে নেই যে দুর্বল স্মৃতিকে একটু মার্জনা করে নেব বা প্রয়োজনমতো উদ্ধৃতি সংগ্রহ করব। তার ওপর আবার একটি কষ্টকর চিকিৎসাপ্রক্রিয়ার শিকার হয়ে মানসিকভাবে এমন অস্থির হয়ে আছি যে আমার সবটুকু বক্তব্য গুছিয়ে বলতে পারব কিনা সন্দেহ।

ডঃ কুশারী ডাইসনের সুদীর্ঘ উত্তর পড়ে কোনও কোনও বিষয়ে আমার ধারণা স্বচ্ছ হল বলে উপকৃত বোধ করেছি। তবে উনি যে আমার সমালোচনা পড়ে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হবেন এটা আমার অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু এমন বিশদ আত্মপরিচয় দিতে ব্যগ্র হবেন তা ভাবিনি। এই ব্যাপারে তাঁর হৃদয়স্পর্শী সারল্যে একটু যে অস্বস্তি বোধ করছি, একথাও না বলে পারলাম না। ক্ষমা করবেন।

ডঃ কুশারী ডাইসন জানিয়েছেন যে তাঁর বাঙলা বইটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতো বিদগ্ধ বহু ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করেছে। সে-কথাও আমার অজানা নেই। তাই সবিনয়ে বলব যে তাঁরা এই রচনায় যে-মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন তা যে আমার মতো বহু মধ্যম-শিক্ষিত ব্যক্তি দেখতে পায়নি এ আমাদের দুর্ভাগ্য এবং যথেষ্ট পরিশীলিত রুচির অভাবেই সম্ভবত এটা ঘটেছে। সমালোচনা লেখার সময় নিজেকে সাধারণ পাঠিকা বলাতেও লেখিকা দোষ ধরেছেন বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই 'ছদ্মবেশটা অবান্তর।' আমার তো অবান্তর মনে হয় না। বাঙলা ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে হাজার-হাজার মানুষ আছেন যাঁদের বোধবুদ্ধি ও শিক্ষা আমারই সমপর্যায়ের। তাই আমি অসাধারণত্ব দাবি করব কিসের জোরে? অন্যত্র কোথাও কোথাও 'আমার' শব্দের বিকল্পে 'আমাদের' লিখেছি বলেও তিরস্কার করে বলেছেন যে গৌরবে বহুবচন ব্যবহার করবার কোনও অধিকার আমার নেই। কারা আমায় তাদের মুখপাত্র নির্বাচন করেছে? আমি নাকি শুধু আমার কথাই বলতে অধিকারী। তাই আবার নিবেদন করি যে সমালোচনা লেখায় হাত দেবার আগে আমি আমারই মতো ২৫-৩০ জন স্ত্রী-পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করেছিলাম। একজন (যিনি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ছাড়া আর কেউই এই যুগান্তকারী প্রেমের উপাখ্যানটির প্রশংসা করেন নি আমার কাছে। বরং আমার চেয়েও তীব্রতর প্রতিকূল মন্তব্য করেছেন। এ অভিজ্ঞতাটা মনের পিছনে থাক্যতেই বোধহয় বহুবচন ব্যবহার করে ফেলেছিলাম। সেজন্যও কি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে? সবাই তো আর বইয়ের সমালোচনা লিখতে বসতে পারেন না। তাঁদের কেউ কেউ আবার ড. কুশারী ডাইসনের সমসাময়িক ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে—ইংরাজি সাহিত্যও পড়িয়ে থাকেন।

যাই হোক, বইটি যেহেতু লেখিকার স্বদেশে ও সমকালেই পুরস্কৃত হয়েছে তাই তাঁর গুণের যথাযোগ্য সমাদর লাভ করার জন্য ভবভূতির মতো নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর উপর বরাত দেবার প্রয়োজন নেই ডঃ কুশারী ডাইসনের। এবং এই কারণেই যদি তাঁর মনে আস্থা জন্মায় যে তাঁর এই পরীক্ষামূলক রচনা 'কালক্রমে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ' করবে তাহলেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবে সমকালের অনাদরকে যেমন, আদরকেও তেমনি যথেষ্ট মর্যাদা দিতে দায়বদ্ধ যে মহাকাল নয়, সে কথাও নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নেই।

অবশ্য আমি দুঃসাহসী। তাই প্রশ্ন করি যে তাঁর এই রচনাটি যেহেতু অভিনব পরীক্ষামূলক তাই আমার মতো যারা এর গুণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সবাইকেই একবাক্যে 'সেকেলে' বলে বরখাস্ত করে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? তারা 'পুরানো দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে থাকার ফলে নতুনের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে পিছু হটতে বাধ্য' হবেই—এতখানি দৃঢ় নিশ্চিতিরও সঙ্গত ভিত্তি আছে কি? কোথায় যে তাদের আপত্তি সেটা ধৈর্য ধরে বুঝবার চেষ্টা করলে সম্ভবত লেখিকা হিসেবে তাঁর ক্ষতি হবে না।

বিজ্ঞানে যদি বা কখনও-কখনও নূতন তত্ত্ব পুরানোকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয় তবু সমাজের বিবর্তনে, শিল্প সাহিত্য ও মানবিক শাস্ত্রের নানা বিভাগের ক্রমবিকাশে যা প্রাচীন তা হার মানতে বাধ্য হয়ই—এমনটা সব সময় দেখা যায় কি? তা ছাড়া, সম্পূর্ণ 'নতুন' বলে কিছু আছে কিনা, এবং 'পুরানো যা কিছু তা সবই কালের দুর্বার স্রোতে ভেসে' গেলে সংস্কৃতি ও সমাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা পায় কী করে—'ট্র্যাডিশন বনাম মডার্নিজমে'র এইসব বিতর্কে আপাতত আমি প্রবৃত্ত হব না। কিন্তু গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে একথাও বলব যে, এমন কোনও-কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যমান থাকতে পারে বা আছেই যা চিরকালীন এবং সব নতুনকেই, প্রাথমিক ঝড়ের ধুলো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থিতিয়ে যাবার পরে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ড দিয়েই বিচার করারও প্রয়োজন হয়। আর এভাবে বিচার করেই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হয় যে কোন্ 'নতুন' ধোপে টিকে সাহিত্যের মণিকোঠায় ঠাঁই পাবে আর কোন্ 'নতুন' নিক্ষিপ্ত হবে আবর্জনার কুণ্ডে। নতুন মাত্রই শিরোধার্য—এমন বিধান আমি অন্তত মানতে রাজি নই। 'যে-রচনা যত পরীক্ষামূলক সেই রচনা তত বেশি ঝড় তোলে' ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষামূলক হলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অবধারিত কি? উত্তীর্ণ হয়েছে কি হয় নি, সে বিচার করার অধিকারী আমি কিনা এ-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। তবে এই প্রশ্নের উত্তর আমার বিপক্ষে যাবার আগেই আমার দুচার কথা পাঠকের দরবারে পেশ করে ফেলতে চাই।

একটি উপন্যাস এবং একটি সিরিয়স গবেষণাকর্ম পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে দেখে প্রথমে আমার মনে কিছুটা সংশয় এবং সেই সঙ্গে একটা কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমার সমালোচনায় আমি ইতিপূর্বেই লিখেছি যে, 'আমি ভাবছিলাম কোনও মহৎ সৃষ্টি হয়ত বা হয়েও উঠতে পারে এই অভিনব আঙ্গিকে।' 'সৃষ্টি এবং গবেষণা যে দুটি জল-অচল কামরা নয়'—তাঁর এই দাবি আমি অবশ্যই মানব। লেখিকার এই 'উচ্চস্তরের গবেষণা নিছক তথ্য সন্ধানের ব্যাপার নয়' এবং 'তাতে সৃজনশীল কল্পনাশক্তি'-ও যে তিনি ব্যবহার করেছেন এতে আমার কোনোই আপত্তি নেই। তবে অনুসন্ধান ও গবেষণার ব্যাপারে সৃজনশীলতার কোনও সীমাও থাকবে কিনা এ নিয়ে কি কোনও প্রশ্ন তোলা যায় না?

ডঃ কুশারী ডাইসনের তুল্য সব্যসাচী, কিন্তু সম্ভবত অধিকতর প্রতিভাধর, বহু ব্যক্তির সৃজন ও গবেষণার যুগ্ম আঙ্গিক যে সার্থক ফল প্রসব করেছে, সে সংবাদটুকু আমিও জানি। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব জাতীয় নানা মানবিক শাস্ত্রে বিশ্বের যত শ্রেষ্ঠ কাজ হয়ে চলেছে, বেশ কিছুকাল যাবৎ তাতে কল্পনা-প্রবণ এবং সৃজনশীল কিছু জ্ঞানান্বেষী আপাতবিচ্ছিন্ন নীরস তথ্যকেও গেঁথে নিতে পেরেছেন প্রাণবান ও নান্দনিক-গুণ-সম্পন্ন জ্ঞানচর্চায়। বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের কল্পনাসমৃদ্ধ নান্দনিক আবেদন যে কম নয় একথা বোদ্ধারা বলে থাকেন এবং কেউ-কেউ সেই অসামান্য অভিজ্ঞতাকে আমাদের বোধের পর্যায়েও এনে দিতে পেরেছেন।

তবু একটা কথা থাকে। ইমাজিনারি এবং ইমাজিনেটিভ—এই দুটি ইংরেজি শব্দের পার্থক্য বোঝাবার জন্য কাল্পনিক ও কল্পনাপ্রবণ শব্দ দুটি ব্যবহার করা যায় তো? একজন সিরিয়স গবেষক—তদুপরি তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী ইত্যাদি যাই হোন না কেন—নিশ্চয়ই ইমাজিনেটিভ/কল্পনাপ্রবণ হবেন। কিন্তু তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য বা তত্ত্ব ব্যাখ্যান করতে বসে তাতে যদি কিছু ইমাজিনারি/কাল্পনিক কাহিনি গুঁজে দেন এবং সেই কাহিনি সত্যিই যদি প্রাসঙ্গিক মনে না হয় কোনও কোনও পাঠকের তাহলে কি বড়োই অসুবিধা হয় না? নান্দনিক উপভোগও ব্যাহত হয়, জ্ঞানের অনুসন্ধানও দিশেহারা হয়ে যায়।

ডঃ কুশারী ডাইসন লিখেছেন, 'যেসব খবর আমি আমার বইয়ে দিয়েছি সেসব আমার আগে আর কেউ রিসার্চ করে বার করতে পারলেন না কেন? তার কারণ কি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এটা হতে পারে না—যে ওই জাতের অনুসন্ধান করতে যে-ধরনের মন লাগে তা তাঁদের ছিল না? যে-মন অনামিকাকে কল্পনা করতে পেরেছে সেই মনই রিসার্চগুলোও করতে পেরেছে। বইটার মিশ্র আঙ্গিকের সেটাই প্রকৃত ভিত্তি।' ঘটনাবলীর অসাধারণ সম্পাতে এই যে একটি অচিন্তিতপূর্ব গবেষণা সম্ভব হয়েছে এবং বাঙলা সাহিত্যের জগতে একটি অনামিকার সৃষ্টি হয়েছে, সেজন্য ড. কুশারী ডাইসন চিরস্মরণীয়া হবেন—এমন প্রত্যাশা যদি তাঁর থাকে থাকুক, আমি ঈর্ষা করব না। তাঁর এই গ্রন্থের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম মুদ্রণ হতে থাকুক। তবু আমরা অনেকেই গ্রন্থটি একবার পড়বার পর দ্বিতীয় বার পড়তে কেন উৎসাহ বোধ করছি না, সেটা স্পষ্ট করে বলে তিরস্কৃত হবার অধিকারটুকুও যেন না হারাই।

সৃজনী সাহিত্য ও গবেষণার দুটি জাঁরকে একত্র মেখে নিয়ে যে অভিনব মিশ্র আঙ্গিক তিনি ব্যবহার করেছেন সে বিষয়ে আমার তত আপত্তি হত না যদি ওই আঙ্গিকের প্রয়োগে এই বিশেষ রচনাটিকে একটি সার্থক সৃষ্টি বলে মনে হত। হয়নি বলেই তাঁর এই মিশ্র আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও তেমন মূল্য দিতে পারিনি এবং স্বাগত জানাতে পারিনি। না পারার অপরাধে ড. কুশারী ডাইসন আমার মতো মানুষদের জন্য (অথবা শুধু আমারই জন্য?) সাত-আট পৃষ্ঠা জুড়ে 'মিশ্রতা' বিষয়েই আলোক দান করেছেন। জীবনের সর্বত্রই মিশ্রতা যে দোষ নয়, গুণ—এই তাঁর প্রতিপাদ্য। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে সবরকম সাংকর্য বা হাইব্রিডিজমেই আমার ঘোরতর আপত্তি এবং আমি সম্ভবত অবিমিশ্র শুদ্ধতার পূজা করে থাকি। হায় ঈশ্বর! হায় হায়, আমার যে ঈশ্বরও নেই।

প্রসঙ্গত নিজের সম্বন্ধে লেখিকা জানিয়েছেন 'আমি তো সত্যিই প্রাদেশিক বা এক-সাংস্কৃতিক মানুষ নই, আমি তো সত্যিই আন্তর্জাতিক মানুষ—যে জন্য রবীন্দ্র-ভিকতোরিয়া-এলমহার্স্টের আন্তর্জাতিক কাহিনিটা বোঝা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে।'...'কবিতা লিখি বলে কি বিজ্ঞানে আগ্রহ নেই? 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকাটার পাতা উল্টে থাকি, এবং এই পত্রিকায় কখনও-সখনও আমার চিঠি পর্যন্ত বেরিয়েছে। সম্প্রতি অক্সফোর্ডের মহিলা নৃতত্ত্ববিদদের একটি দল আমাকে ধরে বেঁধে তাঁদের সংস্থার সাম্মানিক সদস্য করেছেন।'...ইত্যাদি আরও অনেক কথা। এভাবেই তিনি লিখেছেন, 'হাইব্রিডিজম যে একটি মস্ত শক্তি, এই তত্ত্বটি আমি কত কাল আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে এবং পঞ্চাশের দশকের কলকাতার সাহিত্যিক আবহাওয়ায় আয়ত্ত করেছি।' 'ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এসব কথা অতি পরিচিত, প্রায় 'ক্লিশে'।' ...অন্য কারুর কাছেও যে এগুলি 'ক্লিশে' মনে হতে পারে সে বিষয়ে কী করুণভাবে তিনি অসচেতন!

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ডঃ কুশারী ডাইসন যে আমিও 'রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেই আগ্রহী', তাঁর ভাষায় 'যারা প্রধানত রবীন্দ্রমধুলোভী' তাদেরই একজন আমি। 'আমার সাহিত্যিক বিবর্তনে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই, তিনি মূলত রবীন্দ্র-কৌতূহলী'—লেখিকার এই অনুমানে কোনও ভুল নেই। তাঁর সাহিত্যিক বিবর্তনকে বোঝার কোনও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাগিদ নিয়ে যে আমি বই দুখানি আগাগোড়া পড়ি (এ বিষয়ে লেখিকা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অবশ্য) নি একথা কবুল না করে আমার উপায় নেই। তবু আমার মতো বেদরদি ও দায়িত্বজ্ঞানহীন পাঠকদের সমর্থনে বলি যে আমাদেরও তো সময়ের কিছু দাম আছে। আমার জানা মাত্র দু-একটি ভাষাতেই অদ্যাবধি যত মহৎ সৃষ্টি হয়েছে তার কতটুকু ভগ্নাংশই বা পড়ে ওঠার মতো সময় ও শক্তি আমার ছিল? এখন আমি জীবনের যে-পর্যায়ে পৌঁছেছি তাতে চিরকালীন ক্লাসিক সাহিত্যে মনোনিবেশ করাটাই সময় ও শক্তির সবচেয়ে সার্থক উপযোগ বলে মনে করি। কখনও-সখনও আধুনিক. এমনকি পরীক্ষামূলক রচনাও যে পড়ি না তা নয়। তবে সেই রচনা যদি প্রথম সাক্ষাতেই বিস্বাদ ঠেকে তাহলে সেই লেখকের বিবর্তন অনুধাবন করার অথবা তাঁর পরীক্ষামূলক আঙ্গিকের সার্থকতা বিচার করার আগ্রহও শূন্যে গিয়ে নামে। আমি নিরুপায়।

আবার কখনও উল্টোটাও হয়। কদিন আগেই ইগনাৎসিও সিলোনের একটি উপন্যাস, 'ব্রেড অ্যানড ওয়াইন', পড়ে এত ভালো লাগল যে তাঁর অন্য বইগুলির সন্ধান করছি। অথচ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের অনুষঙ্গে এই নামটির সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আর এতকাল পরে এই প্রথম তাঁর একটি রচনা পড়লাম। এই লেখকের বিবর্তনও প্রায় আর্থার কোয়েসলার কিংবা জর্জ অরওয়েলের মতোই অনুধাবনযোগ্য বলে আমি মনে করি। এবং এঁরা অনেক বেশি আমার আগ্রহের মানুষ। তবু এঁদের অনুধাবন করবার মতো সময়ও কি আর আমার অবশিষ্ট আছে? একথা শুনেও ডঃ কৃশারী ডাইসন আমাকে ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না। তবে কেন তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থ দুটি আমার মাথায় ঢোকে নি তা বুঝতে পেরে হয়ত কিছুটা শান্তি পাবেন।

সে যাক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ডঃ কৃশারী ডাইসন লিখেছেন, 'এও আমি মানি নে যে, একটি আধুনিক প্রেমকাহিনির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়ার গল্পটা কাম্যে হয়ে যেতে পারে।' ওখানেই তো জ্বালা। এবার আমি ছোট্ট করে একটা গল্প না বলে পারছি না। সম্প্রতি একটি বাংলাদেশী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে জাহাজের দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইঞ্জিনীয়র। শ্রীমান কলকাতার এক কৃতী ও সুপরিচিত ডাক্তারের কন্যাকে ভালোবেসে মহাবিপদে পড়েছিল। কারণ কন্যার পিতা এই পাণিপ্রার্থী যুবককে তাঁর জামাতা হবার যোগ্য বলে মোটেই গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তবু তাঁর মন গলাবার আশায় তাঁর পায়ে ধরে অনুনয় করে যুবকটি বলেছিল যেন দুটি তরুণ জীবন তিনি ব্যর্থ করে না দেন। উত্তরে ওই ডাক্তার সাহেব তাকে পরম বিজ্ঞের মতো বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'অল্প বয়সে ঔইরকম প্রেম সবারই বহুবার হয়। আমিও ঢের প্রেম করেছি। মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় আমার এক ক্লাসফ্রেন্ড, এক হিন্দু মিনিস্টরের মেয়ে তো আমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়েছিল। কিন্তু বিয়ে যখন করলুম তখন আব্বাজান যাকে পছন্দ করে দিলেন তাকেই করলুম। অসুখী তো হইনি।' শ্রীমান আমার কাছে স্বীকারোক্তি করেছিল, 'তিনারে আমি কইতে পারি নাই যে আপনে যারে প্রেম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কন আমি তারে প্রেম কই না।' আমারও ওইটুকুই বক্তব্য ছিল।

তবু হয়ত বিশদ করেই বলতে হবে। কারণ, কেন যে রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়ার কাহিনির সমান্তরালে অশনি-অনামিকার ওই কাহিনির পরিবেশনে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি তার কারণ লেখিকাকে যে বোঝাতে পারি নি এটা স্পষ্ট। 'আমাদের দুজনের মধ্যস্থ ইডিওলজিকাল ব্যবধানের' উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'ওই নামী দুজনের' গল্পটা সোনা আর অন্য দুজনের গল্পটা খাদ—আমার বই এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ।' তুমুল প্রতিবাদটা একটু অস্থানে করেছেন। প্রেমিকের মূল্য নির্ণয় করতে বসে আকবর বাদশার, এমনকী শাহজাহান বাদশার সঙ্গেও, হরিপদ কেরানির ভেদ কল্পনা করব, প্রেমের ধারণায় এতটা স্থূল আমাকে নাই বা মনে করলেন।

তাঁর অন্য অনুমান যে, 'প্রেম-জীবনের অসামাজিকতাই যদি বিচারের নিকষ হয়, আমার চোখে, তাহলে আমি যেন একবার ভেবে দেখি কে বেশি 'খারাপ মেয়ে' (!) —ভিকতোরিয়া না অনামিকা।' যেহেতু বাস্তবের ভিকতোরিয়া স্বামীর জীবৎকালেই কত অখ্যাত-বিখ্যাত জনের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করেছেন। তাঁর 'প্রেমজীবন সামাজিক নিয়মের ধার ধারেনি।' অন্যপক্ষে কাল্পনিক 'অনামিকা বিধবা, তার প্রেম অন্বেষণ অবৈধ নয়, সে একটি রাত একজনের সঙ্গে কাটিয়েছে' মাত্র। আবারও কপালে করাঘাত করতে ইচ্ছা করছে। তা না করে বরং স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করি যে, প্রেমজীবনের সামাজিকতা-অসামাজিকতা আমার কাছে কোনও প্রশ্নই নয়—বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে অসামাজিকতার অর্থ সমাজের কোনও অনুশাসন ভঙ্গ করা। কিন্তু অসামাজিকতার অর্থ যদি হয় অন্য মানুষের সুখ-দুঃখ ভালোমন্দ বিষয়ে নিষ্ঠুর অবহেলা, তা হলে আমি দ্বিতীয় বার ভেবে দেখে আমার মতামত ব্যক্ত করব।

প্রেমের মহত্ত্ব কিংবা অকিঞ্চিৎকরতার নিকষ আমার কাছে, তার গভীরতা, তার সূক্ষ্মতা, তার প্রসাদগুণ। কোনও প্রেম মানুষকে বড় করে আর কোনও প্রেম যে মানুষের ক্ষুদ্রতাগুলিকেই চারিয়ে দেয়, এ তো কতজনের বেলাতেই দেখলাম কতবার। সব 'প্রেম' তুল্যমূল্য—এ আমার মনে হয় না। যে অনামিকা এতই অগভীর, নির্বোধ ও স্থূল যে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'বিদীর্ণ বিস্তীর্ণ বিরহের cult' অশনি (যার এককালে প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন শয্যাসঙ্গিনী লাগত) অন্তঃস্থ করে নিতে পারে কিনা এমন প্রশ্ন নিজেকেও করতে পারে কিংবা 'কবিগুরুর মতন বিরহবেদনা মন্থন করে কবিতা লিখতে' চাওয়া অশনির পক্ষে সম্ভবপর কিনা সেটুকুও বুঝতে পারে না, সেই নায়িকার প্রেম যতই কেন অভিনব হোক না, আমার মনে তা শ্রদ্ধা জাগায় না। আর অশনির কথা নাই বললাম। অবশ্য তার রচয়িত্রী তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথসদৃশ সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। আমার 'খাটো দৃষ্টি' (ডঃ কুশারী ডাইসন শব্দ দুটিকে ভালো করে দাগিয়ে দেবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করেছেন—তাতে যদি আমার চোখ খোলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা।) আমাকে বঞ্চিত করেছে। ওই মহৎ সম্ভাবনার আভাসমাত্র দেখতে দেয়নি।

যাক, অনামিকার প্রতিতুলনায় 'বেশি অসামাজিক' গোপন প্রেমে লিপ্ত ভিকতোরিয়া

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যখন ত্রিশউত্তীর্ণা হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হন (তার প্রচুর প্রমাণ ডঃ কুশারী ডাইসন তাঁর ইংরিজি বইটিতে দিয়েছেন) এবং পরিণত বয়সেও সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে লিখতে পারেন, 'মাঝে-মাঝে ইচ্ছা করত তাঁর ঘরের দরজার সামনে পোষা কুকুরটির মতো পড়ে থাকি—কিন্তু তা তো আর সত্যিই করা যায় না'—তখন 'প্রেম' শব্দটি অন্য এক উজ্জ্বল মাত্রা পায় আমার চোখে। কোন্ প্রেম 'সাচ্চা' আর কোন্টা 'ঝুটা' তার তাৎক্ষণিক বিচার হয়ত প্রেমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষেও সম্ভব নয়? এবং যুগান্তরের ব্যবধানে!

অশনি-অনামিকা প্রেমকাহিনির সেই অংশটি আবার স্মরণ করাই : অশনির হোটেলে রাত্রিযাপন করার পর অনামিকাকে নিজের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য অশনির অশোভন ত্বরা অনামিকাকে ক্ষুব্ধ করেছিল বলে সে বেশ তীব্রভাষায় অনুযোগ জানিয়েছিল। যাই হোক, অশনি দায়নামানো ভাবে তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার পরে নিজের হোটেলে, কফি সামনে নিয়ে বসে প্রাতরাশের অপেক্ষা করছিল অনামিকা। রাত্রিশেষে বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে আর-একবার রতিক্রিয়ার ফলে তখনও তার অধোবাসে অস্বস্তিকর সিক্ততা অনুভব করছিল। তখন জানালার বাইরে বরফ পড়ছিল। অনামিকা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে আবৃত্তি করছিল

I think
love is like that ; merciful as snow
bandaging the bruised earth,
while making the green grow.

লেখিকার মতে এই 'bruised earth' শব্দ দুটিতে 'পৃথিবীর বিক্ষত অবস্থার কথাই বলা হচ্ছে, আর যে মানবিক ক্ষতিবোধের ইঙ্গিত অভিপ্রেত তা নায়িকার অকালবৈধব্যের।' কিন্তু নায়িকার অকালবৈধব্যের ক্ষত তখন এতটাই মিলিয়ে গিয়েছে যে অপর একটি পুরুষের সঙ্গলাভ বিষয়ে কোনও মানসিক প্রতিরোধ তো সে বোধ করেই নি, বরং আকর্ষণই অনুভব করেছিল। এই সঙ্গসুখ লাভের পরে ঘুম থেকে উঠে আবার এই পুরুষটির সঙ্গেই তীব্র মান-অভিমানের কথাও কিছুটা হয়েছিল। তাই লেখিকার অভিপ্রায় যাই থাকুক, সেই মুহূর্তে 'bruised earth'-এর সঙ্গে অনামিকার অতি সাম্প্রতিক হৃদয়বেদনার কোনও সম্পর্ক অনুমান করা পাঠকের পক্ষে খুব কি অনুচিত হবে? তবু এ নিয়ে আমি তর্ক করব না, লেখিকার মতই মেনে নিলাম। কিন্তু এখানে 'love' শব্দটির ব্যবহারে আমি যে আপত্তিটুকু জানিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করছি না।

আমি আমার সমালোচনায় লিখেছিল্যম 'এখানে আর একবার সেই too often profaned শব্দটির ব্যবহারে আমার সেকেলে মন হায় হায় করে উঠল।' নিজেকে এই প্রসঙ্গে 'সেকেলে' বলে কবুল করেছিলাম শুধু প্রেমের চরিত্র বিষয়ে আমার একটু পুরানোপন্থী ধারণা ব্যক্ত করার জন্য। কিন্তু দেখে পুলকিত হলাম যে এর ফলেই ডঃ কুশারী ডাইসন আমাকে এতদূর সেকেলে ধরে নিয়েছেন যে সম্ভবত আমি জাতপাত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মানি, অন্ত্যজের হাতে জল খাই না, গোমাংস খাই না ইত্যাদ ইত্যাদি। অগত্যা এইসব ব্যাপারে তাঁর নিজের উদারতা ঘোষণা করাটা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে তাঁর।

আমার প্রত্যুত্তরের দৈর্ঘ্য বেড়ে চলেছে। কিন্তু সত্যিই এই আলোচনায় কোনও লাভ আছে কিনা এ প্রশ্ন বারে-বারেই মনে হচ্ছে। কারণ এজাতীয় বিতর্কে প্রায়ই প্রতিপক্ষের হীনতা প্রমাণ করতেই বড়ো ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। ডঃ কুশারী ডাইসনও আমাকে অব্যাহতি দেননি। তাঁর ইংরিজি বইটির প্রসঙ্গে লিখেছেন, '৪৭৭ পৃষ্ঠার এই একাডেমিক বইটাতে আমার অনেক পরিশ্রমের ফসলকে তার ন্যায্য পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে পশ্চিমবঙ্গের কিছু সীমাবদ্ধ দৃষ্টির পাঠক আদেখলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন একটি মাত্র পৃষ্ঠার উপরে, লুব্ধ শিশু যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে মণ্ডামিঠায়ের উপরে। আমি স্তম্ভিত যে মাননীয়া গৌরী আইয়ুবও এই কাজটি করেছেন। বস্তুত কেবল একটি ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানাতেই তাঁর সুরুচিবোধের তাড়নায় (বা যাঁরা তাঁর সুরুচিধোধের শরিক তাঁদের প্ররোচনায়) কলম ধরেছেন, নয়ত বৃহদায়তন বইটাতে আলোচিত আর কোনও ব্যাপারে তাঁর তেমন কোনও মতামত নেই।'

অভিযোগটা যথার্থ নয় একথা বলতেও লজ্জা বোধ করছি। তাঁর এই গ্রন্থখানির যে অংশগুলি আমার উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছিল, সে বিষয়ে ৪½ পৃষ্ঠায় লেখার পর আমার আপত্তি আড়াই পৃষ্ঠায় লিখেছিলাম। আমার সমালোচনা-প্রবন্ধটি চতুরঙ্গ পত্রিকার দুই সংখ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত হলেও মুখবন্ধের মন্তব্যগুলি যে বাঙলা বইটির জন্য তত নয়, এবং ইংরিজি বইটির জন্যই প্রধানত, একথাটা প্রথমেই আমার স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ, ভিকতোরিয়া ও এলমহার্স্টের চিঠিপত্রগুলি খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করে তাঁদের পারস্পরিক প্রীতি, উচ্ছ্বাস অভিমান অভিযোগ, প্রায় কিশোরদের মতন ভুল বোঝাবুঝি, মানভঞ্জন অবশেষে স্থায়ী সৌহার্দ্য... এই সবকিছুর সরস বর্ণনা দিয়ে দু মাসে গড়ে ওঠা ত্রয়ী বন্ধুত্বের কাহিনিটা এমন সুন্দর করে বলতে পেরেছেন বলেই তাঁকে একাধারে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক এবং কৃতী সাহিত্যিক বলেছিলাম। কোনও কোনও ঘটনার বর্ণনা ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যায় তিনি সুরুচি, অন্তর্দৃষ্টি এবং শিল্পনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন সত্যিই। কিন্তু ওই মর্মে তাঁকে যে প্রশংসা করেছিলাম সেই প্রশংসাকে তিনি অকপট মনে করতে পারেন নি যেহেতু তাঁর বাঙলা বইয়ের প্রেমকাহিনিটিকে আমি একেবারেই প্রশংসা করতে পারিনি।

এই বিদুষী বহুভাষাবিদ মহিলা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক যা কিছু বলেছিলাম তার প্রায় সবটাই তাঁর ইংরিজি বইটি পাঠের প্রতিক্রিয়া—একথাও যে তাঁর ভালো লাগবে না তা আমি বুঝতে পারছি। বাঙলা উপন্যাসটি তো তাঁর এমন সৃজনকর্ম যাতে তাঁর নিজের সত্তাকেও কিছুটা প্রক্ষেপ করেছেন। অথচ তাঁকে আমি সংবেদী বলেছিলাম এইজন্য যে ভিকতোরিয়ার সংক্ষিপ্ত কিন্তু জোরদার চিঠিগুলি এবং কিছুটা জটিল আচরণের সবটুকু প্রেক্ষিত এবং বহুতল অর্থ স্পষ্ট করে তুলে ধরবার ব্যাপারে তিনি যথার্থই অসাধারণ সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু ইংরিজি বই থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতিসহ তখন যে লিখিনি তার কারণ বাঙলা প্রবন্ধ ইংরিজি-উদ্ধৃতিভারাক্রান্ত হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রেস ও পাঠকের বিরক্তি সৃষ্টি করে প্রায়ই। কিন্তু আমার আসল দোষ হয়েছিল এই কথা লেখায় যে ইংরিজি বইখানি পড়েও আমার অসাহিত্যিক কৌতূহল যতখানি চরিতার্থ হয়েছে আমার রবীন্দ্রসাহিত্যিক অনুভব সে পরিমাণে গভীরতর বা সমৃদ্ধতর হয়নি। সত্যিই এটা আমার দুর্ভাগ্য যে In Your Blossoming Flower Garden পড়বার পরেও 'পূরবী' কাব্যের উপলব্ধিতে কোনও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি। এটা নিশ্চয়ই আমার সংবেদনহীনতার প্রমাণ।

ওই বিতর্কিত পৃষ্ঠাটি সম্বন্ধে আমার আপত্তি একটু বেশি জোর দিয়ে বলেছিলাম বলেই লেখিকার বলতে বাধে নি যে আমিও সব বাদ দিয়ে আদেখলে লুব্ধ শিশুর মতো ওই পৃষ্ঠাটির উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তবু আমার আপত্তির কথাটাই আরও একবার বলব। লেখিকা এবার তাঁর উত্তরের গোড়ার দিকে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'কোনও কৃতী ব্যক্তির জীবদ্দশায় পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা সম্ভব নয়, কেননা জীবিত ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা অবশ্যই রক্ষা করতে হয়।' কেন? এবং মৃত ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তাই বা রক্ষা করতে হবে না কেন? এখানেই আমার একটি মৌল প্রশ্ন, শুধু ডঃ কুশারী ডাইসনকেই নয়, সেইসব গবেষকদের কাছেই যাঁরা পরিচিত মানুষদের জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করে থাকেন—সেইসব মানুষ কৃতী-অকৃতী যাই হোন না কেন? মৃত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করার দায় বা প্রয়োজন কিছুই কি নেই উত্তরসূরীদের? মৃত ব্যক্তির দেহটিকেও তো উলঙ্গ করে পথের ধারে ফেলে রাখাকে আমরা অমানবিকতা বলে মনে করি। তার জীবনটা কি তার সত্তার প্রিয়তর অংশ নয়? সেই জীবনটাকে কি হাটের মাঝখানে টেনে এনে নির্বিচারে কাঁটাছেঁড়া করার নৈতিক অধিকার আমাদের আছে? বিশেষ করে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় সত্যিই সেই মানুষের জীবন ও কর্মকে বুঝে ওঠার পক্ষে এমন কিছু অপরিহার্য নয়? অথচ যে গোপনীয়তাকে রক্ষা করার জন্য জীবদ্দশায় সেই মানুষটি হয়ত তার সর্বস্বই দিতে পারত? মৃত্যুর পর যখন সে আত্মরক্ষা করতে সবচেয়ে অক্ষম—অতএব আমাদের সহৃদয় আশ্রয় যখন তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—তখনই কি তার জীবনের উপর শকুনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে?

কৃতী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল অসীম এবং সেই কৌতূহলের সবটুকু চরিতার্থ করে যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে মূল্যবান কিছু সংযোজন হয়—সব সময় তাও নয়। 'উচ্চস্তরের গবেষণা'র নামে এজাতীয় মরণোত্তর উৎপাত আজকাল জলভাত হয়ে গিয়েছে। কে-ই বা এর থেকে অব্যাহতি পেতে পারে?

আমার এই আপত্তিকে এই গবেষকরা ব্রাহ্ম শুচিবায়ু, পিউরিটান শালীনতাবোধ, মরাল গার্জেনি ইত্যাদি অনেক কিছুই বলেছেন এবং বলবেন। আরও গালি মাথা পেতে নিয়েও বলব যে তাঁরা যতই বড়ো জ্ঞানান্বেষী হোন, কারুর ব্যক্তিগত জীবনকে অনাবৃত করার আগে একবার কি হৃদয় দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করবেন না যে সেই মানুষটি বেঁচে থাকতে এ-জাতীয় পরিণতির কথা কল্পনা করলেও কতখানি আতঙ্কিত হতেন? কারবারটা যেহেতু অ্যামিবাকে নিয়ে নয়, সুখে-দুঃখে আত্মসম্মানবোধে গর্বে লজ্জায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক্ষতবিক্ষত হৃদয়সম্পন্ন মানুষকে নিয়ে, তাই নির্মম অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে সামান্য একটু সহানুভূতিও কি যুক্ত হওয়া উচিত নয়? An Allegory of Venus and Cupid দেখার অভিজ্ঞতা আর ভিকতোরিয়ার অপ্রকাশিত ডায়েরি পড়ার অভিজ্ঞতার জাত একই, এমনতর কথা যদি কেউ বলেন তাহলে আমি বলব হয় এই উক্তিতে ইনটেলেকচুয়াল ডিজঅনেস্টি আছে নয় জীবন ও শিল্পের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকে সেটি উপলব্ধি করবার ব্যাপারে মানসিক অসাড়তা আছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যদি এই কাহিনি লিখে যেতেন—যেমন 'নষ্টনীড়' লিখেছিলেন—তাহলেই একে আমরা নান্দনিক অভিজ্ঞতায় পেতাম এবং পাবার অধিকারী হতাম। গান্ধির My Experiment with Truth আত্মজীবনী বলেই মহৎ সৃষ্টি। স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসুর My Days with Gandhi সুলিখিত ও সত্যবাদী হলেও তার 'বৈজ্ঞানিক হৃদয়হীনতা' আমাকে একটু আহত করে। আমার শ্রদ্ধেয় এই লেখক যদি নিজের জীবন নিয়ে এরকম নির্মোহ সত্যভাষণ করতে পারতেন তাহলেই আমি তাঁকে যথার্থ সৎসাহসী লেখক বলতাম। নিজেকে যথেচ্ছ অনাবৃত করার অধিকার আমাদের সবারই আছে। অপরকে করার অধিকার নেই, বিশেষত মৃত্যুর পরে। আইনের বাধা না থাক, হৃদয়ের বাধা থাকা উচিত। কোনও ব্যক্তির (তিনি যদি সর্বজনপরিচিত হন, তবে তো আরও বেশি করেই) স্পষ্ট অনুমতি না নিয়ে তার জীবনে উঁকি দিয়ে দেখা জীবদ্দশায় ঘটলে অভব্যতা, মরণের পরে তেমন আচরণ, তদুপরি হৃদয়হীনতা। ভিকতোরিয়া-রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন, আর সবার বেলাতেও তেমনি, 'যা ব্যক্তিগত তাই পবিত্র।' না কি মৃত্যুর পরে ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকতেই নেই, সবই এজমালি সম্পত্তি হয়ে যায়?

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভিকতোরিয়ার সম্পর্কটা কোন্ পক্ষ থেকে ঠিক কীরকম ছিল, রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে 'শুধুই আধ্যাত্মিক ছিল না অন্য কিছুরও মিশাল ছিল'—অর্থাৎ একটা 'সামগ্রিক আকর্ষণ' ছিল কিনা, তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরেও সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি না। তাঁদের সম্বন্ধে যত অনুমান, যত কিংবদন্তী আগেও যেমন দু-দেশের হাওয়ায় উড়ত, এখনও তেমনি উড়তে থাকবে। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক জটিল-চরিত্র মানুষের পারস্পরিক মনোভাব ও ব্যক্তিগত প্রকাশ্য অথবা ঘনিষ্ঠ আচরণ তাঁরা নিজেরাই বা কতটুকু বুঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং পরস্পরকে যথাযথ বুঝিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? দুদিক থেকেই যতটুকু উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে এবং যা অনুচ্চারিত রয়ে গিয়েছে তা অনুমান করে আমরা কি সব চরিত্রলক্ষণ মিলিয়ে শনাক্ত করে ফেলতে পারি যে সম্পর্কটা 'ঠিক এই জাতীয়' এবং 'ওই-জাতীয় নয়'? মানবিক সম্পর্কগুলির কি একই রকমের চেহারা থাকে সর্বত্র, সর্ব অবস্থায়? এখানে যা অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছিল তার স্পষ্টীকরণের চেষ্টাটাই আমার মূঢ়তা বলে মনে হয়।

তার উপর এখন তো দেখছি এটা প্রায় একটা জাতীয় মানসম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মারিয়া রেনা কুরা এবং আরও বহু আর্জেনটিনীয়রা বলবেন, 'প্রেম থাকলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছিল রবীন্দ্রনাথেরই, ওকাম্পোর নয়', আর আমরা বাঙালিরা বলব, 'বিদেশিনী বিজয়াই রবি-অনুরাগিণী ছিলেন, আমাদের ঋষিপ্রতিম কবির অনুরাগটা ছিল নিতান্তই কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক।' মনে হচ্ছে যেন যে পক্ষ ভালোবেসেছিল বলে প্রমাণ হয়ে যাবে সে পক্ষই একটা গোল খাবে। অর্থাৎ প্রায় নৈতিক পরাজয়। এই নিয়ে 'মূল্যবান' গবেষণা চলতে থাকুক। 'রাজা অশোকের কটা ছিল নাতী এবং বিন্দুসারের কটা ছিল হাতি' তার থেকে যে অনেক-অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হতে থাকবে সে কথা রজনীকান্ত সেনও অস্বীকার করতে পারতেন না। আমি তো কোন্ ছার!

ডঃ কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে আমার মৌলিক ও ইডিওলজিকাল দূরত্ব যখন প্রমাণিত হয়েই গিয়েছে তখন তাঁর সুদীর্ঘ উত্তরে ছোটো বড়ো আরও বহু বিতর্কের বিষয় যে রয়েই গেল সেটা বলাই বাহুল্য। তবু এক জায়গায় ক্ষান্তি দিতে হয়। তবে তার আগে আর একটিমাত্র প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তিনি জানতে চেয়েছেন যে আমার কাছে 'প্রেমের শারীরিক প্রকাশ এবং টয়লেটে যাওয়া তা হলে সমগোত্রীয়?' এরও উত্তর দিতে হয়! না দিয়ে উপায় নেই বলে অগত্যা সংক্ষেপে বলি   কোনও-কোনও পরিস্থিতি আছে যে পরিস্থিতিতে অন্য কেউ আমাদের দেখুক এটা আমরা চাই না—যদি না অবশ্য আমরা প্রদর্শকামী বা Exhibitionist হই। প্রিয়জনের, শ্রদ্ধেয়জনের এই না-চাওয়াটা অনুভব করতে পারা এবং তাকে মান্য করা কি তাঁদের উপর নৈতিক সর্দারি করা? কিন্তু কোন্‌টা যে শ্রদ্ধা আর কোন্‌টা অশ্রদ্ধা, কোনটা সৌজন্য আর কোন্‌টা অসৌজন্য এই ব্যাপারেই যখন আমাদের যোজন-প্রমাণ মতভেদ তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ কী? কেহ কারও ভাষা বোঝে না।

আমার শিয়রে সংক্রান্তি। আগামীকাল আবার কয়েক ঘণ্টা ধরে শল্য-চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, এবার তার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তার পরেও যদি বেঁচেবর্তে থাকি তবু এই বিষয়টা নিয়ে আর ডঃ কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে নিষ্ফলা তর্ক করব না, সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করে ফেলেছি।

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫২ (১৩৯৮), সং ৯ পৃঃ ৭৩৪-৪৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মত

অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'ছোটো খোকার সহজপাঠ' প্রবন্ধটির কয়েকটি বক্তব্য বিষয়ে আমার কিছু নিবেদন করবার আছে।

সহজ পাঠ প্রথম ভাগের প্রথম ছড়াটিতে 'অ আ'-র সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্য যে ছোটো খোকার উল্লেখ আছে "শেখে নি সে কথা কওয়া"। তাই বলে কি সহজপাঠ প্রথম ভাগ, বাক্‌স্ফূর্তি পর্যন্ত হয় নি যে শিশুদের তাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অথবা স্কুলে তাদেরই পাঠ্য বলে নির্বাচন করেছিলেন সরকার? অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন "যে ছোটো খোকা কথা কওয়া পর্যন্ত শেখেনি তার পক্ষে 'সহজপাঠ' কতখানি সহজপাঠ সে বিষয়ে নতুন করে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ আছে বলে মনে করি।" আমার তো মনে হয় মোটেই তার অবকাশ নেই। কথা বলতে শেখার আগেই সহজপাঠ পড়াবার পণ্ডশ্রম কেউ করতে চেয়েছেন বলে তো ইতিপূর্বে শুনিনি। বই পড়ে কে কবে মাতৃভাষা বলতে শেখে?

সহজপাঠ প্রথম ভাগ তিনিও লিখেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য। প্রথম শ্রেণীতে চার পাঁচ বছরের আগে কেউ ভর্তি হয় না এবং চার পাঁচ বছর বয়সে জড়বুদ্ধি (mentally retarded) শিশু ছাড়া আর সবাই কথা কইতে পারে। যাদের মাতৃভাষা বাংলা সেই সব শিশুরা অবলীলায় কঠিন দীর্ঘ বাক্যবন্ধ রচনা করে মা বাবাকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত করে থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তিন বৎসরের কন্যা তার মাকে বলেছিল "আমি তোমাকে ভালোবাসি, তবু আমি তোমার কথা শুনব না।" মা বোধ হয় স্নান খাওয়া জাতীয় কোনো কাজে তাগাদা দিয়ে বলেছিল, "তুমি যদি আমার কথা না শোনো তবে বুঝবো তুমি আমাকে ভালোবাস না।" ওই বয়সেই আর একদিন তার মায়ের বান্ধবীকে তাদের স্নানঘরে স্নান করতে দেখে বলেছিল, "আমরা কিন্তু নিজেদের বাড়িতেই স্নান করি।" আর একটি বালক চার বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে মাকে দস্তানা পরতে দেখে বলেছিল, "এবার বোধ হয় তুমি টুপিও পরবে।" এ জাতীয় বাক্যরচনায় যারা সক্ষম হয়েছিল তারা তখনও সহজপাঠ পড়তে শুরু করেনি। বাক্য গঠনে এতখানি দক্ষতা আয়ত্ত করার পরেও তারা সহজপাঠ পড়ে রবীন্দ্রনাথের কুদৃষ্টান্তে ("বোঝা নিয়ে হাটে চলে" কিংবা "ধান নিয়ে যায় বাড়ি") বাক্যে ক্রিয়াপদের স্থান গুলিয়ে ফেলে "বাবা ডাকছে মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাকে" ("বাবা তোমাকে মা ডাকছে"-র পরিবর্তে) বলতে পারে এমন আশঙ্কা করার সঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। অন্তত ঘরে বাইরে (একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের) সহজপাঠ পড়াবার যতটুকু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে বাক্য বিন্যাসের এরকম ত্রুটি চোখে পড়েনি।

সহজপাঠ প্রথম ভাগের নামপত্রের পিছন পাতায় স্পষ্টাক্ষরে যখন ছাপা আছেই যে "এই বই বর্ণপরিচয়ের পর পঠনীয়" তখন এই দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনার সত্যিই কি অবকাশ ছিল? প্রবন্ধের নতুন আর কিছু প্রতিপাদ্য আছে কি?

তবু ভয়ে ভয়ে বলি যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' বা অন্য কারুর বইয়ের সাহায্য না নিয়েই কেবল মাত্র সহজপাঠের ভিতর দিয়েই আমি কয়েকটি বালক বালিকাকে বাংলা পড়াতে পেরেছি। কোনো সচেতন নীতি অনুসরণ করে যে আমি বর্ণপরিচয় বর্জন করেছিলাম এমন নয়। হাতের কাছে সহজপাঠ ছিল এবং তাকেই যথেষ্ট মনে হলো। সহজ পাঠের বর্ণমালায় ড় ঢ য় ৎ ং ঃ ঁ নেই ঠিকই, যদিও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে পরে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে বর্ণগুলি সহজ পাঠে আছে সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছড়া রয়েছে। প্রথম থেকেই এই ছড়াগুলি কেউ পড়তে শেখে না, শুনে মুখস্থ করে, ঠিক যেমন 'অ-য় অজগর' 'ক-য় কুকুর' ছেলেরা শুনে শুনে শিখে ফেলে, পড়তে শেখে কয়েক মাস পরে। তাই অধ্যাপক ভট্টাচার্য যখন লেখেন "হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ/বসে খায় ক্ষীর খই।—এ কবিতা শিশুর কানের পক্ষে সহজ কিন্তু শিশুর চোখের পক্ষে খুবই কঠিন" তখন বুঝতে পারি এ ব্যাপারেও অধ্যাপক ভট্টাচার্য অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন। নইলে প্রবন্ধের এতখানি জুড়ে ছড়াগুলি পড়তে শিশুদের কত কষ্ট হবে সে প্রসঙ্গ কেন? এ ছড়াটি তো কানে শুনেই কণ্ঠস্থ করবার, চোখে শুধু হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ ঈ র চেহারা দুটি চিনে নেবার কথা।

যাই হোক, শুধু সহজ পাঠের সাহায্যেও বাংলা পড়তে লিখতে শেখা যায় এ দাবি অনেকেই করেননি, তবু আমি করছি। যে বর্ণগুলি সহজ পাঠের বর্ণমালায় আছে এবং যেগুলি নেই সবগুলিই একবার বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ছেলেদের খাতায় লিখে দিতে হয়েছে যাতে পরে অভিধান দেখতে গিয়ে অসুবিধা না হয় অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় পড়ে যাঁরা মানুষ হয়েছেন তাঁদেরও কাউকে ত বর্গ আগে না ট বর্গ আগে তা গুলিয়ে ফেলতে দেখেছি। বর্ণমালার বর্ণের ক্রমটা প্রথম দিকে না হলেও পরে এক সময় বুঝিয়ে দিতে হয়ই। তবে সহজ পাঠ প্রথম ভাগ দিয়েই যারা শুরু করে তাদের একটা 'শব্দ রচনা'-র (word-making) খেলা প্রথম দিকে খেলতে পারলে উপকার হয়। লাইন টানা খাতার বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় স্বরবর্ণগুলি এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি বড় বড় হরফে লিখে দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় কিভাবে যে কোনো দুটি বর্ণ নিয়ে একটি অর্থবহ শব্দ তৈরি করে ফেলা যায় (এই অনুশীলনী বা exercise-এর অভাব আছে সহজ পাঠে)—যেমন কিনা 'এই যে ক, আর এই যে ই—এ দুটি পাশাপাশি লিখলে হবে 'কই'। অবশ্য 'আজ, আম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আখ' ইত্যাদি দিয়ে শুরু করা ভালো। অ দিয়ে বাংলা ভাষায় দু-অক্ষরের শব্দ তো এক 'অত' ছাড়া আর কিছু নেই শিশুর পাতে দেবার মতন। 'অজ' 'অর' 'অব' সবই তো তার অপরিচিত। আমাদেরও।

হাইফেনের সপক্ষেও বলার আছে। 'মৌ-চাক, মৌ-মাছি, আমলকী-বন, পাহাড়-চূড়া, আর-পারে' ইত্যাদিতে যে দুটি করে শব্দ আছে এবং শব্দগুলি এভাবে জুড়েও ব্যবহার করা যায়, আবার একা-একাও করা যায়—এই কথাটি একবার বলে দিলেই বুঝতে পারবে না এমন শিশু কোথায়?

বর্ণপরিচয়কে অধ্যাপক ভট্টাচার্য অচল বলেছেন তার সাধু ভাষার জন্য। সাধু ভাষা আজ অচল এই অর্থে যে ক্রমেই গদ্য লেখার ভাষা হিশেবে এর ব্যবহার কমে যাচ্ছে। কিন্তু কবিতায় এ ভাষা তো আধুনিকতম কবিরাও সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেননি? আর বাংলা ভাষার যে বৃহৎ অমূল্য ভাণ্ডার রয়েছে এই ভাষায় তার কি সংস্কার করা হবে এবার? কিন্তু সাধু ভাষা আর চলিত ভাষার দূরত্ব কি সত্যিই অসেতুবন্ধ্য? সাধু আর চলিত ক্রিয়াপদের তফাতটুকু শিখতে আমাদের ক'দিন লেগেছিল ছেলেবেলায় এবং কার না মজা লাগত 'মুখের' ভাষা থেকে বইয়ের ভাষায় রূপান্তর করতে? করলাম—করিলাম, খেলাম—খাইলাম, যাব—যাইব, গেলাম—যাইলাম। কেউ কি এই অর্থে গাইলাম লিখেছিলাম? আর গাইলাম থেকে যে গাহিলাম হবে এও কত সহজে আপনা থেকেই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি বিদেশীরাও খুব দ্রুত এটা বুঝে যান দেখে অবাক হয়েছি। সম্প্রতি রাম রাম বসু, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্রমথ চৌধুরির ভাষার নমুনা পাশাপাশি পড়ে এক জাপানী যুবক আমায় বললেন, "এ তফাত তো অতি সামান্য আমাদের প্রাচীন জাপানী ভাষা আর আধুনিক জাপানীর মধ্যে এর চেয়ে অনেক বেশি পার্থক্য আছে।" যাই হোক মুখে বলতে গিয়ে গুরুচণ্ডালী দোষটা সাধারণত বিদেশীরাই করেন, তবে লেখায় গুরুচণ্ডালী আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরও ঘটে। কিন্তু সাধু ভাষা পড়ে বুঝতে অসুবিধা কারুরই হয় না, হবার কারণ নেই। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ মাঝে মাঝে গুলিয়ে ফেলে তার একটা বড় কারণ এই যে একেক জন মাস্টারমশাই তাদের একেক রকম পরামর্শ দেন, কেউ বলেন সাধু ভাষায় লেখ, কেউ বলেন চলিত ভাষায়। ফল যা হবার তাই হয়। অভিভাবকরা এবং মাস্টারমশাইরা সবাই যদি এক মত হয়ে মুখের ভাষায় লেখাটাই স্বাভাবিক অতএব সহজ এটা তাদের বুঝিয়ে দেন তবে প্রথম থেকেই তার অনুশীলন করে নিতে পারে ছেলেমেয়েরা। পাঠ্য বইয়ে পাশাপাশি দুরকম ভাষা পেলেও ক্ষতি নেই। সাধুভাষা কি ও কেন এটুকু বুঝবার জন্য তার ইতিহাস বোঝাতে হবে শিশুদের? হায় ঈশ্বর! আমি আজও সেই ইতিহাস জানি না।

শেষকালে আসি গদ্য পদ্য প্রসঙ্গে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলছেন "আমার নিজের মনে হয় যে-কোনো ভাষায়ই প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার পক্ষে পদ্য অপেক্ষা গদ্য ভালো।" বিদেশী ভাষা শেখার বেলায় একথা যদি বা স্বীকার্য মাতৃভাষার বেলায় মোটেই নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেখাপড়া শেখার আগেই যে ভাষা মানুষের মর্মে গিয়ে বাসা বাঁধে ঘুম পাড়ানী ছড়া দিয়ে, "হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব?" 'আয় চাঁদ আয়, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যায়' দিয়ে তার শুরু। শিশুর সে রাজ্য থেকে পদ্যকে নির্বাসনে পাঠাবেন এতবড় পণ্ডিত মশাই, কী ভাগ্য আজও জন্মাননি! মায়েরা তাই আজও অক্লেশে পদ্যের ভাষাতেই কথা কন সেই খোকাদের সাথে যারা এখনও কথা কওয়া শেখেনি।

সমতট, পৃঃ ২১২-৫

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

A Modern Approach to Islam.

Ed. by Asaf A. A. Fyzee. Second impression. 1981. Oxford University Press. Rs. 45.

চোদ্দশত বৎসর আগে আরব দেশের অনুন্নত এক উপজাতির মুখের ভাষাতে আল্লাহ্-র যে বাণী হজরৎ মহম্মদ লাভ করেছিলেন তার প্রেরণা এতকাল ধরে অসংখ্য মানুষের শুধু আধ্যাত্মিক জীবন নয়, সামাজিক জীবনকেও সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত করেছে। বরং পরলোকের চেয়ে ইহলোকের উপরেই তার প্রভাব এত বেশি ব্যাপ্ত ছিল যে পরস্পর যুযুধান, রক্তক্ষয়ী-আত্মকলহে দীর্ণ কদাচারী বহু উপজাতিকে স্বল্পকালের মধ্যে নবমন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করে এক দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল এই ধর্ম। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তিনটি মহাদেশের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই নবদীক্ষিত জাতি একটি অপরাজেয় শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়। প্রথম সাত শত বৎসরকেই ইসলামের গৌরবময় এবং একাধিক অর্থে প্রগতিশীল অধ্যায় বলে মনে করা হয়। অভূতপূর্ব এমন সাফল্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে ইসলাম একটি 'সম্পূর্ণ জীবনদর্শন' জীবনবিমুখ কিছু পারলৌকিক চিন্তামাত্র নয়। জাগতিক সার্থকতা-ব্যর্থতা জয়পরাজয় মুসলমানের কাছে "মায়া" নয়। বরং ইহলোকে এই ধর্মসংস্থাপনের প্রয়াস যত সার্থকতর হবে পরলোকেও অনন্ত সুখের সম্ভাবনা ততই উজ্জ্বলতর হবে একজন গাজি (ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী) বা শহীদের (ধর্মযুদ্ধে নিহত) পক্ষে।

সময়ের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের এবং সমাজেরও অধ্যাত্মবোধ উন্নত হয়, সমাজজীবনের বহিরঙ্গে বিবর্তন-উদ্বর্তন তো আজ সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব। তাই ধরে নিতে দোষ নেই যে চোদ্দ শতাব্দী পূর্বের আরবজাতির তুলনায় আজকের—বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের—সমাজজীবন অনেক উন্নত, ব্যক্তিমানুষও সেই পরিমাণে অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য প্রাচীনের মহিমাকীর্তনে অভ্যস্ত কেউ যদি বা 'উন্নত' এই অভিধায় আপত্তি করেন তাহলে অন্তত একথা বলা যায় নিশ্চয়ই যে আজকের ব্যক্তি ও সমাজ সেদিনের সঙ্গে তুলনায় অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রায় সার্ধসহস্র বৎসরের প্রাচীন জীবনদর্শন, তা সে সমকালের চেয়ে যতই এগিয়ে থাকুক না কেন, কতটা আজকের পক্ষে উপযুক্ত তার বিচার-প্রয়াসকে আধুনিক মানুষ স্বাগত জানালেও সনাতনপন্থী বহুলোকই একে সর্বনাশা অনধিকারচর্চা বলে ধিক্কার দেবেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমন আশঙ্কার অবকাশ নেই বলতে পারলে সুখী হতাম।

তাই মানতেই হবে যে আসফ আলি ফৈজির প্রচেষ্টা সাহসিক। তাঁর পুস্তকের চারটি অধ্যায় চারটি প্রবন্ধের সমাহার—বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম অধ্যায়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে অনুসরণ করে ইসলামের সারাৎসার যে-চিন্তা তারই ব্যাখ্যান। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়—ইসলামে আইনকানুন ও ধর্মের সাযুজ্য। ভারতবর্ষে শরীয়তী বিধান ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে। শেষ অধ্যায়টি মনে হয় এই পুস্তকের জন্য বিশেষভাবে লিখিত—বিষয় ইসলামের পুনর্ব্যাখ্যান। গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের সমস্যাটি লেখক স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন ইসলামের মূলসূত্রগুলির (ক্রীড) পুনর্ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে তবে কেন? কী ধরনের পুনর্ব্যাখ্যান সম্ভব? কিভাবে তা করা হবে? ফৈজী সাহেব সবিনয়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার প্রয়াস করেছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে যে এই আরব্য জীবনদর্শনের আজ যে দুর্দশা তাতে হয় নিজেদেরকে এই জীবনদর্শনের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে নয়ত এই জীবনদর্শনটিকেই নিজেদের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয় পন্থা হল এই জীবনদর্শনকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন করা। কিন্তু এই তৃতীয় পথ গ্রহণ করতে লেখকের যে অভিরুচি নেই বরং ঘোর আপত্তি আছে সেকথা তিনি অকপটে গোড়াতেই স্বীকার করেছেন। তিনি নিজেকে একজন মুসলমান বলে চিহ্নিত করতে গর্বই বোধ করেন, কারণ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ইসলামের যদি যুগোপযোগী সদ্ব্যাখ্যা করা হয় তবে আজও জগতের মানুষকে দেবার মতো ধন তার অনেক আছে (Islam properly understood has much to offer to the human spirit in the world of today.)। লেখকের সমস্যার এই উপস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত সনাতনপন্থীদের অনেকখানি আশ্বস্ত করবে তবে নব্যপন্থীরা অবশ্যই জানতে উৎসুক হবেন যে ইসলামের বাণী কিভাবে ব্যাখ্যা করে তিনি তার চিরন্তন মূল্যকে সমসাময়িক কালের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই লেখক বিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে এই ভারতবর্ষে বসে ইসলামের নবমূল্যায়নের প্রয়াস করছেন—করার তাগিদ বোধ করেছেন। ভারতবর্ষে ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাস বিচিত্র। বিজয়ীর বেশে এসে কয়েক শতাব্দীর উজ্জ্বল উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই দুটি প্রায়ান্ধকার শতাব্দী পার হয়েছেন ভারতীয় মুসলমানেরা। অবশেষে, আমার তো মনে হয় এবার এক সম্ভাবনাময় নব-পর্যায়ের শুরু হয়েছে ভারতবিভাগ ও স্বাধীনতার পর থেকে। ইসলামের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি কতখানি এবং তা কতদূর কালজয়ী তারই এক অনতি-উপলব্ধ পরীক্ষা চলেছে এই দেশে।

একমাত্র ধর্ম অথবা সংখ্যাগুরুর ধর্ম হিসেবে ইসলাম শাসকের ভূমিকায় বহুদেশে বহুকাল যাবৎ রয়েছে। সংখ্যালঘু হয়েও ভারতবর্ষের বিরাট অংশ শাসন করেছেন মুসলমান। কোথাও বা অন্যধর্মাবলম্বীদের শাসনে সংখ্যালঘু জিম্মি হয়েও রয়েছেন মুসলমান। আবার লেবাননের মতন দেশে অন্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে অস্থির ভারসাম্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দোদুল্যমান থাকার অভিজ্ঞতাও আছে মুসলমানের। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রায় সাত কোটি মুসলমানকে। আজকের ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষিত। এই দেশে একটি বৃহত্তর ভিন্নধর্মাবলম্বী সমাজের সন্দে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমঅংশী হয়ে উঠবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। যদিও দেশের সমগ্র জনসংখ্যার তাঁরা এক-দশমাংশ মাত্র, তবু এখানে মুসলমানেরা শাসিত নয়, শাসক তো নয়ই আর। একটি স্বশাসিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তাঁরা নাগরিক, যে রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক নয়। মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্ম শুধু নাগরিকের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের সঙ্গে নয়, রাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও ওতপ্রোত হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশের অন্য দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের সামনে আজও সেই আদর্শই তুলে ধরা হচ্ছে। অথচ এখানে নতুন এক পরিস্থিতিতে তাঁর ধর্মকে গুটিয়ে এনে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমিত করতে শিখতে হচ্ছে। এমন কি ব্যক্তিগত জীবনের সবটুকুও আর ইসলামের অনুশাসনে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেইজন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষীয় মুসলমান-সমাজ বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তার যে বিশেষ আইন (যা ইংরেজ রাজত্বেও স্বীকৃত ছিল) সেগুলিকে রক্ষা করতে এমন বদ্ধপরিকর এবং সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ মেনে নিতে প্রচণ্ডভাবে অনিচ্ছুক—যেন এই তার শেষ আশ্রয় কিংবা তার বিশিষ্ট সমাজসত্তার সবচেয়ে মূল্যবান চিহ্ন। অথচ ইসলামী দেশে দেশে এজাতীয় আইনের অনেকখানি সংস্কার ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে। ইসলামের মূলতত্ত্বের তাতে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। দিনে দিনে মানুষের নীতিবোধ ও বিবেকের তো উন্নতি ঘটছে। সেই অনুযায়ী এসমস্ত ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসনের সংস্কার করে নিলে ব্যক্তি ও সমাজের লাভ বই ক্ষতি নেই। কিন্তু এসব যুক্তির কথা শুনতে চায় না রক্ষণশীল মানুষ। ধর্মের কোন্ অংশটা চিরন্তন আর কোনটা পরিবর্তনসাপেক্ষ—তার বিচার বিশ্লেষণ করতেও রাজি নয় বেশির ভাগ মানুষ।

এদিকে হিন্দুধর্মের সামাজিক বিধিবিধানের পরিব্যাপ্তিও কিছু কম নয়। বর্ণবিভক্ত, কর্মবাদশাসিত এবং কিছুটা ইহলোক-বিমুখ এই সমাজ অনেক প্রাচীনতর বলেই এর ধর্মীয় আচার-আচরণের মূল আরও গভীরে প্রোথিত। উন্নত সংবিধান ও প্রগতিশীল আইন-কানুনের সাহায্যে এই সমাজের আধুনিকীকরণের প্রয়াস চলছে বটে কিন্তু বাস্তবের সমাজ এখনও যে বহুদূর পশ্চাতে পড়ে আছে সে কথা কে অস্বীকার করবে? আমাদের সমাজ পুনর্গঠনের যে শম্বুক গতি তিন দশক ধরে লক্ষ্য করা গেছে তাতে মনে হয় আরও বহুকাল এইরকম পিছনেই পড়ে থাকবে হিন্দুসমাজ। ফলে জল-অচল জাতির জন্য ভিন্ন কূপ ও তড়াগের যথেষ্ট সংখ্যক ব্যবস্থা সরকার না করলে সেই নিম্নবর্ণের মানুষরা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হবে এমনতর সামাজিক চাপও রাজনৈতিক দাবীর মর্যাদা পাচ্ছে এবং এর রাজনৈতিক মোকাবেলা করার জন্যই লোকসভাতেও যথেষ্ট উত্তেজনা ও তৎপরতা দেখা গেছে। এমন কী সতীকে সহমরণে যাবার পবিত্র অধিকার প্রত্যর্পণ করার দাবীতেও ইদানীংকালে এদেশের রাজপথে ধ্বনি উঠতে শুনেছি আমরা। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও এর অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রীই যেহেতু পূর্ববর্ণিত সংখ্যাগুরু সমাজের প্রতিভূ তাই মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরে সহস্র সহস্র বৎসরের অভ্যাস পরিবর্তন করে ফেলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় আচার-আচরণ ও চিন্তাভাবনাকে কতদূরে আর নির্বাসিত করতে পারবেন এই যন্ত্রীরা? অতএব উন্নততর ও প্রগতিশীল একটি বৃহত্তর সমাজের সদ্দৃষ্টান্তে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত হবার অবকাশও খুব বেশি নেই একথা বললে কি খুব ভুল বলা হবে? অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর জন্ম হওয়ায় নানাদিকে সংস্কারমুক্তির একটা খোলা হাওয়া বয়ে গেছে এই সমাজের উপর দিয়ে। প্রতিতুলনায় তার সদৃশ কিছু মুসলমান সমাজে না ঘটায় বদ্ধ আবহাওয়া কাটেনি, সমাজের আধুনিকীকরণে বিলম্ব ঘটছে। স্যার সৈয়দ আহমেদ একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালের ভারতবর্ষে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুসলমানের ঘর সামলাবার, মেরামত করবার, নতুন কিছু গেঁথে তুলবার প্রয়োজন যে খুব বেশি দেখা দিয়েছে একথা ফৈজী সাহেবের মতন বিচক্ষণ চিন্তাশীল কিছু মানুষ উপলব্ধি করেছেন। এঁদের সংখ্যা অবশ্যই কম, খুবই কম। কিন্তু সেটা কি অপ্রত্যাশিত? দেশবিভাগের কাঁচি এই সমাজের মাথার দিককার ডালপালা প্রায় নিঃশেষে ছেঁটে ফেলেনি কি? শুধু বিত্তবানেরা নয়, সংস্কৃতিমানেরাও তো ঝেঁটিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। তবে মনে হয় বর্ষার আগে ছেঁটে দিলে যেমন কোনও কোনও গাছের বৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হয় তেমনি হয়তো অধিকতর প্রাণের রস সঞ্চারিত হয়ে এই সমাজবৃক্ষের শ্রীবৃদ্ধি এবার দ্রুত ঘটতে পারবে, অপ্রয়োজনীয় অনেক বোঝা ছেঁটে ফেলে দেবার ফলে। তবে বর্তমান অবস্থা থেকে এবার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে নজর ফেরানো যাক। আসফ আলি ফৈজী কী ধরনের নবমূল্যায়ন করে এই সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলবার আশা করেন?

ইসলামের শিক্ষাকে আধুনিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করার প্রয়াস ইতিপূর্বেই হয়েছে। আসফ আলি সাহেব তিনজন পূর্বসূরীর উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আমীর আলি, মহম্মদ ইকবাল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। আমীর আলির 'স্পিরিট অব ইসলাম' ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, ইসলাম বিষয়ে উৎসুক ব্যক্তিরা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ এই পুস্তকটি পাঠ করে আসছেন। আমীর আলি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হজরৎ মহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করেছেন। তিনি কিভাবে তৎকালীন আরব দেশের সংস্কার ও উন্নয়ন করেছিলেন তার বিশদ ইতিবৃত্ত রয়েছে এই পুস্তকে—সম্ভবত বিরূপ সমালোচনার উত্তর দেবার জন্যই। কিন্তু ইসলামের ত্রুটি বা দুর্বলতা কোথায় তা বুঝবার বিশেষ কোনও চেষ্টা আমীর আলি করেননি বলে আসফ আলি এই প্রয়াসকে ইসলামের নবমূল্যায়ন বলে গ্রহণ করতে রাজি নন।

অন্যপক্ষে ইকবাল আধুনিক দার্শনিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, বিশেষ করে মরমিয়া রহস্যবাদের (mysticism) প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অনেকখানি। তবু তিনি সুফীবাদের প্রশান্তি ও নির্লিপ্তির চেয়েও ইসলামের কর্মোৎসুক দিকটির দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। তিনি ইসলামের কিছু সংস্কার অবশ্যই চেয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাতে জনগণের মধ্যে মতৈক্য (কনসেনসাস) স্থাপনের প্রাচীন রীতির সঙ্গে আধুনিক আইনকানুনের একটা সমন্বয় সম্ভব হতে পারে। ভারতে (ও পরে পাকিস্তানে) অগণিত ভক্ত তাঁর এই কর্মবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উর্দু ও ফারসী কাব্যবাহিত তাঁর এই দর্শন যুক্তির চেয়েও মুসলমানের হৃদয়কে বেশি অভিভূত করেছিল। ইকবাল যেহেতু মুসলিম বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্নে মশগুল ছিলেন তাই এখানে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করি।

আসফ আলি ফৈজীর এই পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৬৩। তার কয়েক বছর পরে অন্যত্র একটি প্রবন্ধে এই লেখক মন্তব্য করেছিলেন, আজকের মুসলমানদের স্মরণ রাখা মঙ্গল যে উম্‌মা—যা তাদের একটি সযত্নলালিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের কল্পনা বা myth—সেটি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থাৎ জগতের সর্বত্র যেখানে যত মুসলমান আছেন তাঁরা এক জাতি (উম্‌মা), একমন, একপ্রাণ, একই আচার-অনুষ্ঠানে পরস্পরের সন্দে জীবনে মরণে সম্বন্ধ—এই প্রিয় কল্পনা আজ চুরমার হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আল্লাহ্-র সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব (হুকুমৎ-ই-ইলাহিয়া) যার সর্বময় কর্তা খলিফ এমনতর স্বপ্নের বাস্তবে প্রতিষ্ঠা হবার সম্ভাবনা যে আর নেই একথাটা ভারতীয় মুসলমানদের বুঝে নেওয়া দরকার। এতকাল সব দেশের মুসলমানই জেনে এসেছে যে সে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক, তার আনুগত্য দুটি রাষ্ট্রের প্রতি, একদিকে আছে তার ভৌগোলিক সীমা ও রাজনৈতিক অধিকারে বিধৃত রাষ্ট্র বা কওম, অন্যদিকে আছে তার উম্‌মা বা আবিশ্ব-পরিব্যাপ্ত ধর্মরাষ্ট্র। জগৎজোড়া মুসলমানকে নিয়ে যে মিল্লৎ তারই বন্দনা করেছেন ইকবাল। আসফ আলি তাঁর মন্তব্যকে বিশদ করে বলেছিলেন "নমাজ সেরে এসে আলবোলায় সুখটান দিতে দিতে বৃদ্ধ নানাসাহেব যখন তাঁর তরুণ নাতির সঙ্গে উম্‌মা বিষয়ে সগর্ব আলোচনা করেন তখন খেয়াল থাকে না যে তাঁর কল্পনার উম্‌মা রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক কোনও অর্থেই আর সত্য নয়।" কিন্তু মহম্মদ ইকবাল তো বাতুল বৃদ্ধ ছিলেন না, এই উম্‌মার কল্পনা তাঁর কাব্যেরও একটি মহৎ প্রেরণা ছিল। আসফ আলি মনে করেন এর বাস্তবতা অথবা অবাস্তবতা ততখানিই যতখানি T. S. Eliot-এর Christian Society-র কল্পনা। যাই হোক বিস্তৃততর এই আনুগত্য বহুকাল যাবৎ মুসলমানকে এক বিশেষ গর্ব, বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে। অথচ যেসব দেশে মুসলমানকে অন্যধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে হয়েছে সেসব দেশের অমুসলমান নাগরিকরা এই স্বদেশাতীত রাষ্ট্রাতীত আনুগত্য এবং এই নিয়ে উন্মাদনাটা ঠিকমতন বুঝতে পারেন না এবং পারেন না বলেই মুসলমানের দেশপ্রেম বিষয়ে সন্দিগ্ধ। দুদিক থেকেই এটা মূঢ়তা। আসফ আলি সাহেবের বক্তব্য অনুধাবন করে সুধীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত দুটি পংক্তি মনে পড়ছে

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।

পরবর্তী পংক্তি দুটিও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।

'সম্প্রতি এই স্বপ্ন যে আরও অনেক নিষ্ঠুর আঘাত খেয়েছে আসফ আলি তা জেনে যাননি। পাকিস্তানের দুই অংশের হানাহানি তাঁর জীবদ্দশায় ঘটে থাকলেও ইরান-ইরাকের যুদ্ধ তার পরবর্তী দুর্ঘটনা।

যাই হোক ইসলামের নবমূল্যায়নের মডেল (আদর্শ?) হিসেবে মৌলানা আজাদের চিন্তার প্রতিই আসফ আলির পক্ষপাত। সুগভীর পাণ্ডিত্য আর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার জন্য এই বুদ্ধিজীবীটির যতখানি স্বীকৃতি লাভ করা উচিত ছিল ভারতীয় রাজনীতির এক যুগান্তকারী আবর্তে পড়ে তার কিছুই প্রায় তিনি পাননি। বিজ্ঞজনেরা বলেন, গত দুশ বছরে ইসলামী শাস্ত্রে তাঁর তুল্য পণ্ডিত দ্বিতীয় কেউ জন্মাননি এই দেশে। তাঁর সেই বিপুল পাণ্ডিত্য নিয়ে শেষ জীবনে তিনি কোরানশরীফের উর্দু তর্জমা (তর্জুমান উল্ কুরান) করায় হাত দেন। তাঁর সেই আরব্ধ কর্ম শেষ করে যেতে পারেননি। দুই খণ্ডে কোরানের প্রায় অর্ধাংশের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল। তবে প্রথম খণ্ডের জন্য যে ভূমিকাটি রচনা করেছিলেন তার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এতে কোরানের প্রথম সুরাহ্ 'ফাতিহা'-র উপর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কোরানের উৎসস্বরূপ এই যে উম্মুল কুরান (কোরানের জননী) অথবা সারাৎসার, এই থেকেই সমগ্র ইসলামের ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন আজাদ। এই 'সুরাহ্-এ-ফাহিতা'-র প্রার্থনাই মানুষের মনে ধর্মের যত আকাঙ্ক্ষা সব পূরণ করতে সক্ষম বলে দাবী করেছেন আজাদ, এবং ফৈজীও তাঁর সঙ্গে একমত বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী আইনকানুন ও ধর্মের বিশদ আলোচনা আছে। আসফ আলি সাহেব খ্যাতিমান আইনজ্ঞ এবং বোম্বাই ল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। নিঃসন্দেহে মুসলিম ল-এর তিনি একজন সর্বজনস্বীকৃত পণ্ডিত। মানুষের তৈরি কানুন ও ঈশ্বরপ্রদত্ত শরীয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক তলিয়ে বিচার করে তিনি সুফল পেয়েছিলেন বলে মনে করেন এবং সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিধানের ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন। সেমিটিক ধর্মে ঈশ্বরই ন্যায়ের উৎস। পয়গম্বরের শেষ বাণীতে ধর্ম ও কানুন সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। পরবর্তীকালে ওমরের শিক্ষায় ন্যায় ও আইনের ওপর জোর বেশি—আলির শিক্ষা প্রধানত আধ্যাত্মিক। ইসলামের প্রসারের পর প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে আইনকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না—ব্যক্তির জীবন যেসমস্ত বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তা সম্পূর্ণতই ছিল আল্লাহ্‌র মুখ-নিঃসৃত। আল্লাহ্-র নির্দেশানুযায়ী মানুষ সংযত জীবন যাপন করে তাঁর করুণা অর্জন করবে এই ছিল সর্বশক্তিমান, দয়াময়, ন্যায়বিধাতা আল্লাহ্-র অভিপ্রায়। ক্রমে সমাজব্যবস্থা যত জটিল হয়ে উঠল, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে যত বেশি সমস্যার সৃষ্টি হতে লাগল ততই নতুন নতুন লৌকিক কানুন তৈরি করতে হল এবং অলৌকিক শরীয়া-য় আর কুলোল না।

আইনের তুলনামূলক চর্চায় আসফ আলি সাহেবের বিশেষ উৎসাহ। পয়গম্বর যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজে জন্মেছিলেন তার আইনকানুন কেমন ছিল পূর্বে, সে বিষয়ে পয়গম্বরের ও তাঁর সহযোগীদের অভিমত কোথাও পাওয়া যায় কিনা—পয়গম্বর কী ধরনের আইনশৃঙ্খলা স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার ফল কী হয়েছিল এবং এখন চোদ্দশত বৎসর ধরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে শরীয়া-র কী ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং শেষত ইসলামের মূলসূত্রগুলিকে সামনে রেখে আজ শরীয়ার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে কিনা এ সমস্তই বর্তমান লেখকের পঠন-পাঠনের বিষয়। উনি সাবধানে প্রশ্ন করেছেন "মুসলমান সমাজকে পুন রুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে, ইসলামের মূলশিক্ষাকে ক্ষুণ্ণ না করেও যুগের প্রয়োজন বিচাব করে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ে নবার্জিত জ্ঞানের আলোকে আমরা কি যুক্তি দিয়ে শরীয়ার পুনর্মূল্যায়ন ও সংস্কার করতে পারি না?" এর সদর্থক উত্তর দেবার জন্য কতজন এগিয়ে আসতে রাজি আছেন, আমরা তা-ই সোৎসাহে লক্ষ্য করব।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা আরও বেশি ভারতমুখী। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সাধারণ সমস্যাটিই বিশেষভাবে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এবার আলোচনা করা হয়েছে। শরীয়া-র যে অংশ পূজা-উপাসনা ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের বিধিবিধান নিয়ে ব্যাপৃত তাকে বলা হয় দীনিয়াৎ (অথবা এবাদত) আর যে অংশে জাগতিক সমস্যা সমাধানের বিধান রয়েছে তা মুআমলাত। পঞ্চদশ শতাব্দী কিংবা তারও আগে থেকে এই উপমহাদেশের মুসলিম বিধিবিধান নিয়ে যথেষ্ট চর্চা হয়েছে, বিশেষত হানাফী গোষ্ঠীর। ১৯৫০ সালে নাকি হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছিল কেবল ভারতবর্ষেই ৮৮টি মাদ্রাসা আছে। এর সবগুলিই অবশ্য দেওবন্দের দারুল উলুমের সমগোত্রীয় নয়। তবু আরবী ভাষায় সনাতন পদ্ধতিতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা তো দেওয়া হয়ে থাকে। ধর্ম ও কানুন, বিশেষ করে হাদীসের উপর অনেকখানি মৌলিক আলোচনা ও চিন্তাভাবনা আবার উর্দুভাষায় বিধৃত বলে বহির্বিশ্বে তার তেমন প্রচার হয়নি। অথচ এই একটি প্রাণবান মুসলিম সংস্কৃতি যা ভারতবর্ষে এতকাল ধরে পুষ্ট হয়েছে, এর গতিপ্রকৃতি ঠিকমতন হৃদয়ঙ্গম না করলে সাধারণভাবেই ইসলামের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেকখানি অনুপলব্ধ থেকে যাবে। কারণ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, শিবলী নুমানী, আজাদ, অধ্যাপক মুহম্মদ আজমল খান ইত্যাদি ভাবুকরা ইসলামী চিন্তাভাবনার পরিধি অনেকখানি প্রসারিত করেছেন। ভারতে ইসলামী শাস্ত্র চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করে লেখক মন্তব্য করেছেন যে যদি নিরপেক্ষভাবে এদেশের 'মুসলিম ল' বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তবে স্বীকার করতেই হবে যে শরীয়া-য় কানুনের অনেকখানি অনুপ্রবেশ ইতিপূর্বেই ঘটেছে। ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়েও তিনি বলেছেন "বর্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস যে সম্প্রদায়বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন আইন ক্রমেই পরিবর্তিত হতে থাকবে কিংবা একেবারে বাতিল হয়ে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সবার প্রতি প্রযোজ্য সাধারণ আইনাবলী গৃহীত হতে থাকবে। এইভাবে দিনে দিনে শরীয়া-য় যতটুকু যুক্তিসহ পরিবর্তন ঘটবে তাতে ইসলামের শাশ্বত সত্য ক্ষুণ্ণ হবে না।" এই স্পষ্ট ভাষণ খুবই প্রয়োজন আপামর ভারতীয় মুসলমানের জন্য। কিন্তু হায়, ক'জনের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর ফৈজী সাহেবের এই বক্তব্য পৌঁছবে!

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে তিনি বলেছেন "A reexamination, reinterpretation, reformulation and restatement of the essential principles of Islam is a vital necessity of our age."—তা নইলে নাকি মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক দুর্বলতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং আধ্যাত্মিক দেউলেপনা ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে এই আধ্যাত্মিক দেউলেপনাই আজ মুসলিম জগতের মূলে ঘুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মুসলিম ও অমুসলিম যেসব পণ্ডিতের ইসলাম বিষয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তর্কাতীত তাঁরা অনেকেই নাকি ফৈজী সাহেবের সঙ্গে একমত। সেই জন্যই লেখক শেষ প্রশ্ন করেছেন এখন তবে কর্তব্য কী?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ফৈজী সাহেবের হাতের কাছে তৈরি তাঁর কোনও পছন্দসই তত্ত্ব নেই এবিষয়ে। কিভাবে কোন পথে অগসর হওয়া যায় এবং তার ফল কী হবে তা তিনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না। তবু বিশ্বের তাবৎ চিন্তাশীল মুসলমানের মনে এই যে ব্যাকুলতা জেগেছে তার প্রকাশ কোথাও তো শুরু হবেই। অতএব পরবর্তী ও শেষতম অধ্যায়ে তিনি সংক্ষেপে সবিনয়ে এই কাজে হাত দিয়েছেন, অর্থাৎ শরীয়ার কী ধরনের সংস্কার করে নিয়ে তাকে আধুনিক কালের উপযোগী করে তোলা যায় সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। অবশ্য তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর এই মতের জন্য তিনি মৌলিকত্ব দাবী করতে পারেন না এবং তাঁর মত একটা ভুঁইফোঁড় কিছু নয়। এর জন্য তিনি ভারতীয় এবং বিদেশি বহু শাস্ত্রজ্ঞের কাছে ঋণী।

আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় দান স্বাধীনতা—চিন্তন, ভাষণ ও করণের স্বাধীনতা। ব্যক্তিবিশেষের এই স্বাধীনতার সীমা ততদূর যা পার হয়ে গেলেই আর-একজনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। আসফ আলি ধর্মাচরণে এই স্বাধীনতা ভোগ করতে চান, তাই তিনি পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছেন যে তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসহীন নাস্তিক (non-believer) না হলেও তিনি শরীয়া-র প্রচলিত ব্যাখ্যা যা উলেমারা করে থাকেন তার সবটুকু মেনে নিতে প্রস্তুত নন অর্থাৎ তিনি non-conformist! আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নেবার অধিকার তিনি ইমামদের হাতে ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক—প্রচলিত ধারণা থেকে একচুল দূরে সরলেই কাফির বলে ফতোয়া দেওয়া চলবে না। অর্থাৎ সম্প্রতি পাকিস্তানের যে সুগায়িকা সঙ্গীতকেই তাঁর ধর্ম এবং সঙ্গীতের সাধনাকেই তাঁর উপাসনা বলার অপরাধে কাফির বলে ঘোষিত হয়েছিলেন একে ফৈজী সাহেব উলেমাদের অন্যায় অত্যাচার বলেই মনে করতেন। কিন্তু তিনি তো জানেন ধর্মীয় অনুশাসনের বেলাতে স্বাধীন চিন্তার কোনও অবকাশ দিতে ইসলাম নারাজ! ইসলামে সামাজিক বিধান ও ধর্মীয় বিধানকে পৃথক করাও যায় না সহজে—যেন একই খাতে দুই ধারা বয়ে চলেছে পাশাপাশি—শরীয়া ও ফিকহ্। মানুষের যাবতীয় কর্তব্য সংক্রান্ত বিধানই শরীয়ার অন্তর্গত, ফিকহ বলতে বিশেষ করে লৌকিক বিধিবিধানকেই কেবল বোঝায়। শরীয়া সেই জ্ঞান বা ইল্‌ম্ যা আল্লাহর করুণায় প্রত্যক্ষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লাভ (revealed) করেছিলেন পয়গম্বর। কোরান হাদীস এইভাবে প্রাপ্ত। আসফ আলি সাহেব কিন্তু শরীয়ার অলৌকিকত্ব স্বীকার করেও লৌকিক বিধান ও আধ্যাত্মিক বিধানের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানতে চান। বার বার লিখেছেন law must be separated from religion—তাতে করে ধর্মের শাশ্বত বাণীগুলি রক্ষা করা সহজ হবে বলে তাঁর ধারণা। আবার লৌকিক বিধিবিধানগুলিও প্রয়োজনমত পরিবর্তন করতে পারলে সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে না।

ইসলামের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন—এক ঈশ্বরে আন্তরিক আস্থা। এই আস্থা যাঁর আছে তিনি মুসলমান। ফৈজী সাহেব মনে করেন একেশ্বরের ধারণা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, শূন্য বা Zero-র ধারণার চেয়েও এ আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের পক্ষে লোহা, আগুন কিংবা আপেক্ষিক-তত্ত্বের আবিষ্কার যত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে এই আবিষ্কারের। তিনি মনে করেন এই এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্-য় বিশ্বাস শাস্ত্র থেকে গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই—মানুষ তার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্-কে লাভ করে। সেই অভিজ্ঞতা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করার উপায় নেই।

ফৈজী সাহেব এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্-য় বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্ব আল্লাহ্র সৃষ্টি, তিনিই বিশ্ববিধানের রচয়িতা। তিনি একথাও বিশ্বাস করেন যে হজরৎ মুহম্মদ আল্লাহ্-র বার্তাবহ দূত এবং এই বিশেষ দূতটি অন্যান্য দূত বা ধর্মগুরুর চেয়ে মহত্তরও নন, হীনতরও নন। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় আছে, উপনিষদের বাণী তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বুদ্ধ, মোজেজ ও যিশুকে শ্রদ্ধা করেন। নানা ধর্মের সাঙ্কর্য তিনি কাম্য মনে করেন, যে কারণে ইসলামী খোজাদের হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মিশ্রণ তাঁর শ্রদ্ধেয় মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রত্যেক মানুষকেই তার নিজস্ব ধর্মভাবনা গড়ে তুলবার অধিকার দিতে চান। তিনি নিজেও তাঁর অভিজ্ঞতা, স্বজ্ঞা (intuition) ও দর্শন অনুযায়ী একটি ধর্মবিশ্বাস গড়ে তুলেছেন। তিনি চান তুমি তোমার ধর্ম নিয়ে থাক, আমি আমার ধর্ম নিয়ে থাকি।

তিনি এও বিশ্বাস করেন যে কোরান আল্লাহ্-র মুখনিঃসৃত বাণী। মুহম্মদ অবশ্যই আল্লাহ্-র কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিলেন তবে তিনি যা শুনেছিলেন তা আবার নিজের ভাষায় আরবীতে ব্যক্ত করেছেন। এই বাণীকে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক যুগে নিজের মতন করে উপলব্ধি করবে, গ্রহণ করবে এটাই কাম্য। তিনি ইসলামের প্রবর্তিত প্রার্থনায়ও বিশ্বাস করেন এবং এই প্রার্থনাপদ্ধতি তরুণদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। তবে তা যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র না হয়, অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত হয় যেন—এই প্রার্থনা।

ইসলাম সত্য সুন্দর ও মঙ্গল এই শাশ্বত মূল্যত্রয়ে আস্থা রাখে। ফলে মুসলমান পণ্ডিতেরা সত্যের সাধনা, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চা যতখানি করেছেন, করবার সুযোগ পেয়েছেন, অন্য খুব কম সভ্যতাতেই তা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্যের যে উৎকর্ষ ঘটেছিল মুসলমানদের হাতে তাতে সুন্দরের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা সুপ্রমাণিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য ধর্মের সঙ্গে তুলনায় ইসলামের যদি কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে তা হল ন্যায় ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ। মঙ্গলের সাধনা কি এর চেয়ে শ্রেয়তর পথ জানে? সাতশত বৎসর ধরে মুসলমান এই শাশ্বত মূল্যগুলির সাধনা অব্যাহত রেখেছিল। পরবর্তীকালে ধর্মোন্মত্ততা, সংকীর্ণ ধর্মতত্ত্ব আর এক সর্বগ্রাসী গোঁড়ামি এই সাধনার পথ রুদ্ধ করে দিল। গত দু'শ বছর ধরে আবার সেই নিগড় থেকে মুক্ত হবারই প্রয়াস চলছে। যদি ইসলামের প্রথম যুগের সেই ভ্রাতৃত্ববোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিগ্রাহিতা, করুণা ও আনন্দকে শৃঙ্খলমুক্ত করে আবার উৎসারিত করতে পারা যায় তবে বর্তমান যুগের মানুষকে আরও একটু সুখী করা যাবে।

বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াজনিত কিছুটা হতাশা অন্তত আমার মনে শেষ পর্যন্ত রয়েই যায়। তাঁর বিশ্বাসের তালিকা যত দীর্ঘ হয় উৎসাহী পাঠক হিসেবে আমার মন ততই দমে যায়। তিনি যে দীর্ঘ বিশ্বাসের ফিরিস্তি দিয়েছেন তার কোথায় যে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আঁচড় কাটতে শুরু করব ভেবে দিশেহারা বোধ করি।

শেষ পর্যন্ত আজাদের রচনা থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা পাঠ করে ভাবি এতক্ষণ তবে কোন্ মরীচিকার পিছনে ছুটছিলাম? উদ্ধৃতির ভগ্নাংশ সুধী পাঠকদের উপহার দিই I am a Muslim and this fills me with pride. The traditions of Islam during its career of thirteen centuries go to form my heritage. I am not willing to give up *an iota* (বাঁকা হরফ আমার) of this portion. Islamic education, Islamic history, Islamic arts, Islamic science, and Islamic culture constitute the elements of my wealth : and as a Muslim, it is my duty to preserve it..Being a Muslim, I have a special position in cultural and religious circles, and I cannot bear that anyone should interfere in this sanctum of my soul." তাই যদি হয়, কিছুই যদি ভাঙতে না চান, এক কণাও যদি ছাড়তে প্রস্তুত না থাকেন, তবে নতুন কিছু গড়বেন কোথায়? কিন্তু তিনি তো আর নেই। মরহুম আসফ আলি ফৈজীর উত্তরসূরীরা কী বলেন?

চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪ (১৪০০), সং ২ পৃঃ ৭৩-৮০

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

Tear-Jerkers For The Low-Brow

Bengali publishers around College Square in Calcutta moan over the slump in their industry and the rising costs of printing and publishing. But Bengalis buy books even more than before as gifts for weddings, birthdays, New Year and the Durga Puja. And also during Kavipaksha or the fortnight -around Tagore's birthday when a special rebate of 12½ per cent is given on his books. Rabindranath Tagore and Sarat Chandra Chatterji are still our bestsellers. But that does not mean that the moderns are not doing well. While Tagore in his last days was mighty pleased with an offer of Rs 100 as honorarium for writing a story for the Puja number of a big daily paper, some of our very popular writers of fiction today can easily expect, as I am told, Rs 5000 for a novelette, paid in advance for the autumn Puja number of some of our widely circulated, periodicals. This Puja number I guess, is a typically Bengali feature, that brightened our autumn vacation.

Some Bengali writers of fiction are able to make their living from their writings only but you can count the names of such writers on three fingers of your right hand. For the rest, journalism and teaching are supposed to be the most congenial professions, though a lucrative job in a chartered accountant's or advertisers' firm is not despised. Our poets come from all walks of life and not a single one of them can be called really affluent, now that Sudhindra Nath Datta is no more. But the slender volumes of verses by Sub hash Mukherjee, Nirendranath Chakravarty, Shakti Chatterji etc., exhaust their editions of 1100 copies fast enough by any standard. Both from Calcutta and the mofussil, innumerable magazines, entirely devoted to poetry, are published for a very limited but steady group of subscribers. Fiction of all disciplines—romance, social, historical or crime—has the greatest demand. The last variety is found more in translation than originally in Bengali. There was a spate of historical and pseudo-historical novels based, on 'serious research' during the last decade but it has waned of late. So has the

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

accent on sex, normal or perverse, perhaps because it had touched the limit of saturation in our fiction. Socials and romances still have the widest readership though all romances are not for all people. There are tear-jerkers for the lowbrow whereas for the more discriminating there are novels like Maitreye Devi's "Na Hanyate" (translated recently as "It does not die") or "Asamay" (Untimely) by Bimal Kar, which won this year's Akademi award. The socials, written since Sarat Chandra Chatterji and Tara Shankar Bannerji (Jnanpith awardee) are more and more veering around the urban middle class, though once in a while we taste surprisingly fresh fare from agrarian Bengal or the industrial slums. One genre which is popular among readers, but not among writers yet, is the politically committed fiction. The Naxal up-rising has inspired some of this type of fiction, all of which is not very convincing. Mahashweta Devi's "Hajar Churashir Ma" (The mother of prisoner number 1084) is almost a solitary exception. Sometimes, Gour Kishor Ghosh's stories and novelettes have deftly upheld the liberal political values. The market for serious essays is not at all negligible. Even the most widely circulated weekly, Desh, is hospitable to reflective writing and the reader-response through the correspondence column reveals an increasing interest in such literature. Little magazines are many which devote themselves totally to the discussion of 'Nineteenth Century rennaissance in Bengal,' 'the role of the intellectual today,' 'the scrolls of the Kalighat Patuas' and what not. Bengal may still be the sick man of India but Bengali literature is virile even now. And then, Bangladesh across the border, which is ever eager to buy books from Calcutta, is opening up new horizons to the Bengali writers.

Youth Times, November 12-25, 1976, p.15

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নানাবিধ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বর, মৃত্যু, মানুষ—ইত্যাদি ভাবনা ঃ ১

আমার গান্ধীবাদী পিতা সচেতন প্রয়াসে তাঁর সন্তানদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য নিজস্ব একটা গার্হস্থ্য আয়োজন করেছিলেন। দর্শনের অধ্যাপনা তাঁর জীবিকা ছিল বটে তবু বেদান্তের চর্চা যে নেহাৎ একাডেমিক আগ্রহেই করতেন তা নয়। বরং ভারতীয় দর্শন যে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনেই শেষ হয় না, বস্তুত জীবনযাত্রার মার্গ-প্রদর্শনে সহায় হয় একথা বলতেন। তাই বলা বাহুল্য, তাঁর ধর্মশিক্ষায় কোনো পুজো-আর্চা বা অনুষ্ঠান-উপচার ছিল না। মনে পড়ে, আশৈশব আমরা সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠেই বাবা ও মায়ের সঙ্গে সবাই গোল হয়ে বসতাম। কিছু স্তোত্রপাঠ করা হত সমস্বরে—তবে নীচু গলায়। পাড়া জাগিয়ে নয়। 'নমস্তে সতে জগৎকারণায়' দিয়ে শুরু হত। কখনো তারপরে দশাবতারস্তোত্র সুরে গাওয়া হত 'প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্'...। কখনো বা শঙ্করের মোহমুদ্গার থেকে সুরে আবৃত্তি করা হত, 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।'

বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, 'আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ বোধাদপি গরীয়সী।' হয়তো সেই কারণেই বাংলা অর্থ বলে দেবার বা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেননি কখনো। ধরে নিয়েছিলেন যে ক্রমে বয়স ও অভিজ্ঞতা হলে 'কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চতি আশাবায়ুঃ' ইত্যাদির অর্থ আপনিই, মনের মধ্যে প্রকাশ পাবে। আমার ভাইবোনদের কার মনে কী অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল তা ঠিক বলতে পারব না কারণ তারা প্রাপ্তবয়স্ক হতে না হতেই দীর্ঘদিন আমি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তবে আমি স্কুলে অল্পস্বল্প সংস্কৃত শেখার পরেই মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম যে 'প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে'-র অর্থ মরণ ঘনিয়ে এলে পরে ডুকরে কাঁদলেও কেউ রক্ষা করবে না!

সাধারণত ছুটির দিনে যখন বাবার হাতে একটু বেশি সময় থাকত তখন এই প্রার্থনাসভায় হারমোনিয়ম বা সেতার নিয়ে বসতেন। তার সঙ্গে গাইবার জন্য 'গীতাঞ্জলি' থেকে রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' বা 'কল্যাণী' থেকে দুই-তিনটি গান বেছে নিতেন। সবাইকেই গাইতে হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কান্তগীতি ছাড়াও গান্ধীজীর 'আশ্রম ভজনাবলী'-র অন্তর্গত কিছু ভজনও গাওয়া হত। সম্প্রতি সেই ছোট্ট পকেটবুকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাবার শেষ জীবনের নিবাস শান্তিনিকেতনের সর্বগ্রাসী উইয়ের কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর তার উত্তরাধিকার আমিই লাভ করেছি। ঐ বইটুকুর মধ্যে আমাদের শৈশবের অনেকখানি লুকিয়ে আছে। সেজন্যই বোধহয় পঞ্চাশ বছর পরেও ওটির প্রতি একটা বিশেষ মমতা অনুভব করি।

এই স্মৃতিচারণা করতে শুরু করার কদিন পরেই হঠাৎ একদিন ভোরবেলায় পুণে বেতার কেন্দ্র থেকে ঐ 'আশ্রম ভজনাবলী' সংকলনের একটি গজল শুনে চমকে উঠলাম। গত পঁয়তাল্লিশ বছরে ঐ গানটি আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। মহারাষ্ট্রে তখন সদ্যপ্রয়াত জে. আর. ডি. টাটার জন্য রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হচ্ছিল। সেই উপলক্ষে বেশ গম্ভীর ও পরিশীলিত কণ্ঠে কোনো এক গায়িকা গাইলেন (নাম বলা হয়নি)

হ্যায় বাহার-এ বাগ দুনিয়া চন্দ্‌ রোজ।
দেখ লো ইসকা তমাশা চন্দ্‌ রোজ।

সত্যি বলতে কি আমাদের পিতার কণ্ঠে ছাড়া এই গানটি কখনো আর কাউকেই আমি গাইতে শুনিনি। তাই গানটি শোনার পর বহুক্ষণ বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম।

তবু অস্বীকার করলে অধর্ম হবে যে, ঐ অবশ্যকর্তব্য নিত্যকর্ম, একটু বড় হবার পর থেকেই আমার ভাল লাগত না। কিন্তু এতে যোগ না দেবার সাহসও ছিল না। ভাইবোনদেরও প্রায় একই অবস্থা। আমরা নিজেদের মধ্যে এই নিত্যকর্তব্যকে মাঝে মাঝে 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বেগার' বলে চাপা গলায় হাসাহাসি করতাম। কথাটা কে প্রথম শিখিয়েছিল মনে নেই। হয়তো আমাদের চেয়ে বয়সে বড় কোনো আশ্রিত আত্মীয়। সেইরকম কেউ কেউ পড়াশোনা করে মানুষ হবার আশায় প্রায়ই আমাদের পিতার অভিভাবকত্বে আমাদের পাটনার সংসারে এসে থাকতেন এবং এই কারণে পিতৃদেবের পারিবারিক শৃঙ্খলা তাঁদেরও মেনে নিতে হত। বক্রোক্তিটা তাঁদেরই কারুর হলেও আমাদেরও যে মনের মতো হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের ঐ প্রাত্যহিক ধর্মচর্চার কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া আজও আমার মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

প্রতি-তুলনায় মা যে কয়েকটি মেয়েলি ব্রত করতেন সেগুলি আমাকে অবিমিশ্র আনন্দ দিত। অবশ্য সেগুলিও যদি প্রত্যহ করতে হত এবং তাতে আমাকেও যোগ দিতে বাধ্য করা হত তাহলে কেমন লাগত বলা কঠিন নয়। যাই হোক, মায়ের ব্রতের আনুষঙ্গিক উপচারে যেসব নৈবেদ্যের ব্যবস্থা থাকত শুধু তাতেই যে উৎসাহ বোধ করতাম এমন কিন্তু নয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটাতেই বেশ একটা রস পেতাম। রসনাতৃপ্তির বিশেষ আয়োজনও থাকত অবশ্যই। কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানের ফলে ঈশ্বর-বিশ্বাস যে গাঢ়তর হত এমন নয়। মনে হয় পুতুলের বিয়ে দিতে যে আনন্দ যেন খানিকটা সেই রকমই একটা পুজো পুজো খেলার আনন্দ ছিল।

পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ঐতিহ্য থেকে নিয়ে আসা মায়ের এই ব্রতগুলি যেন একটু অন্য রকমের ছিল। যেমন 'যম-পুকুর' ব্রতে উঠোনের মাঝখানে একটা ছোট্ট খেলার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুকুর কেটে তা থেকে স্বর্গগতা তৃষ্ণার্তা শাশুড়িকে তুলসী পাতায় করে জলপান করানো। বেশ লাগত দুদিন ধরে এই ব্রতের খুঁটিনাটি নানা আয়োজনে সাহায্য করতে। গোবর দিয়ে সারা উঠোন লেপে পুকুরটির চারদিকে পিটুলি গোলা দিয়ে আলপনা দিতাম। ছেলে বুকে দাঁড়িয়ে থাকা শাশুড়ি পুতুলটি অবশ্য মা নিজেই গড়তেন মাটি দিয়ে। সেইসঙ্গে নানা গার্হস্থ্য প্রাণীর ছোট ছোট পুতুলও গড়া হত। এরা পুকুরটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকত এবং সবশেষে এরাও জল পেত। তার আগে অবশ্য হাতে দূর্বা নিয়ে বসে ব্রত কথা শুনতে হত। সেও বেশ মজার ব্যাপার ছিল, বিশেষ করে যেসব মহিলারা ঐ ব্রত পালন করায় অবহেলা করতেন তাঁদের কি কি শাস্তি হত তার সরস বর্ণনা। ব্রতের শেষে পারণের ব্যবস্থাটি যে আরো উপাদেয় হত তা স্বীকার করতেই হবে। ব্রতিনী মুক্তহস্তে তাঁর পারণের অংশ সবাইকে দান করে তৃপ্ত হতেন।

মায়ের পৌর্ণমাসী ব্রতটিও বেশ লাগত। সম্ভবত মাঘের পূর্ণিমা রাত্রে সেটি পালন করা হত। পূর্ণচন্দ্রের জন্য পাঁচটি কি সাতটি অর্ঘ্যের আয়োজন করা হত কলার আগ-পাতে। সম্ভব হলে কয়েকটা কলা গাছের আঙটা-পাতা কেটে এনে প্রত্যেকটারই আগাটা ব্যবহার করা হত। সারাদিন ধরে উপোস করে নানা রকম নিরামিষ সুখাদ্য ও পিঠে-পায়েস রান্না করে সন্ধ্যায় সেসব দিয়ে নৈবেদ্য সাজানো হত সাধারণত বারান্দায় যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ত সেখানেই। তারপর ব্রতকথা বলা হয়ে গেলে একটি পাতার নৈবেদ্য সযত্নে তুলে নিয়ে গিয়ে নদীতে বা পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হত চাঁদের উদ্দেশে। এতখানি সুখাদ্যের অপচয়ে আমাদের মহা দুঃখ হত এবং অবশিষ্ট পাতাগুলির জন্য রেষারেষি শুরু হয়ে যেত। তবে যারা ঐ কলাপাতার নৈবেদ্য পেত না তাদের জন্যও মায়ের ভাণ্ডারে কোনো অভাব থাকত না।

সবচেয়ে নিজেদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতাম কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী ব্রতের দিনে। পূর্ব বাংলার অনেক জেলায়, আমাদের মৈমনসিংহ জেলাতেও এই ব্রতটি পুত্রকন্যানির্বিশেষে সব ক'টি সন্তানের দীর্ঘায়ু কামনায় উদ্‌যাপন করা হত—মোটেই কেবল জামাতাদের পোশাক-আশাকে ও ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করার জন্য নয়। নানা উপচারে ষষ্ঠী দেবীর নৈবেদ্য সাজানো হলো তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্ষমতারও বর্ণনাসম্বলিত ব্রতকথা আমাদের সবাইকেই শুনতে হত। তারপর সন্তান ও সন্তানস্থানীয়দের আসন পেতে বসিয়ে ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে, ষাট ষাট বলে নতুন পাথায় বাতাস করে প্রত্যেকের হাতে নববস্ত্র ও ছটি করে ফল দিতেন মা। এটা আমরা, সবাই খুব উপভোগ করতাম। ঐ ফলের সদ্ব্যবহার করার আগেই নতুন পোশাক পরে নিতে হত। তারপর একটু বেলা করে হত দ্বিপ্রাহরিক ভোজ!

দুর্গাপূজার পাঁচদিন পরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও ছিল মায়ের বিশেষ ধর্মকর্মের অন্তর্গত। সারাদিন উপবাস করে পূজার আয়োজন করতেন। সন্ধ্যায় সব নৈবেদ্য সাজিয়ে একটি কালো পাথরবাটিতে নারকেলের জল আর তাতে নারকেলের সাদা 'ফুলটি' (প্রায়ই পুষ্ট নারকেল ভাঙলে পাওয়া যেত) ভাসিয়ে দিতেন। ভারি চমৎকার দেখাত। ঐ উপলক্ষে অনেক দিন পর্যন্ত ঘর-বারান্দা এবং নিকোনো উঠোন ভরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আলপনা দিয়েছি পরম উৎসাহে। লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন ধানের ছড়ার পাশে পাশে পদ্মলতা বেয়ে ঘরে এসে উঠত।

ঐসব বাৎসরিক উৎসবে আমার যত উৎসাহ ছিল দৈনন্দিন উপাসনায় ছিল ততখানিই অনীহা। মায়ের একটি স্থায়ী লক্ষ্মীর আসনও ছিল। এর দায়িত্ব আমার উপর এসে না পড়া পর্যন্ত লক্ষ্মীর প্রতি আমার কোনো বিরাগ ছিল না সে কথা সত্যি। কিন্তু লক্ষ্মীর নিত্য ফলজল জোগানোর ভার আর বৃহস্পতিবারের পাঁচালি পড়ার কাজটাও আমার উপর যখন বর্তাল তখন থেকেই লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার আড়াআড়ি শুরু হয়ে গেল। এই নিত্য-নৈমিত্তিক দায় থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য একটা যে ভীষণ অপকর্ম করেছিলাম তার কথা এখন আর নাই বললাম। কারণ সেই কৈশোরিক অপকর্মের দশ বারো বছর পরে আবার আমি এমন একজনকে বিবাহ করেছিলাম যিনি জন্মসূত্রে মুসলমান। ফলে এখন সেই অপরিণত বুদ্ধির কালাপাহাড়ী কাণ্ডের অপব্যাখ্যা হতে পারে এমন আশঙ্কায় বলতে সঙ্কোচবোধ করছি।

এই প্রসঙ্গেই স্বীকার করা সঙ্গত যে আমার পক্ষে কখনই ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ আর সব বাদ দিয়েও দৈনিক পাঁচ বার নামাজ পড়া এবং রমজান মাসে রোজা রাখা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। বাধ্যতামূলক প্রাত্যহিক ধর্মচর্চা বিষয়ে অল্প বয়স থেকেই মনে যে একটা বিরাগ-সৃষ্টি হয়েছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা তীব্রতর হয়েছে। কোনোকিছু করতে যদি আমাকে বাধ্য করা হয় তাহলেই আমার মন অবাধ্য হয়ে ওঠে। জন্মগতভাবে যিনি মুসলমান তিনি যদি আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি পালন না করেন বা ঐ 'ফর্জ অদা' না করেন তবে তিনি ভ্রষ্ট মুসলমান হন, অ-মুসলমান হয়ে যান না। কিন্তু অ-মুসলমানকে দীক্ষিত মুসলমান হতে হলে অবশ্যই ঐ কর্তব্যগুলি নিষ্ঠাভরে পালন করতে হয়। আমার একটি মামাতো দেওর যে শিখকন্যাকে বিধিমতে ধর্মান্তরিত করে নিয়ে নিকাহ্ করেছিল সেই বধূটি সর্বপ্রযত্নে সব 'ফর্জ অদা' করে শ্বশুরকুলের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তার সদ্দৃষ্টান্ত কেউ কেউ আমার সামনে উল্লেখ করেছিলেন বটে। তবে সৌভাগ্যবশত আমার স্বামীর অসম্মতি এই বিষয়ে এতই দৃঢ় ছিল যে তাঁকে কেউ কিছু বলতেই সাহস করেনি কখনো।

যদিও কোরাণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি উচিত নয় তবু লক্ষ্য করেছি যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বিষয়ে বেশ একটা প্রবল চাপ আছে মুসলমান সমাজে। ব্যক্তিমানুষের উপরে কওম কিংবা মিল্লতের যতখানি চাপা মুসলমানরা আজও অনুভব করেন হিন্দুরা ততখানি সামাজিক চাপ আর বোধ করেন না। এখন তো আবার বিপথগামী তরুণদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে বলা হয়, "এদেশে মুসলমানের আর কী বাকি রইল তার ইমান ছাড়া! সেটুকু অন্তত বাঁচাও, তাহলে এই ইমানের কল্যাণেই নিজেও রক্ষা পাবে।"

যাই হোক ঈশ্বরচিন্তা ও আনুষ্ঠানিক ধর্মচর্চার সঙ্গে আমার আবাল্য সম্পর্কটা কেমন সেটাই শুধু বলতে চেয়েছি। অনেক হিন্দু সংসারেও আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর চেয়ে অনেক বেশি কড়াকড়ি থাকে। আবার বহু সংসারেই ছেলেমেয়েদের প্রাত্যহিক ধর্মচর্চার ব্যাপারে বেশ উদাসীনতাই দেখা যায়। আমাদের সমবয়সী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আর কারুর বাড়িতেই প্রাত্যহিক ঈশ্বরচিন্তার তেমন কোনো আয়োজন দেখতাম না যাকে ধর্মশিক্ষা বলা যায়। গান্ধীজীর সেবাগ্রামে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যা থেকে উঠে যেভাবে ঈশ্বরভাবনায় দিন আরম্ভ করার রীতি দেখে এসেছিলেন সেই ধারাটিই আমাদের পিতা নিজের সংসারেও অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার বেলায় এর খুব একটা সুফল হয়নি বলেই আমার ধারণা। অন্য ভাইবোনদের বেলায় কার যে ঠিক কি হয়েছে তা নিয়ে এই পরিণত বয়সে একবার খোলাখুলি আলোচনা করলে মন্দ হয় না। তবে ওরা কেউই নিজের সংসারে ঈশ্বরভাবনার ঐ ধারার প্রচলন যে করেনি এটুকু জানি।

আমাদের ঈশ্বরমুখী করার এতখানি সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও ষোল বছর বয়সেই আমি ঈশ্বরকে হারিয়েছি। আজ তেষট্টি বছর বয়সেও তাঁকে ফিরে পাইনি। পাবার যে কোনো তাগিদ ভিতর থেকে ছিল এমন কথাও বলতে পারব না। তাই পাবার চেষ্টাও করা হয়নি আজ পর্যন্ত—যদিও জীবনযন্ত্রণা বলতে যা বোঝায় তার অংশও কম জোটেনি ভাগ্যে এবং সেসব সহ্য করার জন্যও ঈশ্বরের ওপর বা অতিপ্রাকৃতের উপর নির্ভর করার কথা কখনো মনে হয়নি। তবে কৈশোর উত্তীর্ণ হতেই ঈশ্বরকে হারাবার যে তাৎক্ষণিক কারণ ঘটেছিল—অন্তত বাইরের যে কারণটা আমি মনে করতে পারি তার উল্লেখ করব এখানে। আগেও নানা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কয়েকবার করেছি।

তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকের কথা। রাত দশটার পর অন্য সব কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে বাবা আমাকে খানিকক্ষণ অঙ্ক, সংস্কৃত ও ইংরেজী পড়াতেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই সেই পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছিল। একটু রাত পড়তেই এক দিকের যুদ্ধ-ঘোষণা শুরু হত 'জয় বজরঙ্গবলী কী জয়' রবে। অন্যদিক থেকে 'নারা-এ তকবীর' শোনা যেত 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে। ইতিপূর্বে কলকাতার সেই নিদারুণ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' আর নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে গিয়েছে। তখন তার 'বদলা' চলছে বিহারে। আমাদের পাটনা শহরে হানাহানি তত বেশি হয়েছিল বলে মনে পড়ে না কিন্তু তীব্র উত্তেজনা আর আতঙ্ক বেশ কিছুকাল ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি হয়েছিল বলে মনে পড়ে না কিন্তু তীব্র উত্তেজনা আর আতঙ্ক বেশ কিছুকাল ছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি করে আমাকে যন্ত্রণা দিত পত্রিকায় দাঙ্গার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং সেইসব বৃত্তান্ত নিয়ে জনে জনে দলে দলে বসে আলোচনা। এই ব্যাপারটা আরো ছয়-সাত মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছিল যখন মুসলিম লীগ ডিরেক্ট অ্যাকশানের ডাক দেয়। এইসব আলোচনা প্রায়ই একটি অমানবিক সিদ্ধান্তে এসে শেষ হত 'ঐ জাতকে বিশ্বাস নেই।' তখন চিনতাম না তবু অনুমান করেছিলাম এবং পরে নিশ্চিত জেনে ছিলাম যে অপর পক্ষের সিদ্ধান্ত অবিকল একই ছিল এবং আজও এর পরিবর্তন হয়নি কোনো পক্ষেই।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পারিবারিক শিক্ষার কারণেই হোক অথবা আমার ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলেই হোক ঐ বিরোধ-বিদ্বেষের ঘটনায় কোনো বিশেষ জাতকে এক তরফা দোষী করতে আমার মন রাজি হত না। অবশ্য সেই সময়ে আমাদের আবহাওয়ায় যে ভয়, ঘৃণা, অবিশ্বাস আর প্রতিহিংসা ছিল তা যে আমার মনকেও মাঝে মাঝে অভিভূত করত না একথা বলতে পারব না। কিন্তু ঐ বীভৎস ঘটনাগুলির বর্ণনা আমাকে যত বিচলিত করত ততই ভাবাত।

এক তো মনে হত, ধর্মের নামে মানুষ যদি পশুরও অধম আচরণ করে তবে এই ধর্মের প্রয়োজন কি? বরং ধর্মই যদি এতখানি অমানবিক আচরণ করতে উৎসাহ দেয় তাহলে তো ধর্ম মানুষের ক্ষতিই করে, মঙ্গল করে না! তাহলে তো এমন ক্ষতিকর আচরণ আর বিশ্বাসগুলিকে যত তাড়াতাড়ি মানুষের সমাজ থেকে দূর করে দেওয়া যায় ততই মানুষের মঙ্গল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বলতে শুনতাম যে ধর্মের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে পারলে তবেই মানুষে মানুষে বিরোধ আর হানাহানি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কি করে যে সংকীর্ণতার ঐ প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলে সব মানুষকে সমবেত করা যায় তা ভেবে পেতাম না, আজও পাই না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকবে, নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ অহঙ্কার থাকবে অথচ এই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, এ কি করে সম্ভব?

তাছাড়া ঐ বয়সে ঈশ্বরের প্রতি এক তীব্র অভিমান ও ধিক্কার জাগত মনে। কারণ একটা প্রশ্ন ক্রমাগতই মনে আসত। এই জগতে সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, একটি ঘাসও যদি তাঁর ইচ্ছা বিনা না গজায়, তাহলে এইসব নৃশংস অত্যাচার আর নরহত্যাও তো তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে চলেছে। হায় হায়, তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের এই দুঃসহ আত্ম-অবমাননা? তাহলে ঈশ্বর তুমি কেন আছ? যা আমাদের কাছে এতই বীভৎস, এতই অসহনীয় মনে হয় সেসব ঘটনা কেন পরম করুণাময়, কল্যাণময় ঈশ্বরের পৃথিবীতে ঘটে? এইসব ঘটনা আর ভাবনা আমাকে কিছুকাল যেন হতবুদ্ধি করে রেখেছিল। ক্রমে ঈশ্বরে আস্থা স্বধর্মের প্রতি বিশেষ মমতা ও নির্ভরতা—এই দুয়েরই ভিত নড়ে গিয়েছিল।

এখানে বলা দরকার যে ঈশ্বরের প্রতি আমার তৎকালীন বিশ্বাস ও আস্থাটা যে সম্পূর্ণ বাইরে থেকে চাপানো বলে বোধ করতাম তা কিন্তু নয়। বরং কৈশোরে কিছুকাল একটা ধর্মীয় আবেগ বোধ করেছিলাম যা একান্তই সত্য ও ব্যক্তিগত। ঐ সময়ে স্বদেশী ভাবধারা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রায়ই নানা উপলক্ষে স্বদেশী কুটিরশিল্প প্রদর্শনী হত। একবার ছুটিতে 'দেশে' অর্থাৎ পূর্ববাংলায় বেড়াতে গিয়ে নেত্রকোণায় ঐরকম একটি প্রদর্শনী দেখেছিলাম। সেখানে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের দোকানে শ্রী চৈতন্যের একটি মূর্তি এমন মন কেড়েছিল যে মা ঐটি কিনে দিয়েছিলেন আমাকে। মূর্তিটি এক বিঘতের বেশি উঁচু ছিল না। হাল্কা সুন্দর গড়ন। খুব যত্ন করেই পাটনায় নিয়ে ফিরছিলাম। তবু একটি উদ্বাহু ভেঙে যাওয়ায় কী দুঃখ হয়েছিল আজও মনে আছে! গেরুয়া গঙ্গামাটির সাহায্যে কোনোরকমে সেটি জোড়া লাগিয়ে রেখেছিলাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তখন তো আর ডেনড্রাইট কি ফেবিকল ছিল না। কিন্তু ঐ বাহু ভাঙা মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়ে চেয়েই ভক্তিরসে আমার মন ভরে উঠত। কিছুকাল ধরে ভোরবেলায় উঠে ফুল তুলে তাঁর পূজাও করেছিলাম। একটা অনির্বচনীয় আনন্দের ভাব মনে জাগত। অবশ্য ঐ বারো-তেরো বছর বয়সে বচনের উপর খুব একটা দখল তো ছিল না, তাই অনির্বচনীয় বললে হয়তো খুব কিছু বলা হয় না। কিন্তু এটুকু এখন বুঝে পারি যে তখনকার মনের ভাবটা ছিল অনুরাগের। গৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগ জাগাটা অবশ্য মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না ঐ বয়সে।

তাছাড়া মীরাবাঈয়ের কাহিনীও ছিল মনের পটভূমিকায়। 'তাপসী' নামে একটি বই ছিল বাড়িতে। ভাল লাগত বলেই কত বার যে পড়েছি বিভিন্ন ধর্মের ও নানা দেশের ঐ তাপসীদের কথা! তাঁরা কিছুকাল আমার মনকে খুব অধিকার করে রেখেছিলেন। তাঁরা অনেকেই সংসারযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছিলেন বুঝতে পারতাম কিন্তু যন্ত্রণাটা যে ঠিক কী জাতীয় এবং কতটা তীব্র তা সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারতাম না। এদিকে নিজের সংসারযন্ত্রণাটা (মা-বাবার শাসন ও গৃহশিক্ষকের উৎপীড়নের ফলে) তখনো সংসার-ছাড়া করবার মতো প্রবল তো হয়নি। তবু সংসাগ ত্যাগ করে এই তাপসীদের সন্ন্যাসগ্রহণ করাটা মনকে খুব টানত। এঁরা যে সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে—অতএব অনুকরণযোগ্য এরকম একটা বোধ তো ছিলই।

যথার্থ ধর্মভাব বলতে যদি এমন কিছু হয় যা কেবল আপ্তবাক্য দিয়ে গড়া কতগুলি বিশ্বাস আর আচরণ নয়, বরং একটা নিবিড় প্রশান্ত উপলব্ধি যা জগৎসংসারের প্রতি মনকে প্রসন্ন ও সশ্রদ্ধ রাখে তবে সে জাতীয় একটি অনতিস্ফুট অনুভব বছর পনেরো বয়স পর্যন্ত আমার মধ্যে যে ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ভক্তের ভাষায় বলা যায় ঈশ্বরের 'উপস্থিতি' অন্তত কিছুকাল অত্যন্ত স্থূলভাবে হলেও অন্তরে অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এই উপলব্ধি যে ঐ প্রাতঃকালীন চরিত্রগঠন-সংক্রান্ত ব্যায়ামের ফলে ঘটেছিল তা আমার মনে হয় না।

নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলনের চেয়ে উদাহরণ বেশি ফল দেয় বলে আমারও বিশ্বাস। পিতার ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবনযাত্রার অলক্ষ্য প্রভাব বরং আমার উপর কিছুটা পড়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁর সযত্ন প্রয়াসে আরোপিত ধার্মিক ভাবনা ও শৃঙ্খলাকে আমি অল্প বয়সেই প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহী হয়েছিলাম। এই ব্যর্থতা উভয় পক্ষেই বেদনার। আমার সেই আচরণে অপরিণত বয়সের অসহিষ্ণুতাই বেশি ছিল। সুচিন্তিত কোনো বিকল্প পন্থা খুঁজে পাওয়া সেটা নয়। ক্রমে বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ধোপে অসহিষ্ণুতা অনেকখানিই কেটে গিয়েছে মনে হয়। কারণ ঐ বিদ্রোহের রঙটা কাঁচা ছিল। কিন্তু জীবনের তাপে যে মনোভঙ্গিটা দিনে দিনে পোক্ত হয়েছে সে হল ঈশ্বর বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আর সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে একটা গভীর বিতৃষ্ণা।

এই ধরনের একটি নিরীশ্বর মন মৃত্যুর মুখোমুখি হলে কি জাতীয় আচরণ করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে কথাই একটু বলব ভেবে কলম ধরেছিলাম। কিন্তু বিরাট একটা মুখবন্ধ হয়ে গেল যার নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পাঠকের ধৈর্য ধরে পড়বার আগ্রহ কেন থাকবে বুঝতে পারছি না। তবু লেখার ঝোঁকে লিখে ফেলেছি।

জীবনের নানা আঘাত সহ্য করবার জন্য তো বটেই, মৃত্যুর সঙ্গেও একটা ভদ্ররকম রফা করবার জন্যও নাকি ঈশ্বরের আশ্রয় প্রয়োজন হয়। মৃত্যু যে সর্বগ্রাসী নয়, মৃত্যুতেও যে সবকিছু নস্যাৎ হয়ে যায় না বরং "অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে'—এমন একটা বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলে মানুষ মস্ত একটা ভরসা পায় নিশ্চয়ই। নীরন্ধ্র অন্ধকার সুড়ঙ্গটির ঐ পারে যেন আলো দেখতে পায়। এই তৃষিত মরু পার হয়ে অবশেষে একদিন ছায়াময় এক মরুদ্যানে পৌঁছবার ভরসা থাকে।

এভাবে যাঁরা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারেন, 'ইতনা তো করনা স্বামী জব প্রাণ তনসে নিকলে/গোবিন্দ নাম লে কর ফির প্রাণ তনসে নিকলে'—তাঁরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে জনৈক পরিচিত এক পাষণ্ড স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল যে তার সরল-স্বভাবা সাধ্বী স্ত্রীটির গভীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে প্রথম থেকেই তাকে প্রবঞ্চনা করে চলেছে বলে আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু স্ত্রীর মনে কোনো সন্দেহ জেগেছে বলে এখনো মনে হয় না। এদিকে তাকে সবাই এত ভালবাসে যে তার ভুল ভাঙিয়ে দেবার নিষ্ঠুর চেষ্টাও কেউ কখনো করেনি। কিন্তু আমরা এই স্ত্রীকে ঈর্ষা করব, না করুণা করব?

কখনো কখনো আরো প্রবল অবিশ্বাসের কথাও মনে আসে। কোথায় বা স্বামী, কাকে বা একান্ত বিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করা! এর সবটাই কি শিশুসুলভ কল্পনার একটি মনোহর খেলা নয়? যেমন করে আমার সাড়ে পাঁচ বছরের নাতনি বলে, "মনে কর আমি যেন সিন্ডারেলা...তুমি যেন পরী...তুমি এখন আমার জন্য রাজবাড়িতে যাবার সুন্দর সুন্দর পোশাক এনে সাজিয়ে দেবে...মস্তবড় সাত ঘোড়ার গাড়ি এনে দেবে যাদুর কাঠি ঘুরিয়ে..." ইত্যাদি। কিন্তু সেও তো জানে এটা একটা 'যেন যেন' খেলা—এটা 'সত্য' নয়। খানিক বাদেই সে এই খেলাটা গুটিয়ে ফেলবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের অনুরূপ খেলায় তো 'যেন'-টাও নেই। আমার এক জেঠীমা একদিন বলেছিলেন, "এই সেদিন দুপুরে খেতে বসে হঠাৎ খুব গরম লাগছিল, ঘেমে উঠেছিলাম। রোজ তো এমন হয় না। পরে খাওয়া সেরে উঠে গিয়ে দেখি আমার ঠাকুরের আসনে গোপালের গায়ে এসে রোদ পড়েছে! 'জ্যষ্ঠি' মাসের দুপুরে কী কড়া রোদ! জানালাটা বন্ধ করে দিতে পর্যন্ত মনে ছিল না।" এসব 'ঘটনা' যাঁদের জীবনে ঘটে তাঁদের 'ভুল' ভাঙিয়ে দেবার সাধও আমার নেই, সাধ্যও আমার নেই। কিন্তু আমি সেই মোহনীয় কল্পলোকের ছাড়পত্র বহুকাল আগেই হারিয়ে ফেলেছি। কতজনের কত বিচিত্র 'অভিজ্ঞতার' কথা শুনতে পাই কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার জগতে যাবার পথ পাইনে। বিশ্বাস করতে পারিনে, অবিশ্বাস জাহির করতেও দ্বিধাবোধ করি।

আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোকটি শুধু যে তার রূপ রস গন্ধ নিয়ে আমাকে মুগ্ধই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে রেখেছে তা নয় তার কুৎসিত, বিরস, দুর্গন্ধ স্বরূপটিও নানাভাবে আমাকে প্রায়ই আঘাত করে। কখনো মনে হয়, ধন্য এই জন্ম। কখনো অতিষ্ঠ হয়ে ভাবি, কবে এই পাপের ভোগ শেষ হবে! বলা হয়তো বাহুল্য নয় যে জন্মান্তরের পাপের ভোগের কথা আমি ভাবি না। এই জন্মেরই কখনো সকারণ, কখনো বা অকারণ দুঃখের কথাই ভাবি। তার অল্প-স্বল্প হয়তো বা ব্যক্তিগত কিন্তু অনেকটাই পরিচিত কিংবা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষেরও নিরুপায় দুঃখ-ভোগ। অবশ্য আমি জানি যে অনেকেই বলবেন যে যা আপাতদৃষ্টিতে অকারণ বলে মনে হয় তাও অকারণ নয়। আর সেই কারণেরও 'বুদ্ধিগ্রাহ্য' ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন হবে না যদি আমরা ইহজন্মের সীমানাকে দুদিকেই অতিক্রম করে জন্ম-জন্মান্তরের সম্ভাবনাকে মেনে নিতে রাজি থাকি। কিন্তু এভাবে ইহ-জাগতিক- কার্য-কারণ শৃঙ্খলার মধ্যে জন্মান্তরের নৈতিক অভিপ্রায় আর পরিকল্পনা দেখতে পাবার জন্য এবং এই জন্মের নিদারুণ কষ্টকর ক্যান্সার রোগের 'কারণ' পূর্বজন্মে কৃত কোনো পাপের মধ্যে সন্ধান করতে যাওয়ার জন্যও যে কল্পনাপ্রসূত 'দূরদৃষ্টির' প্রয়োজন হয় তাও আমি কৈশোর অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে বসে আছি।

ফলে আমার এই জীবনটা আর জগৎটা হয়তো অনেকের তুলনায় বড়ই সীমিত। অথচ অন্য দিকে দেখি আমার এই কটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এই মনটুকু দিয়েই যতখানি নিতে পারি তার তুলনায় কত ক-ত যে বিরাট এই জগৎটা তার তো অন্ত পাই না। তাছাড়া কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ যে মনোলোকের সৃষ্টি করে চলেছে তারও তো শেষ পাব না এই একটা জীবনে। সে সাহিত্য হোক, দর্শন হোক, শিল্প কি বিজ্ঞান—তার কোনো একটি ক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের একটা স্পষ্ট ধারণা করতেও তো এই একটা জীবনে কুলোবে না। তাহলে এসব ফেলে, হাতের কাছে যে নিশ্চিত 'লাভের' সম্ভাবনা আছে তার দিকে মন না দিয়ে অনিশ্চিত কিসের আশায় ছুটব? এই তো আমার ধ্রুব। অধ্রুবের পিছনে ছুটোছুটি করে দমটা ফুরিয়ে ফেলে কি লাভ হবে? আমার প্রতিটি দিন, আমার জাগরণের প্রতিটি মুহূর্তও যদি আমি এই অধিগম্য জগৎটাকে নিয়েই ডুবে থাকি তবু তো তার ক্ষুদ্র এক কণার বেশিও জানা হবে না। তাই তো জেনে জেনে আমার শেষ নেই, ক্লান্তি নেই।

আবার আমার এমন কোনো অতৃপ্তি বা অভিযোগও নেই যে আমার যা উচিত প্রাপ্য ছিল তা এখানেই, এই জীবনেই পাওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য তারও যে অনেকটাই পাওয়া হয়নি, কোনো দিন হবে না, তার কারণ রয়েছে অন্যত্র। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিছুটা কারণ রয়েছে আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতির নানা অক্ষমতা—অপূর্ণতার মধ্যেই, কিছুটা রয়েছে মানুষমাত্রেরই স্বভাবের সেই আত্মখণ্ডনের মধ্যে যার জন্য সে যা চায় তার সবটুকু পাওয়া কোনো দিনই সম্ভব নয়, আবার যা সে পায় তাও দুদিন পরই সে আর চায় না।

তবে এসব উল্টোপাল্টা ঘূর্ণিপাকে, এলোমেলো কিছু ধারায় নাকানি চোবানি না খেলে, কিছুটা হা হুতাশ জ্বালা যন্ত্রণা না থাকলে জীবনটা বড় দুর্বহ রকম এক ঘেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ভাল' হয়ে উঠত। ঐসব আছে বলেই তো অহরহ সেই 'স্বর্গীয় অতৃপ্তি' কী যেন পাইনি, কী যেন হল না। এই সবকিছু নিয়েই আর পাঁচজনের মতই আমারও এই আমি। আবার সবটুকু 'আমি' অন্য কারুরই মতো নয়। নিতান্তই 'নিরালা' নিজের মত ভিন্ন। কিছুটা তার পছন্দসই, কিছুটা বড়ই বিরক্তিকর।

আমার এই 'আমি'কে যে অনেকটাই বুঝতে পারি না একথা ঠিক কিন্তু যতটুকু বুঝলে একে নিয়ে এক রকম ঘর করা যায় ততটুকু তো বুঝি বলেই মনে হয়। আবার স্বভাবের যে সব খোঁচি-খোঁচি ব্যাঁকা ত্যাড়া থাকলে মাঝে মাঝেই রগড়ানি খেতে হয়, নুন ছাল উঠে যায়, জ্বালা ধরে—সে সবও কি নেই? যথেষ্টই আছে। সেগুলিকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে একটা পছন্দসই মসৃণ 'আমি' যে তৈরি করে নেব তেমন ইচ্ছা থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না দেখি। বুঝতে পারি যে আমার কিছুটা 'আমি' আছে যা বেশ বেয়াড়া, আমার হাতের বাইরে, সহজে পোষ মানে না, বশ হয় না। তাকে নিয়ে নিজেও কষ্ট পাই, অন্যদেরও কষ্ট দিই মাঝে মাঝে।

যাই হোক এই যে ভালয়-মন্দয় মেশানো 'আমি'-টা এর সবচেয়ে বেশি স্ফুরণ আর পরিতৃপ্তি হয় দেখি অন্য মানুষের ভিতর দিয়ে। আমারই মতন জনাকয় মাঝারি মাপের মানুষ নিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ নিয়ে আমি এরকম বেশ থাকি। খুব বেশি ভিড়, বেশ জমজমাট হৈচৈ—বৃহৎ আকারের একটা 'কর্মযজ্ঞ' যাকে বলে—সেসব আমার ধাতে সয় না। এক সময়ে সাধ হয়েছিল বটে যে অনেককে নিয়ে অনেক মস্ত করে কিছু একটা করব। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে তার হাঙ্গামা সামলানো আমার স্বভাবের পক্ষে বেশ কষ্টকর। এক তো হৈ-হট্টগোল আমার বেশিক্ষণ ভাল লাগে না। তায় আবার নানা জনের নানা মত হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। অথচ ঐ নানা মতের সঙ্গে পা মিলিয়ে এক লক্ষ্যের দিকে চলা প্রায়ই বড় কঠিন হয়ে পড়ে। তখন টানা-পোড়েনে জেরবার হয়ে শেষ পর্যন্ত দেখি কাজের কাজ প্রায় কিছুই হয় না। মান-অভিমান রেষারেষিতেই সব শান্তি উড়ে যায়।

বর্তমানে গণসংযোগের নানা মাধ্যম তো চোখ-কানের গোড়ায় রয়েছেই। তাই কতই না উপদেশ নিত্যদিন শুনতে পাই

"হরিভজন বিনা সুখ শান্তি নহীঁ
হরিনাম বিনা আনন্দ নহীঁ....."

কিন্তু মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হরিভজনে মগ্ন হয়ে যে আনন্দে থাকব তারও তো তাগিদ নেই ভিতর থেকে। সেই ভিতরের আকুলতা না থাকলে বাইরের উপদেশে কি হবে?

নিবোধত, বর্ষ ৮ (১৪০১), সং ১, পৃঃ ৫২-৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বর, মৃত্যু, মানুষ—ইত্যাদি ভাবনা ঃ ২

এ কালের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, যিনি দমদমের জেসপ ফ্যাক্টরীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বহু বৎসর জেলে ছিলেন সেই পান্নালাল দাশগুপ্ত গত ত্রিশ বছর ধরে গান্ধীবাদী গ্রামীণ পুনর্গঠনের কাজ নিয়েই আছেন। কয়েক বছর আগে হঠাৎ একদিন তাঁর মুখে শুনে বিস্মিত হলাম, "সব কিছু ছেড়েছুড়ে নিজের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান ভুলে যদি দেশের কাজ, দশের কাজ করতে হয় তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস খুব দরকার। তাতে ভিতর থেকে জোর পাওয়া যায়।"

"ঈশ্বরে বিশ্বাস দরকার বলেই ইচ্ছামতন বিশ্বাস করা যায় কি? এ তো made to order ব্যাপার নয়। যাকে বিশ্বাস করব তার প্রতি একটা আস্থা আপনা থেকেই প্রথমে সৃষ্টি হবে তো? নইলে দরকার পড়লেই ফরমাইস দিয়ে কি একটা বিশ্বাস গড়ে নেওয়া যায়? না নিলেই হল?"

না, ঠিক সেকথা তিনি বলছিলেন না। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে, সমস্ত কীর্তি-অকীর্তি তাঁকেই সমর্পণ করতে পারলে সার্থকতা-ব্যর্থতাকে সমানভাবে মেনে নিয়ে অবিচল থেকে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অর্থাৎ সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকা কিছুটা সম্ভব হতে পারে। মনে হয়েছিল যেন ঐরকম একটা বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মনোভাব তাঁর মধ্যে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে। বহুকাল তো তিনি ঘোর মার্কসবাদী ছিলেন। মার্কসবাদী তত্ত্ব আর কর্মপন্থায় পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে সমাজ-বদলের সশস্ত্র চেষ্টা করেছিলেন।

পরে দীর্ঘ কারাবাসের কষ্টকর কিন্তু নিভৃত আশ্রয়ে যখন আত্মসমালোচনা ও দূর থেকে তাঁর প্রাক্তন কর্মপন্থাকে নিরাসক্ত পর্যালোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তখন ক্রমে তাঁর ভাবনা-চিন্তায় বেশ মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। কানা গলি থেকে বার হয়ে আসার জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু তখনো ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলেন বলে মনে হয় না।

তাঁর ঈশ্বরে অবস্থান অথবা প্রত্যাবর্তন বোধহয় পরবর্তী অভিজ্ঞতার ফল। নানা মানুষকে নিয়ে, এমন কি নকশাল যুগের প্রাণ নিতে ও দিতে প্রস্তুত এবং সে-সময়ে সর্বত্যাগী দু-একজন যুবককে সহযোগী হিসেবে নিয়ে সমাজগঠনের কাজে নেমে তাঁকে অনেক আঘাত পেতে হয়েছিল। মনুষ্যচরিত্র বিষয়ে নতুন করেও যথেষ্ট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মোহমুক্তি ঘটেছিল। সশস্ত্র বিপ্লব যেমন এক ধরনের চারিত্রিক বিকার ঘটায় তেমনি আবার সংগঠনের কাজে নেমে দান-অনুদানের প্রাচুর্যও অন্যরকম নৈতিক বিকার সৃষ্টি করে। দুদিকেই সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন হয়। পান্নাবাবু তাই বড় দুঃখের সঙ্গে একবার বলেছিলেন, "কাজ করতে নেমে দেখলাম আর সব রিসোর্স জোগাড় করা কঠিন নয়। ব্যাঙ্ক লোন, ফরেন ডোনেশান সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু খাঁটি হিউম্যান রিসোর্সই সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য।" আবার অন্য রিসোর্স বেশি হতে পেলে হিউম্যান রিসোর্সে দ্রুত পচন ধরে।

এইসব হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার ফলেই বোধহয় মানুষের দিক থেকে তাঁর মুখ কিছুটা ঈশ্বরের দিকে ফিরেছে। নয়তো মানুষকে সহ্য করাও বোধহয় কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবশ্য তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ হয়নি। এর অনেকটাই আমার অনুমান। তাঁর সাম্প্রতিক কিছু দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা যতটুকু জেনেছি তারই ভিত্তিতে অবশ্য এই অনুমান।

কিন্তু আমার নিজের তো সেইসব কঠিন অভিজ্ঞতা এখনো হয়নি। উনি যেমন করে সব ব্যক্তিগত চাহিদা বিসর্জন দিয়ে, অন্য মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা না করে সেবার কাজকে গ্রহণ করেছেন তেমন তো আমি করিনি। আমি তলারও কুড়োচ্ছি, গাছেরও খাচ্ছি। ওঁর মতন সব ছাড়তে হলে, অন্য মানুষের উপর দাবি প্রত্যাহার করতে হলেই হয়তো ঈশ্বরকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আরো বেশি হয়—গ্রহণ করা সম্ভবও হয়। তখন তুমি ছাড়া 'আর কেহ নাই, কিছু নাই'! কিন্তু এই বোধটাও যে ভিতর থেকেই আসবার জিনিস। বাহির থেকে হাত পেতে গ্রহণ করার তো নয়, তা সে পান্নালাল দাশগুপ্ত হাতে তুলে দিলেই বা এবং যতই কেন না তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকুক।

ঘুরে ফিরে যে কথায় আসছি সে হল ঈশ্বর আমাকে আজও ধরা দেননি। তা-ই যদি হয় তবে বিপদে-সম্পদে কাকে আমি অংশী করতে চাই, কার উপর নির্ভর করি? কেন, মানুষের উপর! হ্যাঁ, নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই উপর। দোষ-ত্রুটি ভুলচুকে ভরা আমারই মতো যেসব মানুষ আমার চারদিকে আছে তাদেরই উপর। তাদের কেউ কেউ হয়তো কোনো দিকে অসামান্যও বটে। কিন্তু সেটা আপতিক। তেমন গুণবান না হলেও হৃদয়বান হতে তো বাধা নেই। আমার সুখে দুঃখে তারাই নির্ভর। তারা কখনো শান্তি দেয়, কখনো দুঃখ দেয়। সে তো ঈশ্বরও দেন। তারা কেউ কখনো কিছু অপ্রত্যাশিত পুরস্কার দেয়, কখনো বা প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত করে। ঈশ্বরের প্রসাদও তো নিরন্তর বর্ষিত হয় না। কখনো তাদের প্রতি গাঢ় অনুরাগ, কখনো বা তীব্র বিরাগ বোধ করি। কিন্তু তারাই তো আমার নাগালের মধ্যে রয়েছে।

কিন্তু কখনো সখনো সেইসব চরম মুহূর্ত আসে যখন কেউই আর ঠিক নাগালের মধ্যে থাকে না, থাকতে পারে না। সবই যেন মুঠি থেকে আলগা হয়ে যায়। সেই মুহূর্তে আমি একান্ত একা...পাশে বসে থাকা মানুষটিও আসলে বহু দূরে...কাউকেই তখন আমি তার সঙ্গে পেতে পারি না। মৃত্যুর মুখোমুখি সজ্ঞানে দাঁড়াবার সময় মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এভাবে সম্পূর্ণ একা। সেই অতল অন্ধকার গহ্বরে একাই পা বাড়াতে হয়। অবশ্য রুমালে হাতে-হাত বেঁধে যখন তরুণ প্রণয়ীরা লেকের জলে ঝাঁপ দেয় কিংবা অনারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ আর্থার কোয়েসলার এবং তাঁর তরুণী স্ত্রী যখন একসঙ্গে euthanasia বা স্বেচ্ছামরণ বরণ করেন তখন হয়তো সেই একাকিত্বের অসহায়তা থাকে না। অথবা রাজপুত রমণীদের জহরব্রত সম্ভবত এমন একটা মরণ উৎসব যা নির্জন নিরালোক পথে অনিচ্ছুক একা মানুষের নিরুপায় যাত্রা নয়।

বেশির ভাগ মানুষেরই তো সেই সৌভাগ্য হয় না। মৃত্যুকে আমরা একা একাই পাই, পেতে হয়। এই এক অদ্ভুত ঘটনা যার কোনো অভিজ্ঞতা হয় না, যা ঘটে তা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুভব। জীবনের এই সবচেয়ে চরম ঘটনাই যে কোনো অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেয় না। এ এক ভয়ানক বঞ্চনা, ভীষণ অন্যায় ব্যাপার বলে মনে হয় আমার। যখন আমি সম্পূর্ণ 'না' হয়ে যাচ্ছি, নিজের এই নিরস্তিত্বের কোনো বোধই আমার হবে না, এ এক বিষম প্রবঞ্চনা নয় কি? সম্প্রতি মৃত্যুকে সন্নিকটে অনুভব করার আর একবার সুযোগ ঘটেছিল, অভূতপূর্ব আশ্চর্য কিছু নয়, এমনটা প্রায়ই অনেকের ঘটে এবং ঘটা ভাল। আকস্মিক মৃত্যুটা একদিক থেকে দেখলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ একটা ব্যাপার। অপ্রত্যাশিত মৃত্যু মস্ত এক অপচয়। কারণ আসন্ন মৃত্যুর মতন চরম একটি ঘটনার কোনো নৈতিক সুফলই তখন লাভ হয় না। অথচ মৃত্যু আসন্ন একথাটা সজ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারার চমৎকার সুফল হতে পারে, হয়ও। যদি অবশ্য ভয়ে দুঃখে আত্মহারা হয়ে নিজের প্রতি করুণায় আমরা মুহ্যমান না হয়ে থাকি।

আসন্ন মৃত্যুকে নিশ্চিত অনুভব করে যদি শান্ত চিত্তে নিজের অবসিতপ্রায় জীবনটাকে দ্রুত একবার বিচার করে নেবার, তার সার্থকতা-ব্যর্থতার নির্মোহ খতিয়ান করবার মতো মনের স্থৈর্য থাকে তবে এই শেষ সীমান্তে সজ্ঞানে এসে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতাও স্বাস্থ্যকর হতে পারে...যদি অবশ্য সেই অভিজ্ঞতার কথা অপর কাউকে শুনিয়ে যাবার সুযোগ ঘটে। নিজের সম্বন্ধে যে নিরাসক্ত মূল্যায়ন এই সময়ে সম্ভব হয় তার যদি অল্প কিছু সুফলও স্থায়ী হয় অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারের কাছে এসেও যদি শূন্য হাতে ফিরে যায় এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তার মুখ যে একবার আভাসেও দেখা গেল তারও উপকার কম হবে না, যদি অবশ্য মন তা গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এতকালের আসক্তিগুলিকে তখন উদাসীন চোখে দেখে নিয়ে কোনটা রাখব আর কোনটা ফেলব তার একটা হিসেব করে নেওয়া সম্ভব হয়।

অবশ্য মৃত্যুর সঙ্গে এই ক্ষণিক মোকাবিলার 'অপ্রিয়' স্মৃতিকে দ্রুত ভুলিয়ে দেবার জন্য জীবনের ভাণ্ডারে লোভনীয় আয়োজনের কোনো অভাব নেই। ঐ চরম মুহূর্তে যা পরম মূল্যবান মনে হয়েছিল, আর যা মনে হয়েছিল নিতান্তই তুচ্ছ, পরেও যে সেইসব 'গুণ-অবগুণের' বিচার সেভাবেই মনে রেখে সেই অনুযায়ী জীবনটার পুনর্বিন্যাস করে নিই আমরা তা কিন্তু প্রায় ঘটে না—তবে ঘটা সম্ভব। ঘটলে ভাল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হয়। অবশ্য আমারও যে খুব একটা ঘটেছে সে দাবিও করতে পারব না।

তবু নিজেকে সেই যে এক চরম মুহূর্তে নিরাসক্তচিত্তে মূল্যায়ন করেছিলাম তার যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব তা ধরে রাখতে পারলে আমার যে উপকার হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাতে করে এত কালের ভুলভ্রান্তির, অনড় অভ্যাসের কিছুটা হয়তো শোধন হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধরে রাখাটা সহজ নয়, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বার বার সেই মুহূর্তটি স্মরণ করে ভেবে দেখতে হবে কী তখন মনে হয়েছিল।

যাই হোক আমার বেলায় ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছিল দুই এক দিন ধরে অহরহ মনের মধ্যে বাজছিল, "এ যাত্রা আর রক্ষা নেই।" তখন মনকে বলেছিলাম, "রক্ষা না থাকলেই বা ক্ষতি কি? যা হয়েছে, যা করেছ এর চেয়ে এমন কি আর ভালর আশা কর আরো বেঁচে থাকলেও যদি আরো দশ বছর বাঁচ অথবা বিশ বছরও তাহলেও এমন আর কি একটা হয়ে উঠবে বল তো? তার চেয়ে আলোয় আলোয় বিদায় নিলেই কি বেশি শোভন হয় না? আরো কিছুকাল মাটি কমড়ে পড়ে থেকে আরো খানিক হতমান হয়ে লাভ কি? এখনই তো বিদ্যেবুদ্ধি স্বভাবচরিত্র নিয়ে ঘরে বাইরে সন্দেহ জাগছে। ভাল রকম খোয়ার না হওয়া অবধি বুঝি মন উঠছে না?"

প্রথমেই স্বীকার করে নিই যে যাই যাই করেও খসে না-পড়ার সপক্ষে যথেষ্ট অজুহাত আমার হাতে নেই। এমন কোনো কাজ আমার সত্যিই পড়ে নেই যা আমি না করলে আর কেউ করতে পারবে না কিংবা না করলে কেউ বলবে যে; আহা মস্ত একটা ফাঁকা রয়ে গেল। অথবা আমি না থাকলে কেউ মনে করবে, অমুক থাকলে এটা কত ভালমত হত। অবশ্য আমার মন শীতল হবে এমন করে আমাকে টেনে বলার কেউ নেই তা নয়, সে আছে। কিন্তু আমি মানুষটা চলে গেলে জীবনটা ফাঁকা হয়ে যাবে, একটা দাঁত পড়ে গেলে জিভের ডগায় থেকে থেকেই যতখানি শূন্যতার বোধ হয় ততখানি হবে এ আশা কি সত্যিই করা যায়?

তেমন করে ভিতরটায় কারুরই হু হু করবে না। সেটাই স্বাভাবিক। বন্ধুবান্ধব, আপনজন কম তো হারাইনি। মনে পড়লে মাঝেমাঝে ভিতরটায় মোচড় দিয়ে ওঠে ঠিকই, তবে তাই বলে তো আমার অন্ন-জল বিস্বাদ হয়ে যায়নি! প্রায় সবই তো একই রকম রয়েছে জীবনে। কার জন্যে কতটুকুই বা ছেড়েছি? অবশ্য গলায় শেকল দিয়ে ঝোলানো একটা ভারি পাথরের মতো একটা দুর্ভার বিষাদ শুধু মাঝে মাঝে অতলে টেনে নামিয়ে নিতে চায়। দম আটকে আসে। কিন্তু তখনই আবার ঝটাপাটি করে নিজেকে ভাসিয়েও তুলি। শ্বাস নিই। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসি। অন্যদেরও তো আমি না থাকলে আমার জন্য এই রকমই হবে। এর বেশি আর কী হতে পারে!

তাই কোর্ট আঁকড়ে এখানে পড়ে থাকার মতো যথেষ্ট কারণ নেই একথা আমাকে মানতেই হবে। তবু মিনু মাসানীর মতো যাঁরা স্বেচ্ছামরণকে আইনসঙ্গত করতে উদ্যোগী তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারছি না সে শুধু তাদের কথা ভেবে যাদের এমনিতেই অহরহ গঞ্জনা শুনতে হয় "মরতে পারো না, মরে অন্তত মুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দাও না আমাদের।" স্বেচ্ছামরণের আইন হয়ে গেলে সেই দুর্ভাগাদের তো মুখ লুকোবার জায়গাটুকুও থাকবে না কোথাও। কিন্তু মনে মনে euthanasia-কে আমি সমর্থন করি। নিজের জন্য এটাই সবচেয়ে সম্মানজনক নিষ্ক্রমণের পথ বলে মনে হয়। কিন্তু অপরের জন্য নয়, প্রিয়জনের জন্য তো নয়ই। তারা কেউ এটা বেছে নিক এটা ভাবতেও ইচ্ছা করে না, যদি না অনারোগ্য অসহ্য শারীর যন্ত্রণায় কষ্ট পায়।

যে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গেই বলি মরণ বিষয়ে কোনোরকম বাড়াবাড়ি আবেগ আমার নেই। মরণকে এখনই চাই না মোটেই, আবার মরণ যদি হঠাৎ এসেই পড়ে তবে যে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব তাও নয়। তবে যখনই আসুক মরণকে আমি চূড়ান্ত অবসান বলেই জানি। সদর্থক যা কিছু আমার জীবনকে ধারণ করে আছে তার সবই যে মরণে নিঃশেষ হয়ে যাবে এ বিষয়ে আমার মনে সামান্যতম সন্দেহ-ও নেই। সব ইচ্ছা, সব চেষ্টা, সব অনুরাগ—যা এখন আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে মিশে আছে তার সবই যে আমার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এই জীবনটুকুই যে আমার 'চিরকাল' একথা নিশ্চিত মেনে নিয়েছি বলেই মৃত্যুচিন্তায় মনে বেশ একটা ধাক্কা লাগে। যথাযথ অর্থে সর্বনাশের সম্ভাবনায় মনে একটা চাপা 'হায় হায়' ভাব যে জাগে সে কথাও অস্বীকার করব না। আমার পরেও এই ভরা হাট এমনি থাকবে, ভেঙে যাবে না মোটেই, শুধু এর এক কোণ থেকে আমিই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব ভাবলে কয়েক ফোঁটা আত্মকরুণায় মন সিক্ত হতে থাকে।

অবশ্য তারপরেও আমার কথা কেউ ভাবল কিনা, আমার জন্য কেউ কোনো অভাববোধ করল কিনা...এসবে আর কি এসে যায়? আমিই যখন প্রিয়জনের সেই হুতাশটা 'উপভোগ' করবার জন্য থাকব না তখন সেসবে আমার কি প্রয়োজন?

এই চূড়ান্ত না থাকার ভাবনাটা অদ্ভুত এক মনের ভাব সৃষ্টি করে—শুধু আমারই করে এমন নিশ্চয়ই নয়। আমার না থাকার অভিজ্ঞতাটুকুও যদি আমার হয়ে যেত তবেই তো মনে হত যে জীবনের সবটুকুই জানা হল। হাসপাতালের ফাওলার (Fowler) বেডে একা শুয়ে জানালা দিয়ে একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্রায়ই মনে হত জীবনের এত সব আয়োজন যে অদৃশ্য এক প্রশ্ন চিহ্নে গিয়ে শেষ হবে, কী যে শেষ পর্যন্ত ঘটবে তার সবটুকুই থাকবে যবনিকার অন্তরালে...এটা কী রকম অন্যায় প্রবঞ্চনা! পরলোক বিষয়ে আশৈশব শুনে আসা কোনো মনোহর অথবা ভয়াবহ সম্ভাবনাই আমার মনে কোনো দাগ কাটছিল না। মনে হচ্ছিল যেন একটি দীর্ঘ চিত্তাকর্ষক উপন্যাস পড়তে পড়তে এসে দেখি শেষের আট দশ পাতা নেই। তখন কেমন লাগে?

এমন প্রবঞ্চনার মধ্যেও আমার সান্ত্বনা তো ছিল সেই একই—অন্য সব মানুষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা, পরলোকে আস্থাবান ব্যক্তিরা কী আশ্বাস নিয়ে যান তাঁরাই জানেন, আমি আশ্বাস পাই শয্যার পাশে দু-একটি প্রিয় মুখ দেখলে। যখন দেখি আমার কষ্ট লাঘব করতে যত্নবান, আমার না-থাকার আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ ম্রিয়মান কেউ আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, এমন কি কিছু অপরিচিত অনাত্মীয় মানুষের চেষ্টাও তাতে যুক্ত হচ্ছে তখন মানুষেরই প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার বোধ না এসে পারে না। তাছাড়া মনে একটা ভাবনা, এমন কি অহঙ্কারও আসে যে আমি তাহলে নেহাৎ আবর্জনার মতো ফেলে দেবার যোগ্য নই। যতদিন এইসব অনুভূতি আছে ততদিন মানুষের সংসারে অন্য মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যই বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। কেউই যে একেবারে ফেলনা নয় এই মহামূল্য আশ্বাসটুকু পথের মুমূর্ষু ভিখারীকেও দেবার জন্যই তো মাদার টেরিজার শেষ আশ্রয় Home for the Dying!

ঈশ্বর যখন দূরতম নীহারিকার চেয়েও সুদূর—তাঁকে যখন ভিতরে বাহিরে কোথাও পাই না সেই সময়ে শয্যার পাশে চোখে উদ্বেগ নিয়ে যে কটি মানুষ বসে থাকে তাদের চোখে যাচাই করেই নিজের অস্তিত্বকে সামান্য কিছু মূল্য দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বটে "তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা"—কিন্তু প্রায়ই যে এই তারা ভরা আকাশ, এই সকালে সোনালী আলো, বনের এই প্রগাঢ় শ্যামলিমা... এইসব কিছুকেই আমার প্রতি বড় উদাসীন মনে হয়। আমি যেদিন অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে অনিচ্ছুক চরণে বিদায় নেব সেদিনও তো এইসব এমনই হাসিমুখে চেয়ে থাকবে। আমি থাকি কিংবা নাই থাকি তাতে এই আপনাতে আপনি মগ্ন প্রকৃতির কিই বা এসে যায়। তাই ভেবে পাই না এই জগতটাকে 'আমারই' বলার কতটুকু অধিকার আছে আমার! আমাদের বাগানের যে কীট গন্ধরাজ ফুলের কুঁড়িগুলিকে কুরে কুরে খেয়ে ফুল ফুটতে দেয় না, যে যক্ষ্মার জীবাণু প্রতিদিন অসংখ্য আবালবৃদ্ধবনিতার দেহকে নিঃশেষে শোষণ করে...এই বিশ্বটা আমার যতখানি ততখানিই ঐ কীটের, ঐ জীবাণুরও নয় কি? অথবা ওদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি আমার, যেহেতু আমি 'কীটনাশক' তৈরি করতে পেরেছি আর ওরা 'মানবনাশক' তত জোরদার কিছু তৈরি করতে পারেনি? কলেরা কি ম্যালেরিয়া জীবাণুর কিংবা ক্যান্সারের পাগলা 'কোষ'গুলির যতটা অধিকার এই বিশ্বের উপর, আমার অধিকার তার চেয়েও বেশি কিনা সে বিষয়ে প্রায়ই আমার মনে প্রবল সন্দেহ জাগে।

শুনতে পাই মানুষ যখন ছিল না তখনো আরশোলারা ছিল, আবার হানাহানি করে নিজেদের ধ্বংস করবার জন্য মানুষ যেসব পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে সে সবেও আরশোলা নিঃশেষ করা যাবে না। সম্ভবত মানুষ যখন থাকবে না তখনো ওরা থাকবে। তখনো 'এড্‌স্‌'-এর ভাইরাস হয়তো অন্য কোনো প্রাণীদেহে বিরাজ করবে। তাহলে কি ঐ আরশোলার, ঐ জীবাণুর কিংবা ঐ ভাইরাসের আরো বেশি অধিকার নেই ঈশ্বরকে বলার যে, "আমায় নইলে তোমার এই লীলা অসম্পূর্ণ থাকত?"

এইসব দেখে দেখে মনে হয় উদাসীন এই বিশ্বের উপর কোনো দাবি করে লাভ কি? শুধু গুটিকয় মানুষেরই উপর যতটুকু দাবি এখন আছে তাই সত্য...হ্যাঁ, শুধু আজ এই মুহূর্তেই সত্য। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ জানে। ঐ মানুষ কটির কাছ থেকে আজ আমি যতটুকু পাচ্ছি তার জন্যই কৃতজ্ঞ আছি। তার বেশি দাবি করা বাতুলতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার ক্ষুদ্র অঞ্জলির জন্য আর কত চাই? "যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।" এই ভালবাসাটুকুই যা সত্য।

আবার আমার মনের এ-হেন সংবৃত আকাঙ্ক্ষা এবং অনীহা নিয়েও যখন কোনো উল্টো সুরের গভীর কথা শুনি মনটা খানিকক্ষণ থমকে থাকে। কথাগুলি মনকে ভাবায়। বছর আট-দশ আগে এক পণ্ডিত মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, নাম Dr. Charis Waddy। ইনি বহুকাল অক্সফোর্ডে বাস করছেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী ছিলেন। এখন তাঁর বয়স নব্বই পার হয়ে গিয়েছে। তাঁর চেয়েও বৃদ্ধা ও অক্ষম আর এক মহিলা তাঁর সঙ্গেই বাস করেন। তাঁকে দেখাশোনা করার ভারও ক্যারিস গ্রহণ করেছেন। ক্যারিস অক্সফোর্ডের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট যিনি আরবী এবং হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। পরে তাঁর গবেষণায় বিষয় ছিল আরবী ঐতিহাসিকদের ক্রুসেড-সংক্রান্ত বিবরণ।

ক্যারিসের দুটি বই আগেই তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়ে পড়েছিলাম The Muslim Mind এবং Women in Muslim History.

সম্প্রতি তাঁর একটি পুস্তিকা এক বন্ধুর হাতে পেলাম। এটির নাম Shaping a New Europe–The Muslim factor. বইয়ের মুখবন্ধেই লিখেছেন, "Islam is a major factor in European history. It has been present for 1400 years. It has sometimes threatened, sometimes enriched and always challenged European ways of life. Not everyone thinks of it as an asset. I believe it is." এই বাক্যকটি ভারতীয় ইতিহাসের পক্ষেও সত্য, কেবল সময়ের হিসাবটুকু ছাড়া। বিশেষ করে শেষ বাক্যদুটির সঙ্গে আমি একমত বলেই উদ্ধৃতিটুকু দিলাম। কিন্তু এটা আসল কথা নয় অথবা আপাতত প্রাসঙ্গিক নয়।

তাঁর যে অভিমত আমার এই আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক তা তাঁর পুস্তিকা থেকে এইবারে উদ্ধৃত করব। দুটি মহাযুদ্ধের চোট তাঁর সমসাময়িক যাঁরা কৈশোর ও যৌবনে সহ্য করেছিলেন তাঁদের কথা মনে করেই লিখেছেন, "My generation faced a turbulent and uncertain world and we wanted to do something about it. Many ideas competed for our allegiance, notably communism, later fascism. The idea that captured me was more challenging. It was simple, based on faith. God has a plan. It is a plan for the whole world. He has a part in that plan for you and for every man, woman and child on his earth. If you commit your life to Him, He will show you that plan day by day, and give you the power to carry it out." ভ্রাতৃঘাতী দুটি মহাযুদ্ধের তাণ্ডব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টান-মুসলমান-ইহুদিদের মধ্যে অন্তহীন হানাহানি, আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আরো কত কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এখনো করছেন। এখন ইউরোপের দেশে দেশে, বিশেষ করে প্রাক্তন রাশিয়ার নানা বিচ্ছিন্ন অংশে কিংবা গত আড়াই বছর ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুগোশ্লাভিয়ায় যা চলছে সবই প্রতিদিন দেখতে পাবার পরেও তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস অটল রয়েছে এবং জগদ্ব্যাপী এই জটিল নাটকে ঈশ্বর-নির্দিষ্ট তাঁর ভূমিকাটুকু নতমস্তকে প্রসন্নচিত্তে পালন করে যেতে যে প্রস্তুত আছেন এতেই আমি বিস্ময়বোধ করি। যা কুৎসিত, যা অসহনীয়, যা আমার সর্বদেহমনকে ভীষণ পীড়ন করে অথচ যা এত প্রবল যে আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে তাকে প্রতিহত করতে পারি না, সেই সবকিছুকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই ঠিকই কিন্তু প্রসন্নচিত্তে এগুলিকে গ্রহণ করি কি করে? আমার এই তিক্ত প্রতিক্রিয়া, আমার মনের এই তীব্র বিদ্রোহ... শুধু এগুলিই কি তবে সৃষ্টি ছাড়া....অর্থাৎ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তাঁর সৃষ্টি নয়? কে যেন বলেছিলেন, "আমি সেই ঈশ্বরকেই শ্রদ্ধা করি যিনি তাঁকে অস্বীকার করার অধিকারও আমাকে দিয়েছেন।"

আমিও সেই অধিকারটুকু হাতে নিয়ে মানবজন্ম লাভ করেছি। প্রকৃতির শাসনকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে না পারলেও বার বার তাঁর আঁচলের খুঁটটুকু ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন হবার অভিলাষ হয় আমার। বয়স এক বছর পার না হতেই মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে আনুভৌমিক না থেকে ঊর্ধ্বাধঃ দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি দুই পায়ের উপর। এই দুই পায়ে কতটুকু শক্তি আছে তার শেষ পরীক্ষা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত, প্রকৃতি এবং মানুষের তৈরি সমাজ আমাকে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে না ফেলা পর্যন্ত আমাকে তো এই দুই পায়ের উপর দাঁড়িয়েই মাথা তুলে থাকার চেষ্টা করতে হবে। ক্যারিস হয়তো বলবেন, বিশ্ব-পরিকল্পনায় এই আমার বিধি-নির্দিষ্ট ভূমিকা। 'তবে তাই হোক'। এই কঠিন ভূমিকাই আমার মনের মতন।

অবশ্য একটু খটকা থাকছে। ক্যারিস বলছেন যে পূর্বাহ্ণেই তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারলে ("If you commit your life to Him.") তবেই হয়তো জীবনের মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে পৌঁছে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের সেই পরিকল্পনা ও তার মাঝে আমার স্থান আমার চোখে উদ্ভাসিত হতে থাকত এবং তাতে আমার ভূমিকাটুকু পালন করার শক্তিও পেতাম। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে এসে এখন তো দেখছি হাতে আর সময়ও বেশি নেই। তাছাড়া প্রথমে পথনির্দেশপ্রাপ্তি ও তারপরে আত্মসমর্পণ অথবা প্রথমেই আত্মসমর্পণ করে তবে পথনির্দেশলাভ—এর কোনটা বেশি যুক্তিযুক্ত? এই সমস্যারও তো কোনো সমাধান পাচ্ছি না। প্রথমেই কোন শূন্যে, কোথায় কিভাবে যে নিজেকে সমর্পণ করব তারও তো কোনো হদিশ পাই না। কে বা পথ দেখাবে এই মূঢ়কে? ইহজগতের সঙ্গী না হয় মানুষ কিন্তু আমারই মতো রক্তমাংসের মানুষ কি করে আমাকে ইহজগতের বাইরে হাত ধরে নিয়ে যাবে?

নিবোধত, বর্ষ ৮ (১৪০১), সং ১, পৃঃ ১৫৮-৬৩

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিকোণ আমি ভয় করিনে

কোনো কোনো বাক্য আমাকে ভীষণ ধাক্কা দেয়। মনে হয় নিশিতে পাওয়া আমি খুব জোর হোঁচট খেয়ে বুঝি জেগে উঠলাম। ক'দিন আগে এই রকম একটি বাক্যের সঙ্গে দেখা হল "The only thing we have to fear is fear itself" এলীনর রুজেভেল্ট নাকি ফ্র্যাংলিন রুজেভেল্টের সমাধি ফলকের জন্য এই বাক্যটি চয়ন করেছিলেন।

বাক্যটি আমাকে ইলেকট্রিক শক দিয়েছিল। সম্ভবত এই কারণে যে সম্প্রতিকালে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, অনেককে ভয় পেতে দেখেছিলাম এবং এই ভয়ের জন্য তীব্র লজ্জা আমার আত্মসম্মানকে প্রতিদিন আহত করছিল। যে সংকটে পড়লে ধর্মপ্রাণ মানুষ বাইবেল কোরান গীতা নিয়ে বসেন আমি সেই সংকটে পড়ে 'গীতবিতান' নিয়ে বসে থাকতাম। রবীন্দ্রনাথের অভয় (নাকি মাভৈ?) সঙ্গীত দু'চারটি পড়ে পড়ে নিজের ধসে পড়া সাহসকে তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। মনে পড়ত কিছুকাল আগে দেখা চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি ফিল্মের দৃশ্য, নাৎসী সৈন্য গ্রামে পৌঁছে গেছে খবর পেয়ে বৃদ্ধা, চলৎশক্তিহীনা একটি ঠাকুরমা কম্পিত হাতে পারিবারিক বাইবেলটি নামিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। ...অনেক সময় ভাবতাম, ভয় ভাগ করে নিলে কমে, সাহস ভাগ করে নিলে বাড়ে। কিন্তু ভাগ করে নেওয়াও সহজ ছিল না।

মনোবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্য কেতাবে লেখে, আকস্মিক কোনো আপৎকালীন অবস্থার মুখোমুখি হলে ভয় পাওয়া বা রেগে-যাওয়া প্রাণীর রক্তে অ্যাড্রিনালীনের সঞ্চার হয়। তাতে করেই নাকি আপদের মোকাবিলা করবার জন্য শরীর প্রস্তুত হতে থাকে। অর্থাৎ পশ্চাৎ অপসরণের তাড়ায় কিংবা অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করার চেষ্টায় যদি আঘাত পাই তাহলে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণ যাতে না হয় তারই ব্যবস্থা করেন প্রকৃতি। অ্যাড্রিনালীন নাকি রক্তকে তাড়াতাড়ি জমে যেতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আপৎকালে আমাদের সবারই অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড যখন বেশ একটু সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তখন হঠাৎ আমাদের কল্পনাশক্তির দৌড় খুব বেড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। সম্ভব-অসম্ভব ভেদজ্ঞান মাঝে মাঝেই লোপ পাচ্ছিল। অবশ্য এই লক্ষণটিও মনোবিজ্ঞানের নিয়ম-বহির্ভূত নয়। এখন ভাবলে হাসি পায় বটে কিন্তু তখন ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছিল কেউটের কল্পনায়। কোনো কোনো কাল্পনিক ধারণা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রায় কুসংস্কারের মতই মনকে আচ্ছন্ন করছিল। যেমন কিনা, অযুতচক্ষু অযুত বাহু অমিত বলশালী পুলিসের একটি চক্ষু আর একটি বাহু সদা সর্বদা আমারই প্রতি উদ্যত রয়েছে এমন একটা দুশ্চিন্তা শিরা-উপশিরাকে অবসন্ন করে ফেলছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল শৈশবে অভিভাবকদের সেই সতর্কবাণী যত লুকিয়েই কিছু কর না কেন ভগবান দেখছেন ঠিকই তোমার মনের চিন্তাও তাঁর অগোচরে নেই।

ঠিক সেই রকমের নজরবন্দী শৈশব আর একবার যেন ঘিরে ফেলেছিল চতুর্দিক থেকে। মনে হত বলা কি যায় হয়তো আমার টেলিফোনেও ওরা আড়ি পাতছে, কলকাতা শহরে যে দু-এক হাজার লোকের উপর নজর রাখা স্থির হয়েছে হয়তো সেই সম্মানিতদের মধ্যে আমিও আছি, হয়তো আমার নামে যেসব চিঠি আসে সেগুলি খুলে দেখা হয়, যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে জরুরী অবস্থা সম্বন্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছি সে হয়তো অসাবধানে এমন লোককে বলে দিয়েছে যে ওই অযুত বাহুর একটি বাহু। এবার ওই বাহু হয়তো তৎপর হয়ে শেষ রাতে আমার সংসারে হানা দেবে, আমার রোগজীর্ণ স্বামীকে না-হক জিজ্ঞাসাবাদ করে উৎপাত করবে, হয়তো আমার যত সযত্ন-সঞ্চিত বইখাতা চিঠিপত্র সব তছনছ করবে, হয়তো আমার বিছানার তলায় জ্যোতির্ময় দত্তকে খুঁজবে এসে। ভয়-ভাবনা শতমুখ কাঁটা হয়ে অহরহ আমাকে শত রকমে ফুঁড়ছিল।

যে সব দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র বিশ্বতশ্চক্ষু আর বিশ্বতোবাহু সে সব দেশের ভয়তাড়িত নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষ শুনেছি নিজের বালিশ ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না। গোপন অশ্রু, চাপা দীর্ঘশ্বাস এবং অস্ফুট অভিযোগের একমাত্র সাক্ষী থাকে বালিশ। কখন কখনও ভাবছিলাম, এদেশেও কি শেষ পর্যন্ত তাই হবে? কিছুকাল আগে গালিবের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছিলাম সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন। সাধারণত এ ধরনের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যা হয়, কেউই তো ঠিক বুঝতে পারে না জয় কোন্ দিকে, কোন্ দিকে দুর্গা বলে ঝুলে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রেসের ঘোড়া হলে পছন্দ মতন একটা ধরে বসে রইলাম, যা যাবে টাকার ওপর দিয়ে যাবে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ভুল ঘোড়া ধরলে ধনেপুত্রে সর্বনাশ। গালিবের ধনও ছিল না, পুত্রও ছিল না। শুধু প্রাণটুকু বাঁচাতে সদর দরজার বাইরে থেকে কুলুপ এঁটে যুযুধান দুই পক্ষ হতেই সমদূরত্বে বসে সাধারণের অবোধ্য প্রাচীন ফার্সী ভাষায় দিনলিপি লিখতে থাকলেন। গুজব, উত্তেজনা আর ভয়ে ঠাসা দিল্লি শহরে তখন এছাড়া আর কোন উপায়ে বাঁচবেন? তবু পড়ে মনে হয়েছিল, ছিঃ কী কাপুরুষ! এই কি তবে "অজব আজাদ মর্দ"? আশ্চর্য স্বাধীনচিত্ত পুরুষ? নামাজ রোজা না মানা এবং অপরিমিত মদ্যপান—এতেই কি এই মুসলমানের বাচ্চার সব সাহস ফুরিয়ে গেল? সমাজ আর ঈশ্বরের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে শেষে কিনা সিপাহীর ভয়ে দরজায় কুলুপ? ওই জীবনীটি পড়ার অল্পদিন পরেই ভয়ের ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল আমাদের সারা দেশ জুড়ে। নিজের ফ্যাকাশে নিরক্ত মুখের ছায়া দেখলাম আশেপাশে সবার মুখে। তখন গালিবকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু নিজেকে করলাম না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অথচ হঠাৎ একটা দুর্দিনে প্রয়োজন হলেই আমি ভয়কে কাটিয়ে উঠবই বা কি করে? আশৈশব ভয় করতেই তো শিখেছি। টিকটিকি আরশোলা, কলাগাছের ছায়া, মধ্যরাতে কুকুরের কান্না, পাড়ার যত কচি ছেলে খাওয়া ডাইন, কাবলিওয়ালা, জটাধারী সন্ন্যাসী, পুলিস. ষাঁড়—ভয়ের কারণ কি চতুর্দিকে কিছু কম ছড়ান ছিল? তা সত্ত্বেও ভাইদের অনুসরণ করে মাঠে-ঘাটে গাছে-চালে আমার স্বচ্ছন্দ বিহার এক ঠানদিকে বিশেষ চিন্তিত করত। তিনি অদূর ভবিষ্যতের আর একটি ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে প্রয়াসী হতেন। বলতেন, "এই রঙ্গ-ই রঙ্গ না, আরো রঙ্গ আছে।" 'আরো রঙ্গটি' যে নাকের জলে, চোখের জলে একদিন জমে উঠবে, এই ছিল সাবধান বাণী। কারণ ভাইদের যে পরের বাড়িতে যেতে হবে না এবং আমাকে যে যেতে হবেই এবং সেখানে যাবার প্রস্তুতি হিসাবে আমার ধিঙ্গিপনা যে খুব কাজে লাগবে না এ বিষয়ে ঠানদি আমাকে অবহিত করতে যত্নবতী হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে দীর্ঘকাল যাবৎ বিহার প্রবাসিনী অন্য এক মহিলার 'বাংলা' উক্তি দিনভর ছপ্পড়ে ছপ্পড়ে তেলেঙ্গি লুটে বেড়ালে তরক্কী হবে কি করে? কিন্তু 'পরের বাড়ি' সম্বন্ধে ওই ভয়টা আমার মনকে যথেষ্টই চেপে ধরতে পেরেছিল মনে হয়, কারণ যখন থেকে একটু জ্ঞানবুদ্ধি হল তখন থেকেই ঠিক করলাম যে জেলখানার বিকল্প ওই যে স্থানটি যা নারীমাত্রেরই জীবনের অবশ্য গন্তব্য লক্ষ্য, সেখানে যাওয়া যে করেই হোক ঠেকাতে হবে। অচিরেই অঘোরকামিনী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে গিয়ে চোখের সামনে কয়েকজন অনূঢ়া ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রীকে দেখে ভরসা পেলাম যে ঠানদি আমার জন্য যে অমোঘ ও ভয়াবহ লক্ষ্য নির্দেশ করে গিয়েছেন সেটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। সে যাই হোক, ইতিমধ্যে ইস্কুলটাও কম ভয়ের কারণ হল না। খেলার সময়টুকু আর গুটিকয়েক প্রাণের বান্ধবী ছিল সেই কালো মেঘের রুপোলী রেখা।

জানি না এখনও মেয়েদের ইস্কুল তেমনি ভয়াবহ জায়গা কিনা। লন্ডনে বি এ পাশ করা আমাদের হেডমিসট্রেস ডিসিপ্লিন জিনিসটা শক্ত হাতে সামলাতেন। অগ্নিশিখা সদৃশা এই মহিলার দুই ইঞ্চি হিলের খুট খুট শব্দ ইস্কুলের করিডরকে যে পরিমাণে সন্ত্রস্ত করে রাখত, কোনো দুর্দান্ত অফিসারের বুটের শব্দও কোনো ব্যারাককে সেই পরিমাণে সন্ত্রস্ত রাখতে পারে কিনা জানি না। সকালের দিকে একবার দোতলা প্রশস্ত ইস্কুল বাড়ির প্রত্যেকটি ক্লাস পরিদর্শন করতেন হেডমিসট্রেস। ক্লাসের দরজা দিয়ে ঢুকে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াতেন, আমরা বিদ্যুৎপৃষ্টের মতন প্রায় stand at attention ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত কণ্ঠে বলতাম, Good morning, madam." তারপর রুদ্ধশ্বাস কয়েকটি মুহূর্ত, তিনি কখনও কেবলমাত্র শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দিয়েই চলে যেতেন, কখনও শিক্ষয়িত্রীকে অথবা ছাত্রীদের কাউকে কিছু বলতেন। আমি সেই সময়টায় তাঁর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করতাম না, যদিও আকারে ক্ষুদে ছিলাম বলে প্রথম বেঞ্চেই চিরকাল ঠাঁই পেয়েছি এবং কোনো কোনো বছরে দরজার একেবারে পাশে, যেখানে, হেডমিসট্রেস এসে দাঁড়াতেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দু-হাতের মধ্যেই। ওঁর গায়ের বিলিতি সুগন্ধেও আমার ভয় কাটত না। বুঝতে পারি কেন সেকালের মানুষ দেবতাদের মুখের দিকে তাকাতে পারত না, কেন জাপানের প্রজারা মাথা নীচু করে থাকত যখন শোগুণ পথ দিয়ে যেতেন। ভদ্রমহিলা পিছন ফিরলে তবে আমাদের নিশ্বাস পড়ত। কেন যে "stand at ease"-এর হুকুম হিন্দীতে দেওয়া হয় 'আ....রাম' হেঁকে তা বোঝা কঠিন নয়।

ইস্কুলের গাছের আম চুরি করা থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের আন্দোলনে বড় মেয়েদের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দুঃসাহস পর্যন্ত যেমন কঠোর হস্তে দমন করতেন তিনি তা যে কোনো ক্ষমতা-কাঙ্ক্ষিণী মহিলার শিক্ষণীয়। সুলতানা রিজিয়া থেকে শুরু করে অতি সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুতা মহিলাটিও তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিতে পারতেন। তার ওই রকম নানা কীর্তি বিষয়ক জনশ্রুতি আমাকে আমার ঈশ্বরপ্রদত্ত আকারের চেয়েও সঙ্কুচিত করে রাখত ইস্কুলে। আমার জীবনের প্রথম ১৫ বছর যেসব আধিভৌতিক আধিদৈবিক ভয় আমাকে ঘিরে রেখেছিল তাতে আমার ঝাঁসীর রানি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা মূলেই নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। ম্যাডামের সামনে মাথা সোজা করে দাঁড়াতেই পারতাম না। পরবর্তী জীবনের ভয়গুলি যেন ওই প্রাক্তন ভয়েরই প্রকারভেদ।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে ভয় ভাঙানোর ডাক এল চতুর্দিক থেকে। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে উঠেছে, আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা ধীলন-সায়গল-শাহনাওয়াজের মুক্তির জন্য আন্দোলন ছাত্র সমাজ ডিঙিয়ে আমাদের সরকারি ইস্কুলের ছাত্রীদেরও টানল। আর অন্যদিকে এল দাঙ্গা। কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে আমরা শেষ বেলার একটি পিরিয়ডে মাথা নীচু করে বসে সংস্কৃত অনুবাদ করছিলাম। সেই সঙ্গে কলম কামড়াচ্ছিলাম আর ডেস্কের দোয়াতে বার বার নিব ডুবিয়ে তুলে ঝেড়ে ঝেড়ে চতুর্দিকে প্রচুর অনুস্বার বিসর্গ ছড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি দিদিমণির স্বাভাবিক শ্যেন দৃষ্টি একটু যেন বিমনা, জানলার বাইরে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু পর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "আজ এখন কলকাতায় না জানি কি শুরু হয়েছে।"

প্রবাসী বাঙালিরা সাধ্যমত সবাই "আনন্দবাজার" পড়তেন তখন। অতএব কলকাতা নোয়াখালি খুলনার যত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ পৌঁছে যাচ্ছিল আমাদের কাছে আর বিহারের ঘটনা সব তো এক রকম চোখের সামনেই ঘটল। সেই সব কিছুর মাঝে গান্ধীজীর একটি কথা আমাকে অসম্ভব ভাবিয়ে তুলেছিল। তিনি বলেছিলেন মেয়েদের আত্মসম্মান রক্ষার উপায় তাদের হাতেই আছে। নিগৃহীতা মেয়ের আত্মহত্যা তো কেউ ঠেকাতে পারে না। কথাটা সরাসরি হজম করা সেদিনও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যে মেয়েদের আত্মরক্ষার কোনো শিক্ষাই কোনোদিন দেওয়া হয়নি, সমাজও যদি তাদের রক্ষা করতে না পেরে থাকে তবে তাদের সমাজচ্যুতা একঘরে করবার কিংবা মৃত্যু বিধান দেবার অধিকার পেল কি করে সমাজ।

গান্ধীজীর এই বিধান আমার মনকে তোল পাড় করেছিল তখন, যদিও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজপুতানীর জহরব্রতের গৌরব ইস্কুলপাঠ্য বই মারফৎ হৃদয়ের এক কোণে শিকড় গেড়েছিল ঠিকই। 'অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভালো" এ তো একটা সর্বজনীন নীতি। কিন্তু যে মেয়েকে অসম্মান করা হল সে আত্মহত্যা করবে আর তার অসম্মান যারা ঠেকাতে পারল না সেই বাপ-ভাই-স্বামীর কোনো অসম্মান হল না, তাদের আত্মহত্যা করার বিধান কেউ দিল না এ বড় আশ্চর্য ঠেকেছিল আমার কাছে। আত্মহত্যা যদি করতে হয় এসব ক্ষেত্রে তবে সপরিবারে আত্মহত্যা করাই তো উচিত। সবারই কি অসম্মান হয়নি? এই এক চোখা বিধান আমার মনকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

কিন্তু আত্মহত্যার প্রশ্নটা নানাভাবে আমাকে বহুদিন ধরে ভাবিয়ে চলেছে। প্রাণ সম্বন্ধে এমন তীব্র জৈব আকর্ষণ আছে যে তাকে কাটিয়ে ওঠা কিংবা সমস্ত ভয়ের মূলে যে ওই প্রাণভয় তাকে কাটিয়ে ওঠা বুদ্ধিবিবেকের তাড়নাতেও সহজ হয়নি। তবু অবশ্য মানুষ ছাড়া আর কেউ স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয় না। কিন্তু সম্প্রতি জানলাম লেমিং নামে একমাত্র আর এক জাতের চতুষ্পদ প্রাণী আছে যাবা নাকি রাজপুতানীদের মতো দল বেঁধে আত্মহত্যা করে, তবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে এবং স্ত্রী-পুরুষে মিলে। এই শেষ পয়েন্টে তারা মানুষের চেয়ে উন্নত। যাই হোক, মানুষের মধ্যেও আবার আত্মহত্যা করে তারাই যাদের জীবনবোধ কোনো না কোনো দিক থেকে খুব তীক্ষ্ণ কিংবা একান্তই যারা নিস্পৃহ। জৈন অর্হবদের প্রায়োপবেশনের রীতি মনে পড়ে। মনে হয় যেন তাঁদের চোখে এই ছিল জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। আমি কিন্তু তবু আত্মহত্যাকে ভয় পাই।

জীবনে যতবার ভয় পেয়েছি তার অনেকটাই শারীরিক কষ্টের ভয়, কদাচিৎ মৃত্যুর ভয়। তাছাড়া, অপমান আর বিচ্ছেদের ভয়ও মনকে উৎকণ্ঠিত করেছে বহুবার। নানা রকম ব্যর্থতা ও অভাবের ভয় কখন কখনও পেয়েছি। সাম্প্রতিক ভয়টা ছিল মানুষের মতো বাঁচতে না পারার ভয়। এই এতগুলি ভয়কে জয় করা কি সহজ? সব ভয়েরই শেষ করা যায় বটে ও মৃত্যু ভয়কে জয় করতে পারলে সেটাও যে খুব অসম্ভব নয় তার প্রমাণ দেশে দেশে কত মানুষ দিয়েছেন, ফাঁসির মঞ্চে, যুদ্ধের প্রাঙ্গণে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে। কিছুকাল আগে যে চিকিৎসক মানস রায়চৌধুরী এনকেফেলাইটিস রুগীকে বাঁচাবার চেষ্টার নিজের মুখে রোগীর দেহ থেকে বিষ নিষ্কাষণ করে শেষে নিজেও সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁর নামে কোনো বাগ বা কোনো সরণী চিহ্নিত না হলেও তিনি বীরোত্তম। এভাবে মৃত্যুকে যাঁরা গ্রহণ করতে পেরেছেন নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যের জীবনকে কিছুটা সুন্দর ও সহনীয় করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আমার যত শ্রদ্ধা তত বিস্ময়, ততই ঈর্ষা। জীবন এত দামি, এত প্রিয়, সব কিছু সত্ত্বেও এত বাঞ্ছনীয় যে একে যদি দিতেই হয় তবে দেবার মতন তেমন পাত্রও তো পাওয়া দরকার। "ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে" বলা সত্যিই যায় কি-না জানি না, কিন্তু "শুধু তোমারে জানি" বলার মতন তো কিছু থাকবে জীবনের প্রান্তে? কি যে কার জীবনে এই সর্বস্ব-অপহারী "তুমি" হয়ে উঠবে বলা সহজ নয়। আবার এমনও তো হয় যে, মহৎ কিছু সহসা আমাদের জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসে ফিরে যায়, লগ্নভ্রষ্ট হয়। আমরা এই "তুমি"-কে চিনতেও পারি না গ্রহণও করতে পারি না। সেই মুহূর্তে হয়তো রাজ্যের সংশয় আর বিতর্ক তুলে নিজের প্রতি জান্তব মমতাটুকু আঁকড়ে ধরি। আমাদের মতন বেশির ভাগ মানুষের জীবনে সে রকমটাই তো ঘটে। নিজেকে দেবার সুযোগ আসে না, এলেও সে সুযোগ নেবার সাহস হয় না।

ইদানীং ভয় পেয়ে আমি এই রকমের কিছু এলোমেলো কথা ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, কেন এমনটা হয় যে কোনো কোনো মানুষ যা অবলীলায় করতে পারে আমার কাছেই তা এত দুরূহ ঠেকে? মোটামুটি নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বিগ্ন জীবনে সব কিছু সহজেই পেয়ে এসেছি বলেই কি এই ভীরুতা, সাহসে মরচে পড়ে গেছে? যদি যথেষ্ট পরিমাণ মূল্য চুকিয়ে দিয়ে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য সম্মান স্বাধীনতা উপার্জন করে নিতে হত তবেই হয়তো সেগুলি আগলে রাখার জন্যও সমান তৎপর হতাম, তার মূল্য দেবার জন্য যতটা কষ্টবরণ প্রয়োজন তা করতে ভয় পেতাম না। জানি না, পুরোপুরি বুঝতেও পারি না কোথায় আমার দুর্বলতার শিকড়, কোথায় আমার শক্তির উৎস। কেমন করে যে একটাকে উপড়ে ফেলব, অন্যটার পাথর-চাপা স্রোত দেব খুলে তাও বুঝতে পারি না। বুদ্ধদেব তো বেশ বলে দিলেন, "আত্মদীপো ভব"। কিন্তু বার বার যে সেই দীপ নিবে যেতে চায়, চণ্ডালিকার মতন শুধু অন্ধকারে চোখ বুজে বসে জপ করতে থাকি।

> "আমি ভয় করিনে মা, ভয় করিনে।
> ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে,
> পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।"

দেশ, বর্ষ ৪৪, সং ৩১ (২৮।৫।১৯৭৭), পৃঃ ২১-২২

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নবজাতক সম্পাদিকা সমীপেষু

গত সংখ্যার 'নবজাতকে' রাজশাহি থেকে লেখা অধ্যাপক সামাদের পত্রটি পড়লাম। সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তিনিও ভাবছেন এতে সুখী হয়েছি। এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধ ও মিলনের চিত্রটি তিনি সংক্ষেপে ভালোই এঁকেছেন। সাম্প্রদায়িকতার মূল যে ইতিহাসের সুদূর গর্ভে প্রোথিত এবং একদিনে তা উপড়ে ফেলা যাবে না এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি এক মত। আমাদের সাহিত্যে ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতার প্রকাশ যে বংশ-পরম্পরায় মানুষের মনকে সংকীর্ণ করে রেখেছে এ বিষয়ে এখন অনেকেই এখানে সচেতন হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভারতবর্ষকে সামাদ সাহেব বা শেখ মুজিব যে উপদেশ দিয়েছেন তা নতমস্তকে মেনে নিলাম।

তবু সবিনয়ে তাঁদের স্মরণ করাই যে এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমাদের সরকার কিছুটা সচেতন এবং সচেষ্ট ; কিছু আদর্শবাদী মানুষও যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছেন। ভারত বিভাগ হবার অব্যবহিত পর থেকেই এখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস চলেছে মানুষের মনকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করার জন্য। গত বছরে কথায় কথায় লক্ষ্য করেছি যে 'বাংলাদেশে'র অনেকে ভুলে গেছেন যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উন্মূল করতে গিয়েই গান্ধিজিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। দেশবিভাগের জন্য সে সময়ে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর মনে যতই আক্রোশ থাক, যুগাগত অবজ্ঞা ও ঘৃণা যতই প্রবল হয়ে উঠুক, তবু এই দেশে কয়েকজন নেতা এতটা শক্তিমান ছিলেন যে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়নি। নেহেরু ডিক্‌টেটর ছিলেন না। দেশের মেজাজ একেবারে বুঝতেন না তাও নয়। তবু যে ভারতীয় মুসলমান; খৃস্টান, পার্শিকে alienate না করবার জন্য অন্তত সংবিধানে তাঁদের সমান অধিকার দিতে পেরেছিলেন তার জন্য ভারতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহিষ্ণুতাকে প্রশংসা না করলে অন্যায় হবে। এই আদর্শ আমাদের প্রতিটি মানুষের জীবনে গৃহীত হয়েছে এমন দাবী করব না। কিন্তু সেদিক থেকে দেখতে গেলে তো আমাদের কত আদর্শই এখনও জীবনে স্বীকৃত হয়নি ; অস্পৃশ্যতা, পণপ্রথা ইত্যাদি বেআইনী হয়েও দিব্যি বহাল রয়েছে সমাজে। তবু বার বার বড়ো আদর্শকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে হয়, ক্ষুদ্র মানুষকে মহত্ত্ব অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করতে হয়। 'বাংলাদেশে' হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের যে আনুপাতিক হার, সারা ভারতবর্ষে মুসলমান হিন্দুর আনুপাতিক হারও প্রায় একই। কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনের শীর্ষে যত মুসলমান এখনই আছেন তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। এ দেশের সর্বময় অধিনায়ক রাষ্ট্রপতিও একজন মুসলমান হয়েছেন। আজও ভারতবর্ষে আট কোটি মুসলমান আছেন, পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। ইদানীং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরও তাঁরা দলে দলে দেশত্যাগ করেননি যেমন কিনা বাঙালি-আসামী দাঙ্গা কিংবা গুজরাটি-মারাঠি দাঙ্গার পরেও উৎপীড়িত মানুষ ভিটে ছাড়েননি। সম্প্রতি একটু আত্মপ্রসাদ বোধ না করে পারি না যখন দেখি আমাদের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত খোলা থাকলে আজ প্রচুর মুসলমান প্রাণ বাঁচাবার জন্য এই ভারতে ছুটে আসতেন দুদিকের দুই মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র থেকেই ইতিমধ্যেই অল্পস্বল্প গোপনে এসেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমত আজ পড়েন ক'জন—আর যাঁরা পড়েনও তাঁরা নির্বিচারে পড়েন না। বর্তমান শতকেও সাম্প্রদায়িক সাহিত্য রচনা করা হয়নি বলব না। তবে একথাও বলব যে যাঁরা একাজ করেছেন তাঁদের চেয়েও বেশি শক্তিমান লেখকরা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার মানবতার পরিচয়ও দিতে পেরেছেন। রঙ্গমঞ্চে ও চলচ্চিত্রেও তার পরিচয় পেয়েছি। তাছাড়া ভারতবর্ষের একটি বেতারকেন্দ্র থেকেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হয়নি গত ২৫ বছর ধরে। এমন কি ১৯৬৫ সালের পাকভারত সংঘর্ষ কিংবা গত বৎসরের শেষে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েও মুসলমান-বিরোধী একটি বাক্যও বেতারে উচ্চারণ করা হয়নি। এর কি একটা সুফল ফলবে না জনচিত্তে? এই বিকার এদেশে যতটা আছে তা নিয়ে লজ্জিত হবার, আত্মসমালোচনা করার কিংবা ক্রমাগত এই হীনতাকে ধিক্কার দেবার মতো কিছু লোক তো এদেশে আছেন! জয়প্রকাশ নারায়ণ, অন্নদাশঙ্কর রায়, আপনি, পান্নালাল দাশগুপ্ত, সুভদ্রা যোশী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, মালতী দেবী, ইত্যাদি কতজনে এই কাজ করে চলেছেন।

বরং আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে বেদনা বোধ করি যে বাংলাদেশের কেউ স্বীকার করতে চান না যে সেখানে এ সমস্যা আছে। আমার মনে পড়ে যায় ১৯৬৪-৬৫ সালের কথা যখন আমাদের 'লক্ষাধিক প্রচারিত' পত্রিকাগুলি সাম্প্রদায়িকতা ঠেকাতে নেমেছিলেন বলে আপনাদের ধিক্কার দিত মনে করিয়ে দিত যে স্বদেশের মিথ্যা নিন্দা পাপ! কতজনে আপনাদের বলেছেন যে এদেশে যে-সমস্যা নেই আপনারা খুঁচিয়ে সে সমস্যা তৈরি করছেন। আত্মসমালোচনা আত্মোন্নতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং জাগ্রত সমাজ আত্মসমালোচনা করবে ; নিজের দোষত্রুটি, দীনতা তুচ্ছতা নির্ভিক চোখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখবে এবং অদম্য সাহসে তার মোকাবিলা করবে এই আমার প্রত্যাশা। আওয়ামী লীগ তো বছর দুয়েক মাত্র মুখ ফুটে কথা বলতে শুরু করেছেন—তাও গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে তার মুখ বন্ধ ছিল। সে সময়ে 'বাঙলাদেশে'র চাষীমজুর নিরক্ষর মানুষ ঢাকা রেডিও থেকে প্রতিদিন যা শুনেছেন তা অসাম্প্রদায়িকতার বাণী নয়, হিন্দুকে ভালোবাসার সদুপদেশ নয়। স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাংলাবেতার কেন্দ্র ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন বটে তবে এই অল্পদিনের প্রচার শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব বাঙালির মনকে পরিচ্ছন্ন করতে পেরেছে এমন ভরসা আমার নেই। এত শতাব্দীর সঞ্চিত বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস এতই সহজে যায় এমন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে না। যে কাজ ২৫ বছর ধরে করে এসেও মাঝে মাঝে আমার মনে হয় হালে বুঝি পানি পাই না, সে কাজ শুরু হতে না হতেই ওখানে সারা হয়ে গেল এ কি বিশ্বাস্য?

গত বছরের সমস্ত অপরাধ তো পাকিস্তানী সৈন্য এবং বিহারীদের উপর চাপিয়ে দিলে চলবে না; প্রতিবেশি বাঙালি মুসলমানও তো বাঙালি হিন্দুর ঘরবাড়ি লুঠ করেছে। যারা কয়েক মাস আগেই হয়তো আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক ছিল, শুনেছি তারাও রাতারাতি পরম মুসলমান সেজে পাকিস্তানীদের ডেকে এনে হিন্দুদের উৎখাত করেছে—অবশ্য 'দেশদ্রোহী' 'ইসলামবিরোধী' মুসলমানদেরও বাদ দেয়নি। সে যাই হোক হিন্দুর প্রতি অপ্রীতি বাঙলাদেশের বহু মানুষের মন থেকেই যে যায়নি বরং ভারতবর্ষের সাহায্যে স্বাধীনতা লাভের পর অনেকেই যে বলাবলি করেছেন 'হিন্দুদের এবার খুব বাড় বেড়েছে'—একথা তো অস্বীকার করা যাবে না। তবু এসবের উদাহরণ দীর্ঘ করে মন বিষিয়ে তুলতে ইচ্ছা করে না—যে কারণে আমাদের পত্রিকাগুলিও এবার এজাতীয় সংবাদ যথাসাধ্য চাপা দিয়েছে, ভালোই করেছে। তবে এটা যাঁদের সমস্যা তাঁরা যদি এর দিকে চোখ বন্ধ করে থাকেন তবে সেটাকে বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলব না। কারণ সমস্যাকে অস্বীকার করেই তাকে যাদুকরের ফুঁতে উপে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা আছে কিনা তার সাক্ষ্য যেমন আমি হিন্দুর কাছ থেকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হব না তেমনি 'বাঙলাদেশে' সাম্প্রদায়িকতা আছে কিনা তার সাক্ষ্যও আমি সেখানকার মুসলমানের কাছে নেব না। কোথায় কেমন করে অসম্মান অবিচার কাঁটার মতো বেঁধে তা শুধু সংখ্যালঘুই বলতে পারে।

আমি 'বাঙলাদেশে'র নানা ধরনের মানুষকে ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করছি প্রায় দেড় বছর ধরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। আরও আগে থেকে আমরা সে দেশে চিত্তের মুক্তি সাগ্রহে লক্ষ্য করছি। ওই দেশের মানুষের জন্য আমার মনে আশা আগ্রহ ও গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁদের দুর্বলতাগুলিও চোখ এড়ায়নি। সামাদ সাহেব যেমন বন্ধুর মতো উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি আমাদেরও দু-একটি উপদেশ দেবার অধিকার দিন।

(১) আমাদের অভিজ্ঞতায় মনে হয় 'বাঙলাদেশে'র গ্রামে গঞ্জে সর্বত্রই যে হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক মধুর এমন নয়। গত ২৫ বৎসর ধরে যে হিন্দু বিদ্বেষ ও ভারতবিভীষিকা তাঁদের মনে সঞ্চার করা হয়েছে তার কুপ্রভাব এখনই দূর হয়নি। সেজন্য তাঁদের দোষও দেওয়া যায় না কারণ দূর করার জন্য তেমন ব্যাপক চেষ্টাও করা হয়নি। উটপাখির মতো এ সত্য অস্বীকার করলে কার লাভ হবে?

(২) ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের ফলে যে পরিমাণে কমেছে আবার ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা সে পরিমাণে বেড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'বাঙলাদেশে'র মানুষের কি তাতে মঙ্গল হবে? কোনওরকম অসহিষ্ণুতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমাদের উত্তর প্রদেশে উর্দুকে সরকারি ভাষার সম্মান না দেওয়াতে আমরা ক্ষুন্ন বোধ করি তাই 'বাঙলাদেশে' আজ কোনও পিতা যদি কন্যাকে উর্দু ভাষায় পোস্টকার্ড লিখতে সাহস না করেন তবে একে 'বাঙলাদেশে'র পক্ষে সুলক্ষণ বলে মেনে নেব কি করে? এই সহিষ্ণুতার দাবী করতে পারেন জনসাধারণের কাছ থেকে তেমন নেতা আজ কই সেখানে? উর্দুভাষী মাত্রকেই কি করে পাকিস্তানী বলে শাস্তি দেওয়া চলে যখন আমরা জানি যে সেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের বাঙালিরাই ধরিয়ে দিয়েছেন? পরের দোষ বড়ো করে দেখার আগে নিজেদের দোষ সংশোধন করলে আত্মশক্তি বাড়ে। যেখানে ধর্মীয় উন্মত্ততা এতদূর বেড়েছিল যে স্বসমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকেও 'ধর্মচ্যুত' বলে শয়ে শয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে বাধেনি সেখানে হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজে পূর্ণ সম্প্রীতি বজায় রয়েছে একথা কি করে মেনে নেব? তাছাড়া এই অপ্রীতির কারণ হিসাবে 'চীনপন্থী' 'মার্কিন পন্থী' 'দালালদের' দিকে আঙুল দেখানো চক্ষুষ্মানের পরিচায়ক নয়। একদা আমরা অবিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পেয়ে ইংরেজ শাসকদের এ পাপের জন্য দায়ী করেছিলাম। তাতে আমাদের চরিত্রের উন্নতিও হয়নি, রাজনৈতিক সুফল ও ফলেনি! অতএব বাঙলাদেশের প্রতিটি বাঙালি আজ সন্ধানী আলো নিজের দিকে ফেরান, আত্মানুসন্ধান করুন।

(৩) সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে জাতীয়তা ভালো সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ সমস্ত মানুষের কল্যাণ যেখানে লক্ষ্য জাতীয়তা সেখানে মাঝ পথের স্টেশান— আন্তর্জাতীয়তার চর্চাতেই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ। বাঙালি হয়ে ওঠা গর্বের কথা।...'মানুষ' হয়ে ওঠা শ্রদ্ধার ব্যাপার। আমরা ভারতবর্ষে যেহেতু কম করেও সতেরোটা ভাষা আর পাঁচ ছয়টা ধর্ম নিয়ে ঘর করব মনস্থ করেছি তাই কেবল বাঙালি হয়ে ওঠায় খুব বড়ো কিছু দেখতে পাই না আমি। আমাদের পক্ষে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'টা ছিল বিপজ্জনক বিলাসিতা, 'ত্রিজাতি'টা বুঝতেই পারলাম না। সে কথা যদি ওঠে তবে এই এশিয়া মহাদেশেই তো কত জাতি (nation) আছে, তাদের সবার সঙ্গেই শান্তিতে সহাবস্থান আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৪) মনুষ্যত্বের নাম নিয়ে আরও একটি দুর্ভাবনার কথা বলি। গত বছর বাঙলাদেশে যত বীভৎস নিষ্ঠুরতা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছি, মুক্তিবাহিনীর কাছে শুনেছি, ধর্মপ্রাণা হাজ্জিনের কাছেও শুনেছি তার একটা বিরাট অংশের দায়িত্ব বাঙালি মুসলমানের। এমন কি বাঙালি মুসলমানের মেয়েকেও বাঙালি মুসলমান বাদ দেয়নি। মফস্বলের একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকার উপর কি অত্যাচার হয়েছিল সে কথা যেদিন শুনেছিলাম সেদিন ভাবছিলাম শুধু এই ভদ্রমহিলার স্বামী এবং ভাই আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন বলেই কি এত দূর বর্বরতা সম্ভব? কোথায় এই হিংস্রতার উৎস? বিংশ শতাব্দীতে এর একমাত্র তুলনা নাৎসী জার্মানীর কীর্তিতে। তবে নাৎসীরা কিছুকাল ধরে য়িহুদিবিদ্বেষ এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বর্বরতা সে কারণেই সম্ভব হয়েছিল বলে বলা হয়। বাঙালি মুসলমান শুধু কি রাজনৈতিক কারণেই বাঙালি মুসলমানের সঙ্গেও এতদূর হিংস্র ব্যবহার করতে পেরেছে গ্রামে গ্রামে? মানসিকতার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই কি? শুধু খান আর বিহারীদের দিকে আঙুল দেখালে তো এই পাপকে উচ্ছেদ করা যাবে না! তার জন্য চাই আত্মসমালোর্চনার সাহস, আত্মনিন্দার প্রত্যয় আর আত্ম সংশোধনের সদিচ্ছা।

এখানে আমরা কেউ কেউ নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত, লজ্জিত এবং আত্মসংশোধনের জন্যও সচেষ্ট। তাই অপরের চোখ বন্ধ করে রাখা আত্মসন্তোষকেও (self complacence) ধাক্কা দেবার আমাদের অধিকার আছে বলে মনে করি। সামাদ সাহেব বলেছেন, 'বরং ভারতের সাধারণ মানুষ এখনও পড়ে আছে বিশেষ ভাবে টোটেম টাবু আর অ্যানিমিজমের-এর যুগে।' সে কথা ঠিক। তবে 'বাঙলাদেশে'র সাধারণ মানুষই কি আর তার চেয়ে খুব এগিয়ে গেছে? তাগা-তাবিজ জল পড়ার totemism ভারতে যেমন রয়েছে 'বাঙলাদেশে' কি তার চেয়ে কম? আর খতনা করার (circumcision) চেয়ে উদ্ভটতর totemism সমসাময়িক বিশ্বে আর কি আছে? taboo-র কথা যখন উঠল তখন বলি গোমাংস সম্বন্ধে taboo যত তীব্র শূকর মাংস সম্বন্ধে taboo তো তার চেয়ে কম তীব্র দেখলাম না। পাথরের নুড়িকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা যেমন animism. মাজারে গিয়ে প্রার্থনা করাটাও তেমনি animism নয় কি? তাই কুসংস্কার কোথায় যে কম সে তো বুঝতে পারি না। সামাদ সাহেব অপরাধ মার্জনা করবেন।

বিনীতা
গৌরী আইয়ুব

নবজাতক, বর্ষ ৮ (১৩৭৮), সং ২ পৃঃ ৩০০-৪

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জীবন রেখা

প্রথম জীবন

গৌরী দত্তের জন্ম পাটনায়, ১৯৩১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি। মা নিরুপমা দেবী ও বাবা প্রখ্যাত দার্শনিক, অধ্যাপক ধীরেন্দ্র মোহন দত্তের নয় পুত্রকন্যার মধ্যে গৌরী ছিলেন তৃতীয়। লেখাপড়ায় মেধাবী গৌরী ১৯৪৭ সালে বাঁকিপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে মেয়েদের মধ্যে স্কুল ফাইনালে রাজ্যে প্রথম হন ও মগধ মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ পড়তে শুরু করেন। সে সময়ে ইংরেজ-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দু'দিন পর যখন মুক্তি পেলেন, তাঁর বাবা আর গৌরীকে পটনায় রাখা অসমীচীন মনে করে অবিলম্বে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকেই তিনি ১৯৫২ সালে বি এ ও ১৯৫৩ সালে বি টি (টিচার্স ট্রেনিং) পাশ করেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্নদাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে গৌরী ও নিমাই চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে তিনদিন ব্যাপী সাহিত্যমেলার আয়োজন করেন। দুই বাংলার লেখক-কবিদের এই সমাবেশটি আদতে ছিল ঠিক এক বছর আগে নিহত ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি। পরবর্তী কালে এই দিনটিই আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গৌরী এডুকেশনে এম এ পাশ করেন ১৯৫[illegible] সাল[illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিজীবন

শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় তাঁর অধ্যাপক প্রখ্যাত দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাথে গৌরীর প্রণয়ের সূত্রপাত হয় ও ১৯৫৬ সালে তাঁরা কলকাতায় বিয়ে করেন। একমাস পুত্র পুষনের জন্ম হয় ১৯৫৭ সালে। স্বামীর সাহিত্যচর্চায় গৌরীর প্রভূত অবদান ছিল। বিশেষত উর্দু কবি মীর ও গালিবের গজলের অনুবাদ গ্রন্থদুটিতে তিনি স্বামীকে সাহায্য করার জন্য উর্দু শিখেছিলেন এবং ওই দুই কবির জীবনীও লিখেছিলেন। ১৯৮২ সালের ২১শে ডিসেম্বর আবু সয়ীদ আইয়ুবের মৃত্যু হয়। আইয়ুবের সাথে বিবাহে পিতার সম্মতি ছিল না বলে তিনি কন্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ত্যাগ করেন, অথচ গৌরী চিরকাল নানা ভাবে তাঁর গান্ধীবাদী পিতার আদর্শ অনুসরণ করে গিয়েছেন।

কর্মজীবন

১৯৫৩ সালে অল্পদিন গৌরীর ঊষাগ্রাম মেথডিস্ট মিশনে পড়ান। পরে সাউথ পয়েন্ট স্কুল (১৯৫৫-৫৭) ও কিছুদিন যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুলে পড়িয়ে তিনি শ্রী শিক্ষায়তন কলেজে এডুকেশন বিভাগে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে ও সেখান থেকেই ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষাদানের মাধ্যমকে গৌরী ব্যবহার করেছিলেন সমাজসেবার কাজেও। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য আনার একটি উপায় বাঙালি মুসলমান যুব সমাজে শিক্ষার অধিকতর প্রসার ঘটানো। তাই অভাবী মুসলসমান ছাত্রদের সিভিল সার্ভিস প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তিনি বিনা বেতনে ইংরিজি পড়াতেন। পাড়ার অন্যান্য দুঃস্থ ছাত্রদেরও তিনি পড়াতেন। অন্যদিকে, কলকাতায় গবেষণারত বেশ কয়েকজন জাপানী ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি বাংলা পড়িয়েছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রগাঢ় উৎসাহের কারণে তিনি একসময় নিয়মিত রবীন্দ্র চর্চা ভবনেও পড়াতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজ ও রাজনীতি

গৌরা আইয়ুব সক্রিয় ভাবে সমাজ সেবায় ব্রতী হন ১৯৬৪ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়। মৈত্রেয়ী দেবীর নেতৃত্বে যে কাউন্সিল ফর প্রোমোশন অফ কম্যুনাল হারমনি প্রতিষ্ঠা হয়, গৌরী ছিলেন তার সহ-সম্পাদক ও সক্রিয় সদস্য। এই সংস্থার সদস্যরা কয়েকটি ক্যাম্প চালনা ছাড়া দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে দুর্গতদের সাহায্যও করতেন। ১৯৮৯ সালে তিনি বেগম রোকেয়া স্মৃতি সহায়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সুরাহা সম্প্রীতির সভানেত্রী হন।

১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় গৌরী এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্য করা ছাড়াও মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে তিনি যুদ্ধের ফলে অনাথ হওয়া কয়েকটি বাচ্চাকে নিয়ে শুরু করেন 'খেলাঘর' নামে এক অনাথ আশ্রম। ১৯৯০ সালে মৈত্রেয়ী দেবীর মৃত্যুর পর থেকে তিনিই খেলাঘর-এর দায়িত্ব নেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিরূপ ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার গৌরী আইয়ুবকে 'বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা' (মরণোত্তর) প্রদান করেন।

১৯৭৫-৭৭ সালে আরোপিত এমারজেন্সির বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনে গৌরী এক উল্লেখ্য অংশ নেন। তিনি রাজরোষকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও লেখক-তথা-সমাজ সংস্কারক গৌরকিশোর ঘোষসহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়মিত সভা-সমিতি করতেন।

সাহিত্য সৃষ্টি

গৌরী বিশ্বাস করতেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তির মূল কারণ এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে অজ্ঞতা। সারা জীবন তিনি নানা প্রবন্ধের মাধ্যমেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তির আরেকটি উল্লেখ্য অংশ হল তাঁর শিক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিষয়ক প্রবন্ধগুলি। সাহিত্যের আসরে গৌরী আইয়ুবের পরিচিতি একদিকে যেমন তাঁর সুগভীর ও সময়োচিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনার জন্য, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে তাঁর একগুচ্ছ মর্মস্পর্শী ছোট গল্পের সঙ্কলন ও তাঁর ছাত্রী· ক্যোউকো নিওয়ার সাথে অনুবাদ করা জাপানী কবি মাৎসুও বাশোই-এর কাব্যিক ভ্রমণ কাহিনী। একমাত্র নাতনি শ্রেয়া অহনার ফরমায়েশে ঠাকুমা-গৌরী রচনা করেন এক আপাতমধুর দিনলিপি ('এই যে অহনা') যাতে প্রবাসী নাতনির সাথে তাঁর কিছুদিনের ওঠা-বসা-খেলা-পড়ার কথা লিখেছেন তিনি। এই কাহিনীতে স্বল্পকাল নাতনির সঙ্গে কাটানোর আনন্দ ঘন মুহূর্তগুলির আড়ালে রয়েছে তাকে ছেড়ে ঠাকুমার দূরে থাকার কষ্ট।

১৯৯৮ সালের ১৩ই জুলাই, ৬৭ বছর বয়সে গৌরী আইয়ুবের মৃত্যু হয়।

গ্রন্থ তালিকা

১। 'তুচ্ছ কিছু সুখ-দুঃখ' (গল্প সংগ্রহ), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬

২। 'দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ' (জাপানী ভ্রমণ কাহিনীর অনুবাদ, ক্যোউকো নিওয়ার সাথে), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯০

৩। 'এই যে অহনা', প্যাপিরাস, ১৯৯৬

—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও